শত বর্ষের শত গল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

।। ১৮৯৮ - ১৯৪১ ।।

সাগরময় ঘোষ

সম্পাদিত

বঙ্গ বাণী

৪৩ই/১এ ঝিল রোড
কলিকাতা ৭০০ ০৩১

প্রথম প্রকাশ	ডিসেম্বর ১৯৬১
প্রকাশক	লিপিকা হাজরা। বঙ্গবাণী। কলিকাতা ৭০০ ০৩১
পরিবেশক	দে বুক স্টোর। কলিকাতা ৭০০ ০৭৩
	পত্র ভারতী। কলিকাতা ৭০০ ০০৯
অক্ষর বিন্যাস	ফটো কম্প প্রসেস। কলিকাতা ৭০০ ০০৪
মুদ্রক	স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়াকর্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ৭০০ ০০৯

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে

শত বর্ষেব শত গল্প-ব দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। ভূমিকাব কোনও প্রযোজন ছিল না , বাংলাব ছোটগল্প সম্পর্কে আমাব বক্তব্য প্রথম খণ্ডেব ভূমিকাতেই আমি নিবেদন কবেছি। তবু দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে বিশেষভাবে দু-একটি কথা পাঠকদেব কাছে তুলে ধববাব প্রযোজন আছে।

এই সংকলনেব দ্বিতীয় খণ্ড যে-বৎসব এবং যে মাসে প্রকাশিত হল, সেই বৎসবে, সেই মাসেই ববীন্দ্রজন্মেব শত বর্ষ পূর্ণ হযেছে। এই দুটি ঘটনাব মধ্যে যে সম্পর্ক, তা তাৎপর্যময।

যে-কথা প্রথম খণ্ডেব ভূমিকায বলেছি, সে-কথা আবাব বলি, বাংলা ছোটগল্পেব সার্থকতম সৃষ্টি ববীন্দ্রনাথই কবেছেন, বাংলা ছোটগল্প প্রথম শিল্পৰূপ পেযেছে ববীন্দ্রনাথেব হাতেই। গল্পগুচ্ছেব গল্প পঞ্চাশ বছব আগেও সাহিত্যেব পাঠকদেব যে-ভাবে আনন্দ দিযেছে, আজও দিচ্ছে, পঞ্চাশ বছব পবেও পাঠকবা সেইভাবেই সেই গল্প থেকে আনন্দ উপভোগ কববে।

ছোটগল্পেব মধ্যে যে-প্রাণ ও শিল্পৰূপ ববীন্দ্রনাথ দিযে গিযেছেন তাঁবই উত্তবসাধক পঁযতাল্লিশ জন লেখকেব মহত্তম সৃষ্টিধাবাব মধ্যে সেই প্রাণ-প্রবাহেবই পবিচয পাওযা যায। এই গল্প নির্বাচনেব মূলে লক্ষ ছিল যে-সময়ে গল্পগুলি বচিত, সেই যুগ ও কাল গল্পেব মধ্যে কতখানি প্রতিফলিত হযেছে তা ব্যক্ত কবা। সেই কাবণেই চেষ্টা কবা হযেছে সাধ্যমত গল্পগুলিব প্রথম প্রকাশেব তাবিখটি নির্দিষ্ট কবা। অনুসন্ধানী পাঠকেব কাছে এব প্রযোজন আছে বলে মনে হয। যুগ ও কাল এইসব গল্পে বিধৃত হলেও যুগ ও কালজযী কোনও গভীব সত্যকে শিল্পকর্মে ৰূপ দিযেছেন বলেই দ্বিতীয খণ্ডে নির্বাচিত ববীন্দ্রোত্তবকালেব লেখকদেব এই গল্পমালা বাংলা সাহিত্যেব গর্বেব বিষয।

৪৫ এস আব দাশ বোড

কলিকাতা ২৬

১ বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

সাগরময ঘোষ

সূচিপত্র

অগ্রদানী	তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায	৯
আঙটি	শবদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায	১৯
অর্জুন মন্ডল	বনফুল	২৫
বাঘ	মনোজ বসু	৩৯
পরাজয়	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৫
মহেন-জো-দড়োর পতন	প্রমথনাথ বিশী	৫৮
স্বাহা	যুবনাশ্ব	৭৪
দেবতার জন্ম	শিববাম চক্রবর্তী	৮৬
নিবারণের মৃত্যু	সরোজকুমাব রায়চৌধুরী	৯২
রং নাম্বার	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯৯
সাপ	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১০৭
দু'কানকাটা	অন্নদাশংকর বায়	১১৪
পাদটীকা	সৈয়দ মুজতবা আলী	১২৩
রঙের গোলাম	প্রবোধকুমার সান্যাল	১২৯
পত্রলেখার বাবা	সতীনাথ ভাদুড়ী	১৪৪
হাতেখড়ি	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	১৫৩
লজ্জা	বুদ্ধদেব বসু	১৫৮
সমুদ্রের স্বাদ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭১
পশ্চিম দিগন্ত	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	১৭৬
ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ	আশাপূর্ণা দেবী	১৮৫
শ্মশান চাঁপা	সুবোধ ঘোষ	১৯৪
পাশের ঘর	আশালতা সিংহ	২০৬
ইষ্টিকুটুম	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২১৩
ঘরন্তী	বিমল মিত্র	২২১
নিম অন্নপূর্ণা	কমলকুমার মজুমদার	২৩২

বেহাগ	সুশীল রায়	২৪৮
মাধবীর জন্য	প্রতিভা বসু	২৫৮
বাঈজী	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৭১
দোলা	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২৭৯
চিমনির ধোঁয়া	নবেন্দু ঘোষ	২৯১
গন্ধরাজ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩১২
সাইকেলের রেস	বাণী রায়	৩২২
জেন্টলম্যান	রঞ্জন	৩২৮
চিনেমাটি	সন্তোষকুমার ঘোষ	৩৩৬
ইঁদুর	সোমেন চন্দ	৩৪৯
পলাশ সন্ধ্যা	ননী ভৌমিক	৩৬০
নিষাদ	বিমল কর	৩৬৮
দুই বন্ধু	সত্যজিৎ রায়	৩৭৭
আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া	বমাপদ চৌধুরী	৩৮২
অন্ধকূপ	গৌরকিশোর ঘোষ	৩৯২
পাড়ি	সমরেশ বসু	৪০৫
দ্রৌপদী	মহাশ্বেতা দেবী	৪১৭
তেওট তালে কনসার্ট	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	৪২৬
যাবার বেলায়	শংকর	৪৪১
বুড়ো ও ফুচা	মতি নন্দী	৪৬৪
চূড়ামণি উপাখ্যান	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৪৭৯
বোধন ও বিসর্জন	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৪৯১
বেহালা	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	৫০০
আত্মজা	বুদ্ধদেব গুহ	৫১৩
দিয়ে যাওয়া	সমরেশ মজুমদার	৫২৭

অ গ্র দা নী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি ছয় ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা কাঠিকে মাঝামাঝি মচকাইয়া নোযাইয়া দিলে যেমন হয়, দীর্ঘ শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্তীর অবস্থাও এখন তেমনই। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে সে এমন ছিল না, তখন সে বত্রিশ বৎসরের জোয়ান, খাড়া সোজা। লোকে বলিত, মই আসছে—মই আসছে। কিন্তু ছোট ছেলেদের সে ছিল মহা প্রিয়পাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিদের হাসি দেখিয়া সে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিত, হুঁ। কী রকম হাসছ যে?

এই দাদা, একটা রসের কথা হচ্ছিল। •

হুঁ তা বটে, তা তোমার রসের কথা—ও তোমার রস খাওয়ারই সমান।

একজন হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া দিত, না দাদা, তোমাকে দেখেই সব হাসছিল, বলছিল—মই আসছে।

চক্রবর্তী আকর্ণ দাঁত মেলিয়া হাসিয়া উত্তর দিত, হুঁ তা বটে। তা কাঁধে চড়লে স্বগ্গে যাওয়া যায়। বেশ পেট ভ'রে খাইয়ে দিলেই, বাস্, স্বগ্গে পাঠিয়ে দোব।

আর পতনে রসাতল, কী বলো দাদা।

চক্রবর্তী মনে মনে উত্তর খুঁজিত। কিন্তু তাহার পূর্বেই চক্রবর্তীর নজরে পড়ত, অল্প দূরে একটা গলির মুখে ছেলের দল তাহাকে ইশারা করিয়া ডাকিতেছে। আর চক্রবর্তীর উত্তর দেওয়া হইত না। সে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িত।

কোনদিন রায়দের বাগানে, কোনদিন মিএলাদের বাগানে ছেলেদের দলের সঙ্গে গিয়া হাজির হইয়া আম জাম বা পেয়ারা আহরণে মত্ত থাকিত। সরল পরিপক্ক ফলগুলির মিষ্ট গন্ধে সমবেত মৌমাছি-বোলতার দল ঝাঁক বাঁধিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণের ভয় দেখাইলেও সে নিরস্ত হইত না; টুপটাপ করিয়া মুখে ফেলিয়া চোখ বুজিয়া রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকিত।

ছেলেরা কলরব করিত, ওই, অ্যাঁ—তুমি যে সব খেয়ে দিলে, অ্যাঁ! সে তাড়াতাড়ি ডালটা নাড়া দিয়া কতকগুলা ঝরাইয়া দিয়া আবার গোটা দুই মুখে পুরিয়া বলিত, আঃ!

কেহ হয়তো বলিত, বাঃ পুন্নকাকা, তুমি যে খেতে লেগেছ? ঠাকুর পুজো করবে না?

পূর্ণ উত্তর দিত , ফল, ফল, ভাত মুড়ি তো নয়, ফল, ফল।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে দিন এ কাহিনী আরম্ভ, সেদিন স্থানীয় ধনী শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এক বিরাট শান্তি-স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষে ছিল ব্রাহ্মণ-ভোজন। শ্যামাদাসবাবু সন্তানহীন, একে একে পাঁচ পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা গিয়াছে। ইহার পূর্বে বহু অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এবার শ্যামাদাসবাবু বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; কিন্তু স্ত্রী শিবরানী সজল চক্ষে অনুরোধ করিল, আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখো ; তারপর আমি বাবণ করব না ; নিজে আমি তোমার বিয়ে দেব।

শিবরানী তখন আবার সন্তানসম্ভবা। শ্যামাদাসবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শুধু তাই নয়, এবার তিনি এমনধারা ব্যবস্থা করিলেন যে, সে ব্যবস্থা যদি নিষ্ফল হয় তবে যেন শিবরানীর পুনরায় অনুরোধের উপায় আর না থাকে। কাশী, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর এবং স্বগৃহে একসঙ্গে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। স্বস্ত্যয়ন বলিলে ঠিক বলা হয় না, পুত্রেষ্টি যজ্ঞই বোধ হয় বলা উচিত।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনও বিপুল। শ্যামাদাসবাবু গলবস্ত্র হইয়া প্রতি পংক্তির প্রত্যেক ব্রাহ্মণটির নিকট গিয়া দেখিতেছেন—কী নাই, কী চাই। এক পাশে পূর্ণ চক্রবর্তীও বসিয়া গিয়াছে,

সঙ্গে তাহার তিনটি ছেলে। কিন্তু পাতা অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি। বাড়তি পাতাটিতে অন্ন ব্যঞ্জন মাছ স্তূপীকৃত হইয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাতাটি তাহার ছাঁদা ; তাহার নাকি এটিতে দাবি আছে। সে-ই শ্যামাদাসবাবুর প্রতিনিধি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে, আবার আহারের সময় আহ্বান জানাইয়াও আসিয়াছে। তাহারই পারিশ্রমিক এটি। শুধু শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এবং এই ক্ষেত্র-বিশেষটিতেই নয়, এই কাজটি তাহার যেন নির্দিষ্ট কাজ, এখানে পঞ্চগ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়িতেই হউক এবং যত সামান্য আয়োজনের ব্রাহ্মণ-ভোজন হউক না কেন, পূর্ণ চক্রবর্তী আপনিই সেখানে গিয়া হাজির হয় ; হাঁটু পর্যন্ত কোনরূপ ঢাকে এমনই বহরের তাহার পোশাকি কাপড়খানি পরিয়া এবং বাপ-পিতামহের আমলের রেশমের একখানি কালী-নামাবলী গায়ে দিয়া হাজির হইয়া বলে, হুঁ, তা কর্তা কই গো, নেমন্তন্ন কী রকম হবে একবার বলে দেন? ওরে, মাছগুলো বেশ তেলুক তেলুক ঠেকছে! হুই হুই—। নিয়েছিল এক্ষুনি চিলে।

চিলটা উড়িতেছিল আকাশের গায়ে, পূর্ণ চক্রবর্তী সেটাকেই তাড়াইয়া গৃহস্থের হিতাকাঙ্খার পরিচয় দেয়। দুর্দান্ত শীতের গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া সে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরে ; প্রচন্ড গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরেও আহারের আহ্বান জানাইতে চক্রবর্তী ছেঁড়া চটি পায়ে, মাথায় ভিজা গামছাখানি চাপাইয়া কর্তব্য সারিয়া আসে ; সেই কর্মের বিনিময়ে এটি তাহার পারিশ্রমিক। যাক।

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া পূর্ণকে বলিলেন, আর কয়েকখানা মাছ দিক চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর তখন খান-বিশেক মাছ শেষ হইয়া গিয়াছে ; সে একটা মাছের কাঁটা চুষিতেছিল, বলিল, আজ্ঞে না, মিষ্টি-টিষ্টি আবার আছে তো! হরে ময়রার রসের কড়াইয়ে ইয়া ইয়া ছানাবড়া ভাসছে, আমি দেখে এসেছি।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, সে তো হবেই ; একটা মাছের মুড়ো? পূর্ণ পাতাখানা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল, ছোট দেখে। মাছের মুড়োটা শেষ করিতে করিতে ওপাশে তখন মিষ্টি আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্তী ছেলেদের বলিল, হুঁ, বেশ করে পাতা পরিষ্কার কর্ হুঁ। নইলে নোন্তা ঝোল লেগে খারাপ লাগবে খেতে। এঃ, তুই যে কিছুই খেতে পারলি না, মাছসুদ্ধ পড়ে আছে।—বলিয়া ছোট ছেলেটার পাতের আধখানা মাছও সে নিজের পাতে উঠাইয়া লইল। মাছখানা শেষ করিয়া সে গলাটা ঈষৎ উঁচু করিয়া মিষ্টি-পরিবেশনের দিকে চাহিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে হাঁকিতেছিল, এই দিকে।

ওপাশে সকলে তাহাকে দেখিয়া টেপাটেপি করিয়া হাসিতেছিল। একজন বলিল, চোখ দুটো দেখ, চোখ দুটো দেখ —

উঃ, যেন চোখ দিয়ে গিলছে! আমি তো ভাই, কখনও ওর পাশে খেতে বসি না। উঃ কী দৃষ্টি !

ততক্ষণে মিষ্টান্ন চক্রবর্তীর পাতার সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়াছে।

চক্রবর্তী মিষ্টান্ন-পরিবেশকের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল, ছাঁদার পাতে আমি আটটা মিষ্টি পাব।

বাঃ, সে তো চারটে ক'রে মিষ্টি পান মশায় !

সে দুটো ক'রে যদি পাতে পড়ে, তবে চারটে। আর চারটে যখন পাতে পড়ছে, তখন আটটা পাব না, বাঃ!

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া বলিলেন, ষোলটা দাও ওর ছাঁদার পাতে। ভদ্রলোক বিনা মাইনেতে নেমন্তন্ন ক'রে আসেন, দাও দাও ষোলটা দাও।

পূর্ণ চক্রবর্তী আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল, আঁচলে দাও, আমার আঁচলে দাও।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, চক্রবর্তী কাল সকালে একবার আসবে তো! কেমন, এখানে এসেই জল খাবে!

যে আজ্ঞা, তা আসব।

ওপাশ হইতে কে বলিল, চক্রবর্তী' বাবুকে ধরে প'ড়ে তুমি বিদূষক হ'য়ে যাও — আগেকার রাজাদের যেমন বিদূষক থাকত।

চক্রবর্তী গামছায় ছাঁদার পাতাটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, হুঁ। তা তোমার, হলে তো ভালই হয় ; আর তোমার, ব্রাহ্মণের লজ্জাই বা কী ? রাজা-জমিদারের বিদূষক হয়ে যদি ভাল-মন্দটা —

বলিতে বলিতে সে হাসিয়া উঠিল।

বাড়িতে আসিয়া ছাঁদা-বাঁধা গামছাটা বড় ছেলের হাতে দিয়া চক্রবর্তী বলিল, যা, বাড়িতে দিগে যা।

ছেলেটা গামছা হাতে লইতেই মেজো মেয়েটা বলিল, মিষ্টিগুলো ?

সে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যা।

অ্যাঁ, তুমি লুকিয়ে রাখবে। যোলটা মিষ্টি কিন্তু গুনে নেবে, হ্যাঁ।

আরে আরে এ বলছে কী ! যোলটা কোথা রে বাপু ! দিলে তো আটটা, — তাও কত ঝগড়া করে।

মা, মা, দেখো, বাবা মিষ্টিগুলো লুকিয়ে রেখেছে, অ্যাঁ।

চক্রবর্তী-গৃহিণী যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্র্যের শতমুখী আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই। দেহ শীর্ণ, চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, তবুও হৈমবতী যেন সত্যই হৈমবতী। কাঞ্চননিভ দেহবর্ণ দেখিয়া সোনার প্রতিমা বলিতেই ইচ্ছা করে। চোখ দুইটি আয়ত সুন্দর, কিন্তু দৃষ্টি তাহার নিষ্ঠুর মায়াহীন। মায়াহীন অন্তর ও রূপময়ী কায়া লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি, প্রভাতের পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতোই প্রখরতর হইয়া উঠে।

হৈমবতী আসিয়া দাঁড়াইতেই চক্রবর্তী সভয়ে মেয়েকে বলিল, বলছি, তুই নিয়ে যেতে পারবি না; না, মেয়ে চেঁচাতে —

হৈমবতী কঠোর স্বরে বলিল, দাও।

চক্রবর্তী আঁচলের খুঁটটি খুলিয়া হৈমর সম্মুখে ধরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছেলেটা বলিল, বাবাকে আর দিও না মা। আজ যা খেয়েছে বাবা, উঃ। আবার কাল সকালে বাবু নেমন্তন্ন করেছে, বাবাকে মিষ্টি খাওয়াবে।

হৈম কঠিন স্বরে বলিল, বেরো, বেরো, বেরো বলছি আমার সম্মুখ থেকে হতভাগা ছেলে ! বাপের প্রতি ভক্তি দেখো ! তোরা সব মরিস না কেন, আমি যে বাঁচি !

পূর্ণ এবার সাহস করিয়া বলিল, দেখো না, ছেলের তরিবৎ যেন চাষার তরিবৎ।

হৈম বলিল, বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে, সেটুকুও ভাগ্যি—মেনো। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই, রোগে ওষুধ নেই, গায়ে জামা নেই, তবু—মরে না ওরা। রাক্ষসের ঝাড়, অখণ্ড পের্‌মাই !

চক্রবর্তী চুপ করিয়া রহিল। হৈম যেন আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া গেল। চক্রবর্তী ছেলেটাকে বলিল, দেখ দেখি রে, এক টুকরো হত্তুকি ; কি সুপুরি এক কুচি যদি পাস্ ! তোর মার কাছে যেন চাস নি বাবা।

সন্ধ্যার পর চক্রবর্তী হৈমর কাছে বসিয়া ক্রমাগত তাহার তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। হৈম কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। চক্রবর্তী এবং ছেলেরা আজ নিমন্ত্রণ খাইয়াছে। রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা নাই, যে ছাঁদাটা আসিয়াছে তাহাতে হৈম এবং কোলের ছেলেটারও চলিয়া গিয়াছে।

বহু তোষামোদেও হৈম যেন তেমন প্রসন্ন হইল না, অন্তত চক্রবর্তীর তাই মনে হইল, সে মনের কথা বলিতে সাহস পাইল না। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায়। তাহার তৃপ্তি হয় নাই, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্ধমান বহ্নি-শিখার মতো জ্বলিতেছে।

ধীরে ধীরে হৈমবতী ঘুমাইয়া পড়িল। শীর্ণ দুর্বল দেহ, তাহার উপর আবার সে সন্তানসম্ভবা, সন্ধ্যার পরই শরীর যেন তার ভাঙিয়া পড়ে। চক্রবর্তী হৈমর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হাঁ, হৈম ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া হৈমর আঁচল হইতে দড়িতে বাঁধা কয়টা চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই ছেলেরা নাচিতে নাচিতে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল, ছানাবড়া খাব। বড় ছেলেটা ঘুর ঘুর করিয়া বারবার মায়ের কাছে আসিয়া বলিতেছিল, আমাকে কিন্তু একটা গোটা দিতে হবে মা।

হৈম বিরক্ত হইয়া বলিল, সব-সব—সবগুলো বের করে দিচ্ছি, একটা কেন ?

সে চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একটা রূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে শিকাটাতে মিষ্টিগুলি ঝুলানো ছিল, সেটা কিসে কাটিয়া ফেলিয়াছে, মিষ্টান্নগুলি অধিকাংশই কিসে খাইয়া গিয়াছে, মাত্র গোটা তিন-চার মেঝের উপর পড়িয়া আছে, তাও সেগুলি রসহীন শুষ্ক, নিঃশেষে রস শোষণ করিয়া লইয়া ছাড়িয়াছে। ছেঁড়া শিকাটাকে সে একবার তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, কাটা নয়, টানিয়া কিসে ছিঁড়িয়াছে। অতি নিষ্ঠুর কঠিন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, গিন্নির একান্ত ইচ্ছে যে, তুমি এবার তাঁর আঁতুড়দোরে থাকবে।

এখানকার প্রচলিত প্রথায় সূতিকা-গৃহের দুয়ারের সম্মুখে রাত্রে ব্রাহ্মণ রাখিতে হয়। চক্রবর্তীর সন্তানদের মধ্যে সবকটিই জীবিত, চক্রবর্তী-গৃহিণী নিখুঁত প্রসূতি, তাহার সূতিকা-গৃহের দুয়ারে চক্রবর্তী শুইয়া থাকে। তাই শিবরানী এবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, কল্যাণের এমনই সহস্র খুঁটিনাটি লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত। শ্যামাদাসবাবু তাহার কোনও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন না।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ তা আজ্ঞে —

একজন মোসাহেব বলিয়া উঠিল, তা না না —কিছু নেই চক্রবর্তী। দিব্যি এখানে এসে রোজ ভোগ খাবে রাত্রে, ইয়া পুরু বিছানা, তোফা ভরা পেটে, বুঝেছ ?—বলিয়া সে ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকাইয়া ফেলিল।

আহার ও আরামের বর্ণনায় পুলকিত চক্রবর্তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হুঁ, তা হুজুর যখন বলছেন, তখন না পারলে হবে কেন ?

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, ব'স তুমি, আমি জল খেয়ে আসছি। তোমারও জলখাবার আসছে। — বলিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একজন চাকর একখানা আসন পাতিয়া দিয়া মিষ্টান্ন-পরিপূর্ণ একখানা থালা নামাইয়া দিল।

একজন বলিল, খাও চক্রবর্তী।

হুঁ। তা একটু জল, হাতটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

আর একজন পারিষদ বলিল গঙ্গা গঙ্গা বলে ব'সে পড়ো চক্রবর্তী। অপবিত্রো পবিত্রো বা, ওঁ বিষ্ণু স্মরণ করলেই—বাস্ শুদ্ধ, ব'সে পড়ো।

গ্লাসের জলেই একটা কুলকুচা করিয়া খানিকটা হাতে বুলাইয়া লইয়া চক্রবর্তী লোলুপভাবে থালার সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

পাশের ঘরে জলযোগ শেষ করিয়া আসিয়া শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, পেট ভরল চক্রবর্তী ?

চক্রবর্তীর মুখে তখন গোটা একটা ছানাবড়া। একজন বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, কথা বলবার

অবসর নেই চক্রবর্তীর এখন।

সেটা শেষ করিয়া চক্রবর্তী বলিল, আজ্ঞে, পরিপুন্ন, তিল ধরবার জায়গা নেই আর পেটে।

সে উঠিয়া পড়িল।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, তোমার কল্যাণে যদি মনস্কামনা আমার সিদ্ধ হয় চক্রবর্তী, তবে দশ বিঘে জমি আমি তোমাকে দেব। আর আজীবন তুমি সিংহবাহিনীর একটা প্রসাদ পাবে। তাহ'লে তোমার কথা তো পাকা, কেমন ?

সিংহবাহিনীর প্রসাদ কল্পনা করিয়া চক্রবর্তী পুলকিত হইয়া উঠিল। সিংহবাহিনীর ভোগের প্রসাদ—সে যে রাজ-ভোগ।

হুঁ তা পাকা বৈকি। হুজুরের—

কথা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, দেখি, দেখি, ওহে দেখি।

চোখ তাহার যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

খানসামাটা শ্যামাদাসবাবুর উচ্ছিষ্ট জলখাবারের থালাটা লইয়া সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। একটা অভুক্ত ক্ষীরের সন্দেশ ও মালপোয়া থালাটার উপর পড়িয়া ছিল। চক্রবর্তীর লোলুপতা অকস্মাৎ যেন সাপের মতো বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উদ্গার করিল। চক্রবর্তী স্থান কাল সমস্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিল, দেখি দেখি, ওহে দেখি দেখি।

শ্যামাদাসবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, করো কী, এঁটো, ওটা এঁটো। নতুন এনে দিক।

চক্রবর্তী তখন থালাটা টানিয়া লইয়াছে। ক্ষীরের সন্দেশটা মুখে পুরিয়া বলিল, আজ্ঞে রাজার প্রসাদ। আর সে বলিতে পারিল না, আপনার অন্যায়টা পরমুহূর্তে তাহার বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আর উপায় ছিল না, বাকিটাও আর ফেলিয়া রাখা চলে না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেটাও কোনরূপে গলাধঃকরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের ছুতা করিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়িতে তখন মরুতে যেন ঝড় বহিতেছে। হৈম মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ছেলেগুলো কাঁদিতেছে। বড়টা কোথায় পলাইয়াছে।

মেজো মেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিষ্টিগুলো কিসে খেয়ে দিয়েছে, তাই দাদা ঝগড়া ক'রে মাকে মেরে পালাল। মা পড়ে গিয়ে—

কথার শেষাংশ তাহার কান্নায় ঢাকিয়া গেল। চক্রবর্তীর চোখে জল আসিল। জলের ঘটি ও পাখা লইয়া সে হৈমর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে করিতে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চেতনা হইতেই হৈম স্বামীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি ছি। তোমাকে কী বলব আমি—ছিঃ।

চক্রবর্তী হৈমর পা জড়াইয়া ধরিয়া কী বলিতে গেল, কিন্তু হৈম চিৎকার করিয়া উঠিল, মাথা ঠুকে মরব আমি, ছাড়ো, পা ছাড়ো।

সমস্ত দিন হৈম নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার দিকে সে সুস্থ হইয়া উঠিলে চক্রবর্তী সমস্ত কথা বলিয়া কহিল, তোমার বলছ আবার ওই সময়েই। তা হ'লে না হয় কাল ব'লে দেব যে, পারব না আমি।

হৈম চিৎকার করিয়া উঠিল, না না না। মরুক, মরুক হয়ে মরুক আমার, আমি খালাস পাব। জমি পেলে অন্যগুলো তো বাঁচবে।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই। সেদিন সন্ধ্যায় শ্যামাদাসবাবুর লোক আসিয়া চক্রবর্তীকে ডাকিল, চলুন আপনি, গিন্নিমায়ের প্রসব-বেদনা উঠেছে।

চক্রবর্তী বিব্রত হইয়া উঠিল; হৈমরও শরীর আজ কেমন করিতেছে।

হৈম বলিল, যাও তুমি।

কিন্তু—

আমাকে আর জ্বালিও না বাপু, যাও। বাড়িতে বড় খোকা রয়েছে, যাও তুমি।

চক্রবর্তী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। জমিদারবাড়ি তখন লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, এসো চক্রবর্তী এসো। আমি বড় ব্যস্ত এখন। তুমি রান্নাবাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিও।

চক্রবর্তী সটান গিয়া তখনই রান্নাশালে উঠিল।

হুঁ, ঠাকুর, কী রান্না হয়েছে আজ, বাঃ, খোসবুই তো খুব উঠছে। কি হে ওটা, মাছের কালিয়া, না মাংস ?

মাংস। আজ মায়ের পুজো দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে কিনা।

হুঁ, তা তোমার রান্নাও খুব ভাল। তার ওপর তোমার বাদলার দিন। কতদূর, বলি দেরি কত ? দাও না, দেখি একটু চেখে।

সে একখানা শালপাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙা করিয়া একেবারে কড়াই ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা লোভ তোমার কিন্তু চক্রবর্তী।

হুঁ তা বলেছ ঠিক। তা একটু বেশি। তা বটে।

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল, সিদ্ধ হতে দেরি আছে নাকি ?

হাতাতে করিয়া খানিকটা অর্ধসিদ্ধ মাংস তাহার ঠোঙাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, এই দেখো, বললে তো বিশ্বাস করবে না। নাও, হুঁ।

সেই গরম ঝোলই খানিকটা সড়াৎ করিয়া টানিয়া লইয়া চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, বাঃ, ঝোলটা বেড়ে হয়েছে। হুঁ তা তোমার রান্না যাকে বলে, উৎকৃষ্ট।

ঠাকুর আপন মনেই কাজ করিতেছিল, সে কোনও উত্তর দিল না।

চক্রবর্তী অবার বলিল, হুঁ। তা তোমার, এ চাকলার তো কাউকে জুড়ি দেখলাম না। মাংসটা সিদ্ধ এখনও হয়নি। তবে তোমার গিয়ে খাওয়া চলবে।

ঠাকুর বলিল, চক্রবর্তী, তুমি এখন যাও এখান থেকে। খাবার হ'লে খবর দেবে চাকরেরা। আমাকে কাজ করতে দাও। যাও, ওঠো।

চক্রবর্তী উঠিত কি না সন্দেহ। কিন্তু এই সময়ই তাহার বড় ছেলেটা আসিয়া ডাকিল, বাবা।

চক্রবর্তী উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কী রে ?

একবার বাড়ি এসো। ছেলে হয়েছে।

তোর মা—তোর মা কেমন আছে ?

ভালই আছে গো। তবে দাই-টাই কেউ নেই, দাই এসেছে বাবুদের বাড়ি ; নাড়ি কাটতে লোক চাই।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি ছেলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

হৈম ।

ভয় নেই, ভালই আছি। তুমি গুন্দুরদের দাইকে ডাকো দেখি, নাড়ি কেটে দিয়ে যাক। আমাদের দাইকে তো পাওয়া যাবে না।

তাহাই হইল। দাইটা নাড়ি কাটিয়া বলিল, সোন্দর খোকা হয়েছে বাপু, তা—বাপ সোন্দর না হইলে কি ছেলে সোন্দর হয় । মা কেমন—তা দেখতে হবে।

হৈম বলিল, যা যা বকিসনি বাপু, কাজ হ'ল তোর, তুই যা।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, তা হ'লে, তাই তো। খোকা যাক, ব'লে আসুক বাবুকে, অন্য লোক দেখুন

ওঁরা।

হৈম বলিল, দেখো জ্বালিও না আমাকে; যাও বলছি, যাও।

চক্রবর্তী আবার অন্ধকারের মধ্যে বাবুদের বাড়ির দিকে চলিল।

মধ্যরাত্রে জমিদারবাড়ি শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শিবরানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

পূর্ব হইতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত ছিল, সে-ই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নাড়ি কাটিল। গরম জলে শিশুর শরীরের ক্লেদাদি ধুইয়া মুছিয়া দাইয়ের কোলে শিশুটিকে সমর্পণ করিয়া সে যখন বিদায় লইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রভাতে চক্রবর্তী বাড়ি আসিতেই হৈম বলিল, ওগো, ছেলেটার ভোররাত্রে যেন জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে।

চক্রবর্তী চমকিয়া উঠিল, বলিল, হুঁ, তা—

অবশেষে অনুযোগ করিয়া বলিল, বললাম তখন, যাব না আমি। তা তুমি একেবারে আগুন হয়ে উঠ্‌লে । কিসে যে কী হয়—হুঁ।

হৈম বলিল, ও কিছু না, আপনি সেরে যাবে। এখন পয়সা-টাকের সাবু কি দুধ যদি পাও তো দেখো দেখি। আমাকে কাটলেও তো এক ফোটা দুধ বেরুবে না।

পয়সা ছিল না, চক্রবর্তী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবুদের বাড়ির দিকেই চলিল, দুধের জন্য। কাছারি-বাড়িতে ঘটিটি হাতে দাঁড়াইয়া সে বাবুকে খুঁজিতেছিল। বাবু ছিলেন না। লোকজনও সব ব্যস্তসমস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে। কেহ চক্রবর্তীকে লক্ষই করিল না।

খানসামাটা বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিল, সে চক্রবর্তীকে লক্ষ করিয়া বলিল, আজ আর পেসাদ-টেসাদ মিলবে না ঠাকুর, যাও, বাড়ি যাও।

চক্রবর্তী ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। একজন নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য একটা আড়াল দেখিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল, চক্রবর্তী তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ, বাবা, ছেলের জন্য গাই দোয়া হয়নি ?

সে উত্তর দিল, কেন ঠাকুর, ধারস্য খাবে নাকি। আচ্ছা পেটুক ঠাকুর যা হোক। না, গাই দোয়া হয়নি ; বাড়িতে ছেলের অসুখ, ওসব হবে না এখন, যাও।

শিশুর অসুখ বোধ হয় শেষ রাত্রেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোঝা যায় নাই। সারারাত্রিব্যাপী যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শিবরানী এলাইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রিজাগরণক্লিষ্টা দাইটাও ঘুমাইয়াছিল।

প্রভাতে, বেশ একটু বেলা হইলে, শিবরানী উঠিয়া বসিযা ছেলে কোলে লইয়াই আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিল। এ কী, ছেলে যে কেমন করিতেছে। তাহার পূর্বের সন্তানগুলি তো এমনিভাবেই—। চোখের জলে শিবরানীর বুক ভাসিয়া গেল। শিশুর শুভ্রপুষ্পতুল্য দেহবর্ণ যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শিবরানী আর্তস্বরে ডাকিল, যমুনা, একবার ডেকে দে তো।

শ্যামাদাসবাবু আসিতেই সে বলিল, ডাক্তার ডাকাও, ছেলে কেমন হয়ে গেছে । সেই অসুখ।

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দুর্গা দুর্গা !

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। স্থানীয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল এবং তাহার পরামর্শমতো শহরেও লোক পাঠানো হইল বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শিবরানীর আশঙ্কা সত্য ; সত্যই শিশু অসুস্থ। ধীরে ধীরে শিশুর দেহবর্ণ হইতে আকৃতি পর্যন্ত যেন কেমন অস্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। এই সর্বনাশা রোগেই শিবরানীর শিশুগুলি এমনি করিয়াই সূতিকা-গৃহে একে একে বিনষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্নে সদর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া শিশুকে কিছুক্ষণ দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চলুন, আমার দেখা হয়েছে।

দাইটা বলিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু ছেলে —

তাহার প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই ডাক্তার বলিল, ওষুধ দিচ্ছি। শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে ডাক্তার বাহির হইয়া গেল।

শ্যামাদাসবাবুর মাসিমা সূতিকা-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাইকে বলিলেন, কই ছেলে নিয়ে আয় তো দেখি।

ছেলের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আ আমার কপাল রে। — বলিয়া ললাটে করাঘাত করিলেন। ঘরের মধ্যে শিবরানী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

মাসিমা আপন মনেই বলিলেন, আরও বার করে দিতে হয়েছে কী করেই বা বলি । আর পোয়াতির কোলেই বা—

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুকে বলিল, কিছু মনে করবেন না শ্যামাদাসবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

বলুন।

ডাক্তার, শ্যামাদাসবাবুর যৌবনের ইতিহাস প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া বলিল, আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওই হল আপনার সন্তানদের অকাল-মৃত্যুর কারণ।

তা হ'লে ছেলেটা কি—

না, আশা আমি দেখি না ।—বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইল।

শ্যামাদাসবাবু বাড়ির মধ্যে আসিতেই মাসিমা আপনার মনের কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, নইলে কি পোয়াতির কোলে ছেলে মরবে ? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা। আচার-আচরণগুলোও মানতে হবে তো।

আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোনও প্রয়োজন হয় না। এবং হিন্দুর সংসারে আচারের উপরেই নাকি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরানীর কোল শূন্য করিয়া দিয়া শিশুকে সূতিকা-গৃহের বাহিরে বারান্দায় মৃত্যু প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার কাছে রহিল দাই এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নির্মাল্যের রাশি। ঘরের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা শিবরানীর সেবা ও সান্ত্বনার জন্য রহিল যমুনা ঝি।

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি। চক্রবর্তী বসিয়া ঘন ঘন তামাক খাইতেছিল। তাহার ঘরেও শিশুটি অসুস্থ। কিন্তু সে সারিয়া উঠিবে। চক্রবর্তী মধ্যে মধ্যে আপন মনেই বিদ্রুপের হাসি হাসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, বিধিলিপি! তাহার শিশুটা মরিয়া যদি এটি বাঁচিত, তবে চক্রবর্তী অন্তত বাঁচিত। দশ বিঘা জমি আর সিংহবাহিনীর প্রসাদ নিত্য এক থালা। ভাগ্যের চিকিৎসা কি আর ডাক্তারে করিতে পারে !

শিশুটি মধ্যে মধ্যে ক্ষীণকণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। চক্রবর্তী দাইটাকে বলিল, একটু জল-টল মুখে দেরে বাপু।

নিদ্রাকাতর দাইটা বলিল, জল কে খাবে গো ঠাকুর ? তা বলছ, দিই। সে উঠিয়া ফোঁটা দুই জল দিয়া শিশুর অধর ভিজাইয়া দিল। তারপর শুইতে শুইতে বলিল, ঘুমোও ঠাকুর, তোমার কি আর ঘুম-টুম নেই ?

চক্রবর্তীর চক্ষে সত্যই ঘুম নাই। সে বসিয়া আকাশজোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশও এমনি অন্ধকার। আঃ, ছেলেটা যদি মহামন্ত্রে বাঁচিয়া ওঠে। চক্রবর্তী পৈতা ধরিয়া শিশুর ললাটখানি স্পর্শ করিল।

অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপে।

না, না, সে হয় না। জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। সে আবার তামাক খাইতে বসিল।

দাইটা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। ঘরের মধ্যেও শিবরানীর মৃদু ক্রন্দন ধ্বনি আর শোনা যায় না। কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল, জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন তাহার আগুন জ্বলিতেছে।

উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মূর্তি, তাহার শিশুও কুৎসিৎ নয়, দরিদ্রের সন্তান হইলেও জননীর কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার সন্তানের হইবে। উঃ !

পাপ যেন সম্মুখে অদৃশ্য কায়া লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চক্রবর্তীর চোখের সম্মুখে ঝলমল করিতেছে। চক্রবর্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুব নিকট আসিয়া কিন্তু তাহার ভয় হইল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। পরমুহূর্তে সে মৃতপ্রায় শিশুকে বস্ত্রাবৃত কবিয়া লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল।

অদ্ভুত সে যেন চলিয়াছে অদৃশ্য বায়ুপ্রবাহের মতো। নিঃশব্দ, দ্রুত গতিতে। অন্ধকার পথেও আজ সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ, কেহ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করে না। তাহারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভাঙা ঘর। চারিদিকে প্রাচীরও সর্বত্র নাই। হৈমর সূতিকা-গৃহের দরজাও নাই, একটা আগড় দিয়া কোনরূপে আগলানো আছে। হৈমও গাঢ় নিদ্রায আচ্ছন্ন।

চক্রবর্তী আবার বাতাসেব মতো লঘু ক্ষিপ্রগতিতে ফিরিল।

দাইটা তখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

* * *

রোগগ্রস্ত শিশু, মৃত্যুরোগগ্রস্ত নয। সে থাকিতে থাকিতে অপেক্ষাকৃত সবল ক্রন্দনে আপনাব অভিযোগ জানাইল। দাইটার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না। চক্রবর্তী ঘুমেব ভান করিয়া কাঠ মারিয়া পড়িয়া বহিল।

শিশু আবার কাঁদিল।

ঘরের মধ্যে শিবরানীর অস্ফুট ক্রন্দন এবার যেন শোনা গেল।

শিশু আবার কাঁদিল।

এবার যমুনা ঈষৎ দরজা খুলিয়া বলিল—দাই, ও দাই ! ওমা, নাক ডাক্‌ছে যে । ঠাকুরও দেখছি মড়ার মতো ঘুমিয়েছে। ও দাই !

দাইটা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

যমুনা বলিল, "এই বুঝি তোর ছেলে আগলানো? ছেলে যে কাতরাচ্ছে, মুখে একটু ক'রে জল দে।"

দাইটা তাড়াতাড়ি শিশুর মুখে জল দিল, শুষ্ককণ্ঠ শিশু ঠোঁট চাটিয়া জলটুকু পান করিয়া আবার যেন চাহিল। দাই আবার দিল। এবার সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ওগো, জল খাচ্ছে গো, ঠোঁট চেটে চেটে !"

শিবরানী দুর্বল দেহে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে আয়, ঘরে নিয়ে আয় আমার ছেলে। কারুর কথা আমি শুনব না।"

প্রভাতে আবার লোক ছুটিল সদরে । এবার অন্য ডাক্তার আসবে। মৃত্যু-দ্বার হইতে শিশু ফিরিয়াছে। দেবতার দান, ব্রাহ্মণের প্রসাদ। চক্রবর্তী নাকি আপন শিশুর পরমায়ু রাজার শিশুকে

দিয়াছে। হতভাগ্যের সন্তানটি মারা গিয়াছে। প্রায়ান্ধকার সূতিকা-গৃহে শিবরানী জ্বর-কাতর শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাগ্যদেবতা তাহার হারানো মাণিক।

*   *   *

দশ বিঘা জমি চক্রবর্তী পাইল। সিংহবাহিনীর প্রসাদও এক থালা করিয়া নিত্য সে পায়। হৈম অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্তী সেই তেমনই করিয়া বেড়ায়।

লোকে বলে স্বভাব যায় না ম'লে। চক্রবর্তী বলে হুঁ, তা বটে। কিন্তু ছেলের দল দেখেছ, এক একটা ছেলে যে একটা হাতির সমান।

হৈম ছেলেগুলিকে স্কুলে দিয়াছে। বড় ছেলেটি এখন ইতরের মতো কথা বলে না, কিন্তু বড় বড় কথা বলে, বাবার ব্যবহারে স্কুলে আমার মুখ দেখানো ভার মা। ছেলেরা যা তা বলে। কেউ বলে ভাঁড়ের বেটা খুরি। কেউ কেউ আবার দেখলেই সড়াৎ ক'রে মুখে ঝোল টানে। তুমি বাপু বারণ করে দিও বাবাকে।

হৈম সে কথা বলিতেই চক্রবর্তী সহসা যেন আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অস্বাভাবিক রূপ দেখিয়া হৈমও চমকিয়া উঠিল।

চক্রবর্তী বলিল, চলে যাব আমি সন্নেসী হয়ে।

ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু বাহির হইতে কে ডাকিল, চক্রবর্তী।

কে ?

বাঁড়ুজ্জেরা পাঠালে হে। ওদের মেয়ের বাড়ি তত্ত্ব যাবে। তোমাকে যেতে হবে; ওরা কেউ যেতে পারবে না। লাভ আছে হে, ভাল মন্দ খাবে, বিদেয়টাও পাবে।

আচ্ছা চলো যাই।

চক্রবর্তী বাহির হইয়া পড়িল। বাঁড়ুজ্জের বাড়ি গিয়া যেখানে মিষ্টি তৈয়ারি হইতেছিল, সেখানে চাপিয়া বসিয়া বলিল, ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। হুঁ, তা যেতে হবে বৈকি। উননের আঁচটা একটু ঠেলে দিই, কি বলো মোদক মশাই ?

সে সতৃষ্ণ নয়নে কড়াইয়ের পাকের দিকে চাহিয়া রহিল।

*   *   *

বৎসর দশেক পরে শিবরানী হঠাৎ মারা গেল। লোকে বলিল—ভাগ্যবতী, স্বামী-পুত্তুর রেখে ডঙ্কা মেরে গেল।

শ্যামাদাসবাবু শ্রদ্ধোপলক্ষে বিপুল আয়োজন করিলেন। চক্রবর্তীর এখন ওইখানেই বাসা হইয়াছে। সকাল বেলাতেই টুক টুক করিয়া গিয়া হাজির হয়, বসিয়া বসিয়া আয়োজনের বিলিবন্দোবস্ত দেখে, মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে।

সেদিন বলিল হুঁ, ছাঁদা একটা করে তো দেওয়া হবে। তা তোমার লুচিই বা ক'খানা, আর তোমার মিষ্টিই বা কী রকম হবে ?

একজন উত্তর দিল—হবে, হবে, একখানা করে লুচি এই চালুনের মতো। আর মিষ্টি একটা করে, তোমার লেডিকেনি, এই পাশ বালিশের মতো, বুঝলে ?

সকলে মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল। শ্যামাদাসবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, একটু থামো তো, সব। হ্যাঁ, কী হল, পাওয়া গেল না ?

একজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি কথা কহিতেছিলেন। কর্মচারীটি বলিল, আজ্ঞে, তাদের বংশই নির্বংশ হয়ে গিয়েছে।

তাহলে অন্য জায়গায় লোক পাঠাও। অগ্রদানী না হলে তো শ্রাদ্ধ হয় না।

আচ্ছা তাই দেখি। অগ্রদানী তো বড় বেশি নেই, দশ বিশ ক্রোশ অন্তর এক ঘর আধ ঘর।

কে একজন বলিয়া উঠিল, তা আমাদের চক্রবর্তী রয়েছে। চক্রবর্তী নাও না কেন দান, ক্ষতি কী ? পতিত করবে আর কে কী করবে তোমার ?

শ্যামাদাসবাবুও ঈষৎ উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিলেন, মন্দ কী চক্রবর্তী ! শুধু দান সামগ্রী নয়, ভূসম্পত্তিও কিছু পাবে, পঁচিশ বিঘে জমি দেব আমি, আর তুমি যদি রাজি হও, তবে বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারি সম্পত্তির মুনাফা দেব আমি, দেখো। বলিয়াই তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া চাকরকে ডাকিলেন, ওরে, চক্রবর্তীকে জলখাবার এনে দে। কলকাতার কী মিষ্টি আছে নিয়ে আয়।

শ্রাদ্ধের দিন সকলে দেখিল, শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিবরানীর শ্রাদ্ধ করিতেছে, আর তাহার সম্মুখে অগ্রদান গ্রহণ করিবার জন্য দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে পূর্ণ চক্রবর্তী।

তারপর গোশালায় বসিয়া তাহারই হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চক্রবর্তী গোগ্রাসে পিণ্ড ভোজন করিল।

গল্পের এইখানেই শেষ। কিন্তু চক্রবর্তীর কাহিনী এখানে শেষ নয়। সেইটুকু না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

লোভী, আহার-লোলুপ চক্রবর্তী আপন সন্তানের হাতে পিণ্ড ভোজন করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই। লুব্ধ দৃষ্টি, লোলুপ রসনা লইয়া সে তেমনই করিয়াই ফিরিতেছিল। এই শ্রাদ্ধের চৌদ্দ বৎসর পর সে একদিন শ্যামাদাসবাবুর পায়ে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল। শ্যামাদাসবাবু তাঁহার দুই বৎসরের পৌত্রকে কোলে করিয়া শুষ্ক অশ্বত্থ তরুর মতো দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চক্রবর্তী তাঁহার দুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পারব না বাবু, আমি পারব না।

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না পারলে উপায় কী, চক্রবর্তী ? আমি বাপ হয়ে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে,— তার বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে পারবে আর তুমি পারবে না বললে চলবে কেন, বলো, দশ বিশ বিঘে জমি তুমি এতেও পাবে।

শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিশুপুত্র ও পত্নী রাখিয়া মারা গিয়াছে। তাহারই শ্রাদ্ধ হইবে।

চক্রবর্তী নিরুপায় হইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল।

পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী।

শ্রেষ্ঠ গল্প

আ ঙ টি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হীরার আঙটির হীরাটা যখন আলগা হইয়া যায়, তখন আর তাহা আঙুলে পরিয়া বেড়ানো নিরাপদ নয়। হীরা অলক্ষিতে পড়িয়া হারাইয়া যাইতে পারে। বিষয়ী, সাবধান !

ক্ষেত্রমোহনের আঙটির হীরা অনেকদিন আগেই হারাইয়া গিয়াছিল। শোকটা সে সহজেই

কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল এবং ঝুটা পাথর দিয়া কাজ চালাইতেছিল। অপরিচিত কেহ হয়তো হঠাৎ দেখিয়া ভুল করিতে পারিত, কিন্তু অন্তরঙ্গদেব মনে কোনও মোহ ছিল না।

ক্ষেত্রমোহন যে একজন ভদ্রবেশী মিষ্টভাষী জুয়াচোর তাহা তাহার স্ত্রী চপলা জানিত। চপলার বয়স বাইশ বছর। রূপ ও যৌবন দুই আছে— সন্তানাদি হয় নাই। তাহার রূপ-যৌবনের মধ্যে একটা তীব্র তেজস্বিতা ছিল—চোখ-ধাঁধানো উগ্র প্রগল্‌ভতা। বাইশ বছর বয়সে বাঙালি মেয়ের যৌবন সাধারণত থাকে না—যাহা থাকে তাহা পশ্চিম দিগন্তের অস্তরাগ। চপলার মধ্যে কিন্তু কোনও অভাবনীয় কারণে যৌবন টিঁকিয়া গিয়াছিল। তাহার মনেব উপর যে নিগ্রহ হইয়াছিল, তাহারই ফলে হয়তো এমনটা ঘটিয়াছিল। মনের সহজাত বৃত্তি ও সংস্কারগুলি যখন নিপীড়িত হইয়া অন্তর্মুখী হয়, তখন তাহারা কোন্ পথে কী রূপ ধরিয়া দেখা দিবে বলা দেবতারও অসাধ্য। ফ্রয়েড সাহেব এই অতল সমুদ্রে চাটগেঁয়ে খালাসীর মতো 'পূরণ' ফেলিতেছেন বটে— কিন্তু বাম্ মিলে না।

ক্ষেত্রমোহন লোকটা নিরম্বু বদমায়েস। মোসাহেবি করা ছিল তাহার পেশা। বড়লোকের সদ্যবয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের অপ্সরালোকের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু সে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত। বেহুঁশ মাতালের পকেট হইতে মনি-ব্যাগ চুরি করিতে তাহার বাধিত না। কিন্তু সে নিজে মদ খাইত না। এবং অন্য মকার সম্বন্ধেও তাহার একটা স্বাভাবিক নিস্পৃহতা ছিল। অপ্সরালোকের দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

শঙ্করাচার্য সত্যই বলিয়াছেন—এ সংসার অতীব বিচিত্র।

চপলা যখন প্রথম স্বামীর চরিত্র জানিতে পারে, তখন ভীত বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর কিছুদিন কান্নাকাটির পালা চলিল। ক্ষেত্রমোহন সস্নেহে যত্ন করিয়া চপলাকে নিজের চার্বাকনীতি বুঝাইয়া দিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে চপলা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে আর মোহ ছিল না।

ট্রাম-ঘর্ঘরিত সদর রাস্তার উপর একটি সরু বাড়ির দোতলায় গোটা দুই ঘর লইয়া ক্ষেত্রের বাসা। শয়নঘরের একটা জানালা সদর রাস্তার উপরই। সেখানে দাঁড়াইলে পথের দৃশ্য দেখিবার কোনও অসুবিধা নাই।

সেদিন বৈকালে চপলা সেই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিল, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল। উৎফুল্ল ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিল।

ক্ষেত্রের বয়স ত্রিশ—সুশ্রী চটপটে বাক্‌পটু। সে হাসিতে হাসিতে চপলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। আজ রাত্তিরেই—বুঝলে ? গুদাম সাবাড়—মাল তস্রুপাত।'

চপলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল—জ্বলজ্বলে চোখ-ঝলসানো হাসি। তাহার দাঁতগুলি যেন একরাশ হীরা, আলোয় ঝকমক করিয়া উঠিল। ক্ষেত্রের এ হাসি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তবু সে লোভ সামলাইতে পারিল না, একটা চুম্বন করিয়া ফেলিল।

বুকে হাত দিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া চপলা বলিল, 'কী হ'ল ?'

চপলার কাছে ক্ষেত্রের কোনও কথাই গোপন ছিল না। বরং কেমন করিয়া কাহার নিকট হইতে টাকা ঠকাইয়া লইল, কাহাকে মাতাল করিয়া পকেট-বুক হইতে নোট চুরি করিল—এসব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চপলার কাছে গল্প করিতে ভালবাসিত, বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। এখন সে জানালার গরাদ ধরিয়া সোৎসাহে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তোমাকে অ্যাদ্দিন বলিনি। এক নূতন কাপ্তেন পাকড়েছি ; বেশ শাঁসালো জমিদারের ছেলে—কলকাতায় ফুর্তি করতে এসেছে। নরেন চৌধুরী নাম। ফড়েপুকুরে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে একলা আছে। তাকে মাসখানেক ধ'রে খেলাচ্ছি।

'ছোঁড়ার বয়স বেশি নয়—তেইশ-চব্বিশ। কিন্তু হ'লে কী হবে, এরই মধ্যে অনেক বুড়ো ওস্তাদের কান কেটে নিতে পারে। একেবারে একটি হর্তেল ঘুঘু। এই দেখো না, এক মাস ধ'রে তেল দিচ্ছি এখনও একটি সিকি পয়সা বার করতে পারিনি। শালা মদ কিনবে তাও আমার হাতে টাকা দেবে না ; নিজে গিয়ে বোতল কিনে আনবে, নয়তো দরোয়ান ব্যাটাকে পাঠাবে। তার থেকে দু পয়সা বাঁচাব, সে গুড়ে বালি। পাঁড় মাতাল, কিন্তু মদের গেলাস ছোঁবার আগে কী করে জানো ? টাকাকড়ি, মায় হাতের আঙটি পর্যন্ত দেরাজে বন্ধ ক'রে চাবিটি ঐ শালা দরোয়ানের হাতে দিয়ে বলে, যাও মৌজ করো। এই ব'লে তাকে একেবারে বাড়ির বার ক'রে দেয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসতে থাকে—চণ্ডাল ব্যাটাচ্ছেলে।'

চপলা মন দিয়া শুনিতেছিল, এই আকস্মিক উত্তাপে সকৌতুকে হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, 'তবে যে বললে সব ঠিক করে ফেলেছি ?'

ক্ষেত্র মুখের একটা বিরক্তি-সূচক ভঙ্গি করিয়া বলিল, 'দেখলুম, ও-শালা পগেয়া বদমায়েসকে সহজে ঘায়েল করা যাবে না, একেবারে ঘাড় মটকাতে হবে। আমারও রোখ চ'ড়ে গেছে—আজ রাত্রে ঠিক করেছি ব্যাটার দেরাজ ফাঁক করব। এই দেখো, চাবি তৈরি করিয়েছি।' বলিয়া পকেট হইতে কয়েকটা চকচকে চাবি বাহির করিয়া দেখাইল।

'চুরি করবে ?'

'হ্যাঁ। ঢের খোশামোদ করেছি, আর নয় ; এবার একহাত ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দেব। টাকাকড়ি ব্যাটা দেরাজে বেশি রাখে না—কোথায় রাখে ভগবান জানেন ; কিন্তু একটা হীরের আঙটি আছে, রাত্রে বেরুবার সময় সেটা দেরাজে বন্ধ ক'রে রেখে যায়। সেইটের ওপর টাঁক করেছি। উঃ ! কী হীরেটা মাইরি, চপলা, যদি দেখো চোখ ঝলসে যাবে। দাম হাজার টাকার এক কানাকড়ি কম নয়। যদি পাঁচ শো টাকাতেও ছাড়ি, কেষ্ট স্যাকরা লুফে নেবে।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়ো ?'

'সে ভয় নেই। বন্দোবস্ত সব পাকা ক'রে রেখেছি। আজ এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ব্যাটা বেরুবে, সমস্ত রাত বাড়ি ফিরবে না।' বিমনাভাবে ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'কোথায় যাবে কিছুতেই বললে না ; হয়তো নটরাজ থিয়েটারের সৌদামিনীর কাছে—কিন্তু সৌদামিনী তো মেনা মিত্তিরের ; যাক গে, যে চুলোয় খুশি যাক। আসল কথা, এগারোটার পর ব্যাটা বাড়ি থাকবে না। দরোয়ানটা বেরুবে—তার ব্যবস্থা করেছি। বাস্, গলির মোড়ে ওৎ পেতে থাকব, কর্তারাও বাড়ি থেকে বেরুবেন আর আমিও সুট ক'রে গিয়ে ঢুকব। তারপরই গুদাম সাবাড়—মাল তস্রুপাত। শালা লুট লিয়া—শালা লুট লিয়া—' রাস্তার দিকে তাকাইয়া ক্ষেত্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই বিড়ালের মতো লাফ দিয়া জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'স'রে এসো—স'রে এসো, ও-পাশের ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছে।'

চপলা সরিল না, বলিল, 'কে ?'

'নরেন চৌধুরী—স'রে এসো।'

'কী দরকার ? আমাকে তো আর চেনে না।'

'তা বটে !' তারপর ঘরের ভিতরের অন্ধকার হইতে উঁকি মারিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'ঐ দেখতে পাচ্ছ, ফরসা মতন চেহারা, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, হাতে হরিণের শিঙের ছড়ি ? উনিই নরেন চৌধুরী। হাতের আঙটিটা দেখতে পাচ্ছ ?'

'পাচ্ছি।' চপলা বাহিরের দিকে তাকাইয়া হাসিল ; পড়ন্ত দিনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, মনে হইল, যেন একরাশ হীরা ঝরিয়া পড়িল—'হীরেটার দাম কত বললে ?'

'হাজার টাকা।' ক্ষেত্র বিছানার উপর গিয়া বসিল—'বেশিও হতে পারে। এবার তোমার ঝুমকো

গড়িয়ে দেবই, বুঝেছ ? ঐ কেষ্ট স্যাকরাকে দিয়েই গড়িয়ে দেব—সস্তায় হবে। অনেকদিন থেকে তোমায় ব'লে রেখেছি—'

রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই চপলা বলিল, 'হুঁ।'

ক্ষেত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'চ'লে গেছে, না, এখনও আছে ?'

চপলার ঠোঁটের উপর একটা ক্ষণিক হাসি খেলিয়া গেল, ক্ষেত্র তাহা দেখিতে পাইল না। চপলা বলিল, 'মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে।'

'ফিরে আসছে ?' ক্ষেত্রর কপালে উৎকণ্ঠার ভ্রূকুটি দেখা গেল। 'তাই তো, আমার বাসার সন্ধান পেয়েছে নাকি ? ব্যাটা যে রকম কুচুটে শয়তান! তুমি স'রে এসো। কে জানে—'

চপলা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া রহিল, খানিক পরে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'চ'লে গেছে।'

'যাক, তা হ'লে বোধ হয় এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।' বলিয়া ক্ষেত্র একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

চপলা যেন অন্যমনস্কভাবে ক্ষেত্রের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, টাকার জন্যে মানুষ সব করতে পারে, না ?'

ক্ষেত্র একগাল হাসিল—'পারে না ! টাকার জন্যে পারে না এমন একটা মানুষ দেখাও তো দেখি। খুন জখম জাল ফেরেববাজি—দুনিয়াটা চলছে তো ঐ টাকার পেছনে। আর তাতে দোষই বা কী ? টাকা না হ'লে কারুর একদণ্ড চলে ? আমি যে ব্যাটার ঘাড় ভাঙতে যাচ্ছি, তার মধ্যে আমার অন্য স্বার্থও আছে। ব্যাটা আমাকে বড় হয়রান করেছে। যেমন ক'রে হোক ওর ঐ আঙটি গাপ করবই।'

আলস্যভরে দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া চপলা গা ভাঙ্গিল। তারপর বলিল, 'যাই, চুল বাঁধি গে।'

* * *

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ক্ষেত্র গলির মোড়ে আড্ডা গাড়িল। ঠিক সম্মুখে ফড়েপুকুরের রাস্তা পূর্ব-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, গলির মুখ যেখানে গিয়া তাহার সহিত মিশিয়াছে সেখানে একটা কাঠের আড়ৎ আছে—সেই আড়তের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে সহজেই পথচারীর দৃষ্টি এড়ানো যায়। রাস্তায় গ্যাস কাছাকাছি নাই।

এখান হইতে নরেন চৌধুরীর বাসার সদর বেশ দেখা যায়—বড় জোর বিশ গজ। রাস্তার উপরেই দরজা। দরজা খুলিলে ভিতরে একটা ছোট গলি, গলির দুই ধারে দুইটি ঘর, রাস্তার উপরেই। বাহিরের দিকে জানালা আছে।

ক্ষেত্র দেখিল, পাশের একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। এইটাই আসল ঘর। ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে, সেই টেবিলের ডান দিকের দেরাজে—

ক্ষেত্র পকেটে হাত দিয়া দেখিল, চাবি ঠিক আছে। সে মনে মনে হিসাব করিল, কাজ শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগিবে না। তাহার হাত নিশপিশ করিতে লাগিল, একটা স্নায়বিক অধীরতা তাহার শরীরকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। লোকটা কতক্ষণে বাড়ির বাহির হইবে?

ক্ষেত্র বিড়ি ও দেশলাই বাহির করিল। বিড়িতে ফুঁ দিয়া ঠোঁটে ধরিয়া দেশলাই জ্বালিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। না, কাজ নাই। গলিতে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গলির দুই ধারে বাড়ি। কে জানে, যদি কেহ দেশলাইয়ের আলো দেখিতে পায় ! ধূমপানের সরঞ্জাম ক্ষেত্র আবার পকেটে রাখিয়া দিল।

হাতে ঘড়ি ছিল, চোখের খুব কাছে আনিয়া দেখিল, এগারোটা বাজিতে পাঁচ মিনিট। সময় হইয়া

আসিতেছে।

এমন সময় নরেন চৌধুরীর ঘরে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়া গেল। ক্ষেত্র নিশ্বাস বন্ধ করিয়া একদৃষ্টে সদর-দরজা পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এইবার !

সদর-দরজা খুলিয়া নরেন চৌধুরী বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্র কাঠগোলার দেয়ালে একেবারে বিজ্ঞাপনের পোস্টারের মত সাঁটিয়া গেল। নরেন ফুটপাতে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল। ক্ষেত্র সহস্রচক্ষু হইয়া দেখিল, তাহার হাতে আঙটি আছে কি না ! না, নাই। আবার সে ধীরে ধীরে চাপা নিশ্বাস ফেলিল। নরেন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

এইবার ক্ষেত্র অন্ধকারে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। নরেনের পরিপাটি সাজসজ্জা সে এক নজরে দেখিয়া লইয়াছিল। এই সব নিশাচর প্রজাপতিদের প্রতি তাহার মনে একটা অবজ্ঞাপূর্ণ ঘৃণার ভাব ছিল। সে মনে মনে বলিল, 'অভিসারে বেরুলেন !' কোনও একজন স্ত্রীলোক ইহাকে দোহন করিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া শেষে ছোবড়ার মত দূরে ফেলিয়া দিবে, ইহা ভাবিয়া সে মনে বড় তৃপ্তি পাইল। করুক, করুক, সোনার চাঁদকে একেবারে ন্যাঙটা করিয়া ছাড়িয়া দিক।

কিন্তু এদিকে দরোয়ানটা এখনও বাহির হইতেছে না কেন ? খোট্টাটার আবার কী হইল ? ভাঙ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই তো ?

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্র ঘড়ি দেখিল, সওয়া এগারোটা। তাই তো ! কী হইল ? দরোয়ান আগে বাহির হইয়া যায় নাই তো ? না, তাহা হইলে নরেন দরজায় তালা লাগাইয়া যাইত। তবে—দরোয়ানটা কি সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল ? তাহাকে সরাইবার জন্য ক্ষেত্র এত মেহনত করিয়াছে—সারকুলার রোডে ময়দা-কলের বস্তিতে তাড়ির আড্ডার সন্ধান বলিয়া দিয়াছে, আর শেষে—

এই সময় খোট্টা দরোয়ান বাহির হইল। দরজায় তালা লাগাইয়া পাগড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে নাগরা ঠকঠক করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার সময় উপস্থিত। দরোয়ানের নাগরার শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর, ক্ষেত্র কাঠগোলার ছায়ান্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। পথ নির্জন—বাধা বিপত্তির কোনও ভয় নাই। কিন্তু দুই পা অগ্রসর হইয়া ক্ষেত্র আবার ফিরিয়া আসিল। কাজ নাই, আর একটু যাক। যদি দরোয়ানটা কিছু ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়া থাকে, হয়তো আবার ফিরিয়া আসিবে।

দশ মিনিট কাটিয়া গেল, দরোয়ান ফিরিল না। তখন ক্ষেত্র অন্ধকার হইতে বাহির হইল। বেশ স্বাভাবিক দ্রুতপদে, যেন নিজের বাড়িতে যাইতেছে এমনভাবে, দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া, বেশ শব্দ করিয়া দরজা খুলিল। তারপর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

ক্ষেত্রের পকেটে একটা ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল, সেটা এবার সে জ্বালিল—একবার চারিদিকে ফিরাইয়া দেখিয়া লইল। তারপর বাঁ দিকের দরজার উপর ফেলিল।

দরজায় তালা লাগানো। ক্ষেত্র একটা চাবি বাছিয়া লইয়া তালায় পরাইল, খুট করিয়া শব্দ হইল। তালা খুলিয়া গেল।

টর্চের আলো নিবাইয়া ক্ষেত্র ঘরে ঢুকিল। ঘরে কোথায় কী আছে সবই তাহার জানা ছিল ; সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া গিয়া রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ঘরের দিকে ফিরিয়া টর্চ জ্বালিল।

টর্চের আলো একটা টেবিলের উপর গিয়া পড়িল। টেবিলের উপর বিশেষ কিছু নাই—কাগজ-চাপা, ব্লটিং প্যাড, দোয়াত, কলম। টেবিলের আশেপাশে দুই-তিনটা চেয়ার অস্পষ্টভাবে দেখা গেল।

ক্ষেত্র আর কালক্ষয় না করিয়া কাজে লাগিয়া গেল। টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া সে

দেরাজ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। ডান ধারের দেরাজগুলো খোলা, কিন্তু বাঁ ধারের দেরাজের সম্মুখে একটা কবাট আছে—তাহার গায়ে চাবির ঘর। ক্ষেত্র সেই কবাটের গায়ে চাবি প্রবেশ করাইয়া সন্তর্পণে ঘুরাইল। কবাট খুলিয়া গেল।

চারটি দেরাজ। নরেন উপরের দেরাজে আঙটি রাখে—ক্ষেত্র দেরাজের ভিতর আলো না ফেলিয়াই তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিল। কাগজপত্র ও পানের ডিবা তাহার হাতে ঠেকিল, কিন্তু আঙটির পরিচিত ক্ষুদ্র কেসটি হাতে ঠেকিল না। তখন সে দেরাজের ভিতর আলো ফেলিয়া দেখিল, আঙটি নাই।

আঙটি নাই ? কোথায় গেল ? প্রথমটা ক্ষেত্র কিছু বুঝিতেই পারিল না। সে এতই স্থিরনিশ্চয় ছিল যে, এই অভাবনীয় ব্যাপারে যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর তাহার বুকের ভিতরটা দুরদুর করিয়া উঠিল।

তবে কি— ?

সে একবার ঘরের চারিপাশে চাহিল, টর্চটা ঘরের কোণে কোণে ফেলিয়া দেখিল, না, কেহ নাই। সে ভয় করিয়াছিল, নরেন তাহাকে ধরিবার ফাঁদ পাতিয়াছে—তাহা নয়।

হয়তো আঙটিটা দ্বিতীয় দেরাজে আছে। মেঝেয় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ক্ষেত্র দ্বিতীয় দেরাজ খুলিল। একেবারে শূন্য—তাহাতে একটা আল্‌পিন পর্যন্ত নাই।

তৃতীয় দেরাজ। সেটাও শূন্য। চতুর্থ দেরাজও তাই। ক্ষেত্রের কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল। নাই—কিছু নাই। আঙটি তো দূরের কথা, একটা পয়সা পর্যন্ত নাই।

আলো নিবাইয়া অন্ধকার ঘরে ক্ষেত্র কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তাহার বুক ধকধক করিতে লাগিল। নরেন নিশ্চয় সন্দেহ করিয়াছিল, তাই তাহাকে ঠকাইবার জন্য—

কিন্তু, না, নিশ্চয় আছে। হয়তো তাড়াতাড়িতে নরেন ডান দিকের খোলা দেরাজেই আঙটি রাখিয়া গিয়াছে। ক্ষেত্র আবার আলো জ্বালিয়া ডান দিকের দেরাজগুলো খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোনটাতেই কিছু পাইল না। কতকগুলো মদের বিজ্ঞাপন, স্ত্রীলোকের ছবি, গোটাকয়েক অশ্লীল বিলাতি উপন্যাস—

এতক্ষণে ভূতের মতো একটা ভয় ক্ষেত্রকে চাপিয়া ধরিল, তাহার মনে হইল, এই শূন্য বাড়িখানা তাহার চুরির ব্যর্থ প্রয়াস দেখিয়া নিঃশব্দে অট্টহাস্য করিতেছে। এই ঘরটা ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আর পলাইতে পারিবে না।

এই সময় দূরের কোনও গির্জায় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। ঘড়ির আওয়াজ ক্ষেত্রের কানে বোমার আওয়াজের মতো লাগিল। বারোটা ! এতক্ষণ সে এখানে আছে ? যদি কেহ আসিয়া পড়ে ? নরেনই যদি ফিরিয়া আসে ?

ক্ষেত্র আর দাঁড়াইল না। দেরাজগুলা খোলাই পড়িয়া রহিল, সে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তারপর বাড়ির বাহির হইয়া আসিল। বাড়ির বাহির হইয়া ভয়ার্ত চোখে একবার চারিদিকে তাকাইল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না, পাড়া সুষুপ্ত। তখন স্খলিত হস্তে সদরের তালা বন্ধ করিয়া হনহন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার বাসা যে দিকে, সে ঠিক তাহার উল্টা মুখে চলিয়াছে তাহা সে জানিতে পারিল না।

* * *

একটার সময় ক্ষেত্র নিজের বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণে তাহার মাথা বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে, ভয় আর নাই। এমন কী, অহেতুক ভয়ে দেরাজগুলো খোলা রাখিয়া পলাইয়া আসার জন্য সে একটু লজ্জা বোধ করিতেছে। কিন্তু বিস্ময় তাহার কিছুতেই ঘুচিতেছে না। নরেন কি তাহাকে

সন্দেহ করিয়াছিল ? তাহাই বা কী করিয়া সম্ভব—নরেন আঙটি পরিয়া বাহির হয় নাই ইহা সে স্বচক্ষে ভাল করিয়া দেখিয়াছে। তবে আঙটিটা গেল কোথায় ?

ক্ষেত্র নিজের সিঁড়ির দরজার কড়া নাড়িল। তাহার উপরে উঠিবার সিঁড়ি স্বতন্ত্র, তলার বাসিন্দার সহিত কোনও সংযোগ নাই। তাই প্রতিবেশীকে না জাগাইয়া রাত্রে যখন ইচ্ছা সে বাড়ি ফিরিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে চপলা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ক্ষেত্র কোনও কথা না বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। চপলা সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়নঘরে আসিল, তারপর বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ক্ষেত্র জামা খুলিতে খুলিতে ভাবিতেছিল, চপলা জিজ্ঞাসা করিলে কী উত্তর দিবে ! কিন্তু চপলা যখন কোনও প্রশ্ন করিল না, তখন সমস্ত কথা বলিবার জন্য তাহার নিজেরই মন উশখুশ করিতে লাগিল। মুখে চোখে জল দিয়া আলোটা কমাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, 'আজ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল। ঘুমুলে নাকি?' ব্যর্থতার কুণ্ঠায় তাহার স্বর নিস্তেজ।

চপলা উত্তর দিল না, কেবল গলায় একটা শব্দ করিল মাত্র। ক্ষেত্র বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, চপলা চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, তাহার ডান হাতটা চোখের উপর রাখা। অল্প আলোয় চপলার মুখ ভাল দেখা গেল না।

'আঙটিটা পেলুম না, বুঝলে ?'

চপলার নিকট হইতে কোনও সাড়া আসিল না। সে ঘুমাইয়াছে কি না দেখিবার জন্য ক্ষেত্র তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল—'জেগে আছ, না ঘুমুলে ?'

চপলার মুখের উপর হাতটা একটু নড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আঙুলের উপর আলো ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

ক্ষেত্র সূচীবিদ্ধের মতো বিছানায় উঠিয়া বসিল। চপলার হাতখানা টানিয়া নিজের চোখের সম্মুখে আনিয়া বিকৃত চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, 'আঙটি ! এ আঙটি তুমি কোথায় পেলে ?—তুমি কোথায় পেলে—'

শ্রেষ্ঠ গল্প

অর্জুন মন্ডল

বনফুল

কড়া নাড়ার শব্দে উঠে বসলাম। শীতকালে এতরাত্রে কে এল আবার।

"কে ?"

"আমি, আমি, কপাট খোলো।"

খুললাম। সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জ্বাললাম। দেখি খর্বকায় একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। আজানুলম্বিত গলাবন্ধ খদ্দরের কোট গায়ে। মাথার সামনের দিকটা কেশ-বিরল, চোখ নিষ্প্রভ, ভুরুতে পাক ধরেছে, সমস্ত মুখে বলি-রেখা, সামনে গোটা দুই দাঁত নেই।

"আমার চিঠি পাওনি নিশ্চয়।"

"না।"

"চিতুয়া পোস্ট করেনি তাহলে। শালা ডাকু। নিজে হাতে পোস্ট করলেই ঠিক হত তাকে দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল। ভুল, ভুল, এ জীবনটা ভুল করতে করতেই কাটল, বীরেনবাবু।"

হঠাৎ অর্জুনকাকাকে চিনতে পারলাম আমি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরই চিনিয়ে দিলে তাঁকে। বহুদিনের যবনিকা সরে গেল যেন।

"অর্জুনকাকা। হঠাৎ এত রাতে কোথা থেকে ?"

"তীর্থে যাচ্ছি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। শহরে জিনিসপত্রও কিনতে হবে কিছু। তোমাকে এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিলাম বোধ হয়। আমার ধারনা ছিল চিঠি পেয়েছ তুমি।"

"না, না, তার জন্য কী হয়েছে।"

"হয়নি কিছু। তোমার কাছে খবর না দিয়ে আসবার জোরও আমার আছে। কিন্তু চিতুয়াটার কথাই ভাবছি। এই সব ছোটখাটো ব্যাপার থেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝা যায় কি না—"

অর্জুনকাকা মাঝে মাঝে কথাবার্তাতেও শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। 'বুঝা' 'দিব' নিয়ে আগে কত হাসাহাসি করেছি আমরা।

"ডাকের গোলমাল হয়েছে হয়তো।"

"না, ও কথা মানব না আমি।"

অর্জুনকাকা বারান্দা থেকে নেবে গেলেন এবং গাড়ি থেকে নিজেই নিজের জিনিসপত্র নামাতে উদ্যত হলেন।

"আপনি ছেড়ে দিন না, গাড়োয়ানই নামাবে এখন।"

"কেন ওকে বেশি পয়সা দিতে যাব মিছামিছি।"

'মিছামিছি'-ও অর্জুনকাকার বিশেষত্ব।

"দাঁড়ান, আমার চাকরটাকে ডাকি তাহলে।"

"চাকরকেই বা ডাকবে কেন। আমার গায়ে জোর নাই নাকি ?"

অবলীলাক্রমে নাবিয়ে ফেললেন সব। বিছানা, প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ, লোহার উনুনও একটা। চুক্তিমাফিক গাড়োয়ানকে পাই পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন—"কোন্ ঘরটায় শুব?"

বাইরের দিকে খালি ঘর ছিল একখানা। তাতে একটা চৌকিও ছিল। সেইটেই খুলে দিলাম। অর্জুনকাকা বললেন—"যাও, তুমি শুয়ে পড়ো এইবার। অনেক রাত হয়েছে। আমি এই চৌকির উপর নিজেই বিছানা বিছিয়ে নিচ্ছি। তুমি যাও।"

"আপনার খাওয়া দাওয়া ?"

"রাত্রে আমি কিছুই খাব না।"

"দু' চারখানা লুচিটুচি ভেজে দিক না, কী আর এমন রাত হয়েছে।"

বিছানা পাততে পাততে অর্জুনকাকা বললেন—"তোমার সঙ্গে কি আমি লৌকিকতা করছি ?"

চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "চিতুয়া এবারও ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি বুঝলে।"

"ও।"

"নিজেই ভুগবে শালা। আমার কী।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"যাও, আর রাত কোরো না, শুয়ে পড়ো।"

"সত্যিই কিছু খাবেন না ?"

"দেখো, বেশি যদি পীড়াপীড়ি করো বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে চলে যাব তাহলে!"

বুঝলাম অর্জুনকাকা বদলাননি। আর দ্বিরুক্তি না করে শুতে চলে গেলাম।

শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। অর্জুনকাকার কথাই ভাবতে লাগলাম। অর্জুনকাকার কথা বাবার মুখে খানিকটা শুনেছি—নিজেও দেখেছি খানিকটা। আশ্চর্য জীবন লোকটার! স্বাধীন দেশে জন্মালে দিগ্বিজয় করতে পারতেন। এ দেশে কিছু হল না। জাতে জেলে। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। মাথায় করে মাছের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে এসে হাটে বেচতেন আমাদেরই বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই হাট বসত। অর্জুনকাকার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটা এখনও আমার মনে আছে।

হাটে প্রচণ্ড একটা গোলমাল উঠল একদিন। চিৎকার চেঁচামেচি, কলরব আর্তনাদে সমস্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। একটা জায়গায় ভিড়টা জমাট বেঁধে গেল। মনে হতে লাগল তার কেন্দ্রে ভয়াবহ কী যেন একটা হচ্ছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলে অর্জুনকাকা বেরিয়ে এলেন। তাঁর বগলে একটা রুই মাছ। বাবা হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। অর্জুনকাকা ছুটে এসে মাছটা দড়াম করে সামনে ফেলে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

"আমায় বাঁচান আপনি ডাক্তারবাবু, শালারা আমার সব কেড়ে নিচ্ছে!"

বাবা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

"কী কেড়ে নিচ্ছে? কারা?

"জমিদারের সিপাহিরা। মাছ কেড়ে নিচ্ছে আমার। রোজই নেয় কিছু কিছু। আজ এই বড় রুইটা নিতে যাচ্ছিল। দেব না বললাম তো মারলে এক চড়। আমিও ঘুরিয়ে এক চড় মেরেছি শালাকে।"

গুরুতর ব্যাপার। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের বিরুদ্ধে সামান্য জেলের এই বিদ্রোহ হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ ঘটনা নয়। বাবা একটু বিব্রত হলেন। সামান্য অবাধ্যতার জন্য এই জমিদার একজন গরিব প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন কিছুদিন আগে।

"আচ্ছা তুমি চুপ করে বসো এইখানে।"

বাবার পা ছেড়ে অর্জুনকাকা এককোণে বসলেন গিয়ে। সিপাহি দু'জনও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বাবা জিগ্যেস করলেন, "এর মাছ কেড়ে নিচ্ছিলে কেন তোমরা?"

"এইসেই তো রেওয়াজ হ্যায় হুজুর। মাহিনামে একঠো বড়া মছলি তো উসকো দেনাই চাহিয়ে।"

"নেহি দেগা!"

কোণ থেকে গর্জন করে উঠলেন অর্জুনকাকা।

সিপাহিদের চক্ষু অগ্নি বর্ষণ করতে লাগল।

ডাক্তার বলে বাবাকে ইতর ভদ্র সকলেই খাতির করত। তাই সিপাহিরা আত্মসম্বরণ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা সিপাহিদের বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যাও। তোমাদের মালিককে যা বলবার আমি বলব। ওকে তোমরা কিছু বোলো না এখন।"

সিপাহিরা চলে গেল।

জমিদারও বাবাকে খুব খাতির করতেন। অর্জুনকাকার কিছু হল না। বাবার খাতিরে জমিদার তার মাছ নেওয়াই মাপ করে দিলেন। অতিশয় সামান্য ব্যাপার। জমিদাররা মানীর মান রাখবার জন্যে হামেসাই এরকম করে থাকেন। অর্জুনকাকার কিন্তু তাক্ লেগে গেল। অত বড় দুর্ধর্ষ রাবণ

মিশির লিকলিকে রোগা এই ডাক্তার বাবুটির কাছে একেবারে কেঁচো। উঃ, বিদ্যাব কী প্রতাপ! কী হবে পয়সায়, কী হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস। বশিষ্ঠের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।

উক্ত ঘটনার দিন সাতেক পরে অর্জুনকাকা একদিন এসে একটু কাচুমাচু হয়ে বাবাকে বললেন—"আমার একটি আরজি আছে ডাক্তারবাবু।"

"কী বলো।"

"আমি কিছু লিখাপড়া করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

এইবার বাবার তাক্ লাগল।

"তুমি লেখাপড়া করবে! তোমার সংসার দেখবে কে ?"

"আমার স্ত্রী। আমার জমিজমা কিছু আছে, আমার স্ত্রী ধান কুটে, ছাতু পিষে—চলে যাবে কোনও রকমে। আমিও রোজকার করব কিছু।"

"ক'টি ছেলেপিলে তোমার।"

"সাতটি মেয়ে, ছেলে নাই।"

বাবার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু অর্জুনকাকার চোখে জ্বলন্ত আগ্রহ দেখে হাস্য সম্বরণ করতে হল তাঁকে।

"পড়াশোনা করবে! সে তো ভাল কথাই। কিন্তু করবে কী করে স্কুলে তো আর নেবে না তোমায়।"

"নেবে না ?"

"এ বয়সে কী আর স্কুলে নেয়।"

"তবু আমি পড়ব। আপনি যদি একটু দয়া করেন তাহলে হয়।"

"কী করব বলো।"

"আপনার চরণে যদি আশ্রয় দেন একটু। আপনার হাতায় আমি ছোট কুঁড়ে বেঁধে থাকব, আর আপনার ছেলেদের কাছেই পড়ব, তাদেরই পুরনো বই টই নিয়ে।..."

বাবা একটু চুপ করে রইলেন। অর্জুনকাকার আগ্রহ দেখে তাঁকে তিনি নিরস্ত করতেও পারছিলেন না, অথচ এরকম একটা অসম্ভব প্রস্তাবে সায় দিতেও কেমন যেন লাগছিল তাঁর। একটু চুপ করে থেকে দ্বিধাভরে শেষে বললেন, "বেশ, পারো তো আমার আপত্তি কী।"

তার পরদিনই বাঁশ খড় দড়ি কাটারি শাবল কোদাল নিয়ে অর্জুনকাকা এসে পড়লেন, দেখতে দেখতে ছোট কুঁড়ে ঘরটি বানিয়ে ফেললেন। আমরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম আর সেইদিন থেকে তিনি হলেন আমাদের অর্জুনকাকা। আমাদের যে মাস্টারমশাই পড়াতেন তিনিই অর্জুনকাকার অক্ষর পরিচয় করিয়ে হাতে-খড়ি দিয়ে দিলেন। আমাদেরই প্রথম ভাগ এবং ফার্স্ট বুক নিয়ে তাঁর পড়া শুরু হয়ে গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে আমাদের ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।

অর্জুনকাকা খুব ভোরে উঠতেন। এত ভোরে যে আমরা টেরই পেতাম না। আমরা উঠে দেখতাম তিনি কাজে বেরিয়ে গেছেন। মজুরের কাজ করে বেড়াতেন দিনের বেলায়। যা পেতেন স্ত্রীকে দিয়ে আসতেন। ফিরতেন বিকালে। বিকেলে এসেই তিনি খাওয়া দাওয়া করতেন। প্রায়ই রাঁধতেন না। দই চিঁড়ে কলা প্রিয় খাদ্য ছিল—ছাতুও খেতেন কখনও কখনও। খেয়ে উঠেই হাতের লেখা লিখতেন দিনের আলো থাকতে থাকতে। সন্ধ্যা হলে প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসতেন। রেড়ির তেলের বেশ বড় একটা প্রদীপ ছিল তাঁর। ভোরে কাজে বেরোবার আগে তিনি যে পড়াটা পড়তেন তা আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যেভাবে পড়তেন তার থেকে তা আন্দাজ করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। শির-দাঁড়া একটুও বেঁকতে দেখিনি কখনও। টেবিল চেয়ার ছিল না,

আমাদের মতো চাপটালি খেয়েও বসতে পারতেন না তিনি। উবু হয়ে বসতেন। সামনে থাকত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, তার উপর খবরের কাগজ পাতা। তাতেই একটি ছোট ইটের উপর তিনি প্রদীপটি রাখতেন। সেই কেরোসিন কাঠের বাক্সটি একাধারে ছিল তাঁর টেবিল এবং শেল্‌ফ। নীচের ফাঁকটায় তাঁর বই খাতা দোয়াত কলম থাকত। কী সুন্দরভাবে যে গুছিয়ে রাখতেন সেগুলিকে। খাগের কলমটি, পেন্সিলটি নিখুঁতভাবে কাটা। আমাদের পেন্সিল কলমও তিনিই বেড়ে দিতেন। পিতলের দোয়াতটি ঝকঝক করত। প্রত্যেক বইয়ে কী সুন্দর মলাট দিতেন। কিছুক্ষণ পড়বার পরই কিন্তু ঘুম পেত তাঁর। কিন্তু ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করবার লোক অর্জুনকাকা নন। উঠে চা করতেন ঘুঁটের উনুন জ্বেলে। ঘুঁটের ধোঁয়ায় শুধু ঘুম নয় মশাও পালাত। একটি ঘটি চা খেতেন তিনি, এক আধ কাপ নয়। রাত্রে আর কিছু খেতেন না। চা খেয়ে আবার শুরু করতেন পড়া। কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুল ধরত। চোখে সর্ষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধরে টানতেন। ঠাস ঠাস করে নিজের গালে চড়ও মারতেন কখনও কখনও। আমরা হাসতাম। কারণ অর্জুনকাকার সাধনার ঠিক স্বরূপটি বোঝবার মতো বয়স হয়নি আমাদের তখনও। এখন বুঝতে পারি পুরাকালে শিক্ষার্থী যেমন গুরুগৃহে বাস করে অধ্যয়ন করত, অর্জুনকাকাও তেমনি আমাদের বাড়িতে থেকে পড়তেন। অর্জুনকাকার গুরুস্থানীয় হবার মতো লোক অবশ্য কেউ ছিল না, তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল সেকালের বিদ্যার্থীদের মতো। ওরকম নিষ্ঠা আর কোথাও দেখিনি। মাঝে মাঝে দু'একদিনের জন্য বাড়ি যেতেন অবশ্য, কিন্তু তা দু'একদিনের জন্যই। মাসের অধিকাংশ দিনই পড়াশোনা করতেন তাঁর কুঁড়ে ঘরে বসে। এইভাবে পড়ে বছর দেড়েকের মধ্যে বাংলায় সীতার বনবাস এবং ইংরেজিতে রয়াল রিডার নম্বর ফোর পর্যন্ত পড়ে ফেললেন তিনি। অঙ্কও শিখলেন কিছু কিছু। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক বেশ কষতে পারতেন। তাঁর উৎসাহ দেখে স্কুলের মাস্টার পণ্ডিত সবাই সাহায্য করতেন তাঁকে। অর্জুনকাকা বিনামূল্যে কারও সাহায্য নেবার লোক নন। নানাভাবে প্রতিদানও দিতেন তিনি। দইটা মাছটা কলাটা মুলোটা তো দিতেনই, সেবাও করতেন। কারও পা টিপে দিতেন, কারও কাপড় কেচে দিতেন, কারও বাজার করে দিতেন, কিছুতেই আপত্তি ছিল না তাঁর।

এইভাবেই হয়তো আরও কিছুদিন চলত কিন্তু হঠাৎ একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে সব ওলটপালট হয়ে গেল। হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এক সাহেব সিভিল সার্জন এলেন একদিন। সকালে স্টেশনের কুলি তাঁর জিনিসপত্র বয়ে এনেছিল, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ফেরবার সময় জিনিস বইবার লোক পেলেন না। হাসপাতালের চাকরটা অসুস্থ, আমাদের চাকরও বাড়ি গিয়েছিল। কাছে কুলি-জাতীয় কাউকে না পেয়ে সাহেব (এবং বাবাও) বিপন্ন বোধ করছিলেন। স্টেশন বেশ একটু দূরে, সাহেবের মালও নেহাত হাল্‌কা নয়। অর্জুনকাকা নিজের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি বসে বসে দড়ি পাকাতেন এবং প্রতি হাটে তা বিক্রি করতেন। বাবা গিয়ে তাঁকে বলতেই তিনি সাহেবের জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, এগিয়ে এসে সাহেবকে সেলাম করে বললেন—"Yes, Sir, I shall carry your things most gladly." অর্জুনকাকার মুখে সাহেব ইংরাজি শুনবেন প্রত্যাশা করেননি, শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বাবার মুখে অর্জুনকাকার ইতিহাস এবং অধ্যবসায়ের গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হলেন। স্টেশনে মালপত্র নাবাতেই সাহেব তাঁকে একটি টাকা দিতে গেলেন। অর্জুনকাকা পুনরায় সেলাম করে বললেন—"Thank you, Sir, I am a labourer, no doubt, but I shall not accept anything from you."

বিস্মিত সাহেব প্রশ্ন করলেন—"Why?"

"You are our Doctor Babu's honoured guest." সাহেব অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলেন।

অর্জুনকাকা জিনিসপত্র নাবিয়ে চলে যাবার পর সাহেব বাবাকে বললেন, 'ও যদি চায় আপনি ওকে অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে ভরতি করে নিন। কিছুদিন পরে পরীক্ষা দিয়ে পাকা ড্রেসার হোক। তারপর ওকে আমি কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যেও স্কলারশিপ জোগাড় করে দেব।"

খবরটা শুনে অর্জুনকাকা অবাক হয়ে গেলেন। একটু দমেও গেলেন। একাগ্রচিত্তে তিনি যে পথে সবেগে চলছিলেন হঠাৎ তাতে বাধা পেয়ে এবং সে বাধা দুরতিক্রম্য অনুভব করে (স্বয়ং ডাক্তারবাবু যখন তাকে ড্রেসার হতে বলছেন তখন তা দুরতিক্রম্য ছাড়া আর কী) অর্জুনকাকার এমন অদ্ভুত একটা ভাবান্তর হল যা প্রায় অবর্ণনীয়। হতাশা, জেদ, বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ, ক্ষোভ এবং এই সবটার জন্য দায়ী যে অদৃশ্য শক্তি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—সমস্তটা সমবেতভাবে ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে।

ইতিপূর্বে তাঁর মুখের এ রকম ভাবান্তর আরও কয়েকবার লক্ষ করেছিলাম আমি। অর্জুনকাকা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন তাঁর ঘরে একা থাকতেন আমি মাঝে মাঝে ফুটো দিয়ে (তাঁর দরমার ঝাঁপে অসংখ্য ফুটো ছিল) তাঁকে লক্ষ করতাম। তাঁর মুখের এ রকম ভাবান্তর হতে অনেকবার দেখেছি। এর চেয়েও বেশি অস্থির হতেও দেখেছি। হঠাৎ তাঁর চোখ মুখ কেমন যেন হয়ে যেত, উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতেন, মনে হত জিবটা যেন চিবুচ্ছেন। নাকটা খুব জোরে কুঁচকে খুব ঘনঘন চিবুতেন মনে হত। ছোট একটা হাত-আয়না ছিল তাঁর। চালে গোঁজা থাকত সেটা। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ সেইটে পেড়ে ভ্রূকুটি সহকারে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে থাকতেন খানিকক্ষণ। অতীত জীবনে যে সব দুরতিক্রম্য বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি, অন্যায়ভাবে নিয়তির কাছে যতবার পরাভূত হয়েছেন, তাঁর সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি তাঁকে মাঝে মাঝে পাগল করে তুলত বোধ হয়। আয়নার দিকে চেয়ে নিজেই নিজেকে ভ্যাংচাতেন। হয়তো কথঞ্চিত শান্তি পেতেন তাতে।

বাবার কথা শুনে বললেন, "কাল থেকে ঘা ধোয়াব ! সে কি ! তিন তিনখানা ডিক্‌শ্‌নারি আনতে দিয়েছি আমি—"

"অত ডিক্‌শ্‌নারি কী হবে !"

"মুখস্থ করব।"

"মুখস্থ করবে ? কী হবে ডিক্‌শ্‌নারি মুখস্থ করে। তাছাড়া অত পড়েই বা তোমার লাভ কী, পরীক্ষা তো তোমায় দিতে দেবে না।"

"দেবে না ? কেন !"

"এই নিয়ম। প্রাইভেটলি মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারে। আর পারে শিক্ষকরা · · · তাও তিন বচ্ছর চাকরি করার পর।"

অর্জুনকাকা বললেন—"শুনেছি হাইস্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়া যায়।"

"তা যায় বটে। কিন্তু তারপর আর পারবে না, কলেজে ভর্তি হতে হবে। আই. এ. পাশ করতে করতে বুড়ো হয়ে যাবে। তাতে লাভটা হবে কি ? তার চেয়ে এইতেই লেগে পড়ো। কম্পাউণ্ডার হতে পারো যদি কাজ হবে একটা।"

অর্জুনকাকা চুপ করে রইলেন।

পরদিন থেকেই অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসারের পদে বহাল হয়ে গেলেন তিনি। ড্রেসার করিম মিঞার কাছে প্রথম পাঠ নিলেন ব্যাণ্ডেজ পাকাতে হয় কী করে। করিম মিঞার খুব সুবিধে হল। ছা-পোষা লোক তিনি। মুরগি, ছাগল, গোটা দুই বিবি এবং গোটা বারো ছেলে মেয়ে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে যে, হাসপাতালের কাজে মন দেবার অবসর পেতেন না তিনি। বাবার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতেন। অর্জুনকাকাকে শাকরেদ পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি। অর্জুনকাকাই সমস্ত কাজ করতে

লাগলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্যাণ্ডেজ পাকানো, ছুরি-কাঁচি পরিষ্কার, খাতায় রুলটানা, টেবিল ঝাড়া—সমস্ত হয়ে যেত। হাসপাতালের চাকরটার আসতে দেরি হলে তার কাজও করে দিতেন। কম্পাউণ্ডার হারাধনবাবুও প্র্যাকটিস করবার সময় পেলেন। স্টক মিকশ্চার, স্টক মলম অর্জুনকাকাই করতে শিখে গেলেন; অল্প কিছুদিন পরে সার্জিকাল যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিষ্কার করতেন, লেবেল ময়লা হয়ে গেলে পরিচ্ছন্ন অক্ষরে লিখতেন সেগুলি, এমন কী বাবার হয়ে রিটার্নও করে দিতেন প্রত্যহ। অর্জুনকাকা হাসপাতালের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠলেন দেখতে দেখতে। হাসপাতালের চেহারাই বদলে গেল। অর্জুনকাকার দৈনন্দিন কার্যক্রমও বদলে গেল অবশ্য খানিকটা। মজুরি খাটবার জন্যে আব বেরুতেন না। অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে সিভিল সার্জন যে বেতন তাঁকে মঞ্জুর করেছিলেন যদিও তা সামান্যই কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তিনি। লেখাপড়া বন্ধ করেননি, বরং বাড়িয়েছিলেন। বাঙলায বসুমতী সংস্করণেব বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক গ্রন্থাবলীই কিনে পড়েছিলেন তিনি। ইংরেজিতে ববিন্সন ক্রুশো, গ্যালিভার্স্ ট্রাভল্‌স, পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্ জাতীয় বই কিনে শেষ করতে লাগলেন একটাব পব একটা। ডিক্‌শ্‌নারি মুখস্থ করবার উদ্যমটা নিয়োজিত করতে হল ড্রেসারি বিষযক জ্ঞান-আহবণে। কোর্স ছিল অবশ্য ছোট একখানা চটি বই। কিন্তু ওইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবার লোক অর্জুনকাকা নন। তিনি সেই বইটা আগাগোড়া মুখস্থ তো করলেনই, সে বিষয়ে আরও যে সব বই বাজাবে ছিল তাও আনিয়ে পড়ে ফেললেন একে একে। এতে কিন্তু ফল শেষ পর্যন্ত ভাল হল না। কারণ সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন অন্য একজন লোক।

তিনি এতবড় একজন দিগ্‌গজকে পরীক্ষার্থী রূপে পাবেন আশা করেননি। কোনও কোনও বিষয়ে অর্জুনকাকার জ্ঞান তাঁব চেয়েও বেশি এটা বরদাস্ত করা শক্ত হল তাঁর পক্ষে। তিনি সহজ সরল উত্তব প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু অর্জুনকাকা অনেক বই পড়েছেন, একই প্রশ্নের নানা বিচিত্র উত্তব জানা ছিল তাঁর। প্রত্যেক ব্যাণ্ডেজের উদ্ভব, উপযোগিতা, ইতিহাস, সুবিধা অসুবিধা তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন তিনি। বড় বেশি কথা বলছে দেখে পরীক্ষক ধমক দিলেন। অর্জুনকাকা ধমকে নিরস্ত হবার লোক নন। রাত জেগে অনেক বই পড়েছেন, সমানে তর্ক করতে লাগলেন। পরীক্ষকের সঙ্গে তর্ক কবা ডাক্তারি লাইনে শ্রেষ্ঠতম অপরাধ। ফেল হয়ে গেলেন তিনি। ফেল হয়ে অর্জুনকাকা যে দিন ফিবে এলেন সেদিনও ওইরকম মুখভার দেখেছিলাম তাঁর। হতাশা জেদ ক্ষোভ এবং সমস্তটাব জন্য দায়ী যে দুরতিক্রম্য নিয়তি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—এই সবগুলো একসঙ্গে যেন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখভাবে, চোখের দৃষ্টিতে। সমস্ত দিন ঘর থেকে বেরুলেন না। মাঝে মাঝে সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠেছে, চালে গোঁজা আয়নাটা পেড়ে অতি কুৎসিতভাবে ভ্যাংচাচ্ছেন নিজেকে। অবশ্য ওই একদিন মাত্র; পর দিন থেকেই আবার কাজে লেগে গেলেন পূর্ণ উদ্যমে। যেন কিছুই হয়নি।

পরের বার পাশ করলেন। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্য স্কলারশিপও পেলেন। কিন্তু একটা মুশকিল হল। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্য কটক যেতে হবে। পরিবার রেখে যাবেন কার কাছে ? দিন কয়েক ছুটি নিলেন। ছুটির পর ফিরে এসে কিন্তু তিনি যে খবর দিলেন তা অভাবনীয়। পাশের গ্রামেই অর্জুনকাকার স্বজাতি বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল একঘর। বেশ ভাল অবস্থা, ছোটখাটো জমিদারি আছে।

তাঁর সাত ছেলে। তিনি নাকি তাঁর সাত ছেলের সঙ্গে অর্জুনকাকার সাত মেয়ের বিয়ে দিতে চান। হাসপাতালে চাকরি হওয়াতে এবং আমাদের সম্পর্কে আসাতে অর্জুনকাকার একটা খ্যাতি রটে গিয়েছিল নিজেদের সমাজে। এ প্রস্তাবে আনন্দিত হওয়ার কথা, কিন্তু অর্জুনকাকা এতে বিপন্ন বোধ করলেন।

"এ এক মহা আফৎ হল।"

অর্জুনকাকা 'আপদ'কে 'আফৎ' বলতেন।

বাবা বললেন, "আমার তো মনে হচ্ছে ভালই হল; মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে চলে যাও তুমি। মেয়েরা তোমার সুখেই থাকবে। ওরা বড়লোক।"

"বড়লোক বলেই আমার আপত্তি। বড়লোক মানেই পাজি, বদমাস, চোর, লম্পট, লুচ্চা—"

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অর্জুনকাকা।

"আপনি তো সবই জানেন ডাক্তারবাবু। এই জমিদার শালারাই দেশকে চুষে খেয়ে ফেললে। আমার কী হাল হয়েছিল আপনি তো সবই জানেন, আপনি না থাকলে আমাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলত শালারা—"

"সবাই খারাপ নয়। এরা লোক ভাল।"

"আপনি বলছেন ?"

অর্জুনকাকার মুখভাব আবার সেইরকম হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। বড়লোকদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার ইচ্ছে নেই তাঁর, কিন্তু বাবা যখন এতে মত দিচ্ছেন তখন তা অমান্য করবার সাধ্যও নেই। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি!

বাবা বললেন, "তোমার মেয়েদের যদি না-ও দাও তাহলে কার কাছে রেখে যাবে এদের ? মাসখানেকের মধ্যেই তো কটক যেতে হবে তোমাকে।"

"তার জন্যে আমার ভাবনা ছিল না, আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে রেখে যাব ভেবেছিলাম। তাকে আনবার জন্যেই কসবায় গিয়েছিলাম ছুটি নিয়ে।"

"তোমার যা খুশি করতে পারো। কিন্তু আমার মনে হয় মেয়েদের বিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল"— এই বলে উঠে গেলেন। অর্জুনকাকা চুপ করে বসে রইলেন। ক্রমশ তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হতে লাগল। চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পলক ফেলে জিবটা চিবুতে শুরু করলেন তিনি।

বিয়ের দিনও এক কাণ্ড ঘটল। অর্জুনকাকা তাঁর জমিদার বেয়াইকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি গরিব মানুষ, বেশি বরযাত্রীর হাঙ্গামা বরদাস্ত করবার শক্তি নেই তাঁর, কুড়ি জনের বেশি বরযাত্রী যেন আনা না হয়। বিয়ের দিন দেখা গেল পঞ্চাশটা ঢোল, কুড়িটা রাম-শিঙে, পনেরোটা কাঁসি এবং দশটা শানাই সমভিব্যাহারে এক বিরাট জনতা চতুর্দিক সচকিত করে অর্জুনকাকার বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্জুনকাকা সোজা থানায় চলে গেলেন। দারোগাকে গিয়ে বললেন—"হুজুর, আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, বাঁচান আমাকে।" দারোগা সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে সত্যিই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন অকুস্থলে। ব্যাপারটা অবশ্য পরিহাসেই পর্যবসিত হল শেষ পর্যন্ত। অর্জুনকাকার বেয়াই শুধু লোকজনই আনেননি, তাদের বসবার, শোবার, খাবার সমস্ত আয়োজনই সঙ্গে করে এনেছিলেন। অর্জুনকাকা কিন্তু এতে খুশি হলেন না। অপমানিত বোধ করলেন। ধনী হস্তের এই অভিনব অস্ত্রে আহত হয়ে চুপ করে রইলেন। কারণ এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলে না। গুম হয়ে বসে রইলেন কেবল। হয়তো নির্জনে মুখ-ভঙ্গি করে নিজেই নিজেকে ভেংচেছিলেন, কিন্তু সে খবর আমরা জানি না।

মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল। অর্জুনকাকা নিজের স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কটক চলে গেলেন।

এর পর বছর দুয়েক অর্জুনকাকার কোন খবর পাইনি। মাইনার পাশ করে আমরা শহরের হাইস্কুলে গিয়ে ভরতি হলাম। অর্জুনকাকা কটকে কম্পাউণ্ডারি পড়ছেন এইটুকু শুধু জানতাম। মাঝে কার মুখে যেন শুনেছিলাম অর্জুনকাকা সেখানেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বছর দুই পরে অর্জুনকাকা হঠাৎ এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে তাঁর সাত জামাই। তাদের স্কুলে ভরতি করে দিয়ে গেলেন। আমাদের অনুরোধ করলেন আমরা যেন একটু দেখা-শোনা করি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বললেন, "বলছি বটে কিন্তু কিচ্ছু হবে না। বড় বিলাসী। আর আফৎ জুটেছে এক পিসি—"

মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। পরের ট্রেনেই চলে গেলেন।

আমরা বোর্ডিংয়ে থাকতাম। অর্জুনকাকার জামাইরা একটা বাসা ভাড়া করে রইল। সঙ্গে এল এক পিসি। তিনিই হলেন গার্জেন। জমিদারি থেকে প্রচুর দুধ দই মাছ ঘি আম কাঁঠাল সরবরাহ হতে লাগল, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক তাদের প্রাইভেট পড়াতে লাগলেন, স্থানীয় মনোহারী দোকানটার বিক্রি বেড়ে গেল, অর্জুকাকার জামাইদের নিত্য-নূতন সাজ-সজ্জায় আমরা ঈর্ষান্বিত হতে লাগলাম। কিন্তু অর্জুনকাকা যা বলেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাই হল। অর্থাৎ জামাইদের কিচ্ছু হল না। জামাইরা প্রমোশন পেলে না। একদিন হঠাৎ আবার শুনলাম অর্জুনকাকা এসেছেন। শুধু এসেছেন নয়, এসে গো-বেড়েন করেছেন প্রত্যেকটি জামাইকে ! বেচারাদের আর্তনাদে পাড়ায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে নাকি ! দেখতে গেলাম। গিযে দেখি বাইবেব বাবান্দায় ভাঙা আয়না, চিরুনি, স্নো, পাউডার, সিগারেটের বাক্স, কয়েকটা শৌখিন জামা, শাল প্রভৃতি ইতস্তত ছড়ানো। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বাইরের দিকে একটা জানালা ছিল। উঁকি দিয়ে দেখি অর্জুনকাকা ! পিছনে দুহাত রেখে ক্রমাগত পায়চারি করছেন আর জিব চিবুচ্ছেন। মুখভাব ভয়াবহ। চুপি চুপি সরে পড়লাম। অর্জুনকাকা সেই দিনেই চলে গেলেন। তার পরদিন জামাইবাও স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে চলে গেল। এ নিয়ে শুনেছি বেয়াইয়ের সঙ্গে ঘোরতর মনোমালিন্য হয়েছিল অর্জুনকাকার, কিন্তু বাবা মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিয়েছিলেন সব।

আমি ক্রমশ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ কবে কলেজে ভর্তি হলাম। তারপব আই. এস্-সি. পাশ করে গেলাম মেডিকেল কলেজে। অর্জুনকাকাব খবর অনেকদিন পাইনি। এইটুকু শুধু শুনেছিলাম যে, তিনি কম্পাউণ্ডারি পাশ করে ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের নানা হাসপাতালে চাকরি করে বেড়াচ্ছেন। একবার ছুটিতে বাড়ি এসে দেখলাম অর্জুনকাকা আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমার জন্যই বিশেষ করে ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। কেন এসেছেন শুনে অবাক হযে গেলাম। আমার কাছে তিনি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং ফার্মাকোলজি বিষয়ে জ্ঞান-আহরণ করতে চান।

"তুমি তো পড়েছ এ সব, আমাকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দাও।"

বলা বাহুল্য, বিপন্ন হলাম। কিন্তু অর্জুনকাকাকে নিরস্ত করার সাধ্য আমার ছিল না। একবার শুধু ইতস্তত করে বললাম, "এখন আর কী করবেন এসব পড়ে ?"

তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমার কথা শুনে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে, যেন আমি হাস্যকর অদ্ভুত কিছু বলেছি একটা।

"কী করব ! বাঃ !"

একটু থেমে তারপর বললেন, "শিখব। শিখতে দোষ কী আছে ! তা ছাড়া চাকরি করার আর ইচ্ছা নাই। সব শালা চোর ! প্র্যাকটিস্ করব ঠিক করেছি। আমাকে ডাক্তারিটা ভাল করে শিখিয়ে দাও তুমি !"

যতদিন বাড়িতে ছিলাম অর্জুনকাকার সঙ্গে পড়তে হত। নিজের অক্ষমতায় লজ্জা হত আমার। ওই বৃদ্ধের উৎসাহের সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারতাম না। প্রত্যহ রাত্রে এগারোটায় শুয়ে ভোর চারটের সময় ওঠবার শক্তি ছিল না আমার। কিন্তু অর্জুনকাকা না-ছোড়। রোজ ডাকাডাকি করে ঠিক তুলতেন আমাকে। দুপুরটা কেবল ছুটি পেতাম। অর্জুনকাকা সেই সময়ে আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে আশ্রয় নিতেন। খিল দিয়ে দিতেন ভিতর থেকে। আমি মনে করতাম ঘুমোন বোধ হয়। একদিন জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি পিছনে দু'হাত রেখে পরিক্রমণ করে বেড়াচ্ছেন সারা ঘরটা। জিব চিবুচ্ছেন। ক্ষোভ দুঃখ ঘৃণা ব্যঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখে। হাতে ছোট আয়নাখানা। মাঝে মাঝে সেটা তুলে ধরছেন মুখের সামনে আর ভ্যাংচাচ্ছেন নিজেকে।

ছুটি ফুরোতে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। কোলকাতায় ফিরেই কিন্তু অর্জুনকাকার বড় বড়

স্পষ্টাক্ষরে লেখা চিঠি পেলাম একখান। "অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি এবং মেটিবিয়া মেডিকা বিষয়ক বাংলা ভাষায় এবং সহজ-বোধ্য ইংরেজি ভাষায় লেখা যত বহি সংগ্রহ করিতে পারো অবিলম্বে আমার নামে ভি. পি. যোগে পাঠাইয়া দিও।" যা পেলাম পাঠিয়ে দিলাম।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম অর্জুনকাকা সত্যিই চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করেছেন। তারও কিছুদিন পরে আমার মেসে এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে ছ'সাত বছরের একটি ছেলে। বললেন—"এটি আমার নাতি। আমার মেয়ের ছেলে। একে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করব বলে এনেছি। ওখানে কিছু হবে না। তুমি একটা ভাল স্কুল বেছে দাও। শুনেছি মর্টন স্কুলে খুব কড়া শাসন, সেখানে দিলে কেমন হয় ?"

"কী হবে অত কড়া শাসনে রেখে ?"

"তুমি বুঝ না, কড়া শাসনই দরকার। তা না হলে এসব ছেলের কিছু হবে না।"

তাবপর একটু হেসে কবি হেমচন্দ্রের সাহায্য নিয়ে বললেন, "হেঁ হেঁ এসব দৈত্যে নহে তেমন"

চকিতের মধ্যে মুখের পেশীগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল জিবটাও যেন নড়ে উঠল মুখের মধ্যে একবাব। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী নাম তোমার ?"

"চিতুয়া।"

অর্জুনকাকা ধমক দিয়ে উঠলেন।

"চিত্তরঞ্জন বলতে পারো না ?"

তারপর আমার দিকে ফিবে বললেন—"এমন অসভ্য এরা, ভাল একটা নাম বাখলাম চিত্তরঞ্জন সে নামকে করে ফেললে চিতুয়া। সবাই ডাকছে চিতুয়া, চিতুয়া। চিত্তরঞ্জন শব্দ মুখ দিয়ে বাহিরই হয় না, কী করবে বেচারাবা—" অর্জুনকাকার ওপরের ঠোঁটটা একটু কেঁপে থেমে গেল।

চিত্তরঞ্জনকে মিত্র ইনস্টিট্যুশনে ভর্তি কবে দিলাম।

মর্টনের উপরই অর্জুনকাকার ঝোঁক বেশি ছিল, কিন্তু আমি মানা করাতে আমার কথাটা রাখলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—'টাকার কোনও অভাব হবে না, এর বাবা না দেয় আমি টাকা দিব, কিন্তু পড়াশোনাব ভাল ব্যবস্থা হওয়া চাই। বিলাসিতা না করে সেইটি দেখিও—"

আমি যতদিন কোলকাতায় ছিলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম চিতুয়া যাতে চিত্তরঞ্জন নামের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন প্রতিকূলতা করতে লাগল। চুম্বক যেমন লৌহকণা আকর্ষণ করে, চিতুয়া তেমনি নানা কুসঙ্গী জোটাতে লাগল তার চারিদিকে। ক্লাশ প্রমোশন অবশ্য পেলে কিন্তু তা নিজের জোরে নয়, আমার তদ্বিরে।

··· এবপর অর্জুনকাকার যে স্মৃতিটা আমার মনে পড়ছে তা আমার বিলেত যাওয়ার ঠিক আগের ঘটনা। ভাল ডাক্তার হতে হলে এখানকার ডিগ্রিই যে পর্যাপ্ত নয় এ ধারণা তখন আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। এখন যদিও ধারণাটা বদলেছে, তখন কিন্তু নামের পিছনে একটা বিলিতি ডিগ্রি লাগাবার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছিলাম। বাবাকে বললাম। তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু। ছেলেকে বিলেতে পাঠাবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। কিন্তু আমাকে সোজা 'না'-ও বলতে পারলেন না। ছেলে পড়তে চাইছে, অর্থাভাবে তার পড়া হবে না, ব্যাপারটা কষ্টদায়ক হয়ে উঠল তাঁর কাছে। তিনি ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় আমাদের এক আত্মীয় এসে খবর দিলেন যে, একজন বড়লোক আমার বিলেত যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করতে প্রস্তুত আছেন আমি যদি বিলেত যাওয়ার পূর্বে তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করি। আমরা চিরকাল পণ-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে এসেছি, সুতরাং এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারলাম না। এই সব নিয়ে বাড়িতে আলাপ আলোচনা চলছে, হঠাৎ

অর্জুনকাকা এসে উপস্থিত হলেন। আমি বাড়ি এসেছি খবর পেলেই তিনি আসতেন এবং ডাক্তারি নানা তথ্য আহরণ করতেন আমার কাছ থেকে। তিনি আমাদের বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও শুনলেন সব। শুনে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। সবাই চলে গেলে আমাকে বললেন, "বিয়ে করে বিলেত যাও না, ভালই তো। শ্বশুরের টাকা নিতে তোমার আপত্তি কেন ?"

"ওর মধ্যে বড়লোকের দম্ভ প্রচ্ছন্ন আছে একটা, তা আমি সহ্য করতে পারব না।"

"বাঃ—"

অর্জুনকাকা প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, "বিলেত যেতে কত টাকা লাগে ?"

"পাঁচ ছ' হাজার।"

"মোটে ? আমি দিব তোমাকে টাকা।"

"আপনি ?"

"হাঁ—ছ' হাজার টাকা পোস্টাফিসে আছে আমার। কালই বাহির করে আনতে পারি। তুমিই নাও টাকাটা। তোমাদের জন্যই তো আমার সব। আমার তো কিছুই ছিল না।" চুপ করে রইলাম।

"কাল তাহলে টাকাটা বাহির করি ?"

"না, থাক !"

"কেন, আপত্তি করছ কেন ?"

"থাক না আপনার টাকা। আপনার নাতিরা মানুষ হয়নি এখনও।"

"হবেও না। সব শালা গুণ্ডা হচ্ছে। তাছাড়া ওদের টাকার অভাব কী ? ওদের আমি দিব না কিছু। তুমিই নাও, ভাল কাজে খরচ হলে তৃপ্তি হবে আমার। কি বলো, বাহির করি ?" অর্জুনকাকার চোখে আগ্রহ ফুটে বেরুতে লাগল যেন।

"না, থাক।'

"কেন আমাকে পর ভাবছ ?"

একটু মুচকি হেসে আমি উঠে গেলাম। অর্জুনকাকা একা বসে রইলেন। ফিরে এসে দেখি তিনি পায়চারি শুরু করেছেন। উত্তর দিকের বারান্দাটায় ক্রমাগত চক্কোর দিচ্ছেন। পিছনে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ, চোখের দৃষ্টি দিয়ে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা অবর্ণনীয়। আমাকে দেখতে পেলেন না, আমিও সরে গেলাম সেখান থেকে।

কিছুদিন পরেই একটা জাহাজের চাকরি নিয়ে আমি বিলেত চলে যাই। অর্জুনকাকার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দেখা হল বিলেত থেকে ফেরবার পর। হঠাৎ একরাত্রে এসে হাজির। কিন্তু, সকালে উঠে দেখি অর্জুনকাকা নেই। তাঁর উনুনটি বাইরের বারান্দার নীচে ধোঁয়াচ্ছে। চাকরটা বললে, বুড়ো বাবু আমার কাছ থেকে কিছু কয়লা আর ঘুঁটে নিয়ে নিজের হাতে উনুনে আঁচ দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। এখুনি ফিরবেন। হাতে বিশেষ কোনও কাজ ছিল না, তাঁর অপেক্ষাতেই বসে রইলাম। বিলিতি ডিগ্রি সত্ত্বেও চাকরি পাইনি, প্র্যাকটিস্‌ও জমাতে পারিনি। কোটিপতি হবার আশায় কোলকাতা শহরে গিয়ে বসেছিলাম কিছুকাল। কিছু হয়নি। এখন এই মফঃস্বল শহরে এসে বসেছি। কোটিপতি হবার সম্ভাবনা না থাকলেও গ্রাসাচ্ছাদন জুটবে বলে মনে হচ্ছে। দশটার সময় একজায়গা যেতে হবে, তার আগে হাতে কোনও কাজ নেই। অর্জুনকাকার অপেক্ষায় বসে রইলাম। একটু পরেই অর্জুনকাকা শিবস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে এলেন। শুধু গা, শুধু পা। এক হাতে এক ঘটি জল, অন্য হাতে ভিজে কাপড়, গামছা।

"অর্জুনকাকা, এত ভোরে কষ্ট করে গঙ্গা নাইতে গেলেন কেন। চাকরটাকে বললেই সে বাথরুম দেখিয়ে দিত—"

"কষ্টটা আর কী। এতেই অভ্যস্ত আমি।"

ভিজে কাপড় গামছা জানলার গরাদেতে বেঁধে শুকুতে দিলেন। তারপর এক হাতেই জ্বলন্ত উনুনটা তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়। "বাবান্দায় উনুন রাখতে তোমার আপত্তি নাই তো ?"

"না। উনুন নিয়ে কী করবেন ?"

"দেখো না"—বলেই জলের ঘটিটা বসিয়ে দিলেন তাতে। তারপর উনুনের ধারে ছোট মোড়াখানা টেনে এনে তার উপরে বসে গা হাত পা সেঁকতে লাগলেন।

"তুমিও সরে এসে বসো না। সোয়েটারই পরো আর শালই গায়ে দাও, এর কাছে কিছু নয়।"

অর্জুনকাকা হাত গরম করে দুইগালে দিতে লাগলেন। দু' পা ফাঁক করে উনুনটাকে দুই পায়ের মাঝখানে রেখে দাঁড়ালেন দু' একবার। চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল। অর্জুনকাকার সঙ্গে যে আমার কী সম্পর্ক তা স্ত্রীকে সবিস্তারে বলেছিলাম। ট্রের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝলাম সম্মানিত অতিথির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে সে।

অর্জুনকাকা সবিস্ময়ে বললেন—" এ সব কী !"

"একটু চা খান।"

"আমার কথা সব ভুলে গিয়েছ দেখছি।"

"চা তো আপনি খেতেন।"

"চা তো খাবই, ওই তো জল হচ্ছে। চা দুধ চিনি আনতে বলো—আমার বাক্সে সব আছে—কিন্তু তোমার এখানে এসেছি, তোমাবটাই খাব আজ। শৌখিন পেয়ালার এক আধ চুমুক খেয়ে কিছু হবে না আমার—"

"বেশ তো, বেশি করেই খান না।"

"আমিই নিজের হাতে করব— নিজে খাব, তোমাকেও খাওয়াব।"

"খাবারটাবারগুলো ?"

"আমি তো সকালে কিছু খাই না, তুমি জানো। আগে দই চিড়া খেতাম, এখন তা-ও ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল একবার খাই, শুধু দুপুরে, তা-ও নিরামিষ।"

"এত খাবার কী হবে তাহলে, আপনার জন্যে এনেছে—"

"বেশ, আমিই তোমাদের দিচ্ছি। তুমি খাও, তোমাব ছেলেমেয়েদের ডাকো। ছেলেপিলে কটি তোমার?"

"একটিও হয়নি এখনও।"

"কেন !"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন অর্জুনকাকা। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক যুক্তি অনুসারে আমি যে জন্ম-নিরোধ ব্যাপারে লিপ্ত আছি তা আর তাঁকে বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

অর্জুনকাকা চাকরটাকে বললেন, "তুমি এসব নিয়ে যাও। মাকে বলো কিছু চা চিনি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে। তোমার বাবুর জন্যে একটা কাপ রেখে যাও খালি।"

চাকর নিয়ে এল সব। অর্জুনকাকা চায়ের পাতা শুঁকে বললেন—"এ চা ভাল নয় তোমার। ঠকিয়েছে তোমাকে।"

একটু লজ্জিত হলাম। সত্যি কথাই বলেছেন অর্জুনকাকা। ঠকায়নি—অর্থাভাবে শস্তা দামের চা-ই ব্যবহার করি। শহরে অধিকাংশ বাড়িতেই পেয়ালারই চাকচিক্য, চা খেলো।

অর্জুনকাকার ঘটির জল ফুটে উঠল। তোরঙ্গ থেকে তিনি কুচকুচে কালো পাথরের বেশ বড় একটি গ্লাস বার করলেন। একটি পিতলের ছাঁকনিও।

চা তৈরি করলেন, আমাকে এক কাপ দিলেন, নিজে এক গ্লাস নিলেন। চা খেতে খেতে নিজের

কথা বলতে লাগলেন। মূর্খ জামাইদের সঙ্গে বনিবনাও হয়নি তাঁর। নাতিও মনের মতো হয়নি। স্ত্রী মাবা গেছেন। প্র্যাকটিস্ করতেও আর ভাল লাগে না। দুনিয়ার কারও সঙ্গেই বনল না। বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই ঠিক কবেছেন শেষকালে।

"তোমার প্র্যাকটিস্ হচ্ছে কেমন ?"

"চলে যাচ্ছে।"

"হবে, তোমাব ঠিক হবে। আম গাছে আমই ফলবে।"

খানিকক্ষণ চুপ কবে বসে রইলেন।

"আচ্ছা, তুমি বসো। আমি বাজাবটা ঘুবে আসি।"

অর্জুনকাকা চলে গেলেন।

আমিও বোগী দেখতে বেরুলাম।

যখন ফিবলাম তখন বেলা বাবোটা। ফিবে দেখি অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায অর্জুনকাকা বসে আছেন।

"খুব অদ্ভুত জিনিস দেখলাম একটা।"

"কী।"

"দেখবে ? চলো না, কাছেই"

"বলুন না কি ?"

"না দেখলে সে ঠিক বুঝবে না। পাঁচ মিনিটেব পথ, চলো না।"

যেতেই হল। অর্জুনকাকা আমাকে নিয়ে গেলেন এক লোহাব দোকানে।

"ওই দেখো।"

"কী ?"

বিস্ময়কব কিছু দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হচ্ছিলাম।

"লোহাব চাদরটা দেখছ না। হাত দিয়ে দেখো কত মোটা।"

কোট-প্যান্ট পরা ছিল, ঝুঁকতে একটু কষ্ট হল, তবু অর্জুনকাকাব আগ্রহাতিশয্যে ঝুঁকে লোহার চাদরের ঘনত্ব অনুভব করলাম।

"ভাল নয় ?"

"হ্যাঁ, বেশ পুরু মনে হচ্ছে।"

"পুরুই দবকাব।"

"কী করবেন এ নিয়ে ?"

"উনুন। চমৎকাব উনুন হবে এতে। তোমার জন্যও একটা কবতে দি, কি বলো ?"

"দিন।"

উনুনেব দরকার ছিল না, কিন্তু অর্জুনকাকাকে ক্ষুণ্ণ কবতে পারলাম না। অর্জুনকাকা সোৎসাহে আবও খানিকটা লোহাব চাদর, শিক, আংটা প্রভৃতি কিনে নিজেই সেগুলি কামারেব ওখানে বয়ে নিয়ে গেলেন। কুলি করতে দিলেন না। কামারকে বললেন — "আব একটা উনুনও করতে হবে। বেশ ভাল মজবুত করে কোরো, বুঝলে।"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাজারে যে সব তৈরি তোলা উনুন পাওয়া যায় সে সব বড় অমজবুত। এ দেখো কী রকম হবে।"

ফিরবার পথে বললেন, "এখানে কাঠও বেশ পাওয়া যায়। কাঁঠাল কাঠের দর করে এসেছি, একটা সিন্দুকও করিয়ে নেব ভাবছি।"

তারপর দিন শুধু কাঁঠাল কাঠ নয়—ইস্ক্রুপ, কবজা, কাঁটি, লোহার পাত এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত

এক ছুতোর মিস্ত্রিও এসে হাজির হল। অর্জুনকাকা সোৎসাহে সিন্দুক করাতে লেগে গেলেন।

আমাকে বললেন, "সিন্দুকটা এমনভাবে করাব যাতে আমার সব কুলিয়ে যায় ওতে। বিছানা পত্তর, খাওয়া দাওয়ার জিনিস, উনুনটা, বাসন দু'একখানা, বই টই—পাঁচটা পুটুলি করে আর কী হবে ? আমার ক'টা জিনিসই বা আছে। একটু বড় করেই করাব, রাত্রে যাতে ওর উপর শুতেও পারি · · · কি বলো।"

"বেশ তো।"

উঠে পড়ে লাগলেন তিনি। সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিস্ত্রিটার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলত।

"ভাল করে র‍্যাঁদা দাও না, ওর নাম কী র‍্যাঁদা দেওয়া। বার্নিশ হবে। ও কী করছ তুমি ?"

"একটু ভাল করে খেটে-খুটে করো বাবা, মজুরি ছাড়া বখশিসও দেব তোমাকে। ফাঁকি দিও না।"

"হ্যাঁ, ঠিক করে মেপে নাও—থামো থামো, আমি ধরছি।"

"আরে বাবা কতবার বলব তোমাকে, ভিতরে বড় বড় চারটে খোপ হবে, হাঁ চারটে—"

"হাঁ হাঁ হাঁ প্যাঁচ কোষো না এখন, দাঁড়াও দেখি—"

এই জাতীয় নানা উক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যেত। অর্জুনকাকা মেতে উঠলেন সিন্দুক নিয়ে। একেবারে শ্রান্তিক্লান্তিহীন। জলের মতো পয়সাও খরচ হতে লাগল। পিতলের বড় বড় ডুমো ডুমো পেরেক কিনে আনলেন সিন্দুকের শোভাবৃদ্ধির জন্য। কোণে কোণে লোহার পাত দিলেন মজবুত করবার জন্য। মিলটন কাপড় কিনে সিন্দুকের ভিতর অস্তর দিলেন। যত খরচই হোক জিনিসটা মনোমত করতে হবে। জীবনে কোনও জিনিসই মনোমত হয়নি, এটাকে নিখুঁত করতেই হবে—আমার মনে হল এই ধরনের একটা জেদ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। অন্তত একটা কাজেও তিনি যে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন এই সান্ত্বনাটুকুকে আঁকড়ে তিনি তীর্থবাস করতে চান। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত আগ্রহ যেন সিন্দুকটার উপর প্রয়োগ করছেন তাই।

সিন্দুকটা হলও চমৎকার। যেমন প্রশস্ত, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর দেখতে।

অর্জুনকাকা বললেন—"এর উপর উঠে লাফাও তুমি।"

'কেন ।"

"দেখো, কত মজবুত।"

"মজবুত হয়েছে বৈকি।"

"আহা, উঠে দাঁড়াও না তুমি।"

অনিচ্ছা সহকারেও সিন্দুকটার উপর উঠে দাঁড়াতে হল।

"পা ঠুকো।"

পা ঠুকলাম দু'-একবার।

"খুব মজবুত হয়েছে।"

অর্জুনকাকার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

উনুন এসে গেল। অর্জুনকাকা তোরঙ্গটাও আমাকে উপহার দিলেন। তোরঙ্গের জিনিসপত্র সিন্দুকে পুরলেন। আরও নানারকম জিনিস কিনে ভরতে লাগলেন সিন্দুকে। গোটা দুই তালা কিনলেন ভাল দেখে।

· · · ক্রমশ যাবার দিন ঘনিয়ে এল। অর্জুনকাকা প্রথমে যাবেন প্রয়াগ, মাঘ মাসটা সেখানে কাটাবেন, তারপর থাকবেন কাশীতে এসে।

অর্জুনকাকাকে তুলে দিতে স্টেশনে গেলাম। একটা কুলি সিন্দুকটা তুলতে পারলে না। দু'জন

লাগল।

ট্রেন এল। কুলি দু'জন প্রাণপণে চেষ্টা কবলে সিন্দুকটাকে গাড়িতে তুলতে, কিন্তু কিছুতেই পাবলে না। সিন্দুকটা এত বেশি বড় হযেছিল যে, ট্রেনেব দবজা দিযে কিছুতেই ঢুকল না। সুটকেস নিয়ে কত লোক উঠল নাবল কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুনকাকা উঠতে পাবলেন না। ট্রেন ছেড়ে গেল।

অর্জুনকাকাব দিকে চেযে দেখলাম—তাঁব সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, ঘনঘন জিব চিবুচ্ছেন তিনি।

শ্রেষ্ঠ গল্প

বা ঘ

মনোজ বসু

বনকাপাসি গ্রামে এ বকম অত্যাশ্চর্য ব্যাপাব কোনদিন ঘটে নাই।

সকালবেলা তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জে মহাশয় গাড়ু হাতে বাঁশবাগানেব মধ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় যেন কেঁদো-বাঘ ডাকিয়া উঠিল। বাঁড়ুজ্জে গাড়ু ফেলিয়া তিন লাফে বাগান পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। ডাকটা কোন দিক হইতে আসিল তাহা সঠিক সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। কোন দিকে যে চূড়ান্ত নিরাপদ জায়গা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য এদিক-ওদিক তাকাইতেছেন, এমন সময দেখা গেল জাল কাঁধে ছিদাম মালো উত্তব-মুখো বিলেব দিকে চলিয়াছে।

—শুনিসনি ছিদাম ?

ছিদাম কিছু শুনিতে পায় নাই।

—শেষকালে দিনমানেও কেঁদো ডাকতে আরম্ভ করল। বিলকোলাচে পাতিবনের দিকটায়—

কথার মাঝখানেই পুনরায় বাঘের ডাক এবং যেন আরও একটু নিকটে।

ছিদামের মাছ ধরা হইল না, ফিরিল—পাগুলি একটু ঘন ঘন ফেলিয়াই। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের বয়স হইয়াছে এবং বাতের দোষ আছে, তিনি তো দৌড়াইতে পারেন না—

কোনও গতিকে মিত্তিরদের চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে উঠিয়া দেখিলেন, এক পাশে পাইক নিমাই হুঁকা শোলক করিতেছে এবং ভিতরে মিত্তিরের সেজ ছেলে বুধো তাবক চক্কোত্তির সঙ্গে দাবা খেলিতেছে। বাঁড়ুজ্জে বাঘের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিন জনেই জোয়ান। বুধো এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর হইতে সড়কি বাহির করিয়া আনিল, নিমাই পাইক লইল তাহাব পাঁচহাতি লাঠি, এবং হাতের কাছে জুতসই আর কোনও অস্ত্র না দেখিয়া তারক চক্কোত্তি একটানে একটা জিওলের বড় ডাল ভাঙিয়া কাঁধে করিল।

তিন বীরপুরুষ বাহির হইয়া পড়িল—আগে তারক, মাঝে বুধো, শেষে নিমাই।

ঐ—ঐ—আবার বাঘ ডাকে।

একেবারে পাড়ার মধ্যে। দিঘির পাড়ে কিংবা হলুদভুঁইয়ের মধ্যে। সর্বনাশ— দিন দুপুরে হইল কী ! তারক পিছাইয়া পড়িল। মাত্র জিওলের ডাল সম্বল করিয়া গোঁযার্তুমিটা কিছু নয়। নিমাই কহিল—ফেরা যাক সেজ কর্তা, পাড়ার সবাইকে ডেকে আনি।

বুধো তাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু আর আগাইল না, সড়কিটা শক্ত কবিযা ধবিয়া সন্তর্পণে সেখানে

দাঁড়াইল।

ঐ—ফের।

একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে। আমবাগানের আড়ালে—দশ হাতও হইবে না। বাবা রে। তারক ও নিমাই দৌড় দিল। বুধো একা একা কী করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে মোড় ঘুরিয়া সামনে আসিয়া পড়িল—

বাঘ নয়, দুজন মানুষ।

একজনের মাথার উপরে চৌকা লালচে রঙের কাঠের ছোট বাক্স, বাক্সর উপর গামছায় বাঁধা পুঁটুলি। অপরের বাঁ হাতে হুঁকা, ডান হাতে অবিকল ধুতুরাফুলের মতো গড়নের বৃহদাকার একটি চোঙা। সেই চোঙা এক একবার মুখে লাগাইয়া শব্দ করিতেছে, আর যেন সত্যকার বাঘের আওয়াজ হইতেছে।

বুধো লোক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাহিরের উঠানে দাঁড়াইল।

বাঁড়ুজ্জে তখনও সেখানে ছিলেন। ইতিমধ্যে গ্রামের আরও দু-চারজন জুটিয়াছে। বাঘের গল্প হইতেছে—পাঠশালায় পড়িবার সময় একবার বাঁশের বাড়ি দিয়া ঘনশ্যাম মিত্তির একটা গোবাঘার সামনের দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিলেন—সেই সব অনেককালের কথা। গল্প ভাল জমিয়াছে, এমন সময় উহারা আসিল।

—কী আছে তোমার ওতে ?

—গ্রামোফোন—গান আছে, এক্‌টো আছে, সাহেব-মেমের হাসি—একেবারে যেন ঠিক সত্যি, ছাদ ফেটে যাবে মশাই।

বাঁড়ুজ্জে বলিলেন—তুমি আর নতুন কী শোনাবে বাপু। আমাদের এই গাঁয়ে যাত্রা বলো, আর ঢপ-কবি-বৈঠকি বলো, কোনও কিছু বাকি নেই। গেল-বারেও ঠাকুরবাড়ি যাত্রা হয়ে গেল—নীলকণ্ঠ দাসের দল। নীলকণ্ঠ দাসের নাম শোনোনি—হাকোবার নীলকণ্ঠ ?

রাম মিত্তির বলিলেন—সাহেব-মেম তো ইংরাজিতে হাসে। ও ইংরাজি-মিংরাজি আমরা কেউ বুঝতে পারব না। তবে গান-এক্‌টো—তা তুমি কি একলাই সব করো ? কিসের দল বললে তোমার ?

চোঙা হাতে লোকটি বলিল—গ্রামোফোন—কলের গান। আমি কিছু করব না মশাই, সব এই কল দিয়ে করাব। বলিয়া সে সঙ্গীর মাথার বাক্সটি দেখাইল।

প্রিয়নাথ থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিল। গ্রাম সুবাদে রাম মিত্তিরের ভাইপো বলিয়া তাহার সামনে তামাক খায় না। একটা শেষ টান মারিয়া একটু আগাইয়া হুঁকাটা অশ্বিনী শীলের হাতে দিয়া সে বলিল— তোমার ঐ বাক্স এক্‌টো করবে ? কাঠে কখনও কথা কয় ? মন্তোর-তন্তোর জানো নাকি ?

বামুনপাড়ার নিত্যঠাকরুন দিঘির ঘাটে স্নান করিয়া ঘড়া কাঁধে ঘটি হাতে সবেগে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পথের সকল অশুচিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কথাটা তাঁহার কানে গেল। মন্ত্র থামাইলেন না, কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃত্তান্তটা শুনিলেন।

এ-পাড়া ও-পাড়ায় অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া গেল—মিত্তিরবাড়ি এক আশ্চর্য কল আসিয়াছে, তাহা মানুষের মতো গান গায় ও এক্‌টো করে। খুকিরা এবং যেসব ছেলে পাঠশালায় যায় না, সকলেই ছুটিল। যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহারা অবশ্য এমন গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করিল না—তবু দেখিতে গেল।

চোঙাওয়ালা লোকটার নাম হরসিত—জাতে পরামানিক। উঠানে বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সে কিন্তু নিতান্তই নিস্পৃহভাবে তামাক খাইতেছে, এত যে লোক জমিয়াছে তাহার যেন নজরেই আসিতেছে না। চক্কোত্তিদের বুঁচি খানিক আগে আসিয়াছে। আঙুল দিয়া টেঁপিকে দেখাইয়া দিল, ঐ

সে কল। কিন্তু টেঁপিকে বোকা বুঝাইলেই হইল। ছোট চৌকা কাঠের বাক্স—উহাই নাকি আবার গান গায়, যাঃ।

হরসিত চোখ বুজিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে তামাকের ধোঁয়ায় পৌষ মাসের সকালবেলার মতো চারিদিকে নিবিড় কুয়াশা জমাইয়া তুলিল। এ যেন আরব্য উপন্যাসের সেই কলসির ভিতর হইতে দৈত্য বাহির হওয়া—কেবলই ধোঁয়া, ধোঁয়া—তার মধ্যে হরসিতের আবছা মূর্তি। এইবার বুঝি প্রচণ্ড লাফ দিয়া একটা অত্যদ্ভুত কিছু করিয়া বসিবে। কিন্তু সে তাহা কিছু না করিয়া সহসা হুঁকার ভুড়ভুড়ি থামাইল এবং চোখ খুলিয়া বলিল—তামাক যে ফ্যাকসা মশাই, গলায় সেঁকও লাগে না।

অমনি জন দুই ছুটিল কামারপাড়ায় যাদবের বাড়ি। সে গাঁজা খায়, তাহার কাছে গলা সেঁকিবার উপযুক্ত এক ছিলিম তামাক মিলিতে পারে।

সকলে রাম মিস্তিরকে ধরিয়া বসিল—তুমি কায়েতদের সমাজপতি, এ গান তোমাকে দিতে হবে। রাম মিস্তিরের হইয়া সকলে দর কষাকষি আরম্ভ করিল। টাকায় আটখানি করিয়া গান, দু টাকায় সতেরো খানা অবধি হইতে পাবে—তার বেশি নয়। এক্‌টোর দর অন্যত্র হইলে বেশি হইত, কিন্তু এতগুলি ভদ্রলোক যখন বলিতেছেন তখন তা আর কাজ নাই। মোটের উপর হরসিতের বিবেচনা আছে। এক টাকায় নয়খানি বফা হইল।

তখন পকেট হইতে একটা চকচকে গোলাকার বস্তু, হাতল, কাঁটার কৌটা প্রভৃতি বাহির করিয়া ধাঁ-ধাঁ করিয়া চৌকা বাক্সে হরসিত সেগুলি পরাইয়া ফেলিল, চোঙাটিও বাক্সের গায়ে বসাইল। তারপর গামছার পুঁটুলি খুলিয়া হাত-আয়না, চিরুনি ও কাপড় সরাইয়া বাহির করিল কালো কালো পাতলা পাথর—

কাহারও আর নিশ্বাস পড়ে না।

হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—বায়নার টাকা দিন। অগ্রিম দেবেন না, বলেন কী মশাই ? আমার সাহেববাড়িব কল—

থালায় করিয়া টাকাটি আসরের ঠিক মধ্যস্থলেই রাখা হইল, যে-যে পেলা দিতে চাহিবে, তাহাদের কাহারও যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয়। তারপর হরসিত কলের উপর একখানা পাথর বসাইয়া টিপিয়া দিল, আর পাথর চরকির মতো ঘুরিতে লাগিল। তারপর সেই ঘুরন্ত পাথরে যেই আর-একটা মাথা বসাইয়া দেওয়া, অমনি একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল তবলা, বেহালা, ইংরাজি-বাজনা, ঢোল, করতাল—বোধকরি পৃথিবীতে সুর-যন্ত্র যা কিছু আছে সবগুলিই।

ইতিমধ্যে হৈ হৈ করিয়া একপাল ছেলে আসিয়া পড়িল, এই উপলক্ষে পাঠশালার ছুটি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেরা আর কতটুকু গণ্ডগোল করিতে পারে ? কলের মধ্যে যেন এককুড়ি পাঠশালায় একত্রে সমস্বরে নামতা পাঠ হইতেছে। হাঁ—কল যে সাহেববাড়ির, তাহাতে সন্দেহ নাই। হরসিত বলিয়াছিল—ছাদ ফেটে যাবে, সেইটাই বুঝি সত্য-সত্য ঘটিয়া বসে।

কিন্তু এত যে গোলযোগ, পাথরখানা বদলাইয়া দিতেই চুপচাপ। ক্রমশ শোনা গেল, চোঙের ভিতর হইতে একলা গলায় গীত হইতেছে—ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা। একেবারে স্পষ্ট আর অবিকল মানুষের গলা। মানুষ দেখা যায় না, অথচ মানুষই গাহিতেছে।

মন্টুর অনেকক্ষণ হইতে মনে হইতেছিল, ঐ চোঙের ভিতর কাহারা বসিয়া বাজাইতেছে—ঠিক তাহার বুড়োদাদা যেমন দুলিয়া দুলিয়া তেহাই দিয়া থাকেন, তেমনি আবার তেহাই দেয়। এবারে গান শুনিয়া তাহার আর এক ফোঁটা সন্দেহ রহিল না।

চোঙের অধিবাসী সেই গায়ক ও বাদক-সম্প্রদায়কে দেখিতে ছেলেদের দল ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু কলের ভিতর হরসিত এমনি করিয়া দলসুদ্ধ পুরিয়া ফেলিয়াছে যে কাহাকেও দেখিবার জো নাই।

বুঁচি খুব কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া দূরে দাঁড়াইল। শঙ্কা হইল—ঐ কলওয়ালা কতলোককে তো পুরিয়াছে, যদি কাছে পাইয়া তাহাকেও পুরিয়া ফেলে—তখন ? কিন্তু টেঁপি বুঁচির চেয়ে দু-বছরের বড়, বুদ্ধিও বেশি। সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল—বাক্স তো এ্যাটুকুন মোটে, বড় বড় মানুষ কি করে থাকে ?

বাক্সর ও মানুষের আয়তনের তারতম্য হিসাব করিলে মনে ঐ প্রকার সন্দেহের উদয় হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন স্পষ্ট মানুষের গলা শোনা যাইতেছে তখন যেমন করিয়া এবং যত ঠাসাঠাসি করিয়াই হউক তাহারা তো আছে নিশ্চয়ই।

বাঁড়ুজ্জে ঠিক সামনে বসিয়াছেন। গান-বাজনার আসরে এই স্থানটি তাঁহার নিত্যকালের। বনকাপাসিতে কত মজলিস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ওস্তাদ তো একজন আসিল না যে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জের পায়ের ধূলা না লইয়া চলিয়া যাইতে পারিল।

আগাগোড়া সভাসুদ্ধ লোক বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে, কেবল রাম মিত্তির বলিলেন—গলায় মোটে দানা নেই, দেখছ বাঁড়ুজ্জে ? যতই হোক, টিনের চোঙ আর কাঠের বাক্স তো।

কে-একজন নেপথ্যে মন্তব্য করিল—সকাল বেলা এই খরচান্ত, মিত্তিব মশায়ের গায়ের জ্বালা কিছুতে মরছে না।

রাম মিত্তিরের সঙ্গে বাঁড়ুজ্জের মিতালি সেই নকুল গুরুর কাছে পড়িবার সময় হইতে। কলের গানের জন্য সকলে ধরিয়া পড়িয়া রাম মিত্তিরের একটা টাকা খরচ করাইয়া দিল, সেজন্য মন খারাপ আছে নিশ্চয়। কিন্তু বাঁড়ুজ্জের কেমন মনে হইল, রাম তাঁহাকে খোশামোদ কবিয়াই গানের নিন্দা করিতেছে —টাকার শোকে নহে।

প্রিয়নাথ বলিল— ও বাঁড়ুজ্জে মশায়, গান-বাজনায় চুল তো পাকালেন, কত গানই গেয়ে থাকেন, এমন সুর-লয় শুনেছেন কখনও ? নাপতের পো ডাকিনী-সিদ্ধ, অপ্সরী-কিন্নরী ধরে এনে গান গাওয়াচ্ছে যেন।

গানের পর গান চলিল। একটা গানের এক জায়গায় ভারী তানের প্যাঁচ মারিতেছিল। অশ্বিনী শীল অকস্মাৎ উচ্ছ্বাস ভরে বলিয়া উঠিল—কি কল বানায়েছে সাহেব কোম্পানি। দেবতা—দেবতা—বেহ্মা-বিষ্টুর চেয়ে ওরা কম কিসে ? বাঁড়ুজ্জে মশায়, আপনার সেতারের টুং-টাং আর রামপ্রসাদীগুলো এবার ছাড়ুন।

কলের বলবান রাগিণীর তলায় অশ্বিনীর গলা চাপা পড়িল, বাঁড়ুজ্জে তাহার সদুপদেশ শুনিতে পাইলেন না।

কিন্তু বাঁড়ুজ্জের আর কী আছে ঐ সেতারের টুং-টাং ছাড়া ? চকমিলানো পৈতৃক প্রকাণ্ড বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে—চামচিকার বসতি। সেখানে থাকিবার লোক তিনটি—মণ্টু, তার দিদিমা এবং তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জে স্বয়ং। নারানীও ছিল—সেই সকলের শেষ। সাত বছর আগে মণ্টুকে ছ মাসের এতটুকু রাখিয়া সেও ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। ছয় ছেলের মা বাঁড়ুজ্জে-গিন্নি একে একে সব কটিকে বিসর্জন দিয়া এই শেষের ধন মরা-মেয়ের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। পাড়ার সকলে আসিয়া আর সান্ত্বনা দিবার কথা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু বাঁড়ুজ্জের চোখে জল নাই। রাম মিত্তির কাঁদ-কাঁদ গলায় কহিলেন—বুক বাঁধো বাঁড়ুজ্জে, ভগবানের লীলা। তখন বাঁড়ুজ্জে স্ত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন—ঐ যে অবুঝ মেয়েমানুষ উঠোনের ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, ওকে গিয়ে তোমরা প্রবোধ দাও—আমার কাছে আসতে হবে না, ভাই। শুধু তিনি তাকের উপর হইতে সেতারটি নামাইয়া দিতে বলিলেন।· · ·

এতকাল বাদে কিনা অশ্বিনী শীল তাঁহাকে সেতার-বাজনা ছাড়িয়া দিতে বলিল।

এক-একটা গান হইয়া গেলে হরসিত কাঁটা বদলাইয়া আগের কাঁটা ফেলিয়া দিতেছিল। তাই

কুড়াইতে ছেলেমহলে কাড়াকাড়ি। একবার আর একটু হইলে মন্টু কলের উপর গিয়া পড়িত। হরসিত তাড়া দিয়া উঠিল। বাঁড়ুজ্জে মন্টুকে ডাক দিলেন—তুই দাদু, আমার কাছে আয়—এসে ঠাণ্ডা হয়ে বোস তো। নারানীর সেই ছ-মাসের মন্টু এখন কত বড় হইয়াছে।

কিন্তু মন্টু আসিল না, উহার অনেক কাজ। কাঁটা কুড়ানো তো আছেই, গানও লাগিতেছে বড় ভাল। তা ছাড়া চোঙের ভিতর বসিয়া যে গায়ক গাহিতেছে, তাহার মূর্তিদর্শন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবাব কারণ এখনও ঘটে নাই।

যখন ভাল কবিয়া বুলি ফুটে নাই, বাঁড়ুজ্জে তখন হইতেই মন্টুকে তবলার বোল শিখাইতে আরম্ভ করিযাছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় রাম মিত্তির প্রভৃতি দু-চারজন বাঁড়ুজ্জে-বাড়ি গিয়া বসেন। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিবাদলা এক একদিন এমন চাপিয়া পড়ে যে কেহ বাড়ির বাহির হইতে পারে না। না পারুক, তাহাতে এমন কিছু অসুবিধা ঘটে না। সেদিন মন্টুর সেতার-শিক্ষা আরও বিপুল উদ্যমে চলে। ভারী তাল কাটে, লজ্জা পাইয়া মণ্টু বলে—বুড়োদাদা, আজ আর হবে না, ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুম পাইলেই হইল ! লাউয়ের খোলের ভিতর হইতে সুর আদায় কবা সোজা কর্ম নয়।· · ·

অশ্বিনী শীল বনকাপাসির সুবিখ্যাত সংকীর্তনের দলে খোল বাজাইযা থাকে। উল্লসিত হইয়া পুনশ্চ সে বলিয়া উঠিল—আজই বাড়ি গিয়ে খোলের দল ছিঁড়ে খড়মে লাগাব। মরি, মরি—কী কীর্তনটাই গাইল রে। আমাদের গানের পরে আজ ঘেন্না হয়ে গেল।

রাম মিত্তির ক্ষীণ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—মন দিয়ে শুনেছ বাঁড়ুজ্জে ? অন্তরার দিকটায় তালে গোলমাল কবে গেল না ?

বলিয়াছিল বটে আমির খাঁ ওস্তাদ—বাঁড়ুজ্জিবাবুর কান ডালকুত্তার মাফিক। খাঁ সাহেব অনেক কায়দা করিয়াও বাঁড়ুজ্জের কানকে ফাঁকি দিতে পারে নাই, কারচুপিটুকু ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। দিল্লিওয়ালা আমিব খাঁ অবধি ভুল করিতে পারে, কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য কাঠের বাক্সের গানে একবিন্দু খুঁত ধরিবার জো নেই। বাম মিত্তিব তালেব কিছু বোঝেন না, তিনি ভুলের কথা বলিলেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বাঁড়ুজ্জে কি ভুল ধরিবেন ?

বিকালেও আব এক বাড়ি বায়না—কামারপাড়ায়। মন্টু শুনিতে গিয়াছে, বাঁড়ুজ্জের মাথাটা কেমন টিপ-টিপ করিতেছিল বলিয়া যাইতে পারেন নাই।· আধঘুমের মধ্যে বাঁড়ুজ্জের মনে হইল, কে যেন আসিয়া কপাল টিপিয়া দিতেছে আর ডাকিতেছে—বাবা ! মেজ ছেলে মানিকের গলা না ? দশ বছরেরটি হইয়াছিল। গোলাঘাটার বড় ইস্কুলে পড়িতে যাইত। কিন্তু মানিক নয়, মানিক গিয়াছে ঘুড়ি উড়াইতে— নারানী—নারানী। নারানী ডাকিতেছে—বাবা, বাঘ এয়েছে—খোকাকে ধরল যে। নারানী মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। · · · ঘরের মধ্যে বাঘ ? সেতারেব তাল কাটিয়া গেল। মারো সেতারের বাড়ি বাঘের মাথায়—মারো—মারো। মন্টুকে ছাড়িয়া বাঘ সেতার কামড়াইয়া ধরিল, তার ছিঁড়িল, চিবাইয়া চিবাইয়া আগাগোড়া একেবারে তছনছ। তা যাক, মন্টু কই ? —মন্টু, মন্টু ! বাঁড়ুজ্জে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—মন্টু !

মন্টু গান শুনিয়া ফিরিয়াছে। তাহার আর আনন্দ ধরিতেছিল না। বলিল—বুড়োদাদা, তুমি গান শুনলে না—আমরা শুনে এলাম, দুই টাকার গান। এবেলা আরও খাসা খাসা। তুমি অমনি ভাল করে গাও না কেন দাদা ?

বাঁড়ুজ্জে কহিলেন—ভাল গাই নে ?

মন্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। তুমি গাও ছাই—বুধোকাকারা বলেছে।

বাঁড়ুজ্জে একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর যেন কত বড় রসিকতার কথা—প্রবলবেগে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—জানিস নে ও মন্টু, জানিস নে—ও যে কোম্পানি বাহাদুরের কল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি ? গোটা জেলাটা জুড়ে ওদের রাজ্যি, আর আমি ব্রহ্মোত্তরের খাজনা

পাই মোটে একান্ন টাকা সাত আনা —

বলিতে বলিতে সেতারটা পাড়িয়া লইলেন।

মন্টু বলিল—সেতারে কত ঝঞ্ঝাট, কলের গান আপনাআপনি বাজে। আমাকে একটা কলের গান এনে দিতে হবে।

বাঁড়ুজ্জে বলিলেন—দেব, বুঝলি দাদু, কলের গান দেব আর সেই সঙ্গে কলের হাত-পা-নাক-চোখওয়ালা একটা নাতবউ—কী বলিস ?

বলিতে বলিতে গলাটা যেন বুজিয়া আসিল, তবু বলিতে লাগিলেন—ওস্তাদের কত গালাগালি খেয়েছি, সরস্বতী ঠাকরুনকে কত চিনির নৈবিদ্যি খাইয়েছি। এখন আর কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। তোরা যখন বড় হবি মন্টু, ততদিনে সরস্বতী দুর্গা কালী শালগ্রামটা পর্যন্ত কলের হয়ে যাবে। খুব কলের পুজো করিস।

সন্ধ্যা গড়াইয়া যায়। আজ বাঁড়ুজ্জে-বাড়ি কেহ আসে নাই। মন্টুও নাই। কেবল রাম মিস্তিরের খড়মের ঠকঠকি সিঁড়িতে শোনা গেল।

—কি বাঁড়ুজ্জে, একা একা খুব লাগিয়েছ যে। সুরটা পূরবী বুঝি ?

বাঁড়ুজ্জে তদ্গত হইয়া সেতার বাজাইতেছিলেন। বলিলেন—দোসর কোথায় পাই ভাই ? চাঁদা তুলে ঠাকুরবাড়িতে আবার কলের গান দিচ্ছে—মন্টু গেছে সেখানে। একা-একাই বাজাচ্ছি—কেমন লাগছে বলো তো ?

রাম মিস্তির বলিলেন—এখন রেখে দাও, এ-সব তো রোজ শুনব। চলো ঠাকুরবাড়ি যাওয়া যাক।

বাঁড়ুজ্জেকে লইয়া রাম মিস্তির ঠাকুরবাড়ির আসরে বসিলেন। হরসিতের কলে ইতিমধ্যে দু-খানি গান সারা হইয়া এক্‌টো শুরু হইয়াছে :

কি করিলি অবোধ বালিকা ?
সুধা ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান—

চেহারা তো দেখা যায় না, তবে হাঁ—গলা শুনিয়া একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে বক্তা ভীম, রাবণ বা অন্ততপক্ষে তস্য পুত্র মেঘনাদ না হইয়া যায় না।

বাঁড়ুজ্জে বলিলেন—তুমি বাপু, একখানা পূরবী বাজাও তো।

হরসিত ঘোরপ্যাঁচের মানুষ নয়, জবাব সোজা করিয়াই দিল—হুকুম-টুকুম চলবে না মশাই, যা বাজাই শুনে যান—আমার সাহেব-বাড়ির কল—

অতএব সাহেববাড়ির কলের যেরূপ অভিপ্রায় হইল, বনকাপাসির সমুদয় শ্রোতা তটস্থ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। ইহা আমির খাঁ ওস্তাদের মজলিস নয় যে ফরমায়েশ খাটিবে।

অকস্মাৎ—ঘটর্‌-ঘটর্‌-ঘ্যস্‌—। গান থামিয়া গেল। কলের কোথায় কী কাটিয়া গিয়াছে। এতগুলি শ্রোতা বিরসমুখে বসিয়া রহিল। যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া হরসিত কাঠের বাক্সটা খুলিয়া আলগা করিয়া ফেলিল।

কলের ভিতর মানুষ নাই, কেবল লোহালক্কড়।

হরসিত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু মেরামত হইল না। তখন থালা হইতে বায়নার টাকা ও পেলার পয়সা তুলিয়া লইয়া উপ্‌টাগাঁটে ভাল করিয়া গুঁজিয়া সে বলিল—রাত্তিরে আর নজর চলে না মশাই। সকালেই ঠিক করে বাকি গানগুলো শুনিয়ে দেব, কির্‌পা করে মশাইরা সকলে পদধূলি দেবেন।

ঠাকুরবাড়িতে গ্রামস্থ সকল মহাশয়েরই সকালে যথাসময়ে ভিড় হইল। কিন্তু হরসিত নাই, কলের গান নাই, এমন কী নেত্য ঠাকরুনের পিতলের ঘটিটিও নাই। জল খাইবার জন্য হরসিতকে ঘটিটি দেওয়া হইয়াছিল।

গল্পসংগ্রহ

প রা জ য়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নিজেই কল্পনা করে নিন :

কলকাতা শহরের বালিগঞ্জ অঞ্চলে তিনতলা বাড়ির একখানি ঘর। চমৎকার সাজানো। দরজা জানলার মাপ ক'ফুট ক'ইঞ্চি, ঘরে ক'খানি চেয়ার, কী রকম টেবিল, জানলায় কী রঙের পর্দা—সে-সব কথা নাই-বা লিখলাম।

গ্রীষ্মকাল। ইলেকট্রিকের পাখা নিশ্চয়ই ঘুরছে।

সবে সন্ধ্যা। আকাশ বা চন্দ্র সূর্যের খবর এরা রাখে না। রাখলে আমাকে লিখতে হত—পশ্চিম দিগন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত। সূর্যদেব অস্তমিত হলেন।

সে-সব বালাই যখন নেই, ধরে নিন—ঘরে আলো জ্বলছে।

একজন যুবক, একজন যুবতী। মুখোমুখি বসে। ঘরে আর-কাউকে দেখা যাচ্ছে না। না না—লজ্জার কিছু নেই। স্বামী আর স্ত্রী। বসে বসে চা খাচ্ছে।

গল্পটা আরম্ভ হয়েছিল ভাল। কথা কইলেই নাটক জমে উঠত।

কিন্তু কোথাকার কে-এক অরসিক—দিল রসভঙ্গ করে।

খোলা দরজায় পর্দা ঝুলছিল। পর্দার ও-পার থেকে বলে উঠল : May I come in ?

পুরুষ মানুষের গলার আওয়াজ।

চায়ের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে যুবতী উঠে দাঁড়াল। চট্ করে একবার আড়চোখে দোরের দিকে তাকিয়ে, পাশের দরজা দিয়ে ও-ঘরে চলে গেল।

'May I come in' বলে আগন্তুকের উচিত ছিল জবারের জন্য অপেক্ষা করা। কিন্তু তা সে করলে না। সটান্ ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

ঢুকেই বললে, চিনতে পারো শিশির ?

তাহ'লে যুবতীর স্বামীর নাম শিশির।

শিশির বললে, বাঃ বেশ মানুষ যা হোক্। তোমার সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়।

—বলো না।

বলেই সে চেপে বসল। বসেই বললে, কথা বলবে না ? কিন্তু চা এক পেয়ালা নিশ্চয়ই দেবে।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য পেতে পারো। মতি! মতি!

মতি চাকরের নাম।

বাইরে থেকে মতি বললে, জি, হুজুর।

—এক কাপ চা দিয়ে যা বাবা এখানে।

—যে-আজ্ঞে।

কথা কইবে না বলেও, কথা না বলে থাকতে পারলে না শিশির। বললে, তুমি আমাকে অত্যন্ত বিপদে ফেলেছিলে সমর।

আগন্তুকের নাম সমর। বললে, বিপদে ফেলেছিলাম ? আমি ?

শিশির বললে, হ্যাঁ তুমি। কাউকে কিছু না বলে তো পালালে বাড়ি থেকে। তোমার মা ডেকে পাঠালেন আমাকে। তিনি জানেন আমি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমি নিশ্চয়ই জানি তোমার খবর। ভেবে দ্যাখো আমার তখন কী রকম অবস্থা। না পারি দাঁড়িয়ে থাকতে, না পারি পালাতে।

সমর বললে, কি করলে ?

শিশির বললে, মার দু'চোখ তখন জলে ভরে এসেছে। আমি সেদিকে তাকাতে পারছি না, হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় তোমার বোন অনিলা বললে, দাদার সঙ্গে কিন্তু টাকা আছে—দশ হাজার। ছোট একটা ব্যাঙ্কে মা'র ওই টাকাটা ছিল, দাদাই ভুলিয়ে ভালিয়ে বড় ব্যাঙ্কে রেখে দেবে বলে মাকে দিয়ে একটা চেক্ লিখিয়ে নিয়েছিল। তারপর বুঝতেই পারছ—। বললাম, তবে আর ভাবছিস কেন ? সে বিলেত চলে গেছে। ঠিক তাই। পরের দিন তোমাদের বাড়ি গিয়ে শুনলাম, তোমার টেলিগ্রাম এসেছে। টেলিগ্রামটা দেখলাম। তবু ভাল যে শেষের লাইনে লিখেছিলে, খবরটা শিশিরকে জানিয়ে দিও। তারপর এই সুদীর্ঘ—

সমর বললে, তিন বৎসর।

শিশির বললে, তিন বৎসর পরে এই তোমার প্রথম আবির্ভাব।

মতি চা আনলে।

শিশির বললে, তোমার মাকে বলো, আজ ইনি এইখানে খাবেন, এইখানে থাকবেন।

সমর বললে, খেতে হবে, থাকতেও হবে ?

—নিশ্চয়। এতদিন পরে দেখা।

মতি বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

এইবার শিশির জিজ্ঞাসা করলে, একা ফিরলে, না কোনও সুন্দরী বিদেশিনীকে এনেছ সঙ্গে ?

সমর বললে, না। তখনও একাকী, এখনও একাকী। আচ্ছা দ্যাখো, আমি যখন এলাম, মনে হল একটি মেয়ে বসেছিল তোমার পাশে, তিনি কি—

শিশির বললে, পরনারী ন'ন্—সহধর্মিনী। নীলিমা।

সমর বললে, আমি বিলেত যাবার কিছুদিন আগে সেই যে-মেয়েটিকে তুমি একবার দেখেই পছন্দ করেছিলে, এ কি সেই—

শিশির বললে, হ্যাঁ, ইনিই তিনি। তুমি চলে গেলে, আমি বিয়ে করলাম। আজ তিন বছর হল। কিন্তু সত্যি বলতে কী ভাই, এই তিন বছরের ভেতর একটি দিনের জন্যও আমাদের—ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়নি।

সমর বললে, চমৎকার। লাভ-ম্যারেজ। কিন্তু এটা খুব ভাল লক্ষণ নয় শিশির, বৈচিত্র্যহীন নিতান্ত একঘেয়ে জীবন। আমি হ'লে এতদিন হয়তো মারামারি কাটাকাটি— শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়িও হয়ে যেতে পারত।

শিশির বললে, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার কি এখনও সেই ধারণাই আছে নাকি সমর ?

সমর বললে, কোন্ ধারণা ?

শিশির বললে, সেই যে বিলেতে যাবার কিছুদিন আগে থেকে তুমি বলতে আরম্ভ করলে—মেয়েরা তোমার দু'চক্ষের বিষ। তাদের তুমি ঘৃণা করো।

সমর বললে, নিশ্চয়। সে ধারণা আমার কোনদিন যাবে না। তোমরাই দিয়েছ মেয়েদের মাথাটি

খেয়ে। নিজেদের প্রয়োজনে তোমরা ওদের খোশামুদি করেছ, পুজো করেছ, পায়ে ধরেছ, মাথায় তুলেছ—দেবী বলেছ, লক্ষ্মী বলেছ। ওরা তার সুযোগ গ্রহণ করেছে।

শিশির বললে, এ-মত তোমার ইংলণ্ড আমেরিকা গিয়েও বদলাল না ?

সমর বললে, না বদলায়নি, বরং বেড়েছে। আমাদের দেশে ওরা ওদের দীনতা ঢেকে ঘোমটা টেনে অন্দর মহলে বসে থাকে, আর ওদেব দেশে ওরা জানে কতটুকু ওদের দাম আর কী তাদের প্রয়োজন। তাই তারা তাদের সমগ্র দেহটিকে বেশে-বিন্যাসে সব সময়েই অনাবৃত করে পুরুষের চোখের সামনে তুলে ধরে রাখে। সোনালি রঙে ছাপা ঠিক যেন ইনভিটেশন কার্ড। ওরা জানে যে ওবা সেক্স্ ছাড়া আর কিছুই নয়। Vulgar sex!

নাটক আরম্ভ হয়ে গেছে।

ভেজানো দরজায় দুটো কপাটের মাঝখানে একটু ফাঁক ছিল। এবার সে ফাঁক যেন আরও একটু বাড়ল। আর সেই ফাঁকের ওধারে এক যুবতী নারীর একজোড়া চোখ, আর একজোড়া কান।

শিশির বললে, আমাদের দেশ কিন্তু তা নয় সমর। Sex ছাড়াও মেয়েদের যে আব-একটা পৃথক সত্তা আছে—

সমর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বললে, আরে থামো। তোমার ও স্তুতিবাদ আমি শুনতে চাই না। মেয়েদের হাবভাব দেখলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায। ঘৃণায় আমার সর্ব শবীর রি রি করতে থাকে। ওবা, স্বার্থের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। তুমি যদি যেতে একবার বিলেতে, তাহলে তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতাম—নারীর সত্যিকারের রূপ। বহু বিচিত্র বর্ণে চিত্র-বিচিত্রিত মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপ।

পাশেব দরজায় বেশ জোব শব্দ হলো। শিশির ও সমর দু'জনেই সচকিত হয়ে সেইদিকে তাকালে।

শিশির চুপিচুপি বললে, সব শুনেছে।

সমর বললে, শুনবেনই তো।

বেশ জোরে জোরে মনে হল যেন অন্তরালবর্তিনীকে শুনিয়ে শুনিয়েই সে আবার বললে, আড়ি পেতে শোনাই তো ওদের স্বভাব।

শিশির যেন ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। বললে, আঃ, আস্তে।

সমর বললে, আমার স্বভাবটা ঠিক তার উল্‌টো। কাজেই আস্তে বলা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।—আর এক পেয়ালা চা দিতে বলো দেখি।

শিশির ডাকলে, মতি। মতি।

যে দরজায় শব্দ হয়েছিল, সেই দরজা খুলেই মতি এল।

শিশির বললে, বাবুর জন্যে আর এক কাপ চা আনো। বাবু রাত্রে এখানে থাকবেন, সেকথা বলেছ তো ?

মতি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছি।

মতি চলে যেতেই সমর বললে, তোমার স্ত্রী আমার কথাগুলো শুনেছেন কি না এইবার বুঝতে পারা যাবে। একটু অপেক্ষা করো।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে সমর বললে, সিগারেট তুমি এখনও খাও না ?

শিশির বললে, না।

নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে বললে, বিয়ের পর সিগারেটটা ধরলেই পারতে।

শিশির একটু হাসল।

মতি ঘরে ঢুকল। বললে, মা বললেন, চা হবে না। দোকান থেকে চা আনিয়ে খেতে বলো। আর বললেন, মাসিমার বাড়ি যাবার কথা কি ভুলে গেছেন ?

সমর মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে মুখ থেকে। তারপর সেই কুণ্ডলীপাকানো সাদা ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, হল তো ? শুনলে ?

এতক্ষণ পরে নাটক বোধ হয় জমল।

শিশির একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

নীলিমা যে এরকম কথা বলতে পারে তা সে ভাবেনি। বললে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, মতি কী বলতে কী শুনেছে—

সমর বললে, মতি ঠিকই শুনেছে শিশির।

শিশির বললে, না না, তাহলে ও তোমার সঙ্গে একটু রসিকতা কবেছে। আর ওই যে মাসিমাব কথা বললে, ওটা সত্যি। আজ আমাব এক শালীর ছেলের অন্নপ্রাশন। আমাদের সেখানে যাবার কথা ছিল।

সমর বললে, আজ আমি উঠি তাহলে। তোমরা যাও।

শিশির বললে, পাগল হয়েছ ? এতদিন পবে তোমার সঙ্গে দেখা। আজ আমি তোমাকে ছাড়ব না। দাঁড়াও আসছি।

শিশির বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

মতি চলে যাচ্ছিল তার পিছু পিছু, সমর ডাকলে, শোনো ! মতি !

মতি ফিরে এল।

সমর : এখানে তুমি কতদিন চাকরি কবছ ?

মতি : বছর খানেক হবে বাবু।

সমর : এ বাড়িতে কে রান্না করে ? তোমার মা-ঠাকরুণ, না, ঠাকুর আছে ?

মতি : ঠাকুর আছে বাবু। তবে ভাল রান্না করতে হলে মা নিজে বান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেন।

সমর : (পকেট থেকে পয়সা বের করে) এই নাও বাবা, কাছাকাছি কোনও দোকান থেকে এক পেয়ালা চা আনো চট্ করে।

পয়সা নিয়ে মতি চলে গেল। সমর সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরালে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলি দেখতে লাগল। হঠাৎ যে-ছবিটার কাছে গিয়ে একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে রইল, এমন কী হাতের সিগারেটটা টানতে পর্যন্ত ভুলে গেল, সে ছবিটি নীলিমা দেবীর।

ঘরে ঢুকল শিশির । সঙ্গে নীলিমা।

শিশির বললে, ওদিকে কী দেখছ ? এইদিকে তাকাও দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিই।

সমর ফিরে দাঁড়াল। বললে, পরিচয় আমাদের হয়ে গেছে। অতিথিকে যখনই উনি দোকান থেকে চা আনিয়ে খেতে বলেছেন, ওঁর পরিচয় আমি তখনই পেয়ে গেছি।

নীলিমা : ওঁর পরিচয়ও আমি পেয়েছি। যার বাড়িতে এসেছেন তাকেই যিনি স্বার্থপর, নীচ, ইতর বলতে পারেন তাঁর আর নতুন করে পরিচয়ের দরকার হয় না।

সমর এগিয়ে এসে একটা সোফায় চেপে বসল। বললে, দেখুন, এই 'ইতর' বিশেষণটা আমার মনে ছিল না। ওটা যে আপনি নিজেই প্রয়োগ করলেন, তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শিশির : আরে, তোমরা দু'জনে ঝগড়া শুরু করলে যে।

সমর : ওঁদের সঙ্গে তো আমার ঝগড়ার সম্পর্ক। মেয়েদের সঙ্গে চিরকাল ঝগড়া করেছি, আজও করব।

মতি দোকান থেকে চা এনে পেয়ালাটি সমরের হাতের কাছে নামিয়ে দিলে।

নীলিমা ঃ চা কি দোকান থেকেই এল ?

সমর ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়িতে যার সব থেকেও কিছু থাকে না, বাইরের আশ্রয় তাকে নিতেই হয়।

নীলিমা ঃ আপনার হেঁয়ালি বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। (শিশিরকে) দিদিব বাড়ি যাবার কী হবে ?

শিশির ঃ তুমি গেলে আজ আর ফিরতে পারবে না।

নীলিমা ঃ কেন ?

শিশির ঃ কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। তার চেয়ে গাড়িটা নিয়ে আমি নিজেই একবার চট্ করে ঘুরে আসি।

নীলিমা ঃ আর আমি ?

শিশির ঃ তোমরা ততক্ষণ ঝগড়া করো। বোস সমর, আমি যাব আব আসব। এসে যেন আমাকে পুলিশ না ডাকতে হয়।

সমর ঃ আমাকে তুমি শত্রুপুরীতে রেখে যাচ্ছ শিশির মনে থাকে যেন।

শিশির ঃ শত্রুপক্ষ অবলা। পরাজয়েব আশঙ্কা কম। এই বলে শিশিব সত্যিই চলে গেল।

সমর ঃ (নীলিমাকে) শুনলেন ?

নীলিমা ঃ শুনেছি।

সমর ঃ এবার তা'হলে যুদ্ধং দেহি।

নীলিমা ঃ জিততে পারবেন ?

সমর ঃ নিশ্চয়ই পারব।

নীলিমা ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নারী পুরুষকে হারিয়ে দিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে আছে।

সমর ঃ আছে। কদাচিৎ। খুব কম। তার চেয়ে যা সর্ববাদিসম্মত তা হচ্ছে এই যে সৃষ্টির আদিকাল থেকে নারী পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করেছে। প্রকৃতির এই নিয়ম।

নীলিমা ঃ ভুল ব্যাখ্যা করেছেন আপনারা। বন্ধুত্বের নাম দিয়েছেন বশ্যতা। তাই নারী আপনাদের বন্ধু না হয়ে দাসী।

সমর ঃ দাসী না করে নারীকে যে-দেশ বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছে সে দেশও আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম।

নীলিমা ঃ কী দেখলেন ?

সমর ঃ দেখলাম আজ যে বন্ধু, কাল সেই হয়েছে পরম শত্রু। গৃহ সেখানে একরকম নেই বললেই হয়।

নীলিমা ঃ গৃহ কি আপনাদের এখানে আছে ?

সমর ঃ নিশ্চয়ই আছে। রাখলেই আছে। আসল কথাটা কি জানেন ?

নীলিমা ঃ জানালে বাধিত হব।

সমর ঃ আপনারা প্রচার করে এসেছেন যে ছন্নছাড়া পুরুষদের নিয়ে ঘর বাঁধাই নাকি আপনাদের সহজাত কামনা এবং সাধনাও। কিন্তু—

নীলিমা ঃ থামলেন কেন ?

সমর ঃ আসল কথাটা ঠিক উলটো। ঘর ভাঙাই আপনাদের খেলা। নেশাও।

নীলিমা ঃ সব মেয়েই কি তাই ?

সমর ঃ হ্যাঁ। অন্তত আমার কাছে।

নীলিমা ঃ মিস্টার চৌধুরী।

সমর ঃ মিসেস্ সেন। আমার দোষ নেই মিসেস্ সেন। শুনতে আপনিই চেয়েছিলেন। সত্যি কথা সব সময় মিষ্টি শোনায় না। তবু ক্ষমা চাইছি।

নীলিমা ঃ আমিও।

সমর ঃ গৃহ এখানে নেই বললে শুনব কেন ? এই চমৎকার গৃহ।

নীলিমা ঃ থাক আর জখমের ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে না।

সমর ঃ না, অত দয়ামায়া আমার নেই। আপনারা দু'জন—বিয়ের আগে দু'জনকে ভালবেসেছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, তারপর এই তো বেশ দুটিতে—কী বলব ? ভাল বাংলা করে বলতে হলে বলতে হয়—পরমানন্দে একটি সুখনীড় রচনা করেছেন।

নীলিমা ঃ থাক্ আর কবিত্ব করবেন না। বিয়ের আগে, কে বললে আপনার বন্ধুকে আমি চিঠিপত্র লিখতাম ?

সমর ঃ আমার বন্ধু আমাকে সে চিঠি দেখিয়েছে।

নীলিমা ঃ তা তো দেখাবেই। পুরুষেরা বিশ্বাসঘাতক।

সমর ঃ আবার উল্টো কথা বলছেন।

নীলিমা ঃ শুধু বিশ্বাসঘাতক নয়—ভণ্ড। এই যে আপনি নিজেকে নারীবিদ্বেষী বলে প্রচার করেন, ওটা আপনার মনের কথা নয়।

সমর ঃ প্রচার করি ? আমি ভণ্ড ?

নীলিমা ঃ হ্যাঁ।

সমর ঃ চোখে এখন আপনার রঙিন চশমা। ভুল দেখছেন। নিজের মতন দেখছেন হয়তো।

নীলিমা ঃ মিস্টার চৌধুরী, আপনি ভুলে যাচ্ছেন—

সমর ঃ কী ? কী ভুলে যাচ্ছি ?

নীলিমা ঃ না থাক্। আমি আসছি।

সমর ঃ যুদ্ধ আরম্ভ হতেই শত্রুর পলায়ন। মতি ! মতি !

মতি ঃ যাই হুজুর।

সমর ঃ মতি, বাবা, আর এক পেয়ালা চা। এই নাও পয়সা।

মতি ঃ যে-আজ্ঞে।

নীলিমা ঃ মতি।

মতি ঃ আপনি ডাকছেন মা ?

নীলিমা ঃ হ্যাঁ। কোথায় যাচ্ছ ?

মতি ঃ বাবুর চা আনতে।

নীলিমা ঃ না। তোমার ও-বাবু এখন চা খাবেন না। পয়সা রাখো।

মতি ঃ যে-আজ্ঞে।

সমর ঃ কিন্তু চা আমি খাবই।

নীলিমা ঃ না।

সমর ঃ হুকুম ?

নীলিমা ঃ হ্যাঁ।

সমর ঃ মানি না আমি কারও হুকুম। চা আমাকে খেতেই হবে।

নীলিমা ঃ খুব বীরপুরুষ। চাকরের সামনে অপমানটা আর নাই-বা করলেন। মতি ! যাও তুমি। ওঁর খাবার হয়ে গেছে।

সমর ঃ খাবার ? কার ?

নীলিমা ঃ আপনার।

সমর ঃ আমি খাব না।

নীলিমা ঃ দোকান থেকে চা আনতে বলেছিলাম বলে ?

সমর ঃ আরও অনেককিছু বলেছেন।

নীলিমা ঃ তবু খেতে হবে।

সমর ঃ না।

নীলিমা ঃ হ্যাঁ।

সমর উঠে দাঁড়াল। চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বললে, শিশিরকে বলবেন কাল যেন সে আমার বাড়ি যায়। চললাম।

নীলিমা ঃ (এগিয়ে গিয়ে) মিস্টার চৌধুরী।

সমর ঃ না।

নীলিমা ঃ (পথ আগলে) এভাবে যেতে আপনি পারবেন না।

সমর ঃ আমি যাবই।

নীলিমা ঃ যেতে আমি দেব না।

সমর ঃ দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ান মিসেস্ সেন।

নীলিমা ঃ আপনাকে খেয়ে যেতেই হবে।

সমর ঃ না। মেয়েদের অপমান সহ্য করা আমার স্বভাব নয়।

নীলিমা ঃ আমি আপনাকে অপমান করেছি ?

সমর ঃ নিশ্চয় করেছেন।

নীলিমা ঃ তার জন্য ক্ষমা চাইছি। যাবেন না।

সমর ঃ যেতে দেবেন না ?

নীলিমা ঃ না।

সমর ঃ কেন আমাকে ধরে রাখছেন বলুন তো ?

নীলিমা ঃ আমার খুশি।

সমর ঃ আপনি আমার বন্ধুর স্ত্রী। তা না হলে আপনাকে আমি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চলে যেতাম।

নীলিমা ঃ যেতে হলে আমাকেও ঠেলে ফেলে দিয়েই যেতে হবে।

সমর ঃ ওঃ, আচ্ছা, আপনিই জয়ী হলেন।

নীলিমা ঃ চলুন তাহলে। বসুন।

সমর ঃ একটি মেয়ের কাছে জীবনে এই আমার প্রথম পরাজয়।

নীলিমা ঃ পরাজিত শত্রুর জন্যে এবার তাহলে খাবার আনি।

সমর ঃ তার আগে চট্ করে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই।

নীলিমা ঃ করুন বন্দী রাজাধিরাজ।

সমর ঃ আপনি কি শিশিরকে সুখী করতে পেরেছেন ?

নীলিমা ঃ বেয়াদবি প্রশ্ন। তবু জবাব দিতে হবে। অন্যের মনের কথা আমি জানি না।

সমর ঃ বেশ তবে নিজের মনের কথাই বলুন। শিশিরকে পেয়ে আপনি সুখী হয়েছেন ?

নীলিমা ঃ তা জেনে আপনার লাভ ?

সমর ঃ লাভ না থাক, লোকসানও নেই।

নীলিমা ঃ অনধিকার চর্চা করবেন না। জবাব দেব না। মতি ! মতি !

মতি ঃ যাই মা।

নীলিমা : বাবুর খাবার দিয়ে যেতে বলো।

মতি : খাবার নিয়ে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে মা। কোথায় দেবে ?

নীলিমা : এই যে এই সামনেই টেবিলে দাও। হ্যাঁ, ওইখানে। উনি বিলেত-ফেরত মানুষ, টেবিলে খাওয়াই অভ্যেস। বসুন।

সমর : শেষ পর্যন্ত বসাবেন।

নীলিমা : আর কত খোশামুদি করব ?

সমর : বেশ তাহলে আরম্ভ করি। কিন্তু দেখুন, ওদেশে কিন্তু এ নিয়ম নেই।

নীলিমা : কী নিয়ম ?

সমর : একজন খাবে, আর একজন বসে বসে খাওয়া দেখবে, এ চলে না। একসঙ্গে বসে খেতে হয়।

নীলিমা : খাওয়ার চেয়ে খাইয়ে আমরা বেশি আনন্দ পাই। ও দেশের মেয়েরা সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত। যাক্‌গে সে কথা। একটা কথা মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করব ?

সমর : করুন।

নীলিমা : বিয়ে কি আপনি করবেন না ভেবেছেন ?

সমর : যদি বলি করব না।

নীলিমা : কোনও মেয়ে কি আপনাকে প্রতারণা করেছে ?

সমর : করেছে।

নীলিমা : এমন মেয়ে খুঁজলে পাবেন যে আপনাকে ভালবাসবে।

সমর : কি হবে মেয়েদের ভালবাসা পেয়ে ?

নীলিমা : ও-বস্তু থেকে যিনি বঞ্চিত, তাঁকে বোঝাব কেমন করে ?

সমর : তবে আর মিছে কষ্ট নাই-বা করলেন ?

নীলিমা : এইটুকু বলতে পারি—কোনও মেয়ের ভালবাসা পেলে আপনার চোখে পৃথিবীর রং যাবে বদলে। বেঁচে থেকে আনন্দ পাবেন।

সমর : সে আনন্দ আপনি কোনদিন পেয়েছেন ? না, কল্পনায় স্বর্গ রচনা করেছেন ?

নীলিমা : সব কথাতেই আমাকে টানছেন কেন ?

সমর : যদি আঁকড়ে ধরে কূলে উঠতে পারি—এই আশায়

(শিশির ফিরে এল)

শিশির : এই যে দেখছি বেশ জমিয়েছ তোমরা।

সমর : এরকম জানলে স্ত্রীকে একা রেখে যেতে না নিশ্চয়ই।

শিশির : না, তা নয়। যেরকম মধুর আপ্যায়নে তোমাদের পরিচয় পর্ব শুরু হল, ভেবেছিলাম ফিরে এসে পুলিশ ডাকতে হবে। তা—মিটল কেমন করে ?

নীলিমা : হাতে পায়ে ধরে।

শিশির : কে ধরলে ?

সমর : যদি বলি — আমি।

শিশির : বিশ্বাস করব না।

নীলিমা : ও কী ? খাওয়া হয়ে গেল।

সমর : হ্যাঁ।

শিশির : মতি ! যাও, বাবুকে বেসিনটা দেখিয়ে দাও গে।

সমর : হ্যাঁ বাবা, চল্। (চলে গেল)

শিশির : রাত্রে সমরকে থাকতে বলেছি, কোন্ ঘরে ব্যবস্থা করবে ?

নীলিমা : কোনও ঘরেই না।

শিশির : তার মানে ?

নীলিমা : মানে অত্যন্ত সোজা। আমি চাই না উনি রাত্রে এখানে থাকেন।

শিশির : কথাটা আমি বলব কেমন করে ?

নীলিমা : সে ভার আমার। তুমি যেমন অনুরোধ করবার তেমনি করবে।

সমর : দারুণ খাওয়া হয়ে গেছে। গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ। এবার একটু শোয়ার জায়গা পেলেই হয়।

শিশির : কোন্ ঘরে ব্যবস্থা কবরে ?

সমর : দূরে ঠেলে দিও না। ইংলণ্ড-আমেরিকার অনেক মজার মজার গল্প আছে। মিসেস্ সেনকে তা থেকে বঞ্চিত কোরো না।

নীলিমা : মতি ! ড্রাইভারকে খাইয়ে দে বাবা।

শিশির : তোমার দিদি তাকে খাইয়ে দিয়েছে।

নীলিমা : বেশ তাহলে গাড়িটা বের কবতে বলো।

শিশির : এখন গাড়ি কী হবে ?

নীলিমা : আমি বেরুব।

শিশির : কোথায় ?

নীলিমা : মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে।

সমর : আমার সঙ্গে ?

নীলিমা : হ্যাঁ, আপনাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসব আর আপনার বাড়িটা চিনে আসব।

সমর : বুঝেছি। বেশ তাহলে ওঠা যাক্।

নীলিমা : হ্যাঁ, উঠুন। (শিশিরকে) তুমিও আসতে পারো আমাদের সঙ্গে।

শিশির : তাহলে সত্যিই তুমি যাবে ?

নীলিমা : মিথ্যা বলছি না।

সমর : তুমিও এসো শিশির, মেয়েদের অতটা বিশ্বাস কোরো না।

নীলিমা : বিশ্বাস না করে আপনার বন্ধুর বোধ হয় আর উপায় নেই মিস্টার চৌধুরী।

(তিনজনেই এল গাড়ির কাছে। ড্রাইভার দাঁড়িয়ে ছিল)

নীলিমা : ড্রাইভার, তুমি থাকো বাড়িতে। (শিশিরকে) তুমি গাড়ি চালাও। আমরা দু'জনেই পেছনে বসব।

সমর : পেছনে বসব ? শিশির ড্রাইভারের মতো একা ড্রাইভ্ করবে ?

নীলিমা : হ্যাঁ। সেজন্যে আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই। বসুন।

(গাড়ি চালাচ্ছে শিশির। চৌরঙ্গীর ওপর গাড়ি গেল বন্ধ হয়ে। চালাবার অনেক চেষ্টা করলে। গাড়ি থেকে নেমে বনেট্ তুলে অনেকক্ষণ ধরে কী সব করলে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।)

নীলিমা : তেল আছে তো গাড়িতে ?

শিশির : আছে।

নীলিমা : তাহলে এখন উপায় ?

সমর : একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।

নীলিমা : তা যাবেন বৈকি। আমাদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে যেতে পারবেন ?

সমর : সরি। সে-কথা ভাবিনি। আপদ বিদেয় করতে চাচ্ছিলেন কিনা, তাই যত তাড়াতাড়ি পারি নিজেই বিদায় হয়ে যাচ্ছিলাম।

নীলিমা : চাইলে কী হবে, man proposes, God disposes ! নিন্ ডাকুন ট্যাক্সি। আপদ বাড়িতেই চলুক্। সেই ট্যাক্সিতেই ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিই।

শিশির : সেই ভাল। তোমরা বাড়িতেই ফিরে যাও। মেয়েদের কথা আবার শোনে।

সমর : খুব দেরিতে বুঝলে। এই ট্যাক্সি। দাঁড়াও। (ট্যাক্সি দাঁড়াল। নীলিমা আর সমর চড়ে বসল। শিশির রইল গাড়ি আগলে বসে।)

(শিশিরের বাড়ি)

নীলিমা : (গাড়ি থেকে নেমে) মতি ! ড্রাইভারকে এই গাড়িতে পাঠিয়ে দাও। গাড়ি খারাপ হয়ে পড়ে আছে চৌরঙ্গীতে।

ড্রাইভার : (তাড়াতাড়ি এসে) বাবু কি—

নীলিমা : হ্যাঁ, বাবু তোমার গাড়ি আগ্‌লে বসে আছেন। নামুন মিস্টার চৌধুরী।

সমর : আমি আর কী জন্যে নামব ? এই গাড়িতেই আমি চলে যাই।

নীলিমা : না। আপনাকে নামতে হবে। ড্রাইভার, এই নাও, এই দশটা টাকা তোমার কাছে রাখো। যদি ওখানে দরকার হয়।

ড্রাইভার : কিছু দরকার হবে না মা। এ্যাক্সিলেটারের তারটা ছিঁড়ে গেছে। ওটা কাল একবাব ছিঁড়েছিল। আমি গিয়েই ঠিক করে দিচ্ছি।

নীলিমা : ট্যাক্সির ভাড়া দিতে হবে তো। রাখো নোটখানা। আসুন মিস্টার চৌধুরী।

(সমর নামল গাড়ি থেকে। নীলিমার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিলে।)

নীলিমা : আমি তাড়াবার চেষ্টা করলে কী হবে। রাত্রিবাস আজ এখানে আপনাকে করতে হল।

সমর : আপনি কি ভয় পেয়ে আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করছিলেন ?

নীলিমা : না। অপরাধ যে করেনি, তার আবার ভয় কিসের ?

সমর : তবে ?

নীলিমা : পুরানো কথা উঠুক্ সেটা আমি চাই না। বসুন। আসছি।

সমর : নীলা। নীলা।

নীলিমা : (ফিরে দাঁড়িয়ে) কে নীলা ?

সমর : চেনো না নীলাকে ?

নীলিমা : না। নীলা মরে গেছে। আমি নীলিমা।

সমর : আমি কিন্তু চিনতাম ওই নামের একটি মেয়েকে।

নীলিমা : চিনতেন চিনতেন—তাতে আমার কী ? যে চলে গেছে, যে মরে গেছে তাকে মনে রেখে আপনারই বা কী লাভ ? ভুলে যান তাকে। মুছে ফেলুন মন থেকে।

সমর : ভুলে যাওয়া এতই সোজা ? ভুলে যাওয়ার মতো কাজ সে করেনি।

নীলিমা : কী করেছিল সে ?

সমর : তাই তো বলছি। শুনুন। প্লিজ।

নীলিমা : বলুন। শুনছি।

সমর : নীলাকে ভালবাসত একটি ছেলে। প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। ঠিক হল তারা বিয়ে করবে। ছেলেটির মা কিন্তু এ বিয়েতে রাজি ছিল না। ছেলেটির বাবা নেই। সমস্ত সম্পত্তি আর টাকাকড়ি তার মার হাতে। মার অমতে যদি সে বিয়ে করে, মা বললে, কিছুই সে পাবে না। ছেলেটি তখন কী ঠিক করলে জানেন ?

নীলিমা : কী ঠিক করলে ?

সমর : নাটক-নভেলের নায়ক-নায়িকারা যা করে থাকে। নাই-বা পেলে ঘরে ঠাঁই। বিয়ে তারা

করবেই।

নীলিমা ঃ তারপর ?

সমর ঃ ছেলেটির ইচ্ছে ছিল সে বড় হবে, ইয়োরোপ যাবে পড়তে। নীলার প্রেমের জন্য সব কিছু বিসর্জন দিয়ে দিন-কয়েকের জন্যে সে দিল্লি গেল সরকাবি একটি চাকরির খোঁজ পেয়ে। ঠিক রইল ফিরে এসেই বিয়ে করবে। ফিরে সে এল। দেখা কবলে নীলার সঙ্গে। বললে, আমি এসেছি নীলা। নীলা জিজ্ঞাসা করলে, পেয়েছ সে চাকরিটা ? 'না' কথাটা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল, তবু সে সত্য কথাই বললে। বললে, তুমি ভেবো না নীলা, চাকরি একটা পাবই। নাই-বা হল মোটা মাইনে। আমরা মোটে দুটি প্রাণী। অভাব অভিযোগ আমাদের ভালবাসা দিয়ে—। কথাটা নীলা তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, আমি দু'দিন ভেবে দেখি। ভেবে কী দেখবে নীলা ? পরশু আমবা বিয়ে করব। নীলা বললে, না, এ হয় না। কী হয় না ? বিয়ে ? নীলা বললে, হ্যাঁ। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। সমর বললে, এখনও দু'মাস হয়নি আমি দিল্লী গিয়েছিলাম, এরই মধ্যে কী এমন ঘটল যার জন্যে তুমি বলছ আমাদের বিয়ে হবে না ? নীলা বললে, তুমি বুঝতে পারছ না সমর, এমন করে দুঃখকে ডেকে এনো না। সমর বললে, আমি বড় হব, আমি একদিন অনেক টাকা উপার্জন করব নীলা, তুমি বিশ্বাস করো, কিন্তু বিশ্বাস করতে সে পারল না। উবে গেল তার এতদিনের ভালবাসা। বললে, তুমি যাও সমর, বিয়েব দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছে আমার। কোথায় ? কোথাকার রাজপুত্র সে ? নীলা বললে, বিয়ের দিন তোমায় নিমন্ত্রণ করব। এসো। সমর তখন ভেঙ্গে পড়েছে। বললে, মস্ত বোকা আমি তাই তোমার মতো মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। বিশ্বাস করেছিলাম তোমার ভালবাসায়। তোমরা সব পারো নীলা, টাকাই তোমাদের কাছে সব। বেশ, পারি যদি কোনদিন তো টাকা দিয়েই কিনব তোমাকে। এই বলে সমর চলে গেল।

নীলিমা ঃ গল্প শেষ হল ?

সমর ঃ হল। এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

নীলিমা ঃ অস্বীকার করছি না। এখন কী করতে চাও তুমি ?

সমর ঃ যদি বলি শোধ নিতে চাই।

নীলিমা ঃ আমার স্বামী তোমার বন্ধু।

সমর ঃ তাই বোধ হয় ওর বাধেনি।

নীলিমা ঃ এ সবের সে একবর্ণও জানত না।

সমর ঃ জানিয়ে দেব ?

নীলিমা ঃ পারবে ?

সমর ঃ নিশ্চয় পারব।

নীলিমা ঃ বিলেত থেকে কি এই বিদ্যেটা শিখে এলে নাকি ? এই ব্ল্যাক্‌মেলিং ?

সমর ঃ না ও-বিদ্যে শিখতে বিলেত যাবার দরকার হয় না। নিজের লোভের ওপর দুনিয়ায় আর কোথাও কিছুই নেই সে-কথাটা তোমার মতো একটি মেয়ের কাছ থেকেও মানুষ শিখতে পারে।

নীলিমা ঃ তোমার বন্ধুকে আঘাত দিতে তোমার বাধবে না ?

সমর ঃ আমাকে আঘাত দিতেও তো কারও বাধেনি।

নীলিমা ঃ তাই করো। বাধা দেব না। (চলে যাচ্ছিল)

সমর ঃ নীলা !

নীলিমা ঃ মিসেস্ সেন বলতে যদি একান্তই অসুবিধে হয় তো নীলিমা দেবী বলে ডেকো।

সমর ঃ আজ আমার কী মনে হচ্ছে জানো ? মনে হচ্ছে, মেয়েদের কাছে ভালবাসাটা কিছুই নয়। আমাদের মতো যারা বোকা, তারাই শুধু ভালবেসে মরে।

নীলিমা : খুব ভাল একটি মেয়ে আমি দেখে দিচ্ছি, বিয়ে করো।

সমর : তুমি থামো। আমারও চোখ আছে। মেয়ে আমিও দেখে নিতে পারি।

নীলিমা : বেশ তবে শোওগে যাও। মতি, পুবের ঘরে বাবুর বিছানা পাতা আছে। বাবুকে নিয়ে যাও।

মতি : আসুন বাবু।

নীলিমা : শোন্ মতি, বাবু শুয়ে পড়লে সবুজ বাতিটা জ্বেলে দিয়ে আসবি।

সমর : মনে আছে দেখছি।

নীলিমা : হ্যাঁ। সকালে আটটার আগে বাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিও না। গরম চা এক কাপ হাতে নিয়ে গিয়ে বাবুকে ডেকে তুলো।

মতি : বেশ মা।

(শিশির এল। এসেই তার ঘরে গিয়ে ড্রয়ার খুলে কী যেন খুঁজতে লাগল।)

নীলিমা : গাড়ি ঠিক হল ?

শিশির : হ্যাঁ, কী একটা তার ছিঁড়ে গিয়েছিল।

নীলিমা : এসেই ওখানে কী খুঁজছ ?

শিশির : সমরের চিঠি একখানা। রাস্তায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এই যে, পেয়েছি। (চিঠিটা হাতে নিয়ে) কোথায়, সমর ঘুমুলে নাকি ?

সমর : না, ঘুমোইনি। গাড়ি ঠিক হল ?

শিশির : হ্যাঁ, হল। রোজই ভাবি গাড়ির মেকানিজম্‌টা শিখে নেব, কিন্তু হয়ে ওঠে না। এই নাও (চিঠিখানা দিয়ে) তোমার এই চিঠিখানা অনেকদিন থেকে পড়ে আছে আমার কাছে। তোমার বোন অনিলা তার বিয়ের রাতে আমাকে দিয়েছিল তোমাকে দিয়ে দেবার জন্যে। তুমি তখন বিলেতে। ভাগ্যিস মনে পড়ল, নইলে কাল আবার ভুলে যেতাম। আচ্ছা ভাই চলি, ঘুমোও, রাত অনেক হয়েছে।

(শিশির চলে গেল। সমর চিঠিখানা হাতে নিয়ে উঠল। সবুজ আলোটা নিবিয়ে সাদা আলোটা জ্বাললে। চিঠিখানা চোখের সামনে তুলে ধরলে।)

সমর : অনিলা দিয়েছে ? এ যে দেখছি নীলার হাতের লেখা। অনিলাকে লিখছে—আমার বিলেত যাবার আগে ! (চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল) তোর দাদার মতো তুইও ভুল বুঝিসনি ভাই। সমরকে বলতে পারিনি, তোকে বলছি। ওকে আমি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি অনিলা। ও ভাল ছেলে। ইউনিভার্সিটির রত্ন। ও বড় হবে। বিলেত যাবে। বিখ্যাত হবে। সে পথ বন্ধ করে দিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে, সামান্য একটি চাকরি নিয়ে নিতান্ত দরিদ্রের মতো জীবন কাটাতে বাধ্য করব আমি—আমার নিজের স্বার্থে—তা আমি পারিনি ভাই। তাই আঘাত দিয়ে—অপমান করে ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কী করে যে পেরেছি তা আমি নিজেই জানি না।

সমর : (আপন মনে) এ-কথা তুমি আমাকে বললে না কেন নীলা ? এ তুমি কী করেছ ? (আবার চিঠি পড়তে লাগল) আর একটা কথা অনিলা, কাউকে বলিসনি যেন। তোদের মা একদিন এসেছিলেন আমার কাছে চুপিচুপি। কেঁদে ভিক্ষে চেয়েছিলেন তাঁর ছেলেকে। মা একদিন আমরা সবাই হব—সেই সেদিনের কথা মনে করে—বুঝে নিস অনিলা। মাপ্ করিস আমাকে। আর আমি লিখতে পারছি না।

সমর : (চিঠিখানা দলা পাকিয়ে নিজের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে চেপে ধরে) ছি ছি, এ তুমি কী করলে, কী করলে নীলা ! (অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। মনে হল তার বুকের ভেতর যেন ঝড় উঠেছে।—কখন সকাল হয়ে গেছে। মতি চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে) মতি।

তোমার বাবুর ঘুম ভেঙেছে ?

মতি : অনেকক্ষণ। রোজ ভোরে উনি গাড়ি নিয়ে যেমন বেরিয়ে যান আজও তেমনি বেরিয়ে গেছেন।

নীলিমা : (বাইরে থেকে) কার সঙ্গে কথা বলছিস মতি ?

মতি : বাবুর সঙ্গে।

নীলিমা : বাবু উঠেছেন ? (ঘরে ঢুকে) যাও মতি, তুমি বাজারে যাও। (মতি চলে গেল। সমর একদৃষ্টে নীলিমার দিকে তাকিয়ে রইল) ও কি ! অমন হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কী ?

সমর : তোমাকে দেখছি।

নীলিমা : নতুন দেখছ নাকি ?

সমর : হ্যাঁ, নতুনই দেখছি। এ রূপ তোমার আমি কখনও দেখিনি। না না যেও না। দেখতে দাও।

নীলিমা : তোমার হল কি সমর ?

সমব : কী হল নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না।—সদ্যস্নাতা, আলুলায়িত কুন্তলা, পরনে গৈরিক পট্টবাস, সিঁথিতে সদ্য আঁকা সিন্দুব রেখা, কণ্ঠে জড়ানো বস্ত্রাঞ্চল, অলক্তকবর্জিত নগ্ন পদযুগল—

নীলিমা : থামো থামো, হাসি পাচ্ছে। কবি হলে কবে থেকে ?

সমর : না না সত্যি এ রূপে তোমাকে আমি—

নীলিমা : পুজো করছিলাম ঠাকুব-ঘরে।

সমর : পুজো কবো নাকি ? কার কল্যাণে ? শিশিরের ?

নীলিমা : তোমারও।

সমর : মিছে কথা।

নীলিমা : ঠাকুর দেবতা নিয়ে হিন্দুর মেয়ে মিছে কথা বলে না। সমর !

সমর : নীলা !

নীলিমা : কাল তুমি বলেছিলে মেয়েরা রহস্যময়ী, মেয়েরা হেঁয়ালি। একদিন বলেছিলে, টাকা দিয়ে নীলাকে কিনে নেবে। পারবে ?

সমর : না। ও-কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দিও না নীলা।

নীলিমা : যে-নীলা তোমার ভালবাসার দাম দেয়নি, যে তোমাকে ঠকিয়েছে, কেন তুমি তাকে ভুলে যাবে না সমর ? কেন মুছে ফেলছ না মন থেকে সেই স্বার্থসর্ব্বস্ব মেয়েটাকে ? পৃথিবীতে আরও অনেক মেয়ে আছে।

সমর : না। নীলা বোধহয় একটাই আছে।

নীলিমা : পাগল হলে নাকি ?

সমর : হইনি এখনও। তবে হতেও আর দেরি নেই। তোমার কাছে আমিই শেষ পর্যন্ত হেরে গেলাম নীলা। আমি আজ চলি।

নীলিমা : সে কি ! বন্ধু আসুক। নীলার কীর্তিকথা তাকে বলে যাও।

সমর : না।

নীলিমা : ও-মা সে কি ? হঠাৎ হতভাগী নীলার ওপর সমর চৌধুরীর এত দয়া যে !

সমর : নীলা তার বন্ধু অনিলাকে একখানা চিঠি লিখেছিল, সে-চিঠি আমি এতদিন পরে কাল দেখেছি।

নীলিমা : কেমন করে ? কোথায় ?

সমর : খামে মুড়ে অনিলা তার নিজের চিঠি বলে আমাকে দেবার জন্যে দিয়েছিল শিশিরকে।

নীলিমা : সমর ! ছি ছি, তোমার কাছে আমি ধরা পড়ে গেলাম। হেরে গেলাম এতদিনে।

অনিলা আমাকে এ কী লজ্জায় ফেললে !

সমর : আমি আসি এবাব।

নীলিমা : হ্যাঁ এসো। তোমার সামনে আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। তুমি এসো। যাবার সময় বলে যাও—

সমর : কী বলে যাব ?

নীলিমা : তোমার নীলাকে তুমি ক্ষমা করলে।

সমর : সে কথা আমার নীলা জানে। মিসেস নীলিমা সেনকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবে।

নীলিমা : আর কোনদিন এখানে আসবে না বোধহয়।

সমর : বন্ধুপত্নী নীলিমা দেবীর নিমন্ত্রণ পেলেই আবার আসব। নীলা আমার সঙ্গেই রইল।

নীলিমা : খুব ভাল একটি মেয়ে আছে। আমার বন্ধু। তার সঙ্গে তোমাব বিয়ে দেব। তাকে একদিন এখানে এনে তোমাকে ডেকে পাঠাব। আসবে তো ?

সমর : এ-কথার জবাব এখন দিতে পারব না।

নীলিমা : এখন না দাও, তখন দিও।

(ঘরে ঢুকল শিশির)

শিশির : একি সমর, চললে নাকি ?

সমর : হ্যাঁ ভাই, চললাম।

শিশির : নীলিমাকে ক্ষমা করে যাচ্ছ তো ?

সমর : ছি ছি শিশির, একি বলছ তুমি ?

শিশির : বেশ, আমার নীলিমাকে ক্ষমা করতে না পারো তোমার নীলাকে ক্ষমা কোরো।

সমর : শিশির ! তুমি—তুমি কি করে—

শিশির : জানি—সব জানি। চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

সমর : চলো।

(দুই বন্ধুতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিলে। নীলিমা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে।)

শ্রেষ্ঠ গল্প

মহেন্-জো-দড়োর পতন

প্রমথনাথ বিশী

সিন্ধু নদের তীর বরাবর সুদীর্ঘ, সুদৃঢ়, সু-উচ্চ বাঁধ, বালির নয়, পাথরের নয়, প্রাকৃতিক নয়, ছোট মাপের ইটের তৈরি ; এক সময় মানুষে তৈরি করিয়াছে, কিন্তু কতকাল আগে, কালের দিগন্তে সে স্মৃতি আজ অস্পষ্ট। বাঁধের গায়ে কত দিনের শ্যাওলা, নদীর ঘাত-প্রতিঘাতের কত চিহ্ন, কোনও কোনও অংশে ভাঙনের ক্ষত, আবার সেখানে মেরামত হইয়াছে।

বহু পুরুষ ধরিয়া মানুষে বাঁধটি দেখিতেছে ; লোকে নদীর ঐতিহ্যের যেমন সন্ধান করে না, বাঁধটি সম্বন্ধেও তাই—দুই-ই এখন সকল প্রশ্নের অতীত, দুটিকেই মানুষে বিনা প্রশ্নে স্বীকার করিয়া

লইয়াছে।

বাঁধেব একদিকে নদী, অপরদিকে নগর। নগরের দিক্ হইতে মাঝে মাঝে বাঁধে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। বাঁধের মাথাটা বেশ প্রশস্ত, ৫।৭ জন মানুষ স্বচ্ছন্দে পায়চারি করিতে পারে, করেও তাই। ওখানে বেড়াইবার একটা স্থান, কত লোকে সকাল বিকাল ওখানে বেড়াইয়া থাকে।

আমাদের গল্পের সূত্রপাত ঐ বাঁধটার উপরে। সেখানে দুইজন লোক পাশাপাশি বেড়াইতেছিল, হাওয়া খাইতেছিল—এমন নয় ; কারণ, এখনও সান্ধ্যবিচরণকারী দলের আসিবার সময় হয় নাই।

দু'জন লোকই দীর্ঘকায়, একজনের দাড়ি গোঁফ দীর্ঘ আর একজনের গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু দাড়ি দীর্ঘ , দু'জনেরই চুল লম্বা—সে চুল পিছন দিকে খোঁপার আকারে সজ্জিত, তাহাতে সোনার কঙ্কতিকা (কাঁকই) গোঁজা ; বাম কাঁধের উপর, দক্ষিণ বাহুর নীচে দিয়া গায়ের কাপড় জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত, অধোবাস অদৃশ্য। দু'জনাকেই সম্ভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

তাহারা নদীর দিকে তাকাইয়া কী যেন দেখিতেছিল—তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলে, পুবদিকে মুখ ফিরাইলে দেখা যাইবে নদীর বিস্তৃত প্রবাহ, অনেক নীচে বলিয়া স্রোতোহীন প্রতীয়মান, কিন্তু মাঝে মাঝে দ্রুতগামী নৌকা দেখিলে স্রোতের প্রচণ্ডতা অনুমান হয়— আবার পশ্চিম দিকে চাহিলে দেখা যাইবে নগরের উচ্চাবচ সৌধতরঙ্গ—দূবে বলিয়া, নীচে বলিযা দাবার ছকেব মতো দৃশ্যমান—তিনতলা বাড়িগুলাও খেলাঘরের মতো। বাঁধটা কত উঁচু—আর সম্মুখে পশ্চাতে বাঁধের বিস্তৃত শিবদাঁড়া—দুই দিকের দিগন্তে সূক্ষ্ম সূঁচালো হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি দু'জন এবার মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল—নদীই আমাদের শত্রু, আবার নদীই আমাদের মিত্র।

অপর জন বলিল—শত্রুতা, মিত্রতা—সবই অবস্থার উপরে নির্ভর করে।

পূর্বোক্ত জন বলিল—সেনাধ্যক্ষ, তোমার কথা অর্ধসত্য, সবই নিজেদেব উপরে নির্ভর করে।

দ্বিতীয় জন বলিল—পূর্ত-সচিব, তোমার কাজ নদীকে সংযত কবা, আমার কথাকেও তুমি সংযত করিয়া যথার্থ রূপ দিয়াছ।

তাহাদের কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—একজন নগরেব সেনাধ্যক্ষ—অপর জন পূর্ত-সচিব, দু'জনেই নগরপ্রধানগণের শ্রেণীভুক্ত।

পূর্ত-সচিব বলিল—এবারে বন্যায় খুব জোর ধরিবে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—কী ভাবে বুঝিলে ?

দেখো না কেন, এখন বর্ষার প্রারম্ভ, ইতিমধ্যেই জল বাঁধের কতটা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তা' ছাড়া, আমি দেখিয়া আসিতেছি যে, পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবলতর বন্যা হইয়া থাকে।

হোক প্রবল বন্যা। তোমার বাঁধ আমাদের প্রহরী।

প্রহরী প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে—আজ তাহার জীর্ণদশা। এবার বর্ষা-অন্তে বাঁধ মেরামত না করিলেই নয়।

আমিও তাহাই বুঝি, কিন্তু নগরপ্রধানগণ কি অর্থ ব্যয় করিতে রাজি হইবেন ?

আমারও সেই আশঙ্কা। তাঁহাদের অধিকাংশই বয়সে নবীন, তাঁহারা নগরের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলিয়া মনে করেন। বাঁধ মেরামতের প্রশ্ন তুলিলেই তাহারা বলিবেন—ওটা পূর্ত-সচিবের একটা খেয়াল, নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার জন্য কেবল বাজে খরচের বাবদ অর্থ চান ! কিন্তু—

কিন্তু আমরা দু'জনেই বৃদ্ধ, আমরা জানি—হ্রাস বৃদ্ধি, উত্থান পতন, জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম !

সেই তো বিপদ ! নবীনেরা এসব কথা বুঝিতে চায় না। তাহারা বাঁধ-মেরামতের অনিবার্য অর্থ

দিয়া নগরের স্থানে স্থানে দেবলিঙ্গ স্থাপন করিতেছে, অনর্থক ধুমধাম করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে। আমাদের সতর্কবাণী তাহারা শুনিতে চায় না।

ওই আর এক বিপদ। আমাদের প্রাচীন মৎস্য-পূজায় এখন আর কাহারও মন নাই। নবপ্রবর্তিত লিঙ্গ-পূজায় এখন সকলেই উন্মত্ত। কিন্তু পূর্ত-সচিব, ভাবিয়া দেখো, সে পূজা কত সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল, অথচ আন্তরিকতাও ছিল। আর এই মৎস্যদেব তো সিন্ধু নদেরই প্রতীক।

সেই কথাই তো বলিতে চেষ্টা করিতেছি, নদীর দিক হইতে আমাদের মন নগরের দিকে, সরলতার দিক হইতে আড়ম্বরের দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। বাঁধের উত্তর দিকটা দেখিয়াছ কি ? এবার বর্ষায় যদি টেঁকে— সৌভাগ্য, বর্ষার অন্তে মেরামত না করিলেই দুর্ভাগ্যের চরম হইবে।

পূর্ত-সচিব, তোমার ঐ উত্তর দিকের প্রসঙ্গে একটি জরুরি বিষয় মনে পড়িল। আমার গুপ্তচরেরা নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের আমি উত্তর দিকের খবর সংগ্রহ করিতেই বিশেষভাবে আদেশ করিয়াছি। একজন দূত দুই শত ক্রোশ অবধি গিয়াছিল। সেখানে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, সে আগেও সেখানে একবার গিয়াছে। কিন্তু এবারে গিয়া দেখিল, নগরের সে পূর্বসমৃদ্ধি নাই।

এমন বিপদ্ কেন ঘটিল? বন্যা?

না।

অগ্নি ?

না।

ভূমিকম্প ?

না।

তবে কি শত্রু ?

এবারে ঠিক অনুমান করিয়াছ।

কিন্তু তাহাদের কি সৈন্য ও অস্ত্র ছিল না ?

ছিল বৈকি।

তবে ?

আততায়ী মহাশক্তিসম্পন্ন।

হইলেও মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

সে কথা ঠিক। কিন্তু তাহাদের বাহন এক প্রকার দ্রুতগামী জীব। সেই বায়ুগতি বাহনে চড়িয়া তাহারা অতর্কিতে আসে, অতর্কিতে যায়, পদাতিকে তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন ?

এত সংবাদ দূত রাখিল কী প্রকারে ?

একবারের আক্রমণের সময়ে সে উপস্থিত ছিল।

কী সেই জন্তু ?

দূত তাহার একটা ছবি আঁকিয়া আনিয়াছিল।

ছবিখানা দেখিয়াছ ? দেখিয়া কী বুঝিলে ?

বুঝিলাম, সে জন্তু তেজস্বী, দ্রুতগামী ; আর বুঝিলাম, এদেশে কেহ তাহা দেখে নাই, এদেশে সে জন্তু নাই।

কিন্তু দুই শত ক্রোশ দূরের ভয়ে ভীত হইবার তো কারণ দেখি না।

পূর্ত-সচিব, যে বন্যায় আমরা সর্বদা শঙ্কিত, তাহা তো আরও দূর হইতে আসিয়া থাকে।

তা বটে।

আর এমন দ্রুতগামী বাহন যাহাদের, তাহারা কি একটা নগর ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হইবে। সিন্ধুলালিত শ্রেষ্ঠ নগরের সংবাদ কি তাহাদের কানে পৌঁছিবে না ?

এ আশঙ্কা মিথ্যা নয়। চলো, তোমার আবাসে গিয়া সেই অদ্ভুত জীবের ছবিটা দেখিব, সেখানা আছে তো ?

আমি যত্নে রাখিয়া দিয়াছি।

দুইজনে যখন বাঁধ হইতে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন একজন নাগরিক ব্যস্তভাবে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নত হইয়া অভিবাদন করিল ; বলিল, নগরপ্রধানগণ শীঘ্র আপনাদের স্মরণ করিয়াছেন।

কেন হে বাপু ?

তাহা আমি জানি না, তবে কোনও বিপদ ঘটিয়া থাকাই সম্ভব।

তাঁহারা কোথায় ?

মুখ্য স্নানাগারের নিকটবর্তী চত্বরে, সেখানে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

ভিড়ের মধ্যে কী আছে ?

তাহা আমি দেখি নাই, আমি দূরে ছিলাম।

আচ্ছা, চলো যাওয়া যাক্।

তখন তাহারা দুইজনে দূতের অনুসরণ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া বাঁধ হইতে নামিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্বোক্ত স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা দেখিল, সত্যই এক বৃহৎ জনতা, চত্বর পূর্ণপ্রায়। তাহাদের দেখিবামাত্র পথাধ্যক্ষ, শকটাধ্যক্ষ এবং আরও ২।৪ জন রাজপুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিল, বলিল—আসুন, এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

হঠাৎ এমন কী বৈচিত্র্য ঘটিল, বুঝিতে না পারিয়া তাহারা ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল—দেখিল, মাঝখানটা ফাঁক, আব সেখানে দাঁড়াইয়া আছে এক অদৃষ্টপূর্ব জন্তু।

পূর্ত-সচিব বলিল—সেনাধ্যক্ষ, দেখো এক অদৃষ্টপূর্ব জানোয়ার।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আমার একেবারে অদৃষ্ট নয়, এ সেই জানোয়ার।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে মুখে পরিহাসের ছায়ামাত্র নাই, দেখিল—অমিতবিক্রম সেই পুরুষের মুখ পাংশু। পূর্ত-সচিবও ভীত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে জনতা সেই জন্তুটিকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, কেহ লেজ ধরিয়া টানিতেছে, কেহ খোঁচা মারিতেছে, কেহ বা মুখের কাছে শষ্পমুষ্টি ধরিতেছে, কিন্তু তেজস্বী জন্তুটার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া দণ্ডায়মান, মাঝে মাঝে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইতেছে, চক্ষুর শ্বেতাংশ ঘূর্ণিত করিতেছে, দূর পথ-অতিক্রমণে ক্লান্ত বলিয়া বক্ষ কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইতেছে, আর নিতান্ত বিরক্তি বোধ করিলে লেজটি আন্দোলিত হইতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—এ জন্তু আসিল কোথা হইতে ?

একজন নাগরিক অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আমার ক্ষেতখামার এখান হইতে দূরে, প্রায় দুই দিনের পথ, সেখানে মাঝে মাঝে গিয়া তদারক করি। এবারেও গিয়াছিলাম, আজ সকালে উঠিয়া দেখি, জানোয়ারটা ক্ষেতের শস্য খাইতেছে, তখন—

দাঁড়াও। দু'দিনের পথ তুমি একদিনের মধ্যে আসিলে কী প্রকারে ?

উহার পিঠে চড়িয়া।

তোমার খামার কোন্ দিকে ?

উত্তর দিকে।

সর্বনাশ !

সেনাধ্যক্ষের ভয়ের কারণ আর কেহ বুঝিতে না পারুক, পূর্ত-সচিব কতকটা বুঝিল।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণকে বলিল—নগরপ্রধানগণের এখনই একবার সম্মিলিত হওয়া আবশ্যক।

আপনাদের আপত্তি না থাকে তো, আমার ভবনে আসিলে সুখী হইব।

সকলে বলিল—আপত্তি কী।

সেনাধ্যক্ষ পূর্ত-সচিবের উদ্দেশে বলিল—সেই ছবিটার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিবে।

তখন রাজপুরুষগণ সেনাধ্যক্ষের ভবনের দিকে চলিল, যাইবার আগে সেনাধ্যক্ষ জানোয়ারটাকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ দিয়া গেল।

পাঠক, এই নগরীর নাম মহেন্-জো-দড়ো। আজকার ধ্বংসাবশেষ নয়, পাঁচ হাজার বছর আগেকার ধনে জনে সমৃদ্ধিতে পূর্ণ জীবনচঞ্চল নগর, তৎকালীন নাম 'নন্দুর'। আর ঐ অদৃষ্টপূর্ব জন্তুটি একটি ঘোড়া।

২

সেনাধ্যক্ষের আবাসে রাজপুরুষগণের সভা বসিয়াছে। সেনাধ্যক্ষ বিপদের আশঙ্কা সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। বাঁধের উপর পূর্ত-সচিবকে যে-সব কথা সে বলিযাছিল, তাহাই আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে, গুপ্তচর কাষ্ঠফলকে জন্তুর যে চিত্র আঁকিয়া আনিয়াছিল, তাহা সকলকে দেখাইয়াছে, সেই চিত্রের সঙ্গে জানোয়ারটির সাদৃশ্য দেখাইয়া দিয়াছে—আর বলিয়াছে, নূতন যে দুর্ধর্ষ জাতি সুদূর উত্তরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—এইরূপ দ্রুতগতি বাহনের জন্যই তাহারা অজেয় । তাহাদের হাতে দুই শত ক্রোশ দূরবর্তী সমৃদ্ধ নগরের যেভাবে পতন হইয়াছে, তাহারও বর্ণনা করিতে ভোলে নাই। এবং সর্বশেষে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষা করিতে হইলে অন্য খাতে ব্যয় বন্ধ করিয়া উত্তর দিকে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর তুলিতে হইবে।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের যুক্তি ও প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছে যে, নগরের দুটি শত্রু। একটি নদী, এতদিন তাহাকেই মাত্র শত্রু বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সম্প্রতি আরও একটি শত্রুর আভাস শুনিতে পাওয়া গেল। পূর্ত-সচিব প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষার জন্য উত্তর দিকে প্রাচীর গাঁথা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি অত্যাবশ্যক বাঁধের সংস্কার। সে জানাইয়া দিয়াছে যে, বাঁধটি অনেক কাল সংস্কৃত হয় নাই—উত্তর দিক্‌টায় এমনি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই বর্ষাতেই কী হয় বলা যায় না। আর কোনও মতে এবার বর্ষাকালে টিকিয়া গেলেও আগামী বর্ষায় ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী, তখন নগরের কী অবস্থা হইবে, সকলকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিয়া থামিল, কিন্তু তাহাদের কথায় আর কেহ যে বিচলিত হইল, এমন বোধ হয় না। তাহার একটি কারণ, সমবেত রাজপুরুষগণের মধ্যে এই দুই জনেই বয়সে বৃদ্ধ, অবশ্য পদগৌরবেও শ্রেষ্ঠ। অন্য সকলের বয়স তারুণ্যের কোঠায়, দু'একজনকে প্রৌঢ়ও বলা যাইতে পাবে।

পথাধ্যক্ষ বয়সে তরুণ। সে এবারে উঠিল এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—মাননীয় রাজপুরুষদ্বয়ের কথা শুনিলাম, কিন্তু আমি তো উদ্বেগের কারণ দেখি না, যেহেতু কোথায় কোন্ সম্ভাবিত শত্রু রহিয়াছে, তাহার আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিলে জীবনযাত্রা দুরূহ হইয়া পড়ে। একটি অদ্ভুত জানোয়ার নগরে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছায় আসে নাই, আনীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঐ নিরীহ জানোয়ারটি কিরূপে যে এমন ভয়াবহ, তাহা বুঝি না। বাঘের মতো তাহার নখ নাই, গণ্ডারের মতো তাহার খড়্গ নাই, হস্তীর মতো তাহার দন্ত নাই, কোথায় তাহার ভীষণতা !

তাহার বর্ণনা শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

পথাধ্যক্ষ পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার বিবেচনায় সেনাধ্যক্ষের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। আর আপনারা যদি অনুমতি করেন তো বলি যে, নিজের মর্যাদা ও নিজ বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন।

এই বলিয়া পথাধ্যক্ষ বসিল, কেহ তাহার উক্তির প্রতিবাদ তো করিলই না, বরঞ্চ ভাবগতিকে বুঝিতে পারা গেল যে, তাহাতে তাহাদের অনেকেরই সমর্থন আছে।

এবারে শকটাধ্যক্ষ উঠিল, বয়সে সেও তরুণ। সে বলিল—সেনাধ্যক্ষের উক্তির অর্বাচীনতা সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে, আর প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ত-সচিবের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাই।

এই বলিয়া আরম্ভ করিল—পূর্ত-সচিব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সর্বত্র তিনি ভয়ের ছায়া দেখিতে পান। এ বাঁধ কত কাল নির্মিত হইয়াছে, কেহই জানে না, পূর্ত-সচিবের বয়স যতই হোক, আমার বোধ হয় তিনিও জানেন না। এতদিনের মধ্যে বাঁধ ভাঙ্গে নাই, কাজেই এবারে ভাঙ্গিবে, এমন আশঙ্কা অমূলক। আর যদিই ভাঙ্গে, পূর্ত-সচিব আছেন কেন ? এমন অবস্থায় বাঁধের পিছনে অর্থব্যয় আর নদীর জলে তঙ্কা ফেলিয়া দেওয়া সমান। আমার বিবেচনায় এই উদ্দেশ্যে কপর্দক ব্যয় করাও সমীচীন নয়।

শকটাধ্যক্ষ বসিলে তরুণবয়স্ক অরণ্যাধিপতি উঠিল। সে বলিল—পূর্বোক্ত বিষয়দ্বয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট মনে করি। পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের দাবি যে কত দূর ভিত্তিহীন, তাহা আপনাবা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার প্রসঙ্গ ভিন্ন। নগরের বৃহৎ স্নানাগারটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—এখন সব সময়ে তপ্ত জল পাওয়া যায় না, মেঝে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অনেক সময়েই স্নানার্থীরা পিছলিয়া পড়িয়া যায়, এমন অবস্থায় একটি বৃহত্তর স্নানাগার-নির্মাণ আশু প্রয়োজন। নগরকোষের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রাচীর গাঁথিয়া অপব্যয় না করিয়া নাগরিকগণের সুখ-সুবিধা যাহাতে বাড়ে, সেই উদ্দেশ্যে একটি মনোরম স্নানাগার-নির্মাণ প্রয়োজন। অনেক বিলম্ব হইয়াছে—আর কালব্যাজ অমার্জনীয়।

এবারে পুনরায় সেনাধ্যক্ষ উঠিলেন, তিনি বলিলেন—বিপদের আশঙ্কাকে আপনারা দূরবর্তী বলিয়াছেন, আমি তো দেখি, বিপদ একেবারে ঘরের মধ্যেই। বাহিরের আক্রমণ ভয়াবহ সত্য, কিন্তু তাহাতে জয়-পরাজয় দুই-ই সম্ভবপর। কিন্তু যে আক্রমণ আভ্যন্তরীণ, তাহার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কী ? আসল বিপদ আততায়ীর ভয় নয়, আসল ভীতি সেই ভয়কে অবহেলা। পুরাতন স্নানাগারে কেহ কেহ পা পিছলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতেই আপনারা বিচলিত, কিন্তু আপনাদের যে মনোভাব দেখিতেছি, তাহাতে সমস্ত নগরটাই অচিরে পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইবে আশঙ্কা হইতেছে। আপনারা এখনও সতর্ক হোন।

সেনাধ্যক্ষ বসিলে পথাধ্যক্ষ বলিল—বিপদকালে বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিবার পরামর্শ আছে—আগে বিপদ আসুক, তার পরে বৃদ্ধেরা যেন মুখ খোলেন। এখনই বাক্যে কী প্রয়োজন। বৃদ্ধের মুখে বাচালতা নিতান্তই অশোভন।

কিন্তু অর্বাচীন যখন পরামর্শদাতার পদ গ্রহণ করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, দুঃসময় ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেনাধ্যক্ষই এই বাচালতার উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু এ তাঁহার নিজ ভবন। আর সকলে তাঁহার অতিথি, কাজেই যে কথা এক্ষেত্রে তাঁহার বলা উচিত নয়—আমাকেই তাহা প্রকাশ করিতে হইল।

এই বলিয়া পূর্ত-সচিব বসিল।

এবারে অরণ্যাধিপতি উঠিল, বলিল—এই সব দূরস্থিত বিপদের কচ্‌কচানি আর ভাল লাগিতেছে না। সন্ধ্যা সমাগত। আজ রাত্রে বৃক্ষপূজার তিথি। সাতটি নর-বলি হইবে। বলি প্রস্তুত। সেখানে যাইবার সময় হইয়াছে। চলুন, সেখানে যাওয়া যাক। কিন্তু তার আগে একটা কাজ সারিয়া লওয়া ভাল। এখানে রাজপুরুষগণ সমবেত হইয়াছেন, কাজেই নূতন স্নানাগার নির্মাণের অর্থব্যয়ের অনুমতি আপনারা দিন।

এ বিষয়ে অধিক বিতর্ক হইল না, কেবল সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মাত্র আপত্তি করিল, কাজেই অধিকাংশের সম্মতি অনুসারে নূতন স্নানাগার নির্মাণের ব্যয় মঞ্জুর হইয়া গেল।

তখন আর সকলে প্রস্থান করিল, শুধু সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মূঢ়ের মতো গালে হাত দিয়া সেই শূন্য সভাকক্ষে বসিয়া রহিল। বহির্গত রাজপুরুষদের পরিহাসের অট্টহাস্যও তাহাদের মৌনভঙ্গ করিতে পারিল না।

৩

এই ঘটনার পরে পুরা তিনটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং সেই সুদীর্ঘ সময়-মধ্যে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার লক্ষণ মাত্রও দেখা যায় নাই ; কাজেই এখন বৃদ্ধদ্বয় সমস্ত নগরবাসীর উপহাসের পাত্র। না উত্তর দিক্ হইতে অজ্ঞাত শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, না পূর্ব দিক্ হইতে পরিজ্ঞাত নদী বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম করিয়াছে।

যুগান্তকারী বিপদ আসিতে এক যুগ সময় নেয়—তাই বলিয়া বিপদ্ কখনোই আসিবে না—এমন কথা মূর্খ ছাড়া কেহ বলে না। মানুষের জীবনে যুগ দীর্ঘ, সভ্যতার জীবনে তাহা পলকপাত মাত্র।

সেই ঘোড়াটি এখনও নগরে আছে, লোকে বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে ডাকে সেনাধ্যক্ষ, আর ঘোড়াটির নখদন্তহীনতা স্মরণ করিয়া 'নখদন্তহীন বুড়ো' বলিয়া সেনাধ্যক্ষের উল্লেখ করে। পূর্ত-সচিবও বাদ যায় নাই। পূর্ত-সচিবের নাম পড়িয়াছে "ভাঙা বাঁধ,' আর বাঁধটাকে সকলে পূর্ত-সচিবের কবরখানা বলিয়া উল্লেখ করে।

এই ভাবে সুখে দুঃখে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। চতুর্থ বৎসরে বর্ষাকালে বন্যায় জোর ধরিল, বাঁধের উত্তর দিক্‌টা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাঁধ রক্ষার জন্য পূর্ত-সচিবের অধীনে কতকগুলি 'রাজ' থাকিত, কিন্তু এ সঙ্কট রক্ষা করা তাহাদের সাধ্য নয়।

নিরুপায় পূর্ত-সচিব রাজপুরুষগণের নিকট লোক পাঠাইল। তাহারা এখন দিবাভাগের অধিকাংশ সময় নবনির্মিত মনোরম স্নানাগারে কাটাইয়া থাকে।

"মহেন্-জো-দড়োর অন্যতম আশ্চর্য জিনিস, একটি স্নানাগার। স্নানাগারটি এত সুবৃহৎ ও সুগঠিত যে, এই যুগের পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট ও পূর্ব পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দিকে ৭/৮ ফুট পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্নানাগারের মধ্যভাগে একটা প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট একটি সন্তরণ-বাপী আছে। . . . এই সন্তরণ-বাপীটির নির্মাণকৌশল খুব চমৎকার। বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ পূর্ত-বিশেষজ্ঞ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এই বাপীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নীচে স্নানার্থীদের জলে নামিবার জন্য অনুচ্চ মঞ্চ ছিল। অদূরবর্তী কূপ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটি জলপূর্ণ করা হইত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জলনিকাশের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাড়ে ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল। এই জলাশয়ের চতুর্দিকে তিন চার ফুট পুরু করিয়া সুন্দর ও মসৃণ ইটের গাঁথনি দেওয়া হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গেই স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করার জন্য এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর প্রলেপ দিয়া যাহাতে ইট গড়াইয়া না পড়িতে পারে, তজ্জন্য এক সারি মসৃণ পাতলা ইট দিয়া চাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল। . . . বৃহৎ স্নানাগারের নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাতে পাঁচ ফুট উচ্চ কয়েকটি চতুষ্কোণ ইষ্টকমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলিতে চুল্লী বসানোর জন্য খাঁজ কাটা রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, এই গৃহে চুল্লীর সাহায্যে স্নানাদির জন্য উত্তাপ-সঞ্চয়ের এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।" *

* 'প্রাগৈতিহাসিক মহেন-জো-দড়ো'—শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, পৃ. ২৪-২৭।

পূর্ত-সচিবের দূত আসিয়া দেখিল যে, রাজপুরুষগণ বাপীসলিলে জলক্রীড়া করিতেছে. সে সমস্ত নিবেদন করিল। একজন রাজপুরুষ বলিল—বড় সুসংবাদ। বাঁধ ভাঙ্গাই এখন দরকার, বাপীতে আজ জল কম।

সকলে হো হো করিযা হাসিয়া উঠিল।

আর একজন বলিল— তুমি তোমাব প্রভুকে গিয়া বলো, তিনি যেন আব একটু কষ্ট করিয়া বাঁধটা ভাঙ্গিয়া দেন। নদী আমাদের মিত্র।

আবাব সকলে হাসিয়া উঠিল।

তৃতীয় আর একজন বলিল—পূর্ত-সচিব বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল ঢুকিবে—দুশ্চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু জলেব সঙ্গে যে প্রচুর মাছ ঢুকিবে—যে সুসংবাদ কি রাখেন ?

হাসিতে হাসিতে বারংবার সুবৃহৎ স্নানাগার চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

অপ্রস্তুত দূত প্রস্থান করিল।

রাজপুরুষরা নিজেদেব মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, নাঃ বুড়া দু'টাকে আর সহ্য করা যায় না।

কেহ বলিল—এ দু'টা আমাদের সকল সুখের কাঁটা।

কেহ বলিল—মবেও না, মুখও বোজে না।

কেবল শত্রু আর বন্যা!

কেবল এল এল, গেল গেল!

ভয় দেখাইয়া আমাদের ভাল করিতে চান!

আমরা খারাপটাই বা এমন কী ?

ওঁদের কালে ওঁরা যে কেমন ছিলেন, তা' শুনেছি তো ঠাকুমার কাছে।

বসনা ছাড়া যাদের আর সব ইন্দ্রিয় শিথিল, তাদের আর গতি কী বলো!

সেদিন 'নখদন্তহীন ঘোড়া' বলছিল যে, আমাদের বিলাসিতা আজকাল বড়ই বেড়ে উঠেছে, তাতেই নাকি আমাদের অধঃপতন হয়েছে।

হযেছে! একেবারে হওয়া শেষ! কী সর্বনাশ!

এবারে বুড়ো দু'টোকে সবানো দরকার।

না হে, দু'টো একটা বুড়ো থাকা ভাল, তাতে যৌবনের মূল্য বোঝবাব সুবিধা হয়।

তবে ফ্যাচ-ফ্যাচ করতে নিষেধ করে দিয়ো।

তা না হলে আর বুড়ো কেন ?

যাই হোক, পূর্ত-সচিবের প্রাক্তনের পুণ্যেই হোক আব বন্যার তীব্রতার অভাবেই হোক, বাঁধটা সেবাব বক্ষা পাইয়া গেল। তাহাতে অন্যান্য রাজপুরুষগণের যুক্তিই প্রমাণিত হইল, বাঁধ ভাঙ্গিবার নয়। আর যা ভাঙ্গিবে না, তাহা রক্ষা করিবারই বা উদ্যম কেন! ঐ সূত্রে আরও একটা প্রসঙ্গ অনেকের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। যে বস্তু ভাঙ্গা-গড়ার অতীত, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা কেন ? ভাবে-গতিকে মনে হইতে লাগিল যে, বাঁধটি যাইবার আগেই হয় তো বা পূর্ত-সচিবের বৃত্তিটি যাইবে। হয় তো বা সত্যই যাইত, এমন সময়ে সেই বছরেই শীতকালে উত্তরের প্রত্যাশিত আশঙ্কা অপ্রত্যাশিতরূপে দেখা দিল।

শীতকালের প্রারম্ভে গুপ্তচর আসিয়া সেনাধ্যক্ষকে জানাইল যে, উত্তর দিকে অশ্বারোহী আততায়ীগণ দেখা দিয়াছে. সে বলিল—ষোল ক্রোশ উত্তরে যে নগর আছে, অশ্বারোহিগণ তাহা লুটপাট করিতেছে এবং অগ্নিসংযোগে পোড়াইয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল, তাহারা সংখ্যায় কত ?

পাঁচ শতের অধিক হইবে মনে হয় না, কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

তাহারা কি এ নগরে আসিবে ?

আমার মনে হয়, এই নগরের উদ্দেশ্যেই আসিতেছিল, ঐ নগরটি পথে পড়ায় এবং তাহারা বাধা দান করায় আগে সেটিকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সে জানিত, তাহারা কোথায় থাকিবে। স্নানাগারের দ্বিতলে বিশ্রামকক্ষেই অবশ্য তাহাদের পাওয়া যাইবে। পথিমধ্যে পূর্ত-সচিবকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাহাকে বিপদের কথা জানাইল এবং দুইজনে স্নানাগারের বিশ্রামকক্ষে দ্বিতলে গিয়া উপস্থিত হইল । সেখানে গিয়া দেখিল, রাজপুরুষরা সেখানে অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত।

সেনাধ্যক্ষ সংক্ষেপে তাহাদের সব সংবাদ নিবেদন করিল, কিন্তু কেহ যে বিশ্বাস করিল, এমন বোধ হইল না।

একজন রাজপুরুষ বলিল—আপনি আমাদের বালক বলিয়া মনে করেন, তাই সদা-সর্বদা জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকেন।

আর একজন বলিল—আজ চার বৎসর ধরিয়াই তো তাহারা আসিতেছে। এতদিন যদি আসিয়া না থাকে তবে আজই বা আসিবার নিশ্চয়তা কী ?

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আজ না আসুক, কাল আসিবে।

তবে সে কাল দেখা যাইবে। আজ আমাদের খেলা শেষ করিতে দিতে দিন।··· নাও—তোমার রাজাকে সামলাও।

সেনাধ্যক্ষ রুষ্ট হইয়া উঠিল—বলিল, আপনাদের সব খেলাই, একেবারে শেষ হইবে।···

দেখো মন্ত্রী গেল।

একজন রাজপুরুষ বলিল—শত্রু আসে—যুদ্ধ করুন।

শত্রু আসিলে যে যুদ্ধ করিতে হয় জানি। কিন্তু যুদ্ধ করিতে সৈন্যের প্রয়োজন। আজ চার বৎসর বৃত্তি না পাইয়া সৈন্যগণ কর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, কেহ বা নগরান্তরে গিয়াছে। আর যাহারা আছে, শুধু হাতে তাহারা লড়িতে পারে না, সংস্কার অভাবে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা তাহার কী করিব ?

কী করিব ? আপনারাই কি এজন্য দায়ী নহেন ? সৈন্যদলের প্রাপ্য বৃত্তি দিয়া আপনারা স্নানাগার গড়িয়াছেন, নূতন নূতন লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায় অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন—এখন আমরা কি করিব ?

তবে এক কাজ করুন, অর্থ দ্বারা আততায়ীদের বশ করিয়া ফিরাইয়া দিন।

আমি ব্যবসায়ী নহি, সৈনিক, আমি যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু দালালি করিতে জানি না।

পূর্ত-সচিব বলিল—অর্থের স্বাদ তাহাদের দিবেন না, তাহা হইলে প্রতি বৎসর তাহারা অর্থের লোভে আসিয়া হাজির হইবে।

তখন দেখা যাইবে। এবারে তো একটা ব্যবস্থা করুন।

ও ব্যবস্থার মধ্যে আমি নাই। তার চেয়ে আসুন সৈন্যদলের উপরে ভরসা না করিয়া আমরাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই না কেন ?

পূর্ত-সচিব বলিল—এ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

—হ্যাঁ, দুইজনে মিলিয়াছে ভাল ! যান, আপনারা দুইজনে লড়াই করুন গিয়া, আমরা উহার মধ্যে নাই।

তা থাকিবেন কেন ?

সেনাধ্যক্ষ বলিতেছেন—আপনারা স্নানাগারে আছেন, অক্ষক্রীড়ায় আছেন, লিঙ্গপূজায় আছেন—আপনারা যুদ্ধের মধ্যে থাকিবেন কেন ? বৃত্তি না পাইয়া সৈন্যদল ভাঙিয়া গিয়াছে—কত বার আপনাদের জানাইয়াছি। 'এই হইবে' 'আগামী বৎসর হইবে !' পাছে আমার গুপ্তচরেরা অশুভ সংবাদ আনিয়া আপনাদের বিলাসব্যসনে বাধা জন্মায়, তাই তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া বৃক্ষদেবের

নিকটে বলি দিয়াছেন। এখন যখন বিপদ্ আসন্ন, আপনারা সব দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিতেছেন— আমরা উহার মধ্যে নাই।

একজন রাজপুরুষ রাগিয়া উঠিয়া বলিল—মহাশয়, অধিক ফ্যাচফ্যাচ করিবেন না।—যান—ভাগুন।

এই বলিয়া একটি অক্ষগোলক সেনাধ্যক্ষকে ছুঁড়িয়া মারিল। কাষ্ঠগোলক তাহার কপালে লাগিয়া রক্ত বাহির হইল।

পূর্ত-সচিব বলিল—আপনারা বীর বটে, বন্ধুকে আঘাত করিতে হাত কুণ্ঠিত হয় না।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—এ মন্দের ভাল। হাত একবার উঠিয়াছে। এই হাত শত্রুর বিরুদ্ধে উঠুক !

শত্রু আপনার মাথায়।

তাই বুঝি সেখানে আঘাত করিলেন। আপনারা কেবল বীর নন, বুদ্ধিমানও বটে।—বলিলেন পূর্ত-সচিব।

শত্রু আসুক, তখন দেখা যাইবে।

শত্রু অবশ্যই আসিবে, তখন আর আপনাদের দেখা পাওয়া যাইবে না।

এই বলিয়া সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব স্থানত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুরুষগণ পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিল।

নাও, তোমার রাজা গেল !

মন্ত্রীর দোষেই।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নগরবাসীরা এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইল। তাহারা দেখিল, উত্তর দিগন্তে অকালে ধুলার ঝড় উঠিয়াছে। যাহারা জাগিয়া ছিল, ভাল করিয়া দেখিবার আশায় ছাদের উপরে উঠিল, যাহারা তখনও নিদ্রিত ছিল, নগরের কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া 'কী হইয়াছে' শুধাইতে শুধাইতে বাহিরে আসিল !

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিবের কাছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। তাহারা অপমানের আশঙ্কা সত্ত্বেও রাজপুরুষগণের ভবনের দিকে রওনা হইল।

পথাধ্যক্ষ জাগরিত হইয়া বলিল—সত্যই আসিয়াছে, না সমস্তটাই আপনাদের কল্পনা !

অরণ্যাধিপতি বলিল—দূরে আছে, এদিকে না আসিতেও পারে।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আসিয়া পড়িলে আপনারা ব্যবস্থা করিবেন। সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই, নামে মাত্র সেনাধ্যক্ষ হইয়া আমি কী করিব ?

সে জন্য আপনাকে দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না, যান।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব সমস্ত দৃশ্যটা পর্যবেক্ষণ করিবার আশায় বাঁধের উপরে গিয়া উঠিল।

বাঁধের উপর হইতে তাহারা দেখিল যে, ধূলার দিগন্ত ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, কাছে, আরও কাছে। ক্রমে ধূলিপটল ভেদ করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহী দৃষ্ট হইল। গুপ্তচরের অনুমান ভুল নহে, সংখ্যায় পাঁচ শতের কাছাকাছি। তাহারা দেখিল যে, পাঁচ শত অশ্বারোহী নগর-সীমান্তে উপস্থিত। তেজস্বী জন্তুর উপরে সমান তেজস্বী সব পুরুষ। তাহাদের অঙ্গে পশুচর্মের আচ্ছাদন, পৃষ্ঠে তূণ, স্কন্ধলগ্ন ধনুক, দক্ষিণ হাতে দীর্ঘ বর্শা, বাম হাতে বল্‌গা ; আর সকলকে ম্লান করিয়া দিতে পারে, দেহের এমন জ্যোতির্ময় কান্তি। তাহারা দেখিল, আততায়ীদের বর্ণ গৌর, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ নাসিকা, দীর্ঘ-প্রলম্বিত কেশ, মুখমণ্ডল গুম্ফশ্মশ্রুহীন। শত্রু হইলেও তাহাদের মনে বিস্ময়ের ভাব উদিত হইল—হাঁ, ইহারাই দেশের অধিপতি হইবার যোগ্য বটে।

কিন্তু অলীক চিন্তার সময় তাহাদের ছিল না। তাহারা দেখিল যে, কয়েকজন রাজপুরুষ অশ্বারোহীদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। অশ্বারোহীদের কয়েকজন অশ্ব হইতে অবতরণ করিল।

তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় পক্ষে কী সব কথাবার্তা হইতে থাকিল। অবশেষে তাহারা দেখিতে পাইল যে, শকট বোঝাই করিয়া থলিপূর্ণ যব গম ও নানা প্রকার খাদ্য অশ্বারোহীদের নিকটে নীত হইতেছে। দেখিতে পাইল যে, মূল্যবান রঙিন চর্ম-থলিকায় বোঝাই সুবর্ণ-মুদ্রা তাহাদের নিকটে নীত হইতেছে ; তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আত্মরক্ষার সহজতম পন্থাটাই গৃহীত হইল। তাহারা জানিত, সহজতম পন্থায় আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হইলে শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশ ঘটিয়া থাকে। তারপরে তাহারা দেখিল যে, থলিগুলি অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া আততায়ীগণ ঘোড়ার মুখ উত্তরদিকে ফিরাইয়া দিল। তখন শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

বাঁধ হইতে নামিবার মুখেই রাজপুরুষগণের সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সঙ্গীর সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া পথাধ্যক্ষ বলিল—এবারে বিশ্বাস হল তো যে, আমরা শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ।

পূর্ত-সচিব—ইহার নাম আত্মবিক্রয়, আত্মরক্ষা নয়।

পথাধ্যক্ষ। আপনারা তো লড়াই করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম সব সময়েই অনিশ্চিত, নিশ্চয়ের মধ্যে—লোকক্ষয়।

সেনাধ্যক্ষ। আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিত। পরাজিত হইলে তাহারা আর এদিকে আসিত না।

পথাধ্যক্ষ। আব আসিবে না বলিয়া গিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ। আর পাঁচ শত মাত্র আসিবে না. এবারে পঞ্চাশ সহস্র আসিবে।

পথাধ্যক্ষ। আবার ভীতি-প্রদর্শন ?

অরণ্যাধিপতি। কেন পঞ্চাশ সহস্র আসিবে, কারণ শুনিতে পারি ?

সেনাধ্যক্ষ। প্রথম কারণ, তাহারা ভাবিয়াছিল, অন্যান্য লুণ্ঠিত নগরের মতো ইহাও একটি ক্ষুদ্র পত্তন ; তাই সামান্য সংখ্যায় আসিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, তাহারা দেখিল যে, সিন্ধুপত্তনের ইহা সব চেয়ে সমৃদ্ধ ও বৃহত্তম নগর। তৃতীয় কারণ, বুঝিয়া গেল যে, ইহারা শুধু কাপুরুষ নয়, নির্বোধও, নতুবা ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা করিত না। কাজেই আপনারা নিশ্চিত থাকুন, শীঘ্রই তাহারা এমন অমিত সংখ্যায় আসিবে, যাহাদের পরাস্ত করিবার বা উৎকোচ দ্বারা লোভ প্রশমিত করিবার ক্ষমতা আপনাদের নাই। চতুর্থ কারণ, ইহারা বীর পুরুষ।

পথাধ্যক্ষ। উহাদের বলিতেছেন বীর । ঐ তো চেহারা ! পাথর-চাপাপড়া ঘাসের মতো বিবর্ণ রঙ্। বসন বুনিবার বুদ্ধি নাই বলিয়া যাহারা পশুচর্ম পরিধান করে ! যেমন বীর, তেমনি বিদ্বান, তেমনি বুদ্ধিমান !

সেনাধ্যক্ষ। তৎসত্ত্বেও ইহাদের সম্মুখে এই সুবৃহৎ দেশের গৌরবময় ভবিষ্যৎ বিস্তারিত। এখনও সতর্কবাণী অবধান করুন ! অবিলম্বে প্রস্তুত হোন, নতুবা অচিরকাল মধ্যে আপনাদের সমৃদ্ধি ও জীবন ঐ অস্তমান সূর্যের মতো বিলয়ের দিগন্ত স্পর্শ কবিবে।

সেনাধ্যক্ষের কথায় সকলের হুঁস হইল ! তাই তো, সন্ধ্যা সমাগত !

পথাধ্যক্ষ বলিয়া উঠিল—বৃথা বিতর্কে লাভ নাই, আজ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার ভোজের নিমন্ত্রণটা বিস্মৃত হইবেন না। সন্ধ্যার পরেই সময়, স্থান—এই দীনের ভবন।

অত্যাবশ্যক কার্যসূচী মনে পড়িয়া যাওয়ায় সকলে দ্রুত প্রস্থান করিল। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিবকে কেহ আহ্বান করিল না।

৪

সেনাধ্যক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে বড় বিলম্ব হইল না। পর বৎসর বর্ষাকালেই খবর আসিয়া পৌঁছিল যে, অশ্বারোহী আততায়ী আসিতেছে, এবারে আর পাঁচ শত মাত্র নয়, অগণ্য। শীতকালেই যুদ্ধের প্রশস্ত সময়, কিন্তু শত্রু বুঝিয়াছে, দুর্বল ও কাপুরুষকে আক্রমণে কালাকাল বিচারের প্রয়োজন

নাই।

এই কয়েক মাসের মধ্যে নগরের নৈতিক মেরুদণ্ড আরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। রাজপুরুষগণ দেখিয়াছে যে, সৈন্যের চেয়ে স্বর্ণ অধিক শক্তিক্ষম । তাহারা সৈন্যদল একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, কেবল সেনাধ্যক্ষের মুষ্টিমেয় অনুচরকে দূর করিতে পারে নাই। সৈন্য আর প্রয়োজন কী ? শত্রুরা কি বলিয়া যায় নাই যে, তাহারা আর আসিবে না ? আর যদিই বা আসে, যুদ্ধে বৃথা রক্তক্ষয় না কবিয়া উৎকোচ দান করিলেই কার্য সিদ্ধ হইবে।

আবার রাজপুরুষগণের জীবনযাত্রা অনুসরণ করিয়া নগরেব সাধারণ লোকেরাও বিলাসের সুলভ সংস্করণ প্রচারণায় লাগিয়া গিয়াছে। আগে যে অর্থ ও সামর্থ্য তাহারা চাষবাসে নিয়োগ করিত, তাহা দিয়া স্থানে স্থানে স্নানাগার তৈয়ারি করিয়াছে, রাজপুরুষগণের স্নানাগারের মতো তেমন মনোরম নয়, তবে মন্দও নয় ; স্থানে স্থানে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার পূজায় সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয করিয়া থাকে ; আর আগে যাহাদের গমের ও যবের রুটি হইলে চলিত, এখন অন্তত তাহার সঙ্গে মাছ মাংসের ৫/৭টি পদ আহার করিয়া থাকে ; রাজপুরুষগণের আহার্য কমপক্ষে দশপদী ; বাজপুকষগণ আগে তামার পাত্র ব্যবহার করিত, এখন রৌপ্যপাত্র ব্যবহার করে, লোকসাধারণ আগে মৃন্ময় পাত্র ব্যবহাব করিত, এখন তাম্রপাত্র ছাড়া ব্যবহার করে না। ফলকথা, সমস্ত নগর বিলাসের স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়াছে। নদীর স্রোত সমুদ্রগামী, জাতীয় বিলাসের স্রোত সর্বনাশের সমুদ্র পর্যন্ত না লইয়া গিয়া থামে না। বিশেষ সকলেই দেখিয়াছে যে, আর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া মরিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আর নিয়মচর্যায় ও সামরিক শৃঙ্খলায় আবশ্যক কী ? শত্রুকে বশ করিবার মতো নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোনও সমাজ আত্মার চেয়ে অর্থের উপরে যখন বেশি ভরসা কবে, বুঝিতে হইবে, তখন সর্বনাশের আর বিলম্ব নাই।

এই সর্বনাশের প্লাবনের মধ্যে যুগল গিরিশৃঙ্গের মতো সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অটল, অচল। সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের ভরসা এরেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, আশঙ্কার কারণ সে আর বুঝাইতেও চেষ্টা করে না ; প্রয়োজন কী। ঐ তো এক কথা শুনিতে হইবে,—মহাশয় আমাদের সৈন্য নাই থাকিল, স্বর্ণ আছে। এখন সে মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে, জয় করিবার আশায় নয়, বাধা দিবার জন্য এবং মরিবার জন্য। সময়বিশেষে জয়ের চেয়ে পরাজয় অধিকতর গৌরবদ্যোতক। সেনাধ্যক্ষ জানিত, স্বর্ণস্বাদলুব্ধ শত্রু আবার আসিবে এবং তাহা অগৌণে। কিন্তু পরবর্তী শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যে বর্ষাকালেই আসিয়া দেখা দিবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই।

পূর্ত-সচিবের অবস্থাও সমান অসহায়। সে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, এবারে বন্যার পঞ্চবার্ষিক জোর বাঁধিবার সময়, বাঁধ মেরামত না করিলে নগর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে ? শঙ্কার সতর্কবাণী বিলাসের কানে কবে প্রবেশ করিয়া থাকে ? রাজপুরুষগণের সহযোগিতা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। অর্থ কোথায় ? লোকজন কোথায় ? সেনাধ্যক্ষের মতো তাহারও অবশ্য মুষ্টিমেয় অনুচর আছে, কিন্তু বাঁধের এখন যে অবস্থা, তাহা মুষ্টিমেয়ের সাধ্যের অতীত। সে অবশ্যম্ভাবীকে মানিয়া লইয়া সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছে যে, বর্ষাকালে উভয়ের অনুচর একত্র করিয়া বাঁধ রক্ষা করিবে এবং শীতকালে আবার উভয়ের অনুচর একত্র করিয়া আততায়ীগণকে বাধা দিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, দুই বিপদ্ একত্র আসিয়া পড়িয়া তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা পর্যুদস্ত করিয়া দিবে। ধর্ম যখন মারে, তখন একেবারে সমূলে আঘাত করিয়া মারে।

একদিন বর্ষার প্রারম্ভে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধের উপর ঘুরিতেছিল, পূর্ত-সচিব এখন দিনরাত্রির অনেকটা অংশই বাঁধের উপরে কাটাইয়া থাকে। মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে জননীর মতো, বন্যাপ্রহত নগরের ঊর্ধ্বে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ—দু'জনেই নির্নিমেষদৃষ্টি। জল প্রতিদিন বাড়িতেছে,

স্রোত প্রতিদিন প্রবলতর হইতেছে ; বাঁধের উত্তরদিকের কতকটা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, এখনও নগরে জল প্রবেশ করে নাই বটে, তবে আর খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িলেই করিবে। পূর্ত-সচিবের অনুচরেরা ভগ্নস্থান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দিনে যেটুকু গাঁথিয়া তোলে, রাত্রে জল বাড়িয়া সেটুকু ধ্বসিয়া যায়। মানুষের হাতে ও নদীর স্রোতে সে এক প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছে।

বাঁধের নীচে কারিকরেরা দেওয়াল গাঁথিতেছে, উপরে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ কথোপকথনের অবকাশে তাহাদের কাজ দেখিতেছে।

পূর্ত-সচিব। নদী ইতিমধ্যেই কত প্রসারিত হইয়া গিয়াছে, ওপার আর দেখা যায় না।

সেনাধ্যক্ষ। বর্ষার সূচনাতেই এমন তো কখনও দেখি নাই।

পূর্ত-সচিব। কাল রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছি। নদী যেন দ্বিধা হইয়া নগরকে গ্রাস করিতে উদ্যত। সে যেন সাপের দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা ; একটা আসিতেছে পূব হইতে, আর একটা উত্তর হইতে, দু'টাতে মিলিয়া নগরকে জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত।

সেনাধ্যক্ষ। পূবেরটা বুঝিতে পারি, নদী। উত্তরেরটা কী ?

পূর্ত-সচিব। স্বপ্নের আবার বোঝাবুঝি !

সেনাধ্যক্ষ। বোধ করি, তাহারও প্রয়োজন আছে। উত্তর দিকের বিপদ্ও আমাদের আসন্ন।

পূর্ত-সচিব। শত্রু ? সে তো শীতকালে।

সেনাধ্যক্ষ। তাহা হইলেই মন্দের ভাল। তবে রক্ষা কিছুতেই নাই। ওই যে নগরের অগণ্য গৃহ হইতে সূপকার্যের ধূম উঠিতেছে, উঠিতেছে ক্ষীয়মাণ কর্মকোলাহল, ওই যে পথে লোক-জীবনের চঞ্চলতার চিহ্ন, আর, ওই যে আরও দূরে ছক-কাটা ক্ষেত্রসমূহে গোধূমের নবাঙ্কুর, ওই যে গৃহপালিত গো-মহিষ, ছাগ প্রভৃতি— পালনকর্তার সঙ্গে ইহারাও লোপ পাইবে!

পূর্ত-সচিব। কেমন করিয়া জানিলে ?

সেনাধ্যক্ষ। তোমার সেই স্বপ্নে দৃষ্ট দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা—

পূর্ত-সচিব। পূবেরটাকে হয় তো এবারেও সংযত রাখিতে পারিব।

সেনাধ্যক্ষ। কিন্তু উত্তরেরটা ? প্রকৃতির লোভ সীমাবদ্ধ, মানুষের লোভকে সংযত করিবে কার সাধ্য ?

পূর্ত-সচিব। আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন ?

সেনাধ্যক্ষ। কী জানি। ও কিসের গর্জন ?

পূর্ত-সচিব। নদীর। পরিচিত গর্জন।

সেনাধ্যক্ষ। তাও বটে। কিন্তু আজ সমস্তর উপরেই কেমন একটা অপরিচয়ের সূক্ষ্ম পর্দা যেন পড়িয়া গিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালে গুপ্তচর আসিয়া জানাইল যে, উত্তরদিকে অশ্বারোহী আততায়ী দেখা দিয়াছে। এই সংবাদে সেনাধ্যক্ষ বিস্মিত বা বিচলিত কিছুই হইল না, কেবল শুধাইল সংখ্যায় কত ?

অগণ্য, অসংখ্য, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ।

ঠিক হইয়াছে। যাও, রাজপুরুষদের নিবেদন করো গিয়া। আমার আর কিছু করিবার নাই। কেবল আমার অনুচরদের বলিয়া দিয়া যাও, এখন হইতে তাহারা আমার আবাসের নিকটই যেন থাকে, ডাকিবা মাত্র যেন পাই।

গুপ্তচর প্রস্থান করিল।

তাহার কথা রাজপুরুষগণের কেহই বিশ্বাস করিল না। কেহ রাগ করিল, কেহ বিরক্ত হইল, কেহ বলিল, সেনাধ্যক্ষ একবার নিজে না আসিয়া লোক পাঠাইয়া পরীক্ষা করিতেছে, কেহ বলিল, আগে আসুক, কেহ বলিল, কোষাধ্যক্ষ যেন কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত রাখে। দূত চলিয়া গেলে তাহারা পুনরায়

বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন হইল।

৫

নগরের চিহ্নিত জীবনের আরও একটা দিন গত হইয়াছে। প্রাতঃকাল। বাঁধের উপর দণ্ডায়মান পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ। তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরস্পরের মনও জানে। রাত্রের মধ্যে জল অনেকটা বাড়িয়াছে, কারিকরেরা ভাঙ্গা জায়গা বাঁধিবার চেষ্টা কবিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ। পূর্ত-সচিব, শেষে তোমার সেই স্বপ্নের কথাই সত্য হইয়া উঠিল দেখিতেছি।

পূর্ত-সচিব। কোন্ কথা ?

সেনাধ্যক্ষ। সেই উত্তর দিকের জিহ্বা।

এবারে পূর্ত-সচিব কালকার মতো আর প্রতিবাদ করিল না, উত্তর দিকের বিপদ্ সম্বন্ধে এখন তাহারা নিঃসংশয়, বস্তুত উত্তর দিগন্ত কখন চঞ্চল হইয়া উঠিবে, তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যেই বাঁধের উত্তর প্রান্তে উত্তর দিকে মুখ করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল। যে কোনও মুহূর্তে উত্তর সীমান্তে ধূলা উড়িয়া উঠিতে পারে।

মধ্যাহ্ন কাটিল, অপরাহ্ণও কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিয়া পড়িল। নগরের কোলাহল কমিল, নদীর কলগর্জন বাড়িল ; গৃহে গৃহে দীপ জ্বলিল, আকাশে তারা ফুটিল ; পূবে একখানা ঘনমেঘ উঠিল, তাহার ছায়ায় নদী চামুণ্ডামূর্তি ধরিল।

পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ বাঁধ হইতে নামিতে যাইবে, এমন সময়ে পূর্ত-সচিব চমকিয়া বলিল—ও কি!

তাই তো ও কি!

উত্তর দিগন্তে অস্পষ্ট আলোর বিন্দু।

ওখানে তো আলো দেখা দিবার কথা নয়!

যাহা নয়, তাহাই হইতে চলিয়াছে।

তবে কি—

কোনও সন্দেহমাত্র নাই।

প্রতি মুহূর্তে আলোর সারি দীর্ঘতর, আলোর দীপ্তি উজ্জ্বলতর এবং আলোর সীমানা নিকটতর হইতে লাগিল। পূর্ব হইতে পশ্চিমে যতদূর দেখা যায়, আর অসংখ্য আলোর আভায় কতদূর যে দেখা যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই, সমস্ত আলোর ফুটকিতে ভরিয়া গিয়াছে। আকাশে তারা যেমন অগণ্য, সৈকতে বালু যেমন অসংখ্য, বনস্পতিতে পাতা যেমন অজস্র, তেমনি অগণ্য, অসংখ্য, অজস্র আলোকবিন্দু! আততায়ী সর্পের মাথার মণির প্রভায় সন্ত্রস্ত হরিণ যেমন মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করে, নগরবাসীও তেমনি একপ্রকার ভাব অনুভব করিল। মৃত্যু যদি মোহন মূর্তিতে আসে, তবে তাহার ভয়াবহতা অনেকটা হ্রাস পায়। রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে বসন্তকালে সমস্ত প্রান্তর যেমন ছোট ছোট ফুলে ভরিয়া যায়, তেমনি মহেন্-জো-দড়োর উত্তরদিক্ আলোয় আলোয় ভরিয়া গেল। আর বসন্তের অরণ্যে বাতাস বহিলে যেমন একপ্রকার মিশ্রিত গুঞ্জন শ্রুত হয়, তেমনি একপ্রকার চাপা শব্দ উঠিতে লাগিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নগরবাসী সেই ভীষণ শোভার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া সে রাত্রিটা ছাদে ছাদে কাটাইয়া দিল ; আর স্থিরকর্তব্য সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধ হইতে অবতরণ করিল না, তাহাদের মন আজ লঘু, তাহাদের লক্ষ্য আজ স্থির, কেবল চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতার কালো ঘোড়াটাকে নদীর কলধ্বনির চাবুকের আঘাত বারংবার চঞ্চল করিয়া তুলিতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, সকলেই প্রভাতের অপেক্ষায় রহিল।

প্রভাত হইলে উদ্বিগ্ন নগরবাসী দেখিতে পাইল যে, দগ্ধমশালপরিকীর্ণ সেই বিশাল প্রান্তর অশ্ব ও অশ্বারোহীতে পূর্ণ। অশ্বারোহীগণের অনেকে নিদ্রিত, অনেকে সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছে ; অশ্বসকল

স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া, ঘাড় নিচু করিয়া, ঘাস খুটিয়া খাইতে নিযুক্ত। আবার আততায়ীগণ এতক্ষণ স্পষ্টভাবে অট্টালিকারণ্যসদৃশ সেই সমৃদ্ধ নগর দেখিতে পাইল, তাহাদের উৎসাহের অবধি রহিল না।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিতে পাইল যে, নগরবাসীর একটি ক্ষুদ্র দল আততায়ীশিবিরের দিকে চলিয়াছে, সঙ্গে কয়েকখানি দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ শকট। তাহারা বুঝিতে পারিল, রাজপুরুষগণ ভেট সহকারে নবোদ্ভাবিত কৌশল-প্রয়োগে নগর রক্ষা করিতে চলিয়াছে।

রাজপুরুষগণ আততায়ীদের দলপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া খাদ্যসম্ভার ও সুবর্ণমুদ্রা-পূর্ণ পেটিকা অর্পণ করিল, এবং সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, এবারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিত। দলপতি দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া জানাইল যে, তাহারা "আরিয়" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ; তাহারা উপঢৌকন গ্রহণ করে, কিন্তু উৎকোচ লয় না।

পথাধ্যক্ষ বলিল—গতবারে তো লইয়াছিলে।

ক্রুদ্ধ দলপতি তাহার মুখে চাবুকের আঘাত করিয়া বলিল—চুপ্ কর বর্বর!

দলপতির আদেশে কয়েকজন লোক আসিয়া রাজপুরুষগণের বেশবাস কাড়িয়া লইয়া তাহাদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া ফেলিল। তারপরে দলপতির আদেশে সমস্ত প্রান্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল, আততায়ীগণ যে যাহার অশ্বে চড়িয়া প্রস্তুত হইল।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিল যে, অশ্বারোহীগণ নগরের দিকে ধাবিত হইয়াছে, সারির পরে সারি, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ ; প্রথম দলের পদাঘাতেই রাজপুরুষগণ পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, তারপরে ঝটিকা-চালিত সমুদ্র-তরঙ্গ যেমন তটে আঘাতের পর আঘাত করিতে থাকে, তটভূমি রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি সমস্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। নগরবাসী যুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই স্ত্রীপুরুষ বালক বৃদ্ধ শতে শতে পলায়ন করিতে লাগিল ; একদিকে অসহায় আর্তনাদ অপরদিকে অশ্ব ও মানুষের বিজয়োল্লাস! নগর ও নগরবাসী প্রহৃত, আহত, নিহত, দলিত, মথিত, মর্দিত হইতে লাগিল।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—ভাই, আর সহ্য হয় না, চলিলাম।

পূর্ত-সচিব বুঝিল, মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া সেনাধ্যক্ষ মরিতে চলিল।

পূর্ত-সচিব বলিল—যাও, আমিও আসিতেছি, কিন্তু নগর অধিকৃত হইতে দিব না—ইহা নিশ্চয় জানিও।

সেনাধ্যক্ষ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সব বুঝিল, তাহারা পরস্পরের মন ভাল করিয়াই জানিত।

নিঃসঙ্গ পূর্ত-সচিব দেখিল, মুষ্টিমেয় অনুচর-পরিবৃত সেনাধ্যক্ষ শত্রুসৈন্যমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আর প্রবল আবর্তে তৃণখণ্ড ভাঙিয়া যেমন শত খণ্ড হইয়া কোথায় বিলীন হয়, সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সৈন্য কয়জন মুহূর্তমধ্যে তেমনি কোথায় তলাইয়া গেল!

সেনাধ্যক্ষ তাহার ঋণ শোধ করিল, রাজপুরুষগণ আগেই করিয়াছিল, এবারে পূর্ত-সচিবের পালা। সে দেখিল যে, বহু সহস্র অশ্বারোহী বাঁধের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিল, সুযোগ আসিয়াছে। সে একবার নদীর দিকে তাকাইল, কাল রাত্রিতে বন্যার জল ও স্রোত দুই-ই বাড়িয়াছে!

তখন সেই বৃদ্ধ বাঁধের উপর নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল, বসিয়া পড়িয়া করজোড় করিয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া বলিল, হে মৎস্যদেব, এ নগর তোমার, তুমি ইহাকে রক্ষা করো। হে মৎস্যদেব, এ নগর তোমার আশ্রিত, শত্রুকবলগ্রাসের গ্লানি হইতে তুমি ইহাকে রক্ষা করো। হে মৎস্যদেব, আমি দুর্বল আমার মনে বল দাও।

তারপরে সিন্ধুনদের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল—হে নদ, এতদিন তোমাকে বিষম শত্রু মনে করিতাম, আজ তুমি পরম মিত্র! হে নদ, এতদিন তোমার গ্রাস হইতে নগর-রক্ষায় প্রাণপণ করিয়াছি,

আজ বুঝিতেছি, তোমার গ্রাসই নগর-রক্ষার একমাত্র উপায়। হে নদ, তুমি নগর গ্রাস করো, গ্রাস করিয়া শত্রুকবল হইতে রক্ষা করো। হে নদ, তুমি মৎস্যদেবের বাহন, এ নগর মৎস্যদেবের আশ্রিত, তুমি তাহাকে আপন আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রক্ষা করো।

তারপরে আর্তকণ্ঠ আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—বল দাও, দেবতা, বল দাও।

এই বলিয়া নীচে যেখানে কারিকরগণ বাঁধ মেরামত করিতেছিল, সেখানে সে নামিয়া গেল—চিৎকার করিয়া বলিল—লাগা, লাগা, সকলে হাত লাগা।

প্রভুর উৎসাহবাক্যে সকলে দ্বিগুণ বেগে প্রাচীর গাঁথিতে শুরু করিল ; কিন্তু পূর্ত-সচিব বলিল—না, না, আজ উল্টো হাত লাগা!

সে কি, প্রভু !

ঐ তো রে। যখনকার যা নিয়ম। ভাঙ। ভাঙ। বাঁধ ভাঙিয়া ফেল!

সকলে ভাবিল, পূর্ত-সচিব উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যথা করিতে পারিল না, যেহেতু তাহারা প্রভুর আদেশ পালনে অভ্যস্ত, বিশেষ দেখিতে পাইল যে, স্বয়ং প্রভু বাঁধ ভাঙিবার কাজে অগ্রণী হইয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

সকলে বাঁধ ভাঙিতে লাগিয়া গেল। গড়া কঠিন, ভাঙা সহজ। ভাঙন অপ্রত্যাশিত দ্রুত বাড়িয়া চলিল, বিশেষ সঙ্গে ছিল বন্যার প্রচণ্ড সহযোগিতা। দেখিতে দেখিতে দণ্ড দুই সময়ের মধ্যে বাঁধের একটা বিরাট্ অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়া সেখানে জল ঢুকিল , জলের পথ মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়িতে লাগিল, এবং এক সময়ে একটা সুবৃহৎ তরঙ্গের প্রচণ্ড ধাক্কায় বাঁধের সমগ্র উত্তর অংশটা খসিয়া পড়িয়া মৎস্যদেবের তরঙ্গশীর্ষ বিজয়রথ নগরমধ্যে বিজয় উচ্ছ্বাসে ঢুকিয়া পড়িল।

জলের প্রথম আঘাতেই সানুচর পূর্ত-সচিব কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণ পরে পূর্ত-সচিবও তাহার ঋণশোধ করিল।

সমস্ত নদীটা যেন নগরমধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

অশ্বারোহীগণ পার্শ্বে তাকাইয়া দেখিল—এ এক অপ্রত্যাশিত সঙ্কট! নদী তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে আসিতেছে' জল অতলস্পর্শ। তখন পিছু হটিবার তাড়া পড়িয়া গেল। একদল অশ্বারোহী অপর দলকে মথিত করিতে লাগিল, সকল দলই ডুবিয়া মরিল। অশ্বারোহীগণ প্রান্তরবাসী, নদীকে তাহাদের বড় ভয় ছিল, অবশেষে সেই নদীই তাহাদের আক্রমণ করিল ! সকলে ডুবিল ! নগরবাসী ও অশ্বারোহী কেহই প্রাণে বাঁচিল না। কেবল যে-সব অশ্বারোহী জলের সীমানার বাহিরে ছিল, তখনও নগর-সমীপে আসিয়া পৌঁছায় নাই, তাহারাই বাঁচিল ; তাহারা অশ্বের মুখ ফিরাইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুততর বেগে ছুটিয়া পালাইল।

প্রাতঃকালে যেখানে ধনজনসমৃদ্ধ মহানগর ছিল, সন্ধ্যাকালে সেখানে দেখা গেল, দুস্তর জলমরুর অমেয় বিস্তার।

পূর্ত-সচিব সত্যই তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে, নগর শত্রুগণ কর্তৃক অধিকৃত হইতে দেয় নাই

চরাচরব্যাপী সেই তরল অন্ধকারের ভূমিকার উপরে নিত্যকার মতো সেদিনেও নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারাগুলি উঠিল। *

ধনেপাতা

* এই গল্প রচনায় ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ তথ্যের কাছাকাছি থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসের দুটি কারণ অনুমান করা হয়, সিন্ধুর বন্যা ও আর্য জাতির আক্রমণ। ইতিহাসের সহিত যেটুকু কল্পনা মিশাইলে গল্প হয়, তাহার বেশি কল্পনা না মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

স্বাহা

যুবনাশ্ব

কম্পিত ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে দাস সায়েব উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভারী চোখের পাতার কোণ থেকে বড় বড় [illegible]টা স্ফীত নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। জানালার শার্সিতে হাত ভর দিয়ে, তারই মধ্যে মুখ গুঁজে সরকারের খেতাবি উজির, পঞ্চাশ বছরের বুড়ো দাস সায়েব ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন। আবেগ-প্রাবল্যে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠতে লাগল।

নীচে লাল সুরকির সরু রাস্তা ধরে ডাক্তারের টু-সিটার সশব্দে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে মিসেস দাসের গলা শোনা গেল, ওগো, তুমি এত অধীর হচ্চো কেন ? যা গেচে, তা কি ফিরবে আর ? আর কষ্ট কি তোমারই একার ? আর কারও বুকে কী তোমার মতোই লাগেনি ? কথা শোনো··· এদিকে এসো—

দাসেব কাঁধে হাত রেখে মিসেস দাস কোমর থেকে একটা সিল্কের রুমাল বের করে, চোখ মুছে ও নাক ঝেড়ে, কপালে হাত দিয়ে চুল ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বললেন, এখনকার যা কাজ সে সম্বন্ধে তো উদাসীন থাকলে চলবে না। সোফারকে গাড়ি দিয়ে মার্কেটে পাঠিয়েচি ফুল আনতে, রতন নীচে ফোনে বসে আছে রাজ্যিসুদ্ধ লোকের শোকপ্রকাশের জবাব দিতে।

দাস সায়েব কাঁধ থেকে মিসেসের হাত নামিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে না তাকিয়েই ক্লান্ত ধরা গলায় বললেন, আমায় মাপ করো লীলা, যা করবার তুমিই করো, ওসব তুমিই ভাল বোঝো। আমি একটু একা থাকতে চাই। —বলে স্খলিত পায়ে তিনি ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস মিনিট খানেক বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁধ ঝাড়া দিয়ে স্বামীর উদ্দেশে বললেন, মেয়ে তোমার শুধু একারই মরেনি, তাই বলে ঢঙ করতে শিখিনি আমরা। বাড়াবাড়ি কিছুরই ভাল নয়, দু'ফোঁটা চোখের জল বেশি ফেললেই কী আর মরা মেয়ে ফিরে আসবে ? যখনকার যা তখনকার তা। মেয়ের শোকে এখনকার কর্তব্য ভুললে চলবে কেন ?···· দেখি কাদের ওখান থেকে আবার ফুল নিয়ে চিঠি এসেচে, জবাবটা লিখে দিগে—

আর একবার কপালে ও চুলে হাত বুলিয়ে তিনি দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলেন।

ড্রইংরুমের দক্ষিণে লটির শোবার ঘর। একটা দরজা মাঝে, ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। ঘরের সাথে পশ্চিমে স্নানের ঘর, পূবে চওড়া বারান্দা, টবে ও অর্কিডে সাজানো। সে দিকে দু'টো দরজা। ঘরের ঠিক মাঝখানে চওড়া খাটটার ওপর আপাদমস্তক কাশ্মীরি চাদরে ঢাকা, তেইশের কোঠা না পেরতেই অচিন পথের দেওয়ানা, লটি দাস শুয়ে আছে। দু'একগাছা চুল বালিশের ওপর দিয়ে এসে এপাশে ওপাশে ঝুলছে। শোওয়ার ধরন-ধারণ এত স্বাভাবিক যে, দেখলে মনে হয় রোজ যেমন সে খাওয়ার পর একটা বই হাতে করে শুয়েই অমনি ঘুমিয়ে পড়ত, আজও তেমনি পড়েছে। মাথার দিকে আয়নার টেবিলে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তেমনি সাজানো। আজ কেবল রুপোর চিরুনিটার দাঁতের ফাঁকে একগাছা চুলও বেঁধে নেই, আর টেবিলের চকচকে মেহগ্নিতে এক ফোঁটা পাউডারও পড়েনি।

লটির হাত দু'খানা বুকের ওপর, মাথাটা ডাইনে কাঁধের দিকে একটু হেলানো। চাদরের ভেতর দিয়ে আর কিছু দেখা যায় না।

কিন্তু কেউ যদি মুখের চাদরটা উঠিয়ে ফেলত, তবে দেখতে পেত, লটির আজকের ঘুম প্রকাণ্ড প্রশান্তির ঘুম নয়। অল্প ফাঁক ঠোঁট দু'টিতে অতৃপ্তির প্রত্যাশা মাখানো। মুদিত চোখের কোণ বেয়ে যে অশ্রুধারা ছাপ রেখে গেছে, তার উৎস শুধু দৈহিক যন্ত্রণাই খুলে দেয়নি। নাকের ডগার যে লালিমাটুকু

মরণ এখনও মুছে নিতে পারেনি, তার পেছনে অনেক অনুক্ত বেদনার কাহিনী পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

লটি দাস ··· সোসাইটির নামকরা সুন্দরী মেয়ে লটি! রূপে গুণে তার তুলনা ছিল না। যে পার্টিতে তার যাওয়া হত না, সেখানকার ছেলেবুড়ো সবাই মনমরা হয়ে উঠত তার অভাবে। যে ডিনারে সে যোগ দিত না, সেখানকার প্রত্যেকটি ডিশ বিস্বাদ হয়ে উঠত। তার একটি কথা রাখবার জন্যে দরকার হলে কেউ কেউ প্রাণ দিতে পারত। ছোকরা ব্যারিস্টার সরকার বিলেত থেকে গোঁফের ধার ছেঁটে মর্কট সেজে এসেছিল। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউ তাকে বড় করে রাখতে অথবা কামিয়ে ফেলতে রাজি করাতে পারেনি। লটির একবার নাক সেঁটকানোর মর্জিতে সে-জোড়া সমূলে অন্তর্হিত হয়েছিল। ষাট বছরের বুড়ো, পেনশানভোগী সিবিলিয়ান হালদার সায়েব, তাঁর তিরিশ বছরের মৌতাত, হাভানা সুদ্ধ লটিকে তুষ্ট করবার জন্যে ছেড়ে, সিগারেট ধরেছিলেন। সমাজে লটির প্রতিপত্তি ছিল অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো।

ঘণ্টা দুই-আড়াই হ'ল লটির মৃত্যু হয়েছে, এরই মধ্যে ফোনে ও লোকের মারফৎ খোঁজ খবরের ভিড় শুরু হয়ে গেচে। একতলার হলকামরা কালো পোষাকে ও ক্রেপে অন্ধকার হয়ে উঠেছে। সাদা ফুল লটির ঘরে আসছে, ঘর ভরে উঠল বলে। সমাগত শোক প্রকাশকদের নিয়ে মিসেস দাসের ব্যস্ততার আর অবধি নেই। আদর, অভ্যর্থনা, ঘন ঘন শুকনো চোখে রেশমি রুমাল বুলানো, 'মিস্টার দাসের হঠাৎ এই খানিক আগে শরীরটা—' বলে তাঁর হয়ে মাপ চাওয়া—অনবরত চলছে। অভ্যাগতদের মধ্যে কলকাতার বড়দরের কতিপয় ইংরেজ ও বহু বাঙালি সায়েব মেমের মধ্যে বিশেষ কেউ আর বাকি নেই। কেউ বিষণ্ণ মুখে চুপ করে আছেন, কেউ মিসেস দাসকে দু'একটা সান্ত্বনার কথা বলছেন—কেউ চাপা গলায় অস্ফুটস্বরে লটির বিষয়ই আলোচনা করছেন।

যাঁরা আসতে পারেননি তাঁদের মধ্যেও লটির মৃত্যুসংবাদ কম আলোড়নের সৃষ্টি করেনি। কেউ হয়তো হাইকোর্ট বেরোবার মুখে খবর পেয়ে ফিরে এসেছেন, লটি, লটি দাস! এমন হঠাৎ—কেন, কী হয়েছিল তার! এমন শক্ত কিছু হয়েচে বলে তো আগে শুনিনি—

একটু একটু ক'রে তাঁর মাথায় সমস্ত স্মৃতি একের পর এক ভেসে উঠেছে।

—লটি আমায় দুটো ফুল দিয়েছিল দে'র গার্ডেন পার্টিতে। দিন কয়েক পর আমি একটা ব্রোচ প্রেজেন্ট নিয়ে যেতে তার মুখ ভার, ··· শেষে মায়ের তাড়ায় বেচারিকে রাজি হ'তে হ'ল। মিসেস সরকারের বুক্-টিতে সে way of an eagle হয়ে গেছল। প্রথম ধরি আমি—good gracious! ও কি বারোটা। ডি, সি-র সাথে একটা কনসলটেশন ছিল যে,—ঘড়িটা বেগড়ায়নি তো! ···

সকাল প্রায় সাতটায় লটির মৃত্যু হয়েছে। শরীরটা অসুস্থ ছিল ক'দিন থেকে, কাল সারাদিন ঘর থেকে বারই হয়নি। আজও সকালে চা খেয়েছে ঘরেই। খানিকক্ষণ পরে বাথরুমে গোঙানির শব্দ শুনে মিসেস দাস ছুটে গিয়ে দেখেন, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আসল ব্যাপার কী, আর কারও জানা না থাকলেও মিসেসের অজানা ছিল না। কিন্তু সে কথা তিনি যে জন্যেই হোক, কাউকে বলা উচিত মনে করেননি। সেবা শুশ্রূষা ডাক্তার কিছুরই ত্রুটি হয়নি, কিছুতেই তাকে ধরে রাখা গেল না, এমন কী যে মায়ের কথা সে জীবনে কোনদিন ঠেলেনি, তাঁর সহস্র কাতরোক্তিতেও না।

ডাক্তার পরীক্ষা করে সবই বুঝতে পেরেছিলেন, দাস সায়েবকে বলেও গেছেন। কিন্তু সে তো বাইরে বলা চলে না। মিসেস দাস সবায়ের প্রশ্নের জবাবে বলছেন, না। স্লিপ করে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথা ঠুকে যায় ওয়াশ বেসিনের কোনায়; ব্রেইন কন্‌কাশন, দু'ঘণ্টা পুরোও রাখা গেল না,—সঙ্গে সঙ্গে চোখে রুমাল।

মিসেস দাসকে হৃদয়হীনা মনে করলে ভুল করা হবে। হৃদয় তাঁর সত্যিই ছিল, শুধু মায়া-মমতার জায়গায় সোসাইটি ও ফ্যাশন তাঁর সবটুকু জুড়ে ছিল। নিজে তিনি ছা-পোষা ঘরের মেয়ে। পঁচিশ

বছর আগে যখন ডেপুটি নরেন দাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, দাস তখন যাযাবর বৃত্তি ধরে বাংলাদেশের মহকুমায় মহকুমায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

দাসের মতামত বরাবরই একটু সায়েবি। ওটা পৈতৃক উত্তরাধিকার, তাঁর বাবা রমেশ দত্তদের আমলের ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হিন্দু ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর বিলিতিয়ানায় তাঁকেও মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হ'ত। মুখে কিছু বলা সম্ভব হ'ত না, কিন্তু মনে মনে তিনি স্ত্রীর ধরন-ধারণ অপছন্দ করতে শুরু করলেন।

বিয়ের বছর তিনেক পর যখন লটি হ'ল, মিসেসের নব-উন্মেষিত সভ্যতার চক্ষু গিয়ে তার ওপর পড়ল। স্বামীর কাছে আমল না পেয়ে তিনি মেয়ের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে পড়লেন। লটির বছর ন'য়েক বয়েসের সময় তিনি স্বামীর কর্মস্থল পিরোজপুর মহকুমা ত্যাগ করে সকন্যা দার্জিলিং-এ সমারূঢ়া হলেন। উদ্দেশ্য স্থায়ী অবস্থান, উপলক্ষ মেয়ের শিক্ষা।

মায়ের নিপুণ তত্ত্বাবধানে মেয়ের পড়াশুনা ও তার ফিরিঙ্গীয়ানা তড়িৎগতিতে অগ্রসর হ'তে লাগল। সতেরো বছর বয়েসে লটি পিয়ার্সন ম্যাগাজিনে কবিতা ও ত্রিলোক মানে তিন্‌ঠো আদমি বলতে শিখলে।

কুড়ি বছর বয়েসে তার পিয়ানো বাদন ও ইংরেজি অভিনয় পটুতার খ্যাতি দার্জিলিং মেলে সাঁড়া ব্রিজ পার হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছল।

এই সময় একদিন 'কলকাতা গেজেটে' খবর বেরোলো যে, দাস সাহেব অস্থায়ীভাবে অতিরিক্ত জেলা কলেক্টরের পদে উন্নীত হয়ে আলিপুরে বদলি হয়েছেন।

কলকাতায় এসে প্রথম শ্রেণীর ইঙ্গবঙ্গ সমাজে মিশতে ডেপুটিজায়ার যে অসুবিধে, মেয়ের দৌলতে মিসেস দাস তা কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। লটির খ্যাতি প্রতিপত্তির জোরে হোমরা-চোমরা বাঙালি সায়েব-মেম মহলের সব দরজাই তাঁর জন্য উন্মুক্ত হতে লাগল।

লোয়ার সারকুলার রোডের এক ফ্ল্যাটে দাস সায়েব বাসা নিয়েছিলেন। আসবাবপত্র এল পার্ক স্ট্রিটের বিলিতি দোকান থেকে, মোটরও এল একখানা—ফোর্ড। মোটর নিয়ে সায়েব মেমে প্রথম দিনই বচসা হয়ে গেল। মিসেস বললেন, আমি হেঁটে বেড়াব সেও ভাল, কিন্তু তোমার কলের টমটমে চড়তে পারব না।

দাস ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, বেশ তো ! বয়েস হলে হাঁটার মতো ভাল জিনিস কী আর আছে ?

মিসেস ঠাট্টা গায়ে না মেখে বললেন, মল্লিক সায়েবের মেম ডেমলার কিনলে সেদিন, তারাও তো আর ক্যাশ সব টাকা দেয়নি।

—সত্যি কথা। মল্লিক নগদ দেয়নি, কিন্তু দেবে। অর্থাৎ দিতে পারবে। কারণ মাস গেলে সে বেতন পায় সাতাশশো, আর আমার ? হপ্তা খানেকও হয়নি, সাড়ে আটশোর কোটা পেরিয়ে বারোশো পঁচাত্তরে ঠেকেচে।

জবাবে মিসেস দুর্বোধ্যভাবে যা-তা বলে উঠে গেলেন।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ওই ফোর্ডগাড়ি, কলকাতার সবচেয়ে দামি গাড়ি হয়ে উঠল। ওই গাড়িতে লটির পাশে একটু বসবাব জায়গা পেলে, বৃহৎ রোলস মিনার্ভা-র মালিকও নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন। দেখে শুনে. মিসেস দাস হেঁটে বেড়ানোর শুভ সংকল্প ত্যাগ করলেন।

সোসাইটি পুরোমাত্রায় চলতে লাগল।

দিন কতক পর একদিন রাতে শুতে যাবার আগে দাস সায়েব মিসেসকে বললেন, দ্যাখো, মল্লিকের ছেলের সঙ্গে লটির বেশি মেলামেশা আমি পছন্দ করিনে।

মিসেস ভ্রূ কপালে তুলে বললেন, কে, [illegible] . The finest young man in society ! তেরো

বছর বিলেতে ছিল, পাব্লিক স্কুল আর—

—আমি জানি। একটি আস্ত বাঁদর হয়ে ফিরে এসেচে, তাও জানি।

—কে বললে তোমায় ? নিশ্চয়ই কেউ চুকলি করেচে। ওগো, ঘটে যদি তোমার একটুও বুদ্ধি থাকত, তবে তুমি এসব ভাবতেও না। অমন বাপমায়ের ছেলে, জুনিয়ারদের মধ্যে পসারও হয়েচে মন্দ নয়। আর তা ছাড়া—ও-ও-লটিকে, ইয়ে, খুব সাধারণভাবে দেখে না। কে কোথায় কী কানে তুলেচে, তাই তাকে cut করতে হবে ?

স্ত্রীব দিকে একটু কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাস বললেন, শোনো লীলা, অত কথা আমি শুনতেও চাইনে, বুঝতেও চাইনে I don't want Mullick Jr. to get thick with Lottie, ব্যাস্।

তিনি বিছানায় গিয়ে উঠলেন।

মিসেস কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। তাবপর তাচ্ছিল্যেব সুরে বলে উঠলেন, ইস। ভা-রী-তো।

মুখে বললেন বটে, ইস্, কিন্তু স্বামীকে তিনি চিনতেন। বেশি কথার মানুষ তিনি নন, গায়ে পড়ে বড় কিছু বলতেও আসেন না। আজকের পব প্রকাশ্যভাবে টুটুর সাথে মেলামেশা যে তিনি বরদাস্ত করবেন না—এ সুনিশ্চিত। কিন্তু তা বলে তার নিজেরও তো একটা মতামত আছে. মেয়ের ওপর দাবি কি শুধু একা বাপেরই। স্বামীর কথামত চললে সোসাইটিতে মুখ দেখানো কঠিন হয়ে উঠবে যে। মল্লিক বাড়িতে তো ঢোকাই যাবে না—ছিঃ।

এমন সময় লটির গলা শোনা গেল, মাম্,—মাম্—তোমার চিঠি, নেলিদের ওখান থেকে—

—ইয়েস ডিয়ার, বলে মিসেস উঠে গেলেন।

পরদিন বিকেলে সার এস. এন. দত্তের ফটকের সামনে দাসের ফোর্ড এসে দাঁড়াতেই ইজেরকোর্তার তবকজোড়া কতিপয় ইয়ং মেন এগিয়ে এসে মিসেস ও মিস দাসকে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিলে।

শেষ টান দিয়ে সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ছুড়ে ফেলে টুটু মল্লিক বললে, by jove, Baby, you are late ! ঝাড়া একঘন্টা আমরা তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে। Couldn't you come earlier ?

মৃদু হেসে লটি বললে, না ড্যাডির অপিস থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হল আজ, তাই—

—Hell ! চলো, মিসেস দাস এগিয়ে গেছেন।

টুটু একটা সিগারেট বার করে বাঁ হাতের উল্টো পিঠে ঠুকতে লাগল।

মল্লিক জুনিয়ারকে লটি যে খুব পছন্দ করত, তা নয়। কিন্তু মনের অপছন্দকে ব্যবহারে প্রকাশ করবার মতো সাহসও তার ছিল না, শিক্ষাও হয়নি। টুটুর ধরন-ধারণ ক'দিন থেকে একটু কেমন কেমন ঠেকলেও সে কিছু গায়ে মাখেনি। চলতে চলতে টুটু বললে, কী হবে এখুনি ওই বুড়োদের দলে ভিড়ে ? চলো, একটু বেড়ানো যাক বাগানের দিকে।

লটি বললে, কিন্তু মাম miss করবে আমাকে—

—আশ্চর্য ! তুমি কি কচি খুকি রয়েচে এখনও ? মা-র আঁচল ধরে ঘুরতে হবে !

—তা নয়। তবে কারও সাথে দেখা হবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—

—কী হবে দেখা করে ? ওখানে গেলেই তো ভায়োলেট মিত্তিরের ক্যাটকেটে গলার সুর ভাঁজা, না হয়, রেণু চৌধুরীর damned Bengali songs শুনতে হবে।

—বাঙলা গান আমার খুব ভাল লাগে।

—কবে থেকে ? সেদিন পর্যন্ত তো দেখেচি, বাঙলা তুমি ভাল বোঝই না—

—তারপর শিখেচি।

অপ্রসন্ন মুখে টুটু বললে, বেশ, চলো তাহলে।

দু'জনে গিয়ে ড্রইংরুমে উঠল।

লেডি দত্ত লটির হাত ধরে বললেন, বড্ড দেরি হল, লটি, তোমাদের। এসো এ ঘরে, কিছু মুখে দেবে চলো।

গৃহকর্ত্রীর কথা শুনে অভ্যাগতদের জনকয়েক কিচির মিচির করে উঠল, Oh dear, no ! Don't rob us of her company !

হালদার সায়েব পাকা ভুরু জোড়ার ওপর প্যাঁসনেটা বসিয়ে বললেন, তা হলে বিভা, খাবারটাই এখানে আনার ব্যবস্থা করো। এসো গো, মা লক্ষ্মী, এইখানে এসো, বলে তিনি হাত ধরে লটিকে নিজের পাশে বসালেন।

লটি বসে, অল্প হেসে বললে, আজও খেয়েচেন ওগুলো।

একটু বিব্রত হয়ে অপরাধীর মতো হালদার বললেন, খুব কম মা, খুব কম। তিরিশ বছরের মৌতাত—তা আজ সমস্ত দিনে মাত্র ছ'টা খেয়েচি।

লটি বললে, বা রে, বেশ তো। আমি কী আপনাকে একেবারে হঠাৎ ছেড়ে দিতে বলেচি ? কমাতে কমাতে ছেড়ে দেবেন।

হালদার আশ্বস্ত হয়ে লটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, মা লক্ষ্মী ! তারপর শুধোলেন, দাস এল না যে ?

মিত্র সায়েবের মেমের সাথে মিসেস দাস পর্দার কাপড়ের ডিজাইন নিয়ে বচসা করছিলেন; হালদার সায়েবের কথা কানে যাবামাত্র বলে উঠলেন, তাঁর মাথাটা বড় ধরেচে আজ, তাই আর বেরোতে পারলেন না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে, ভ্রূকুটি করে লটি পিয়ানোর পাশে রেণু চৌধুরীর কাছে উঠে গেল।

বাইরে, বাগানের ধারের বারান্দায় টুটু মল্লিক ও ভায়োলেট মিত্তির সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছিল।

আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে ভায়োলেট বললে, Horrid ! গাঁজা।

মল্লিক বললে, Sorry ! my brand–

— I know, but not mine বলে, ভায়োলেট আংটা আঁটা রেশমি ব্যাগ খুলে সুদৃশ্য ছোট সোনার কেস বার করে খুলে ধরে বললে, try ?

একটা তুলে, নিজের নিঃশেষিতপ্রায় সিগারেটটা থেকে ধরিয়ে নিয়ে, লম্বা একটান দিয়ে টুটু বললে, ঘাস খেলেই পারো।

—খাইনে বলেই তোমাকে চিনেচি। তারপর what about your latest ?

কপালে চোখ তুলে টুটু বললে মানে ?

—ন্যাকা, কিছু বোঝো না, না ? ওসব আমার কাছে নয়। I am–

—কী বাজে বক্‌চ ভায়োলেট।

—কি বাজে বক্‌চ ? খ্যাপা কুকুরের মতো লটি দাসের পাছ নিয়েচ, শুধু আমি কেন, a host of others waiting ! চোখ এড়ানো অতই সোজা।

— I say, Vi, আস্তে আস্তে, তুমি বড্ড চেঁচিয়ে কথা কও।

— Fiddlesticks ! What do I care ? সবাই জানুক, সেই তো আমি চাই। তুমি যে কী চিজ—

—আহা চটো কেন ? কী করতে চাও তুমি, আমায় ফাঁসাবে ? সে তুমি পারবে না, তাহলে সাথে সাথে নিজেকেও ফাঁসতে হবে এবং তোমার রাঁচির মীনা মাসি—, কথা শেষ না করে টুটু রেলিংয়ে বসে দেয়ালে ঠেস দিলে।

ভায়োলেট ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বললে, ও।—That's what you are banking on ? ভাল করেচ মল্লিক জুনিয়র, মেয়েদের তুমি চেনোনি। নিজে আমি যাই করে থাকি না কেন, —to save that innocent kid's honour, I can risk my own–এই মুহূর্তে I shall warn Lottie, এই বলে যাচ্ছি তোমাকে আমার কথা বাদ দাও, —আমি old sport, আর সবার কথা ? যারা জানে, তাবা সবাই জানে—

একটু বিব্রত হয়ে টুটু বললে, Don't be silly, Violet ! হেল্লো, এই যে সরকার এসো এসো। ওকি তোমার গোঁফ কোথায় গেল ? দেখেচ ভায়োলেট—

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে তাকিয়ে ভায়োলেট বললে, বাঁচলে এখনকার মতো। তারপর সবকারের দিকে তাকিযে বললে, আমি জানি। আব কেন কামিয়েচে তাও জানি।

আমতা আমতা করে সবকাব বললে, হেঃ, কি জানেন আপনি ? আমাব খুশি আমি কামিয়েচি।

ভায়োলেট বললে, বটে, ডাকব লটিকে ?

মুখ চুন কবে সরকার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল।

মল্লিক বললে, কেন ওকে ঘাঁটাচ্চ সবকাব। তারচেয়ে চলো, গলাটা একটু ভিজিয়ে আসা যাক। শুকিয়ে কাঠ হযে উঠেচে। যাবে নাকি ভায়োলেট ?

—I refuse to drink with you.

গলা ভিজিযে সরকার আর মল্লিক যখন ফিরল, তখন পিয়ানোতে লটি গান গাইছে। একপাশে পিযানোয ঠেস দিয়ে ভায়োলেট একখানা বিলিতি স্বরলিপির পাতা ওল্টাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে লটিব মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

সে মুখ তাকিযে দেখবাব মতো। যথেষ্ট হিংসার কাবণ থাকা সত্ত্বেও ভায়োলেট মনে মনে তারিফ না কবে পাবছিল না।

লটিব গান শেষ হবামাত্র ঘন ঘন করতালির সঙ্গে সবাই thank you, thanks, বলে চেঁচিয়ে উঠল।

মল্লিকজায়া বললেন, একখানা গেয়েই ফাঁকি দেবে ? আর একটা হোক না— সেই *lovely lads of ludlow*–

লটি বললে, বাঃ, আমি তো খানিক আগেই আরও দু'খানা গেয়েছি। একা আমিই entertainment এর ভার নেব নাকি ? আর কারও গাওয়া উচিত—

মিসেস রায় বললেন, তা তো বটেই, বেচারি হয়রান হযে পড়েচে। তাহলে ভায়োলেট, you're nearest the piano—

ভায়োলেট বললে, আমায় গাইতে বলার সেই বোধহয় একমাত্র কারণ ? Of course, don't mind, বলে সে বসে পড়ল।

মিসেস রায় লজ্জিত হয়ে বললেন, না, না, তা কেন।

লটি উঠে হালদার বুড়োর পাশে এসে বসল। বুড়োকে সে মনে মনে ভারী পছন্দ করত, শ্রদ্ধাও করত। শিশুর মতো সরল মানুষ। এই পরবেশী ও পরভাষী সমাজে তিনি যখন তাকে মা-লক্ষ্মী বলে ডাকতেন, তখন তার সত্যিই খুব ভাল লাগত।

বসেই কব্জির দিকে তাকিয়ে লটি বললে, ঈস্, রাত যে অনেক—

—কটা ?

—দশটা দশ।

—তাহলে একটু রাত হয়েচে বটে। কেমন লাগল তোমার আজকের পার্টি ?

—বেশ।

—বিভা ভারী ভাল মানুষ, না ? একটু সেকেলে, তা আমাদের কাছে তাই ভাল লাগে। হালের চালচলন পছন্দ হয় না আমার, তবে ববদাস্ত করে যাই।

—তাহলে, আমাদেরও ভাল লাগে না আপনার ?

—তুমি বড় কথা কাটো, মা লক্ষ্মী, আমি কি তাই বললুম ? তবে, এই আজকালকার সবাই, এত ছোট সব জিনিস নিয়ে এরা থাকে, ভাল লাগে না। চালচলনও সব কেমন যেন। এই ধরো না ইয়ং মল্লিক, well to be frank, I detest the fellow !

টুটু মল্লিক একপাল মেয়ের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিল। লটি সেদিকে তাকিয়ে দেখলে, হালদারের কথার জবাব দিলে না।

মিসেস দাস গৃহকর্তার সঙ্গে দামি দামি মোটরেব গল্প করছিলেন। লটি তাঁকে বললে, It's getting late, Mum—

—কেন কটা বেজেচে ?

— Time we were gone ! সাড়ে দশ।

সার এস. এন. বললেন, সেকি এখ্খুনি—?

মিসেস দাস বললেন, হ্যাঁ ওঁর শরীরটা ভাল নেই আজ।

—তাহলে—

হ্যাঁ, উঠি তাহ'লে। এসো লটি। ও লটি, দেখোতো গাড়ি এসেচে কিনা—টুটু মহিলাচক্র ত্যাগ করে এগিয়ে এসে বললে, ও আর দেখে কী হবে! চলুন আমিই পৌঁচে দিযে আসি।

লটি আপত্তি কবে বললে, না, না, তাতে কাজ নাই। কী হবে খামখা। আর এত রাতে, কষ্ট করে—

—Pleasure, কষ্ট নয়, চলুন।

মিসেস দাস পুলকিতভাবে বললেন, অনেক ধন্যবাদ, টুটু, so kind of you. আচ্ছা, গুডবাই—বাই—

সম্মিলিত হাতনাড়া ও অভিবাদনের কোলাহল ত্যাগ করে তিনজনে বেরিয়ে এলেন। দু'সেকেণ্ড পর মল্লিক জুনিয়ারের লম্বা নিচু স্পোর্টিং সানবীম নিঃশব্দে কম্পাউণ্ড পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

ড্রইংরুমে বসে সানবীমে টুটু মল্লিকের স্থানে নিজেকে কল্পনা করে সরকার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

মাস তিনকে পরের এক রবিবাব।

দুপুরের খাবার পর লটি তার শোবার ঘরে বইয়ের সেলফের কাছে বছর খানেকের জমানো ন্যাশ ও স্ট্রাণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করছিল। পরনে লালপেড়ে গরদ, গায়ে ওই কাপড়েরই একটা ঢিলে আস্তিন জামা। ভিজে চুলের বোঝা ডগায় গেরো দিয়ে পিঠের ওপর ছাড়া।

জানলা দিয়ে একরাশ হেমন্তের মিঠে রোদ তার গায়ে পিঠে এসে পড়েছে।

সে গুন গুন করে রেণু চৌধুরীর কাছে সম্প্রতি শেখা একটা বাঙলা গানের এক চরণ ভাঁজছিল, আর তারই ফাঁকে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছিল।

—ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে··· গুনগুনিয়ে। বা রে গ্ল্যাক্সো বেবি ! দেখলেই চুমো খেতে ইচ্ছে হয়।··· ঘরেতে···

দরজার কাছে শব্দ শুনে সেদিকে না তাকিয়েই সে বললে, কোন্ হ্যায়—

পর্দার ফাঁকে শ্বেতশ্মশ্রু 'বয়ে'র পাগড়ি দেখা গেল।

—কেয়া হ্যায়, বয় ? সাব্ বোলা রাহা ? বহুৎ খু'—বোলো ময় আ রহি—আভী হি—

উঠে টয়লেট-র‍্যাকের ওপর থেকে তোয়ালে নিয়ে, মুখ হাত পা ভাল করে মুছে, কপালের ওপর ব্রাশটা দু' একবার বুলিয়ে সে নীচে চলল।

বসবার কামরায় ঢুকতে গিয়েই লটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। দাস সায়েবের পাশে সেরিডানের ওপর একজন যুবক বসেছিল। গায়ের রং রোদে পোড়া গৌর, ঈষৎ তামাটে, চওড়া কপাল ও প্রকাণ্ড নাক— গ্রীক ভাস্করের খোদিত মূর্তির মতো। পোশাক পরিচ্ছদ সায়েবি ও আড়ম্বরহীন। একগোছা চুল বাঁ কপালের ওপর এসে পড়েছে। বোতাম-খোলা কোটের তলায় মস্ত বড় বুকটার ওপর 'টাই' অবিন্যস্তভাবে হাওয়ায় উড়ছে। ওপরকার ঠোঁটের ধার দিয়ে কয়েক ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে।

একটু ইতস্তত করে লটি বললে, Sorry Dad, জানতুম না আর কেউ আছেন।

—আর কেউ মানে দিস জেন্টলম্যান, অর্থাৎ ডাকু তো ? তোমার ঘাবড়াতে হবে না লটি, ওর সামনে তুমি at home feel করতে পারো। She is Lottie ডাকু, সেই নোয়াখালির ছোট্ট ফ্রকপরা লটি। একে তোমার মনে নেই লটি, সেই ডাকুদা—নোয়াখালির মিঃ রায় ছিলেন ডেপুটি, তাঁর ছেলে। তোমার তো ভাল নাম আছে ডাকু—হ্যাঁ হ্যাঁ— শঙ্কর,—শঙ্কর রায়।

শঙ্কর হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিল, লটি হাত বাড়াল দেখে করকম্পন করে বললে, নোয়াখালির পরেও দেখেছি আপনাকে দার্জিলিং-এ দুয়েকবার। সানি ব্যাঙ্কে—

—আপনি যেতেন চৌধুরীদের বাড়িতে ? দেখিনি তো।

—দুর্ভাগ্য। অথচ শেষবার ওই বাড়িতেই উঠেছিলাম। নোয়াখালির কথা তো আপনার মনে থাকা সম্ভব নয়, তখন আপনি বেজায় ছোট।

—হ্যাঁ তবে আপনিও সে সময় বিশেষ বড় ছিলেন না মনে হয়। হেসে শঙ্কর বললে, না। এই ধরুন বারো-তেরো।

—তাই বলুন। আপনি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় মাত্র।

দাস সাহেব বললেন, আচ্ছা লটি, তোমার মাকে যে ডেকে পাঠালুম, এলেন না তো,—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস দাস ঘরে ঢুকলেন। জামা কাপড়, চুল, জুতো—ফিটফাট, মুঠোর রুমালটা একবার নাকে ঘসে তিনি বসলেন।

—লীলা, চিনলে একে ? দাস সাহেব জিগ্যেস করলেন।

অস্ফুট স্বরে মিসেস বললেন, কই—

—ভাল করে দ্যাখো। সুরেন রায়ের ছেলে ডাকু। সেই নোয়াখালিতে—ওঃ, তুমি বেশি দেখোনি ওদের বটে।

মিসেস দাস হাত বার করে বললেন, Good day, Mr. Roy— Well, how do you do—

হাত ঝাঁকানো সমাধা করে, ভাল করে বসে শঙ্কর বললে, আমি বেশ আছি। আপনি ভাল তো ?

মিসেসের দু'চোখ লাল হয়ে উঠল। মিঃ দাস ও লটি হো হো করে হেসে উঠলেন।

দাস সায়েব বললেন, লীলা, তুমি মিঃ রয়, মিঃ রয় করছ কাকে ? ও ডাকু, নামেও, কাজেও—ব্যস্ সেই ওর যথেষ্ট পরিচয়। নামেও, কাজেও। কি বলো হে ?

লটির সাগ্রহ হাসি-রঙিন ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ডাকু বললে, কিন্তু সমাজে বাস করে নামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবন যাপন করলে কী আর চলবে—

—আরে বাদ দাও তোমার সমাজ। সেই ছেলেবেলার মতো ডানপিটেই রয়েচ নাকি এখনও ? মারামারি করে হেস্টিংস হাউস ছাড়লে, সে আমি এখনও ভুলিনি।

—তাইতেই তো সায়েব হওয়াটা পুরো হয়ে উঠল না। আর দু'দিন থাকলেই খাস বিলেতিদের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারতুম। বলে ডাকু হাসল, তারপর বললে, সে শুধু প্যাপির জন্যে। খেলা-ধুলায় ওরকম বরাবর হয়, বিশেষ করে হকিতে। তাই বলে মাস্টাররা মোড়লি করতে আসে না। হাতে ছিল

ডাণ্ডা, মাথায়ও বোধকরি খুন চেপেছিল। কষ্ট হয় টুটু মল্লিকের জন্যে। অবশ্য তার ছোটমানষেমীর যোগ্য শাস্তি হয়েছিল। তবে মারটা একটু বেশিই খেয়েছিল। দিন দশেক ছিল হাসপাতালে।

—কোন্ টুটু ? মল্লিক সায়েবের ছেলে ?

—হ্যাঁ, তারপরই ওব বাবা ওকে বিলেত পাঠিয়ে দেন। শুনলুম ফিরেচে নাকি বছর খানেক হ'ল।

—হ্যাঁ, বারে জয়েন করেচে। লীলা, তুমি ওর কীর্তি কলাপ শুনে ভাবচ, বুঝি ও একটি আস্ত গুণ্ডা! He is a self-made man. নিজের জোরে রেলে বড় কাজ পেয়েচে। জামালপুরে ;—যাক এখন নয়, কোথায় উঠেচ এসে কোলকাতায় ? হোটেলে ? সে কি ? সুরেনের ছেলে আমি থাকতে এসে হোটেলে উঠবে—না, না. absurd! আজই সন্ধ্যার ভেতর চলে এসো, ব্যাগ এণ্ড ব্যাগেজ। No arguments! তোমার একজন দাদা জুটল লটি, বহুৎ বদমাস,—ডাকু দাদা।

বলে দাস সাযেব সস্নেহে তাদেব মুখেব দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন ?

মিসেস দাস গম্ভীর মুখে ঘাড় কাৎ করে পরম মনোযোগের সঙ্গে কাঁধের ব্রোচটার শিল্প-সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন, এইবার গম্ভীরতরভাবে দাস সায়েবের দিকে তাকালেন।

লটি ভাবলে, ওয়েল—বেশ তো! ডাকু—ডাক্‌কুদা!

তারপর ডাকুর দিকে তাকিয়ে বললে, কখন আসছেন তা হলে ? সত্যি, না এলে ভারী দুঃখিত হব আমবা, হব না মাম্ ?

দীর্ঘ দেহ টান করে দাঁড়িয়ে ডাকু বললে, এলে আমি বেঁচে যাই সত্যি, তবে আপনাদের ভুগতে হবে।

দাস সায়েব বললেন, আচ্ছা, আদবকেতা তোমায় মানায় না। We shall expect you before tea, বুঝলে? লীলা, তোমার কোনও engagement নেই তো বিকেলে ?

—আছে বৈ কি। I am going to Mullick's for tea—

—বেশ লটি থাকবে।

—সেকি ? ওকে তো যেতেই হবে, তাঁরা বিশেষ করে বলেছেন।

মায়ের হিপ্নোটিজম আজ যেন লটিকে কায়দায় আনতে পারলে না। সে বাধা দিয়ে বললে, না, আমি যাব না। Not feeling up to it—

দাস সায়েব মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে তুমি বেরোবে না। ডাকু, তুমি ঠিক এসো তাহলে।

—আসব। চললুম খুড়িমা। চলি মিস দাস।

ডাকু যাবার পর খানিক চুপ করে থেকে মিসেস বললেন, আমি আর্মি নেভিতে যাচ্চি, যাবে তুমি?

লটির যেন আজ কী হয়েছিল। সে বললে, বাব্বা এই দুপুরে! আমি তার চেয়ে একটু ঘুমুব।

—কী আলসেই হচ্চ দিন দিন।

ঈষৎ হেসে, লটি বললে, আলসে নয়, তবে দিনরাত ওই পোশাক পরিচ্ছদ ঘাঁটতে ভাল লাগে না আর। আমার এখন একটু পড়তে ইচ্ছে করচে।

বিস্মিতভাবে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস উঠে গেলেন। লটি সশব্দে চটিতে পা গুঁজে গুন্ গুন্ করতে করতে ঘরে চলল।

ঘরে গিয়ে লটি দেখলে, বিছানার ওপর তার জাপানি স্পানিয়েলটা দিব্যি গুঁড়িসুঁড়ি হয়ে আরাম করে ঘুমুচ্চে। অন্য দিন সে সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়ত, কিন্তু আজ তাকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে বললে, জানিস রুবি, মেরে দাদা মিলা একঠো,—ডাক্‌কু, ডাক্স, ডিক—তবে রে পাজি

কুকুর, আচ্ছা নাক চেটে দিলি কী বলে, বল তো!

কোল থেকে রুবিকে নামিয়ে দিয়ে, লটি মুখে চোখে জল দিয়ে এল। তারপর একখানা বই হাতে করে শুয়ে, বইখানা খোলবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দিন দশেক পর কলকাতা ছাড়বার দিন, দুপুরে খাবার পর লটির ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকু ডাকলে, লটি শুনছ ?

—কি ?

—শোনো।

লটি এসে বেতের চেয়ারটার ওপর বসল। পাঁচিলে হেলান দিয়ে ডাকু দাঁড়িয়েছিল, বললে, আজ আমি যাচ্চি, জানো।

—হ্যাঁ।

—দ্যাখো, ভাল করে গুছিয়ে বলা আমার ক্ষমতার বাইরে। হঠাৎ যদি অন্যায় কিছু বলে ফেলি, দোষ নিও না।

—আচ্চা, বলে লটি একটু অবাক হয়ে তাকালে। তারপর বললে, কিন্তু কথাটা কী তা না বলে শুধু বাজে বোক্‌চ।

—তাহলে বলে ফেলি। ওয়ান—টু—থ্রী, তুমি আমায় বে' করবে ?

লটি অবাক। হবারই কথা, কারণ ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত, তেমন অপ্রত্যাশিত। বিয়ের নানারকম প্রস্তাবের বিবরণ সে শুনেচে, পড়েচে। কিন্তু এরকমটা তার ধারণাব বাইরে। তার হাসা উচিত, না চটা উচিত কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকাতে লাগল।

ডাকু হো হো করে হেসে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললে, তুমি আশ্চর্য হবে জানি, কিন্তু আমি সঠিক জবাব চাই। 'না' বললে আমি খুশিই হব, যদি তাই তোমার মনের কথা হয়।

ডাকুর কণ্ঠস্বরে একাগ্রতা প্রকাশ পেতেই লটির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। সে অন্যদিকে মুখ ফেরালে।

ডাকু বললে, তুমি ভেবে সন্ধ্যার আগে আমায় বলো। হ্যাঁ, একটা কথা। ভেবো না এইবারের দু'দিনের পরিচয়ে, অতবড় একটা কথা বলে ফেললাম। নোয়াখালিতে, তখন অবশ্য খুবই ছোট— কিন্তু ছেলেবেলার সে আকর্ষণের পরিণতির পরিচয় পাই দার্জিলিং-এ। যাক, তোমার জীবন কী পথে চলেছে, জানিনে, হয়তো আমার ভবঘুরের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার আগাগোড়াই গরমিল। যদি অপ্রীতির কারণ হয়ে থাকি, ক্ষমা করো, তবে খুলে বলো, আমি জানতে চাই। না জেনে ঢের দিন গেচে, আর সংশয় সইতে পারিনে।

ডাকু উঠতেই লটি মৃদুস্বরে ডাকল, ডাকুদা—

—ডাকচ ?

—হ্যাঁ।

—কী, বলবে ?

লটি চুপ করে থাকল। তারপরে মুখ তুলে বললে, যদি আমি সন্ধ্যার আগে কিছু ভেবে ঠিক না করে উঠতে পারি ?

ডাকু দাঁড়িয়েছিল, এইবার চেয়ারের হাতলের ওপর বসল। বললে, বেশ অপেক্ষা করব।

—আজই যাবে ?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

—আবার আসবে কবে ?

—শিগগির নয়। ছুটি পাওয়া বড় শক্ত। তুমি লিখো।

—লিখব।

—বেশ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ডাকু বললে, আমার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাও ? কোনও কথা—

—দরকার নেই।

—তাহলে চলি এখন নীচে ?

—আচ্ছা।

সন্ধ্যের ডাক গাড়িতে লটির জবাব না নিয়েই ডাকুকে কলকাতা ছাড়তে হল। গাড়ি ছাড়বার আগের মুহূর্তে লটি বললে, আমি লিখব।

ডাকু যাবার পর এক সপ্তাহ না যেতেই একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামী-স্ত্রীতে কথা হচ্ছিল। লটি বাড়ি ছিল না। সায়েব জানতেন ব্যানার্জি পরিবারের সাথে সে এম্পায়ারে গেছে। কথাটা আংশিক সত্য, সে ছবি দেখতে গেছে সত্য, কিন্তু গেছে বিজুতে এবং টুটুর সাথে। এটুকু মেমসায়েবের কারসাজি।

দাস বলছিলেন, ডাকু পৌঁছে চিঠি লিখেচে। একটা অদ্ভুত খবর আছে। সে লটিকে বিয়ে করতে চায়।

—Heavens! ওই ভূতটার সাথে লটির বিয়ে! কী স্পর্ধা! Unmannerly half-civilised boor—

—তার মানে ? সোসাইটির সঙগুলোর মতো ইংরেজি বুক্‌নি কাটে না, কথায় কথায় দিব্যি গলে না, বেপরোয়া মদ্যপান কবে না, এই তো। আমার ডাকুকে ভাল লাগে।

—তা লাগুক। বিলেত যায়নি, একটা আস্ত জানোয়ারই তো রয়ে গেচে এখনও। সমাজেও ওর কোনও স্থান নেই।

—একবার বিলেত ঘুরে এলেই জানোয়ারত্ব ঘুচে যেত ? আমাকেও তাহলে জানোয়ারের দলে ফেলচ তো ?

মেমসায়েব কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত হয়েছিলেন। বললেন, তা নয়, তা নয়। আমি ঠিক বোঝাতে পারচি না, অর্থাৎ, set-এর বাইরে একজন অজানা অচেনা—

দাস সায়েব বাধা দিয়ে বললেন, একটু সমঝে। তুমি যে ডেপুটির স্ত্রী, একথা তুমি ভুললেও, বাঁডুজ্যে মল্লিক পরিবারের কেউই এক লহমার তরে ভুলবে না জেনো। শঙ্কর রায়ের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলে তোমার অমর্যাদা হবার ভয় নেই। সোসাইটির গিন্নিদের জিগ্যেস করে দেখো, যে ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে তাঁদের অনেকেই বর্তে যাবেন। ও যে কাজ করে, সে কাজ পাবার জন্যে বহু বিলেত ফেরৎ মল্লিক-বাঁড়ুজ্যের ছেলে জুতোর তলা খুইয়ে ফেললে। কাদের নিয়ে তোমার set লীলা ? নিজের দেশে পরদেশী, এ্যাকটিং এবং কৃত্রিম জীবনযাপনে অভ্যস্ত জনকয়েক তাসের সায়েব-বিবি। রাস্তার ভিখিরীর যা কালচার, যা tradition, তাদেরও তাই,—তফাত শুধু সিল্ক স্যুট ও ছেঁড়া-কাঁথার। সে অত্যন্ত স্থূল তফাত। যাক। তর্ক বৃথা। আমি নিজে মনে করি তোমার টুটু মল্লিকের চেয়ে ডাকু অনেক উঁচু দরের ছেলে।

—টুটুর নাম করচ কেন ? সে কী করলে তোমার ?

—করেনি কিছু, কিন্তু ঐ একটি লোক আছে, যাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

—গা তোমার জ্বলে যেতে পারে, কিন্তু এই তোমায় বলে রাখচি আমি, তার চাকর থাকবার যোগ্যতাও নেই তোমার ডাকুর।

টুটুর প্রতি দাস সায়েবের মনোভাবের আঁচ মিসেস পেয়েছিলেন, তাই লটির সঙ্গে তার মেলামেশাটাকে যতদূর সম্ভব আড়াল করে রাখতেন। শুধু আড়াল নয়, মেলামেশার সুযোগ ঘটাতেও

মেয়ের প্রতি তাঁর হিপ্নোটিজম বিদ্যার প্রয়োগ করতে হত প্রায়ই।

তাঁর প্রথম থেকেই ইচ্ছে টুটুর সাথে সম্পর্কটা পাকা করে ফেলেন। তাহলে সিভিলিয়ান বৈবাহিক সুবাদে ডেপুটিজায়াত্বের হীনতাটুকু একেবারেই শেষ হয়ে যায়। টুটুর সম্বন্ধে যে সব কথা কানে আসে, সোসাইটিতে সে সব তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ও বয়েসে ও-রকম একটু আধটু সব ছেলেরই হয়।

কিন্তু স্বামীর বর্তমান মনোভাবে এ অভিলাষ প্রকাশে অনেক বিপদ। তাই সর্বাগ্রে তিনি মেয়েকে পোষ মানাবার ফিকিরে ছিলেন।

দাস সায়েব একখানা বইয়ে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে মৌনতা ভঙ্গ করে বললেন, তাই তো, রাত হয়ে চলল যে! Time they were back!

মিসেস বললেন, কটা বেজেচে ?

—ন'টা।

—ভারী রাত হয়েচে। দশটার আগে তো ছবিই শেষ হবে না।

দাস সায়েব কথা কইলেন না। বই হাতে আপিস কামরাব দিকে উঠে গেলেন। মেমসায়েব লাইব্রেরিতে চিঠি লেখা নিয়ে বসলেন।

লটির মনের গভীরতা ছিল না বললে ভুল হবে ; কিন্তু সে গভীরতার ওপরের জলরাশি ছিল ঘোলাটে। তাই তরঙ্গ উঠলে আলোড়ন তলস্পর্শ করত না। কিন্তু ইদানীং যেন সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে শুরু হয়েছিল।

দৈনন্দিন জীবনযাপনের কৃত্রিমতার চাপ তাকে মাঝে মাঝে পীড়া দিত। মাঝে মাঝে মনে হত, সমাজটা যে একটা দানব, যেন কী এক উগ্র নেশায় মত্ত হয়ে চালকহীন রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মতো ভীমবেগে চোখ লাল করে ছুটে চলেচে— কোনও রকমে পায়ের তলায় লাইন দু'টো বেঁকে বসলেই ধ্বংস অনিবার্য। কোনও আশা, কোনও মঙ্গলের সম্ভাবনাও নেই—ঝোড়ো হাওয়ায় যেন তীব্র হিংস্র বিদ্রূপ, টিটকারি দিয়ে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে।

আতঙ্কে তার অন্তর আর্ত হয়ে উঠত।

ঠাণ্ডা মাথায় মাঝে মাঝে সে ভাবতে বসত। পড়বার বাতিক তার চিরদিনই ছিল, কিন্তু পড়ে সে সম্বন্ধে ভাববার অভ্যেস ছিল না। এইবারে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু দেখতে গিয়ে এই কথাটাই তার বারে বারে মনে হত যে, সুন্দরের অভাবের অবস্থাটা হয়তো তবু সওয়া যায়, কিন্তু অসুন্দরের উপস্থিতি অসহ্য।

তার এ ক্ষণিক উন্মেষের আয়ু দীর্ঘ হত না, ভগ্নস্তূপের ক্ষণদ্যুতি স্ফুলিঙ্গের মতো চরম পরিণতির দিকে ঢলে পড়ত।

আজ টুটু মল্লিকের সঙ্গে বেরোতে তার যথেষ্ট আপত্তি ছিল, কারণ অনেক। কিন্তু একটিও বলা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া মা-কে কথা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল।

একটি জিনিস সে বুঝেছিল, মল্লিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মা-র কাম্য। কিন্তু যা বোঝা তার সর্বাগ্রে উচিত ছিল, অর্থাৎ এ আত্মীয়তার ওপর তার নিজের মন বিরূপ, সেইটেই সে পরিষ্কার বোঝেনি।

ছবি সাড়ে আটটায় ভাঙলে, বেরিয়ে লটি বললে, আমি বাড়ি যাব, আমার মাথা ঘুরচে।

টুটু বললে, I say, what—মাথা ঘুরচে, এ তো ভাল কথা নয়। Let us have some food first—খাবার সময়ও হয়ে গেচে।

—খাবার জন্যে নয়। তুমি যে কোল্ড-ড্রিংক দিলে এনে, সেইগুলো খাবার পর থেকে। বিচ্ছিরি ঝাঁঝ লাগল।

টুটুর ঠোঁটের ধার দিয়ে পাতলা হাসি উঠেই মিলিয়ে গেল। বায়স্কোপে প্রারম্ভিক দু'পেগে তার পানতৃষ্ণা কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছিল। তাই সে অধিক বাক্যব্যয় না করে বললে, Still, খেতে তো হবে। চলো ফার্পোতে।

হোটেলে ঢুকে লটি বললে, তুমি কিছুতেই drink করতে পাবে না। মাতালের সঙ্গে ঘুরতে ভয় করে।

টুটু বললে, মাতাল ? কি যা-তা বলচ ? হুইস্কি অবশ্যই আমি খাই, কিন্তু তা ব'লে—যাক। I say, তোমার মাথা ঘুরচে বলছিলে না, দাঁড়াও let me get soothing something for you—

—আমি কিছু খাব না।

—এখানে scene ক'রো না। শেষে মাথা ঘুরে পড়ে-টড়ে যাবে, একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে।

জিন মেশানো জিঞ্জারের প্রভাবে লটির মাথা তখন বেশ ঝিমঝিম করছিল। সে আর কথা বললে না।

ডিনার যখন শেষ হল, তখন রাত সাড়ে দশটা। ততক্ষণে টুটুর ছ'পেগ হুইস্কি ও দু'টো কক্‌টেল এবং লটির চারটে 'soothing something' শেষ হয়ে গেচে।

নীচে গাড়িতে এসে টুটু বললে, What about a long drive? বাড়ি যাবার আগে বুঝেচ তো—একটু মাথাটা ঠাণ্ডা—

লটির কিছু বলবার মতো অবস্থা ছিল না। সে জড়িত-স্বরে একটা কী বলবার চেষ্টা করে টুটুর কাঁধে মাথা রাখলে।

শিস্ দিয়ে টুটু এ্যাকসেলারেটারে পা দাবালে। কলকাতার রাস্তা পার হয়ে গাড়ি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ বেগে ছুটল।

রাত দেড়টায় বাড়ি ফিরে, মিসেসের সুবন্দোবস্তে লটির নিজের ঘরে পৌছতেবিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি বটে, কিন্তু তার চেহারা দেখে মিসেসের মন শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। অনবরত দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে থাকতে থাকতে লাল ঠোঁটে গভীরতর লাল দাগ কেটে দাঁত বসে গেছে। চোখ দু'টোর রঙ হয়েচে অস্তসূর্যের আলোয় বর্ষার নদীর ঘোলা জলের মতো। চুল অবিন্যস্ত, উড়ছে।

পটলডাঙার পাঁচালী

দেবতার জন্ম

শিবরাম চক্রবর্তী

বাড়ি থেকে বেরুতে প্রায়ই হোঁচট খাই। প্রথম পদক্ষেপেই পাথরটা তার অস্তিত্বের কথা প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কদিন ধরেই ভাবছি কী করা যায়।

সেদিন বাড়ি থেকে বেরুবার আমার তেমন কোনও তাড়া ছিল না, অন্তত ওইরূপ তীরবেগে অকস্মাৎ ধাবিত হব এমন অভিপ্রায় ছিল না আদৌ, কিন্তু পাথরটার সংঘর্ষ আমার গতিবেগকে সহসা এত দ্রুত করে দিল যে, অন্যদিক থেকে মোটর আসছে দেখেও আত্মসম্বরণ করতে অক্ষম হলুম ; কী

ভাগ্যি ড্রাইভারটা ছিল হঁশিয়ার—তাই রক্ষে !

সেদিন থেকেই ভাবছি কী করা যায়। আমার জীবন-পথের মাঝখানে সামান্য একটুকরো পাথর যে এমন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেবে কোনদিন এরূপ কল্পনা করিনি ! তাছাড়া, ক্রমশই এটা জীবন-মবণের সমস্যা হয়ে উঠছে, কেননা ধাবমান মোটর চিরদিনই কিছু আমার পদস্খলনকে মার্জনাব চোখে দেখবে এমন আশা আমি করতে পারি না।

তাই ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্, হয় ও থাকুক নয় আমি। ও থাকলে আমি বেশিদিন থাকব কিনা সন্দেহ। তাই যখন আমার থাকাটাই, অন্তত আমার দিক থেকে বেশি বাঞ্ছনীয়, তখন একদা প্রাতঃকালে একটা কোদাল জোগাড় করে লেগে পড়তে হল।

একটা বড় গোছের নুড়ি, ওর সামান্য অংশই রাস্তার ওপর মাথা তুলেছিল। বহু পরিশ্রমের পর যখন ওটাকে সমূলে উৎখাত কবতে পেরেছি, তখন মাথাব ঘাম মুছে দেখি আমার চারিদিকে বীতিমত জনতা। বেশ বুঝলাম এতক্ষণ এঁদেরই নীরব ও সবব সহানুভূতি আমার উদ্যমে উৎসাহ সঞ্চাব করছিল।

তাঁদের সকলের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিযে জিজ্ঞাস করলাম—আপনারা কেউ চান এই পাথবটা ?

জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু কারও ঔৎসুক্য আছে কি নেই বোঝা গেল না। তাই আবার ঘোষণা করতে হল—যদি দরকার থাকে নিতে পারেন। অনায়াসেই নিতে পারেন। আমার শ্রম তাহলে সার্থক জ্ঞান করব এবং আমি খুশি হব।

জনতার এক তরফ থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা কবলে—এটা খুঁড়ছিলেন কেন ? কোনও স্বপ্ন-টপ্ন পেয়েছেন নাকি ?

আমি লোকটার দিকে একটু তাকালাম, তারপর ঘাড় নেড়ে বললাম—না, যা ভাবছেন তা নয়।

পাথরটাকে রাস্তার এক নিরাপদ কোণে স্থাপিত করা গেল। কিন্তু আমার কথায় যেন ওর প্রত্যয় হল না, কয়েকবার আপনমনে মাথা নেড়ে সে আবার প্রশ্ন করলে—সত্যি বলছেন পান্‌নি ? কোনও প্রত্যাদেশ-টত্যাদেশ ?

—কিচ্ছু না।

লোকটার কৌতূহলকে একেবারে দমিয়ে দিয়ে ওপরে এসে মাকে বললাম দু' কাপ্ চা তৈরি করতে। আমার জন্যই দু' কাপ্। পাথরটার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে কাতর হয়ে পড়েছিলাম—প্রায় প্রস্তরীভূত হয়ে গেছলাম, বলতে কী !

এরপর প্রায়ই বাড়ি থেকে বেরুতে এবং বেড়িয়ে ফিরতে নুড়িটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ; অনেক সময় হয় না, যখন অন্যমনস্ক থাকি। এখন ওকে আমি সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করতে পেরেছি, কেননা আমাকে অপদস্থ করার ক্ষমতা ওর আর নেই। সে-দৈবশক্তি ওর লোপ পেয়েছে।

আমাদের মধ্যে একরকম হৃদ্যতা জন্মেছে এখন বলা যেতে পারে। এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন দেখলাম নুড়িটার কান্তি ফিরেছে, ধুলোবালি মুছে গিয়ে দিব্য চাকচিক্য দেখা দিয়েছে। যারা সকালে বিকালে হোস্ পাইপে রাস্তায় জল ছিটোয়, বোঝা গেল, তাদেরই কারুর স্নেহদৃষ্টি এর ওপর পড়েছিল। ওর চেহারা শ্রীবৃদ্ধি দেখে সুখী হলাম।

—ব্যাপার কী রকম বুঝচেন ?

হঠাৎ পেছন থেকে প্রশ্নাহত হয়ে ফিরে তাকালাম। সেদিনের সেই অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি সেই থেকেই এখানে পাহারা দিচ্ছেন নাকি ? না, কোনও প্রত্যাদেশ-টত্যাদেশ পেলেন ?

—না না, তা কেন ? এই পথেই আমার যাতায়াত কিনা।

ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হন, কিন্তু অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নিতে পারেন।

—নুড়িটা দেখছি আছে ঠিক। কেউ নেবে না—কি বলেন ?

প্রশ্নটা এইভাবে করল যেন যে-রকম দামি জিনিসটা পথে পড়ে আছে অমন আর ভূভারতে কোথাও মেলে না এবং এর গুপ্তশত্রুর দল ওটাকে আত্মসাৎ কববার মতলবে ঘোরতর চক্রান্তে লিপ্ত ; ছোঁ মেরে লুফে নেবার তালে হাত বাড়িয়ে সবাই যেন লোলুপ। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানালাম—না না, আপনার যারা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত, সরকার বাহাদুর তাদেব নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে রাঁচীর অতিথিশালায় সযত্নে রেখে দিয়েছেন, তাছাড়া, আপনি নিজেই যখন এদিকে কড়া নজর রেখেছেন তখন তো চিন্তা করার কিছু দেখিনে।

সে একটু হেসে বলল—আপনার যেমন কথা ! দেখেছেন এদিকে কারা ওর পূজার্চনা করে গেছে ?

ভাল করে নিরীক্ষণ করি—সত্যিই, দেখিনি তো, এক বেলার মধ্যেই কারা এসে পাথরটার সর্বাঙ্গে বেশ করে তেলসিঁদুর লেপে দিয়ে গেছে।

আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম—ভালই হয়েছে ! এতদিনে তবু ওর কান্তি ফিরল এবং আরেকটি সমঝদার জুটল !

পাথরটার সমাদরে পুলকিত হবার কথা, কিন্তু লোকটিকে বেশ ঈর্ষান্বিত দেখলাম। কপাল কুঁচকে সে বললে—সেই তো ভয় ! সেই সমঝদার না ইতিমধ্যে ওটিকে সরিয়ে ফ্যালে !

পরদিন সকালে উঠে দেখি কোথাও পাথরটার চিহ্নমাত্র নেই। ওর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আশ্চর্য হলাম খুব। কে ওটাকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল, ইত্যাকার নানাবিধ প্রশ্নের অযাচিত উদয় হল মনে কিন্তু কোনও সঠিক সদুত্তর পাওয়া গেল না। পাথরটার এরূপ অনুপস্থিতিতে এই পথে হরদম যাতায়াতকারী সেই লোকটি যে প্রাণে বেজায় ব্যথা পাবে অনুমান করা কঠিন নয়। একথা ভেবে লোকটার জন্য একটু দুঃখই জাগল ; —কিম্বা, এ সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসুরই কর্মযোগ ?

অনেকদিন পরে গলির মোড়েব অশথতলা দিয়ে আসছি—ও হরি ! এখানে নুড়িটাকে নিয়ে এসেছে যে ! নুড়ির স্থূল অঙ্গটা গাছের গোড়ায় এমনভাবে পুঁতেছে যে, উপরের উদ্ধত গোলাকার নিটোল মসৃণ অংশ দেখে শিবলিঙ্গ বলে ওকে সন্দেহ হতে পারে। এই প্রয়োগ-নৈপুণ্য যার, তাকে বাহাদুরি দিতে হয়। নুড়িটার চারিদিকে ফুল বেলপাতা আতপচালের ছড়াছড়ি। সকালের দিকে এই পথে যে সব পুণ্যলোভী গঙ্গাস্নানে যায়, তারাই ফেরার পথে সস্তায় পারলৌকিক পাথেয়-সঞ্চয়ের সুবর্ণসুযোগরূপে একে গ্রহণ করেছে সহজেই বোঝা গেল। যাই হোক, মহাসমারোহেই ইনি এখানে বিরাজ করছেন—অতঃপর এঁর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারও দুশ্চিন্তার আর কোনও কারণ নেই।

নুড়িটার এই পদোন্নতিতে আন্তরিক খুশি হলাম। আমিই একদিন ওকে মুক্তি দিয়েছি, এখন সবাইকে ও মুক্তি বিতরণ করতে থাক—ওর গৌরব, সে-তো আমারই গর্ব। পৃথিবীর বুকে ওর জন্মদাতা আমি, এইজন্য মনে মনে পিতৃত্বের একটা পুলক অনুভব না করে পারলাম না। এবং কায়মনোবাক্যে ওকে আশীর্বাদ করলাম।

সেই লোকটাকে তার দেবতার সন্ধান দেব কিনা মাঝে মাঝে ভেবেছি। পথে ঘাটে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, পাথরটার কথা ও আর পাড়ে না। পাথরটার পলায়নে ভেবেছিলাম ও মুহ্যমান হয়ে পড়বে, কিন্তু উলটে ওকে প্রফুল্লই দেখা গেল। এত বড় একটা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন ও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তখন আর ওকে উতলা করে তোলায় কী লাভ।

মাঝে মাঝে অশথতলার পাশ দিয়েই বাড়ি ফিরি, লক্ষ করি, দিনকের দিন নুড়িটার মর্যাদা বাড়ছে। একদিন দেখলাম গোটাকতক সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গেড়েছে, গাঁজার গন্ধ এবং ববম্‌বম্‌ শব্দের ঠেলায় ওখান দিয়ে নাক কান বাঁচিয়ে যাওয়া দুষ্কর। ঘ্রাণ এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের ওপরে দস্তুরমতই অত্যাচার।

যখন সন্ন্যাসী জুটেছে তখন ভক্ত জুটতে দেরি হবে না এবং ভক্তির আতিশয্য অনতিবিলম্বেই ইট-কাঠের মূর্তি ধরে মন্দিররূপে অভ্রভেদী হয়ে দেখা দেবে। দেবতা তখন বিশেষভাবে বনেদী হবেন এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে তাঁর তরফে খাজনা আদায় করবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েমী হয়ে দাঁড়াবে।

এর কিছুদিন পরে একটা চিনির কলের ব্যাপাবে কয়েক মাসেব জন্য আমাকে চাম্পারণ যেতে হল। অশথতলাব পাশ দিয়ে গেলেও চলে, ভাবলাম, যাবাব আগে দেবতার অবস্থাটা দেখে যাই। যা অনুমান করেছিলাম তাই, সন্ন্যাসীর সমাগমে ভক্তের সমারোহ হয়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ আলোচনা অনুসরণে যা বুঝলাম তার মর্ম এই যে, ইনি হচ্ছেন ত্রিলোকেশ্বর শিব, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু, একেবারে পাতাল ফুঁড়ে ফেঁপে উঠেছেন—এঁর তল নেই। অতএব এঁর উপযুক্ত সম্বর্ধনা কবতে হলে এখানে একটা মন্দির খাড়া না করলে চলে না।

একবাব বাসনা হল, ত্রিলোকেশ্বর শিবের নিস্তলতার ইতিহাস সবাইকে ডেকে বলে দিই, কিন্তু জীবন-বীমা কবা ছিল না এবং ভক্তি কতটা ভয়াবহ হতে পারে জানতাম, আর তা ছাড়া ট্রেনের বিলম্বও বেশি নেই—ইত্যাদি বিবেচনা করে নিরস্ত হলাম। সেই লোকটাকে খবর না দিয়ে দেখলাম ভালই করেছি, কেননা যতদূব ধারণা হয়, নুড়িটাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করাই তার অভিরুচি ছিল ; কিন্তু ইনি যে ভক্তের তোয়াক্কা না রেখেই স্বকীয় প্রতিভাবলে এবং স্বচেষ্টায় ইতিমধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, এই সংবাদে সে পুলকিত কিম্বা মর্মাহত হত বলা কঠিন।

কয়েক মাস বাদে যখন ফিরলাম তখন অশথতলার মোড়কে আর চেনাই যায় না। ছোটখাট একটা মন্দির উঠেছে, শঙ্খঘণ্টার আর্তনাদে কান পাতা দায় এবং ভক্তেব ভিড় ঠেলে চলা দুরূহ। কিন্তু সে কথা বলছি না, সবচেয়ে বিস্মিত হলাম সেই সঙ্গে আরেক জনের আবির্ভাবে, কেবলমাত্র আবির্ভাব নয়, কলেবর পরিবর্তন পর্যন্ত দেখে। মন্দিরের চত্বরে সেই লোকটা—প্রথমতম, সেই আদি ও অকৃত্রিম উপাসক— গেরুয়া, তিলক এবং রুদ্রাক্ষের চাপে তাকে আর চেনাই যায় না এখন ।

—এ কী ব্যাপার ?

আমিই গায়ে পড়ে প্রশ্ন করলাম একদিন।

—আজ্ঞে, এই দীনই শিবের সেবায়েত।

লোকটি বিনীতভাবে জবাব দেয়।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দিব্যি বিনিপুঁজির ব্যবসা ফাঁদা হয়েছে। এই জন্যেই বুঝি পাথরটার ওপর অত করে নজর রাখা হয়েছিল ?

শিলাখণ্ডের প্রতি ওর প্রীতিশীলতা যে অহেতুক এবং একেবারেই নিঃস্বার্থ ছিল না, এইটা জেনেই বোধকরি অকস্মাৎ ওর ওপর দারুণ রাগ হয়ে যায়, ভারী রূঢ় হয়ে পড়ি।

কানে আঙুল দিয়ে সে বলল—অমন বলবেন না। পাথর কী মশাই ? শ্রীবিষ্ণু ! সাক্ষাৎ দেবতা যে। ত্রিলোকেশ্বর শিব !

উদ্দেশে সে নমস্কার জানায়।

আমি হেসে ফেললাম-—ওর তল নেই, না ?

এবার সে একটু কুণ্ঠিত হয়—ওরাই তো বলে।

—তুমি নিজে কী বলো ? ওরা তো বলে নীচে যতই কেন খুঁড়ে যাও না, টিউব-কলের মতো ওই শিবলিঙ্গ বরাবর নেমে গেছে। কিন্তু তোমার কী মনে হয় ?

—কী জানি ! তাই হয়তো হবে।

—কতদূর শেকড় নেবেছে খুঁড়ে দেখোই না কেন একদিন ?

জিভ কেটে লোকটা বলল—ওসব কথা কেন ? ওতে অপরাধ হয়। বাবা রাগ করবেন—উনি আমাদের জাগ্রত।

—বটে ? কী রকম জাগ্রত শুনি ?

—এই ধরুন না কেন ! এবার তো কলকাতায় দারুণ বসন্ত, টিকে নিয়ে কিছু করেই কিছু হচ্ছে না—

—য্যাঁ, বলো কি, মহামারী নাকি, জানতাম না তো !

—খবরের কাগজেই দেখবেন কিরকম লোক মরছে। কর্পোরেশন থেকে টিকে দেবার ত্রুটি নেই অথচ প্রত্যেক পাড়াতেই—। কিন্তু আমাদের পাড়ায় এ-পর্যন্ত কারও হয়নি দেবতার কৃপায়। আমরা কেউ টিকেও নিইনি, কেবল বাবাব চন্নামেত্ত খেয়েছি। এ যদি জাগ্রত না হয় তবে জাগ্রত আপনি কাকে বলেন ?

এবার কী জবাব দেব তা চিন্তা করবার সময় ছিল না। আগে একবার এই রোগে যা কষ্ট পেয়েছিলাম এবং যা করে বেঁচেছিলাম তাতে বাবা ত্রিলোকনাথের মহিমা তখন আমার মাথায় উঠেছে। '—আমি এখন চললুম। আমাকে এক্ষুণি টিকে নিতে হবে। আরেকদিন এসে গল্প করব।' বলে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মেডিকেল কলেজের উদ্দেশে ধাবিত হলাম।

পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দাঁড় করিয়ে সে বললে—আরে, কোথায় চলেছ এমন হন্যে হয়ে?

—টিকে নিতে।

—টিকে নিয়ে তো ছাই হচ্ছে। টিকেয় কিস্‌সু হয় না। তুমি বরং Veriolinum 200 এক ডোজ খাও গে, কিং কম্পানির থেকে—যদি টিকে থাকতে চাও ! পরের হপ্তায় ওই আরেক ডোজ, তারপরে আরেক— ব্যস, নিশ্চিন্দি। টিকে ফেল করেছে আক্‌চার দেখা যায়, কিন্তু ভেরিওলিনাম্— নেভার !

—বলো কী ? জানতাম না তো।

—জানবে কোত্থেকে ? কেবল ফোঁড়াফুঁড়ি এই তো জেনেছ ! অন্য কিছুতে কী আর তোমাদের বিশ্বেস আছে ? আমি হোমিওপ্যাথি প্রাক্‌টিস ধরেছি, আমি জানি।

—বেশ, তাই খাচ্ছি না হয়।

কিং কম্পানিতে গিয়ে এক ডোজ দু'শ শক্তির ভেরিওলিনাম্ গলাধঃকরণ করলাম। যাক্, এতক্ষণে অনেকটা স্বচ্ছন্দ হওয়া গেল। হাল্‌কা হতে পারলাম।

এর পরেই পথ দিয়ে উপরি-উপরি কয়েকটা শবযাত্রা গেল—নিশ্চয়ই এরা বসন্ত রোগেই মরেছে ? কী সর্বনাশ, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, ওদের থেকে এইভাবে কত লক্ষ লক্ষই না বীজাণু আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ভেরিওলিনাম্ রক্তে পৌঁছতে না পৌঁছতেই এতক্ষণে এই সব মারাত্মক রোগাণুর কাজ শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয় ! হাত পা শিটিয়ে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসে—এই বিপদসংকুল বাতাসের নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

অতি সংক্ষিপ্ত এক টুকরো প্রাচীরপত্রে বিখ্যাত বসন্ত চিকিৎসক কোন্ এক কবিরাজের নাম দেখলাম। হোমিওপ্যাথি করা গেছে, কবিরাজিই বা বাকি থাকে কেন—যে উপায়েই হোক সবার

আগে আত্মরক্ষা। বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় পৌঁছতেই দেখলাম কয়েকজন মিলে খুব ধুমধাম করে প্রকাণ্ড একটা শিলে কী যেন বাঁটছেন। কবিরাজকে আমার অবস্থা বলতেই তিনি আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই যে বাটা হচ্ছে। কণ্টিকারির শেকড়—বেটে খেতে হয়। ওর মতো বসন্তের অব্যর্থ প্রতিষেধক আর কিছু নেই মশাই !

ব্যবস্থামত তাই এক তাল খেয়ে একটা রিক্সা ডেকে উঠে বসা গেল। গায়ে যেন জোর পাচ্ছিলাম না. মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, জ্বর জ্বর ভাব—বসন্ত হবার আগে এই রকমই নাকি হয়ে থাকে। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম—আজ আর কিছু খাব না, মা। দেহটা ভাল নয়।

উদ্বিগ্ন মুখে মা বললেন—কী হয়েছে তোর ?

—হয়নি কিছু। বোধহয় হবে। · · বসন্ত।

—বালাই ষাট্। বলতে নেই। তা কেন হতে যাবে ? এই হর্তুকির টুকরোটা হাতে বাঁধ দিকি। আমি তিরিশ বছর বাঁধছি, এই হাতে কত বসন্ত রোগীই তো ঘাঁটলাম, সেবা করলাম, কিন্তু বলতে নেই, এরই জোরে কোনদিন হাম পর্যন্ত হয়নি—। নে ধর্ এটা তুই।

মা তাঁর হাতের তাগাটা খুলে দিলেন।

—তিরিশ বছরে একবারও হয়নি তোমার ? বলো কী ? দাও, দাও তবে। এতক্ষণ বলোনি কেন? কিন্তু এই একটুকরোয় কি হবে ? রোগ যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাকে আস্ত একটা হর্তুকি দাও যদি তাতে আটকায়।

হর্তুকি তো বাঁধলুম, কিন্তু বিকালের দিকে শরীরটা বেশ ম্যাজম্যাজ করতে লাগল। নিজেকে রীতিমত জ্বরজড়িত মনে হল। আয়না নিয়ে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলাম, মুখেও যেন দু'একটা ফুসকুড়ির মতো দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই বসন্ত, তবে আর বাঁচন নেই, মাকে ডেকে দেখালাম।

মা বললেন—মার অনুগ্রহ নয়—ব্রণ।

আমি বললাম—উঁহু। ব্রণ নয়, নিতান্তই মার অনুগ্রহ !

মা বললেন—অলক্ষুণে কথা মুখে আনিস্ নে। ও কিছু না, সমস্ত দিন ঘরে বসে আছিস্ একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয় গে।

এরকম দারুণ ভাবনা মাথায় নিয়ে কি বেড়াতে ভাল লাগে ? লোকটা বলছিল, ওরা সবাই চরণামৃত খেয়ে নিরাপদ রয়েছে। আমিও তাই খাব নাকি ? হয়তো বা চরণামৃতের বীজাণুধ্বংসী কোনও ক্ষমতা আছে, নেই যে, তা কে বলতে পারে ? · · · · হ্যাঁঃ ওর যেমন কথা ! ওটা স্রেফ্ অ্যাকসিডেন্ট—কলকাতার সব বাড়িতেই কিছু আর অসুখ হচ্ছে না। তাছাড়া মনের জোরে রোগ-প্রতিরোধের শক্তি জন্মায়—মারীরও যেখানে মার—সেই মনের জোরই ওদের পক্ষে একটা মস্ত সহায়—কিন্তু ওই যৎসামান্য পাথরটাকে দেবতাজ্ঞান করার মতো বিশ্বাসের জোর আমি পাব কোথায়?

এ সব যা-তা না করে সকালে টিকে নেওয়াই আমার উচিত ছিল, হয়তো তাতে আটকাত। এখুনি গিয়ে টিকেটা নিয়ে ফেলব নাকি ? টিকে নিলে শুনেছি বসন্ত মারাত্মক হয় না, বড় জোর হাম হয়ে দাঁড়ায়। আর হামে তেমন ভয়ের কিছু নেই—ওতো শিশুদের হামেশাই হচ্ছে। নাঃ, যাই মেডিকেল কলেজের দিকেই বেরিয়ে পড়ি।

টিকে নিয়ে অশথতলার পাশ দিয়ে ফিরতে লোকটার সকালের কথাগুলো মনে পড়ল। হয়তো ঠিকই বলেছে সে। সত্যিই এক জায়গায় গিয়ে আর কোনও জবাব নেই, সেখানে রহস্যের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়। এই তো আজ বেঁচে আছি, কিন্তু কাল যদি বসন্তে মারা যাই তখন কোথায় যাব ? শেকস্‌পিয়ারের সেই কথাটা—সেই স্বর্গমর্ত্য-হোরাশিও-একাকার-করা বাণী—না, একেবারে ফেলনা নয়। এই পৃথিবীর, এই জীবনের, সুদূর নক্ষত্রলোক এবং তার বাইরেও বহুধা বিস্তৃত অনন্ত জগতের

কতটুকুই আমরা জানি ? কটা ব্যাপারেরই বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারি ? যতই বিজ্ঞানের দোহাই পাড়ি না কেন, শেষে সেই অজ্ঞেয়ের সীমান্তে এসে সব ব্যাপারীকেই নতমুখে চুপ করে দাঁড়াতে হয়।

মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে আসতে ত্রিলোকনাথের উদ্দেশে মনে মনে দণ্ডবৎ জানালাম। প্রার্থনা করলাম, বাবা, আমার মূঢ়তা মার্জনা করো, মহামারীর কবল থেকে বাঁচাও আমাকে এ যাত্রা।

খানিক দূর এগিয়ে এসে ফিরলাম আবার। নাঃ, দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া কিছু নয়। মুখের ফুসকুড়িগুলো হাত দিয়ে আঁচ করা গেল।—এগুলো ব্রণ, না বসন্ত ?

এবার মাটিতে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলাম। বললাম—জয় বাবা ত্রিলোকনাথ ! রক্ষা করো বাবা। বম্ বম্ !

উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখলাম কেউ দেখে ফ্যালেনি তো ?

স্ব-নির্বাচিত গল্প

নিবারণের মৃত্যু

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

রেল লাইন থেকেই দেখা যায় কতকগুলি ছোট-বড় গাছের আড়ালে একখানি ভাঙা বাড়ি, সামনে ছোট্ট একটি ডোবা। বাড়ির চারিদিকে, ঘেঁটু, আশশ্যাওড়া আরও কত কিসের ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল। বাড়ির ইট বেরিয়ে পড়েছে। নোনা-ধরা দেওয়াল স্থানে স্থানে এত ক্ষয়ে গেছে যে, কী করে অমন বাড়িতে মানুষ থাকে ভাবতে বিস্ময় লাগে। বাড়ির চারিদিকের পাঁচিল মাঝে মাঝে ভেঙে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে অন্দরের উঠোন পর্যন্ত দেখা যায়। খোয়া-ওঠা উঠোন। তাব এধার থেকে ওধার পর্যন্ত তার ঝোলানো। তাতে কয়েকখানা ছেঁড়া কাঁথা, ভিজে কাপড় ঝুলছে। ওইতেই অন্দরের মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে।

ডোবার বাঁধাঘাটের অবস্থাও সমান শোচনীয়। অন্ধকারে পা না ভেঙে নামা অসম্ভব। কিন্তু ওদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে একটা ছোট ছেলেও চোখ বুজে নামতে পারে। এই ঘাটটিই এ পাড়ার খিড়কি। ছোট ছোট পানায় তার জল এমন নীল হয়ে গেছে যে ছুঁতেও ঘৃণা হয়।

সকাল বেলা। সবে সূর্য উঠেছে। একটি বৃদ্ধা বিধবা ঘাটের পৈঠায় বসে তামাকের গুল দিয়ে যে ক'টি দাঁত এখনও অবশিষ্ট আছে সেই ক'টি সযত্নে মার্জিত করছিল। আর একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক মাথায় আধঘোমটা টেনে ঘাটের অপর প্রান্তে ঘাড় হেঁট করে নিঃশব্দে বাসন মাজছিল। চারিদিকে গাছের ঝিমিয়ে-আসা পাতায় কেমন একটা স্তব্ধতা এসেছে। তারই বিষণ্ণ ছায়া পড়েছে ডোবার নিস্তরঙ্গ নীল জলে।

একটি বউ ভাঙা বাড়ি থেকে মন্থরপদে বেরিয়ে এসে ঘাটের মাথায় মুখ ঢেকে থমকে দাঁড়াল। কতই বা তার বয়স হবে ? কুড়ি-একুশ, কি তারও কম। ছিপছিপে শরীর, কিন্তু তারও বাঁধন যেন আলগা হয়ে পড়েছে। গাছ থেকে লতার বাঁধন আলগা হয়ে গেলে লতার যে অবস্থা হয় তেমনি। যেন এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে। বউটি মুখ ঢেকে দাঁড়াল। ঘাটের এই দুটি মেয়ের কাছে মুখ দেখাতে তার ইচ্ছে করছে না। তার কচি ঘাসের মতো রঙের লাবণ্য যেন কোথায় উবে গেছে। কোমল ত্বকে

কর্কশতা এসেছে। মুখে কলঙ্ক রেখা দেখা দিয়েছে। চোখে জল নেই বটে, কিন্তু লাল, রক্তের মতো লাল। আর তার ঘন পল্লবে বিশ্বের শ্রান্তির ছায়া এসেছে ঘনিয়ে। তারই ওপর মাথার রুখু চুলগুলি বারে বারে উড়ে উড়ে এসে পড়ছে। চোখের কোণে রাত্রি জাগরণের কালিমা।

বউটি ঘাটের মাথায় থমকে দাঁড়াল। পরিচিত মানুষের সামনে তার পা যেন চলতে চাইছে না। কিন্তু তবু থমকে দাঁড়ালে চলবে না। দিনের সব কাজই তার বাকি। বুড়ি শাশুড়ির কাল থেকে কোমর যেন ভেঙে গেছে। আর উঠতে পারছেন না। স্তিমিত দৃষ্টি চোখের জলে অন্ধ হবার উপক্রম। তবু কান্নার এখনই হয়েছে কী ? বলতে গেলে এখনও তো শুরুই হয়নি! এখনও মানুষটির শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে, চোখ মেলে চাইছে, অতি কষ্টে দুয়েকটি কথাও বলছে। কিন্তু আর বোধ হয় বেশিক্ষণ নয়। হয়তো আজ দুপুরেই নিশ্বাস থেমে যাবে, চোখ মেলে চাওয়াও হবে শেষ। ডাক্তার মুখে কিছু বলেননি — কিন্তু তাঁর মুখ-চোখ দেখে বুঝতে আর কারও বাকি নেই। হয়তো দুপুরেই, কিম্বা বড় জোর সন্ধ্যায়। তার বেশি নয়। কান্নার শুরু হবে তখন। তখন থেকে সমস্ত জীবন-ভোর। সমস্ত জীবন-ভোর ··· সমস্ত জীবন-ভোর ·· সমস্ত জীবন-ভোর ··

এর বেশি তরুবালা আর ভাবতে পারে না। একটি জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তারই সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বাকি জীবনগুলি সমানে চলতে থাকবে—এ যেন বিশ্বাস করার মতো কথা নয়। যাকে প্রত্যহ দেখছি, যার অস্তিত্ব প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করছি, অকস্মাৎ একটি বিশেষ মুহূর্তের পরে তাকে আর কোথাও দেখা যাবে না—একথা ভাবতে গেলেও মন হু হু করে, মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে, অকস্মাৎ পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে গিয়ে সমস্ত মন বিষাদ ঔদাসীন্যে পরিপূর্ণ হয়। জীবনের যেন আর কোনও মানেই থাকে না।

যে বৃদ্ধা পিছন ফিরে দন্তধাবন করছিল, তরুবালাকে সে লক্ষ করেনি। তরুবালা তখন ঘাটের শেষ পৈঠায় পৌঁছেছে। যে মেয়েটি বাসন মাজছিল, সে যেন তরুবালাকে দেখে সমীহ করে একটু সরে বসল। বৃদ্ধার দৃষ্টিও তার ওপর পড়তে সেও অপ্রয়োজনে একটু সরে গেল। সবাই জানে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই বধূটির দুঃখে বনের পাখিও কেঁদে উঠবে। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। এই অল্প সময়টুকু কেউ তাকে দুঃখ দিতে চায় না। এই ঘাটেই বাসন মাজা নিয়ে কত জনের সঙ্গে কত কলহই না হয়ে গেছে। ছোট ঘাট। তিনজন নামলেই চতুর্থ জনের আর পা ফেলবার জায়গা থাকে না। তাকে বাসনের গোছা হাতে করে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। কোথায় কে পৈঠার ওপর চিবানো ডাঁটা ফেলে গেছে ; কার পাতের ভাত ঘাটের কোণে জড় হয়ে আছে, ফেলে দিতে মনে নেই ; কার এঁটো বাসনে কারও পা ঠেকেছে, এই অবেলায় নেয়ে মরতে হবে ; কলহের কারণের কী অভাব আছে ? কিন্তু সে সব আজ নয়, বিশেষ করে এই বধূটির সঙ্গে কিছুতেই নয়। ওর সিঁথির সিন্দুর এখনও জ্বল জ্বল করছে বটে, কিন্তু সে সিন্দুর চিহ্নের দিকে চাওয়া যায় না। সে যেন ওর সিঁথিকেই বিদ্রূপ করছে—মর্মান্তিক বিদ্রূপ। যে সীমন্তিনীর সকল গৌরব আর কিছু পরেই পথের ধুলোয় মিলিয়ে যাবে, তাকে প্রতিবেশিনীরা সকল গৌরব নিঃশেষ করে আজকেই মিটিয়ে দিতে চায়। যাকে ক' দিন আগে তারা গ্রাহ্যই করেনি, আজ তাকেই দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে।

বউটি সসঙ্কোচে ঘাটে নামল।

—নিবারণ কেমন আছে বৌমা ?

বৃদ্ধা একবার গলাটা ঝেড়ে, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে।

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার কিছু নেই। নিবারণের অবস্থা কাল রাত থেকেই খুব খারাপ। ভাল লক্ষণ যা ছিল, একটি একটি করে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আশা করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বৌমা উত্তর দিলে না। নিঃশব্দে মাথাটা নেড়ে ডান হাত দিয়ে ললাটের চুলগুলি সরিয়ে ফেললে। এই ক' দিনের রোগী-সেবায় আর দুর্ভাবনায় তার শরীর আধখানা হয়ে গেছে। শীর্ণ করপ্রকোষ্ঠে চুড়ি

দু'গাছি ঢল ঢল করছে। ওই দু'গাছি সরু চুড়িই আজ তার সম্বল। চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের পর তার গায়ের গহনা অবশেষে ওই দু'গাছিতে এসে ঠেকেছে।

প্রতিবেশিনীরা সহানুভূতিসূচক দীর্ঘশ্বাস ফেললে। কাজ তাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে চলে গেল।

ফাল্গুনের শেষ। জলে এখনও শীত রয়েছে বেশ।

এই ডোবায় নামলে চারিদিকের উঁচু পাড় বাইরের পৃথিবীকে দৃষ্টির আড়ালে রাখে। অকস্মাৎ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তরুবালা যেন বেঁচে গেল। মুমূর্ষু রোগীর অস্ফুট আর্তনাদ,পাণ্ডুর চোখের কাতর দৃষ্টি, শিশুপুত্রের কখনও দাপাদাপি, কখনও চিৎকার, বৃদ্ধা শাশুড়ির ভাষাহীন বিহ্বল দৃষ্টি—জরা-মৃত্যু-ব্যাধিগ্রস্ত বিপুল পৃথ্বী তার সমস্ত কুশ্রীতা নিয়ে এই গোষ্পদের সুগভীর নির্জনতায় তলিয়ে গেল।

তরুবালা মুখ ধোবার জন্যে ঘাটে এসেছিল। তার এখনও অনেক কাজ বাকি। সমস্ত রাত ছটফট করে এখন একটু নিস্তেজ হয়ে স্বামী ঝিমুচ্ছে। এখনই উঠবে বোধ হয়। কাছে কেউ নেই। সমস্ত রাত্রি জেগে শাশুড়ি ও ঘরে এলিয়ে পড়েছেন। ছেলেটা সকালে উঠে পুজোর রঙিন পাঞ্জাবিটা গায়ে দেবার জন্যে বেজায় ঝোঁক ধরেছিল। সেটা বের করে দিতেই ছুটতে ছুটতে পাড়ায় বেরিয়ে গেছে। স্বামীর কাছে কেউই নেই। রোগীর ঘুম, হয়তো এখনই উঠে পড়বে। তাকে ওষুধ দিতে হবে। একটুখানি বেদানার রস করে খাওয়াতে হবে। গায়ের ঢাকাটা খুলে গিয়ে থাকলে আবার ভাল করে গায়ে দিয়ে দিতে হবে। কত কাজ। ছেলেটা একটু পরেই ফিরবে। গয়লা দুধ দিয়ে গেছে, সেটুকু গরম করে রাখতে হবে। নইলে ক্ষুধায় ছেলেটা কাঁদবে। কাল শাশুড়ির একাদশী গেছে। তাঁর দ্বাদশীর ব্যবস্থা করতে হবে। আর নিজের জন্যে না হলেও, ওদের দুজনের জন্যেও তো দুটো ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতে হবে। মাত্র একটি মানুষেরই জীবনের তেল ফুরিয়ে এসেছে। পৃথিবীর গতি তো আর বন্ধ হয়নি। যে যাবে সে যাবে, যারা থাকবে তাদের খেতেও হবে, খাটতেও হবে, সবই করতে হবে।

তরুবালার অনেক কাজ।

কিন্তু ডোবার ঠাণ্ডা জল তাকে লোভ দেখাচ্ছে। সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে। উনিশ-কুড়ি বছরের তরুবালা আর পারে না। সে আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে এই সুশীতল একাকিত্বে যেন মগ্ন হয়ে গেল। বাইরের পৃথিবীর কিছুই আর খেয়াল রইল না।

খেয়াল রইল না রুগ্ন স্বামীর মুখ, শাশুড়ির দ্বাদশী-পর্ব, ক্ষুধার্ত শিশুর কাতরতা, ঘর-কন্নার আরও সহস্রবিধ খুঁটিনাটি।

খেয়াল রইল না নিজের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী অসংখ্য দুঃখ-দারিদ্র্য ও জীবন-সংগ্রামের দুর্ভাবনা। বুড়ি শাশুড়ি মরি-মরি করেও আরও কতকাল বাঁচবেন কে জানে, কে জানে সে নিজেই কতকালের পরমায়ু নিয়ে এসেছে। ছোট ছেলে একদিন বড় হবে, তাকে মানুষ করতে হবে,—কিন্তু সে পরের কথা পরে, আপাতত এই তিনটি প্রাণীব দৈনন্দিন দুবেলা দুটি গ্রাসের অন্ন কে জোগাবে সেই তো সমস্যা।

কিন্তু তরুবালা আর ভাবতে পারে না। গত পনেরো দিন ধরে সে কেবলই ভাবছে, কেবলই ভাবছে। ভেবে ভেবে তার দেহ-মন ভেঙে গেছে, মস্তিষ্কের ভাববার শক্তি লোপ পেয়েছে। একটু সে বিশ্রাম চায়। একটু বিস্মৃতি।

ডোবার নীল জল কন্‌কনে ঠাণ্ডা। উঁচু পাড়ের আড়ালে পৃথিবীতে চলেছে ভাঙা-গড়ার খেলা—অবিশ্রান্ত। ঝোপে ঝোপে ক'টি পাখি তুলেছে নিরবচ্ছিন্ন কূজন। তরুবালার সব ভুল হয়ে গেল . . .

সে ডোবার জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মুখ দিয়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে আপন মনে খেলা করতে

লাগল।

নিবারণ মস্ত বড় লোক নয়। সে মারা গেলে তার নিজের নিভৃত কোণটি ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা যাবে না। না বেরুবে খবরের কাগজে ছবি, না লেখা হবে ইনিয়ে-বিনিয়ে সত্যি-মিথ্যে নানা রকম শ্রদ্ধাঞ্জলি। এক যদি কোনও বড়লোকের মোটর চাপা পড়ে মরতে পারত, কিম্বা পুলিশের গুলিতে, তাহলেও হত। কিন্তু সে মরছে নিতান্ত মামুলি ধরনে—দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগে অস্থিচর্মসার হয়ে—আরও কোটি কোটি লোক প্রত্যহ যেমনভাবে মরছে। এমন মৃত্যুর কেই বা খবর বাখার উৎসাহ বোধ করে। আর কী উৎসাহই বা বোধ করবে ? কেউ কি তাকে চেনে ? মানব সভ্যতায় তার দান কী ?

নিবারণ ক্যানভাসার। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল লাইনে সে ট্রেনে ফেরি করে বেড়ায়—জি. সি. দত্তের বিখ্যাত নিমের মাজনের, জয়পুরেব মান সিং গুলির, নারকেল তেলের মসলার, সুগন্ধি ধূপকাঠির, আর মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করার অব্যর্থ ও একমাত্র ওষুধ মাথলিনের'

তার বযস পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, কি বড় জোর আটাশ অর্থাৎ তাকে দেখে তার বয়স বলা শক্ত। নিবারণ সাধারণ বাঙালির চেয়ে অন্তত চার ইঞ্চি বেঁটে, রোগা। সে তুলনায় গোঁফজোড়া যথেষ্ট বড়। আর জুল্‌ফি নামাতে নামাতে গালপাট্টায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাল মাংসহীন। চোয়াল চওড়া, আর সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে। নাকের গোড়াটা চ্যাপটা, কিন্তু ডগাটা বর্তুলাকব। হাঁ-মুখ অসম্ভব রকম বড়, আর পুরু পুরু ঠোঁট। আর কণ্ঠ ? নিবারণ পাশের গাড়িতে কথা বললেও এ গাড়ি থেকে শোনা যায়।

লোকটি ওরই মধ্যে একটু সৌখিন। গায়ে থাকে একটি সিল্ক, নয়তো লংক্লথের পাঞ্জাবি। পরনের কাপড় ধোপ-দুরস্ত। হাতে রিস্ট-ওয়াচ। মাথার চুলে পরিপাটি টেরি। এর সঙ্গে মিলত না তার জুতো। সময়াভাবে জুতোয় কালিও দিতে পারত না, মেরামতও করাতে পারত না। আর সময়ের অভাব ঘটত ক্ষৌরকর্মে। ক্যানভাসারের রবিবারও নেই, দোল দুর্গোৎসবও নেই। সেই কারণে মুখমণ্ডল প্রায়ই শ্মশ্রুকণ্টকিত হয়ে থাকত।

ন'টার সময়ে যা-হোক-দু'টি নাকে-মুখে দিয়ে তাকে বেরুতে হত। এই যা-হোক-দু'টির ব্যবস্থা করতেই তরুবালাকে উঠতে হত ভোর পাঁচটায়। নিবারণ একটু নিদ্রাবিলাসী। উঠতে তার সাড়ে সাতটা বেজে যেত। তাও কি সহজে ? তরুবালা চা নিয়ে এসে কত সাধ্যসাধনা করে তবে ওঠাত। চোখ বুজে বুজেই নিবারণ চা-টুকু খেয়ে নিত। তারপরে একটু অবসাদ কাটলে, উঠে তেল মেখে, একেবারে দাঁতন করতে করতে নাইতে যেত—কী শীত, কী গ্রীষ্ম। স্নান করে এসেই খেতে বসা, তারপরে ন'টা-সাতের ট্রেন ধরতে স্টেশনে দৌড়ান। যাওয়ার সময় তরুবালা হাসিমুখে দুটি পান দিত —প্রত্যহ। এর আর ব্যতিক্রম ছিল না। খোকা নিজের হাতে বাপের মুখে পান দুটি তুলে দিত। কোনও দিন প্রসাদ পেত, কোনও দিন পেত না।

তারপরে ?

—জি. সি. দত্তের বিখ্যাত নিমের মাজন চাই ? মাজন ? আপনারা অনেক দামি দিশি ও বিলাতি মাজন ব্যবহার করে দেখেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের নিমের মাজনও একবার ব্যবহার করে দেখতে অনুরোধ করি। মহাশয়গণ, এ মাজনে কোনও অদ্ভুত জিনিস নেই। এ আমাদের দিশি গাছ-গাছড়ায় তৈরি। এতে আছে আমলা, হরিতকী, বহেড়া··· দাঁত নড়া, দাঁতে রক্ত পড়া, দাঁতের গোড়া কন্ কন্ করা, দাঁতের পোকা প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ একদিনেই আরোগ্য হবে। এ আমার বাজে কথা নয়, মহাশয়গণ। যাঁদের দাঁত হল্ হল্ করে নড়ছে, কিম্বা মুখে এমন দুর্গন্ধ হয় যে কারও সামনে

কথা বলতে সঙ্কোচ হয়, এমন যদি এখানে কেউ থাকেন, তাঁকে একবার আমাদের এই মাজন পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি। এক মাসের ব্যবহারযোগ্য এক কৌটার দাম মাত্র দু'পয়সা। এক সঙ্গে তিন কৌটা নিলে মাত্র পাঁচ পয়সায় পাবেন। মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে চমৎকার সুগন্ধ হবে। যাঁর দরকার হবে চেয়ে নেবেন।

মুখের গন্ধ এত লোকের মধ্যে স্বীকার করতে কেউ রাজি নয়। যাদের দাঁত হল্ হল্ করে নড়ে তারাও এই ট্রেনে, মুখ ধোবার জল নেই কিছু নেই, এমন মহৌষধ ব্যবহার করে দেখতে সম্মত হয় না। তবু প্রয়োজন মতো কেউ কেনে, কেউ কেনে না।

নিবারণ বিখ্যাত মাজন ব্যাগে পুরে আবার একটা নতুন জিনিস তুলে চিৎকার আরম্ভ করে :

—জয়পুরের মানসিং গুলি ; চাই কারও? মহাশয়গণ, আমাদের নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি, একটু দয়া করে শুনবেন।

হয়তো কোনও ভদ্রলোক একটু ঝিমুচ্ছিলেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বলেন, দয়া না করেও শুনতে পাচ্ছি মশাই, একটু আস্তে বলবেন।

নিবারণ অপ্রস্তুত হয় না, হাসে। গলা একটুও না নামিয়ে বলে চলে,—মুখস্ত বলার মতো :

—মহারাজা মানসিংহ এই গুলি ব্যবহার করতেন। হাসবেন না মহাশয়গণ, আপনাদের দেশে সব ছিল। কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যাতে বিলিতি ওষুধের দোকানের ছাপমারা নেই, এখন আপনারা তার নাম শুনলেও হেসে উঠবেন। আমার মুখের কথায় আপনাদের বিশ্বাস হবে না মহাশয়গণ। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী? এতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে, দেহের বল বাড়ে, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়, গলা ধরা, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া, টন্সিলের ব্যথা সমস্ত আরোগ্য হয়। মূল্য একশো গুলির শিশি মাত্র চার আনা। আমার কাছে ছোট নমুনার শিশিও আছে। মূল্য চার পয়সা মাত্র। যাঁর আবশ্যক হবে, চেয়ে নেবেন।

তারপর নারকেল তেলের মসলা। তারপরে মাথলিন।

সবই পরের পর নিবারণ তোতাপাখির মতো গড় গড় করে বলে। যাদের ওষুধ, কী বলতে হবে তারা তা লিখে দিয়েছে। নিবারণ মুখস্থ বলে যায়। তার নিজের 'অবদান' মাঝে মাঝে 'মহাশয়গণ' কথা বসিয়ে দেওয়ায়।

ওর সাহিত্যিক কৃতিত্ব হচ্ছে সুগন্ধি ধূপের বেলায়। সেই জন্যে এইটে সে সব শেষে বলে :

—ধূপ চাই? মহীশূরের ধূপ? বাসর-মজান, রতিবিলাস ধূপ আছে!

সকলের দিকে চেয়ে আবার বলে :

—রতিবিলাসও বটে, আরতিবিলাসও বটে! যার যেমন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেবেন।

'বাসর-মজান', 'রতিবিলাস'—আর তার সঙ্গে 'আরতিবিলাস' এই তিনটে কথা তার নিজের আবিষ্কার এবং এই 'সাহিত্যিক' প্রচেষ্টায় সে বেশ গর্ব অনুভব করে। আরও কয়েকজন ধূপ বিক্রি করে, কিন্তু তারা শুধু বলে মহীশূরের সুগন্ধি ধূপ। নিবারণের 'ট্রেড-মার্ক' যেন কেউ ব্যবহার না করে সেজন্যে তাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

নিবারণ তার 'ট্রেড-মার্কের' ফল শ্রোতৃবৃন্দের ওপর কী রকম হল—চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর বলে :

—যাঁরা অনেকদিন পরে বাড়ি যাচ্ছেন তাঁরা অন্তত এক প্যাকেট কিনে নিয়ে যান। দেখবেন সুগন্ধে ঘর মৌ মৌ করবে, 'মানুষের' মুখে হাসি ফুটবে, সুখে নিশি প্রভাত হবে, আর আমার ধূপের জয় জয়কার হবে। বাসর-মজান ধূপ। সুগন্ধে বাসর রাত্রির কথা মনে পড়বে। নিয়ে যান। রতিবিলাস ধূপ, আরতিবিলাসও বটে,—যাঁর যেমন দরকার। এক প্যাকেট মাত্র দু'পয়সা, পাঁচ পয়সায় তিন প্যাকেট। এক রাত্রেই দামের চতুর্গুণ উশুল হবে।

নিবারণ আত্মতৃপ্তির হাসি হাসে। তার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলেই হোক আর যে কারণেই হোক ধূপটা বিক্রি হয় বেশ, মানে অন্য জিনিসের চেয়ে বেশি।

প্রায়ই কামরায় দু'একজন পরিচিত লোক থাকেন। ছ'বছর ধরে এই লাইনে সে ঘুরছে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে রসিকতা হয় :

—এই যে বাবুদাদা, আবার অনেকদিন পরে যে! কলকাতায় বাসা করেছেন ? বেশ, বেশ, তা, হোক, বাসর-মজান ধূপ দু'প্যাকেট নিয়ে যান। এত সস্তায় এ জিনিস আর কোথাও পেতে হয় না।

বাবুদাদার 'না' বলবার উপায় থাকে না। ততক্ষণে নিবারণ তাঁকে দু'প্যাকেট ধূপ গছিয়ে দিয়েছে।

বাবুদাদা কেবল একবার বলেন, দু'প্যাকেট নয়, এক প্যাকেট দিন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! নিবারণ হাসতে হাসতে বলে, এক প্যাকেটে কি হয় ? কলকাতায় বাসা করেছেন··· আবার কবে দেখা হবে··· কী রকম। বড়বাবু নাকি ? এই নিন আপনার সুবাসিত নারকেল তেলের মসলা। আজ শনিবার। জানি কি না, আপনি আজ আসবেনই। আমি এই ছ'বছরের মধ্যে আপনাকে একটা শনিবারও বাদ দিতে দেখলাম না।

নিবারণ নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে ওঠে।

—ক' প্যাকেট দোব। দুটো ? চারটে ?

বড়বাবু তাড়াতাড়ি বললেন, না, না। আজ আর দরকার হবে না। সেদিন দুটো নিয়ে গেছি, তাই এখনও ফুরোয়নি।

নিবারণ বড়বাবুর হাতে দুটো প্যাকেট গুঁজে দিয়ে বলে, সে প্যাকেট নয় বড়বাবু, আপনার জন্যে স্পেশাল তৈরি করে রেখেছিলাম। বাড়ি নিয়ে যান, যিনি সমঝদার তিনি বুঝবেন।

নিবারণ হো হো করে হাসলে।

প্রতি কামরাতেই এমনি দু'একজন আছেই। কেউ দাদা, কেউ ভাই, কেউ বাবু। কিন্তু কারও নাম সে জানে না। তারও নাম কেউ জানে না। শুধু চেনার পরিচয়। নাম পাতিয়ে নিয়েছে নতুন করে। তাতে উভয় পক্ষেরই কাজ চলে যায় নির্বিঘ্নে। প্রতিদিনের লেন-দেনে কোনও অসুবিধা হয় না। সেই কারণে এর চেয়ে ভাল করে চেনবার জন্যে কোনও পক্ষেরই কৌতূহল এর চেয়ে বেশি এগোয়নি।

নিবারণের পৃথিবী বলতে এই। ঘরে মা, স্ত্রী, একটা শিশুপুত্র,—আর বাইরে এরা। তার নামের কারবার নেই। মা, মা। মায়ের নাম থাকে না। স্ত্রী, ওগো। আর শিশুপুত্রের নাম এখনও স্থির হয়নি। যে যা খুশি তাই বলে ডাকে। তাতেই শিশু সাড়া দেয়। আর বাইরে একদল নামহীন, অপরিচিত বন্ধু। এই নামের পৃথিবীতে তার কারবার একটু অদ্ভুত ধরনের। যত নামহীন লোক নিয়ে।

তার অসুখের খবর কেউ পেলে, কেউ পেলে না। কেউ জানলে, কেউ জানলেই না। কিন্তু সবাই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মনে মনে একবার বোধহয় অনুভব করলে।

তরুবালা ঘাটে গলা ডুবিয়ে রয়েছে তো রয়েইছে।

ওর যেন জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। কিছুরই আর খেয়াল নেই। ছোট মেয়ের মতো আপনমনে জল নিয়ে খেলাই করছে, খেলাই করছে। সময়ের হিসাব নেই।

ঘোষালগিন্নি ঘাটে এসে সশব্দে বাসন নামালেন। তরুবালার কানে এ শব্দ পৌঁছুলই না। তাকে অমন নিশ্চিন্তভাবে জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখে ঘোষালগিন্নি ভাবলেন, নিবারণ বোধহয় ভালই আছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, নিবারণ কেমন আছে বৌমা ?

নিবারণ ? নিবারণ কে ? তরুবালা অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। কিছুই যেন সে বুঝতে পারেনি এমনি করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

তারপরে বিস্মৃতির তিমির বিদীর্ণ করে ধীরে ধীরে জেগে উঠল বাস্তব পৃথিবীর রূপ··· যেখানে মায়ের চোখের সুমুখে মরে ছেলে, স্ত্রীর চোখের সুমুখে মরে স্বামী, ভায়ের চোখের সুমুখে মরে ভাই।

নিষ্ঠুর, কদর্য পৃথিবী।

তরুবালার চোখের পল্লবে আবার ঘনিয়ে এল বিষণ্ণ ছায়া, ঠোঁটে জাগল নিরতিশয় অসহায়তা, আর দুই চোখে ভরে উঠল অসীম শূন্যতা।

তরুবালা মাথায় ভাল করে ঘোমটা দিয়ে ক্লান্তস্বরে বললে, ভাল নেই খুড়িমা।

সামনের মরা আমড়া গাছের শুকনো ডালে একটা কাক এমন করে ডেকে উঠল যে, দু'জনেই ভয়ে ভাবনায় শিউরে উঠল।

সেদিন আর নয়, কিন্তু তার পরের দিন দুপুরের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। সকালেই নাভিশ্বাস উঠেছিল। ঘোষালগিন্নি চটপটে মেয়ে। ব্যাপার বুঝে সকালেই নিবারণের ছেলেকে দুটো ভাতে-ভাত নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জেদাজেদিতে তরুবালাকেও অমন অবস্থায় স্বামীকে ফেলে রেখে একবার থালার সামনে বসতে হয়েছিল, এক টুকরো মাছও মুখে দিতে হয়েছিল। এ নাকি প্রথা। প্রতিবেশিনীরা তাকে জোর করে স্বামীর কাছ থেকে তুলে নিয়ে ঘোষাল বাড়ির রান্নাঘরে বসিয়ে দিয়েছিল। কে একজন এক টুকরো মাছও তার মুখে গুঁজে দেয়। এ নাকি লক্ষণ!

তখনই তরুবালা স্বামীর শিয়রে ফিরে আসে। কিন্তু কথা নিবারণের সকাল থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু চোখের দেখা। চোখ মেলে স্বামীর শেষ যন্ত্রণা দেখা।

সেও অল্পক্ষণের জন্যে। দুপুরের মধ্যেই নিবারণ চলে গেল। সন্ধ্যার মধ্যেই তার পার্থিব দেহের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট রইল না।

নিবারণের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আর পাঁচজনের মতোই অতি সামান্য। ট্রেনের জনৈক সহযাত্রীর মুখে এই ঘটনা শুনেছিলাম। ঘটনাও আজকের নয়, অনেক দিন আগের। কিন্তু আমাদের ট্রেন সেই পানাপুকুরের ধার দিয়ে চলবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল নিবারণকে, অনেক দিন পরে।

এই গতির জগতে মানুষের বিশ্রামের অবকাশ নেই। নিবারণের মৃত্যুর পর এই পথ দিয়ে হাজার ট্রেন এসেছে, গেছে। হাজার যাত্রী। এইখানে পানাপুকুরের সামনে এসে কচিৎ কারও হয়তো তাকে মনে পড়েছে, একটি মুহূর্তের জন্যে। তেমনি করে আমারও তাকে মনে পড়ল অনেক কাল পরে। ওই পানাপুকুরের অনেক পরিবর্তনই নিশ্চয় তার পরে হয়েছে। কিন্তু দেখে দেখে তা আর চোখে পড়ে না। ওরই মধ্যে নিবারণের স্মৃতি একটুখানি কোথাও বেঁচে আছে। ওদিকে চাইতেই এক মুহূর্তের জন্যে তাকে একবার মনে পড়ল।

এরবার মাত্র। তাও নিবারণের জন্যে নয়, বিশেষ কোনও একজন লোকের জন্যেও নয়। এরবার শুধু মনে হল যাদের চিনতাম তাদের মধ্যে কত মানুষই নেই। চকিতে সমস্ত মন কেমন উদাস হয়ে গেল।

ট্রেন চলেছে ঝড়ের বেগে।

শ্রীরামপুর··· শ্রীরামপুর···

নতুন স্টেশন। সে পানাপুকুরের চিহ্ন মাত্র নেই। আবার নতুন জগৎ, নতুন আবেষ্টনী। পাঁচ মিনিট আগের মন পাঁচ মিনিট পিছিয়ে পড়ল। তার হল মৃত্যু। আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভারতবর্ষ ১৩৩৮

রং নাম্বার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'হ্যালো।' রিসিভার তুলে নিল জয়ন্ত।

'তুমি এখন ফ্রি আছ ?' ওপার থেকে জিগগেস করল অরুণিমা।

'না। রং নাম্বার।'

রং নাম্বার মানে ঘরে লোক আছে।

'আচ্ছা। পরে আবার করব। না—এবার তুমি—'

দেওয়ালের কান আছে, কিন্তু এ টেলিফোনের কথা শোনবার আর দ্বিতীয় কান নেই।

কটার সময় করতে হবে বলে দেয়নি।

নটা। যাক আরও দশ মিনিট। হস্টেলে ফিরে আসবার সময় ছাত্রীদের বেলায় আটটা, সুপারিনটেন্ডেন্টের বেলায় আর এক ঘণ্টা বেশি। পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে আরও দশ মিনিট ছেড়ে দেওয়া সমীচীন।

'হ্যালো।' ওপার থেকে আওয়াজ হল। 'কাকে চাই ?'

অন্য কোনও মেয়ের গলা। ছাত্রীরা কেউ হয়তো।

'সুপারিনটেন্ডেন্ট আছেন ?' জিগগেস করল জয়ন্ত।

'না। এখনও ফেরেননি।'

'আচ্ছা।'

'কিছু বলতে হবে ?'

'না।'

ঘরে ফিরে এসে অরুণিমা শুনল কে তাকে ফোন করেছিল।

ছাত্রী টিপ্পুনী কাটল, 'কে একজন ভদ্রলোক।'

'কে জানে।' তাচ্ছিল্যের ভাব করল অরুণিমা।

নিরালা হলে তাকাল টেলিফোনের দিকে। একবার তুলে নেবে নাকি কানে ? ছটা অঙ্ক এদিক ওদিক সন্নিবেশ করার পরই চকিতে শোনা যাবে সেই মধুক্ষরণ কণ্ঠস্বর। শোনা যাবে সেই ডাক, অরুণ, অরুণ, আমার ভোরের অরুণ, লজ্জার অরুণ, কামনার অরুণ—পুরুষের নাম ধরা ডাক শুনতে কী অদ্ভুত যে লাগে। প্রায় সূচ্যগ্র স্পর্শের মতো। তুলবে নাকি রিসিভার ? মুহূর্তে দেখবে নাকি আশ্চর্যকে ? কত দূরে আমি কত দূরে সে। মাঝখানে কত মাঠ কত রাস্তা কত শব্দ কত অন্ধকার। কত বিধি কত বাধা। কিন্তু ছটা অঙ্কের সন্নিবেশ করলেই হৃদয়ের কানে হৃদয়ের মুখ রাখা। আমি তাকে ডাকব জয়, সে ডাকবে অরুণ, আরও একটু গাঢ় হলে রুনি।

কিন্তু এখন ডাকব কি ? এখন তার ঘরে তার স্ত্রীর রাজ্য বসেছে। যদি সিনেমায় গিয়ে থাকে ফিরে এসেছে বাড়ি। ছোটদের খাবার টেবিলে ডাক পড়েছে। কিংবা হয়তো রেডিওতে শব্দঝরা নাটক শুনছে। ফোন করতে গেলেই রং নাম্বার হয়ে যাবে।

জয়ন্তেরই উচিত নিজের সময় খুঁজে নেওয়া। কখন অরুণিমা হস্টেলে থাকে বা না থাকে শিডিউল তো তাকে দেওয়াই আছে। একটু আধটু ব্যতিক্রম সব নিয়মেরই আছে। তা ছেড়ে দিলে জয়ন্তই তো বেশি নিশ্চিন্ত—সেই তো পারে দড়ির দুই প্রান্ত এক করতে। কিন্তু গরজ তো তার নয় গরজ অরুণিমার।

জয়ন্তের জন্যে তো রয়েছে উপশম। কিন্তু অরুণিমার শয্যাভরা আন্তীর্ণ যন্ত্রণা। আর স্বীকার করতে দোষ কী, অরুণিমা এখনও অচ্ছিন্না কুমারী, অনাঘ্রাতা।

তবু যন্ত্রণায় আমি কাতর হব না, যন্ত্রণায় আমি উজ্জ্বল হব। নির্লজ্জ উজ্জ্বল।

'আমার বড় দোষ—' বলছিল অরুণিমা।

'কী দোষ ?' জিগগেস করছিল জয়ন্ত।

'আমি খুব অধীর।'

'অধীরতা তো গুণ।'

'গুণ ?'

'অধীরতা তো অপ্রাপ্তিকেও সুস্বাদু করে। অধীরতাই তো অকপট।'

'কিন্তু অধীরতার চেয়ে দৃঢ়তা কি ভাল নয় ?' আকুল চোখে তাকিয়েছিল অরুণিমা।

জয়ন্ত হেসেছিল করুণ করে : 'দৃঢ়তা তো স্থবির।'

এখনও বেশেবাসে ঢিলেঢালা হয়নি এরই মধ্যে আবার কতকগুলি মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আর তক্ষুনি বেজে উঠল টেলিফোন।

'হ্যালো।' অরুণিমা তুলে নিল রিসিভার।

'তুমি একা আছ ?'

মুখেচোখে বিরক্তির ঝাঁজ আনল অরুণিমা : 'না। রং নাম্বার।' রিসিভারটা রেখে দিল সশব্দে। যেন ভাগ্যের মুখের উপর ছুঁড়ে মারল।

'তোমরা আবার এখন কী করতে এসেছ ?' প্রায় কান্নায় মতো সুরে রুখে উঠল অরুণিমা : 'আমার শরীর ভাল নেই, আমি তোমাদের পিটিশন ফিটিশন এখন শুনতে পারব না। সব কিছুরই একটা সময় আছে, শ্রী আছে—'

তাড়িয়ে দিল মেয়েদের। দরজা বন্ধ করে দিল।

অরুণিমা তাকাল টেলিফোনের দিকেই, সম্বোধন করে বলল, 'জয়, আমি এখন একা, অভেদ্য, একা, আমাকে কিছু বলো, আবার আমাকে বোঝাও—'

কী আর বলবার আছে, কী আর বোঝাবার আছে। অনেক বলেও বলা হয় না, আর যে বোঝাবে সেই বোঝেনি কিছু।

তবু টেলিফোনে কথা বলাটা কী সুন্দর।

নতুন রকম শ্রোতা-বক্তা নতুন রকম সুর। নতুন রকম মন।

সন্নিহিত হয়েও ব্যবহিত। ব্যবহিত হয়েও সন্নিহিত।

অনেক কথা আছে যা মুখে বলা যায় না অথচ চিঠিতে লেখা যায়। অনেক কথা আছে যা মুখেও বলা যায় না চিঠিতে লেখা যায় না অথচ বলা যায় টেলিফোনে। আরেক দেশের আরেক রকম ভাষা। মৌলিকও নয়, লৈখিকও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি অথচ দুটোকেই অতিক্রম করে। রঙ্গমঞ্চে এসেও একটু নেপথ্য থাকা। সম্মুখীন বলতে বলতে আবার খানিক স্বগত বলা।

'কী দেখে আমাকে তুমি ভালবাসলে ?'

'কী দেখে ? তোমার পৌরুষ ? তোমার প্রতিভা ? তোমার ঐশ্বর্য ? বলো না কী বলব ? তোমার হৃদয় ? সেই তোমাকে যখন বললাম, জানো, এত বড় হয়েছি এখনও আমি সমুদ্র দেখিনি, তুমি তার উত্তরে বললে, আমার হৃদয় দেখো। আসল কথা কী জানো ? আসল কথা, আমাকে কোনও পুরুষই দেখেনি হৃদয়ের চোখে, তৃতীয় চোখে। তোমার মাঝেই প্রথম দেখলাম এই তৃতীয় চোখ। তাই তোমাকে দেরি-র মানুষ জেনেও দূরের মানুষ করে রাখতে পারলাম না।'

এ সব কথা কি চিঠিতে লেখা যায় ? ফাঁকা কাব্যের মতো লাগে। বলা যায় মুখে ? নাটুকে নাটুকে শোনায়।

এ সব কথার জন্যেই টেলিফোন।

ইচ্ছে করে মাঝরাতে একটা ফোন আসুক। সাধ্যি কী এক ঝলকও ঘণ্টা বাজে। মেয়েদের জিভ তো এমনিতেই নড়ে, ঘণ্টা শুনে কানও নড়তে থাকবে। কত মেয়ের মধ্যরাতেও ঘুম আসে না। হিংসেয় ফেটে যাবে, আহা এই নিশীথস্বর যদি আমার হত।

তবে সেদিন মধ্যরাতে যখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল ফোন এসেছিল অরুণিমার। এমন তুমুল বর্ষণ ঘণ্টার শব্দ পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল।

'জানো, মধ্যরাতে ডায়াল করতে পর্যন্ত ভয়।' ওপার থেকে বলেছিল জয়ন্ত। 'যদি ও জেগে ওঠে। ও কে বুঝতে পেরেছ তো ?'

'পেরেছি। উহ্য থাকলেও যে কর্তৃকারক।'

'সুন্দর বলেছ। কিন্তু আসলে কর্তৃকারিকা।'

'ঘুমুচ্ছেন ?'

'বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন।'

'আলো জ্বেলেছ ?'

'না। আলো জ্বাললেই ধরা পড়ে যাব। টর্চ টিপে নম্বর দেখে ডায়াল করলাম। এখন অমল অন্ধকার।'

'জয়।'

'অরুণ। রুনি।'

এ পরিবেশ কি চিঠিতে হয় ? না হয় সাক্ষাৎ-দর্শনে ? এ পরিবেশের রচয়িতা টেলিফোন।

সাক্ষাৎ দর্শন কী সোজা কথা ? দুজনের কাজ আর ছুটিকে খাপ খাওয়ানোই কঠিন। আর সবচেয়ে অসুবিধা জয়ন্ত যেতে পারে না হস্টেলে, মেয়েদের হস্টেল, অরুণিমা যেতে পারে না জয়ন্তের বাড়ি যেখানে তার স্ত্রী নীলাক্ষী রয়েছে একচ্ছত্রী।

জয়ন্তের যে ছুটি তার বেশির ভাগ নীলাক্ষীই গ্রাস করে নিয়েছে আর অরুণিমার যা ছুটি তা থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী।

তা টেলিফোনেও যখন রং নাম্বার, ছাত্রীদের কান-নাড়া, তখন চিঠি ছাড়া আর গতি কী। সভ্য সমাজে ভাগ্যিস সম্ভ্রান্ত একটা নিয়ম ছিল যে পরের চিঠি খুলে পড়া হয় না। তাই আর সেদিকে কোনও আলোড়ন ছিল না। শান্তির সরোবর বলতে চিঠিই। নাই বা থাকল তাতে টেলিফোনের শিহরণ।

এরই মধ্যে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে ঠেকো ওখানে গোঁজা দিয়ে, এ-ঘরের ঘুঁটি ও-ঘরে বসিয়ে, গোল গর্তে চৌকো খুঁটি—মাঝেমধ্যে দেখা হয়েছে তাদের।

সেদিন দেখা করেছে একটা পার্কের ফটকে। তারপর দুজনে ভিতরে ঢুকে—একটাও খালি বেঞ্চি নেই—বসেছে ঘাসের উপর। নিরিবিলি একটু ঘাস পাওয়াও দুষ্কর।

'জানো তোমার কাছে আমি একটি উপহার চাই।' বললে অরুণিমা।

'বেশ তো, বলো, কী চাও। তাহলে বসলে কেন ? ওঠো।'

তাড়া দিল জয়ন্ত। 'দোকানগুলো এখনও বন্ধ হয়নি। আর পকেটে আজ আমার যথেষ্ট টাকা আছে।'

'টাকা ?' পাথরের চোখে তাকাল অরুণিমা।

'টাকাই তো সামামবোনাম। কাঞ্চনের আসল হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা।' হঠাৎ একবারে মাটিতে নেমে এল জয়ন্ত : 'টাকা দিয়েই তো শাড়ি গহনা বই ঘড়ি—যা চাও।'

'আমি তোমার কাছে শাড়ি গহনা চাই ?'

'চাইলে ক্ষতি কী। চাওয়াই তো উচিত।' হাসল জয়ন্ত : 'ভরণ বলতে আভরণ আর পোষণ বলতে পোশাক—'

'না, ওসব নয়!' গম্ভীর হল অরুণিমা : 'আমি তোমার কাছে একটা ছোট্ট জিনিস চাই।'

'ছোট্ট ?'

'হ্যাঁ, বলতে পারো সূচ্যগ্র। একটা স্থায়িত্বের চিহ্ন।'

'সে আবার কী ?'

হাতব্যাগ থেকে ছোট একটা রুপোর কৌটো বার করল অরুণিমা। খুলল। খুলে দেখাল। আলোতে জয়ন্ত দেখল, সিঁদুর।

খোলা কৌটো এগিয়ে দিয়ে অরুণিমা বললে, 'তোমার আঙুল করে এর এক ফোঁটা আমার কপালে আর সিঁথেয় দিয়ে দাও।'

হো—হো করে হেসে উঠল জয়ন্ত। বললে, 'চাঁদ ওঠেনি তো আকাশে ? এ বুঝি সাক্ষী করে বিয়ে করা।'

'তা জানি না।' কৌটো সরিয়ে নিল না অরুণিমা।

'তুমি ভাবছ এমনি একটা ফোঁটা তিলক কাটলেই তুমি আমার অ্যাডিশনাল বউ হয়ে গেলে।'

'তা ছাড়া আবার কী। লোকের তো একাধিক বউ থাকে। আর স্ত্রী হয়ে আমি তো তোমার কাছ থেকে ভরণ-পোষণ চাইব না।' স্বর দৃঢ়তর হল অরুণিমার : 'আমি একাই দাঁড়াতে পারব নিজের পায়ে। শুধু কপালে একটা জয়টীকা পরে বেড়ানো। ঝুঁকি যে নিতে পারি তার সাইনবোর্ড এঁটে চলা। নির্ভয় হয়ে চলা। তারপর সত্যি যদি ঝুঁকি নেবার দিন আসে—'

থামা হাসিটা আবার খুঁচিয়ে তুলল অরুণিমা। জয়ন্ত বললে, 'লোকে জিজ্ঞেস করলে কী বলবে!'

'বলব বিয়ে করে এলাম। ছাত্রীরা কুমারী, আমিও কুমারী। ওরা যদি এ বেলা বেরিয়ে ও বেলা বিয়ে করে আসতে পারে, আমি ওদের কর্ত্রী, আমি পারব না ?'

'স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলে কী বলবে।'

'স্বামীর নাম বলা বারণ, কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। যদি করে, যদি নেহাত বলতেই হয় বানিয়ে বলব। কিন্তু অন্তরে-অন্তরে জানব কে আমার নিরন্তর।'

খোঁচানো আগুন দাউ দাউ করে উঠল।

'এত তোমার হাসবার কী হয়েছে ?' আহতের মতো প্রশ্ন করল অরুণিমা।

'একাধিক বিয়ে আর নেই।' হতাশার সুর মিশিয়ে জয়ন্ত বললে, 'সে স্বর্ণযুগের অবসান হয়েছে। নতুন আইন নতুন আশার পায়ে কুড়ুল মেরেছে।'

'তার মানে ?'

'তার মানে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে আরেক মেয়েকে বিয়ে করা অবৈধ।'

এক মুহূর্ত দেরি করল না অরুণিমা, নিষ্ঠুর আগ্রহে বললে, 'বেশ, যাতে বৈধ হয় তাই করো।'

স্তব্ধ হয়ে গেল জয়ন্ত।

অরুণিমা সরে এল একটু ঘন হয়ে। বললে, 'আমাকে তাহলে তুমি ভালবাস না ?'

'ভীষণ, ভীষণ ভালবাসি। এ কথা বলতে দ্বিধা কোথায় ? বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে বলতে পারি তা গলা ছেড়ে।' অরুণিমার বাঁ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল জয়ন্ত : 'এমন লাবণ্যের প্রতিমা আর কে আছে! কোথায় এমন মর্মরের মসৃণতা ? ফাট নেই, খিঁচ নেই, আঁশ নেই, ঢালা নির্মলতার স্রোত। জীবনে এত স্বাদ এত শ্রী এত উৎসাহ আর কে দিল।'

কী হল আজ অরুণিমার ? চোখ ভরা জ্বলন্ত অশ্রু নিয়ে বললে, তুমি আমাকে চাও না প্রবলের মতো, পুরুষের মতো!'

'বলতেই পারি চাই, কিন্তু চাইতে পারার মতো বল কই, আইন কই!' জয়ন্ত ঘাস ছিঁড়তে লাগল।

'তার মানেই তাই।'

'কিসের মানে!'

'ভালবাসার মানে। তার মানেই তুমি আমাকে ভালবাস না।'

'তা হলে বলো বুকের নিশ্বাসকে ভালবাসি না। ভালবাসি না মুখের খাদ্য। চোখের সুনিদ্রা।' জয়ন্ত দুই চোখে তাকাল। বয়স একটু বেশি হয়েছে, তা হোক, কার বা না হবে বাঁচলে। বয়স একটা মায়া ছাড়া কিছু নয়। আভাস মাত্র। অবিদ্যার কল্পনা। আভাসে যাই হোক, সন্দেহ কী, অক্লিন্ন। অনিন্দিতা। কবিতার খাতার অলিখিত পৃষ্ঠার মতো শুভ্র। জয়ন্ত আরও বললে, 'তোমাকে ভাল না বাসা মানে জীবনকে অস্বীকার করা, পরের ঘরে পোষ্য দেওয়া—'

'তাহলে', নিজেই এবার জয়ন্তের হাত ধরল অরুণিমা : 'বিয়েটা বৈধ করে নাও।'

'তার আগে বিচার করে দেখো আমি কি বিয়ের পক্ষে উপযুক্ত ? মজবুত ?' 'টেঁকসই' আমি নড়বড়ে হয়ে গেছি না ? তুমি মরচে পড়া ভোঁতা তরোয়াল নেবে কেন ? তুমি নেবে তাজা টাটকা শানের জৌলুস লাগানো তরোয়াল!'

আগুন, আগুন। কোন্ কাঠের আগুন, অশ্বত্থের না পাকুড়ের, এ পতঙ্গের জিজ্ঞাস্য নয়। প্রেম, প্রেম। প্যাশান ফ্যাশান মেনে চলে না।

'কিন্তু তোমার সঙ্গে বিয়েটা বৈধ করতে হলে স্ত্রীকে, নীলাক্ষীকে ছাড়তে হয়।' বললে জয়ন্ত।

'খুব কঠিন বুঝি ?' যেন চোখের কোণ থেকে বাণ ছুঁড়ে মারল অরুণিমা।

'ছাড়া কিছু কঠিন নয়। পুরনো হয়ে গিয়েছে, একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, নানাভাবে জীবনে নানা উৎপাত ঘটাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে সন্দেহের কাঁটা, কে চিঠি লিখল, কে ফোন করল, কোথায় কী কার কথা একটু লিখলাম, ডায়রিতে, কেন বাড়ি ফিরতে উৎরে গেল সন্ধ্যা। জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে— কিন্তু—সর্বস্বহীন নিঃস্বের মতো তাকাল জয়ন্ত।

'কিন্তু—'

'ছাড়তে হলে আইনের একটা অজুহাত লাগবে। কোনও একটা বিশেষ দোষে দোষী হতে হবে। শুধু রাগী শুধু সন্দিগ্ধ শুধু দুর্মুখ এই কারণে ছেড়ে দেওয়া চলবে না।' অসহায় শোনাল জয়ন্তকে : 'তেমন কোনও দোষ তো খুঁজে পাচ্ছি না নীলাক্ষীতে—' তারপর আদালতের বারান্দায় এসে যেমন বখশিশ দেয় তেমনি বোধহয় স্তোক দিল জয়ন্ত। 'আচ্ছা, দেখি—'

সিঁদুরের কৌটো ফিরিয়ে নিল না অরুণিমা। ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কিন্তু তার নিগূঢ়ের দাবি ছুঁড়ে ফেলে দিল না মাটিতে।

চিঠি লিখল : 'তোমাকে আমার চাই। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। বাবা এবার আমার বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। কোনও এক মফস্বলী হাকিম পাকড়ে এনেছেন আমার জন্যে। ছোট বোন মধুরিমাকে বলেছি তার গতি করতে। ছোট ভাই দেবলদের ম্যাগাজিনে সেই যে ছোট কবিতাটা দিয়েছ সেটা আমারও মনের কথা। স্পর্শমণির মনে কোনও দ্বৈধ নেই এ লোহা কসাইয়ের খড়্গের না পুরোহিতের পূজার। তেমনি প্রেমের মনেও কোনও বিচার নেই এ বৈধ না অবৈধ। আমি বাবাকে বলে দিয়েছি আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ঈস, যদি একটা জীবন্ত প্রমাণ থাকত, যদি অন্তত একটা শিশু থাকত আমার—'

'হ্যালো—' সাড়া দিল অরুণিমা।

'আমি।'

'রং নাম্বার না তো ?'

'না। রং নাম্বার সিনেমায়।'

'শোনো, আমার চিঠি পেয়েছ ?'

'পেয়েছি। পেয়েছি বলেই তো—কী সাংঘাতিক চিঠি।'

'মোটেই সাংঘাতিক নয়। তুমি তো দেখি বলে কত ভাবলে। শেষকালে আমিই ভেবে দেখলাম—'

'কী দেখলে ?'

'দেখলাম বৈধে দরকার নেই। অবৈধেই আমি খুশি। অবৈধই আমার ঐশ্বর্য। তোমাকে না পাই, তোমার—'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

'মাথা খারাপ না হলে কী ভালবাসি ? জেনে শুনে অথচ চোখ বেঁধে অসম্ভবে ঝাঁপ দিই ? সামান্য হয়ে গণ্যমান্যকে স্তব করি ? শোনো—যেন কোনও সাজানো শহরে আগুন লেগেছে এমনি একটা মিলিত কোলাহলের স্বর : "শোনো, তোমাকে না পাই তোমার সার-সত্তাকে চাই। আমি তোরে ভালবাসি অস্থিমাংসসহ—সেই প্রেমের কথা পড়নি।" তোরে, তোমারে নয়। আমারও সেই ক্ষুধা। অস্থির অস্থি-র ভালবাসা। আমি ছিন্নমস্তা, নিজের মাথা কেটে নিজের রক্তে স্নান করি। শোনো, আমাকে অবৈধই দাও—'

'তার মানে।'

'তার মানে তাই। ডাস্টবিন থেকে-ছেলে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এসে আমি শুধু এক মফস্বলী হাকিমকে নিরস্ত করতে চাই না, আমি আমার নিজস্বকে চাই নির্বাচিত নিজস্ব। সমস্ত কিছু পণ্ড হয়ে যাক এক সঙ্গে। জগৎ সংসার চিরদিনের জন্যে নিরস্ত হোক।'

'তোমার চাকরি যাবে।'

'যাক। আমি অন্য জায়গায় গিয়ে চাকরি পাব। বিধবা সাজব। জবালা হব। তোমার কাছ থেকে এক পয়সা চাইব না। ওকে আমি মানুষ করব। আমার মনের মতো মানুষ। কে জানে তোমার চেয়েও হয়তো বড় মানুষ—'

'পরিচয় দেবে কী ওর।'

'পরিচয় আবার কী ? আমার ছেলে।'

'তা নেবে না সমাজ। যখন বড় হবে স্কুলে পড়বে তখন বাপের নাম লাগবে—কী বলবে তখন ?'

'তোমার নাম বলবে।'

ফোনের মধ্যেই হেসে উঠল জয়ন্ত। 'প্রমাণ কী? যে কোনও মেয়ে তার পেটের ছেলেকে যে কোনও পুরুষের বলে চালাতে চাইলেই চলে না—প্রমাণ কী?'

অরুণিমা নির্বিকার।'প্রমাণ হবে না। সব বস্তুই আদালতের নয়। কত জিনিসই তো প্রমাণ হয় না। তাতে কী যায় আসে? প্রমাণ ছাড়াও সংসার ঠিক চলে যাচ্ছে—'

'আমি অস্বীকার করব।'

'কোরো। আমিও বলব তোমাকে তাই করতে। তবু প্রেম বলো, কলঙ্ক বলো, প্রেমের চন্দন বা কর্দমের তিলক বলো, ও আমার।'

'তোমার মুখে চুনকালি পড়বে।'

'তবু তোমার মুখে না পড়ুক। তোমাকে আমি আড়াল করে রাখব। কোনও দাবি সাব্যস্ত করতে দাঁড়াব না তোমার দুয়ারে। রাস্তায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব না। আমার নিজের জিনিস নিজে লুকিয়ে রাখব। তুমি আমাকে দিয়েছ। ভালবেসে কত জিনিসই তো দেয়, নেয়, পায় এই সংসারে। তোমার কাছে না হোক, আমার কাছে প্রমাণ হোক। একটি শুধু প্রমাণ দাও আমাকে।'

'কিসের ? আমার ভালবাসার ?'

'না, আমার ভালবাসার। আমি যে তোমাকে ভালবাসলাম তার স্থির প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রমাণ। যদি কলঙ্কসাগরে নাই ভাসতে পারলাম তাহলে কিসের ছাই আমার ভালবাসা?'

রিসিভার রেখে দিল জয়ন্ত। 'আচ্ছা, দেখি—' ভয়ে ফুটল না বুঝি কণ্ঠস্বর।

ভয়ই শীতল সুন্দর। নীরব সুন্দর। সেই সুন্দরকে কতক্ষণ তুমি শীতল করে রাখবে, নীরব করে রাখবে।

আবার কদিন পরে জয়ন্ত রিসিভার তুলল।

একবার খোঁজ নিতে হয়। একটা বিঘটন কিছু করে না বসে। দড়িটা না ফাঁস হয়ে যায়।

'হ্যালো, রং নাম্বার?'

'না।'

'কী বৃষ্টি হচ্ছে বলো তো।'

'ভীষণ। একবার আসতে পারো না এই বৃষ্টিতে?'

'কী বলছ। সমস্ত রাস্তা নদী হয়ে গেছে কিন্তু গাড়ি তো নৌকো হয়নি। ভাসা যায়, আসা যায় না।' বললে জয়ন্ত। 'কোনও উপায়ে কোনও মন্ত্রে কোনও জাদুবলে, ছোট্ট একটা মাছি হয়ে, দরজার জানলার কোনও একটা অজানা ফাঁক দিয়ে—'

'মাছি হয়ে?' হাসল নাকি জয়ন্ত।

'এককণা বারুদের মুহূর্ত হয়ে—'

'কিন্তু তোমার দরজায় দারোয়ান বসা, অপরিচিত আগন্তুককে ঢুকতে দেবে কেন?'

'তা জানি না, শুধু এই জানি—'

'হাতে হাতকড়া পড়বে। খবরের কাগজের শীর্ষাক্ষর উজ্জ্বল হবে। তার চেয়ে তুমি এসো।'

'কোথায়?'

'আমার বাড়িতে। খরার দিনে।'

'সত্যি বলছ?' মাটির তলার অদৃশ্য টেলিফোনের তার ঝংকৃত হল। 'সেই বাঘের বাচ্চা ছাগলের পালের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিল, ঘাস খাচ্ছিল, তারপর বনের জ্যান্ত জ্বলন্ত বাঘ এসে তাকে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে তাব মুখের ছায়া দেখাল জলে, দিল মাংস খেতে, রক্তের স্বাদ পেতে— দেবে? এই ক্ষুদ্রতম বিন্দুতম স্বাদ—দেবে?

'দেব। চিনবে তো বাড়ি?'

'খুব চিনব। কতবার লুকিয়ে দেখে এসেছি। দোতলায় তোমার ঘরের আভাস, বারান্দায় ফুলের টব সাজানো। সেদিন দেখলাম এক ভদ্রমহিলা টবে জল দিচ্ছেন—ওই বুঝি তোমার স্ত্রী—নীলাক্ষী—'

'হ্যাঁ, আরেক টব।'

'কিন্তু যাব কী। আমার দারোয়ান তো বাইরে তোমার দারোয়ান ভিতরে।'

'এমন এক লগ্নে ডাকব যখন দারোয়ন থাকবে না।'

'থাকবে না মানে? কোথায় যাবে?'

'কোনও এক আত্মীয়ের বাড়ি এক রাত্রির জন্যে স্থানান্তরিত করব। বিয়ে-থা তো এখনও উঠে যায়নি সামাজ থেকে।' হাসল বুঝি জয়ন্ত। 'তেমনি এক ঢাউস নিমন্ত্রণে চালান করে দেব একদিন।'

'তাই থাকব অপেক্ষা করে।'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা করো। শান্ত হও। ঠাণ্ডা থাকো।'

কদিন পরে চিঠি এল অরুণিমার: 'তুমি আর ডাকসে না। আমি চলে যাচ্ছি। কলকাতার বাইরে কালিম্পঙে কাজ পেয়েছি। কলকাতায় আর আমার কিসের আকর্ষণ। যাবার আগে আর একবার দেখা হয় না? আমার দাবি কত, কত কমিয়ে এনেছি। পাই না একটা হীরের টুকরো? অন্তত একটি চুম্বন। একটি সামান্য উপহার?'

'হ্যালো—' রিসিভার তুলল জয়ন্ত।

'হ্যাঁ, আমি।'

'রং নাম্বার?'

'না, একা আছি।'

'চলে যাচ্ছ?' জয়ন্তর কণ্ঠস্বরে বিষাদের সুর।

'যেতে তো হবেই।'

'কোথায় যাবে! যেখানেই যাবে হাত যাবে আমার। আইনের শুনেছি দীর্ঘ হাত কিন্তু বেআইনের হাত, প্রেমের হাত, দীর্ঘতর। শোনো—'

'কান পেতে আছি।'

'নিমন্ত্রণ করছি তোমাকে। কাল সন্ধ্যায় এসো।'

'বলো কী? যাব?'

'হ্যাঁ, লগ্ন প্রস্তুত করেছি।'

'তোমার জ্যান্ত ফুলের টব?'

'সে তার দিদির বাড়ি যাচ্ছে। তার বোনঝির বিয়ে।'

'তুমি যাবে না?'

'আমার তখন জরুরি কাজ থাকবে। আমি পরে যাব। চাই কী তোমাকে তোমার হস্টেলে ড্রপ করে যাব বিয়ে বাড়ি।'

'কটায় লগ্ন?'

'কার? বোনঝির?'

'না। আমার।'

'তুমি এই সাতটা নাগাদ এসো।'

'সন্ধ্যায়?'

'তাই তো ভাল। যথাসময়ে ফিরতে পারবে হস্টেলে।'

'ফিরতে পারব?'

'ফিরতে পারাই তো স্বস্তি। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল !'

চারতলা বাড়ির দোতলা ফ্ল্যাটে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল অরুণিমা।

থমথম করছে চারপাশ। থমথম করছে তার পা ফেলায়, তার হৃৎপিণ্ডের শব্দে। একটু ভয় এসে মিশলে সন্ধ্যাকেও গভীর রাত্রি বলে মনে হয়।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল অরুণিমা। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এসেছে।

দরজায় টোকা দিতেই বেরিয়ে এল জয়ন্ত।

'এসো।'

'কি, রং নাম্বার?' একটু হাসল বুঝি অরুণিমা।

'ইংরিজি রং নয়, বাঙলা রং। তুমিই এখন রং নাম্বার।'

শোবার ঘরে নিয়ে এল জয়ন্ত।

ব্যূহে প্রবেশ করাই কঠিন, বেরুনো কঠিন নয়।

'দরজাটা বন্ধ করে দেব না?' জিজ্ঞেস করল অরুণিমা।

'কেন, ভয়ের কী!' পরদাটা টেনে দিল জয়ন্ত।

অরুণিমা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল বাড়িঘর। এমন কী বারান্দার টবগুলি পর্যন্ত। কোনটায় ফুল

কোনটায় শুধু গাছ।

ঘরে সরে এসে বললে, 'একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।'

'কত গাড়ি দাঁড়াচ্ছে চলে যাচ্ছে।' উদাসীনের মতো বললে জয়ন্ত। 'তুমি বোসো। তোমাকে দেখি।'

বসল অরুণিমা।

'সিঁড়িতে জুতোব শব্দ।'

'কত ফ্ল্যাট, হরদম লোক আসছে যাচ্ছে, উঠছে নামছে।' অভয়ের হাসি হাসল জয়ন্ত। 'তুমি খোলা দরজাকে ভয় পাচ্ছ বুঝি? দরজা বন্ধ থাকলেও তো হামলা হতে পারে। পরদাই তো ভদ্র বুদ্ধিমান।' ইঙ্গিতে গভীব হল জয়ন্ত। লগ্ন যখন পরিপক্ক হবে ঠিক সেই মুহূর্তেই—দরজার দিকে তাকাল।

সিঁড়ির জুতোর শব্দ বাইরে এসে থামল।

সর্ব শরীরে হাসতে হাসতে ঢুকল নীলাক্ষী। ঘরের মধ্যে আগন্তুক মহিলা দেখেও নিষ্প্রভ হল না। জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখো কী আশ্চর্য, শাড়ির বাক্সটাই ফেলে গেছি—'

'শাড়ির বাক্স?' দাঁড়িয়ে পড়ল জয়ন্ত।

'যেটা মেয়েকে প্রেজেন্ট দেব। বেনারসী। ওই যে ফেলে গেছি খাটের উপর।' হাসিমুখে নীলাক্ষী কুড়িয়ে নিল বাক্সটা। বললে, 'মাঝপথে গিয়ে খেয়াল হল। গাড়ি ফিরিয়ে আনলাম।'

চলে যাচ্ছিল আবার ফিরল নীলাক্ষী।

'আপনিই বুঝি অরুণিমা? কণি? তা আপনি তো বেশ দেখতে। কী বা বযেস? পঁচিশ? তিরিশ? সেই মফস্বলী হাকিম মন্দ ছিল কী! মধুরিমাকে কেন? আগে অরুণিমা পরে মধুরিমা।'

'শোনো। ওকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিয়ো না।' দরজার বাইরে গিয়েছিল আবার ফিরল নীলাক্ষী: 'কালিম্পং কবে যাচ্ছেন? আমি সব তৈরি করে রেখেছি মিটসেফে। খুলে দিতে পারবে তো? চাকরটা কোথায়, বাইরে? ডাকো না ওকে। চলে যাবার আগে মিষ্টিমুখ কবে যেতে হয়। আমি ভাই থাকতে পারছি না। খেয়ে যেয়ো কিন্তু—'

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীলাক্ষী।

পবক্ষণেই মন্থর পায়ে নামতে লাগল অরুণিমা।

পিছে পিছে নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল জয়ন্ত। রাস্তায় পড়ে অরুণিমা তার দিকে ফিরে তাকাল। আর্দ্রস্বরে বললে, 'চলে যাচ্ছি। আর কিছু চাই না। শুধু মনে রেখো। মনে স্থান দিয়ো।'

স্বাদু স্বাদু পদে পদে

সা প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কয়েকটা মুহূর্তে সমস্ত দেহমন যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল।

দেশলাই-এর কাঠিটা শেষ পর্যন্ত পুড়ে আঙুলে ছেঁকা লাগতে সাড় ফিরে পেয়ে চমকে পিছু হটে এসে শিকল তুলে দিয়েছিল দরজায়।

চেঁচামেচি করেনি, ডাকেনি কাউকে।

ডাকবে-ই বা কাকে ?

উমেশ বাড়িতে নেই। আজ রাত্তিরেব ডিউটি। ফিরবে অন্তত সেই রাত চারটের আগে নয়।

পাশের কোয়ার্টারের রাঙাবৌদিকে ডাকা যায় অবশ্য। হ্যাঁ তিনিও একা আছেন। জেগেও যে আছেন পাতলা দেওয়ালের ব্যবধানে শোবার ঘর থেকে এই একটু আগেই হামানদিস্তায় কি গুঁড়ো করবার আওয়াজে তা টের পেয়েছে।

কিন্তু রাঙাবৌদিকেও ডাকেনি। ডাকবেও না।

শোবার ঘরে এসেও সমস্ত শরীরের শিরশিরিনিটা যায়নি কিন্তু।

কোণ কানাচগুলোয় খাটের নীচে, বাসনকোসনগুলোর মধ্যে তোরঙ্গ বসানো চৌকিটার নীচে ভাল করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব দেখবার চেষ্টা করেছে।

তেমন তন্নতন্ন করে দেখবে আর কী করে ? ছোট ঘরটা সামান্য যা জিনিসপত্র আছে, তাতেই ঠাসা। আলোটারও তেমন জোর নেই। দেখতে গেলে সব কিছু নাড়তে চাড়তে হয়।

সে সাহস হয়নি।

ঠিক করেছে আলোটা আজ জ্বেলে রেখেই শোবে। সারা রাত আলো জ্বেলে রাখার খেসারত দিতে হবে অবশ্য। কোম্পানির সে দরাজ দিল আর নেই যে, যত খুশি আলো জ্বেলে রাখো বাঁধা টাকা দিলেই চলবে। এখন মিটার বসেছে তাদের এইসব অখদ্দে কোয়ার্টারেও।

তবু আলোটা জ্বেলে রেখেই উমা দরজায় ছিটকিনি দিয়ে তক্তপোষটার ওপর উঠে বসেছে। শুতে পারেনি।

বুকের ভেতর যেখানটা হিম হয়ে গেছল সেখানটা যেন সম্পূর্ণ গলেনি তখনও।

দুটো করে ইটের ওপর বসিয়ে তক্তপোষটা উঁচু করে রাখা বলে কিছুটা যেন নিবাপদ বোধ করেছে।

অথচ এই ইট সাজিয়ে তক্তপোষ বসানোতে কী আপত্তিই তার ছিল। প্রথম বিয়ের লজ্জাও কাটিয়ে উমেশকে মৃদু প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেনি।

উমেশ হেসে উঠেছিল। বলেছিল, শোনো রাঙা বৌঠান শোনো। ভাঙা তক্তপোষের জন্য সোনার খুরো গড়াতে হবে।

রাঙাবৌদিই ঘরদোর সাজানো-গোছানো দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে এসেছিলেন।

তিনি উমাকেই সমর্থন করেছিলেন প্রথমে, ঠিকই তো বলেছে উমা। ঘরের মধ্যে থান ইটগুলো বেখাপ্পা লাগে না !

একটা রীতিমত অশ্লীল রসিকতা করে উমেশ বলেছিল, ওঃ কী আমার ঘর, তার আবার বাহার !

সব কিছু মিলিয়ে কেমন একটা স্থূলতা। উমা ঘর থেকে চলে গেছল। কানদুটো তার ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল কিরকম একটা বিমূঢ় লজ্জায়। আত্মীয়া-অনাত্মীয়া কোনও মেয়েছেলের সামনে এরকম কথা উচ্চারণ করা যায়, এ তখন তার কল্পনার বাইরে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে দেওয়ালে কী একটা নড়তে দেখে উমা শিউরে উঠেছে এখন।

না, কিছু নয়। দেওয়ালের একটা হুকে বাঁধা পাড়ের ফালিটা হাওয়ায় দুলে উঠে তার ছায়াটা নড়ছে।

তক্তপোষটা মেঝে থেকে এতটা উঁচু হওয়ায় একটু বুঝি নিশ্চিন্ত।

জানাশোনা নানা সত্যমিথ্যা আজগুবি গল্প মনে এসেছে একসঙ্গে।

কিন্তু এতটা অস্থির হবার বুঝি কিছু নেই। ও ঘরে তো শিকল তুলে দিয়েই এসেছে। এ ঘরের দরজাও বন্ধ। খাটের ওপর তার ভাবনাটা কিসের ?

কাশির শব্দ শোনা গেছে পাশের কোয়ার্টারের উঠোনে। কাঠের ভাঙা গেটটা খোলা আর বন্ধ করার কর্কশ আওয়াজের সঙ্গে দমকে দমকে ওঠা একঘেয়ে কাশি।

অধরদা তাঁর শিফ্‌ট ডিউটি থেকে ফিরলেন।

রাঙাবৌদি দরজার খিল খুলে নিত্য-নৈমিত্তিক সম্ভাষণ জানালেন, ছাইপাশ গিলে আসোনি তো ?

অধরদার কাশির শব্দ ঘরের ভেতর থেকে অনেকটা চাপা হলেও শোনা গেছে সমানে।

যতক্ষণ ঘুম না আসে ও আওয়াজ শুনতে হবে। রাঙাবৌদির অভ্যাস হয়ে গেছে নিশ্চয়। নইলে ঘুমোন কী করে।

অভ্যাস সবই অবশ্য হয়ে যায়। তারও অনেক কিছু হয়ে গেছে। এমন কি উমেশের মুখের ওই নোংরা কথাগুলো পর্যন্ত।

তক্তপোষের তলায় কী একটা নড়ছে।

কান খাড়া করে উমা তক্তপোষের ওপর থেকে ঝুঁকে নীচেটা দেখবার চেষ্টা করেছে।

সেই নেংটি ইঁদুরটা । বিদ্যুতের মতো এক ছুটে ঘরের এক কোণ থেকে বেরিয়ে তোরঙ্গের চৌকিটার নীচে সেঁধিয়ে গেছে। নীচে নামতে না নামতেই আবার কোথায় যে ছুটে গিয়ে ঘাপটি মারবে জিনিসপত্র তোলপাড় করেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিছুদিন ওটা ধরবার কী চেষ্টাই না হয়েছিল।

রাঙাবৌদি একটা ইঁদুর কল আনতে বলেছিল উমেশকে।

তাই নিয়ে কী কুৎসিত রসিকতাই করেছিল উমেশ।

আঃ উমেশ ! রাঙাবৌদি মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন, কিন্তু মুখ চোখের চেহারা দেখে বোঝা গেছল উপভোগও করেছেন।

সেদিন উমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়নি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামী ও রাঙাবৌদির মুখের দিকে চেয়েছিল।

দুজনের কেউই সে দৃষ্টি লক্ষ্যও করেনি বোধ হয়, করলেও গ্রাহ্য করেনি।

রাঙাবৌদির আসল রূপটা কী !

এখানে আসার কিছুদিন পরেই প্রশ্নটা জেগেছিল।

তখন রোজ বিকেলে রাঙাবৌদি নিজে হাতে চুল বেঁধে দিতেন। একদিন চুল বাঁধতে বাঁধতে বলেছিলেন উমেশকে বলব ওই আজকাল কী সব নকল চুল হয়েছে, তাই এক গুছি কিনে আনতে।

উমার মাথায় চুল বেশ কম।

একটু বুঝি মনে মনে আহত হয়ে উমা বলেছিল, কেন ? নকল চুল দিয়ে সাজতে হবে ! আমার যা আছে এই টিকটিকির ল্যাজই ভাল।

রাঙাবৌদি হেসেছিলেন, তা তুই বলতে পারিস বটে। জোয়ান বরের জন্যে নকল সাজ দরকার হয় না। ওরা তুবড়ির পলতে, দেশলাই কাঠ ঘুঁটে যা কিছুর হোক আঁচ লাগতে না লাগতেই জ্বলে আছে। আমার মতো ভিজে সলতে হ'ত তো বুঝতিস। সেঁকে সেঁকে হয় না। নিজকেও আসল নকল মিলিয়ে বারুদ জোগাতে হয়।

অধরদার রাঙাবৌদির তুলনায় সত্যিই বয়স অনেক বেশি। যত না বয়স, তার চেয়েও বুড়িয়ে গেছেন রোগে অভাবে খাটুনিতে অত্যাচারে। হাঁপানি কাশি তো লেগেই আছে।

রাঙাবৌদির কথাগুলোতে মনের চাপা দুঃখই হয়তো একটু ফুটে বেরিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সব কিছু মিলিয়ে কী একটা স্থূল ইঙ্গিত উমাকে পীড়া দিয়েছিল বড় বেশি।

রাঙাবৌদির সাজগোজের শখটা যে বেশ আছে, তাতে সন্দেহ নেই।

এককালে হয়তো সত্যিই রাঙা নামের যোগ্য ছিলেন। এখন রঙটা মরা তামাটে হয়ে এলেও

চেহারার বাঁধুনিতে আগেকার রূপ-যৌবনের ঝড়তি-পড়তি যা আছে, তাও হেলা-ফেলার নয়। তার ওপর অভাবের সংসারেও যথাসম্ভব ছিমছাম হয়ে থাকেন সারাক্ষণ। এই বয়সেও চোখে কাজল পায়ে আলতা। নিজে মশলা গুঁড়িয়ে মিশিয়েও গন্ধ তেলটি মাথায় মাখা চাই।

বৃদ্ধ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যেই এতসব করা শুনেও উমা ঠিক খুশি হতে পারেনি। খুশি হতে পারেনি আরও কয়েকটা ব্যাপারে।

আপনার জন কেউ নয়, কোনও কুলের কোনও সম্পর্ক নেই, শুধু এক কোম্পানিতে কাজ করার দরুণ পাশাপাশি কোয়ার্টার পাওয়া থেকেই কয়েক বছরের পরিচয়। কিন্তু উমেশের ওপর কর্তৃত্বটা দেখলে তা মনে হয় না। মনে হয়, ওই রুক্ষ যণ্ডা মানুষটারও নাকে কোনও সূক্ষ্ম অদৃশ্য দড়ি বাঁধা যাতে রাঙাবৌদি যখন খুশি টান দিতে পারেন।

টান অবশ্য যখন তখন দেন, তা বলতে পারে না, কিন্তু কর্তৃত্বটা লুকিয়েও রাখেনি।

নিজেই একদিন কী কথায় বলেছেন, নাম ধরে তোদের রাজযোটক করেছি বুঝেছিস। উমা নাম শুনে দেখার আগেই তোর বরকে বলেছিলাম, ওইখানেই বিয়ে করতে হবে। উমেশকে সামলাতে যদি কেউ পারে তো, উমাই পারবে। তাও রাজি করাতে কী কম বেগ পেতে হয়েছে। একদিন বলে কি জানিস ? বলে জোর করে বিয়ে দিচ্ছ দাও, ফুলশয্যার রাত্রেই বৌটার গলা টিপে রেখে চলে যাব। তখন মজা টের পাবে। আমি চুপ করে থেকে হেসেছি, উনি বলেছেন . . . .

নির্বিকার মুখে রাঙাবৌদি অধরদার ইতর রসিকতাটাও শুনিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেদিন ইতর রসিকতাটার চেয়েও পীড়া দিয়েছিল কী একটা অস্ফুট বিক্ষোভ। সেটা যে উমেশের ওপর রাঙাবৌদির অনায়াস অধিকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, তা নিজের কাছে স্বীকার করতেও সময় লেগেছে।

উমেশ অবশ্য ফুলশয্যার রাত্রে বা তারপরে কখনও গলা টিপে মারবার চেষ্টা করেনি। ষণ্ডা গুণ্ডা মানুষটা ব্যবহারে বা কথাবার্তায় পালিশ টালিশের ধার ধারে না, কিন্তু মারধোর দূরের কথা উমাকে দুটো কড়া কথাও কোনদিন শোনায়নি।

তবু উমার মন ধীরে ধীরে বিষিয়ে উঠেছে।

কড়া কথা যেমন নয়, তেমনি মিষ্টি কথাও উমেশ বলতে জানে না বা বলে না। তার নোংরা রসিকতাগুলোও সব রাঙাবৌদি সামনে থাকলে তখন।

সেসব রসিকতায় অশ্লীল ইতরতা দ্বিগুণ অসহ্য হয়েছে সেই কারণে।

উমার বাপের বাড়িতেও গরিবানির সংসার। কিন্তু তারা পড়তি ঘর। স্বচ্ছলতার যুগের সভ্যতা-ভব্যতা রুচির জীর্ণ আচ্ছাদনটা এখনও একেবারে খসে পড়েনি।

উমেশের সঙ্গে বিয়ের কথা হবার সময় বেশ একটু আপত্তি উঠেছিল। তার ভাইদের তুলনায় উমেশ অনেক বেশি রোজগার করে, কিন্তু বংশমর্যাদা বলে কিছু নেই, তার ওপর ইংরেজি একটা নাম থাকলেও আসলে হাতে-নাতে কাজ-শেখা মিস্ত্রি ছাড়া কিছু নয়।

শেষ পর্যন্ত অভাবের যুক্তিই বড় হয়ে সব দ্বিধা আপত্তি হটিয়ে দিয়েছিল।

উমার বেশ উপযুক্ত বয়সেই বিয়ে হয়েছে। অনেক কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করেই সে এসেছিল।

কিন্তু এই আবহাওয়ার কথাটা ভাবতে পারেনি।

কিছুদিন বাদেই রাঙাবৌদির কাছে চুল বাঁধতে যাওয়া সে বন্ধ করেছে। রাঙাবৌদি ডেকেছেন কোয়ার্টারের মাঝখানের নিচু দেওয়ালের ওপার থেকে। প্রথম দিন কাজের ছুতোনাতা করে এড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় দিন রাঙাবৌদি নিজেই এসেছেন ঠিক সময়ে। এসে দেখেছেন উমার চুল বাঁধা হয়ে গেছে তার আগেই। রাঙাবৌদি সে কথা আর তোলেননি। পরেও কোনদিন ডাকেননি বা আসেননি।

রাঙাবৌদি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বা কিছু মনে করেছেন এমনও বলা যায় না। তাঁর ব্যবহারে কোনও

পবিবর্তনই দেখা যায়নি।

সকাল বেলা কোনদিন এক বাটি তরকারি নিয়ে এসে বলেছেন, উমেশ তো আজ ভোরের ডিউটিতে গেছে। দুপুরে বাড়িতেই খাবে। বড়ির ঝালটা দিস। কদিন ধরে মাথা খেয়ে ফেলছে। পুরো বাটিটা যেন সামনে আবার ধরে দিস না। ও রাক্ষস তাহলে তোর জন্যে কিছু রাখবে না।

উমা পুরো বাটিটাই অবশ্য খাবার সময় ধরে দিয়েছে।

পরে আরেক দিন অন্য একটা তরকারি কিন্তু সামনে বারই করেনি। বাইরের বড় নর্দমায় ফেলে দিযে এসেছে এক সময়ে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ উমেশকে জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা তোমার তো মাইনে বাড়ল। এখন এর চেযে ভাল কোয়ার্টার পাবে না ?

পাব না কেন ! নিচ্ছে কে ?—উমেশ তেলকালি মাখা প্যান্টটা ছাড়তে ছাড়তে বলেছে।

কেন ? পেলেও তুমি নেবে না ? উত্তরটা জেনেও ক্ষুণ্ণ স্বরে উমা জিজ্ঞাসা করেছে।

নেব কী করে শুনি। উমেশ যেন উমার সোজা কথাটা বুঝতে না পাবায অবাক হয়েছে—ডবল কোযার্টারি তো আব আমায় দেবে না। ওবা থাকবে কোথায় ?

উমাব ইচ্ছে হয়েছে চিৎকাব করে বলে, জাহান্নমে। কিন্তু নিজেকে সংববণ কবেছে বেশ একটু কষ্ট করে।

নিজের দিক থেকে সম্পর্ক এরপর সে একবকম ঘুচিয়েই দিয়েছে।

অতিবড প্রয়োজনেও সে পাশেব কোযার্টারের চৌকাঠ মাড়ায় না।

মাঝে দু চারদিন প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপের চেষ্টাতেও বেবিযেছে। সুবিধে হযনি মোটেই। এদিকেব কোয়ার্টাবগুলোতে বেশির ভাগই অন্ধ্র মদ্র পাঞ্জাবি। বাঙালির একটি কোয়ার্টার যা আছে অনেক দূরে, সেখানেও স্ত্রীলোক বলতে একজন অতিবৃদ্ধা মহিলা কানে কম শোনাব দরুন যাঁব সঙ্গে আলাপ চালাতে শেষ পর্যন্ত গলা ধরে যায়।

সেখান থেকেই এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পাতলা দেওয়াল ভেদ করে আসা আওয়াজ আব গলাব স্বর শুনে পাথব হয়ে গেছে এক নিমেষে।

একটা চাপড়ের সঙ্গে হাসির শব্দ। তারপরই শোনা গেছে, জ্বালাতন করিসনি। যা তোর বৌ এসে গেছে এতক্ষণে বোধহয়।

আসুক। বিয়ে তুই দিলি কেন ?—উমেশের গলা।

না, তুই ধম্মেব ষাঁড় হযে থাকবি—আমার বুঝি কলঙ্কেব ভয় নেই।

হ্যাঁ, বুড়ো বাহাদুরের বৌ-এর আবার কলঙ্কের ভয়। কলঙ্ক হলে বর্তে যায়।

উমা আর শুনতে চায়নি। ইচ্ছে করেই দরজাব একটা পাল্লা সশব্দে ঠেলে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেছে। সমস্ত কথার মধ্যে একটা শব্দ তার কানের ভেতর বিঁধছে বিষাক্ত ছুঁচের মতো। উমেশের সঙ্গে রাঙাবৌদির সম্পর্কটা কোন্ পর্যায়ের গোপনে ব্যবহার করা ওই একটা শব্দেই তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট।

খানিক বাদেই উমেশ বাড়ি ঢুকেছে।

কী ? ঘরে তালা দিয়ে গেছলে কোথায় ? আমি তো ভাবলাম, পালিয়েই গেলে বুঝি !

গেলে লুকিয়ে পালাব না। জানিয়েই যাব !—উনুনটা সিক দিয়ে অযথা খোঁচাতে খোঁচাতে উমা বলেছে।

ও বাবা ! এও যে ফোঁস করতে শিখেছে ! উমেশ হেসে উঠে দু কোয়ার্টারের মাঝখানে দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করেছে,—ও রাঙা বৌঠান শোনো শোনো দেখে যাও।

কী হল আবার ! কী দেখব !—রাঙাবৌদি দেওয়ালের ওধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গলায়

কৌতুকের স্বর উমার সারা গায়ে যেন বিষ ছিটিয়েছে।

কেঁচো বলে যা গছালে তা যে কেউটে হয়ে দাঁড়াল গো !—যথারীতি নোংরা একটা রসিকতা করে উমেশ শেষে বলেছে, এখন সামলাবে কে ?

কেঁচো খুঁচিয়ে কেউটে করে থাকলে সামলাবে তুমি ! পাড়ার লোকের তো দায় নয় !

হ্যাঁ পাড়ার লোক শুধু আছে তামাশা দেখতে !—উমেশ আরেকটা বিশ্রী কথাও তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে হেসে উঠেছে। ওদিক থেকে রাঙাবৌদির হাসিও শোনা গেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে উমা বলেছে,—হাসি তামাশা দেওয়াল ডিঙিয়ে করার দরকার কী ! ও বাড়ি গেলেই তো পারো ?

গলার স্বরে ও কথার মধ্যে তীব্র শ্লেষের হুল যা ছিল তা কিন্তু উমেশের ওপর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

ঠিক বলেছ। তুমি হেঁসেল ঠেলো, আমরা হাসি তামাশা করি গিয়ে।—বলে অম্লান বদনে বেরিয়ে গেছে।

উমেশ হয়তো কিছুই বোঝেনি, কিন্তু সেই দিন থেকে একটিবার বাদে রাঙাবৌদি আর এ বাড়িতে পা দেননি।

উমেশের সেটা নজরে পড়েনি এইটেই আশ্চর্য, তবে কোনও কিছু লক্ষ্য করবার মানুষ সে নয়।

রাঙাবৌদি এসেছিলেন এই কদিন আগে হঠাৎ দুপুর বেলা। অধরদা উমেশ দুজনেই তখন ডিউটিতে গেছে।

রান্নাঘরের বাইরে সরু রোয়াকটায় বসে উমা তোলা উনুনটায় মাটি লেপছিল। রাঙাবৌদিকে এভাবে ঢুকতে দেখে ভুরু কুঁচকে মুখ তুলে তাকিয়েছে।

রাঙাবৌদি তার দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঈষৎ হেসেছেন। হাসিটা কিন্তু স্বাভাবিক প্রসন্নতার নয়, বেশ একটু বাঁকা।

হাসির সঙ্গে মেলানো গলার স্বরেই তিনি বলেছেন, —সম্পর্ক তুই রাখতে না চাস রাখিস নে। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাসনি, যা পেয়েছিস আমি হাত উবুড় করেছি বলেই পেয়েছিস। ভাগ রাখবার জন্য দিইনি। তবে ইচ্ছে থাকলে এখনও শুধু কড়ে আঙুল নেড়ে নিয়ে যেতে পারতাম।

কথাগুলো বলেই রাঙাবৌদি চলে গেছলেন।

উপযুক্ত জবাব দিতে না পেরে উমার ভেতরটা আরও বেশি জ্বলছে।

অধরদার কাশিটা আজ যেন আরও বেড়েছে। মনে হচ্ছে দম যেন বন্ধ হয়ে যাবে।

শব্দটা যেন কাশির নয় আর কিছুর। দেওয়ালগুলো কাঁপিয়ে উঠোন ছাড়িয়ে বহুদূরে সেই আকাশের শেষ পর্যন্ত চলে গিয়ে আবার ফিরে আসছে।

* * *

উমা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। কখন নিজের অজান্তেই বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

ঘুমের মধ্যে সেই দৃশ্যটাই প্রায় হুবহু আবার দেখেছিল। হরেক রকম জিনিসে ঠাসাঠাসি অপরিসর ভাঁড়ার ঘরটা। ও ঘরের বাতিটা খারাপ হয়ে গেছে বলে, দেশলাই জ্বেলে কেরোসিনের বোতলটা আনতে গেছল। উমেশ রাত চারটেয় ফিরেই চা চাইবে। অ্যালুমিনামের বাটিতে একজনের মতো চায়ের জল কাঠকুটোয় একটু কেরোসিন ঢেলেই ফুটিয়ে নেওয়া যায়।

কেরোসিনের বোতলের জন্যে কোণের দিকে হাত বাড়াবার আগেই দেশলাই-এর আলোয় সেই সমস্ত শরীর হিম করা চোখ দুটো দেখেছে। তারপর সেই ধীরে ধীরে পাক ছাড়ানো মৃত্যুর কুণ্ডলী। চোখ দুটোর হিম ক্রুর দৃষ্টি যেন তাকে অসাড় করে দিচ্ছে ক্রমশ। প্রাণপণে সেই সর্বনাশা সম্মোহ কাটিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। এবারে কিন্তু পেছনের দরজা বন্ধ। সে আকুল হয়ে ছুটে

দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আঘাত করেছে সমস্ত শক্তি দিয়ে বার বার। দরজা খুলছে না।

ঘুমের ঘোর কাটার সঙ্গে সঙ্গে উমা টের পেলে সে নিজে না দিক সত্যিই তার দরজায় ঘা পড়ছে।

উমা ! উমা ! দরজা খোল।

এ তো রাঙাবৌদির গলা। সমস্ত মনটা এক মুহূর্তে আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে তিক্ত হয়ে উঠল।

দরজা অবশ্য সে খুলল, খুলে বেশ একটু কঠিন স্বরেই বললে, —কী হয়েছে কী ?

তোদের সেই মধুর শিশিটা আছে না ? উমেশ সেবার এনেছিল।

তার আর কতটুকু আছে !

যেটুকু থাক তাতেই হবে ! আমার এক ফোঁটা নেই। ওঁর টান আর বুকের কষ্ট ভয়ানক বেড়েছে। সেই বড়িটা মেড়ে না খাওয়ালেই নয়, এই রকম অবস্থা হলেই কবিরাজ খাওয়াতে বলেছিল। রাঙাবৌদিকে এমন অস্থির হয়ে কথা বলতে কখনও শোনেনি বটে। স্বামীর জন্যে যেন তাঁর সত্যিই কত ভাবনা !

কিন্তু এ অভিনয়ে মন আরও বিরূপ হয়ে উঠল। বললে, — কিন্তু সে শিশিটা ভাঁড়ারে কোথায় রেখেছি মনে নেই !

মনে থাকবার দরকার নেই আমি খুঁজে নিচ্ছি।

রাঙাবৌদি স্টোর রুমের দিকে এগোলেন।

কিন্তু .. নিজের প্রায় অগোচরেই বলে ফেলতে গিয়ে উমা নিজেকে সামলালে।

ও ঘরে তো আলো নেই !—বলে কথাটা শেষ করলে।

তোর দেশলাইটা দে তাহলে।—রাঙাবৌদি নাছোড়বান্দা।

উমা দেশলাইটা দিলে। মনকে তখন সে বুঝিয়েছে, যাই এখন হোক তার আর কোনও দায়িত্ব নেই।

রাঙাবৌদি ঘরের শিকলটা গিয়ে খুললেন।

উমা প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে দরজার একটা পাল্লায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পর পর সমস্ত শব্দগুলো শুনল।

রাঙাবৌদি দেশলাই জ্বাললেন। সামনের জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে তিনি বাঁধানো তাকগুলোর কাছে যাচ্ছেন খুঁজতে। তাঁর প্রথম দেশলাই-এর কাঠিটা বোধ হয় নিভে গেছে, তিনি আরেকটা জ্বাললেন। একটা চাপা চমকে ওঠার শ্বাস কি ? কিছুক্ষণ, তারপর সব একেবারে নিস্তব্ধ। রাঙাবৌদি বেরিয়ে এসে দরজায় আবার শিকল তুলে দিলেন।

বললেন, —না দেশলাই-এর কাঠিতে হবে না। তোদের তো আবার কুপি নেই। আমার কুপিটা জ্বেলে নিয়ে আসি।

রাঙাবৌদি চলে গেলেন।

উমার মনের ভেতরটায় কী হচ্ছে তা বোঝবার ক্ষমতা তার নেই। একটা দুর্বোধ অনুভূতির কুণ্ডলী তার বুকের ভেতর থেকেও যেন পাক দিয়ে উঠেছে।

রাঙাবৌদি কুপি নিয়ে ফিরে আসার পর সেটা যেন স্পষ্ট রূপ পেল।

রাঙাবৌদি দরজায় শিকল খুলতে যাচ্ছেন।

দাঁড়ান—বলে উঠল উমা—আপনি পাবেন না। আমি খুঁজে দিচ্ছি।

না।—রাঙাবৌদি ফিরে দাঁড়ালেন,—তোকে আসতে হবে না। ঘরে একটা সাপ আছে। আগে মারতে হবে।

কুপির আলোটাই লক্ষ করেছিল, এখন রাঙাবৌদির আরেক হাতের লাঠিটাও চোখে পড়ল।

সাপ বলে বিস্ময়ের ভান করবার আর প্রবৃত্তি হল না। এগিয়ে গিয়ে উমা বললে, তাহলে মধুর

শিশিটা কি এখন না খুঁজলে নয় ?

না নয়,—কুপির আলোতেই রাঙাবৌদির অদ্ভুত হাসিটা একটু দেখা গেল,—অন্তত বাড়িটা ঠিকমত দিয়েছি এটুকু তো জানব।

তাহলে আমি আলো ধরছি, চলো। —উমা গিয়ে কুপিটা হাতে নিলে।

নে তবে !—এই মুহূর্তেও অদ্ভুত পরিহাসের সুরে রাঙাবৌদি বললেন, আড়াল দেবার একটা নলচে এখনও আছে যখন, সেটা রাখবার চেষ্টা তো করতে হবে। এ ঝক্কিটা তাই একা আমায় নিতে দিলেই পারতিস !

সামান্য এই কুপির আলোতেই এতদিনে কি আসল চেহারাটা উমা দেখতে পায় ?

উত্তর না দিয়ে উমা নিজেই ঘরের শিকলটা খুলে ফেললে।

দু'কান কাটা

অন্নদাশঙ্কর রায়

সেই সব সুন্দর ছেলেরা আজ কোথায়, যাদের নিয়ে আমার কৈশোর সুন্দর হয়েছিল! মাঝে মাঝে ভাবি আর মন কেমন করে।

একজনকে মনে পড়ে। তার নাম সুকুমার। গৌরবর্ণ সুঠাম তনু, একটুও অনাবশ্যক মেদ নেই অথচ প্রতি অঙ্গে লালিত্য। চাঁদের পিছনে যেমন রাহু তেমনি চাঁদপানা ছেলেদের পিছনে রাহুর দল ঘুরত। তাদের কামনার ভাষা যেমন অশ্লীল তেমনি স্থূল। তাদের স্থূলহস্তাবলেপে সুকুর গায়ে আঁচড় লাগত। তা দেখে যাদের বুকে বাজত তাদের জনাকয়েক মিলে একটা দেহরক্ষা বাহিনী গড়েছিল। আমাদের কাজ ছিল তাকে বাড়ি থেকে ইস্কুল ও ইস্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। আমরা নিঃস্বার্থ ছিলুম না। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। সুকু তা জানত, তাই আমাদের প্রশ্রয় দিত না। তার দরুন আমার অভিমান ছিল। থাকবে না? রাহুদের একজন আমার ডান হাতে এমন মোচড় দিয়েছিল যে আর একটু হলে হাতটা যেত। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।

কচিৎ তাকে একা পেতুম। পেলেই আমার বুকভরা মধু তার কানে ঢালতে ব্যগ্র হতুম, কিন্তু তার আগেই সে পাশ কাটিয়ে যেত। সে যে আমার প্রকৃত পরিচয় জানল না, এ কথা ভেবে আমার চোখে জল আসত। সময়ে অসময়ে তাই তাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরতুম! ভিতরে ঢুকতে ভরসা হত না। কারণ সুকু একদিন আমাকে বলেছিল, "তুই আমাদের বাড়ি অতবার আসিসনে, খোকন।"

তখন ঠিক বুঝতে পারিনি কেন এই রূঢ়তা। পরে বুঝেছি ওটা রূঢ়তা নয়। সুকুর বাবা মফঃস্বলে গেলে তার মা'র সঙ্গে তার ঠাকুরমা'র বচসা বাধত। খোঁপা আর এলোচুলের সেই বচসা শুনে পাড়ার লোক জুটত তামাশা দেখতে। এতে সুকুর মাথা কাটা যেত; তার বাবা যখন ফিরতেন, মা'র কথায় কান দিতেন না, ঠাকুরমা'র কাহিনী বিশ্বাস করতেন। মাকে দিতেন মার। তা দেখে সুকুর ভাইবোন বাবার পা জড়িয়ে ধরত, কিন্তু সুকু এত লাজুক যে লুকিয়ে কাঁদত। প্রতিবার মা ঘোষণা করতেন তিনি বাপের বাড়ি যাচ্ছেন, বাক্স বিছানা নিয়ে সত্যি সত্যি বাইরের বারান্দায় দাঁড়াতেন। রাজ্যের লোক

জড় হত তাঁকে দেখতে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। এতে সুকুর বাবার মাথা কাটা যেত, সুকুরও। চাকব এসে বলত, "মা, একখানাও ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না।" তা শুনে ঝি বলত, "আর একটা দিন থেকে যাও, মা। কথা রাখো।" সেদিনকার মতো মা যাওয়া মুলতুবি রাখতেন। প্রতি মাসেই এই ব্যাপার। দুজনেই সমান মুখরা, যেমন মা তেমনি ঠাকুমা। একদিন সুকুর মা এমন মার খেলেন যে গাড়ির অভাবে পেছপাও হলেন না, দুনিয়ার লোকের চোখের উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন ও পায়ে হেঁটে রেল স্টেশনে গেলেন।

সুকুর ভাইবোন লোকলজ্জায় তাঁর সাথী হল না, কিন্তু সব চেয়ে লাজুক যে সুকু সেই তাঁর হাত ধরে পথ দেখানোর ভার নিল। কাজটা সুকুর মা ভাল করলেন না। সুকুর বাবার মাথা হেঁট হল। তিনি সেই হেঁট মাথায় টোপর পরে শোধ তুললেন। খবরটা যখন সুকুর মা'র কানে পড়ল তিনি কুয়োয় ঝাঁপ দিতে গেলেন। সবাই মিলে তাঁকে ধরে এনে ঘরে বন্ধ করে রাখল। তখন থেকে তিনি নজরবন্দি।

মামারা সুকুকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইস্কুলে যাবার নাম করে সেই যে বেরোত ফিরত রাত করে। কেউ তাকে বকতে সাহস করত না, পাছে সে আত্মঘাতী হয়। শিবপুরহাটের তিন দিকে নদী। যেদিকে দু'চোখ যায় সে দিকে গেলে প্রায়ই নদীর ধারে পা আটকে যায়। সুকু পা ছড়িয়ে বসে গা ঢেলে দেয়। কত নৌকো স্রোতের মুখে ভাসছে, উজান বেয়ে আসছে। কোনওটাতে চালের বস্তা, কোনওটাতে নতুন হাঁড়িকলসি, কোনওটাতে ঝুনো নারকেল। ছইয়ের চার কোণে মাকাল ফল দুলছে, ছইয়ের ভিতর ডাবা হুঁকো ঝুলছে। নৌকোর গায়ে কত রকম নক্সা। নক্সার কত রকম রং। নৌকোও কত রকম। জেলেদের ডিঙি, বারোমেসেদের নাও, গয়নার বোট, আরও কত কী। বাংলার প্রাণ নদী, নদীর প্রাণ নৌকো, নৌকোর প্রাণ মাঝি, মাঝির প্রাণ গান। সুকু একমনে গান শোনে, আর গুনগুন করে সুর সাধে। এতেই তার শান্তি, এই তার সান্ত্বনা।

একদিন মেলা লোক যাচ্ছিল মেলা দেখতে। রঘুনাথপুরে রামনবমীর মেলা। তা বলে শুধু রামায়েৎ বৈষ্ণবরা নয়, নিমাইৎ বৈষ্ণবরাও আসে। নানা দিগ্‌দেশ থেকে জমায়েৎ হয় আউল বাউল দরবেশরাও। এক দল কীর্তনিয়া গান করতে যাচ্ছে দেখে সুকুও তাদের নৌকোয় উঠে বসল। মেলায় গিয়ে সে দলছাড়া হল না, সে যদি বা ছাড়তে চায় দলের লোক ছাড়ে না। তারা একটা গাছতলা দেখে আস্তানা গাড়ল। সেখানে জোল কেটে বড় বড় হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। কুটনো কুটতে বসল দলের মেয়েছেলেরা। বলতে ভুলে গেছি দলের কর্তা যিনি তিনি পুরুষ নন, নারী। তাঁর নাম হরিদাসী। হরিদাসী নাম শুনে সুকু ধরে নিয়েছিল হিন্দু, আপনারাও সে ভুল করতে পারেন। তাই বলে রাখছি তিনি মুসলমান দরবেশ। তাঁর দলের পুরুষদের নাম শুনে মালুম হয় না মুসলমান না হিন্দু। ইসব শা-ও আছে, আবার মনু শা-ও আছে। সুকু ধরে নিয়েছিল ওরা সকলেই হিন্দু। তাই আহার সম্বন্ধে দু'বার ভাবেনি। কেবল পানের সময় 'পানি' কথাটা শুনে একটু খটকা বেধেছিল।

হরিদাসীরা মউজ করে রাঁধে বাড়ে খায় আর গান করে। সুকুও তাদের শরিক। তার গলা শুনে হরিদাসী তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "তোর হবে।" এতদিন জীবন বিস্বাদ লাগত, এতদিনে স্বাদ ফিরল! সুকুর চোখে পৃথিবীর রূপ গেল বদলে। যেদিকে তাকায় সেদিকে রূপের সায়র। কানে ঢেউ তোলে হরিদাসীর কণ্ঠধ্বনি—

"এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।
আমি নামি নামি মনে করি মরণ ভয়ে নামলাম না।"

মেলা ভাঙল। সুকুরও ভয় ভাঙল। মামারা যদি তাড়িয়েই দেন তবে তার আশ্রয়ের অভাব হবে না। তখনও সে জানত না যে ওরা মুসলমান। জানল শিবপুরহাটে অন্যের মুখে। তখন তার আরও একটা ভয় ভাঙল। জাতের ভয়। সে মনে মনে বলল, আমার জাত যখন গেছেই তখন দুঃখু করে কী হবে। যার জাত নেই তার সব জাতই স্বজাত। ওরা আমার আপনার লোক, আমিও ওদের।

২

অনুমতি না নিয়ে মেলায় যাওয়া, সেখানে মুসলমানের ভাত খাওয়া, এসব অপরাধের মার্জনা নেই। মামারা মারলেন না, বকলেন না, কিন্তু থালাবাসন আলাদা করে দিলেন। সে সব মাজতে হল সুকুকেই। তাতে তার আপত্তি ছিল না। বরং দেখা গেল তাতেই তার উৎসাহ। মামিমাদের কাছ থেকে সিধা চেয়ে নিয়ে সে নিজেই শুরু করে দিল রাঁধতে। কলাপাত কেটে নিয়ে এসে উঠানের এক কোণে খেতে বসে। কেউ কাছে গেলে সবিনয়ে বলে, "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, জাত যাবে।" তার দশা দেখে তার মা দু'বেলা কাঁদেন। একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না করলেই নয়, মামারা স্বীকার করলেন। তা শুনে সুকু বেঁকে বসল। বলল, "মুসলমানের ভাত আরও কতবার খেতে হবে। ক'বার প্রায়শ্চিত্ত করব? গোবর কী এত মিষ্টি যে বার বার খেতে হবে।"

মামাবাড়ি থেকে চিঠি গেল বাবার কাছে। ইতিমধ্যে সৎমা'র হয়েছিল যক্ষ্মা, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সুকুর বাবা একটা ছল খুঁজছিলেন সুকুর মা'কে ফিরিয়ে আনবার। চিঠি পেয়ে আপনি হাজির হলেন। সুকুকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, "চল আমার সঙ্গে।" স্ত্রীকে বললেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে। আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে। এসো আমার সঙ্গে।"

আবার সুকুদের বাড়িতে আনন্দের হাট বসল। আমরা তার পুরনো বন্ধুরা তাদের ওখানে দিন রাত আসর জমালুম। এবার সে আমাদের বারণ করে না, করলেও আমরা মানতুম না। এ বলে, আমার সুকু। ও বলে আমার সুকু। সুকু যেন প্রত্যেকের একান্ত আপন। ওর বাবা যদি ওকে ইস্কুলে ভর্তি না করে দিতেন আমরা রোজ রোজ ইস্কুল কামাই করে বিপদে পড়তুম।

শিবপুরহাটের সেই যে অভ্যাস সুকু সে অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারল না। কখন এক সময় ক্লাস থেকে পালায়, আমরা চেয়ে দেখি সে নেই। আমাদের মহকুমা শহরে নদী আছে নিশ্চয়, কিন্তু নদীর ধারে ঘন বসতি, সুকুর তাতে অরুচি। সে যায় আউল দরবেশ বৈষ্ণবের সন্ধানে। ফকির দেখলেই সঙ্গ নেয়। তাদের সঙ্গে ঘুরেফিরে সন্ধ্যার পরে বাড়ি আসে। আমরা ততক্ষণ তার জন্যে ভেবে আকুল। তার খোঁজ নিতে এক একজন এক একদিকে বেরোয়, পেলেও তাকে ডেকে সাড়া মেলে না। আমরা যেন তার আপনার লোক নই, যত রাজ্যের ফেরার আসামী ভেক নিয়েছে বলে ওরাই হয়েছে তার আপনার। সুকু যে ওদের মধ্যে কী মধু পায় আমরা তো বুঝিনে। যত সব সিঁদেল চোর আর জাঁহাবাজ চোরনী গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায় কার কী সম্পত্তি আছে সেই খবরটি জানতে। তার পরে একদিন নিশীথ রাতে গৃহস্থের সর্বস্ব চুরি যায়।

সুকুকে আমরা সাবধান করে দিই যে কোনদিন চোর বলে সন্দেহ করে পুলিশ তার হাতে হাতকড়ি পরাবে। সে বলে, "সন্দেহ মিটলে খুলেও দেবে।" আমরা বলি, "কিন্তু কলঙ্ক তো ঘুচবে না। মুখ দেখাবি কী করে?" সে বলে, "ওরা যেমন করে দেখায়।" ওরা মানে বাউল বোষ্টমরা।

সুকুর জন্যে আমাদের লজ্জার সীমা রইল না, দেখা গেল আমরাই ওর চেয়ে সলাজ। ওর সঙ্গে মিশতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হল। প্রকাশ্যে মেলামেশা বন্ধ হয়ে এল, গোপনে মেলামেশা চলল।

হেডমাস্টার মশাই ছিলেন সুকুর বাবার বন্ধু। তিনি পরামর্শ দিলেন ওকে বোর্ডিং-এ রাখতে। ওর বাবা একদিন ওকে বোর্ডিং-এ রেখে এলেন। ওর তাতে আপত্তি নেই, বরং ছত্রিশ জাতের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজনের আশা। আমরা কিন্তু হতাশ হলুম। বোর্ডিং-এর পাশেই হেডমাস্টার মশায়ের কোয়ার্টার। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে যে সুকুর কাছে যাওয়া আসা করব সে সাহস ছিল না।

কিছুদিন পরে এক মজার ব্যাপার ঘটল। হেডমাস্টার মশাই একদিন স্বকর্ণে শুনলেন দুটি বালখিল্য বালক ফুর্তিসে গান করছে—

"যৌবন জ্বালা বড়ই জ্বালা সইতে না পারি
যৌবন জ্বালা তেজ্য করে গলায় দিব দড়ি।

দুঃখ রে যৌবন প্রাণের বৈরী।"

মশাই তো দুই হাতে দুজনের কান ধরে টেনে তুললেন। অন্তরীক্ষে দোদুল্যমান ঐ দুটি প্রাণী অবিলম্বে কবুল করল যে সুকুই ওদের ও গান শিখিয়েছে। তখন তিনি সুকুকে তলব করলেন। সুকু বলল, "সব সত্যি। দোষ ওদের নয়, আমার।"

মশাই বললেন, "গোল্লায় যদি যেতে হয় তবে সদলবলে কেন? তুমি একা যাও।" এই বলে একটা গাড়ি ডেকে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

সেও বাঁচল আমরাও বাঁচলুম। তার বাবা কিন্তু তাকে নিয়ে মুশকিলে পড়লেন। ঘরে আটক করে রাখলে পড়াশোনা মাটি। ইস্কুলে যেতে দিলে সে ঠিকানা হারিয়ে ফেলে। যাদের কাছে পাঠ নেয় তারা মাস্টার নয়, বাউল ফকির। কিছুদিন তিনি নিজেই তাকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেন, সেখানে তার উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হল। কিন্তু সে অঙ্কের খাতায় ইতিহাস ও ইতিহাসের খাতায় সংস্কৃত লিখে শিক্ষকদের উত্যক্ত করে তুলল। এটা যে তার ইচ্ছাকৃত তা নয়। সে নিজেই বুঝতে পারে না কেন এমন হয়। আসলে তার মন ছিল না পাঠে।

সুকুর মা তার বাবাকে বললেন, "জানি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সেকালে কর্তাবা এরকম স্থলে গিন্নিদের উপদেশ নিতেন।"

"শুনি তোমার উপদেশটা কী।"

"আমার ঠাকুরদার বিয়ে হয়েছিল ষোলো বছর বয়সে। সুকুর বয়স পনেরো হলেও ওর যেমন বাড়ন্ত গড়ন—"

সুকুর বাবা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

৩

ম্যাট্রিকে সুকু ফেল করল। আমি পাশ। বাধ্য হয়ে আমাকে বড় শহরে যেতে হল, ভর্তি হলুম কলেজে। চিঠি লিখে সুকুর সাড়া পেতুম না। ওর সঙ্গে দেখা হত ছুটিতে।

দিন দিন ব্যবধান বাড়তে থাকে। আমি যদি বলি "তুই", সুকু বলে "তুমি"। আমার কষ্ট হয়। ডাকলে আসে, না ডাকলে খোঁজ করে না। গেলে দেখা দেয়, কিন্তু প্রাণ খুলে কথা কয় না। একদিন আমি কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলুম, "সুকু, আমি কি তোর পর?" সে উত্তর দিয়েছিল, "তা নয়। আমি হলুম ফেল করা ছেলে। আর তুমি—"

আমি তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলুম, "তোর জন্যে আমার সব সময় দুঃখ হয়।"

"কিন্তু আমি তো মনে করি আমার মতো সুখী আর কেউ নেই। যেখানে যাই সেখানেই আমার ঘর, সেখানেই আমার আপনার লোক।"

বাউল ফকির দরবেশদের ও বলত আপনার লোক। ওরাও ওকে দলে টানত। রতনে রতন চেনে। আমাদের চোখে সুকু একটা ফেল করা ছেলে, ওর পরকালটি ঝরঝরে। ওদের চোখে সুকু একজন ভক্ত। গুরুর কৃপা হলে একদিন পরমার্থ পাবে। আমাদের হিতৈষীপনার চেয়ে ওদের হিতৈষিতাই ছিল ওর পছন্দ।

হাজার হলেও আমি ওর পুরনো বন্ধু। বোধহয় তার চেয়েও বেশি। সুকু সেটা জানত, তাই আমাকে যত কথা বলত আর কাউকে তত নয়। তাকে দিয়ে কথা বলানো একটা তপস্যা। গান করতে বললে দেরি করে না, কিন্তু মনের কথা জানাতে বললে দশবার ঘোরায়।

সুকু নিজেকে সকলের চেয়ে সুখী বলে দাবি করলেও আমার অগোচর ছিল না যে ওর ভিতরে আগুন জ্বলছে আর সে-আগুনে ও পুড়ে খাক্ হচ্ছে। কাকে যে ভালবেসেছে, কে যে সেই ভাগ্যবতী তা আমাকে জানতে দিত না। আমি অবশ্য অনুমান করতুম কিন্তু পরে বুঝেছিলুম সে সব অনুমান

ভুল।

নায়িকা-সাধন বলে ওদের একটা সাধনা আছে। সুকু নিয়েছিল ওই সাধনা। প্রত্যেক নারীর মধ্যে রাধাশক্তি সুপ্ত রয়েছে। সেই শক্তি যখন জাগবে তখন প্রতি নারীই রাধা। যে কোনও নারীকে অবলম্বন করে রাধাতত্ত্বে পৌঁছানো যায়। কিন্তু সে নারীর সম্মতি পাওয়া চাই। সুকু একজনের সম্মতি পেয়েছে এইখানেই তার গর্ব। এই জন্যেই সে বলে তার মতো সুখী আর কেউ নয়। অথচ তার মতো দুঃখী আর কেউ নয়। ভদ্রলোকের ছেলে ছোটলোকদের সঙ্গে খায় দায়, গায় বাজায়, শোয়া বসা করে। ওকে নৌকো বাইতে, গরুর গাড়ি চালাতে, ঘর ছাইতে দেখা গেছে। ওর বাবা সম্মানী ব্যক্তি। তাঁর মাথা হেঁট। তিনি কিছু বলতে পারেন না এই ভেবে যে ইতিমধ্যে তাঁর ছোটবৌ মরেছেন, ছেলেকে শাসন করলে যদি বড়বৌ আবার বাপের বাড়ি যান তবে আর একবার টোপর পরার মতো বল বয়স নেই। মুখে বলেন, "ওটাকে ত্যাজ্যপুত্র করতে হবে দেখছি।" কিন্তু ভাল করেই জানেন যে সুকু তাঁর সম্পত্তির জন্যে লালায়িত নয়। সুকুর মা ওকে বকেন। কিন্তু বকলে সুকু বাইরে রাত কাটায়। তখন তিনিই ওকে আনতে পাঠান।

মজনু ফকির ওর গুরু। গুরুর উক্তি ও সুকুর প্রত্যুক্তি কতকটা এই রকম—

"বাবা, কাঁদতে জনম গেল। যদি সুখের পিত্যেশ পুষে থাক তবে আমার লগে আইসো না। আমি তোমার সুখের নাগাল দিতে নারব।"

"আমি চোখের জলে মানুষ হয়েছি। কাঁদতে কি ডরাই?"

"সারা জনম কাঁদতে রাজি আছ?"

"আছি।"

"আমায় দুষবে না?"

"না, হুজুর।"

"তবে তুমি সুখের সন্ধান ছেড়ে রাধার সন্ধানে যাও। সে যদি সুখ দেয় নিয়ো। যদি দুখ দেয় নিয়ো। কিছুতেই 'না' বোলো না। তার ছলকলার অন্ত নেই। তেঁই তোমায় বলি, কাঁদতে জনম গেল রে মোর কাঁদতে জনম গেল।"

সুকু সেই যে ফেল করল তার পরে আর পরীক্ষা দিল না। তার পড়াশুনা সেইখানেই সাঙ্গ হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে পরীক্ষা দিতে হল, সে পরীক্ষা মাত্র একজনের কাছে। সে একজন তার নায়িকা। তার গুরুই তাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন, এইটুকু আমি জানি, এর বেশি জানিনে। আর যা জানি তা লোকমুখে শোনা, লোকের কথা আমি বিশ্বাস করিনে, যদিও ল্যাটিন ভাষায় প্রবাদ আছে লোকের কথাই ভগবানের কথা।

একবার ছুটিতে বাড়ি এসে শুনি সুকু নিরুদ্দেশ। লোকে বলাবলি করছে সারী বোষ্টমী ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। মেয়েটি নাকি প্রথমে ছিল মোদকদের বৌ। অল্প বয়সে বিধবা হয়। পরে এক বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবনে যায়, সেখানে বেশ কিছু কাল থেকে চালাক চতুর হয়। বৈষ্ণবটির কৃষ্ণ প্রাপ্তি হলে দেশে ফিরে সারী তাঁর বিষয়বাড়ি ভোগদখল করে। তার পর থেকে সুন্দর ছেলে দেখলেই সে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, সর্বনাশ করে ছেড়ে দেয়। গুণের মধ্যে সে গাইতে পারে অসাধারণ। গান দিয়েই প্রাণ মজায়। ছেলেদের অভিভাবকেরা অবশেষে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করেন। তখন জায়গাজমি বিক্রি করে বৈষ্ণবী একদিন নিখোঁজ হয়। তার সঙ্গে সুকুও। সুকুর বাবা থানা পুলিশ করেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তার মা কাতর হয়ে পড়েন।

সুকুর বাবা বললেন, "খোকন, তুমি তো পাশ করলে, জলপানি পেলে, আমার ছেলেটি কেন অমন উচ্ছন্ন গেল! ছি ছি, একটা নষ্ট মেয়েমানুষের—" তিনি মাথা হেঁট করলেন। রুমালে চোখ মুছলেন।

সুকুর মা বললেন, "যে ছেলে মা'র সঙ্গে বনবাসী হয় সে কি তেমন ছেলে! আমার মন বলে সুকু আমার কোনও কুকাজ করেনি। ওর সবটাই সু। কিন্তু কেন আমাকে বলে গেল না? আর কি ফিরবে!"

৪

পরবর্তী কালে সুকুর মুখে প্রকৃত বিবরণ শুনেছি। সব মনে নেই, যেটুকু মনে আছে লিখছি। সুকু, এ লেখা যদি কোনদিন তোমার চোখে পড়ে, যদি এতে কোনও ভুলচুক থাকে, তবে মাফ কোরো।

ওর নাম সারী, তাই সুকুকে ও শুক বলে ডাকত। শুক দেখতে সুন্দর, সারী তেমন নয়। কিন্তু সারী রসের ঝারি, শুক শুকনো কাঠ। বৃন্দাবনে থাকতে সারী হিন্দি বলতে শিখেছিল, যাত্রীদের সঙ্গে মিশে দু'চারটে ইংরেজি বুক্‌নিও। হিন্দি ও বাংলা গান যখন যেটা শুনত তখন সেটা কণ্ঠসাৎ করত। এমন একটি গায়িকা নায়িকা পেয়ে সুকু ধন্য হয়েছিল। সারী ও শুকের মতো দু'জন দু'জনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে গানের সুধা পান করত। সুকুও জানত কত বাউল ফকিরের গান। সারীকে শোনাত।

সুকুর মতো আরও অনেকে আসত সারীর কাছে, তারাও আশা করত সারী তাদের আদর করবে। করত আদর, কিন্তু সে আদর নিতান্তই মৌখিক। রসের কথা বলে সারী তাদের ভোলাত। যাকে বলে সর্বনাশ সেটা অতিরঞ্জিত। এমন কী সুকুর বেলাও।

সারীর নামে যারা নালিশ করেছিল তাদের লোভ ছিল জমিখানার উপরে। কারও কারও লালসা ছিল নারীর প্রতিও। হতাশ লোলুপের দল অভিভাবকদের সামনে রেখে হাকিমের এজলাসে দাঁড়ায়। তখন সারীকে সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে শহর ছেড়ে যেতে হয়। সুকুর মতো আর যারা আসত তারা সেই দুর্দিনে তার সহায় হল না, যে যার পথ দেখল। কিন্তু সুকু তাকে ছাড়ল না, হাতে হাত রেখে বলল, "একদিন মার সঙ্গে গেছলুম, আজ তোর সঙ্গে যাব।"

সারী বলল, "আমি কি তোর মা!"

সুকু বলল, "মাকে যেমন ভালবাসতুম তোকেও তেমনি ভালবাসি।"

সারী রসিয়ে বলল, "তেমনি?"

সুকু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "দূর! তেমনি মানে কি তেমনি?"

"তবে কেমনি?" সারী রঙ্গ করল।

"এমনি।" বলে সুকু বুঝিয়ে দিল।

তখন তারা পরস্পরের কানে মুখ রেখে এক সঙ্গে গান ধরল—

"আশা করি বান্ধিলাম বাসা,
সে আশা হৈল নিরাশা,
মনের আশা।
ও দরদী, তোর মনে কি এই সাধ ছিল!"

তার পরে রাত থাকতে পথে বেরিয়ে পড়ল।

সারীর এক সই ছিল, বিনোদা গোপিনী। গ্রামে তার বাড়ি। সারী ও শুক সেইখানে নীড় বাঁধল।

বিনোদা বলে, "সই, তোর সঙ্গে কি ওকে মানায়! ও যে তোর ছোট ভাইয়ের বয়সী।"

সারী বলে, "গোপালও ছিল গোপীদের ছোট ভাইয়ের বয়সী। কারও কারও ছোট ছেলের বয়সী।"

বিনোদা মুখ বেঁকিয়ে বলে, "আ মর! কার সঙ্গে কার তুলনা।"

সারী মাথা দুলিয়ে বলে, "যা বলেছিস। তোর বরের সঙ্গে আমার বরের তুলনা!"

আসলে সারীর বয়স অত বেশি নয়, ওটা বিনোদার বাড়াবাড়ি। বিনির মনে কী ছিল তা কিছুদিন পরে বোঝা গেল। সে চেয়েছিল তার দেওরের সঙ্গে সারীর কণ্ঠিবদল ঘটাতে।

সারী অবশ্য ও প্রস্তাব কানে তুলল না। ফলে বিনোদার আশ্রয় দিন দিন তিক্ত হয়ে উঠল। এক

দিন শুক সারী নীড় ভেঙে উড়ে গেল।

এবার গেল ওরা সুকুর চেনা এক দরবেশের বাড়ি। আহার সম্বন্ধে সুকুর বাছবিচার ছিল না, সারীর ছিল। ওরা আলাদা রাঁধে খায়, শুধু ফটিকচাঁদের আখড়ায় থাকে।

দরবেশ অতি সজ্জন। তাঁর ওখানে যারা আসে তারাও লোক ভাল, কিন্তু কী জানি কেন সারীর সন্দেহ জাগল সুকু তাদের একটি মেয়ের প্রীতিমুগ্ধ। সুকু সুপুরুষ বলে সারী তাকে সযত্নে পাহারা দিত। অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেখলে চোখা চোখা বাণ হানত।

তখন সুকুই অনুনয় করলে, "চল, আমরা এখান থেকে যাই।"

সারী অভিমানের সুরে বলল, "কেন? আমি কি যেতে বলেছি?"

'না, তুই বলবি কেন! আমিই বলছি। এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে টান পড়ে যায়। সেটা কি ভাল!"

"কিসের উপর টান? জায়গার না মানুষের?"

এই নিয়ে কথাকাটাকাটি করতে সুকুর মনে লাগে। সে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে যে সে দুর্বল। তখন সারী তাকে সানন্দে ধরা দেয়।

এমনি করে তারা কত গ্রাম ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে তাদের পুঁজি এল ফুরিয়ে। কারও কাছে তারা কিছু চায়ও না, পায়ও না, নিলে বড় জোর চালটা আলুটা জ্বালানীর কাঠটা নেয়। সারী শৌখিন মানুষ, হাটে কিংবা মেলায় গেলেই তার কিছু খরচ হয়ে যায়। পুঁজি ভাঙতে হয়।

সারী বলে, "চল আমরা শহরে যাই।"

সুকু বলে, "শহরে!" বলতে পারে না যে, শহরে আত্মগোপনের সুবিধা নেই, লোকে বংশপরিচয় সুধাবে, পরিচয় দিলে কেউ না কেউ চিনবে সে কাদের কুলতিলক।

৫

যে শহরে তারা গেল সেটা উত্তর বঙ্গের একটা মহকুমা শহর। পশ্চিমের মতো সেখানে টমটম বা এক্কা গাড়ি চলে। টমটমওয়ালারা পশ্চিমা দোসাদ।

টমটম পাড়ার এক ধারে পশুডাক্তারখানা। ডাক্তারটি পশুচিকিৎসায় যত না পারদর্শী তার চেয়ে ওস্তাদ গানবাজনায় ও থিয়েটার করায়। সুকুর চেহারা দেখে ও গান শুনে তিনি তাকে তাঁর ছেলেদের মাস্টার রাখলেন। মাস দু'এক পরে যখন পশুদের ড্রেসার চাকরি খালি হল তখন 'তনি সাময়িকভাবে সুকুকেই বাহাল করলেন।

সুকুর সারা দিনের কাজ হল টমটমের ঘোড়া, চাষিদের গরু ও বাবুদের কুকুরের ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগানো ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বেচারিদের করুণ চিৎকারে তার কান ঝালাপালা হলে প্রাণ পালাই পালাই করে, কিন্তু পালাবে কোথায়! সে যা রোজগার করে তাই দিয়ে সারী সংসার চালায়। মাঝে মাঝে গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে সারীও কিছু কিছু পায়। তা দিয়ে কেনা হয় শখের জিনিস।

বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ডাক্তারবাবুর বদলির হুকুম এল। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুকুকে সঙ্গে নিতে, কিন্তু সুকু তো একা নয়। অগত্যা সুকুর যাওয়া হল না। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তিনি গানবাজনার যম। সুকুর কাছে কাজ আদায় করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সে আনাড়ি। তাঁর একটি শালা বেকার বসে ছিল, সুতরাং এক কথায় সুকুর চাকরি গেল।

ইতিমধ্যে টমটমওয়ালাদের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। তারা তার জন্যে দল বেঁধে দরবার করল। তাতে কোনও ফল হল না, কারণ সুকুর না ছিল যোগ্যতা, না অভিজ্ঞতা, না মুরুব্বির জোর। যা ছিল তা দুর্নাম। তখন টমটমওয়ালারা বলল, আমরাই চাঁদা করে তোমাকে খাওয়াব, তুমি আমাদের গান গেয়ে শোনাবে।

একদিন দেখা গেল সুকু টমটম পাড়ায় সভাগায়ক হয়েছে। তার সভাসদ হাড়ি ডোম মুচি দোসাদ জেলে মালী প্রভৃতি ইংরেজি শিক্ষায় বঞ্চিত জনগণ। সুকু শুধু গান গায় না, গান ধরিয়ে দেয়। ছত্রিশ জাতের ঐকতান সঙ্গীতে পল্লী মুখর হয়। জলসা চলে রাত একটা অবধি, তার পর সুকু বাসায় ফিরে সারীর পায়ে সঁপে দেয় আধলা পয়সা ডবল পয়সা।

সুকু তার পরিচয় গোপন করেছিল। ভেবেছিল কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু টমটম পাড়ার সভাকবি হবার পরে সে এত দূর কুখ্যাত হল যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল দূর থেকে তার নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে একদিন সে ধরা পড়ে গেল। খবরটা ক্রমে তার বাবার কানে পৌছল। বাবা এলেন না, কাকা এলেন তাকে নিতে।

কাকা এসেই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়ি গেয়ে বেড়ালেন ভাইপোর কীর্তি। গণ্যমান্যরা শিউরে উঠলেন। ছি ছি! মেয়েমানুষ নিয়ে ভেগেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু ছোটলোকদের সঙ্গে ছোটলোক হয়েছে। ছি ছি!

সুকু কাকার কথা শুনল না। ভাল ছেলে হল না। তিনি অনেক করে বোঝালেন, লোভ দেখালেন, ভয় দেখালেন। যাবার সময় এমন একটা চাল চেলে গেলেন যার দরুন সুকুকে তুষের আগুনে পুড়তে হল।

সারীব বড় গয়নার শখ। কিন্তু কোথায় টাকা যে গয়না গড়াবে। খেতেই কুলোয় না। সারী বোঝে সব, কিন্তু থেকে থেকে অবুঝ হয়। সুকু মনে আঘাত পায়, ব্যথার ব্যথী বলে দ্বিগুণ লাগে। গানের প্রলেপ দিয়ে বুকের বেদনা ঢেকে রাখে। দিন কাটে।

এক দিন টমটমওয়ালাদের সভা থেকে সুকু সকাল সকাল ছুটি পেল। সারী যে তাকে দেখে কত খুশি হবে এ কথা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরল। বাসায় ফিরে তার মনে একটু খটকা বাধল। সে ঠেলা দিয়ে দেখল ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ। ডাকল, "সারী। ও সারী।"

মিনিট পাঁচ সাত ডাকাডাকির পর দ্বার যদি বা খুলল কোথায় সারী। সারীর বদলে কে একজন ঘব থেকে বেরিয়ে এল এবং ঘোমটায় মুখ ঢেকে হন হন করে চলে গেল। চলনটা মেয়েলি নয় মোটেই। সুকু ভেঙে পড়ল। তার মনে হল সে মরে যাবে, বাঁচবে না। মড়ার মতো কতক্ষণ পড়ে থাকল জানে না। যখন জ্ঞান হল দেখল সারী থরথর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে তার পা ছুঁতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। সুকু পা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসল।

সে একটা রাত। দু'জনের একজনেরও চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। বুকে দুর্জয় রোদন। দু'জনেই নিস্তব্ধ, নিশ্চল।

পরের দিন সারীই প্রথম কথা কইল। "তা হলে এখন তুমি কী করবে?"

সারী তাকে এই প্রথম 'তুমি' বলল।

সুকু বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

"বাড়ি ফিরে যাবে, না এখানে থাকবে?"

সুকু ভেবে বলল, "যেখানে তুমি সেইখানেই আমার বাড়ি।"

"কিন্তু দেখলে না? আমি যে বেশ্যা।"

"তুমি কে তাই যদি জানি তো সব জানলুম। তুমি কী তা তো জানতে চাইনে।"

"আমি কে?"

"তুমি রাধা।"

এ উত্তর শুনে সারী স্তম্ভিত হল। এবার ভেঙে পড়বার পালা তার। সে এমন কান্না কাঁদল যে সুকুর মনে হল তার সর্বস্ব চুরি গেছে। অথচ তখনও তার গলায় দুলছিল এক ছড়া সোনার হার, সদ্য নির্মিত।

৬

কাকার চাল ব্যর্থ হল। কিন্তু সারীর নামে যে সব কথা রটল তা কানে শোনা যায় না। সুকুর পক্ষে মুখ দেখানো দায় হল। কিন্তু নিরুপায়। টমটম পাড়ার টিটকারি সে গায়ে মাখে না, ছোটলোকের রসিকতা মাথা পেতে নেয়।

এমন করে তাদের বেশি দিন চলত না। দৈবক্রমে সে শহরে এলেন এক ইউরোপীয় পর্যটক, তাঁর সঙ্গে গান রেকর্ড করার যন্ত্র। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর সামনে সারী ও শুক উভয়েরই ডাক পড়ল। সারীর গলা তাঁর এত ভাল লাগল যে তিনি তার সাত আটখানি গান রেকর্ড করলেন। তারপর সে সব রেকর্ড কলকাতার বন্ধুমহলে বাজিয়ে শোনালেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন এক রেকর্ড ব্যবসায়ী। তিনি সরাসরি সারীকে লিখলেন কলকাতা আসতে।

সারী এল, তার গান নেওয়া হল। সে সব গানের আশাতীত আদর হল। সাহেবের সার্টিফিকেট না হলে এ দেশে বাংলা বইও বিক্রি হয় না। সারীর বরাতে জুটল সাহেবমহলের সুপারিশ। রেকর্ডেব পর রেকর্ড করিয়ে সারী স্বনামধন্য হল। তখন তাকে বাস উঠিয়ে আনতে হল কলকাতায়। বলা বাহুল্য, সুকু রইল সঙ্গে। তার গান কিন্তু কেউ রেকর্ড করতে চায় না, সাহেবের সুপারিশ নেই।

তার পরে সারী পড়ল এক ফিল্মব্যবসায়ীর সুনজরে। তার রূপের জলুস ছিল না, কিন্তু রসের চেকনাই ছিল। ভাল করে মেক্ আপ করলে তাকে লোভনীয় দেখায়। যারা ফিল্ম দেখতে যায় তারা লোভনকে শোভন বলে ভুল করে। সে ভুলের পুরো সুযোগ পেল সারী। ডিরেক্টার তাকে পরামর্শ দিলেন ফিল্মী গান শিখতে। লোকসঙ্গীত ছেড়ে সে 'আধুনিক' সঙ্গীত শিখল। কণ্ঠের কৃপায় সে তাতেও নাম করল। ধীরে ধীরে সারী তারা হয়ে জ্বলল। চার পাঁচ বছর পরে যারা তার ফিল্ম দেখল তারা জানল না তার অতীত ইতিহাস।

অবশেষে এক দিন শুভলগ্নে সারীর বিয়ে হয়ে গেল কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে। কেউ আশ্চর্য হল না, কারণ সারীর আয় তখন হাজারের কোঠায়।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি চেঞ্জ থেকে ফিরছি। ট্রেনে ভয়ানক ভিড়। কোনখানে একটিও বার্থ খালি নেই। বার কয়েক ঘোরাঘুরি করে আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছি এমন সময় একটা সার্ভেন্ট কামরা থেকে কে যেন আমাকে ডাক দিল, "খোকা ? খোকা না ?" আমি পিছন ফিরে দেখি সুকু।

ওর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় লম্বা চুল, মুখে এক রাশ গোঁফ দাড়ি, গলায় একটা কালো কাঠের কি কালো কাচের মালা। ফিটফাট বেহারা চাপরাশির মেলায় ও নেহাত বেমানান। হাতে একটা একতারা না আনন্দলহরী ছিল, সেটা বাজিয়ে মোটা গলায় গান করছিল একটু আগে—

"প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।
প্রেম করা কি কথার কথা রে গুরু ধরো চিনে।"

আমাকে পিছন ফিরতে দেখে সুকু কামরা থেকে নামল। নেমে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে? জায়গা মিলছে না?"

আমি বললুম, "এত রাত্রে কে আমার জন্যে জায়গা ছাড়বে!"

সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ফার্স্ট ক্লাসে, যদিও আমার টিকিট সেকেণ্ড ক্লাসের। দরজায় ধাক্কা মেরে বলল, "ও সারী। একবার খুলবে?"

সারীর বদলে সারীর স্বামী দরজা খুললেন। তখন সুকু আমার পরিচয় দিয়ে বলল, "একটু কষ্ট করতে হবে এর জন্যে। আমার বাল্যবন্ধু।"

ভদ্রলোকের মুখে পাইপ, হাতে ডিটেকটিভ নভেল ও পরনে সিল্কের স্লীপিং সুট। ভদ্রমহিলার পরনেও তাই, উপরন্তু রঙচঙে ড্রেসিং গাউন। তাঁরা বোধ হয় শয়নের উদ্যোগ করছিলেন।

সে রাত্রে আর কথাবার্তা হল না। আমি উপরের বার্থে সসংকোচে নিদ্রার ভান করে পড়ে রইলুম। কিছুতেই ঘুম আসে না। ভোর বেলা আসানসোল স্টেশনে সুকু এসে আমার খোঁজ করল। তার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে তার কাহিনী শুনলুম। বাকিটুকু বর্ধমানে ও ব্যাণ্ডেলে।

হাওড়ায় শেষ দেখা। বিদায়ের আগে সুকুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম "তোব পৌরুষ বিদ্রোহী হয় না? তোর আত্মসম্মান নেই?"

সুকু উত্তর দিয়েছিল, "ও যে বাধা।"

মনপবন ১৯৪৩

পা দ টী কা

সৈয়দ মুজতবা আলী

গত শতকের শেষ আর এই শতকেব গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংবাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তা-ব্যক্তিরা ছেলে-ভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা যাঁরা কোনওগতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই-স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনও কোনও ইস্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাশির চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিত মশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁব পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনও পরান্ন ভক্ষণ করেননি—পালপরব, শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাংলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা—ঘৃণা বললেও হয়তো বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজি হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনায় 'দোলা-লাগা' 'পাখি-জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা—সেদিন কাজে লেগেছিল। এবং তার পর মুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু ক উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশি, এবং টেবিলের উপর পা

দুখানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশি। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গ নিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিতমশাইকে খুশি করবার পন্থা দরকার হলে ঐ বিষয়টি নূতন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশি স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই, ঐ 'দোলা-লাগা পাখি-জাগা-ই' আমার বর্ণাশ্রম-ধর্ম-পালনে একমাত্র গোমাংস-ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ কবতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানাপ্রকার কটুবাক্য বর্ষণ করে। অনার্য, শাখামৃগ, দ্রাবিড়-সম্ভূত কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সম্বোধন করতেন না। তাছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে বলতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে। এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত স্নিগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনও মন স্থির করতে পারিনি যে সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি কোন্‌টা বেশি হয়েছে।

পণ্ডিতমশায়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোঁকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত— অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয় চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন। আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্রবারের মতন স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে কোনও একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে দিন কোনও অজুহাতই পেতেন না—ধর্মসাক্ষী সে কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু'চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায়—আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মতো নিষ্ফল নয় কি ? তারপর কখন আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড় বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টানা-পাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনও প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিত-মশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ং প্রাত শিশির-বসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান— এ কথা অস্বীকার করার জো নাই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজও যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়, সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে পড়া, টিকিতে দোল-লাগা, কাষ্ঠাসন-শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন ?

সে সময়ে আসামের চিফ-কমিশনার ছিলেন এন. ডি. বীটসেন-বেল। সায়েবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে, তাঁর নাম আসলে 'নন্দদুলাল বাজায়

ঘন্টা'। 'এন. ডি.' তে হয় নন্দদুলাল আর বীটসন্ বেল অর্থ বাজায় ঘন্টা—

—দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘন্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে। ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সেই একদিন খবর দিল লাটসায়েব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে— পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের টুর-ক্লার্ক নাকি, সে তাঁর কাছ থেকে পাকাখবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল-আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। এক দিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টার মশায়ের মেজাজ যখন সকলের প্রাণ ভাজা-ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগে আমবা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার ইস্কুলে সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কিনাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সে দিকেই হেডমাস্টার—নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজ ভাই আছে, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বলল, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন কী হয়েছে ?'

'দেখেই আয় না ছাই ।'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনও বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাস্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। আমাদের পণ্ডিতমশাই একটা লম্বা-হাতা আন্‌কোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদবাকি মাস্টাররা কলরব করে সে গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন, নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন, কেউ বলছেন পণ্ডিতমশাই কী বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা, পণ্ডিতমশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তিও ছিল না), কেউ বলছেন, আহা, যা মানিয়েছে (হাতি, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মতো দেখাচ্ছিল), কেউ বলছেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট আউট কী ?)। শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভট্টাচায্য, এ রকম উমদা গেঞ্জি, স্রেফ দুখানা তৈরি হয়েছিল, তারই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানি দেউলে হয়ে গিয়েছে। আর কারও কপালে এরকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাশি নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেণ্ড পিরিয়াডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবি শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সাহেব আসছেন শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না, তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিতমশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্য আমরা তখন তৈরি কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন-মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ডর-ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে

কিনলেন ?' আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান, ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনও ডান হাত, কখনও বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনও মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মতো এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে, সে যে-রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তড়পায় শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনও করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গব্ব-যন্ত্রণা' কখনও এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়মিড় খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন—লাট সাহেবের সামনে তো সর্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সাহেব এলে আমি জানলা দিয়ে দেখতে পাব ! তখন না হয় পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গব্ব-যন্ত্রণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।' আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশায়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই, শুধু আমাদের কারও কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহভরা চোখে বললেন, 'তুই তো আস্ত মর্কট— শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো ? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন ?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে কসম খেলুম।

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশি ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্ত দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গে খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোনও বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম, কোন্ দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময় মতো ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তার 'গব্ব-যন্ত্রণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন, সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটার, ইন্সপেক্টর, হেডমাস্টার, নিত্যানন্দ— আর লাট সাহেবের এডিসি ফেডিসি নাকি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পান্‌ডিট' বলে সাহেব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সাহেবকে সেলাম করলেন—এই অনাদৃত পণ্ডিতশ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেয়েও যে কি রকম বিগলিত হতেন, তা তাঁদের সে সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নাই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃত-তদ্ধিতের বাই জানতেন, তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাট সাহেব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম প্লিজ'। লাট সাহেব আমাদের বললেন 'প্লিজ—এ কী কাণ্ড ! তখন আবার কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন,

'বিহঙ্গ' আমরা চুপ,—তখন প্লিজের ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁটা যতটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয় দেশে নাম করে ফেলল—আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সাহেব ততক্ষণ হেডমাস্টারের সঙ্গে পণ্ডিত শব্দের মূল নিয়ে ইংরাজিতে আলোচনা জুড়ে দিযেছেন। হেডমাস্টার কী বলেছিলেন জানিনে তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছেন, যার সব কিছু পণ্ড গিয়েছে সেই পণ্ডিত।

ইংরাজ-শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব-পণ্ডের ইতিহাস হয়তো রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,—না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়তো একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সাহেব চলে গিয়েছেন, যাবাব পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড় করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু'তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড হল।

তিন দিন ছুটির পব ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে, পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন না শুধু চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনও গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারও দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ !'

নীল যাহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ—যোগরূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর—ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি। উত্তর দিলুম—'আজ্ঞে'।

পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাট সাহেবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাশি নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

বললেন, হল না। আর কে ছিল ?' বললুম, 'ঐ যে বললুম, এক গাদা এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেননি।'

পণ্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরও গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূর্খ ? আমি কালা না তোর মতো অমানুষ।'

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই, জিজ্ঞাসা করুন না কেন পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চিনে।'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা দিবান্ধ— রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন ? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি ? এই পর্যবেক্ষণ-শক্তি নিয়ে—'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ও তো এক সেকেণ্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ এক গৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কী বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো।'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম 'আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরিতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকার মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে সেলাম টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা, লাট সাহেবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।'

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত

করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট দিতেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মতো কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সায়েবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে খবরটা ও গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আট জনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মদনমোহন কী রকম আঁক শেখায় রে ?'

মদনমোহন বাবু আমাদের অঙ্কের মাস্টার—পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'বেশ বেশ। তবে শোন। মিস্বার উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়। এইবার দেখি, তুই কী রকম আঁক শিখেছিস। বল তো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পাঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয় ?'

আমি ভয় করেছিলুম পণ্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।' পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাধু, সাধু ?'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধামাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবন-ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ-পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের ক'টা ঠ্যাঙের সমান ?' আমি হতবাক।

'বল না।'

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

মূর্খের মতো একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায়, বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পণ্ডিতমশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস-শেষের ঘন্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনও মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়' 'silence golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা পাই।'

চাচা কাহিনী

রঙের গোলাম

প্রবোধকুমার সান্যাল

নদীর পুলটি পেরিয়ে মুন্সি-পাড়ার ছোট্ট স্টেশনে এসে প্যাসেঞ্জার গাড়িটি দাঁড়াল। সকাল সাড়ে সাতটা এখনও বাজেনি। এরই মধ্যে বৈশাখের রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠেছে।

আসবার সময় ঠাকুমা বলে দিয়েছিলেন, পাড়াগাঁ, বিদেশবিভুঁই। শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস এই প্রথম। ব্যাগের মধ্যে কড়াপাকের সন্দেশ রইল, ইস্টিশানে নেমে জল খেয়ে নিস ভাই। নাতবৌকে নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত সবাই পথ চেয়ে থাকব। দুর্গা দুর্গা—

কথাটা সুশীলের মনে ছিল।

কলকাতার জীবনটা সহজ, কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামের একটি স্টেশন-প্লাটফরমে এসে নামলে উপস্থিত সমস্যাটাকে এত সহজ মনে হয় না। কথা ছিল, শ্বশুরবাড়ি থেকে দু-একজন কেউ-না-কেউ এসে স্টেশনে অপেক্ষা করবে। তারাই নৌকা আনবে এবং পথঘাট চিনিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু চোখের সামনে সীমাহীন নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। সুশীল দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। কেউ আসেনি।

হ্যাণ্ডব্যাগটি ঝুলিয়েনিয়ে এখানে-ওখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সে একসময়ে স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। মাস্টারমশাই মুখ তুলে বললেন, আপনাকে তো দেখলুম এই গাড়িতে এলেন। কোথায় যাবেন?

সুশীল বললে, শাম্‌তা যাব। কিন্তু,—এখানে দেখছি নে কারোকে—

শাম্‌তা? সে যে অনেক দূর। আজকাল নৌকো তো যায় না, কচুরি জমেছে অনেক। তা ছাড়া বালুতে লগি ঠেলা যায় না। আপনাকে হেঁটেই যেতে হবে। শাম্‌তায় কাদের বাড়ি যাবেন?

চৌধুরীদের ওখানে।

মাস্টারমশাই এবার ভাল করে কলকাতার এই ছোকরার দিকে তাকালেন। তারপর একটু মিষ্ট হেসে বললেন, আপনি কি হরগোপালবাবুর জামাই সুশীল রায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

দাঁড়ান দাঁড়ান—মাস্টারমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—সবই গেছে গণ্ডগোল পাকিয়ে। আপনার দুখানা চিঠি আর জরুরি টেলিগ্রাম আমার কাছে পড়ে রয়েছে,—চৌধুরীদের ওখানে আজও ডেলিভারি দেওয়া হয়নি।

সুশীল প্রশ্ন করল, সে কী ? কেন ?

আর কেন! একজন রানারের কলেরা, আরেকজন ছুটি না নিয়েই বাড়ি গেছে। কে ডেলিভারি দিয়ে আসবে বলুন? আঁটপুরের পোস্টমাস্টারমশাই আমার লোকের হাতে চিঠি আর টেলিগ্রাম দিয়ে বলেছেন, ডেলিভারি দিয়ে দুটাকা বকশিশ চেয়ে নিয়ো চৌধুরীদের কাছ থেকে। আজ ভাবছিলুম যা হোক করে পাঠাব।

বুঝতে পারা গেল এই কারণেই শাম্‌তার কোনও লোক এসে পৌঁছয়নি। সুশীল বললে, কিন্তু আমি তো পথঘাট চিনি নে, শাম্‌তা যাব কেমন করে, বলে দিতে পারেন?

মাস্টারমশাই বললেন, আপনি গিয়ে একটু বসুন ওই ঘাটের ধারে ডাকবাংলায়, আমি খোঁজ-খবর নিচ্ছি। নদীতে এখন জল নেই বললেই হয়, তাই নৌকো পাওয়া বড্ড কঠিন। আপনি গিয়ে অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি। আপ্-গাড়িখানা ছেড়ে দিয়েই আমি আসছি।

ব্যাগটি হাতে ঝুলিয়ে সুশীল নির্দিষ্ট পথের দিকে অগ্রসর হল।

পায়ে-চলা একটি পথ নেমে গেছে ঘাটের দিকে। নীচের অংশটায় ডাক-বাংলার কোলে একটি মস্ত প্রাঙ্গণ। তারই উত্তর দিক ঘেঁষে দুটি পাকা ঘর আর একফালি বারান্দা। কিছুদূরে একটি চালাঘর, সেটি বোধ করি খানসামা আর জমাদারের আস্তানা। এবার কোথা থেকে যেন একটি লোক এসে সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার ঠুকল। সুশীল এগিয়ে এসে বললে, একঘটি খাবার জল আনতে পারো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পারি বৈ কি। ওই তো পিছন দিকেই টিউবওয়েল্।

লোকটা তখনই ছুটতে ছুটতে চলে গেল। বকশিশ পাবার লোভ ছিল তার।

এক বৃদ্ধা বসে ছিল বারান্দার এক কোণে। কার উদ্দেশে যেন কী সে বকছে নিজের মনে। হাতের কাছে তার একটি ময়লা পুঁটলি। বুড়ি মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, কোথা যাবে গা?

পায়াভাঙ্গা একখানা চেয়ারে সুশীল একটু সুস্থির হয়ে বসল, তারপর মুখ ফিরিযে জবাব দিল, শাম্‌তা যাব, বুড়িমা।

শাম্‌তা যাবে? তালটুলি ছাড়িয়ে নাকি?

কোথায় তালটুলি আর কোথায়ই বা শাম্‌তা—নবাগত সুশীলের কিছুই জানা নেই। সুশীল শুধু বললে, মাস্টারমশাই আসছেন, তাঁর কাছেই শুনতে পাবে।

বুড়ি আপন মনে আবার বিজবিজ করতে লাগল।

মিনিট দুই বাদেই চাকরটা এক ঘটি জল এনে রাখল। বললে, বেশ ভাল জল, বাবু-—আপনি মুখ হাত ধোন, দরকার হলে আরও এনে দেব। যদি বলেন, চা বিস্কুট ডিমসেদ্ধ—এসব এনে দিতে পারি। এখানে জোগাড় আছে।

সুশীল বললে, যদি পারো শুধু এক পেয়ালা চা আমাকে তৈরি করে দাও। খাবার কিছু দরকার নেই।

লোকটা আবার সোৎসাহে চলে গেল।

ব্যাগটি খুলে সুশীল সন্দেশের মোড়কটি বার করবার উদ্যোগ করছে এমন সময় একটি ছিপছিপে কাঁচা বয়সের মেয়ে বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বুড়িকে প্রশ্ন করল, গলাবাজি করছিলে কেন? যাবে তো যাও না! সাঁতরে যেতে চাও, যাও—নৌকো নেই।

মেয়েটার চোখ দুটো লক্ষ করে সুশীলের পক্ষে মোড়কটি আর খোলা সম্ভব হল না। ব্যাগটি আবার বন্ধ করে সে কেবল ঘটি থেকে দু-ঢোক জল খেয়ে নিল।

বুড়ি আবার গজগজ করে উঠল, চোখে কি দেখতে পাই যে, গাঙ পেরোব? এখানে জল বেশি। দে না তুই পার করে আমাকে? লম্বা লম্বা কথা! আবাগি ··· নচ্ছার!

মেয়েটা সুশীলের দিকে একবার তাকাল। নবাগত এক ব্যক্তির সামনে গালমন্দ খাওয়াটা বোধ হয় তার গায়ে লাগল, সুতরাং সে তখনই বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে, মুখ খারাপ করলে কিন্তু ভাল হবে না, মাসি, বলে দিচ্ছি। আমি পারব না, যা খুশি করোগে।

মেয়েটা চলে যাচ্ছিল, বুড়ি ডাকল, শোন্, শুনে যা—

না, শুনব না। ভিক্ষের ভাগ দেবে আমাকে যে, তোমার গালমন্দ সইব? কে তোমার ধার ধারে?

মেয়েটা চলে গেল। সোজা গিয়ে সে ঢুকল চালাঘরটায়।

প্রায় আধঘণ্টা পরে মাস্টারমশাই সেই পায়ে-চলা পথটি বেয়ে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন। আপ্-ট্রেনখানা মিনিট দুই আগে পেরিয়ে গেছে। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনার জন্যে বিশেষ কিছুই করতে পারলুম না, সুশীলবাবু। গাঁয়ের জামাই আপনি, খাতির করবার কেউ নেই। তবে একখানা নৌকো যাচ্ছে নবীনগর অবধি,—ওই পর্যন্তই একটু জল আছে। নবীনগরে নেবে আপনি একখানা গরুর গাড়ি পেতে পারেন। আজ সেখানে হাট আছে।

সুশীল এতক্ষণে একটু ভরসা পেয়ে বললে, বেশ, গরুর গাড়ি হলেও যেতে পারব। কোনমতে

পৌঁছতে পারলেই হল।

মাস্টারমশাই বললেন, তাহলে আর দেরি করবেন না। অনেকটা পথ। নবীনগরে দোকান পাবেন,—দুধ কলা চিড়ে বাতাসা, এসব পাওয়া যাবে। এই নিন চিঠি দুখানা আর টেলিগ্রাম। সবই আপনার। হরগোপালবাবুকে বলবেন, তিনি যেন কিছু মনে না করেন। চলুন, আপনাকে তুলেই দিয়ে আসি।—এই বলে চিঠি ও টেলিগ্রামটি তিনি সুশীলের হাতে গছিয়ে দিলেন।

ব্যাগটি নিয়ে সুশীল উঠে দাঁড়াতেই খানসামা চা নিয়ে এল। তার অন্য হাতে একটি কাগজের মোড়ক। সেটি দেখিয়ে সে বললে, এর মধ্যে আপনার জন্যে চারটে ডিমসেদ্ধ আর আটখানা বিস্কুট দিয়েছি।

সুশীল ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ডিম-বিস্কুট চাইনি তো ?

কেন, যুমনি গিয়ে যে বললে আমাকে ? তাই তো ডিম সেদ্ধ করে আনলুম। তবে ভাববেন না বাবু, এসব পথে আপনার লেগেই যাবে। মোট আপনার হয়েছে সাতসিকে।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না। এরকম আচরণে সুশীল মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হল। কিন্তু মাস্টারমশাই বললেন, মেয়েটার বিবেচনা আছে দেখছি। তা ভালই হল, সারাদিনটাই পড়ে রয়েছে সামনে, ক্ষিধে তেষ্টা পাবে বৈ কি। যুমনি ভালই করেছে।

বকশিশ সমেত দুটি টাকা পকেট থেকে বার করে দিয়ে সুশীল চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিল। চা শেষ করতে মিনিট পাঁচেক লাগল বৈ কি। অতঃপর মাস্টারমশাই বললেন, আসুন, ঘাটের দিকে যাই।

বুড়ি ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে সুশীলের পিছু নিয়েছিল। ঘাটের ধারে নৌকার কাছে এসে বললে, আমাকে একটু জায়গা দাও গো বাবারা, আমি তালটুলিতে নেমে যাব। ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাই বাবা, একটু জায়গা দাও।

অনুমতিলাভের আগেই বুড়ি হাতড়ে-হাতড়ে হাঁটু অবধি কাদা মেখে নৌকায় গিয়ে উঠল। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, অ যুমনি, আয় লা আয়। উঠে পড়্।

মাস্টারমশাই বললেন, দেখুন ওদের কাণ্ড ! শুধু পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার ফন্দি ! কী আর করবেন সুশীলবাবু, দিন ওদের একটু জায়গা ! গরিব বেচারা !

সুশীল বললে, তা বেশ, যাচ্ছে যাক্ ! ওদের কাছেই পথ-ঘাট জেনে নেওয়া যাবে।

যুমনিও এসে নৌকায় উঠল। মাস্টামশাই বলে দিলেন, নবীনগর থেকে শামতা হল সাড়ে পাঁচ কোশ,—গরুর গাড়ি না হলে চলবেই না। এখন মাঠ বড্ড শুকনো। ওখানে গেলেই আপনি গাড়ি পাবেন।

মাস্টারমশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে সুশীল গিয়ে নৌকায় উঠল। একখানা রুমাল বার করে খাবারটা বেঁধে নিল।

মাস্টারমশাই ফিরে গেলেন। লগি ঠেলে নৌকা ছেড়ে দিল।

উজান ঠেলে নৌকা চলেছে ধীরে ধীরে। বৈশাখের রৌদ্র অতি প্রখর। সুশীল ছইয়ের ভিতরে গিয়ে একটু গুছিয়ে বসল। সকালের চায়ের তৃষ্ণাটা একপ্রকার মিটেছে, ঘন্টা দুই এখন নিশ্চিন্ত। ব্যাগটি খুলে আরেকটি রুমাল বার করে সুশীল মুখখানা মুছল। ছোট জানলার বাইরে নদীর দুপারে মাঠ। ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে। বাতাস এখনও তেমন গরম হয়নি। যাত্রাটা নতুন ধরনের — ভালই লাগছে।

বাইরে একপাশে বসে রয়েছে যুমনি আর তার পাশে বুড়ি। হাত দুখানা কপালের দিকে তুলে রোদ বাঁচাবার চেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু বুড়ির সঙ্গে যুমনির তর্কাতর্কি লেগেই রয়েছে। তর্কের মূল বিষয়টি সুশীলের কাছে দুর্বোধ্য। তবে আন্দাজে বুঝতে পারা যায় এই, জোয়ান বয়সের মেয়েছেলেকে এড়িয়ে গিয়ে বুড়ো মানুষকে কেউ ভিক্ষে দিতে চায় না। সুতরাং তালটুলিতে নেমে নবীনগরের হাটতলা

যাবার পথে যুম্‌নি যেন বুড়ির সঙ্গ না নেয়। যুম্‌নি কাছে-কাছে থাকলেই তার অসুবিধা। যুম্‌নি তার উত্তরে বলছে, আমি তোমার ভিক্ষের ভাগ বসাতে আসিনি। যা খুশি করোগে তুমি। আমি গিয়ে হাটতলার কোথাও পড়ে থাকব। তুমি তালটুলিতে নেমে যেয়ো।

পড়ে থেকে কি করবি ? তোর মা যদি তোকে ঘরে ঢুকতে না দেয় ?

যুম্‌নি একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, নাই বা দিল ? কে সাধতে যাচ্ছে ? হাটতলায় ভাত ফুটিয়ে খেয়ে সোজা হাঁটা দেব বোষ্টমডাঙ্গায় ! আমি কি ও-মাগীর পরোয়া করি। মা, না ডাইনি !

সুশীল ওদের তর্কটা শুনছিল। যুম্‌নির দিকে এবার মুখখানা ফিরিয়ে বুড়ি একটু হাসল। বললে, ও বুঝেছি, সেই মরদটার কাছে এখন চললি বুঝি ? ছোঁড়াটা না খুনের মামলায় পড়েছিল ?

তোমার মাথা আর মুণ্ডু। সে কবে মরে ভূত হয়েছে !

তবে কোথায় চললি ?

যুম্‌নি একটু থেমে বললে, ওখানে ধানকলে কাজ দিচ্ছে।

বুড়ি বললে, সে ভাল, কাজ কর, —মরদ না হয় নাই পেলি। তোর না একটা বাচ্চা হয়েছিল ? তাকে কোথায় পাচার করলি ?

যুম্‌নি একটু আড়ষ্ট হয়ে নৌকার ভিতরে একবার তাকাল । পরে বললে, তার কথা আর কেন ! সেও মরেছে !

বটে ! বুড়ি বললে, তোকে বুঝি আমি চিনি নে ? বল্ না কেন গাঙে ফেলে দিয়েছিস ?

যুম্‌নি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, নৌকার মাঝি এবার বললে, তোরা নামবি কোথা রে ? আমার পয়সা কে দেবে ?

বুড়ি বললে, ওমা কথা শোনো। ভিক্ষেয় বেরিয়েছি পয়সা পাব কোথায় ?

যুম্‌নি বললে, পয়সার কথা কি হয়েছিল তোর সঙ্গে ?

মাঝি চেঁচামেচি করে উঠল। যুম্‌নি একটু সরে গিয়ে ছইয়ের ভিতরে গলা বাড়িয়ে বললে, ও বাবু, আমাদের কাছে যে পয়সা চাইছে ? তুমি একটু বলে দাও না গো।

ঠাকুরমার কথাটা স্মরণ করে সুশীল তখন সবেমাত্র তার সন্দেশের মোড়কটি খুলে বসেছে। উদ্দেশ্য একটি ডিমসিদ্ধ ও দুটি সন্দেশ খেয়ে সে প্রাতরাশ সারবে। যুম্‌নিকে গলা বাড়াতে দেখে সে একটু বিব্রত বোধ করে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা—তোমরা গিয়ে বসোগে, আমি বলে দিচ্ছি। পয়সা তোমাদের দিতে হবে না।

ওখান থেকেই সুশীল গলা বাড়িয়ে নৌকাওলাকে ডেকে আশ্বাস দিয়ে বললে, তোমার ভয় নেই কর্তা, ওদের পয়সা আমিই দিয়ে দেব।

যুম্‌নি কিন্তু এত সহজে সামনে থেকে নড়তে চাইল না। বুড়ি যেন না শুনতে পায় এইভাবে একটু গলা নামিয়ে বললে, বাবু, চারটে ডিম তোমার জন্যে আমিই বলেছিলুম। দাও না আমাকে দুটো !

সুশীল সহসা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। যুম্‌নি আবার বললে, অত বিস্কুট, অতগুলো সন্দেশ—নাই বা খেলে তুমি ?

যুম্‌নির চাহনির মধ্যে কোথায় যেন একটা চাপা আক্রোশের লাল আভা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। মেয়েটার পরনে একখানা ছিন্ন জীর্ণ ধুতি। বুকের একটা অংশ তার ঢাকা পড়েনি, সেদিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপও নেই। সুশীল চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে এল খাবারগুলোর দিকে। গা যেন তার ঘিনঘিন করে উঠল। কিন্তু যুম্‌নির সেই লুব্ধ রক্তিম দৃষ্টির দিকে মুখ আর না তুলেই সে বললে, এই নাও ডিম-বিস্কুট, নিয়ে তোমরা খাওগে যাও। এই সন্দেশও চারটে নিয়ে যাও।

বলতে বলতে সেই কাগজটির ওপরেই চারটে সন্দেশ তুলে দিয়ে সুশীল খাবারটা তার দিকে এগিয়ে দিল। কিন্তু যুম্‌নির মুখ চোখ তাতে যে খুব খুশি হয়ে উঠল তা নয়, সে যেন তার পাওনা নিয়ে

নিল।

লগি ঠেলতে ঠেলতে নৌকা চলেছে উজিয়ে। মাঝে মাঝে অল্প জলের জন্য নৌকার নীচে বালুর ঘষা লাগছে। আবার প্রাণপণে লগি ঠেলে সেটাকে ঘন জলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইভাবে মাইল তিনেক পথ আসতে আসতেই মধ্যাহ্নকাল পৌঁছে গেল। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে ছইয়ের ভিতরটাও ততক্ষণে গরম হয়ে উঠেছে।

সুশীল হাতঘড়িতে দেখল বারোটা বাজে। মনে মনে সময়ের হিসাব করে সে কূল-কিনারা পেল না। কিছুক্ষণ পরে ছইয়ের পিছনদিক থেকে গলা বাড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, ওহে, নবীনগরের আর দেবি কত ?

মাঝি জবাব দিল, তালটুলি পেরিয়ে যেতে হবে, বাবু। এই এসে পড়েছি, আর দেরি নেই।

কচুরিপানায় নদীপথ আকীর্ণ। ওরই মধ্যে জল চিনে-চিনে নৌকা ঠেলে যাওয়া। হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে একখানা বই ছিল, সেখানা বার করে পড়বার উৎসাহ আব নেই। কড়াপাকের সন্দেশ গোটা-তিন-চার গিলে জলের পিপাসা পেয়েছে। কিন্তু কলেরার ভয়ে সেই পিপাসা সুশীলকে চেপে রাখতে হচ্ছিল।

আরও প্রায় আধঘন্টা পরে নৌকা এসে লাগল তালটুলিতে। বুড়ি এতক্ষণ অবধি সেই অগ্নিক্ষরা বোদ মাথায় নিয়ে বসে ছিল। এর মধ্যে যুম্‌নির খাবারের থেকে সে ভাগ পেয়েছে কিনা বলা কঠিন, কাবণ খাবারগুলো নেবার পর কোনদিক থেকে কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। সুশীলের বিশ্বাস, যুম্‌নি একাই সেগুলো গিলেছে, অথবা তার একটা অংশ গোপন রেখেছে। সুবিধা ছিল এই, বুড়ি চোখে দেখতে পায় না।

তালটুলি এসেছে শুনেই বুড়ি উঠল। পুঁটলিটি ও লাঠিটি নিয়ে উঠে সে বললে, তুই কিন্তু নামতে পাবি নে এখানে, তুই যা নবীনগর। হাটতলায় যা হয় করিস। আমাকে নামতে দে।

যুম্‌নির বোধ করি ক্ষুধানিবৃত্তি হয়েছিল, সুতরাং সে আর প্রতিবাদ জানাল না। এমন সময় সুশীল গলা বাড়িয়ে বললে, ওহে মাঝি, তোমাদের এখানে ভাল খাবার জল পাওয়া যাবে ?

মাঝি বললে, হ্যাঁ বাবু, পাওয়া যাবে। এখানে নতুন সরকারি নল বসেছে। জল খুব ভাল।

যুম্‌নি সোৎসাহে বলে উঠল, আমি এনে দিচ্ছি বাবু, তোমাকে নামতে হবে না। ছুটে যাব আর আসব।

মাঝির কাছ থেকে ঘটিটা নিয়ে যুম্‌নি নৌকা থেকে নেমে পড়ল। বুড়িও নামল তার সঙ্গে। মাঝি গলা উঁচিয়ে বলে দিল, যাবি আর আসবি। ঘটি নিয়ে যেন গা ঢাকা দিস্ নে, মাগী।

মুখ সামলে কথা কস্ জয়নাল, বলে দিচ্ছি—যুম্‌নি পিছন ফিরে এবার আরক্ত চোখে তাকিয়ে মাঠ পেরিয়ে হনহন করে চলল।

নৌকা দাঁড়িয়ে রইল। মাঝি আর দাঁড়ি দুজন নেমে গিয়ে নদীর সেই জলে মাথা মুখ ধুয়ে নিল। সুশীল একসময় বললে, ওকে চোর বলা ভাল হয়নি, বুঝলে হে,—বেচারি গরিব লোক !

আপনি জানেন না বাবু, ওকে এ তল্লাটে সবাই চেনে। খুনে মেয়েছেলে ! দু-দুবার ফাটক ঘুরেছে ! মেয়েটা ভারী ধড়িবাজ। আজ আপনার কাছে কিছু আদায় করে তবে ছাড়বে ! একেবারে ছিনেজোঁক !

সুশীল একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল।

মিনিট পনেরো পরে এক ঘটি জল নিয়ে যুম্‌নি এবার একাই ফিরে এল। বুঝতে পারা গেল বুড়ি গেছে অন্যদিকে, নিজের পথ ধরেছে।

নৌকায় উঠে এসে যুম্‌নি এবার খুশিমুখে বললে, তুমি জল চেয়ে নিলে, এ আমার ভাগ্যি বাবু। তোমরা কলকাতার লোক, এদিকের হালচাল জানো না। শুধু জল কেন, ভিক্ষেও জোটে না !

পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পেয়ে সুশীল তখনই খানিকটা খেয়ে নিল। তারপর মুখে চোখে ঠাণ্ডা জলের হাত বুলিয়ে একসময় প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বলতে পারো—কখন গিয়ে শাম্‌তা পৌছব ?

যুম্‌নি বললে, বোধ হয় সন্ধ্যে হবে। মাঝপথে একটা বিল পড়বে, সেটা পেরিয়ে গেলে সরকারি রাস্তা—

গরুর গাড়ি পাব ?

হ্যাঁ—আমি গাড়ি এনে দেব। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

সুশীল বললে, আমাকে গাড়িতে তুলে ঠিক রাস্তাটা বলে দিয়ো, তোমাকে বকশিশ দেব।

বকশিশ—যুম্‌নি সোজা চোখ তুলে তাকাল। তারপর বললে, তোমার খাবার যে খেলুম তখন ? কে তোমার বকশিশ চায় ? বুঝেছি, জয়নাল এরই মধ্যে কানে তোমার মন্তর দিয়েছে না ?

এদিকটায় কিছু বেশি জল পেয়ে নৌকা একটু দ্রুতগতিতেই চলছিল। লগিটা থামিয়ে ওধার থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জয়নাল। বললে, তোকে জানে না কে, শুনি ? ভদ্দল্লোকের সঙ্গে আবার তর্ক করছিস ? চুলের ঝুঁটি ধরে এখনই লা থেকে ফেলে দেব ! ভয় করি নে তোকে !

ভীষণ বাঁকাচোখে যুম্‌নি এক বার জয়নালের দিকে তাকাল। পরে বললে, তোর ভাইয়ের জন্যে বুঝি রাগ তুলতে চাস ? সাবধানে কথা বলিস, জয়নাল ? ভিক্ষে করে খাওয়াই নি তোর ভাইকে ? আবার লম্বা লম্বা কথা ! নৌকা রাখ্‌, আমি নেমে যাচ্ছি—

সুশীল এবার বাধা দিয়ে বললে, থাক্‌ থাক্‌, ওসব ঝগড়াঝাঁটিতে আর কাজ নেই। রোদ্দুরে মাথা গরম করছ কেন ? আর এইটুকু তো রাস্তা,—নামতে আর হবে না। শান্ত হয়ে বোসো।

জয়নাল চুপ করে গেল। যুম্‌নি মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

দুদিকে রৌদ্রদগ্ধ মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। দুইয়ের মধ্যপথে নদী যতদূর অবধি দেখা যায় কচুরিপানায় পরিপূর্ণ। ওরই মাঝখানে কোথায় জল একটু গভীর, সেটি জয়নালরা জানে। বালু বাঁচিয়ে কচুরির ভিড় ঠেলে একসময় নৌকা এসে লাগল একটা মস্ত বটগাছের তলায়। এইটি নাকি নবীনগরের ঘাট। গ্রামের বাচ্চারা নদীতে নেমে জল নিয়ে মাতামাতি করছিল।

জয়নাল বলে দিল, এখান থেকে তিন পোয়া রাস্তা আপনাকে হেঁটে যেতে হবে, বাবু। হাটের পথ ধরলে তবে গরুর গাড়ি পাবেন।

হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে সুশীল নেমে এসে বটগাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। যুম্‌নিও নামল। তারপর বললে, আমি কি যাব তোমার সঙ্গে বাবু ? পথ যদি চিনতে না পারো তাহলে যাই।

সুশীল বললে, তখন যে বললে গরুর গাড়ি একখানা ভাড়া করে দেবে ?

তাহলে যাই সঙ্গে, চলো !

নৌকাভাড়াস্বরূপ তিনটাকা জয়নালকে বুঝিয়ে দিয়ে সুশীল আগে আগে চলতে লাগল। ঘাট ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে ওরা নামল। সামনে পাওয়া গেল একটা বাঁশবাগান। রৌদ্র থেকে বাঁচবার জন্য ছায়ায়-ছায়ায় সুশীল চলতে লাগল। যুম্‌নি আসছিল পিছু-পিছু। একসময় সে বললে, তোমার কষ্ট হচ্ছে বাবু—ব্যাগটা আমার হাতে দাও না ?

জয়নালের সতর্কবাণী সুশীলের মনে ছিল। সে বললে, না না, সে কি কথা ! হাজার হোক তুমি মেয়েছেলে,—লোকে বলবে কী ?

যুম্‌নি বললে, লোক তো কেউ নেই এখানে ?

সুশীল এবার থমকে দাঁড়াল। বললে, মেয়েছেলে বোঝা নিয়ে যাবে, আর আমি পুরুষমানুষ হয়ে খালি-হাতে হাঁটব, এ কি হয় ? চলো, এটা এমন কিছু ভারী নয়।

বেলা দেড়টা বেজে গেছে। এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে রুমালটি নিয়ে সুশীল হনহন করে চলল।

মেয়েটা আসছে পিছু-পিছু, কিন্তু বকশিশের লোভে নয়। কিছু খাদ্য পেয়েছিল, বোধ করি তারই কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ গরুর গাড়ি একখানা জোগাড় করে দিতে চায়। একসময় যুম্‌নি বললে, বাবু, এই বুঝি তুমি প্রথম শামৃতায় যাচ্ছ ?

সুশীল জবাব দিল, হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

মেয়েটা অনায়াসে চলছে। রৌদ্রে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। খালি-পায়ে শুকনো মাঠের কর্কশ-কঠিন পথ পেরিয়ে চলেছে, কষ্টের ও পরিশ্রমের কোনও চেতনাই নেই। রুমাল দিয়ে সুশীল বার বার নিজের কপালের ঘাম মুছছিল।

মাঠের মধ্যে তিন পোয়া পথ আন্দাজ করা যায় না। হয়তো এক মাইল, হয়তো-বা তারও বেশি। কিন্তু এই বেলাটুকুর মধ্যে এখনও অধিকাংশ পথ পেরিয়ে যেতে হবে। অদূরে বস্তি দেখা যাচ্ছে— এটা নাকি নবীনগবের শেষ প্রান্ত। এখান থেকে প্রায় দেড় ক্রোশ গেলে তবে হাটতলা। সুশীল একসময় থেমে বললে, গরুর গাড়ি ধরবে কোত্থেকে বলো তো ?

চলো বাবু, এই আমরা এসে গেছি। ওই যে চালাঘরগুলো দেখতে পাচ্ছ, ওখানেই গাড়ি পাওয়া যাবে।

সুশীল আবার মুখ বুজে চলল।

যুম্‌নির উৎসাহের শেষ নেই। অন্যের কিছু কাজ করে দেবার সুযোগ বোধ করি সে এই প্রথম পেয়েছিল। সুতরাং চালাঘর দেখে সে সুশীলকে পিছনে রেখে আগে-ভাগে এগিয়ে গেল। বুঝতে পারা যাচ্ছে এসব অঞ্চল তার বিশেষ, পরিচিত। একসময় পিছন ফিবে সে বললে, তুমি ওই আমগাছটার তলায় একটু দাঁড়াও, আমি দেখে-শুনে আসি।

ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত চেহারা নিয়ে সুশীল গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। এবাবে তার প্রকৃতই দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যদি এদের সকলের আন্দাজ সত্য হয় তবে এখনও অন্তত দশ মাইল পথ বাকি। সন্ধ্যার মধ্যে গিয়ে শামৃতায় সে পৌঁছতে পারবে কিনা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বেলা এখন দুটো। সূর্যাস্তের এখনও চার-পাঁচ ঘন্টা বাকি। পাঁচ দু-গুণে দশ মাইল। মনে হচ্ছে, ঘন্টায় দু-মাইল অবশ্যই গাড়ি যেতে পারবে। সুশীল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইল।

আধঘন্টা পরে দূরের থেকে যুম্‌নি হাতছানি দিয়ে ডাকল। সুশীল প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার কাছাকাছি এল। যুম্‌নি বললে, গাড়ি এখনও ফেরেনি বাবু, আজ হাটের বার কিনা।

তাহলে উপায় ?—থমকে দাঁড়িয়ে ভয় পেয়ে গেল সুশীল।

যুম্‌নি হাসিমুখে বললে, আমরা হলে পাঁচ কোশ পথ হেঁটেই চলে যাই। কিন্তু তুমি তো আর তা পারবে না। তা ছাড়া ঘুমৃতির বিল পেরোতেই তো সময় লেগে যাবে। মাঝখানে এখন অনেক জল-কাদা। পারবে বাবু ?

মুশকিলে পড়ে গেল সুশীল। বললে, এদিকের পথঘাট আমার জানা নেই। বিলের চেহারা দেখে অবিশ্যি বলতে পারি, পারব কি না।

চালাঘরের আশে-পাশে দু-চারজন মেয়ে পুরুষ জড়ো হয়েছিল। একজন প্রবীণ চাষি বললে, নাটুপাড়ায় নে যা, ওখানে মানু পালের একখানা গাড়ি আছে। ভদ্দরলোককে যা হোক করে পৌঁছে দে। তুই ওঁকে ধরলি কোথায় ?

যুম্‌নি জবাব দিল, ইস্টিশানে।

লোকটা বললে, বাবু, যত কষ্ট হোক আপনি আর দাঁড়াবেন না। কোশ-দেড়েক গিয়ে নাটুপাড়ায় উঠবেন, দেখুন যদি গাড়ি পান। এখানে হাট থেকে কখন গাড়ি ফিরবে কোনও ঠিক নেই। যুম্‌নি, তুই যা বাবুর সঙ্গে। দেড় ক্রোশ থেকে দু-ক্রোশ পথ।

সুশীলের গলা শুকিয়ে উঠেছিল দুর্ভাবনায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে একবার যেন সমগ্র বিরাট

দেশের দুর্গম চেহারাটা অনুভব করে নিল। তারপর বললে, খাবার জল এখান পাওয়া যাবে ?

যাবে বৈ কি। আসুন বাবু চালার তলায়, একটু বসে যান। আপনারা কলকাতার লোক, মাঠে-ঘাটে কষ্ট হয় বৈ কি।

চালাঘরের নীচে এসে বাঁশবাঁধা একখানা বেঞ্চিতে সুশীল বসল। ভিতর থেকে একটা লোক এক ঘটি জল আর খানচারেক বাতাসা এনে দিল। কিন্তু দশ মাইল পথ সামনে রেখে সুশীল এখানে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারল না। বাতাসা ক-খানা চিবিয়ে একপেট জল গিলে সে আবার ব্যাগটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। যুম্‌নিও মুখে চোখে জল দিয়ে প্রস্তুত হল। পাশ থেকে কে একজন মেয়েছেলে চাপা-কণ্ঠে পরিহাস করে বললে, তোর কপাল ভাল, যুম্‌নি।

দুজনে সেই রৌদ্রে আবার হাঁটা-পথ ধরল। শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে যাত্রাটা ত্র্যহস্পর্শযোগে আরম্ভ হয়েছিল কিনা, সুশীল সেই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল। জলযোগ করে সে একটুখানি সুস্থ হয়েছিল, তার লম্বা লম্বা পদক্ষেপেই সে-কথাটি বুঝতে পারা যায়। যুম্‌নি নিজের মনেই আসছে পিছু-পিছু। তার ভাগ্য নাকি খুব ভাল, বিনা পারিশ্রমিকে কলকাতার লোকের কাজে লেগে গেছে। ঈর্ষা করার মতো ভাগ্য বটে।

পথের দূরত্বের পরিমাপ লোকের মুখে-মুখেই থাকে। নির্দিষ্ট নিশানা কিছু নেই। মাঠের এক মাইল পথ প্রকৃতই এক মাইল কিনা কেউ ভেবে দেখে না। আবার, বৈশাখের রৌদ্রে এক মাইলও তিন মাইল হয়ে ওঠে। নাটুপাড়ায় এসে পৌছতেই বেলা চারটে বাজল। এর মধ্যে গাছতলায় বসতে হয়েছে বার-দুই, ব্যাগ থেকে গামছাখানা বার করে ভিজিয়ে মাথায় বাঁধতে হয়েছে। জুতো খুলে পায়ের ফোসকায় হাত বুলোতে হয়েছে বার বার। ধিক্কার এসে গেছে শ্বশুরবাড়ির দেশ সম্বন্ধে, পল্লীজীবন সম্বন্ধে ঘৃণা এসে গেছে। পায়ের যন্ত্রণায় কান্না চাপতে হয়েছে। খুন চেপেছে মাথায়।

যুম্‌নি একসময় উৎসাহিত হয়ে বললে, বাবু, তোমার কপাল বড় ভাল। মানু পালের গাড়িখানা আছে দেখছি। এবার আর ভাবনা নেই। আজই শাম্‌তা পৌছে যাবে।

যুম্‌নির চোখে পড়েছিল গাড়িখানা দূর থেকে, সুশীল তখনও দেখতে পায়নি। সুতরাং এবারও যুম্‌নি আগে-ভাগে নাটুপাড়ায় গিয়ে ঢুকল। মেয়েটার উৎসাহ এবং অধ্যবসায় অপরিসীম। যত আক্রোশই সুশীলের মনে জমুক না কেন, মেয়েটার প্রতি মনে মনে সে কৃতজ্ঞতা বোধ করল।

গাড়ি দেখলেই হয় না, তার মালিককে চাই। আবার মালিককে পেলেও কাজ হবে না। গরু দুটো জোগাড় করা দরকার। ছুটোছুটি করতে গিয়ে অনেকটা সময় লাগল। মানু পালকে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে জ্বর নিয়ে উঠে এল। মোট চার ক্রোশ পথের জন্য সে হাঁকল পাঁচ টাকা। তাই সই। সুশীল মরিয়া হয়ে উঠেছিল। গরু দুটো আছে মাঠে,—যুম্‌নি ছুটল মাঠের দিকে। ওতে লেগে গেল আরও আধ-ঘন্টা। সুশীলের পায়ের ফোসকা উঠেছে দগদগিয়ে, হাঁটবার সাধ্য আর তার নেই। একখানে জুতোটা খুলে ব্যাগটা পাশে রেখে সে বসল।

গরু দুটোকে দড়ি ধরে এনে যুম্‌নি যখন সামনে হাজির করল, ছিপছিপে মেয়েটার কপাল আর শুকনো চুল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে। গরু দুটোকে গাছতলায় বেঁধে সে একরাশি খড় সংগ্রহ করে আনল। মানু পাল বললে, বাবু, ছইটা আছে আমার ঘরে। গরু বেঁধে আমি গাড়ি নিয়ে এগোই, আপনি আসুন। ছই বেঁধে খড় বিছিয়ে নেব। আসমানে মেঘ জমেছে, ছইটে দরকার।

পাঁচ রকম কাজে ঘন্টাখানেক আরও লেগে গেল। মানু পাল পাঁচ টাকা হাঁকলেও তার গাড়ি চালাবার উৎসাহ বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না। গায়ে তার জ্বর, শরীরটা অবসন্ন। নিতান্ত টাকার লোভেই সে রাজি হয়েছিল।

সুশীলেরও ক্লান্তি ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে একখানা পা তার ফোসকার জন্য প্রায় অকর্মণ্য হয়ে এসেছিল। এই গাড়ি কখন এবং কত রাত্রে গিয়ে শাম্‌তায় পৌছবে, সে হিসাব আর সে করল না।

কিন্তু গাড়িতে উঠে খড়ের বিছানার ওপর বসতে পেয়ে সে যেন বেঁচে গেল। পড়ন্ত রৌদ্রে তার মাথা ধরেছিল। ব্যাগটার ওপর একটু ভর দিয়ে সে কাত হয়ে বসল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। যুম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেই চলতে লাগল। মানু পাল চলল তার পাশে-পাশে। গরু দুটো গাড়ি টানছে আপন খেয়ালে। মাঝে মাঝে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে মানু পাল। এইটিই নাকি সরকারি রাস্তা। দক্ষিণ দিকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ গেলে তবে আঁটপুরের কাছারি। সেখান থেকে মুন্সিপাড়া আর দু ক্রোশ। শাম্‌তার পথ চলে গেছে উত্তরে।

সন্ধ্যা ছয়টায় কালবৈশাখীর আভাস দেখে সুশীলের মুখ চোখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে এল। কালো মেঘ আকাশে ঘনিয়ে এসেছে। বাতাস উঠেছে জোরে। কিন্তু যুম্‌নির মুখে চোখে না আছে ভয়, না ভ্রূক্ষেপ। বরং ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনায় তার যেন কোথাও কিছু একটা উৎসাহই ছিল। মাঠে ধান হবে, ভাতের ভাবনা ঘুচবে।

গলা বাড়িয়ে সুশীল বললে, ওদিকে আকাশের চেহারা যে বড্ড খারাপ হয়ে এল ! বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দেখছ তো ?

যুম্‌নি বললে, হ্যাঁ বাবু, ওদিকে ঝড় উঠেছে। তোমার ভাবনা নেই, ঠিক পৌছে যাবে।

কত রাত্রে পৌছব ?

মানু পাল বললে, তা এক পহর হবে। রাস্তা কম নয়, বাবু। ঘুম্‌তির বিল পেরিয়েও শাম্‌তা পৌছতে আড়াই কোশ।

যুম্‌নি বললে, ঘুম্‌তি তো এসে গেছে। কত জল হবে, মানু ?

ঠিক জানি নে তো, চল্ দেখি। ধুবলির কাঁধে ঘা আছে, টানতে পারলে হয় !

গাড়িখানা দেখতে দেখতে এসে যখন ঘুম্‌তি বিলের জলকাদায় নামল, তখন ঝড় উঠেছে। মাঠ-ময়দানের ঝড় কেমন, সুশীলের আগে জানা ছিল না। প্রান্তরের চারিদিক ধুলোয় আর ঝড়ের বেগে ঘোরালো হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে আকাশ কড়কড় করে উঠছিল। গাড়িখানা এগোচ্ছে কাদার ভিতর দিয়ে। সুশীল কাঠ হয়ে বসে ছিল। কাদা ছাড়িয়ে একসময় জলের মধ্যে গাড়িখানা নামল। যত এগোয়, জল বেশি। ওই জল-কাদার মধ্যে নেমেছে যুম্‌নি আর মানু পাল। কিন্তু গাড়ির মধ্যে বসে একসময় নীচের দিকে ভিজে-ভিজে ঠেকতেই সুশীল ভয় পেয়ে সহসা বলে উঠল, ও গাড়োয়ান, এ কী হল ? তলা থেকে জল উঠছে যে ? এ কোনদিকে নিয়ে এলে ?

যুম্‌নিরও প্রায় কোমর অবধি জল উঠেছে, মানু পালেরও সেই দশা। বিরক্ত হয়ে যুম্‌নি বললে, তখন না তোমাকে বললুম, বিলের পাড় দিয়ে ঘুরে চলো ? সোঁতার মধ্যে গাড়ি ঢুকল, এখন কী করবে ?

পিছন থেকে গাড়িখানা টেনে মানু পাল গরু দুটোকে থামাল। তারপর বললে, ঘুরতে গেলে যে এক কোশ রাস্তা বাড়ে, দেখছ না ?

তাই বলে বাবুকে জলে চোবাবে ? গাড়ি যে ডুবল ! গরুর নাক অবধি জল উঠেছে ! ফেরাও গাড়ি।

কিন্তু ওই কথা কাটাকাটির সময়টুকুর মধ্যে কালবৈশাখীর আকাশ ভেঙে পড়ল। বজ্র বিদ্যুৎ এবং ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি নেমে এল। মেঘের করাল ছায়া আচ্ছন্ন করেছে দিকদিগন্ত।

সুশীল ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, না না, আর এগিয়ো না, গাড়ি ফেরাও। জল বেড়ে যাচ্ছে। এ আমি পারব না।

মানু পাল জলের ভিতরে নেমে গিয়ে গরু দুটোকে ধরল। যুম্‌নি গিয়ে প্রাণপণে ধরল গাড়ির পিছন দিকটা। নানা কৌশল, কসরৎ ও সংগ্রামের পর সেই বৃষ্টির মধ্যে মানু পাল গরু দুটোর মুখসমেত

গাড়িখানাকে আবার ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু সেই জলকাদা ভেঙে ঢালুপথের উপবদিকে গাড়িখানাকে টেনে আনতে যতটা সময় লেগে গেল, তারই মধ্যে মানু পাল আর যুমনির অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে উঠল। এবার চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টির সাপটে আর ঝড়ের তাড়নায় সবাই দিশেহারা হয়ে গেল।

ছইয়ের ভিতরে বসে সুশীল বললে, এভাবে যাওয়া যাবে না, বুঝেছ যুম্‌নি ? কাছাকাছি গাঁ আছে কোথাও ? খানিকক্ষণ যদি অপেক্ষা করে যাই ?

মানু পাল এবার বেঁকে বসল। বললে, গাঁ আছে বটে দুপোয়া রাস্তা গেলে, যুমনি জানে। কিন্তু আমি ওখানে বসে থাকতে পারব না, বাবু। একটা গরুর ভাবগতিক ভাল নয়, হয়তো মরবে ! তা ছাড়া কাল সকালে আঁটপুরের কাছারিতে আমাকে হাজরে দিতে হবে !

সুশীল বললে, তুমি গাড়িভাড়া পাবে, তবে যাবে না কেন ? এত বৃষ্টি বাদলে আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাবে ? এসব কী বলছ ?

যুম্‌নি বললে, তখন একথা বললেই হত ?

মানু পাল বললে, আপনাকে গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে আমি যাব। আমাকে গোটা দুই টাকা দেবেন। যা দেখছি, আজকে আর আশা নেই। আমি বসে থাকতে পারব না।

বৃষ্টি প্রবল। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। অন্ধকারে ছইয়ের মধ্যে বসেও সুশীল বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজছিল। বললে, আমার আর কিছু বলবার নেই। তাই চলো।

গাড়ি নিয়ে অন্ধকারে মানু পাল অগ্রসর হল। যুম্‌নিও এগোল ভিজতে ভিজতে। একসময় সুশীল সকৃতজ্ঞকণ্ঠে গলা বাড়িয়ে বললে, তুমি আমার জন্যে যে কষ্ট করলে, এ আমি ভুলব না, যুম্‌নি, শাম্‌তায় গিয়ে সকলেব কাছে তোমার গল্প করব।

যুম্‌নি কোনও কথার জবাব দিল না। ঝড় ও জলের ঝাপটায় মাঝে মাঝে সে টাল খেয়ে যাচ্ছিল। সর্বাঙ্গ দিয়ে তার জল ঝরছে।

এ দুর্যোগের মধ্যে দুপোয়া পথ কতদূর ঠিক আন্দাজ করা যায় না। অন্ধকার তখনও ঘন হয়নি বটে, কিন্তু বৃষ্টির ভিতর দিয়ে লক্ষ করতে গেলে সবই একাকার মনে হচ্ছে ! সুশীলের কাপড় জামা জুতো ব্যাগ—সমস্তই ভিজে সপসপ করছে। কোথায় গিয়ে আপাতত মাথা বাঁচাবে, সেটা যুম্‌নিই জানে। গরুর গাড়ি নিয়ে মানু পাল এরপর চলে গেলে একমাত্র যুম্‌নি ছাড়া তার আর কোনও ভরসাই থাকবে না। কিন্তু এত বৃষ্টির মধ্যে কোনও কথা তলিয়ে ভাববারও সময় নেই।

সরকারি মেটে রাস্তা খানাখোন্দলে ভরা। মাঝে মাঝে চাকা বসে গিয়ে গাড়িতে ধাক্কা লাগছে। ছইয়ের মধ্যে বসে সুশীলের মাথা ঠুকে যাচ্ছে, পেটের নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকাচ্ছে। খানার মধ্যে যখন গড়গড়িয়ে নামছে, উপুড় হয়ে পড়ে তখন আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে। এইভাবে তথাকথিত দুপোয়া রাস্তা পেরিয়ে এসে গাড়ি যেখানে দাঁড়াল, সেটার নাম বুঝি কুমোরপাড়া। ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না—সামনেই বোধকরি ছোটখাটো একটা হাটতলা। কয়েকটা বাঁশের ওপর গোটা পাঁচ-ছয় আটচালা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে ঝড়ে গোটা দুই চালা কাত হয়ে পড়েছে।

গাড়িখানা মচমচ করে একসময় থেমে গেল। পাশেই কোনও একটা বস্তির থেকে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ওগুলো কুমোরদেরই ঘর, ভিতর থেকে মাঝে মাঝে ধুপধুপ করে আওয়াজ উঠছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে যুম্‌নি এবার এগিয়ে এসে সহসা চাপা-কণ্ঠে বললে, এখানে চেঁচিয়ে কথা বোলো না। ওকে টাকা দিয়ে দাও বাবু, ও চলে যাক্।

সুশীল দুটি টাকা বার করে মানু পালের হাতে দিয়ে দিল। মানু পাল খুশি হয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। সুশীল ব্যাগটি হাতে নিয়ে নেমে এসে একখানা চালার তলায় দাঁড়াল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল চালার বাইরে, কিন্তু সেই ক্ষণকালের আলোয় কেউ কারোকে স্পষ্ট করে দেখতে পেল না। বহুক্ষণ ওদেরকে

ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

বৃষ্টির সাপট এবার একটু কমেছে। গাড়ি নিযে নমস্কাব জানি" মানু পাল তার পথের দিকে এগিয়ে চলল।

ব্যাগটি খুলে একখানা গামছা বার করে সুশীল গা-মাথা মুছল, তারপর বললে, রাত্রের মধ্যে শাম্‌তা পৌঁছতে পারব তো ?

যুম্‌নির আচরণে তার যে প্রকৃতিগত উগ্রতা সাবাদিন ধরে প্রকাশ পেয়ে এসেছে, সেটা যেন কালবৈশাখীর ঝড়জলের তাড়নায় এবার শান্ত দেখাচ্ছিল। সে ঠিক তেমনি চাপা-কণ্ঠে বললে, তুমি যদি পারো, বাবু, আমার আপত্তি নেই। আমি সঙ্গে গিয়েই পৌঁছে দেব। তবে রাত হবে অনেক।

অন্ধকারে হাতঘড়ি দেখা যায় না। কিন্তু আন্দাজে বুঝতে পারা গেল, বাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। সুশীল বললে, এখান থেকে আব কতটা পথ হবে ?

যুম্‌নি বললে, তা ধরো, প্রায় তিন কোশ। আমবা যে আবাব খানিকটা উজিয়ে এলুম। আর কিছু না, বিল পেরোতে সময় লাগবে। অন্ধকারে সাবধান হযে হাঁটতে হবে তো ?

সাপখোপ জন্তু-জানোয়ারের ভয় আছে নাকি ?

ওসব কপালের কথা বাবু।

ব্যাপারটা কি জানো, যুম্‌নি—আমার আর এগোতে ভবসা নেই।—সুশীল বললে, একে তো ঝড়বৃষ্টি অন্ধকার, তাব ওপর জুতোটা এখন আর পবা চলবে না। নতুন জুতোটা পরে না এলেই হত। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্, বুঝলে যুম্‌নি ? এই চালাটার তলায় বসে থাকি। গরমকালের রাত, দেখতে দেখতে পুইয়ে যাবে। ভোরবেলা হেঁটেই চলে যাব।

যুম্‌নি বললে, রাত্তির হলে এখানে বন-শুয়োর আসে, বাবু। হাটতলা কিনা।

চমকে উঠল সুশীল, এবং পলকের মধ্যে সমগ্র অন্ধকার বিশ্বচরাচর সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে এল। প্রশ্ন করল, তুমি কী করে জানলে, যুম্‌নি ?

এখানে যে আমি আসি-যাই। আমার চেনা লোক আছে। বাবু, একটা কথা বাখবে ?

কী বলো ?

একটু থতিয়ে যুম্‌নি বললে, রাত্তিরে তুমি যেতে পারবে না, এখানেও বসে থাকতে পারবে না। বেণী মোড়লের ওখানে যদি বাতটা থেকে যাও—কাল সকালে হেঁটেই যেতে পারবে।

বেশ তো, ভাল কথা !

কিন্তু ওখানে আমাব ইজ্জত আছে, বাবু। এ চেহারায় যাব না।

তাহলে কী করবে ?—মুখ তুলে সুশীল তাকাল।

যুম্‌নি বললে, তোমার ব্যাগের মধ্যে তখন কাপড় দেখেছিলুম, আমাকে দেবে একখানা ?

সুশীল কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। পরে বললে, আমার স্ত্রীর জন্যে খান-দুই নতুন শাড়ি ওর মধ্যে আছে বটে। তবে হ্যাঁ, তোমার একখানা দরকার বৈকি। জামাও একটা দিতে হয় ! বেশ, দিচ্ছি নাও।

সুশীল একখানা রঙিন শাড়ি ও জামা বার করে যুম্‌নির হাতে দিল। খুশি হয়ে যুম্‌নি বললে, তুমি একটুখানি বোসো বাবু, আমি এখুনি আসছি।

হাটতলা থেকে বেরিয়ে যুম্‌নি হনহন করে একদিকে চলে গেল। সামনে বন-বাদাড়, অদূরে মস্ত বাঁশঝাড়, —সমস্ত মিলিয়েই যেন বন-শুয়োরের আতঙ্ক। সুশীল কাঠ হয়ে বসে রইল। মেয়েটা তার সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক আদায় করে নিয়ে পালিয়ে গেল কিনা—ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু একাকী অন্ধকারে অজানা গ্রামের জীর্ণ হাটতলায় বসে ভীতচক্ষে সুশীল পাথবের টুকরোর মতো স্থির হয়ে রইল।

অন্তত ঘন্টাখানেক হবে। অদৃষ্টের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সুশীল অপরিসীম নৈরাশ্য

নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, এমন সময় ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটল। যুম্‌নি এসে দাঁড়াল সামনে। আন্দাজে দেখা গেল, নতুন শাড়িখানা সে পরেছে, মাথার চুল ফিরিয়েছে,—চেহারাটা সম্পূর্ণ বদল করে নিয়েছে। এদিকে ঝড়-বৃষ্টিও থেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

সুশীল বললে, তোমার দেরি দেখে বড্ড দুর্ভাবনায় পড়েছিলুম। কোথায় যেন তখন রাতটা কাটাবার কথা বলছিল ?

যুম্‌নি বললে, হ্যাঁ বাবু,—আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি।

সুশীল এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। ব্যাগটা এক হাতে নিল, অন্য হাতে নিল জুতো-জোড়াটা।

যুম্‌নি বললে, তা কি হয় ? ওরা বলবে কি ? জুতোটা আমার হাতে দাও, বাবু।

বলতে বলতে সে জুতো-জোড়াটা হাত থেকে একপ্রকার কেড়েই নিল।

অতি সন্তর্পণে কয়েক পা অগ্রসর হতে দূরের পথে একটা আলো দেখা গেল। যুম্‌নির গতিভঙ্গিতে কোথায় যেন প্রবল একটা অস্বস্তিবোধ ছিল। উদ্বিগ্নকণ্ঠে সে বললে, ওই ওরা তোমাকে নিতে আসছে, বাবু। একটা কথা বলে রাখি, ওরা যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, তুমি যেন কোনও জবাব দিতে যেয়ো না। তোমার পায়ে পড়ি বাবু,—আমার ইজ্জত যেন না যায়। আমাকে চেনে সবাই। তুমি যেন কিছু মনে কোরো না। তোমারও ইজ্জত আমি রেখে চলব—দোহাই বাবু।

অন্ধকারে তার মুখ-চোখের ব্যাকুল চেহারাটা ঠাহর করা গেল না বটে, কিন্তু যুম্‌নির করুণ কণ্ঠের কাকুতি শুনে সুশীল থমকে দাঁড়াল। পরে বললে, ব্যাপার কী, যুম্‌নি ?

কিছু না বাবু, কিছু না। তোমাকে দেখে নানা কথা উঠবে কিনা, তাই আগে বলে রাখছি। তুমি কিছু জবাব দিয়ো না, এই আমার ভিক্ষে। ওদের কাছে আমার মান রেখো, বাবু। সে অনেক কথা, পরে তোমায় বলব।

ততক্ষণে আলো নিয়ে জন-দুই চাষি মেয়েছেলে এবং মোড়ল এগিয়ে এসেছে।—আশেপাশে ঘিরে রয়েছে পাঁচটি ছোট ছেলেমেয়ে।

মোড়ল কাছে এসে আলোটা তুলে ধরে বললে, তাই তো বটে, মিছে বলেনি। কপালটা তোর ভাল রে, যুম্‌নি ! আসুন বাবু, আসুন—ঘরে নিয়ে যা রে বৌ।

ওর মধ্যে একটা বউ এসে হাসিমুখে সুশীলের হাত ধরে আগুন পেরিয়ে একটি গোলপাতার ঘরের দাওয়ায় নিয়ে তুলল। একটা মেয়ে ঘটি করে আনল পা ধোবার জল। বুঝতে পারা গেল, এরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। একটা সোরগোল পড়ে গেল। বোধহয় এরই মধ্যে কোনও একটা কোণে রান্নার আয়োজন চলছে। দেখতে দেখতে সেই অন্ধকারে একটিমাত্র হারিকেনের ভরসায় আশেপাশে ক্ষুদ্র একটি জনতা জমে উঠল, এবং তাদেরই মাঝখান দিয়ে মূল্যবান শাড়ি এবং জামা পরে গৌরবগর্বিতা যুম্‌নি হাসি-হাসি মুখে চলাফেরা করতে লাগল।

সুশীল প্রথমটা হতচকিত হয়ে উঠেছিল। মনে ভয় ছিল, পাছে এই হট্টাগোলের মধ্যে তার হ্যাণ্ডব্যাগটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সেজন্য প্রথমেই সে পা ধুয়ে হ্যাণ্ডব্যাগটি নিয়ে সামনের ঘরে গিয়ে উঠল।

কলকাতার বাবু, সুতরাং উৎকণ্ঠা এবং আড়ষ্টতা ছিল আশেপাশে। সামনে কেউ আসছে না বটে, কিন্তু অন্ধকারে বহুকণ্ঠের ফিসফাস শোনা যাচ্ছে। একটু পরে ভিতরে এসে দাঁড়াল যুম্‌নি। সুশীল এবার ব্যাগটি খুলল। সন্দেশের মোড়কটি সামনেই ছিল এবং অনেকগুলিই আছে তার মধ্যে। সেটি বার করে সে বললে, আর কেন, এগুলো ওদের সবাইকে ভাগ করে দাওগে।

ব্যাগের ভিতরে একটা কালো রংয়ের কৌটো দেখে যুম্‌নি মৃদুগলায় হঠাৎ প্রশ্ন করল, ওর মধ্যে কী আছে ?

সুশীল বললে, ওতে ঠাকুমার জিনিস আছে। আমার একটি ছেলে হয়েছে, ঠাকুমা তাই তাঁর

নাতবৌকে কিছু গয়না পাঠিয়েছেন।

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল যুম্‌নির। বললে, দেখি না ?

মেয়েটাকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। সুশীল সেই কৌটা খুলল। ওর মধ্যে রয়েছে গলার, কানের, আর হাতের গহনা। যুম্‌নি বললে, আমাকে দাও, পরি—আবার দিয়ে দেব।

প্রতিবাদ কিছুমাত্র জানাবার আগে যুম্‌নি গয়নাগুলো নিয়ে পরতে লাগল। অবাকবিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে রইল সুশীল। অতঃপর গয়না পরে সন্দেশের মোড়কটি নিয়ে যুম্‌নি উঠে বাইরে চলে গেল, এবং ঘন্টাখানেকের মধ্যে আর তার সাড়া পাওয়া গেল না।

ডাল ভাত লাউঘন্ট ডিম সিদ্ধ—আর চাই কী। একটি চাষি-পরিবারের ঘরে এই তো রাজভোগ। পরিতুষ্টি সহকারে আহার শেষ করে সুশীল হাত ধুয়ে ঘরে উঠল। স্পষ্টকথা সুশীল কিছু বলছে না, এটি যুম্‌নির নিষেধ। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া প্রতারণায় ভরা, সুতরাং সুশীল যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বক্ষা করে ছিল। মোড়ল এসে ভয়ে ভয়ে গল্পসল্প করে গেল, কিন্তু এমন করে যুম্‌নি তার নিজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে যে, কোনটাই ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া গেল না। যুম্‌নি তার লোকসমাজের মধ্যে বসে বহু সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী বলে গেল। তার ইজ্জত, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, তার আশ্চর্য সৌভাগ্য—সমস্তটাই বিস্ময়কর। তার লজ্জাশীলতা, শোভন ভদ্র আচরণ তার গদ্‌গদ কণ্ঠের কাকলি, হাসিখুশি মুখ, বাঁকাচোখের কৌতুক চাহনি, তার মূল্যবান পরিচ্ছদ এবং স্বর্ণালঙ্কারের বিচিত্র কাহিনী,—এ সমস্তই মধ্য-রাত্রি অবধি জনসমাজকে অভিভূত ও মুগ্ধ করে রাখল। শুধু একটি বিচিত্র রাত্রি তার সম্মুখে—তার সমগ্র দুঃশীল দুর্গত ও দুর্নৈতিক জীবনের সকল গুপ্ত বাসনা একটি মাত্র রাত্রিতে সংহত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। এ মেয়ে সেই সারাদিনের পথচারিণী দরিদ্রা দুশ্চরিত্রা সমাজ-পরিত্যক্তা মেয়ে নয়, —এ অন্য মেয়ে।

যুম্‌নির কলঙ্ক হেঁটে বেড়িয়েছে চিরকাল এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। সুতরাং আজ তার নূতন সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করে নিতে লোকসমাজের অনেকটা সময় লাগল। হয়তো-বা রাত দুটোই বাজতে চলল। ফুঁ দিয়ে দিয়ে যেমন আগুন জিইয়ে রাখে, তেমনি করে যুম্‌নি তার নতুন-নতুন গল্প ফেঁদে সবাইকে জাগিয়ে রাখল। অবশেষে একে একে সকলকে বিদায় দিয়ে একসময় হারিকেনটি নিয়ে সে ঘরে এসে ঢুকল এবং দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

আলোটা কমানো ছিল, —কমানোই রইল। আন্দাজে সে বুঝল, অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে সুশীল কখন যেন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। অতি সন্তর্পণে যুম্‌নি ছোট জানলাটা খুলে দিল। হ্যাণ্ডব্যাগটি ছিল সামনে। যুম্‌নি আস্তে আস্তে সেটি খুলল, এবং সেই কৌটোটি বার করে গায়ের গয়নাগুলি নিয়ে একে একে তার ভিতর গুছিয়ে রাখল। অতঃপর তার নিজের যে ছিন্নভিন্ন ও ময়লা কাপড়খানা এতক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে নিয়েছিল, সেইখানা দিয়ে সে সুশীলের জুতো-জোড়াটা পরিষ্কার করে মুছল। তারপর সব কাজ একে একে সারতে অনেকটা সময় গেল বৈকি।

একসময় সে উঠল এবং দরজাটা অতি সন্তর্পণে খুলে দিল। ভিতরে হাওয়া আসুক, নিদ্রিত রাজকুমারের কপালে ঘামের ফোঁটা না জমে ওঠে। না, ভিতরে-বাইরে এখন আর কেউ জেগে নেই। কিন্তু আজকের এই নিশুতি রাত্রে যুম্‌নি আর লোভ সামলাতে পারল না। হারিকেনটা সামান্য একটু বাড়িয়ে সে তক্তার ধারে এসে সুশীলের মাথার দিকে দাঁড়াল। দেখল ভাল করে তরুণ যুবককে। এতকাল ধরে অনেক পুরুষমানুষকে সে দেখে এসেছে, —কিন্তু সারাদিন যাবৎ একান্ত কাছে-কাছে থেকেও যে ব্যক্তির দিকে মুখ তুলে সে একটিবারও ভাল করে তাকায়নি, এখন তার ঘুমন্ত মুখখানা যুম্‌নি ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। না, এ ভিন্ন ব্যক্তি। এ পুরুষ যুম্‌নির পরিচিত সংসারের থেকে পৃথক। একে সে আগে কখনও দেখেনি। সবাই মিলে তাকে বলেছে পরম সৌভাগ্যবতী। কিন্তু

সে মিথ্যে। একান্ত প্রতারণা। ভয়ানক ফাঁকি। দেখতে দেখতে নিজের প্রতি তার একটা আক্রোশ ধকধক করতে লাগল এবং কালবৈশাখীর মতোই যুম্নির বাকা চাহনি একবার জ্বলে উঠল। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তারপর দেখতে দেখতেই তার সেই রুক্ষ রক্তিম দৃষ্টির ভিতর থেকে ঝরঝরিয়ে জল নেমে সৃষ্টি-স্থিতি সৌরবিশ্ব প্লাবিত ও একাকার করে দিল।

যুম্নি কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল বলা যায় না। একসময়ে আলোটা নিয়ে সে বাইরে এসে দাওয়ার ধারে বসল এবং বারংবার তার অবাধ্য চোখ দুটো মুছতে লাগল। রাত সাঁ-সাঁ করছিল।

যুম্নি জানে, আকাশের শেষরাত্রির লক্ষণ কখন প্রকাশ পায়। একসময় সে উঠল। তারপর ঘরে ঢুকে চৌকির কাছে গিয়ে চাপাকণ্ঠে ডাকল, বাবু—ওগো বাবু—উঠে পড়ো। এখনই বেরোতে হবে। রাত আর বাকি নেই। তৈরি হয়ে নাও।

সুশীল ঘুম চোখে ধড়মড়িয়ে উঠল। চোখ রগড়ে বললে, হ্যাঁ, যেতে হবে ! চলো,—কিন্তু বড্ড গা ব্যথা,—তা যেতে হবে বৈকি !

তাড়াতাড়ি উঠে জামাটা গায়ে চড়িয়ে সুশীল বললে, এখনও যে অন্ধকার রয়েছে, যুম্নি ! পথ দেখতে পাব তো ?

যুম্নি বললে, হ্যাঁ পাবে। আমিও যে যাব সঙ্গে, পৌঁছে দেব। এখনই ভোর হবে, ঠাণ্ডায়-ঠাণ্ডায় চলে যাবে। তোমার সব গয়না রেখে দিয়েছি কৌটোয়। দেখে মিলিয়ে নাও।—হ্যাঁ, আরেকটা কথা। গোটা চারেক টাকা আমার হাতে দাও তো ? ওদের দিয়ে যাব। তুমি খরচ করতেই তো বেরিয়েছ, পরের ভাত খাবে কেন ? ওতে তোমার আর আমার দুজনেরই মান বাঁচবে।

দ্রুতহস্তে সুশীল চারটি টাকা বার করে দিল। সেই টাকা নিয়ে যুম্নি ছুটে গেল দাওয়া থেকে নেমে আরেকখানা ঘরে। একটি ঘুমন্ত বৌকে মেঝের উপর থেকে টেনে জাগিয়ে তুলল। তারপর তার হাতে চারটি টাকা দিয়ে বললে, আমরা এবার যাচ্ছি রে। মোড়ল উঠলে টাকাটা ওর হাতে দিস ভাই—

বৌটা বাইরে এসে দাঁড়াল। ব্যাগটি হাতে নিয়ে জুতোটা পায়ে দিয়ে সুশীল বেরিয়ে এল। হারিকেনটা টিপটিপ করছে। যুম্নি ওই বৌটির কাছে হাসিমুখে বিদায় নিল, এবং মাথায় একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে সুশীলের দিকে ফিরে বললে, এসো—

দুজনে হনহনিয়ে চলল কুমোরপাড়া ছাড়িয়ে হাটতলা পেরিয়ে অনেক দূর। অন্ধকার গ্রামটি পিছনে ফেলে দুজনে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু বৌটি দাঁড়িয়ে রইল একদৃষ্টে ওদের পথের দিকে তাকিয়ে । আকাশ ধীরে ধীরে ফরসা হল। ঊষাকাল এসে দাঁড়াল। অতঃপর দেখতে দেখতে লোকজন এসে আবার ভিড় করল গতরাত্রির কাহিনী শোনার জন্য।

যত বেলা বাড়ে ততই চতুর্দিকে সাড়া পড়ে যায়। যুম্নিকে সবাই চেনে। সেই কারণে অপরিসীম কৌতূহল সকলের মুখে চোখে। চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেছে সবাই, কিন্তু তবুও বিশ্বাস করতে বাধে।

কিন্তু যাদের নিয়ে এত হৈ-চৈ তারা তখন চলে গেছে অনেক দূর পথ। বেলা আটটার মধ্যে তারা মাইল পাঁচেক পথ পেরিয়ে প্রায় শামুতার কাছাকাছি এসে গেছে। নদীর ঘাট দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে শামুতার সেই বিশাল বটবৃক্ষের বনস্পতি। দূরে কাছারির চালাঘরের করোগেটে রোদ পড়ে চকচক করছে। শিব-মন্দিরের মাথাটা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে চৌধুরীদের মস্ত বাড়ির একাংশ।

সুশীল এবার দ্রুতপদে চলেছে। ঘাটে পা ধুয়ে সে জুতো পরবে, চিরুনি বার করে মাথাটা আঁচড়ে নেবে। কাছা-কোঁচাটাও শ্বশুরবাড়ির উপযুক্ত করে গুছিয়ে পরবে।

যুম্নি পিছু পিছু আসছে। এবার তার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। চৌধুরীদের বাড়িখানা ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে সে চলে যাবে নিজের পথে। যাবে সে ধানকলে কাজ নেবার জন্য।

বাঁশবাগানটা পেরিয়ে সুশীল একবার থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। তার মন খারাপ লাগছে।

অন্তত গোটা দশেক টাকা যুম্‌নির হাতে গছিয়ে দিতে না পারলে তার স্বস্তি হচ্ছে না। পথের অসুবিধা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনই হোক, মেয়েটা তাকে নিরাপদে এনে পৌঁছিয়ে দিল, এর কৃতজ্ঞতা কম নয়।

যুম্‌নি বোধকরি অনেক পিছিয়ে পড়েছিল, বনবাগান ছাড়িয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে না। সুশীল সেখানেই অপেক্ষা করে রইল। আব কিছু নয়, শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে গত চব্বিশ ঘন্টার কাহিনী সবিস্তারে সে বলবে বটে, তবে গতরাত্রিব গল্পটা যথাযথ-ভাবে বলা সঙ্গত হবে কিনা সেটা বিবেচনার বিষয়।

হঠাৎ বেবিয়ে পড়ল যুম্‌নি বাঁশবাগানের ভিতর থেকে। আড়ালে গিয়ে সে এতক্ষণে তার পরনের মূল্যবান শাড়ি আর রেশমি জামা ছেড়ে আগেকার সেই শতছিন্ন মলিন কাপড়খানা পরে নিয়েছে। এবার যেন তাকে কিছু প্রসন্ন মনে হচ্ছে।

ও কি করলে, যুম্‌নি ?

হাসিমুখে যুম্‌নি বললে, দশ মিনিট সময় আমাকে দাও। ঘাট থেকে এ দুটো কেচে শুকিয়ে নিয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নাও। হাওয়ায়-রোদ্দুরে কাপড়-জামা এখুনি শুকিয়ে যাবে।

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, সে কি কথা ! লোভ তোমার কিছুতে নেই জানি, কিন্তু ও-দুটো জামা-কাপড় আমি আর ফেরত চাইনে, যুম্‌নি—ও তোমারই রইল।

তোমার বউয়ের জিনিস আমি নেব কেন ?

তুমি হাসালে, যুম্‌নি। ও যে নতুন জামা-কাপড় ! তিনি তো এখনও চোখেই দেখেননি ! সুশীল এবার যেন একটু মিনতি জানিয়েই বললে, আমার একটা কথা রাখো, যুম্‌নি। তুমি কিছুই নিলে না, অথচ দুদিন ধরে আমার জন্যে এত কষ্ট করে গেলে, এ যখনই ভাবব, আমার বড্ড মন খারাপ হবে। ওই সঙ্গে গোটা দশেক টাকাও তুমি রেখে দাও, যুম্‌নি। তোমার কাজে লেগে যাবে।

এক চাপা রুক্ষতা আবার এসে পড়ল যুম্‌নির দৃষ্টিতে। সে-চক্ষু প্রখর সন্দেহ নেই। ফস্ করে ঈষৎ কর্কশকণ্ঠেই সে বললে, টাকা দিয়ে বুঝি আমার দুঃখু ঘোচাতে চাও ? বড়লোকরা বড্ড টাকা দেখায়।

সুশীল একটু চমকে চুপ করে গেল। বললে, আচ্ছা—আচ্ছা যাক্। আমারই ভুল হয়েছে ! কিছু মনে কোরো না, যুম্‌নি।

যুম্‌নি বললে, বেশ, তুমি যখন বললে এত করে,—এ দুটো আমি নিয়েই যাচ্ছি। ওই যে চৌধুরীদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে ! গাজনতলাটা ঘুরে গেলেই রাস্তা পাবে। এদিক দিয়ে যাও।

হ্যাঁ, এবার চিনতে পেরেছি। আসি তবে। তোমার কাছে অনেক ঋণ আমার রইল, যুম্‌নি।

ব্যাগটা হতে নিয়ে সুশীল অগ্রসর হল। পিছন ফিরে তাকাতে কি জানি কেন তার আর সাহস হল না। পথের বাঁক ফিরে সে হনহন করে চলে গেল।

যুম্‌নি বসল সেইখানে। নতুন কাপড় আর জামা নিয়ে সে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করতে লাগল। মুখেচোখে তার খুশি অথবা আনন্দের আভাস মাত্রও ছিল না। বরং বিরক্তি অশ্রদ্ধা ও আক্রোশে তার মুখের চেহারাটা কঠিন হয়ে রইল।

জামাই এসেছে ঘরে—দিন তিনেক ধরে চৌধুরীবাড়িতে আনন্দের সীমা ছিল না। চতুর্থ দিনে সবাইকে নিরানন্দে ভাসিয়ে কন্যা ও জামাতা বাবাজী নৌকায় উঠল। সঙ্গে চলল দু-মাসের কচি শিশুপুত্র, দুজন ঝি-চাকর, একজন চাপরাশি ও সরকারমশাই। সালঙ্কারা সুবেশা বধূ স্বামীর সঙ্গে চলল শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়।

শাম্‌তা গ্রাম ভেঙে পড়েছিল ঘাটে।

নৌকা চলল ঘাট পেরিয়ে আঘাটার পাশ দিয়ে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে ওই আঘাটার পাশেও লোক জমায়েত হয়েছিল। তবে সেটা অন্য কারণে।

সরকারমশাই বললেন, ওদিকে তাকাবেন না জামাইবাবু, ওতে দিদিমণির অকল্যাণ হবে। ও

একটা দুর্ঘটনা।

সুশীল প্রশ্ন করল, কী হয়েছে ওখানে ?

কে একটা মেয়ে ডুবে মরেছে কাল ঝড়বৃষ্টির সময় সন্ধেবেলা। কাদের মেয়ে কেউ জানে না। তবে পরনে দামি শাড়ি আর গায়ে রেশমি জামা ছিল। কিন্তু শেয়াল আর কিছু রাখেনি। মুখ-চোখ-গা সব খুবলে খেয়েছে ! দুর্গা দুর্গা—

সুশীলের মুখ দিয়ে কোনও কথা ফুটল না।—যুম্‌নি বোধহয় জানত, তিন দিন পরে এই নদীপথ দিয়েই ভাটির টানে সুশীলের নৌকা যাবে।

নওরঙ্গী

পত্রলেখার বাবা

সতীনাথ ভাদুড়ী

দোলগোবিন্দবাবুর বাড়ির আড্ডায় চেঁচামেচি নাই, হইচই নাই, কথা কাটাকাটি নাই। কথাবার্তাগুলো হয় থেমে থেমে। অতি সংক্ষেপে। একটু একজন বলে, বাকিটা সবাই বুঝে নেয়। সবটা কোনও কথার বলতে হয় না। যে রকম গল্পর সবটা করা যায়, সেসব গল্পে এ আসরের লোকের উৎসাহ নাই। রুচির মিলের জন্যই, তিনচারজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই আড্ডাটা টিকে আছে।

রাস্তার ওদিককার বাড়িতে সেতার বাজানো আরম্ভ হ'ল।

"শুরু হ'ল !"

"হ্যা-আ।"

দোলগোবিন্দবাবু বললেন—"যেতে দাও। কী দরকার ওসব কথায়।"

ওই বাড়ির কর্তা নতুন বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলেরা বড় হয়েছে। তাদের বন্ধুবান্ধবরা ওই বাড়িতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় গানের আসর বসায়, এ জিনিস এঁদের চোখে খারাপ লাগে। সেইটা ওঁরা প্রকাশ করলেন ওই তিনটি বাক্যে।

আবার সবাই নীরব—যতক্ষণ না আর একটা নূতন বিষয়ের উপর কথা ওঠে।

নীরবতা ভাঙ্গল সাইকেলের ঘন্টার শব্দ শুনে।

"ন্যাপলা আসছে।"

"হ্যা-অ্যা-অ্যা !"

দোলগোবিন্দবাবুর মুখচোখে একটু উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল।

"এ বাড়ির কাছাকাছি এসে ও সাইকেলের ঘন্টা বাজাবেই বাজাবে।"

"হ্যা-অ্যা।"

ঠিকই নেপাল। সাইকেলখানাকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে সে সোজা ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর। বেরিয়ে এল খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে।

"কাগজে কোনও খবরটবর আছে নাকি হে নেপাল ?"

"তাই দেখছি।"

গভীর মনোযোগে সে খবরের কাগজ পড়ছে দেখে সকলে অবাক হয়।... ব্যাপার কি ?

দোলগোবিন্দবাবু কিন্তু একবারও নেপালের দিকে তাকাননি।

আবার মিনিট দুয়েক সকলে চুপচাপ।

রাস্তার দিক থেকে 'টর্চ'-এর আলো পড়ল। কারা যেন আসছে।

"ও আবার কারা ?"

"অনুপ আর পত্রলেখা হবে বোধ হয়।"

"পত্রলেখা বাড়িতে ছিল না ? তাই বলো !"

মদনবাবু বেফাঁস কথাটাকে সামলে নিলেন—"তাই আজ চা পাওয়া যায়নি এখনও।"

"এত রাত করে গিয়েছিল কোথায় ?"

"নীলমণিবাবুর বাড়িতে আটকৌড়ে ছিল যে। ওঁর মেয়ের ছেলে হয়েছে জানো না ?"

নীলমণিবাবুর বাড়ির চাকর পত্রলেখাদের পৌঁছে দিতে এসেছে। হাতের ধামিতে আটকৌড়ের মুড়িমুড়কি আর জিলিপি।

"আটকৌড়ের খুব ঘটা দেখছি।"

"হ্যা-অ্যা।"

অনুপ দেখাল, তার হাফপ্যান্টের দুই পকেটেই মুড়ি-কড়াই ভাজায় ভরা।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোরই তো ছিল আসল নেমতন্ন। দিদি তো পেটুকের মতো তোরই পিছনে পিছনে গিয়েছে।"

"সে আর বলতে হয় না। আমাকে ডাকতে এসেছে তবে গিয়েছি। নইলে আমার দায় পড়েছিল। জিজ্ঞাসা করুন বাবাকে।"

"তোকে ডাকতে এসেছিল, সেও ভাইয়ের খাতিরে। নইলে আটকৌড়ের কুলো পেটাবার জন্য মেয়েদের আবার ডাকে নাকি।"

"আচ্ছা বেশ, আমি পেটুক। হ'ল তো ?"

"এই রে পত্রলেখা চটেছে। আরে তোকে চটালে কি আমাদের চলে। এই দ্যাখ্না, তুই আজ ছিলি না, তাই আমরা এখনও চা পাইনি।"

"এই নিয়ে এলাম ব'লে।"

পত্রলেখা বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল হাসতে হাসতে।

"এই সেদিন বিয়ে হ'ল না নীলমণিবাবুর মেয়ের ?" একটু চাপা গলা মাধববাবুর। নেপাল কাছেই রয়েছে। ছেলেমানুষদের সম্মুখে এসব কথা যত না বলা যায় তত ভাল। তবে হ্যাঁ, নেপাল আর এখন ছেলেমানুষ নাই। এই মাস থেকে কলেক্টরিতে 'কপিস্ট'-এর কাজ পেয়েছে। চাকরি বাকরিতে ঢুকলেই ছোটরা বড়দের সঙ্গে সমান হবার অধিকার পায়। তবুও প্রথম প্রথম একটু বাধে। কাল প্রথম দোলগোবিন্দবাবু নেপালকে একটা গোপন কাজের ভার দিয়ে, তার বড় হবার অধিকারের সুনিশ্চিত স্বীকৃতি দিয়েছেন। সে খবর আড্ডার অন্য বন্ধুদের জানা নেই, তাই তাঁরা গলার স্বর একটু নামিয়ে কথা বলছেন। কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ। নেপাল গভীর মনোযোগের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ছে।

"শ্রাবণ মাসে।"

"হ্যা-অ্যা।"

"আর আজকে হ'ল এ মাসের তেইশে।"

"হ্যাঁ।"

আঙুলের কর গোনা শেষ হ'লে দোলগোবিন্দবাবু বললেন—"যাকগে, যেতে দাও ওসব কথা।"

সকলেই দোলগোবিন্দবাবুর এ স্বভাবের কথা জানে। পরকুৎসা শোনবার আগ্রহ তাঁরই বোধহয়

দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। শাঁসটুকু নিয়ে ছিবড়েটাকে যথাসময়ে বাদ দিয়ে দিতে তিনি জানেন। তাই আসল কথাটা শোনা হয়ে গেলে, তিনি মৃদু আপত্তি তুলে বলেন—"থাক, থাক,—কী দরকার আমাদের এইসব পরের কথার মধ্যে থাকবার।"

তাঁর এই বারণ কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তবু এই কম-কথার আড্ডাটা আপন নিয়মে কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে যায়।

ভিতর থেকে পত্রলেখা সকলের জন্য আটকৌড়ের মুড়ি-কড়াই ভাজা নিয়ে এল।

"দেখুন কাকা, কে পেটুক—আমি না আপনারা।"

"আরে তোকে কি কখনও আমরা পেটুক বলতে পারি। তা হ'লে তো আমাদের চা-ই দিবি না আজ।"

"মা চা ঢালছে। এই এনে দিলাম ব'লে। নেপালদা, তুমি হুট করে চলে যেও না যেন রাগ করে। তোমার মুড়ি নিয়ে আসছি। হাত তো আমার মোটে দুখানা। একসঙ্গে কতগুলো বাটি আনব?"

"পত্রলেখা, একটি লঙ্কা আনিস তো মা আসবার সময়।"

"আচ্ছা, কাকা।"

তাঁর বন্ধুরা কেমন অনায়াসে মেয়েদের মা ব'লে সম্বোধন করেন, দেখে দোলগোবিন্দবাবু অবাক হয়ে যান। তিনি তো চেষ্টা করেও পারেন না। বাধো বাধো ঠেকে। একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। পত্রলেখা নামটা যা বড়— অনেক সময় যেন মনেই পড়তে চায় না। মা মা বলে ডাকতে পারলে সুবিধা ছিল। পত্রলেখার অন্য কোনও ছোট ডাকনাম দেবারও উপায় নাই ; স্ত্রীর কড়া হুকুম মেয়েকে পত্রলেখা বলেই ডাকতে হবে। তিনি নিজে এই পাড়ারই মেয়ে—ডাকনামেই আজও পরিচিত—ভাল নামটা কেউ জানে না—ডাকনামটা আবার বিশেষ ভাল নয়—তাই পত্রলেখার নাম সম্বন্ধে তাঁর এত সতর্কতা। পত্রলেখা নামটায় দোলগোবিন্দবাবুর প্রথম থেকে আপত্তি। বলেছিলেন যে, যদি লেখা দেওয়া নামই রাখতে হয় তবে সুলেখা, বা চিত্রলেখা রাখো না কেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছে কী তাঁর কোনও কথা খাটে। যে কথা একবার মুখ থেকে বার হবে, তার আর নড়চড় হবার জো নাই। পাড়ার মেয়ে—ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন তো তাকে। আর যার নিজের নাম দোলগোবিন্দ তার কি পত্রলেখা নামটাকে বড় বলবার মুখ আছে?

কথার খই ফুটোতে ফুটোতে পত্রলেখা চা দিয়ে গেল।

"এবার তুমি পড়তে বসগে যাও পত্রলেখা।"

"ও কি হে নেপাল, তুমি যে একগাল করে মুড়ির সঙ্গে এক চুমুক করে চা খাচ্ছ। মুড়ির মুচমুচে ভাবটা চা দিয়ে নষ্ট করে লাভ কী?"

"আমার তাই ভাল লাগে।"

"হ্যা-অ্যা। আপ রুচি খানা।"

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন পাড়ার ইউনিভার্সাল মাসিমা। এঁর জিভের ধার আছে। আর কোনও খবর ইনি এগারটার সময় শুনলে, সে খবর এগারটা বেজে দশ মিনিটের মধ্যে পাড়ার সব বাড়িতে অবধারিত পৌঁছে যাবে, এইরকম একটা খ্যাতি তাঁর আছে এখানে।

"কিসের গল্প হচ্ছে ছেলেদের?"

"ও আপনি এখানে ছিলেন? হচ্ছে এইসব হাবিজাবি কথা। আচ্ছা, চা দিয়ে ভিজিয়ে নিলে মুড়ি চিঁড়ে ভাজার মুচমুচে ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় না?"

"দাঁতই নেই, তার আবার মুড়ি খাওয়া। সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আমার এখন। তবে যেকালে খেতাম তখন মুড়ির সঙ্গে শশা খেতে আমার ভালই লাগত। মুড়ির মুড়মুড়ে ভাবটা শশার জন্য নষ্ট হয়ে যেত বলে তো বোধ হয় না।"

"তা হ'লে দেখছি নেপালেরই জিৎ।"

"হ্যা-অ্যা, ওরই জয়জয়কার আজকাল।"

"শুনতে পাচ্ছি তো তাই। আচ্ছা, আমি এখন চলি।"

"বড় তাড়াতাড়ি চললেন?"

"এসেছি কি এখন? জপসন্ধ্যা আমার এখনও বাকি।"

"আরে দাঁড়ান দাঁড়ান। এই অন্ধকারে একা যাবেন কী। নেপালের চা খাওয়া শেষ হল বলে। ও পৌঁছে দিয়ে আসুক আপনাকে।"

"না না, ও এখন অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে চা খাবে। কি বলিস নেপাল? আমার আবার কোথাও যাবার জন্য লোক লাগে নাকি? কাশী বৃন্দাবন সেরে এলাম একা , এ পাড়া থেকে ও পাড়া যেতে লোক লাগবে সঙ্গে?"

"না না। নেপাল সঙ্গে যাক।"

"ও বেচারা এসেছে খবরের কাগজ পড়তে— তোমরা ওকে জোর কবে পাঠাবে ফোকলা দিদিমার সঙ্গে।"

"ও কাগজ ওর পড়া। এখন এমনি নাড়াচাড়া করছে।"

"হ্যা-অ্যা, রিভাইজ করছে।"

"ইংরাজি করে আবার কী বলা হল? এসব কি আমরা বুঝি। ওসব বুঝবে পত্রলেখার মতো আজকালকার ইংরিজি পড়া মেয়েরা। আচ্ছা আমি চলি। নেপাল তুমি খববের কাগজ পড়ো।"

"পড়া না হয়ে থাকে, কাগজখানা বাড়িতেও তো নিয়ে যেতে পারে।"

"হ্যা-অ্যা।"

এতক্ষণে নেপাল কথা বলল। আর চলে না চুপ করে থাকা।

"আমার কাগজ-পড়া হয়ে গিয়েছে। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।"

"দাঁড়ান দাঁড়ান মাসিমা। একটা কথা। নীলমণিদার নাতি দেখতে গিয়েছিলেন তো? কেমন হয়েছে?"

"দিব্বি বড়-সড় ছেলে।"

প্রশ্ন ও উত্তর দুইই চাপা গলায়। দুইই অর্থপূর্ণ। এর চেয়ে সংক্ষেপে বলা যেত না।

"থাক্ থাক্ ; যেতে দাও, দরকার কী ওসব পরের বাড়ির কথায়।"

নেপাল খবরের কাগজখানা সযত্নে ভাঁজ করছে।

বাড়ির ভিতর থেকে দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর চিৎকার শোনা গেল—"চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড় পত্রলেখা। অঙ্ক-টঙ্ক এখন নয়। ওসব চালাকি আমি ঢের বুঝি, বুঝলি।"

"এতক্ষণে শক্ত পাল্লায় পড়েছে পত্রলেখা।"

"হ্যা-অ্যা।"

পত্রলেখা জোরে জোরে ইতিহাস পড়া আরম্ভ করেছে।

"বাপের নাম দোলগোবিন্দ, মায়ের নাম খেঁদি, মেয়ের নাম হল কিনা পত্রলেখা। হেসে বাঁচি না। নেপাল, আর কেন—চল্ এবার আমরা যাই। তোর ' রকার ৎ.কে তো আবার না হয় ফিরে আসিস এখানে, আমাকে পৌঁছে দিয়ে।"

"হ্যা-অ্যা।"

"না না না—আমি আর আসব না—ওই দিক দিয়েই বাড়ি চলে যাব।"

বেশ জোরর সঙ্গে বলা। বোঝা গেল যে এতক্ষণে নেপাল সত্যিসত্যিই মতস্থির করে ফেলেছে।

অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খবরের কাগজখানা দোলগোবিন্দবাবুর হাতে দিয়ে নেপাল বারান্দা

থেকে নেমে এল। তিনিও নিস্পৃহভাবে বাঁ-হাত বাড়িয়ে অকিঞ্চিৎকর জিনিসটাকে নিলেন। বুঝে গিয়েছেন তিনি, কাগজখানা বাড়ির ভিতরে না রেখে নেপাল তাঁর হাতে দিল কেন। বুদ্ধিমান ছেলে নেপাল।····

কারও মুখে একটাও কথা নাই। মাসিমার গলার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, তারপর আর শোনা গেল না। নির্বাক আড্ডায় একজন পা দোলাচ্ছেন, একজন আঙুলের কর গুনছেন, একজন আঙুল মটকাচ্ছেন। এ সবই প্রত্যাশিত আচরণ, হিসাব করবার সময়ের। গুনে, হিসাব করে একটা সঠিক তারিখ বার করবার গুরু দায়িত্ব এখন এঁদের মাথায়। নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের তারিখটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, আর এখন এঁদের উপায় নাই। চুপ করে আছেন ব'লে যে এঁরা সময় নষ্ট করছেন তা নয়।

"সেটা ছিল উনিশে আগস্ট। ঠিক মনে পড়েছে।" তারিখের হিসাব মদনবাবুর সব সময় নির্ভুল। সেইজন্য কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করল না।

"যেতে দাও ওসব কথা।"

"হ্যা-অ্যা"।

এর চেয়ে বেশি কথা খরচ করতে কেউ রাজি না। বহুক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। দোলগোবিন্দবাবু নেপালের দেওয়া খবরের কাগজখানা হাত থেকে নামাননি, তখন থেকে। রোলারের মতো গোল করে পাকিয়ে নিয়েছেন কাগজখানাকে।

মনের কথা সঙ্গে সঙ্গে মুখে না প্রকাশ পেয়ে যায়, এ সংযম এঁদের প্রত্যেকেরই আছে। নীলমণিবাবুর মেয়ের বিয়ের সঠিক তারিখটা খুঁজে বার করবার মধ্যে অঙ্কের উত্তর মিলবার তৃপ্তি নাই। ওটা শুধু কৌতূহল জাগ্রত করবার প্রথম ধাপ। তার পরের প্রশ্ন, ও উত্তরটাই যে আসল। সেইটা আসছে— এইবার আসছে! এই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা অতি সংক্ষিপ্ত সারকথা খোঁজবার পালা এখন চলেছে। কার মুখ থেকে সেই কথার নির্যাসটা বার হবে প্রথম, তার এখনও ঠিক নাই। দোলগোবিন্দবাবু পা নাচাচ্ছেন। তিনি যখনই খুব বিচলিত হয়ে পড়েন তখনই এমনি করে পা নাচান। এই রকম অবস্থায়, তিনি অনেক সময় ভুলে পরনিন্দা করে ফেলেন।

তবে কি ছোট্ট টিপ্পনীটা, তাঁর মুখ থেকেই বার হবে? তাঁর অবিরাম পা-নাচানো লক্ষ্য করে বন্ধুরা সেই প্রত্যাশাই করছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল একেবারে অন্যরকম। অতিপরিচিত ভঙ্গিতে দোলগোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কটা বাজল?"

অবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ব্যাপার কী? সবে আজকের আড্ডাটা জমে আসছিল। বন্ধুরা জানেন যে, ওই প্রশ্ন, দোলগোবিন্দবাবুর নোটিশ—আড্ডা ভাঙবার। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্তই এ আড্ডার মেয়াদ। দোলগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর হুকুম। স্ত্রীর কথা না শুনে চলবার সাহস তাঁর নাই। শাসন বড় কড়া। পত্রলেখার পড়াশোনায় একটু মন কম ; তার লেখাপড়ার একটু দেখাশোনা না করলে গিন্নি রাগারাগি করেন।····"অঙ্ক না হয় তোমার মাথায় ঢোকে না ; অন্য বিষয়গুলো তো পড়াতে পারো। আর কিছু না হ'ক বানান-টানানগুলোও তো একটু দেখিয়ে দিতে পারো। না-ও যদি পড়াও, কাছাকাছি একটু বসে থাকলেও তো মেয়েটা নভেল নাটক না পড়ে পড়ার বইটই নাড়াচাড়া করে। মেয়েকে ঢুলতে দেখলে চোখে জলের ঝাপটাও তো দিয়ে আসতে বলতে পারো। আমি থাকি সে-ই রান্নাঘরে····"

এই সব মুখঝামটার ভয়ে সাড়ে আটটার সময় আড্ডা ভাঙতে হয় প্রতিদিন। খাওয়া রাত দশটায়। তার আগে কিছুতেই না—মরে গেলেও না। এই হচ্ছে পত্রলেখার মায়ের ব্যবস্থা।

এই সব ব্যবস্থার কথা দোলগোবিন্দবাবুর বন্ধুদের সকলেরই জানা। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, আজকে যেন সাড়ে আটটা বড় তাড়াতাড়ি বেজে গেল। অবশ্য তাঁদের কারও কাছেই ঘড়ি নাই—তবে একটা

আন্দাজ আছে তো সব জিনিসেরই। দোলগোবিন্দবাবু যেন একটু উসখুস করছেন। এ জিনিস বন্ধুদের নজর এড়ায় না।··· কেন?··· মেয়ের পরীক্ষার সময় এখন তো নয়। কোনও কথা না বলে বন্ধুরা উঠলেন। যাবার আগে দোলগোবিন্দবাবুর মুখচোখ আর একবার ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে গেলেন।

"হ্যা-অ্যা।"

শুধু এই কথাটা জুতো পরবার সময় একজনের মুখ থেকে অজ্ঞানতে বার হয়ে গেল।

এতক্ষণে দোলগোবিন্দবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের খবরের কাগজখানা খুলবার সময় পেলেন।··· ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। ছেলেটার বুদ্ধি আছে। পারবে। এ ছেলে পারবে। কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্বাস করা যায় এ সব ছেলেকে।··· এদের হাতে রাখতে পারলে লাভ আছে।

খবরের কাগজের ভাঁজের ভিতর, টাইপ করা চিঠি, আর একখানা খাম। খামের ঠিকানাটাও টাইপ করে লেখা··· এত তাড়াতাড়ির মধ্যেও ছেলেটার মাথায় বুদ্ধি খেলেছে খুব।···

টাইপ করবার জন্য, কাল রাত্রিতে নিজের লেখা খসড়াটা দিয়েছিলেন নেপালের কাছে। নেপাল ফৌজদারি আদালতে কপিস্ট-এর পদে বহাল হয়েছে নতুন। তার কাছে সব কথা খুলে বলেছিলেন। প্রথমে বুঝতে পারেনি নেপাল ব্যাপারটা। 'দশের উপকার', 'অপ্রিয় কর্তব্য', ইত্যাদি কথাগুলো দোলগোবিন্দবাবুর মতো অল্পকথার মানুষের মুখে শুনে প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা লেগে গিয়েছিল তার। তার উপর আবার ফিস-ফিস করে বলা। পর মুহূর্তে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আগাগোড়া জিনিসটা। গলা নামিয়ে সে বলে—"এ আর একটা শক্ত কাজ কী কাকাবাবু। কিছু ভাববেন না। মেসিন বাড়িতেও নিয়ে আসতে পারি যদি দরকার পড়ে তো। যখন যা দরকার লাগবে বলবেন কাকাবাবু।"

"না না আমার নিজের আবার দরকার কী। পাবলিকের উপকারের জন্যই এ কাজ কবা।"

"সে তো বটেই।"

এই হয়েছিল কালকের কথা। নেপাল পত্রলেখার বাবার আস্থাভাজন হতে পারবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল।

উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর সম্বন্ধে বেনামী চিঠি হাতে না লিখে, টাইপ করে পাঠানোই সব দিক বিবেচনা করে, যুক্তিযুক্ত। নিজের অফিসের মেসিনে টাইপ করা নিরাপদ নয়। তাই নেপালের সাহায্য নেবার দরকার হয়েছিল।

বেনামী চিঠি পাঠানো দোলগোবিন্দবাবুর পক্ষে নতুন না। এ তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যস্ত বিলাস। স্ত্রীপুরুষ নির্বিচারে কত বেনামী চিঠি যে তিনি আজ পর্যন্ত লিখেছেন তার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তাঁর এই কাজ সমাজের কল্যাণার্থে। কিন্তু মনে মনে জানেন কেন লেখেন। এর মধ্যে তিনি একটা অদ্ভুত আনন্দ পান। দুর্বার এর আকর্ষণ। পরকুৎসা করবার, বা শোনবার রসটা মিষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু এর তুলনায় পানসে। এটাকে শুধু আড়াল থেকে খুন-সুড়ি করে, মজা উপভোগ করা ভাবলে ভুল হবে। এ হচ্ছে ক্ষমতা-সচেতন মেঘনাদের, মেঘের আড়াল থেকে নিজের অস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা। শিকারের উপর বেনামী চিঠির প্রতিক্রিয়ার কথাটা কল্পনা করেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ ; সেটা নিজের চোখে দেখতে পেলে তো কথাই নাই। এই ঘন রসের নেশা তাঁর একদিনে গড়ে ওঠেনি। ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তিনি। প্রথম বয়সে স্কুলের পায়খানার দেওয়ালে লিখতেন। তারপর আরম্ভ করেছিলেন রাতদুপুরে শহরের দেওয়ালে আর ল্যাম্পপোস্টে কুৎসা-ভরা প্ল্যাকার্ড আঁটা। কিন্তু ও সবের স্বাদ কিছুদিনের মধ্যে ফিকে মনে হয়েছিল। ওর রস প্রচারে ; চটকদার কুৎসার কথাটা দশ জনে মিলে উপভোগ করে। কিন্তু বেনামী চিঠি দেবার আনন্দের জাত আলাদা ; একা উপভোগ করবার অধিকারের আমেজ অনেক বেশি গভীর। তাই তিনি ক্রমে ও সব ছেড়ে এই পথ ধরেন। এ পথে বিপদ-আপদও অপেক্ষাকৃত কম।

এই নিরাপত্তার দিকে চিরকাল তাঁর দৃষ্টি সজাগ। তাঁর বেনামী চিঠি দেবার কোনও কথা বন্ধুরাও জানেন না। কারও সঙ্গে তিনি কখনও আলোচনা করেননি এ সব কথা। কাউকে বিশ্বাস পাননি। ও সব বিষয়ে কখনও কোনও কথা উঠলে, তিনি চিরকাল একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতার ভাব দেখাতে অভ্যস্ত। জানেন এক শুধু তাঁর স্ত্রী—তাও সবটা নয়, কিছু কিছু। যত লুকিয়েই নেশা করো না কেন, স্ত্রীর কাছে কোনও না কোনও সময় সেটা ধরা পড়তে বাধ্য। চাবি-দেওয়া দেরাজের মধ্যে চিঠি লিখবার সরঞ্জাম, আর ডাকটিকিটের প্রাচুর্য দেখেই তাঁর স্ত্রীর মতো বুদ্ধিমতী মহিলা হয়তো অন্য একটা মনগড়া মানে করে নিতেন। তাই তিনি তাঁর সমাজসেবার নিজস্ব ধারার কথাটা স্ত্রীকে জানিয়ে দলে টানতে চেষ্টা করেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা হল। বেনামী চিঠিও আবার নানরকমের আছে তো। দরকার পড়েছিল সেদিন একখানা মেয়েমানুষের হাতে-লেখা বেনামী চিঠির। উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্ত্রীকে বলতেই দেখা গেল যে, এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও তৎপরতা প্রচুর। একবার জিজ্ঞাসাও করেননি এ কাজে কোনও বিপদ আছে কিনা। সম্মতিজ্ঞাপক মৃদু আপত্তি জানিয়ে, পরার্থে, গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে, স্বামীর দেওয়া 'ডিক্টেশন' লিখেছিলেন। লেখা শেষ হলে রসিকতা করে বলেছিলেন—"পাড়ার মধ্যে হয়েছিল বিয়ে আমাদের। বরের চিঠিও কোনদিন পাইনি ; বরকে চিঠি লেখবার সুযোগও কোনদিন হয়নি। চিঠি লেখার পাটই আমার নাই। যাক ফাঁকি দিয়ে সুযোগ পেয়ে গেলাম জীবনে প্রেমপত্র লিখবার।"

আর গুণের মধ্যে বেনামী চিঠির কথা পাড়ার অন্য কারও কাছে বলে না ফেলবার মতো বুদ্ধি আছে তাঁর স্ত্রীর।

এখন কথা হচ্ছে যে, নেপালটারও সুবুদ্ধি আছে কিনা। নেপালকে বিশ্বাস করে তিনি ভুল করলেন কিনা সেই কথাটাই কালকে থেকে তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। তবে আজকে খানিক আগেই নিজের আচরণে নেপাল যা দেখিয়েছে তাতে মনে হয় তাকে বিশ্বাস করতে পারা যায়।

যাক সে সব যা হবার তা তো হয়েইছে। এখন তাঁর হাতে অনেক কাজ। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী সংক্রান্ত টাইপকরা চিঠিখানা দেখেশুনে এখনই ঠিকঠাক করে রাখতে হবে ; নইলে ভোরে উঠে মাইল চারেক দূরের ডাকবাক্সে চিঠিখানা ফেলে আসতে পারবেন কী করে। এ পাড়ার পোস্ট অফিসের ছাপ চিঠিখানার উপর কোনও মতেই পড়তে দেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আবার একটা নতুন কাজ হাতে এসে পড়ল হঠাৎ, আজকের সান্ধ্য আড্ডার গল্প থেকে। নীলমণিবাবুর মেয়ের 'কেসটা'। এই রকমই হয় ; কোনও দিক থেকে যে কখন কাজের বোঝা মাথায় এসে পড়ে তার কী ঠিক আছে! যখন আসে, তখন যেন অনেকগুলো একসঙ্গে হুড়মুড় করে এসে পড়ে—এ তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন। এখন নীলমণিবাবুর নামে একখানা বেনামী চিঠি ছাড়তেই হয়। নতুন জামাই-এর কাছে এখন নয়। সে সব হবে পরে দরকার বুঝলে—একটা সতর্কবাণীর মধ্যে দিয়ে। এখন শুধু নীলমণিবাবুকে দিতে হবে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত। প্রথম চিঠিতে তার চেয়ে বেশি কিছু দেবার প্রয়োজন হবে না। একসঙ্গে বেশি না। নিংড়ে নিংড়ে একটু একটু করে এসব আনন্দের রস নিতে হয়। কোণঠাসা প্রাণীটা এখন সম্পূর্ণ তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। আঘাত খাওয়ার পর আহত শিকারটার চোখের মণিদুটোকে তাঁর বড় দেখতে ইচ্ছা করে ; ভয়ার্ত বুকের অসহায় স্পন্দন আঙুলের ডগায় নিতে ইচ্ছা করে।··· জামাইএর চিঠিখানাও এখনই দিয়ে দিলে কেমন হয়? ··· কিন্তু ঠিকানা যে জানা নাই। মদনবাবুর এসব মুখস্থ। কথায় কথায় জেনে নিলেই হত আজ। বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।····

দোলগোবিন্দবাবু উঠলেন, ঘরের ভিতর যাবার জন্য। পত্রলেখা ছুটে আসছিল এই দিকেই—হাতে বই।

"নেপালদা। এ কী নেপালদা চলে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ, সে তো মাসিমার সঙ্গে গেল। কেন রে?"

"লাইব্রেরির বইখানা আজ ফেরত দেবে বলেছিল।"

নেপালই নিয়মিত লাইব্রেরি থেকে বই এনে দেয় এ বাড়িতে।

"যাক কালকে ফেরত দিলেই হবে। বইখানা দে তো দেখি একবার।"

"এ বই তোমার পড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।"

"না, সেজন্য চাচ্ছি না। বইখানা বেশ লম্বা সাইজের আছে। দুচারখানা অফিসের চিঠি লিখতে হবে ; ওই বইখানার উপর কাগজ রেখে লিখবার বেশ সুবিধা।"

"দাঁড়াও, আমি বড় প্যাডখানা এনে দিচ্ছি।"

"না না, এতেই হবে। তুই শীগগির পড়তে বসগে যা। নইলে তোর মা এখনই আবার বকাবকি আরম্ভ করবে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বি, বুঝলি। আর তোর কলমটা দিয়ে যাস তো।"

এ সব কাজে নিজের কলম ব্যবহার না করে অপরের কলম ব্যবহার করাই ভাল।

পত্রলেখা কলমটা দিয়ে যাবার সময় একখানা লম্বা গোছের খাতাও আনে।

"লাইব্রেরির বই ; ছিঁড়ে-ছুঁড়ে যাবে ; তার চেয়ে এই খাতাখানার উপর কাগজ রেখে লেখাপড়া করো।"

"লাইব্রেরির বই ছিঁড়বে কেন। আমি কি বইয়ের সঙ্গে কুস্তি করতে যাব। যা পড়তে বসগে যা। তুই দেখছি আমাকেও আজ বকুনি না খাইয়ে ছাড়বি না।"

মেয়ে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। কথাগুলো বোধ হয় একটু কড়া হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে তিনি কোনদিনই বকতে পারেন না। শুধু মেয়েকে কেন, কাউকেই না। বকা, চিৎকার করা এ সব তাঁর কোনকালেই আসে না।

চাবি দিয়ে তাঁর প্রাইভেট দেরাজ খুলে, তিনি লেখাপড়ার কাগজপত্র বার করলেন। একে তাঁর স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেন, কুনোব্যাঙের দপ্তর খুলে বসা। খাম, পোস্টকার্ড, টিকিট, কাগজ—বহু রকমের কালি আরও অনেক দরকারি জিনিসের তাঁর স্টক থাকে, কখন কাজে লাগবে বলা তো যায় না। বেনামী চিঠি পাঠাবার দিনে ও সব কেনা, ঠিক না। নেপালের চিঠিখানা তিনি ভাল করে পড়লেন। দুচারটে বানানে ভুল করলেও মোটামুটি মন্দ টাইপ করেনি নেপাল। ভুলগুলো কালি দিয়ে সংশোধন করা ঠিক হবে না—কে জানে কিসে থেকে কী হয়। খামখানা থুতু দিয়ে আটবার সময় চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল সেই সরকারি কর্মচারীটির ছবি। অপ্রত্যাশিত আঘাতে কেমন করে ছটফট করে বেড়াবে, অথচ কাউকে কিছু বলতেও পারবে না—এ কথা ভেবেও আনন্দ।··· লোকটার উপর লক্ষ রাখতে হবে।···

"চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়, পত্রলেখা।"

এইবার দোলগোবিন্দবাবু দ্বিতীয় চিঠিখানা লিখতে বসলেন। অপ্রতিহত তাঁর ক্ষমতা এখন। পুতুল নাচের সুতো তাঁর হাতে ; যেমনভাবে ইচ্ছা নাচাতে পারেন। আজকের হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়া দায়িত্ব ; সর্বাধুনিক কিনা, তাই এইটাই আজকের আসল কাজ। তিনি একখানা খামের উপর খসখস করে বাঁ হাত দিয়ে নীলমণিবাবুর ঠিকানাটা লিখলেন। অভ্যস্ত হাত। তারপর আরম্ভ হল চিঠি লেখা। কলম হাতে ধরলে কখনও কথার জন্য ভাবতে হয় না তাঁকে। কিন্তু আজ প্রথমেই আটকাল একটা বানানে। আরম্ভ করেছিলেন—"আমরা ঘাস খেয়ে থাকি না। লোকের চোখে ধুলো—"

খটকা লাগল ধুলোর বানানে। ধ এ দীর্ঘউ না ধ এ হ্রস্বউ? এইটা দেখবার জন্য পত্রলেখার কাছ থেকে বাংলা অভিধান-খানা চাইতে একটু সঙ্কোচ বোধ হল। লাইব্রেরির বইয়ের মলাটের উপর ধূলো আর ধুলো দুটো পাশাপাশি লিখে দেখলেন কোনটা দেখায় ভাল। দুটোই সমান যে।··· যদি ধুলো কথাটা পাওয়া যায় এই ভেবে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাতা ওলটাতে আরম্ভ করলেন।··· বঙ্কিম চাটুজ্যে কি আর ধুলোটুলো নিয়ে কারবার করে। গোধূলি, ধূলি, ধূলিকণা এই সব গোটা কয়েক

পাওয়া গেল ; কয়েক পৃষ্ঠার পর হাল ছেড়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বইখানা নাড়াচাড়া করছেন—একখানা কাগজ বেরিয়ে এল। কতদূর পর্যন্ত পড়া হল, তারই বোধহয় চিহ্ন দিয়েছিল লাইব্রেরির কোনও পাঠক ওই কাগজখানাকে দিয়ে।··· কাগজখানার উপরের লেখাটার দিকে নজর গেল।··· এ কি! পত্রলেখার হাতের লেখা না? ··· লেখাটা পড়লেন। প্রথমটায় একটু গোলমেলে ঠেকে। চিঠিখানার নীচে কোনও নাম নাই। কাকে লেখা তারও কোনও উল্লেখ নাই চিঠির ভিতরে। চিঠিখানা তাড়াতাড়িতে লেখা—মনে হয় খানিক আগেই লেখা হয়েছে।

—সন্ধ্যার সময় বাড়িতে থাকতে পারিনি। ছোট ভাইকে নিয়ে মার হুকুমে আটকৌড়েতে যেতে হয়েছিল। আমার যেতে একটুও ইচ্ছা ছিল না। রাগ করো না লক্ষ্মীটি।—

শেষের শব্দটার ভুল বানান এই মানসিক অবস্থাতেও নজরে পড়ে।··· না··· অসম্ভব ! আবার পড়ে দেখলেন।··· রাগে সর্বশরীর রি রি করে উঠে। নিজের মেয়ের এই কাজ। ইচ্ছা হয় চুলের ঝুঁটি ধরে এখানে টেনে নিয়ে এসে মেয়ের এই আচরণের জবাবদিহি নেন!

চিৎকার করে মেয়েকে ডাকতে গিয়ে মনে হ'ল যেন হঠাৎ মেয়ের নামটাই মনে পড়ছে না ; কেমন যেন গুলিয়ে গেল। পরের মুহূর্তে নামটা খুঁজে পেলেন। পত্রলেখাকে তিনি আজ পর্যন্ত কখনও বকেননি। মার-ধর, বকুনি, ও সব তাঁর আসে না কোনও কালে। বলেছেন ও সব হচ্ছে ওর মায়ের ডিপার্টমেণ্ট।··· তা ছাড়া মেয়ের কাছে কি কখনও ওসব কথা তিনি বলতে পারেন।...

সব রাগ গিয়ে পড়ল ভিজে-বিড়াল ন্যাপলাটার উপর। ওটার উপর বিশ্বাস করে তিনি কী ভুলই না করেছেন।··· মা বাপেরই বুঝি এ সব জিনিস নজরে পড়ে সবচেয়ে শেষে। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল যে আজ সন্ধ্যার আড্ডায় বন্ধুদের কথাগুলোর ইঙ্গিত এই দিকেই ছিল। মাসিমা পর্যন্ত নেপালের এত মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ার উপর কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। দেখা যাচ্ছে সকলেই জানেন, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন ; সকলে ঘুরিয়ে তাঁকেই খোঁটা দিচ্ছিলেন এ নিয়ে। অথচ শুধু তিনিই বুঝতে পারেননি সে সময়। এর আগে ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে।··· ছি ছি ছি!··· ওই হতভাগাটাকে মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে ; ওর এ বাড়িতে আসা বন্ধ করতে হবে ; করতে হবে তো আরও কত কী! কিন্তু তাঁর যে ও সব আসে না কোনও কালেই! পৃথিবীর যত ঝঞ্ঝাট কি তাঁরই উপর এসে পড়বে।··· ওই বাঁদরটাই নিশ্চয় পত্রলেখাকে বইয়ের মধ্যে রেখে চিঠি পাঠানোর ফন্দিটা শিখিয়েছে! ও চালাকিটা আগে থেকে রপ্ত না থাকলে, কখনও কি অত তাড়াতাড়িতে খবরের কাগজের ভাঁজের মধ্যে ভরে চিঠি চালান দেবার কথাটা কারও মাথায় খেলে? ধরে চাবকানো উচিত রাস্কেলটাকে?··· কিন্তু মারধর করলে নেপালটা আবার চটে তাঁর বেনামী চিঠি দেবার অভ্যাসের কথা লোকের কাছে বলে বেড়াবে না তো? তাঁর নিজের হাতে লেখা চিঠির খসড়টাও যে সেই হতভাগাটার কাছেই থেকে গিয়েছে!··· ভয় ভয় করে।

কী করা উচিত এখন? অনেকক্ষণ ধরে তিনি চিন্তা করে দেখলেন বিষয়টাকে নানা দিক থেকে। যত ভাবেন তত মাথা গরম হয়ে ওঠে। কোনও কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত পত্রলেখার বাবা তাঁর দেরাজের থেকে একটা পুরনো পেন হোল্ডার বার করলেন। কলমটায় নিব নাই। কলমের উলটো দিকটা কালির মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তিনি লিখছেন। লিখছেন নতুন একখানা চিঠি। বেনামী চিঠি। পত্রলেখার মায়ের কাছে। জীবনে স্ত্রীর কাছে তাঁর এই প্রথম চিঠি লেখা।

দেশ, আষাঢ় ১৩৬৪

হাতেখড়ি

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

ভোর থেকেই নীলিমার হাঁকডাকে সারা বাড়ি ব্যতিব্যস্ত। ভৃত্য ভজুয়ার সোয়াস্তি নাই। ঘন ঘন ফরমাস: এটা কর, ওটা ধর, এদিকে আয়, ও-বাড়ি যা। ব্যাপার আদৌ সাধারণ নয়। এই ছোট্ট সংসারটির জীবনে আজ একটা দিনের মতো দিন। নীলিমার একমাত্র পুত্র বাবলু এই প্রথমই স্কুলে যাইতেছে।

বাবলু কী আর সে বাবলু আছে! আজ মা তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছেলের পেশাকি নাম সুরজিৎ বলিয়াই তাকে ডাকিতে চায়। তবু মুখ হইতে কেবলি বার হয় 'বাবলু!' কখনও বা 'খোকন!'

বাবলুর মন দুরদুর করে আনন্দে আর আতঙ্কে। স্কুল আর যাই হোক, মামাব বাড়ি যে নয় সে-জ্ঞান তার টনটনে। এক বছর বাবার কাছে 'ঘোড়ায় চড়িল আছাড় খাইল' করিতে গিয়া মাঝে মাঝে চড়চাপড় কম হয় নাই। গৃহশিক্ষক বনমালীবাবু তাঁর প্রতিশ্রুতি প্রহার-বারণ শর্ত ভঙ্গ করিতে পারেন না বলিয়াই মাঝে মাঝে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া ভিতরের ঝাঁজটা যে প্রকাশ করিয়া ফেলেন সেই অভিজ্ঞতাও বাবলুর কাছে খুব সুখকর নয়। তবু কোথায় যেন, কিসের যেন একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে সাত বছরের এক কিশোর মন।

নীলিমার রান্নার পাট আজ বহু-আগেই শেষ। খোকার জামাকাপড় কোঁচাইয়া গোছাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছে বহুক্ষণ। খানিক কাজলও প্রস্তুত। ভজুয়াকে দিয়া বিল্বপত্র, আম্রপল্লব আর ধানদূর্বাও জোগাড় করিয়া রাখিয়াছে।

মাঝে মাঝে নীলিমা মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়। সেই এক-রত্তি শিশু বাবা-মার সজাগ দৃষ্টির উপর দিয়া দেখিতে দেখিতে কবে যে এতখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে সেই অতি প্রত্যক্ষ নিঃশব্দ সত্যটা যেন আজই প্রথম ধরা পড়িল। নীলিমার খোকা আর বাবলু নয়। সে এখন দস্তুর মতো শ্রীমান সুরজিৎ রায়। তার সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অস্পষ্ট পথ। আজ গৃহে সেই যাত্রারম্ভের মঙ্গলাচরণ।

"শুনছ?"

বিশ্বজিৎ নথিপত্রের উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই বলে: "শুনছি।"

"এই নিয়ে তো তিনবার শুনলে।"

"হুঁ।"

"আজ প্রথম দিন। খোকাকে তুমিই স্কুলে দিয়ে আসবে।"

"ভজুয়া নিয়ে আসবে'খন। আজ আমার মেলা কাজ।"

"ভজুয়া একবার যাবে ডাকঘরে মনিঅর্ডার করতে, আবার যাবে টিফিনের সময় খোকাকে খাবার দিয়ে আসতে, আবার বিকেলে যাবে খোকাকে নিয়ে আসতে। চাকর বলে সে তো আর মেশিন নয়।"

"পাশের বাসার পল্টু আর মণির সঙ্গে যাক্ না।"

নীলিমা এবার ফোঁস করিয়া ওঠে, "পল্টু-মণিরা যেন আজই প্রথম স্কুলে যাচ্ছে। আর, ওর সঙ্গে বুঝি তাদের তুলনা!"

অগত্যা রাজি না হইয়া উপায় নাই। তবু স্বামী বলিয়াই বিশ্বজিৎকে আরও দু'কথা শুনিতে হয়। নিজের ছেলেকে এমন হেলাফেলা নাকি ভূভারতে কেহ কোনও দিন করে নাই।

বিশ্বজিৎ হাসিয়া জবাব দেয়: "ওই তোমার স্বভাব। একটুতেই উতলা হও। এই করেই ছেলে মানুষ করবে, তা হলেই হয়েছে! এই বয়েস থেকেই শিশুদের সাহস শেখাতে হয়—"

"ঢের হয়েছে, থামো।" নীলিমা বাধা দিয়া কহিল, "সব তাতেই লেকচার!—প্রথম দিনটায়

অমন ভয়ভয় সবারই করে। তুমিও এক লাফেই এতটা বড় হয়েছ কিনা।"

যাহাকে লইয়া এত বাদানুবাদ সেই বাবলু আসিয়া হাজির। পিতা সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করে, "কিরে খোকন। তুই একা-একা স্কুলে যেতে পারবি নে?"

সঙ্গে সঙ্গেই বাবলু ঘাড় নাড়ে সম্মতিসূচক।

"ওরে দস্যি ছেলে!" নীলিমা ছেলের কাছে আগাইয়া যায়। "অমন দুঃসাহস করিস্‌নি কখনও।"

"আমি একাই যেতে পারব মা। সেদিন ও-বাসার কালুদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখে এসেছি না। থানার কাছাকাছি আমাদের স্কুল। তার আগেই লোন-আপিস, তার খানিক আগে ডাকঘর, তারও আগে মধু কুণ্ডুর গদি, সেই গদির পাশ দিয়েই তো আমাদের পাড়ার রাস্তাটা এসেছে। আমি ঠিক চিনে যেতে পারব।"

বাবলু গড়গড় করিয়া সারাটা পথ মুখস্থ বলিয়া যায়। বাবা আর মা খুশি হইয়াই শোনে। তবু নীলিমার মনে কেমন একটা শঙ্কা। ভয়টা যে কিসের তাহা নীলিমাও কী ছাই ভাল করিয়া জানে! ছোট মফস্বল শহর। ট্রাম-বাস নাই। মোটর গাড়ি আর লরির উৎপাত যৎসামান্য। স্বামী অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ পসার করিয়াছে। তাদের ছেলে পথ ভুলিয়া গেলেও এই শহরে হারাইয়া যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। তবু নীলিমার শঙ্কা ঘোচে না।

বাবা ছেলেকে আবার উস্কাইয়া দেয়: "আজ তোকে আমিই দিয়ে আসব। কাল থেকে কিন্তু তুই একাই স্কুলে যাবি। ভয় কী!"

নীলিমা রাগত ভাবে জানায়, "ছেলেকে অমন করে আস্কারা দিয়ো না বলছি।"

"আমি সত্যি পথ চিনি মা," বাবলু আবার সগর্বে জানায়, "পন্টুদাও তো একা যায়, একা আসে।"

"যার খুশি সে যাক। তুমি যেতে পারবে না।"

ছেলে আপাতত চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু সঙ্কল্পটা মনে মনে রাখে। স্কুলের পথ কোন্ ছার, দুই-চার দিন বাদেই মায়ের কাছে সে প্রমাণ দিবে এক ক্রোশ দূরে রহস্যপুরের মাঠে— ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের রাস্তার পাশে গত চৈত্র সংক্রান্তিতে যে মস্ত বড় মেলা বসিয়াছিল, সেখানটায়—তার বাবলুও একা গিয়া একাই ফিরিয়া আসিতে পারে।

বিশ্বজিৎ তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইয়া খাইতে বসিয়াছে।

এদিকে নীলিমা ছেলেকে সাজাইতে ব্যস্ত। গেল পূজার সময় পাওয়া জরির-আঁচ-দেওয়া কাপড়খানি পরিয়া, সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া, মুখে খানিক স্নো-পাউডার মাখিয়া, কপালে ছোট্ট একটু চন্দনের ফোঁটা লইয়া খোকা এখন ঠিক বাবলুও নয়, সুরজিৎও নয়—নীলিমারই মুগ্ধ মনের সকৌতুক মন্তব্য অনুযায়ী—বিবাহ-বাসরের মধ্যমণি।

বাবলু এতক্ষণ কোনও আপত্তি করে নাই। কিন্তু চোখে কাজল সে কিছুতেই পরিবে না। সে যেন এখনও ছোটই আছে!

মা-ছেলের সহাস্য হাতাহাতির মাঝখানে বিশ্বজিৎ ঘরে ঢুকিল।

"এ্যাঁ! একেবারে রাজপুত্তুর! ছেলে তোমার দিগ্বিজয়ে বার হচ্ছে বুঝি?"

বাবলু লজ্জায় মায়ের দেহের আড়ালে মুখ লুকায়। নীলিমা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে, "তোমায় কোনও কাজের কথা বললে তখন খোঁড়া হও আর অকাজের বেলায় পঞ্চমুখ।" বাবলুর সলজ্জ মুখখানি জোর করিয়া তুলিয়া ধরিয়া মা জানায়, "লজ্জা কিসের, মুখ তোল্। বোকা কোথাকার! তুই যেন ওঁর মতো এক গেঁয়ো পাঠশালায় পড়তে যাচ্ছিস। সেদিন বুঝি আর আছে! মুখ তোল্।"

মঙ্গলঘটের কাছে কপাল ঠেকাইয়া, ধানদূর্বা মাথায় লইয়া, জননীকে প্রণাম করিয়া বাবলু তার বাবার সঙ্গে বার-দুয়ার পার হইয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল। নীলিমা একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। এত দিনে খোকারও তবে একটা স্বতন্ত্র জীবন শুরু হইল?....

নীলিমার মনে হয় সে যেন আজই প্রথম পুরাপুরি মা হইল—সাত বছর আগে নয়। শাশুড়ির মতো তারও আজ হইতে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকার পালা। তফাত শুধু এই যে, একজন দূর হইতে কত দিনে আবার ছেলের দেখা পাইবেন সেই হিসাব করেন মাস গুনিয়া, আর একজন এখন হইতে পুত্র কখন স্কুল হইতে ফিরিবে সেই হিসাব করিবে ঘণ্টায় আর মিনিটে।...

শাশুড়ির ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে গ্রামের স্কুলে মাস্টারি লইয়া মায়ের কাছেই থাকুক। তা হয় নাই। শাশুড়ির সন্দেহ পুত্রবধূই তাহা হইতে দেয় নাই। তিনি যখন-তখন আত্মীয়স্বজনদের কাছে বলিয়া বেড়ান তাঁর ছেলে নাকি পর হইয়া গিয়াছে। অথচ তাঁর নিজের দুটি মেয়েই যার যাব স্বামীর কর্মস্থলে বিদেশে ঘরসংসার করিতেছে নির্বিবাদে। শাশুড়ি নিশ্চিন্ত। মেয়েদের সৌভাগ্যে বেশ একটু গর্বিতও। যত অপরাধ পরের মেয়ে নীলিমার? ...

নীলিমার কী দোষ? শাশুড়ির ছেলেই যে অদ্ভুত প্রকৃতিব। চিঠিপত্র দিয়া মায়ের খোঁজখবর লওয়ার ভার স্ত্রীর উপর ফেলিয়া দিয়া খালাস। নীলিমাকে তাই প্রতি চিঠিতেই লিখিতে হয়: আপনার ছেলে রাতদিন কাজে ব্যস্ত; সময় পায় না; পৃথক পত্র দিল না; ভালই আছে। ইত্যাকার।

ছেলে বটে! মায়ের কাছে নিজের হাতে দু' ছত্র লিখিলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়! প্রতি মাসে ঠিক সময়ে মাকে টাকা পাঠাইবাব দায়টুকুও স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত!

"মা!"

ভজুয়াব ডাকে নীলিমার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়।

খোকাবাবুর স্কুলে কখন যেতে হবে?"

'বারোটায়। তুই আজ সকাল করে নেয়ে-খেয়ে নে।"

দেড়টা নাগাত নীলিমা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, টিফিনের সময় খোকাকে খাবার দিয়া কখন ভজুয়া ফিরিয়া আসিবে।

মাত্র চার ঘণ্টা। বড় কম সময় নয়। খোকার একটা খবর চাই। মাকে ছাড়িয়া এতক্ষণ কোনদিন কোনখানেই কাটায় নাই সে। অপরিচিত সহপাঠীদের মধ্যে সে হয়তো এখন জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে একটি কোণে, হয়তো বা মার কথা, বাড়ির কথা বার বার করিয়া তার মনে পড়িতেছে।

সেকালের মতো আজকাল আর স্কুলে বেধড়ক মারধর করে না। নীলিমা শুনিয়াছে বেতমারা এখন বে-আইনি। মাঝে মাঝে একটু-আধটু কানমলা বা মৃদুমন্দ চড়-চাপড় যা আছে তা-ও আজ প্রথম দিনে নিশ্চয়ই নয়। তবু মায়ের মনে কেমন একটা অস্পষ্ট, অকারণ শঙ্কা।

বার-দুয়ারে আওয়াজ পাইয়া নীলিমা ডাকে, "ভজুয়া এসেছিস?"

"হ্যাঁ মা।"

"ইদিকে আয়।"

ভজুয়া আসিয়া গৃহকর্ত্রীর সামনে দাঁড়ায়।

"খোকাকে তুই নিজের হাতে খাইয়ে এসেছিস তো?"

"হুঁ।"

"দুধ সবটাই খেলে? ফেলে দেয়নি?"

"না।"

খানিক নীরব থাকিয়া নীলিমা প্রশ্ন করে, "খোকা কিছু বললে?"

"না।"

"কিচ্ছু না?"

প্রশ্নটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া ভজুয়া চুপ করিয়া থাকে।

"বাড়ি আসতে চাইলে না?"

"না তো।"

"তোকে আমার কথা কিছুই জিগ্‌গেস করলে না?"

"উহুঁ।"

"আচ্ছা যা এবার।"

বাড়ির জন্য খোকার মন নিশ্চয় ছটফট করিয়াছে। ভজুয়াটার বুদ্ধি কম। অতশত তলাইয়া সে বুঝিবে কী করিয়া?

খানিক বাদেই আবার নীলিমা ডাকে, "ভজুয়া!"

"যাই মা।"

ভজুয়া হাজির।

"খোকাকে তুই কোথায় দেখলি? ক্লাসের মধ্যে, না বাইরে?"

"বাইরে।"

"কী করছিল তখন?"

"খেলছিল।"

"খেলা করছিল?"

"হ্যাঁ মা। স্কুলের লাগোয়া ছোট মাঠটায় আর সব ছেলেদের সঙ্গে বুড়ি-ছোঁওয়া খেলছিল।"

নীলিমা নির্বাক। মার কথা একটি বারও জিজ্ঞাসা করে নাই! বিচিত্র কী! বাঘের বাচ্চা আজ রক্তের স্বাদ পাইয়াছে। গৃহের সংকীর্ণ পরিধির বর্ণপরিচয় সাঙ্গ করিয়া আজ সে বৃহত্তর বাইরের পরিচয় লাভের প্রথম পাঠ গ্রহণ করিতে গিয়াছে।

এবার নীলিমা নিজেই ভজুয়ার ঘরের দোর-গোড়ায় আসিয়া দাঁড়ায়।

"ভজুয়া!"

"বলুন।"

"তোর মার জন্যে মন তোর কেমন-কেমন করে না রে?"

ভজুয়া ইতস্তত করে, "হ্যাঁ—না—তা একটু একটু করে।"

"মাকে চিঠি দিস্ তো?"

এবার ভজুয়া লজ্জায় মাথা নোয়ায়। লেখাপড়া সে জানে না।

"কেন দিস্ না? আমায় বললে তোর চিঠি বুঝি আমি লিখে দিতে পারি না?—হতভাগা!"

বিকালে নীলিমা রাস্তার ধারের জানালার কাছে বসিয়া আছে। পৌনে পাঁচটা বাজে। এত দেরি হওয়ার তো কথা নয়।

আরও আধ ঘণ্টা বাদে অদূরে গলির মোড়ের মাথায় ভজুয়ার আগে আগে বাবলু যেন বীর দর্পে দেশ জয় করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। নীলিমা ছুটিয়া বার-দুয়ারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। খোকার মুখ তো এতটুকুও শুকনো নয়। খুশির আবেগে যেন টলোমলো।

"দাঁড়াও, আগে আমার বইপত্তর সব রেখে আসি," বলিয়া জননীর প্রসারিত বাহুর আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া বাবলু পড়ার ঘরে চলিয়া যায়।

"হ্যাঁ রে ভজুয়া, তোদের আসতে এত দেরি হল কেন?"

"আর ব'লো না মা। খোকাবাবু বুঝি কথা শোনে আমার! খানিক পথ চলেই দাঁড়িয়ে যায়। ডাকবাংলায় এক সাহেব এসেছে, তাকে না দেখে আসবে না। ডাকঘরে গিয়ে টেলি-করা আজই দেখা চাই।"

"তুই বাধা দিস্‌নি কেন?"

"বাধা দিলে আমায় ধমকে ওঠে।" ভজুয়া বলিয়া যায়, "জলের কলের কাছে এসে আর আসতেই চায় না। কাল দেখাব বললাম, কানে সে কথা তোলেই না। মা! কী সাহস খোকাবাবুর! দুগ্‌গা বাড়ির পুলের উপর উঠে রেলিং ধরে ঝুলতে চায়।"

নীলিমা রুখিয়া ওঠে, "তোকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না বাপু! রাস্তা দ্যাখ্‌। একটা ছোট্ট ছেলেকে বাগ মানাতে পারিস্‌ না।—বসিয়ে বসিয়ে কে কোথায় খাওয়াবে যা না সেখানে।"

ভজুয়া হতবাক। ভাবিয়াছিল খোকাবাবুর বীরত্বের ফিরিস্তি পাইয়া গৃহকর্ত্রী খুশিই হইবেন। এ যে হিতে বিপরীত! ভজুয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়ে।

পড়ার ঘর থেকে আসিয়াই বাবলু সোৎসাহে মাকে জানায়, "জানো মা, আমাদের স্কুলের টিম্‌ এবার মস্ত বড় একটা রুপোর কাপ পেয়েছে।"

সে-কথা জানিবার কোনও আগ্রহ মায়ের নাই। মা খাবার সামনে রাখিয়া বলেন, "আগে খেয়ে নে।"

"আমার এখনও খিদে পায়নি মা!"

"পেয়েছে। তোর কখন খিদে পায় না-পায় সে-কথা বুঝি তোর কাছ থেকে আমি শিখতে যাব?"

বাবলু খাইতে বসে। আজ মনে তার সহস্র কথা। মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে আর রোজ বিকালে ভজুয়ার সঙ্গে স্বল্প সময়ের ফাঁকে ফাঁকে যে-বহির্জগতের মৃদমন্দ আভাস পাইয়া আসিয়াছে, তার অবারিত আস্বাদের ছাড়পত্র এতদিনে মিলিয়াছে।

মা প্রশ্ন করে, "পড়া জিগ্‌গেস করেছিল?"

"প্রথম দিন বুঝি পড়া দিতে হয়।—তুমি কিচ্ছু জানো না মা।"

নীলিমা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি না হয় জানিই না, তাই বলে অমন করে বুঝি মায়ের কথার জবাব দিতে হয়?"

খাওয়া শেষ হইলে নীলিমা ছেলেকে বিছানায় কোলের কাছে টানিয়া লয়।

"খোকা! স্কুলে বাড়ির জন্যে তোর মন কেঁদেছিল?"

"না তো।"

"নিশ্চয় কেঁদেছে। টিফিনের সময় ভজুয়ার সঙ্গে বাড়ি আসবার জন্যে মনে মনে ছটফট করেছিলি, কেমন?"

পুত্রের নিকট হইতে কোনও জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই নীলিমা বলিয়া যায়, "ভয় কী রে বোকা! চিরকাল তোকে আমি আগলে রাখব নাকি! এখন না তুই বড় হয়েছিস!"

ছেলে চুপ করিয়া শোনে।

"খোকন!"

"কী মা?"

"এখন থেকে দিনরাত তুই তো বই নিয়েই কাটাবি। তাই না? কত বন্ধু হবে তোর।"

বাবলু নিরুত্তর।

"হ্যাঁ রে দুষ্টু ছেলে। কথা বলিস না যে।—বাড়িতে দু'বেলা কেবল বই কোলে নিয়েই পড়ে থাকবি তো?"

"না মা।" জবাব একটা না দিলে নয় তাই বাবলু কথা বলে।

"নিশ্চয় তুই বইপত্তর নিয়ে পড়ে থাকবি, তার পরে থাকবি বউ নিয়ে।"

"যাঃ!"

"অ্যাঁ! বড় যে ভালমানুষি দেখানো হচ্ছে! তোর পেটের কথা আমি যেন টের পাইনি কিনা।"

বাবলু অকারণ লজ্জায় মৃদু মৃদু হাসে। নীলিমা একদৃষ্টে ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। সে বেশ জানে নদী কখনও সরোবর হয় না। না-ই বা হইল। তবু আজ তার সর্বাঙ্গ দিয়া নীলিমা এই উদ্বেল মুহূর্তে জননীর উপর একান্ত নির্ভরতার নাগালের মধ্যে ভবিষ্যতের এক বলিষ্ঠদেহ যুবককে একটিবার বাঁধিয়া ধরিয়া রাখার স্বপ্ন দেখিয়া লয়।

মায়ের আকস্মিক ভাবান্তর বুঝিতে না পারিয়া ছেলে জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়া আছে।

"খোকন! তুই আর যা-ই করিস, ফি হপ্তায় আমায় কিন্তু একখানা করে চিঠি দিস্—নিজের হাতেই লিখবি। ভুলিস্নি যেন। বউ-এর উপর বরাত দিয়ে দায় সারলে চলবে না কিন্তু।"

দেশ, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬

ল জ্জা

বুদ্ধদেব বসু

তাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র চার মাস। পারিজাত— পুরুষের বিশেষত আধুনিক পুরুষের পক্ষে নামটি বেম'নান, কিন্তু নামেব জন্য তো আর আমরা নিজেরা দায়ী নই—পারিজাত মধ্য-বিশ-শতকী বাংলাদেশের একজন উৎসাহী যুবক , সেই-সব যুবকদের একজন, যারা সরকারি চাকরির আশা রাখে না, শ্বশুরের পয়সাব আশাও না, যারা প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করে, এবং বিয়ে করলেই যাদের ছেলেপুলে হয় না, যারা নিয়মিত রীডর্স ডাইজেস্ট পড়ে, পুরুষকারে বিশ্বাস করে, এবং জীবনে উন্নতি না-ক'রে কিছুতেই ছাড়ে না। কলেজে ভাল ছেলে ছিল পারিজাত, খুব মেতেছিল ইকনমিক্স নিয়ে; কিন্তু দৈবদোষে পয়লা-নম্বরি ডিগ্রি তার ফশকে গেল—তা গেলই বা। সে তো আর প্রোফেসরের অথর্ব জীবন চায় না—এতেই তার চ'লে যাবে। দরজা খোলা ছিল সাপ্লাই-আপিসেব, সোজা ঢুকে পড়ল। কী চেহারায়, কী কথা-বার্তায়, কী কাজকর্মে, সমস্ত আপিসে সে একটু চোখে পড়বার মতো; পঁচাত্তর থেকে একশো, একশো থেকে দেড়শো, দেড়শো থেকে একলাফে আড়াই-শোতে পৌঁছাল দেড় বছরের মধ্যে। কিন্তু বিশ্বাস কী—যুদ্ধ থামলেই তো আপিস উঠে যাবে, হাতের পাঁচও দুটো-একটা রাখতে হয়। কোনও-এক কলেজের সার্থকনামা বাণিজ্যবিভাগে জুটিয়ে নিল লেকচারশিপ সপ্তাহে দু-দিন সন্ধেবেলা দু-ঘণ্টা ক'রে কাজ; বিজ্ঞাপনের দালালি ক'রে তার এক বন্ধুর বন্ধু হঠাৎ ফেঁপে উঠেছিল, তার কাছে মাঝে-মাঝে হাত পাকাতে লাগল বিজ্ঞাপনের 'কপি' লেখার কাজে—তা ছাড়াও ইংরেজিতে বাংলায় মার্ক্সতত্ত্বের ব্যাখ্যা লিখে এবং রেডিওতে জাপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ক'রে কিছু কিছু রোজগার হ'তে লাগল। এমন যখন হ'ল যে কোনও মাসেই চারশো টাকার কম হয় না, আর আপিসে সবাই, এবং আপিসের বাইরেও কেউ-কেউ তাকে বেশ একটু খাতির করে, তখন সে বিয়ে করল—কিংবা তারা বিয়ে করল। মন্দিরা ঐ সাপ্লাই আপিসেরই বি. এ. পাশ মেয়ে: প্রথম থেকেই তাদের চোখোচোখি এবং পরস্পরের উপর চোখ; ভাব জমিয়ে ফেলতেও পারিজাতের দেরি হ'ল না, যদিও কিছুদিন পর্যন্ত মন্দিরা আরও দু-তিনজনকেও খেলিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে ভাল লাগল পারিজাতের, আরও ভাল লাগল প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিতে। মুখে যতটা বলে ততটা না-হলেও মোটের উপর পারিজাত যে বেশ করিৎকর্মা, এ-বিষয়ে মন্দিরার মনে যখন আর সন্দেহ রইল না,

তখন সে সহজেই বিয়ে করতে রাজি হ'ল, শুধু এইটি শর্ত ক'রে নিল যে এক্ষুনি চাকরি সে ছাড়বে না। 'স্বাধীনতা,' সে বলল, 'মানেই হচ্ছে আর্থিক স্বাধীনতা, এবং আর্থিক স্বাধীনতা থাকলেই বিবাহ আর দাসীত্ব মেয়েদের পক্ষে সমার্থসূচক হয় না।' ঠিক এই ভাষাতেই বলল। মার্ক্সিস্ট স্বামী খুশি হ'য়ে বললে, 'নিশ্চয়ই! তোমার টাকায় আমার কোনও হাত থাকবে না; তুমি যেমন খুশি খরচ করবে—কিংবা করবে না।' আর তাই আগের মতোই নিয়মিত আপিসে হাজিরা দিতে লাগল সে; দেখে বোঝাই যায় না যে তার বিয়ে হয়েছে—এ যুগের কোন মেয়েকে দেখেই বা যায়—নব-বিবাহের সৌরভটুকুই উবে গেছে দেশ থেকে। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, ঠোঁটে রং মেখে, চোখে কালো চশমা পরে সে যখন ট্র্যামের জন্য দাঁড়ায়, তখন তার সিঁথিতে কুসংস্কারের শেষ, ক্ষীণ, রক্তিম স্মৃতিটুকু কারই বা চোখে পড়ে ; এমনকি, তার পাশে দাঁড়ানো শাদা-প্যান্ট-পরা ছিপছিপে যুবকটিকে একটুও স্বামীর মতো লাগে না: আর বস্তুত স্বামী-স্ত্রী হ'য়েও লোকচক্ষে বন্ধু-বন্ধুনি হবার গৌরব কী কম!

পারিজাত সত্যি যে কাজের লোক তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন বিয়ে ঠিক হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় ক'রে ফেলল লেক-মার্কেটের কাছে। ছোট্ট ফ্ল্যাট, কিন্তু তারাও তো মাত্র দু-জন। শোবার ঘর, বসবার ঘর, আর পিছনের সরু বারান্দার একদিকে টেবিল-চেয়ার পেতে খাবার ঘর, অন্য দিকে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা, মাঝে সাইডবোর্ডটি পার্টিশনেরও কাজ করে। অল্প জায়গায় কী ক'রে 'গুছিয়ে' থাকতে হয়, তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ রচনা ক'রে ফেলল মন্দিরা—কিংবা দু-জন মিলেই করল—কেননা পারিজাত, শুধু উপার্জনে নয়, সঞ্চয়েও নিপুণ, আর এটা আবিষ্কার ক'রে মন্দিরা ভারী খুশি হ'ল। কতগুলি অভ্যাস তার ভারী চমৎকার: গুনে-গুনে সিগারেট খায়, সাত জোড়া জুতো নিজেই রোজ বুরুশ করে, বাইরে থেকে এসে, যত ক্লান্তই হোক, কোটটি হ্যাঙ্গারে ঝুলোতে আর পাৎলুন ভাঁজ ক'রে রাখতে ভোলে না, পাজামা প'রে শোয়, নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন ছাড়া ধুতি পরেই না। ফ্ল্যাটটি চব্বিশ ঘণ্টা একেবারে ছবি হয়ে আছে—অবশ্য চব্বিশের মধ্যে ক-ঘণ্টাই বা তারা থাকে সেখানে, হয়তো সেজন্যই অত বেশি ছবি হ'য়ে থাকে। তবু থাকি আর না-ই থাকি, নিজের বাড়ি নিজের মনোমতো হ'য়ে সেজে থাকবে, সেটাই তো ভাল ?

চাকর রাখল না মন্দিরা—কী দরকার, একটি ঝিতেই চ'লে যাবে। যদিও নব-বিবাহিত, দু-জনেই খুব ভোরে ওঠে, উঠতেই হয়। ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে মন্দিরা চা করে, দু-জনে তৈরি হ'তে হ'তে আপিসের ভাতটা ঝি-ই নামিয়ে দেয়—পারিজাত এই একটা বাঙালি অভ্যেস রেখেছে, আপিসের আগে ভাত খাওয়া। রাত্তিরের রান্নাটা মন্দিরা নিজের হাতেই নিয়েছে, সারাদিন আপিসের পরে আবার রান্না!—পারিজাত মুগ্ধ। কখনও ছুটির দিনে বন্ধু-বান্ধব আসে, তখন বসবার ঘরটি খোলা হয়—একটু জমকালো ক'রেই সাজানো ঘরটি—অতিথিদের বসাটা খুব স্বচ্ছন্দ যেন হয় না, তবু যুদ্ধের কথা, দেশের কথা, সিনেমার কথা, সবই হয়, মন্দিরা আগাগোড়া ব'সে থেকে সব কথাতেই যোগ দেয়, কিন্তু চা দেয় না,—কী ক'রে দেবে চিনি তো বাঁধা বরাদ্দ, এক চামচেও বেশি হবার উপায় নেই। মাসে একবার তারা বাইরে খায়, দুটো সিনেমা দ্যাখে, তিন টাকার বেশি বই কেনে না: আর এই মনোরম প্ল্যাণ্ড ইকনমির ফলে তিন মাস পরে দু-জনেরই ব্যাঙ্কে কিছু জমল—শুধু তা-ই নয়, মন্দিরার নতুন একজোড়া কানবালা হ'ল, আর একটি কাকাতুয়া-রঙের সাটিনের ব্লাউজ। পারিজাত দেখল, হোটেলে তার একলা যা খরচ হ'ত, এখন দু-জনে ফ্ল্যাটে থেকে তার কমই বরং হচ্ছে; আর মন্দিরার সুখের সীমা নেই, কেননা বিয়ের আগে তার রোজগার প্রায় সমস্তই গিলে নিত দরিদ্র বাপের সংসার, এই প্রথম সে নিজের টাকায় নিজের জন্য একটা গয়না কিনল।

চমৎকার চলছিল তাদের যুগল জীবন—না, যৌথ জীবন—কিন্তু হঠাৎ একদিন, বলা না, কওয়া না, পোস্টকার্ডের দুটো আঁচড় পর্যন্ত না, একেবারে সশরীরে বাক্স-বিছানা সুদ্ধু ক্ষিতীশ এসে উপস্থিত।

সকালে উঠে চা খাচ্ছে দু-জনে, বাইরে মোটা গলায় হাঁক শোনা গেল: 'পারিজাত আছ নাকি

হে?'

ডাকটা, ডাকের ধরনটা, যেন চেনা-চেনা অথচ অচেনা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে পারিজাত স্তম্ভিত। ক্ষিতীশ।

—'আরে!'

'এই তো এলাম,' একগাল হেসে, একহাতে বিছানা, আর-একহাতে বাক্স নিয়ে ক্ষিতীশ ঢুকে পড়ল ফ্ল্যাটের মধ্যে। যেন পারিজাতের কোনও উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে বললে, 'একটুও অসুবিধে হয়নি বাড়ি বের করতে— বাস থেকে নেমে সোজা চ'লে এসেছি।'

'কিন্তু তুমি—তুমি হঠাৎ—'

'চলো, চলো, সবই বলছি—' ক্ষিতীশ পারিজাতকে আস্তে একটু ঠেলা দিলে—'অনেক কথা আছে।'

বসবার ঘরের দরজা খুলতেই হ'ল। হাতের মাল দুটো নামিয়ে ক্ষিতীশ ধপ ক'রে সোফায় ব'সে পড়ল—অতখানি আরাম ক'রে ওখানে কেউ আর বসেনি এর আগে। হাত-পা ছড়িয়ে বললে, 'বাঃ, বেশ আছ।'

পারিজাত বসল না, মুখের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'কী ব্যাপার?'

'তোমার কাছে এলাম। আমাকে একটা চাকরি ক'রে দিতে হবে ভাই।'

'চাকরি! চাকরি আমি কোথায় পাব?'

'কেন, শম্ভু যে বললে তুমি ইচ্ছে করলেই পারো—'

'শম্ভু—?'

'ঐ যে শম্ভু— ক্রিকেট-ক্যাপ্টেন ছিল, তার সঙ্গে তোমার একদিন দেখা হয়েছিল না কফি-হাউসে না কোথায়?'

হয়েছিল বটে, আর তার সঙ্গে মন খুলে সে দুটো কথাও বলেছিল। তা থেকে নাকি এই!

'—শম্ভু এর মধ্যে একবার গিয়েছিল বাঁকুড়ায়—তারও দেশ তো ওখানে—তোমার সব কথা শুনলাম তার কাছে। খুব ভাল নাকি বিয়ে করেছ, এদিকে একটা ডিপার্টমেন্টের কর্তা হয়েছ, অ্যাঁ।'

শেষের কথাটা যত বড় অতিরঞ্জনই হোক, শোনাল ভাল। পারিজাত মনে-মনে খুশি না হ'য়ে পারলই না, গাল দুটি একটু স্ফীতও হ'ল, কিন্তু গাম্ভীর্য অটুট রেখে বললে, 'যত বাজে কথা!'

কেমন-একটু অপ্রতিভ হ'য়ে গিয়ে ক্ষিতীশ বললে, 'তবে যে শম্ভু আমাকে বলল এক্ষুনি কলকাতা চ'লে যেতে? বলল—"কী ঘোড়ার ঘাস কাটছ এখানে ব'সে ব'সে—কলকাতায় আজকাল চাকরির ছড়াছড়ি— আর পারিজাতের হাতেই আছে অনেক।" তোমার ঠিকানাও দিয়ে দিল সে।'

'আর তার কথা শুনেই তুমি তক্ষুনি চ'লে এলে। বাঃ।'

কাতর চোখে তাকিয়ে ক্ষিতীশ বলল, 'কোনও রকমেই একটা হয় না, পারিজাত? বলো তো— সেই কবে ফেল ক'রে দেশে গিয়ে বসেছি—বাপের উপর আর কতকাল খাব! বেশি কিছু লাগবে না আমার, ষাট-পঁয়ষট্টি টাকার যা-হোক কিছু, নিজেরটা নিজে চালাবার মতো হ'লেই হ'ল। ইচ্ছে করলে কি পার না?'

পারিজাত তাড়াতাড়ি বলল, 'কী যেন, এখন তো ঠিক বলতে পারব না,' বলবার ধরনটা ডিপার্টমেন্টের কর্তার মতোই হ'ল। তারপর স্পষ্ট ক'রে বললে, 'কিন্তু চাকরির চেয়েও জরুরি প্রশ্ন হচ্ছে: কলকাতায় তুমি থাকবে কোথায়?'

এবারে ক্ষিতীশের চোখ-মুখ চকচকে হ'য়ে উঠল। মাথা নেড়ে বললে, 'ওঃ, সেজন্যে ভেবো না তুমি, সে আমি ঠিক ক'রেই এসেছি।'

ক্ষিতীশকে চোখে দেখবার পর এই প্রথম একটু হাসি ফুটল পারিজাতের মুখে। একটু ভেবে

বলল, 'তাহ'লে তোমার ঠিকানা রেখে যাও, আমি আপিসে খবর-টবর নিয়ে—'

ক্ষিতীশ হাত তুলে তাকে থামাল—'আ-হা—আমি এখানেই থাকব।'

'এখানে মানে?'

'মানে, তোমার এখানে। আর তো কেউ নেই আমার কলকাতায়, মেসে-হোটেলে থাকবার পয়সাও নেই। এ আমি শম্ভুর কথা শুনেই ভেবে রেখেছি।'

মিনিটখানেক কোনও কথা বলতে পারল না পারিজাত। মনে-মনে শম্ভুকে দুটো-তিনটে ইংরেজি গাল দিলে, ক্ষিতীশের উপযুক্ত কোনও বিশেষণ মনে আনতে পারল না। ক্ষিতীশ তার চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'চাকরি হ'লেই আমি মেসে-টেসে চ'লে যাব—নিশ্চয়ই যাব—কিন্তু যদ্দিন না হয়, আমার তো কোনও উপায় নেই ভাই। সেইজন্যই—চাকরিটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়—'

'কিন্তু শোবে কোথায়?' পারিজাতের গলা হঠাৎ অনেকখানি চ'ড়ে গেল। 'দু-খানা মাত্র ঘর আমাদের; একটাতে আমরা শুই, আরেকখানা তো এই—বসবার ঘর।'

'বসবার ঘরে তো আর সারা রাত লোক ব'সে থাকবে না—এখানেই আমি শোব।'

'পাগল! দেখছ না কী-রকম জিনিসপত্রে ঠাসা—জায়গা কোথায়?'

'ঐ কোণটাতে— মেঝেতে একজনের বিছানায় কতটুকুই বা জায়াগা লাগবে—চেয়ার দুটো একটু সরালেই হবে—'

চেয়ার সরাবার কথায় পারিজাতের মনে হ'ল কেউ যেন তার দুটো কাঁচা দাঁত উপড়ে ফেলতে চাচ্ছে। কী মুশকিল! এই সক্কালবেলাতেই কী মুশকিল! এদিকে আপিসের বেলা হ'তে চলল বুঝি।

কী বলবে, কী করবে কিছু ভেবে না পেয়ে পারিজাত অস্ফুটস্বরে 'একট বসো' ব'লে আকস্মিকভাবে বেরিয়ে গেল, এবং দ্রুত পায়ে চলে এল বারান্দায়, চায়ের টেবিলে।

স্টেটসম্যানটা টেবিলের উপর ছড়িয়ে নিয়ে মন্দিরা সিনেমার বিজ্ঞাপনগুলো দেখছিল। চোখ তুলে বললে, 'এতক্ষণ কী করলে? চা তো জল হ'য়ে গেল।'

'আর বলো না!' সর-পড়া ঠাণ্ডা চায়েই চুমুক দিল পারিজাত।

'লোকটা কে?'

'ক্ষিতীশ।'

'ক্ষিতীশ।' ভুরু কুঁচকোলো মন্দিরা।

'তুমি চেনো না—কলেজে আমার সঙ্গে পড়ত—'

'কী চায়?'

'চাকরি।'

'চাকরি চায় তো তোমার কাছে কী?'

'কে ওকে বলেছে আমি ইচ্ছে করলেই ঢুকিয়ে দিতে পারি—' বলতে-বলতে আবার একটু খুশির ঝিলিক লাগল পারিজাতের গালে। 'কী করি এখন বলো তো?'

'কী আবার করবে—' মন্দিরার ঠোঁটের এমন একটু ভঙ্গি হ'ল যেন বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট করতে সে চায় না।

'মেয়ে হ'লে না-হয় দাস-সাহেবকে ধ'রে পড়া যেত, কিন্তু—'

স্টেটসম্যানটাকে সচারু ভাঁজ করতে-করতে মন্দিরা বলল, 'বিবাহিত পুরুষের মুখে এ-সব রসিকতা অত্যন্ত অশোভন।'

হঠাৎ এ-রকম একটা থাপ্পড় খেয়ে পারিজাত ঐ ঠাণ্ডা চায়ের অবশিষ্টটুকু গিলে ফেলল। তারপর মুখে বেপরোয়া রকমের হাসি টেনে এনে বললে, 'রসিকতা তো করিনি, সত্যি কথাই বলেছিলাম।

হয়েছে কী; মেয়েদের ম্যাট্রিক হ'লেও চাকরি হ'তে পারে, কিন্তু পুরুষের অন্তত বি. এ. পাশ না-হলে কোনও আশাই নেই।'

'বন্ধুটি বুঝি ফেলটুশ?'

'বন্ধু আর কী—এক হস্টেলে থাকতাম—একটা সময়ে ও আমার কেমন-একটু ভক্তই হ'য়ে পড়েছিল। ঐ এক রকমের আর কি—ডন-কুস্তি করত, হস্টেলে বাজি রেখে একলা ভাত খেত তিনজনের—মাথায় বিশেষ কিছু নেই, আর নেই ব'লে দুঃখও নেই। চাকরি আজকাল শস্তা বটে, কিন্তু ওর চাকরি হওয়া...'

'তা তোমারই বা এত ভাবনা কেন ওর জন্য?'

সকালে চায়ের পরের সিগারেটটি, দিনের প্রথম সিগারেটটি পারিজাত এতক্ষণে ধরাল। নিচু গলায় বলল, 'মুশকিল হয়েছে, ক্ষিতীশ বলছে যদ্দিন চাকরি না হয় এখানেই থাকবে।'

'সে কী!' আর-একটু হ'লেই যেন দম আটকে গিয়েছিল মন্দিরার।

'বাক্স-বিছানা নিয়েই এসেছে একেবারে।'

আবার মন্দিরা বল্ল, 'সে কী!' ঠোঁট তার খোলাই রইল, কিন্তু আর-কোনও কথা বেরল না।

'কী যে করি এখন—

'কী আবার করবে!' হঠাৎ মন্দিরার গলা খুলল। 'চ'লে যেতে বলো—এক্ষুনি চ'লে যেতে বলো!'

'আস্তে!'

'কী ইরেসপনসিবল!' গলা যেটুক নামাতে হ'ল, সেটুকু মন্দিরা পুষিয়ে নিল সজোরে মাথা ঝেঁকে। 'তুমি বলতে পারলে না স্পষ্ট ক'রে?'

'বলেছিলাম তো—'

'তো আবার কী! তেমন ক'রে বললে থাকতে পারে নাকি কোনও মানুষ! ইম্বেসিল তো নয়!... কী, ব'সে আছ যে? ওঠো, বলো গিয়ে!' এক সেকেণ্ড, দু-সেকেণ্ড অপেক্ষা ক'রে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল মন্দিরা। —'চলো, আমিও যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, তা-ই ভাল, তা-ই ভাল,' বলতে-বলতে পারিজাতও চেয়ার ছেড়ে উঠল। তোমার সঙ্গে ইনট্রোডাকশনটাও হ'য়ে যাবে ওর।... শোনো, একবারে যা-তা কিছু ব'লে বোসো না, এককালে তো বন্ধুগোছেরই ছিল।'

'তোমার বন্ধুকে আমি এইটে শুধু বুঝিয়ে দেব যে এখানে থাকা তাঁর হ'তে পারে না, আর এ-রকম একটা কথা কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে মূঢ়তা হয়েছে।' —এই ব'লে মন্দিরা শোবার ঘরে ঢুকল, মিনিটখানেক পরেই বেরিয়ে এল একটু বদল হ'য়ে, চুল ফিটফাট, মুখে একপোঁচ পাউডার, শাড়িটি আঁটো। —'চলো।'

পরদা সরিয়ে বসবার ঘরে ঢুকল দু-জনে, কিন্তু কোথায় ক্ষিতীশ? তাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে—চকিতে কথাটা খেলে গেল পারিজাতের মনে—চ'লে গেল নাকি কিছু না-বলে? না—তার বাক্স-বিছানা তো প'ড়ে আছে তেমনি। হঠাৎ চোখে পড়ল, লম্বা সোফাটায় লম্বা হ'য়ে শুয়ে আছে ক্ষিতীশ, শুয়ে ঘুমুচ্ছে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে, তার মৃদু নাক-ডাকের শব্দ কেঁপে-কেঁপে ভাসছে ঘরের মধ্যে। তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি করল একবার; পারিজাত হাত উল্‌টিয়ে বললে, 'বাঃ!'

মন্দিরা বললে, 'ডাকো। ডেকে তোলো!'

পারিজাত ডাকল, গলা চড়াল, গায়ে ধাক্কা দিল, একবার চুল ধ'রেও টানল, কিন্তু ঘুম ভাঙল না! শেষটায় নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'থাক।'

'থাক মানে!'

'কাল ট্রেনে সারারাত ঘুমোতে পারেনি বোধহয়—'

'তাই ব'লে এই সোফার উপর প'ড়ে ঘুমুতে হবে। গেল, স্প্রিংগুলো গেল।'

'তা-ই দেখছি,' স্ত্রীর কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিল পারিজাত। 'কিন্তু এখন তো কিছুই করা গেল না। আপাতত আপিস—ও বেলা দেখা যাবে।'

মেঝেতে পা ঠুকে মন্দিরা ফোঁশ ক'রে উঠল—'ইন-সাফরেবল্‌।'

২

আগে বাড়ি ফিরল মন্দিবা। ফিরেই প্রথমে বসবার ঘরে ঢুকল—হ্যাঁ, ঠিক আছে বাক্স-বিছানা, একটুও নড়চড় নেই। দাঁতে দাঁত চেপে শোবার ঘরে এল ; শাড়ি ছেড়ে, শাড়ি পাট ক'রে, রোজকার অভ্যেস মতো একটু শুয়ে নিতে যাবে এমন সময় বারান্দায় দরজার বাইরে মোটা গলা শোনা গেল: 'বৌদি ফিরলেন নাকি?'

মন্দিবা একবার ভাবল জবাব দেবে না, ঘুমের ভাব ক'রে শুয়ে থাকবে, কিন্তু তাতে তো আর লোকটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না সত্যি। বরং শিগগিরই মোকাবিলা হওয়া ভাল। অতএব আয়নার সামনে মাত্র দু-তিন সেকেণ্ড দাঁড়িয়েই বারান্দায় বেরিয়ে এল সে।

গেঞ্জি গায়ে ক্ষিতীশ হাত জোড় ক'রে নমস্কার ক'রে বলল, 'আসুন, বৌদি। পারিজাত ফিরল না?'

'ওঁর আজ আবার কমার্স-ক্লাশ আছে।'

'আবার কমার্স-ক্লাশ। ধন্য ছেলে। ফিরতে রাত হবে বোধহয়?'

'তা হবে।'

'তাহ'লে আপনি এখন চা খাবেন?'

'হ্যাঁ, খাব—' ব'লেই উনুনের দিকে তাকিয়ে মন্দিরা দেখল চাপানো কেৎলির মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরচ্ছে। একটু অবাকই হ'ল—সরলাকে তার বলা আছে সে না-ফেরা পর্যন্ত উনুনে আঁচ দেবে না, যেমন-তেমন কয়লা পোড়ালে তো চলে না আজকাল। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'সরলা!'

'সরলা বেরিয়ে গেছে খানিক আগে—'

'বেরিয়েছে? কেন?' যেন ক্ষিতীশের কাছেই কৈফিৎ তলব করল মন্দিরা।

'কে তাব দেশের লোক এসেছে,' মুখটা একটু অপরাধী-মতো ক'রে ক্ষিতীশ জবাব দিল। 'আসবে এক্ষুনি।'

মন্দিরা কপাল কুঁচকে বললে, 'এ-রকম না-ব'লে বেরুনো ভালবাসি না আমি।'

'ঠিক না-ব'লে তো যায়নি, আমাকে ব'লে গেছে। আমি তো আছি, তাই তাকে বললুম, "আচ্ছা যাও, ঘুরে এসো।" লোক মন্দ না সরলা, বেশ যত্ন ক'রে খাইয়েছে আমাকে।...ব'সে ব'সে আর সময় কাটছিল না আমার, তাই উনুটা ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে রাখলুম। বাড়ি ফিরেই চা তৈরি পেলে ভাল লাগে না? যা কষ্ট আপিসে—আমাদেরই কষ্ট, আপনাদের তো কথাই নেই।'

শেষের কথাটা, স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে এই ভেদজ্ঞান, মন্দিরার ভাল লাগল না, কিন্তু সে-বিষয়ে নিজের মতটা অব্যক্ত রেখে শুধু বলল, 'আপনি ··· উনুন ধরিয়েছেন?'

'কেন, ভাল ধরেনি বুঝি?' ক্ষিতীশ হেসে বলল। 'জল কিন্তু ফুটেছে। চা করি?'

'সে কী। আপনি কেন ···'

'আহা-হা—আপনি সারাদিন খেটে এলেন—আর আমি তো কিছুই করিনি, না-হয় চা-টাই করলাম—' বলতে-বলতে ক্ষিতীশ উনুনের ধারে উবু-হাঁটু হ'য়ে ব'সে চায়ের বাসন সাজাতে লাগল। —'হস্টেলে কত চা ক'রে খাইয়েছি পারিজাতদের, রান্নাও করেছি। এ-সব বেশ ভালই লাগে আমার—

এই কৌটোয় চা?—কিন্তু এ-সব ক'রে তো আর দিন কাটে না। হয়েছে কী, আমি একটু মোটা কিনা, তাই একটু কুঁড়ে, সে-রকম চেষ্টাই করলাম না কোনদিন—কিন্তু এখন এমন হয়েছে যে চাকরি না-হ'লে আর চলে না। একটু বলবেন, বৌদি, পারিজাতকে—সত্যি বড্ড দরকার আমার।'

খাবার টেবিলের একটি চেয়ারে ব'সে, টেবিলে কনুই আর গালে হাত রেখে মন্দিরা ক্ষিতীশের নড়াচড়া লক্ষ করছিল, আর তার মনে বিস্ময় ছাড়িয়ে উঠছিল বিরক্তি, কৌতুক ছাড়িয়ে কেমন-একটা অসহায় ভাব। অসহায় ভাবটা এইজন্যে যে এ-রকম মানুষকে কী ক'রে বোঝানো যাবে তার এখানে থাকাটা কতখানি দুশ্চিন্তা। মন্দিরা পর্যন্ত ভেবে পেল না ঠিক কী-রকম ক'রে বললে কাজ হবে।

আবেদন জানিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ক্ষিতীশ; কোনও জবাব না-পেয়ে টী-পটে গরম জল ঢালতে-ঢালতে আবার বলল, 'একটু বলবেন? আমি মনে-মনে একেবারে প্রতিজ্ঞা করেছি এবার, যা-হোক কিছু করবই। দেখুন না, আপনি মেয়ে হ'য়েও চাকরি করছেন, আর আমি এত বড়ো একটা শরীর নিয়ে শুধু খাচ্ছি আর ঘুমুচ্ছি, এ কী দেখতেই ভাল?'

এবার আর মন্দিরা জবাব না-দিয়ে পারল না: 'আপনি বুঝি মেয়ে আর পুরুষকে দুটো আলাদা জাত ছাড়া ভাবতে পারেন না?'

টী-পটে গরম জল ঢালতে-ঢালতে ক্ষিতীশ বলল, 'বা রে, মেয়ে আর পুরুষ তো আলাদা জাতই—তা নিয়ে কোনও কথা আছে নাকি আবার?'

'তবে আপনি যে পুরুষ হ'য়ে স্ত্রীলোকের কাজ করছেন?'

এ-কথার কোনও জবাব দিল না ক্ষিতীশ। ট্রে সাজিয়ে টেবিলে এনে রেখে দাঁড়িয়ে রইল। একে তো গেঞ্জি পরা, তার উপর মুখখানা তার বড্ড সাধারণ—হঠাৎ মন্দিরার মনে হ'ল যে বাড়ির চাকর হ'লে ক্ষিতীশকে খুব ভালই মানাত। কথাটা ভেবে হাসি পেল তার, হাসি লুকোবার জন্য মুখ নিচু ক'রে বলল, 'বসুন।'

ক্ষিতীশ ব'সে বলল, 'চা-টা আপনিই ঢেলে নিন, ওটা মেয়েদেরই কাজ।'

চায়ের ট্রে কাছে টেনে নিয়ে মন্দিরা বলল, 'একটা মোটে পেয়ালা—আপনি?'

'আমার কিছু দরকার নেই চায়ের ··· আচ্ছা দিন, আপনার সঙ্গে ব'সে খাই একটু।'

উঠে গিয়ে আর একটা পেয়ালা নিয়ে এল মন্দিরা। চা ঢালতে-ঢালতে বলল, 'সকালে দেখা হ'ল না আপনার সঙ্গে—'

'ঐ তো দোষ আমার—ঘুমটা একটু বেশি,' ক্ষিতীশ অল্প-অল্প লাল হ'য়ে উঠল। 'আর কোনটাই বা দোষ নয়, বলুন? এই তো হঠাৎ চ'লে এসে কত অসুবিধে করলুম আপনার।'

মুখে সুপরিমিত গাম্ভীর্য এনে মন্দিরা জবাব দিল, 'অসুবিধে আপনারই। দেখছেন তো কতটুকু বাড়ি, একজন গেস্ট রাখতে পারি, এমন উপায়ই নেই আমাদের।'

'আমি আবার গেস্ট!' ক্ষিতীশ হাসল। আমাকে আশ্রিত ব'লে ভাববেন, তাহ'লেই আর খারাপ লাগবে না।'

'আশ্রয় দিতে পারি এমন শক্তিও কি আমাদের আছে।'

'শক্তি কিছু লাগে না, ইচ্ছে থাকলেই হ'য়ে যায়। ··· চা-টা বেশ হ'য়েছে, বৌদি, অ্যাঁ?'

মন্দিরা আর-কিছু বলল না, মুখ নিচু ক'রে চুমুক দিতে লাগল পেয়ালায়। 'বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে'—এই রকম একটা সাংঘাতিক কথাই কি ক্ষিতীশ বলিয়ে নিতে চায় তাকে দিয়ে? এ-রকম কথা সে যে বলতে পারে না তা নয়, কিন্তু তাতে তো এইটেই প্রমাণ হবে যে সে, মন্দিরা, অত্যন্ত মন্দ মানুষ, অভদ্র, অন্ন-পরানি; যে পারিজাত লোক ভাল, কিন্তু তার স্ত্রী—ওরে বাবা। বাপের বাড়িতে মন্দিরা দেখেছে যত অপ্রিয় কাজ বাবা মা-কে দিয়ে করিয়ে নেন—সুবিধেটা ভোগ করেন বাবা, আর

নিন্দে হয় মা-র। কেন, মন্দিরা ঠোঁট কামড়ে ভাবল, কেন আমি দুর্নাম কুড়োতে যাব এর কাছে, পারিজাত যা পারে করবে—কিংবা করবে না। বেকার বন্ধুকে আশ্রয় দেবার মতো বড়োলোক সে যদি হ'য়ে থাকে তো আমার কী।

'বৌদি, রাগ করলেন?'

'কেন, রাগ কেন?' চোখ তুলে তাকিয়ে মুখে শুকনো একটু হাসি টানল মন্দিরা।

'মনে হচ্ছে আমার সংসর্গ আর ভাল লাগছে না আপনার। তা যাই, আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি—এই যে আপনার সরলাও এসে গেছে।'

'সরলা আমাকে পাহারাও দেবে না, সঙ্গও দেবে না—একা থেকে অভ্যেস আছে আমার।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' ব'লে ক্ষিতীশ চ'লে গেল।

৩

পারিজাতের ফিরতে রাত হ'ল সেদিন, স্বামী-স্ত্রীতে নির্জনে দেখা হ'ল একেবারে খাওয়ার পরে শোবার ঘরে। একটুও দেরি না-ক'রে মন্দিরা বলল, 'তোমার বন্ধু তাহ'লে এখানেই থাকছেন?'

'কেন, তুমি ওকে বলোনি?'

'আমি? আমি কেন বলব? তুমি মুখ বুজে চুপ ক'রে থাকবে, আর লোকের সঙ্গে অভদ্রতা করব বুঝি আমি?'

'হয়েছে—আর মেজাজ খারাপ কোরো না, শোও এসে।'

'মেজাজ কী আর সাধে খারাপ হয়।' শোবার ঘর আর বসবার ঘরের মাঝখানকার দরজাটার দিকে তাকাল মন্দিরা। 'ঐ দরজাটা দিয়েই যা একটু হাওয়া আসে এ-ঘরে—তা-ও বন্ধ ক'রে শুতে হবে। উঃ, দম আটকে আসছে গরমে।'

'আরে না। অত গরম না। এসো।'

গায়ের জমকালো ব্লাউজটা খুলে ফেলে মন্দিরা কাঁচুলির উপর শাড়ির আঁচল জড়িয়ে নিল। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে ব'সে নিজের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি কী ভাবছ আমি বলিনি? বলেছিলাম। ভদ্রলোক ভদ্রলোককে যেমন ক'রে বলে তেমনি ক'রেই বলেছিলাম। কিন্তু লোকটা হয় খুব বোকা, একেবারে কিছুই বোঝে না, নয় খুব চালাক— বোঝে, কিন্তু না বোঝার ভান ক'রে নিজের কাজ বাগিয়ে নেয়।'

'তা বাগিয়ে আর কী নিচ্ছে—'

'নিচ্ছে না! আজকাল কেউ কাউকে একবেলা নেমন্তন্ন করে না, আর—! লোকেরই বা দোষ কী—পয়সা হ'লেই কী জিনিস জোটে এ-দিনে, তাছাড়া পয়সাই বা আসে কোত্থেকে। কেন, কলকাতা শহরে ওঁর দূর সম্পর্কের মাসি-পিসিও কেউ ছিল না?'

পারিজাত আস্তে-আস্তে বললে, 'মাসি-পিসির চাইতে বন্ধুপত্নীকে যদি পছন্দ ক'রে থাকে, তোমার পক্ষে তো সেটা গৌরবের কথাই।'

'কী আমার বন্ধুপত্নী রে।' আয়নার দিকে আর-একবার তাকিয়ে মন্দিরা উঠে এসে খাটে বসল। 'আসল কথা, মাসি-পিসি কেউ বরদাস্ত না করুক, বন্ধুপত্নী তো চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারবে না— চমৎকার ফিকির!' একটু থেমে, পা দুটি খাটের উপর তুলে দিয়ে হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো হাসির বুড়বুড়ি তুলে বললে, 'ক—ত্ত খেলো!'

বালিশে কনুই আর হাতের উপর মাথা রেখে স্ত্রীর দিকে একটু তাকিয়ে পারিজাত বললে, 'রুটিটা বোধহয় একটু কমই হয়েছিল ওর—আর তরকারি তো ছিলই না।'

'তা বেশ। আমি তো আর কন্তুর হব না—তুমিই হবে।' মন্দিরা ধুপ ক'রে স্বামীর পাশে শুয়ে

পড়ল। উল্টো দিকে মুখ ক'রে বলতে লাগল, 'আবদার দ্যাখো না—চাকুরি জুটিয়ে দিতে হবে, আর চাকরি যদ্দিন না হবে এখানেই থাকবেন। এ তো দেখছি ব্ল্যাকমেইল!'

'আহা—এত বলছ কেন,' পারিজাত স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখল, 'দু-চারদিনের বেশি তো আর থাকবে না। আমি ওকে ভাল-ভাল টিপ দিয়ে দেব—চাকরি একটা হ'য়েই যাবে।'

'আর-কী! নিজের কাজকর্ম ফেলে বন্ধুর চাকরির ধান্দায় ঘোরো এখন।'

'তোমার দেওরের জন্য একটু না-হয় ঘুরলামই।'

'ঐ তো: ও আমাকে বৌদি-বৌদি করে কেন বলো তো? বারণ ক'রে দিও।'

'কেন, দোষ কী।'

'মাগো, অত্ত বড়ো একটা ঢেঁকি ক্ষিতীশের বৌদি হ'তে হ'লেই গিয়েছি আর কী আমি,' ব'লে মন্দিরা পাশ ফিরল। পারিজাত নিঃশব্দে উঠে ঘরের আলো নিবিয়ে দিল। একটু পরে ক্ষিতীশের কথা দু-জনেই ভুলে গেল।

৪

পরের দিন সকালে মন্দিরা সরলাকে বাজারের পয়সা দিতে যাচ্ছে, ক্ষিতীশ তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাকে দিন, বাজারটা নিয়ে আসি।'

'না. না!, আপনি কেন—'

'তাতে কী। সরলার চাইতে ভাল যদি না করি তাহ'লে আর না-হয় দেবেন না।· · বলুন. কী-কী আনতে হবে।'

মন্দিরা যা-যা ব'লে দিল তার চেয়ে কিছু বেশিই নিয়ে এল ক্ষিতীশ। সরলা তাতে সুখী হ'ল না, কর্ত্রীর কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করল যে মাছটা পচা এবং তরকারিটা বাসি। কিন্তু ও-সব কথায় কান দেবার সময় কোথায় কর্ত্রীর—আপিস না?

সেদিন স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ফিরল আপিস থেকে। সেদিনও চা তৈরি, শুধু চা-ই নয়, কয়েকখানা সুদৃশ্য সুখাদ্য ডিমের স্যাণ্ডউইচ। ক্ষিতীশ ব'সে-ব'সে বানিয়েছে। খেয়ে পারিজাত খুব তারিফ করল। মন্দিরা টিপ্পনী কাটল, 'কোনদিন তো কিছু খেয়ে ভাল বলতে শুনি না। আপনার খুব ভাগ্য দেখছি, ক্ষিতীশবাবু।'

'হ্যাঁ, ঐ রকম এক-একটা ভাগ্য হঠাৎ আমার হ'য়ে যায়,' ক্ষিতীশ একটু হাসল।

পারিজাত বলল, 'কেন, তোমার ভাল লাগছে না?'

'হ্যাঁ, ভালই তো।· · · আপনার বুঝি রান্নার শখ?'

'খুব। বলেন তো আজ রাত্রেই মাংস রেঁধে খাওয়াই।'

'বেশ তো! পারিজাত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মন্দিরা বাধা দিল—'আজ থাক না, ও-বেলার মাছ-টাছ সবই আছে যখন—'

'ভাল। মাছ-মাংস দু-ই খাওয়া হবে। কী বলো, ক্ষিতীশ—আজ রাত্রে ফিস্ট হোক,' পারিজাত হঠাৎ বেপরোয়া হ'য়ে গিয়ে একেবারে দু-দুটো বাজেট-ছাড়ানো টাকা বের ক'রে ফেলল পকেট থেকে।

দু-টাকায় একটা জ্যান্ত মুরগি নিয়ে এল ক্ষিতীশ। দেখেই মন্দিরা ব'লে উঠল, 'এ কী করছেন—কাটবে কে?'

'কেন, আমি। এর জন্য আবার দু-আনা পয়সা দিতে যাই আর কী!'

মন্দিরা চোখে হাত দিয়ে বলল, 'মাগো! বিশ্রী লাগে আমার ও-সব।'

'খেতে ব'সে অত বিশ্রী লাগবে না,' ব'লে ক্ষিতীশ মুরগি হাতে নিয়ে বাইরে চলে গেল। কাটা

ছেঁড়া ধোয়া থেকে আরম্ভ করে রান্না নামানো পর্যন্ত সব করল সে, মন্দিরা কাছাকাছি একটু ঘোরাঘুরি ক'রে যখন দেখল তার কিছুই করবার নেই তখন অগত্যা ঘরে এসে একখানা পেঙ্গুইন খুলে বসল, যাতে নিউ ওঅর্লড অর্ডরের কথা বুঝিয়ে বলা আছে।

রাত্রে শুতে এসে পারিজাত বলল, বেশ খাওয়া হ'ল আজ।'

'রোজ দশ টাকার বাজার করলে আরও ভাল হয়।'

পারিজাত কোনও জবাব দিল না এ-কথার। তারও অর্থনৈতিক বিবেকে কামড় দিচ্ছিল মাঝে-মাঝে: মুর্বগি যতই সুস্বাদু হোক, যে-টাকাটা খরচ করা হ'ল, তা তো আর ফিরে আসে না।

'বন্ধুকে দেখে খাঞ্জাখাঁ হ'য়ে উঠলে যে!' আবার চিমটি কাটল মন্দিরা।

'এ-মাসে বাইরে খাওয়াটা বাদ দিলেই হবে,' পারিজাত স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিল, এবং নিজেকেও।

'বাদ অনেক-কিছুই দিতে হবে এ-মাসে। যা একটি জুটিয়েছ! তাও যদি একটা মানুষের মতো হ'ত।'

'কেন ওর অস্তিত্বটা ছাড়া আর-কী দোষ ওর?'

'কী—! বাজার করবে, উনুন ধরাবে, রান্না করবে—বিশ্রী!'

'ও ঐ রকমই—হস্টেলে থাকতে ছেলেদের বাজ্যের কাজ ক'রে দিত। ওর যখন এ-ই ভাল লাগে, করুক না—তুমি একটু উৎসাহ দিয়ো বেচারাকে। ভাল তো—তোমার একটা হেলপিং হ্যাণ্ড হ'ল।'

'রক্ষে করো— এ-চরিত্রের পুরুষমানুষ আমার দু-চক্ষের বিষ!'

দু-চক্ষের বিষ হ'লে কী হবে, ক্ষিতীশ তো নড়ে না। ছ-দিন, দশ দিন, চোদ্দ দিন কেটে গেল। ভাবখানা এমন যেন এখানেই বাকি জীবন থাকবে। দিব্যি রুটিন-মাফিক দিন কাটছে তার। সকালে উঠে হুশহুশ ক'রে এক্সেসাইজ করে, গবগব ক'রে স্নান, বাজার ক'রে আনে এক ছুটে, পারিজাতের প্যান্ট ইস্ত্রি ক'রে দেয়, মন্দিরার ঢাকাই শাড়ি আনতে হেঁটে-হেঁটে চ'লে যায় টালিগঞ্জে ধোবার বাড়িতে—আর সন্ধেবেলার রান্নাটা সে প্রায় নিজের হাতেই নিয়েছে, রুটি গড়ে, রুটি সেঁকে, ছুরি দিয়ে ঝিরিঝিরি আলু কাটে, বরাদ্দ বাজার থেকেই এমন-সব নতুন নতুন জিনিস বানায় যে মন্দিরা সুদ্ধু মনে-মনে অবাক হয়। দুপুরবেলাটা সে একবার বেরোয় বটে চাকরির চেষ্টায়, কিন্তু মোটের উপর তার সময় কাটে সংসারের হেফাজতে— কোত্থেকে একপো চিনি জোগাড় করল, কী সের খানেক শাদা ময়দা; হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ঝাঁটা-বালতি নিয়ে বাথরুম সাফ করল একদিন, আর একদিন ভিজে খবর কাগজ ঘ'সে-ঘ'সে জানালার প্রত্যেকটি কাচ এমন ঝকঝকে ক'রে তুলল যে কাচ আছে ব'লেই বোঝা যায় না। দিনের সমস্তটা সময় একটা-না একটা কাজ সে জুটিয়েই নেয়, তারপর রাত্রে খাওয়ার পরে আর যখন কিছুই করবার থাকে না, তখন আস্তে-আস্তে ফ্যাশনেবল বসবার ঘরটির আসবাব-সজ্জার একটুও ব্যাঘাত না-ক'রে এক কোণে বিছানাটি পেতে শুয়ে পড়ে—আর, অবশ্য, তার শুয়ে পড়া আর ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে মাত্রই কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধান।

এইরকম ক'রে প্রায় কুড়ি দিন যখন কেটেছে, তখন মন্দিরা আবার একদিন প্রসঙ্গ উত্থাপন করল: 'আর কতকাল পুষবে বন্ধুরত্নটিকে?'

পারিজাত গম্ভীর মুখে বললে, 'আমিও তাই ভাবছি।'

'তুমি কি—এতদিনেও বিদেয় করতে পারলে না ওকে!'

'আমি তো ভেবেছিলাম ও-কাজ তুমিই ভাল পারবে আমার চেয়ে।'

'পারতাম নাকি আর, কিন্তু এমন করে—বলতে গেলে সংসারের সব কাজ তো ও-ই চালাচ্ছে—কিছু বলাও যায় না, সওয়াও যায় না।'

'তা যা-ই বলো, ও থাকাতে তোমার সুবিধেই হচ্ছে অনেকটা—আপিস থেকে এসে কিছুই আর

করতে হয় না।'

গায়ের আড়মোড়া ভেঙে মন্দিরা বলল, 'এ সুবিধে তো সুবিধে নয় ; ও আছে ব'লে সরলাকে তো আর তুলে দিতে পারছি না।'

'না,' পারিজাত একটু ভাবল, 'তা কী ক'রে দেবে। ক্ষিতীশের নিশ্চয়তা কী—যে-কোনদিন চ'লে যেতে পারে।'

'সে-ই তো।' মন্দিরা তার খোলা চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল। 'যক্ষুনি একটা চাকরি হবে তক্ষুনি তো পাখা মেলে উড়বে, যে ক'দিন না হয় তা-না-না-না ক'রে কাটিয়ে দিচ্ছে দিব্যি। দেখতে বোকা হ'লে কী হবে, তালে ঠিক আছে।'

'তা তুমি যদি বলো তোমার চাকরিতেই না হয় পার্মানেন্ট ক'রে দিই ওকে।'

'কী ফাজলেমি করো সব সময়। ভাল লাগে না।' মন্দিরা মাথা ঝাঁকাল এত জোরে যে তার চুলের একটি গুচ্ছ গালে এসে পড়ল, আর তা-ই দেখে তখনকার মতো পারিজাতের মনে হ'ল যে ক্ষিতীশের প্রসঙ্গটা এমন আর জরুরি কী। কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম তার মনে পড়ল ক্ষিতীশের কথা। স্নান করতে-করতে সে-কথা ভাবল, ট্রামে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবল, আপিসে ব'সে-ব'সে ভাবল। আর আপিস ছুটি হবার আগে রীতিমত মনস্থির ক'রে ফেলল সে: এর একটা বিহিত করতেই হবে, আজই করতে হবে, আপিস থেকে ফিরেই। কী ক'রে কথাটা পাড়বে, কোন কথার পর কী বলবে, ক্ষিতীশ যা-যা বলতে পারে তার কী উত্তর দেবে—সব সাজালো মনে-মনে। কোনও কথা এমন বলবে না যাতে ক্ষিতীশ মনে কষ্ট পায়; গম্ভীর ভাষায়, বিচক্ষণ ভঙ্গিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবে—সেই সঙ্গে সহানুভূতির ভাবটা বজায় রাখবে বরাবর, এবং এমন সুপরামর্শ দেবে যার জন্য ক্ষিতীশ, যদি তার মধ্যে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞই হবে মনে-মনে।

সেদিন শনিবার। স্বামী-স্ত্রী একটু আগেই আপিস ছাড়ল, কিন্তু বাড়ি এসে দেখল ক্ষিতীশ নেই। একটু রাগ হ'ল পারিজাতের; এত কথা সে মনে-মনে গুছিয়ে রেখেছে বলবার জন্য, আর ক্ষিতীশ কিনা বাড়িতে ব'সে অপেক্ষাও করতে পারল না। পারিজাত শুলো না, কাপড়ও ছাড়ল না, সারা সপ্তাহের পরিশ্রম দিয়ে উপার্জিত শনিবারের এই অমূল্য বিকেলটিতে একা-একা ব'সে রইল সোজা হ'য়ে বসবার ঘরে, পায়ে ফিতেওলা জুতো, গলায় নেকটাইয়ের ফাঁস। এ-ই ভাল, মনকে একটু ঢিল দিলেই হয়তো আর বলা হবে না, হয়তো কথাগুলি গুলিয়ে যাবে। ব'সে-ব'সে যেটুকু মেজাজ খারাপ হচ্ছে তাতে ভালই হবে; কথাগুলি বেরোবে বেশ কাটাকাটা পরিষ্কার হ'য়ে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। 'ক্ষিতীশ নাকি?' হাঁক দিল পারিজাত।

'হ্যাঁ, আমি,' পরদা ধ'রে দরজার ধারে দাঁড়াল ক্ষিতীশ।

'তুমি এখানে ব'সে আছো? কারও আসবার কথা নাকি?'

'তোমার জন্যই ব'সে আছি,' একটু যেন সস্নেহ সুরেই পারিজাত বলল।

'কেন?'

'এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

হতচ্ছাড়া চেহারার স্যাণ্ডেল জোড়া বাইরে রেখে ধুলোমাখা মস্ত-মস্ত পা নিয়ে ঘরে ঢুকে ক্ষিতীশ হাসিমুখে বলল, 'আমারও কথা আছে। আজ আমার কপাল খুলে গেছে হঠাৎ।'

'কী হ'ল?'

'বীরেনকে মনে আছে তোমার—ফিলজফি-অনার্সের বীরেন? সেদিন হঠাৎ রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা। কর্পোরেশনের স্কুল-ইনস্পেক্টর হয়েছে সে—কথায় কথায় বলল, "তোমার সেই পঞ্চাশ টাকা এবার শোধ ক'রে দেব, শনিবার এসো একবার আমার আপিসে।" হস্টেলে থাকতে কবে টাকা নিয়েছিল—তা আবার মনে ক'রে রেখেছে। যা-ই হোক, গিয়েছিলাম আজ, যেতেই পঁচিশটা টাকা

দিয়ে দিল, সামনের মাসে আবার দেবে বলেছে। নিতে লজ্জা করল—বিয়ে করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে, কত দরকার—কিন্তু আমারও তো—'

'নিশ্চয়ই! এ-সব বিষয়ে চক্ষুলজ্জা কিছু না; আর বীরেনেরও আত্মসম্মান আছে, সে-ই বা তোমার টাকা রাখবে কেন?' পারিজাত বেশ সোৎসাহেই আরম্ভ করেছিল কথাটা, কিন্তু বলতে-বলতে তার কণ্ঠস্বর কেমন মিইয়ে এল, হঠাৎ মনে পড়ল হস্টেলে থাকতে সে-ও দু-টাকা চার টাকা ক'রে কম নেয়নি ক্ষিতীশের কাছে, কখনও শোধ করেনি। এমন অনেকেই অনেক নিয়েছে, কারুরই কখনও মনে হয়নি ফেরত দেবার কথা—ওঃ ক্ষিতীশ! ওর আবার টাকার কী দরকার! সকলেরই মনের ভাবটা এই রকম। একটু অস্বস্তি বোধ করল পারিজাত, তার ভাল-ভাল সাজানো কথাগুলি একটু যেন এলোমেলো হ'য়ে গেল।

'তা শোনো,' ঈষৎ সলজ্জভাবে ক্ষিতীশ বলল, টাকাটা পেয়েই মেট্রোর তিনখানা টিকিট কিনে এনেছি আমি।'

'ভাল করোনি,' আত্মস্থতা ফিরে পেয়ে পারিজাত বলল, 'এত কষ্ট পাচ্ছ, তবু তোমার অপব্যয়ের বদভ্যাস ঘুচল না।'

'অপব্যয় কিসের, আর কষ্টই বা এমন-কী পাচ্ছি,' ক্ষিতীশের সমস্ত মুখে ভাঁজে-ভাঁজে হাসি ছড়িয়ে পড়ল, পারিজাত ভেবে পেল না কোন সুখে। 'সবাই মিলে একদিন সিনেমায় যাব, বেশ তো, আমার তো বেশ ভালই লাগছে।'

মনে-মনে পারিজাতেরও যে ভাল না-লাগছিল তা নয়। ক্ষিতীশ আসবার পর একদিনও সিনেমায় যায়নি তারা; ক্ষিতীশের জন্য যে খরচটা হচ্ছে অন্য উপায়ে সেটা বাঁচাবার চেষ্টা তো অন্তত করতে হবে। আর মেট্রোতে যে ছবিটা এখন দেখাচ্ছে সেটা খুবই ভাল ব'লে সে শুনেছে। ক্ষিতীশ যদি নিয়ে যায় তো ভালই, নিয়ে যাওয়াই তো তার উচিত।

'আচ্ছা, আমি তা'হলে চায়ের জোগাড় করিগে,' ব'লে ক্ষিতীশ উঠে বেরিয়ে গেল। পারিজাত বাধা দিতে পারল না, বলতে পারল না, বোসো একটু, আমার কথাটা ব'লে নিই। এত তৈরি হ'য়েও আসল কথাটা বলাই হ'ল না; ক্ষিতীশ সিনেমার টিকিট কিনে এনে পণ্ড ক'রে দিল। তা...সিনেমাটা এখন দেখে আসি তো...ফিরে এসে...না-হয় কাল...নিশ্চয়ই।

৫

সিনেমা থেকে বেরিয়ে ক্ষিতীশ বলল, 'বাব্ বাঃ, যুদ্ধের ছবি জানলে কে আসত!'

'কেন,' মন্দিরা হাত-ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, 'যুদ্ধের ছবি ভাল লাগে না আপনার?'

'না, যুদ্ধ-টুদ্ধ আমার ভাল লাগে না।'

'যুদ্ধ-টুদ্ধ ভাল লাগে না!' পারিজাত হো-হো ক'রে হেসে উঠল। 'তাই তো, তোমার ভাল লাগে না, অথচ পৃথিবী ভ'রে এত বড় একটা যুদ্ধ ঘ'টে যাচ্ছে। ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়!'

এ-কথায় ক্ষিতীশ কতখানি লজ্জিত হ'ল তা বোঝা গেল না—রাস্তার অন্ধকারে তার মুখ ঢাকা পড়ল। আলো-নেবানো চৌরঙ্গিতে খাকির অফুরন্ত ভিড়। পা টিপে-টিপে হাঁটতে হয়। আস্তে-আস্তে ট্রাম-স্টপের দিকে এগোতে-এগোতে ক্ষিতীশই আবার কথা বলল, 'নাঃ, এর মধ্যে কোনও ভদ্রমহিলার বেরনোই উচিত নয়।'

'কেন, ভয় করছে নাকি আপনার?' এবার হেসে উঠল মন্দিরা, মাথা দুলিয়ে, খিলখিল ক'রে। ঠিক তক্ষুনি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সার বেঁধে চারজন সৈনিক, একজন হঠাৎ একটু থেমে মন্দিরার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠল, 'What a peach!' ব'লে একবার চোখ টিপল।'

মন্দিরার, পারিজাতের দু-জনেরই মুখের রং বদলে গেল। ক্ষিতীশ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনলে!

শুনলে কী বলল!'

ঠোঁটের উপর একবার জিভ বুলিয়ে পারিজাত তাড়াতাড়ি বললে, 'কিছু না, ও কিছু না—চলো!'

'পাগল! এর জবাব দিতে হবে না। একটু দাঁড়াও তোমরা—'

'ওই—!' পারিজাত প্রাণপণে ক্ষিতীশের জামা টেনে ধরল, 'এই—শোনো—

কিন্তু কে শুনবে! এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ক্ষিতীশ, ছুটে গিয়ে সেই সৈনিকের হাত চেপে ধরল। জোর আওয়াজ হ'ল একটা, তারপর মুহূর্তে যেন চারিদিক থেকে খাকির দেয়াল উঠল ক্ষিতীশকে ঘিরে, হৈ-হল্লা ছুটোছুটি শুরু হ'ল রাস্তায়, কিন্তু আলোহীন রাস্তায় কিছু আর দেখা গেল না।

পারিজাতের হৃৎপিণ্ড ততক্ষণে তার কণ্ঠে উঠে এসেছে। মন্দিরার হাত ধ'রে গোলমালের উল্টো দিকে ছুটল সে, একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে বসল। বালিগঞ্জ যেতে দশ টাকা হাঁকল ট্যাক্সিওলা—তা-ই সই। পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, সার্কুলার রোড, ল্যান্সডাউন রোড—ল্যান্সডাউন রোডে এসে তবে আবার সহজে নিশ্বাস পড়ল পারিজাতের। কিন্তু সমস্ত রাস্তা দু-জনের একজনও কোনও কথা বলল না।

ক্ষিতীশ ফিরল ঘণ্টাখানেক পরে। তার চুল উশকো-খুশকো, একটা চোখ ফোলা, পাঞ্জাবিটা পিঠের কাছে ছিঁড়ে গেছে। তার দিকে একবার একটু তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল পারিজাত। জিগেস করল, 'কী হ'ল?'

'কী আবার হবে—আমাকে ছেঁকে ধরেছিল কুড়ি-পঁচিশজন—পালিয়ে বাঁচলাম। তোমরা কোথায় ছিলে?'

'আমরা—একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলুম—তাই—'

'বেশ করেছ। ও-সব গোলমালের মধ্যে না-থাকাই ভাল। আমি আবার খানিকটা খুঁজলুম তোমাদের—ততক্ষণে দোকানের কাচ-টাচ ভাঙা হচ্ছিল কিনা।

'সে কী!'

'আরে এমন একটা সুযোগ কি ছাড়বে লোকেরা! দেখতে দেখতে ভিড় জ'মে গেল—কেন, কী বৃত্তান্ত, কেউ জিজ্ঞেস করল না কিছু, যে যাকে পাচ্ছে মারছে। কালা আদমি শাদা আদমির লড়াই বেধে গেল রীতিমত। শেষটায় বাঙালি ছোকরারা দোকানের কাচে ঢিল ছুঁড়তে লাগল, আর ব্রিস্টল হোটেলে ঢুকে আছড়ে ভাঙতে লাগল চায়ের পেয়ালা, কাচের গ্লাস। গুণ্ডামিটা কিছু বেড়েছে দেশে।'

'পুলিশ?'

'পুলিশ এসেছিল নিশ্চয়ই—আমি তো আর ছিলাম না বেশিক্ষণ। নিজের প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি—যা সব লাল-লাল মুখ!'

'সত্যি! কেনই বা গিয়েছিলে তুমি—কত বারণ করলাম—' পারিজাত এতক্ষণে একটু সহজ হ'ল যেন।

'বাঃ! তাই ব'লে ঐ লোকটাকে ছেড়ে দেব! ওর একটু শিক্ষার দরকার ছিল, আর শিক্ষাটা ও ভালই নিল দেখলাম, বেশি আপত্তি করল না—ব্যস, আর তো কোনও কথা নেই এর পরে! কিন্তু রাজ্যের লোক জড়ো হ'য়ে বিশ্রী একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলল—আর আমি ভিড়ের ধাক্কাতেই ছিটকে বেরিয়ে এলাম ভিড় থেকে, তারপর আর কী আমি কোনওদিকে তাকাই! সোজা হাঁটতে লাগলাম বাড়ির দিকে।'

'হেঁটে এলে নাকি?'

'এই চেহারা নিয়ে আর ট্রামে বাস্‌-এ উঠতে ভাল লাগল না। তোমাদের বসিয়ে রাখলাম, না? বৌদি যে কিছু বলছেন না—ঘুম পেয়েছে?'

'না, ঘুম পাবে কেন,' এতক্ষণে মন্দিরা কথা বলল, তাও নিষ্প্রাণ স্বরে।

'আপনি যেন মন খারাপ ক'রে আছেন? এতে মন খারাপ করবার কী আছে—যত বাজে সব—আসুন, খাওয়া যাক এবার।'

'আপনি হাত-মুখ ধোবেন না?'

'তাহ'লে,' ক্ষিতীশের মার-খাওয়া কালো-কালো মুখটা চকচকে হ'য়ে উঠল, 'তাহ'লে চট ক'রে একটু স্নান ক'রেই আসি—দেরি হবে না, পাঁচ মিনিট—তোমরা ব'সে যাও, পারিজাত।'

পারিজাতের মনে হ'ল ক্ষিতীশের কণ্ঠস্বরে ফূর্তিটা একটু বেশি।

* * *

খেয়ে এসেই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল মন্দিরা আর পারিজাত। শোবার পরে মন্দিরার মনে পড়ল মাঝখানকার দরজাটা খোলাই আছে। ফিশফিশ ক'রে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করলে না?'

পারিজাত জবাব দিল না। মন্দিরা আবার বলল, 'শোনো—দরজাটা বন্ধ করে এসো।'

পারিজাত নড়ল না, কোনওরকম আওয়াজ করল না। ঐ দরজাটা রোজ বন্ধ করে সে, একদিনও ভুল হয় না, আজও ভুল হয়নি তার, কিন্তু...আজ কেমন যেন লজ্জা করল দরজাটা বন্ধ করতে।

স্বামীকে আরও দু-একবার ডেকেও যখন ফল হ'ল না, মন্দিরা নিজেই উঠল। দরজার কাছে গিয়েই তার হাত-পা থেমে গেল, একটু দাঁড়াল চুপ ক'রে। এ-ঘর ও-ঘর অন্ধকার, দরজায় নীল পরদা, কিছুই দেখা যায় না, কিছুই বুঝা যায় না। ক্ষিতীশ কি ঘুমিয়েছে? ভীষণ ঘুম তার, কিন্তু সত্যি সে কি শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে, রোজ? একদিনও জেগে থাকে না, একটুও না? হঠাৎ মন্দিরার মনে হ'ল ঐ ছিটকিনি লাগাবার শব্দটা রোজ রাত্রেই ক্ষিতীশ শুয়ে শুয়ে শোনে। থাকগে, ছিটকিনি না-ই লাগল, ভেজিয়ে দিলেই তো হয়। দু-হাতে দুই পাল্লা ধ'রে আস্তে, নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিল মন্দিরা, তারপর তেমনি নিঃশব্দে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল, আর অনেক, অনেক রাত পর্যন্ত দু-জনেই যদিও বুঝল যে অন্য জন ঘুমোয়নি, তবু দু-জনেই ভান করল যে দু-জনেই ঘুমিয়েছে, কেউ কাউকে একটিও কথা বলল না, অনেক, অনেক রাত পর্যন্ত।

স্বনির্বাচিত গল্প

সমুদ্রের স্বাদ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সমুদ্র দেখিবার সাধটা নীলার ছেলেবেলার। কিছুদিন স্কুলে পড়িয়াছিল। ভূগোলে পৃথিবীর স্থলভাগ আর জলভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু তার অনেক আগে হইতেই নীলা জানিত পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। সাত বছর বয়সে বাবার মুখে খবরটা শুনিয়া কী আশ্চর্যই সে হইয়া গিয়াছিল। এ কি সম্ভব? কই, সে তো রেলে চাপিয়া কত দূরদেশে ঘুরিয়া আসিয়াছে, মামাবাড়ি যাইতে সকালবেলা রেলে উঠিয়া সেই রাত্রিবেলা পর্যন্ত ক্রমাগত হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিতে হয়, কিন্তু নদীনালা খালবিল ছাড়া জল তো তার চোখে পড়ে নাই। চারিদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে জঙ্গল, আকাশ পর্যন্ত শুধু মাটি আর গাছপালা।

তারপর কত ভাবে কত উপলক্ষে ছাপার অক্ষর, মুখের কথা আর স্বপ্নের বাহনে সমুদ্র তার কাছে

আসিয়াছে। বলাইদের বাড়ির সকলে পুরী গিয়া কেবল সমুদ্র দেখা নয়, সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিল। কলিকাতায় সাহেব-কাকার ছেলে বিনুদা বিলাত গেল—সমুদ্রের বুকেই নাকি তার কাটিয়া গেল অনেকগুলি দিন। সমুদ্রের জল মেঘ হইয়া নাকি বৃষ্টি নামে, মাছ-তরকারিতে যে নুন দেওয়া হয় আর থালার পাশে একটুখানি যে নুন দিয়া মা দুবেলা ভাত বাড়িয়া দেন, সে নুন নাকি তৈরি হয় সমুদ্রের জল শুকাইয়া। সারাদিন গরমে ছটফট করিবার পর সন্ধ্যাবেলা যে ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগানোর জন্য তারা ছাদে গিয়া বসে, সে বাতাস নাকি আসে সোজা সমুদ্র হইতে!

'সমুদ্দুর বুঝি দক্ষিণ দিকে বাবা?'

'চারিদিকে সমুদ্দুর আছে। দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর—আমাদের খুব কাছে।'

ঠিক। ম্যাপে তাই আঁকা আছে। কিন্তু চারিদিকে সমুদ্র? উত্তর দিকে তো হিমালয় পর্বত, তারপর তিব্বত আর চীন! ম্যাপটা আবার ভাল করিয়া দেখিতে হইবে।

'আমায় সমুদ্দুর দেখাবে বাবা?'

বাবা অনেকবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এবারও দিলেন। সমুদ্র দেখার আর হাঙ্গামা কী? একবার তীর্থ করিতে পুরীধামে গেলেই হইল, সুবিধামত একবার বোধহয় যাইতেও হইবে। নীলার মার অনেক দিনের সাধ।

কিন্তু কেরানির স্ত্রীর সহজ সাধও কি সহজে মিটিতে চায়! অনেক কষ্টে এক রকম মরিয়া হইয়া একটা বিশেষ উপলক্ষে স্ত্রীর সাধটা যদি বা মেটানো চলে, ছেলেমেয়ের সাধ অপূর্ণই থাকিয়া যায়।

রথের সময়ে যে ভিড়টাই হয় পুরীতে, ছেলেমেয়েদের কি সঙ্গে নেওয়া চলে? তাছাড়া, সকলকে সঙ্গে নিলে টাকায়ও কুলায় না। একজনকে নিলে অন্য সকলে কী দোষ করিল? নীলা সঙ্গে গেলে ছোট ভাইবোনেদের দেখাশোনাই বা করিবে কে?

নীলাকে সঙ্গে না নেওয়ার আরও কারণ আছে।

'না গো, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে নিয়ে ওই হট্টগোলের মধ্যে যাবার ভরসা আমার নেই।'

বিয়ের যুগ্যি মেয়ে কিন্তু বিয়ের অযুগ্যি অবুঝ মেয়ের মতো কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিল। কয়েকদিন চোখের জলের নোনতা স্বাদ ছাড়া জিভ যেন তার ভুলিয়া গেল অন্য কিছুর স্বাদ। মা বাবা তীর্থ সারিয়া ফিরিয়া আসিলে কোথায় হাসিমুখে তাঁদের অভ্যর্থনা করিবে, তীর্থযাত্রার গল্প শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, একটি প্রশ্ন করিয়াই নীলা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

'সমুদ্দুরে চান করেছ বাবা ?'

গাড়ি হইতে নামিয়া সবে ঘরে পা দিয়াছেন, নীলার বাবা বসিয়া বলিলেন, 'করেছি রে, করেছি। একটু দাঁড়া, জিরিয়ে নিই, বলবোখন সব।'

কি বলিবেন? কি প্রয়োজন আছে বলিবার? নীলা কি পুরীর সমুদ্র-স্নানের বর্ণনা শোনে নাই? বলাইদের বাড়ির তিনতলার ছাদে উঠিয়া চারিদিকে যেমন আকাশ পর্যন্ত ছড়ানো স্থির অনড় রাশি রাশি বাড়ি দেখিতে পায়, তেমনি সীমাহীন জলরাশিতে বাড়ির সমান উঁচু ঢেউ উঠিতেছে নামিতেছে আর তীরের কাছে বালির উপর আছড়াইয়া পড়িয়া শাদা ফেনা হইয়া যাইতেছে, এ কল্পনায় কোথাও কি এতটুক ফাঁকি আছে নীলার? কেবল চোখে দেখা হইল না, এই যা। বাপের আদুরে মেয়ে সে। অন্তত সকলে তাই বলে, তার সমুদ্র দেখা হইল না, কিন্তু বাপ তার সমুদ্র দেখিয়া স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। নীলা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবা তাড়াতাড়ি আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'পুজোর সময় যেমন করে পারি তোকে সমুদ্র দেখিয়ে আনব নীলা, ধার করতে হলে তাও করব। কাঁদিসনে নীলা, সারারাত গাড়িতে ঘুমোতে পাইনি, দোহাই তোর, কাঁদিসনে!'

সমুদ্র দেখাইয়া আনিবার বদলে পুজোর সময় নীলাকে কাঁদাইয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

বলাই বাহুল্য যে, এবার সমুদ্র দেখা হইল না বলিয়া নীলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া চোখের জলের নোনতা স্বাদে আর সব কিছুর স্বাদ ডুবাইয়া দিল না, কাঁদিল সে বাপের শোকেই। কেবল সে একা নয় বাড়ির সকলেই কাঁদিল। কিছু দিনের জন্য মনে হইল, একটা মানুষ, বিশেষ অবস্থার বিশেষ বয়সের বিশেষ, একটা মানুষ, চিরদিনের জন্য নীলার মনের সমুদ্রের মতো দুর্বোধ্য ও রহস্যময় একটা সীমাহীন কিছুর ওপারে চলিয়া গেল, সংসারে মানুষের কান্না ছাড়া আর কিছুই করিবার থাকে না।

ছেলেবেলা হইতে আরও কতবার নীলা কাঁদিয়াছে। বাড়ির শাসনে কাঁদিয়াছে, অভিমানে কাঁদিয়াছে, খেলার সাথীর সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় কাঁদিয়াছে, পেটের ব্যথায়, ফোঁড়ায় যাতনায় কাঁদিয়াছে, সমুদ্র দেখার সাধ না মেটায় কাঁদিয়াছে, অকারণেও যে দু-চারবার কাঁদে নাই এমন নয়। এখন কষ্ট হয় কাঁদিতে !—দেহের কষ্ট, মনের কষ্ট। শরীরটা যেন ভারী হইয়া যায়, জ্বর হওয়ার মতো সর্বাঙ্গে অস্বস্তিকর ভোঁতা টনটনে যাতনা বোধ হয়, চিন্তাজগৎটা যেন বর্ষাকালের আকাশের মতো ঝাপসা হইয়া যায়, একটা চিরস্থায়ী ভিজা স্যাঁতসেঁতে ভাব থমথম করিতে থাকে। শরীর ও মন দুরকম কষ্টেরই আবার স্বাদ আছে,—বৈচিত্র্যহীন আলুনি এবং কড়া নোনতা স্বাদ।

স্বাদটা অনুভব করিবার সময় নীলার লাগে একরকম, আবার কল্পনা করিবার সময় লাগে অন্যরকম—রক্তের স্বাদের মতো। ছুরি দিয়া পেন্সিল কাটিতে, বঁটি দিয়া তরকারি কুটিতে, কোনও-কিছু দিয়া টিনের মুখ খুলিতে, নিজের অথবা ভাইদের আঙুল কাটিয়া গেলে তার প্রচলিত চিকিৎসার ব্যবস্থা অনুসারে নীলা কাটাস্থানে মুখ দিয়া চুষিতে আরম্ভ করে,—রক্তের স্বাদ তার জানা আছে।

নীলার বাবার মৃত্যুর পর সকলে মামাবাড়ি গেল। বিয়ের যুগ্যি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া অতদূর মফস্বলের ছোট শহরে যাওয়ার ইচ্ছা নীলার মার ছিল না। তিনি বলিলেন, 'আর কটা মাস থেকে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে গেলে হত না দাদা? একটা ছোটখাট বাড়ি ঠিক করে নিয়ে—'

মেজমামা বলিলেন, 'মাথা খারাপ নাকি তোর? অরক্ষণীয়া নাকি মেয়ে তোর? বাপ মরেছে, একটা বছর কাটুক না।'

ও। বলিয়া নীলার মা চুপ করিয়া গেলেন।

কেবল তাই নয়, শহরে তাদের দেখাশোনা করিবে কে, খরচ চালাইবে কে? মামারা তো রাজা নন। সুতরাং সকলে মামাবাড়ি গেল। সকালে গাড়িতে উঠিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত হু হু করিয়া চলিলে যেখানে পৌঁছানো যায়। স্থানটির পরিবর্তন হয় নাই, অনেক কালের ভাঙা ঘাটওয়ালা পানাভরা পুকুরটার দক্ষিণে ছোট আমবাগানটির কাছে নীলার দুই মামার বাড়িখানিরও পরিবর্তন হয় নাই। কেবল মামারা মামিরা, আর মামাতো ভাইবোনেরা এবার যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। কোথায় সেই মামার বাড়ির আদর, সকলের আনন্দ-গদ্‌গদ ভাব, অফুরন্ত উৎসব? এবার তো একবারও কেউ বলিল না এটা খা— ওটা খা? তার বাবার জন্য কাঁদাকাটা শেষ করিয়া ফেলিবার পরেও তো বলিল না? একটু কাঁদবি নাকি নীলা, বাবার জন্য মাঝে মাঝে যেটুকু কাঁদে তারও উপরে মামাবাড়ির অনাদর অবহেলার জন্য একটু বেশি রকম কান্না?

কিছুকাল কাটিবার পর এ বিষয়ে ভাবিয়া কিছু ঠিক করিবার প্রয়োজনটা মিটিয়া গেল, আপনা হইতেই যথেষ্ট কাঁদিতে হইল নীলাকে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় তো নীলা জীবনে কখনও পরে নাই, গোবর দিয়া ঘর লেপে নাই, পানাপুকুরে বাসন মাজে নাই, কলসি কাঁখে জল আনে নাই, বিছানা তোলা, মশলা বাটা, রান্না করা লইয়া দিন কাটায় নাই, এমন ভয়ানক খারাপ কথার বকুনিও শোনে নাই। হায়, একটু ভাল জিনিস পর্যন্ত সে যে খাইতে পায় না, এমনিই তার শরীরের নাকি এমন পুষ্টি হইয়াছে যে, কোনও ভদ্রঘরের মেয়ের যা হয় না, হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তারই না হয় অভদ্রকমের দেহের পুষ্টি হইয়াছে, তার ভাই-বোনেরা তো রোগা, মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে ওরাও একটু দুধ পায় না কেন, পিঠা-পায়েসের ভাগটা ওদের এত কম হয় কেন? এমন ভিখারির ছেলের মতো বেশ

করিয়া তার ভাই দুটিকে স্কুলে যাইতে হয় কেন? মামাদের জন্য ভাইরা যে তার দুবেলা খাইতে পাইতেছে, স্কুলে পড়িতে পাইতেছে এটা নীলার খেয়ালও থাকে না. মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে নিজের ভাইবোনদের আহার-বিহারের স্বাভাবিক পার্থক্যটা তাকে কেবলি কাঁদায়।

বড়মামি বলেন, 'বড় তো ছিঁচকাদুনে মেয়ে তোমার ঠাকুরঝি?' মেজোমামি বলেন, 'আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের মাথাটা খেয়েছ একেবারে।'

নীলার মা বলেন, 'দাও না তোমরা ওর একটা গতি করে, মেয়ে যে দিন দিন কেমনতর হয়ে যাচ্ছে?'

পাত্র খোঁজা হইতে থাকে আর নীলা ভাবিতে থাকে, বিবাহ হইয়া গেলে সে আবার শহরের সেই বাড়ির মতো একটা বাড়িতে গিয়া থাকিতে পাইবে, সকলের আদর-যত্ন জুটিবে, অবসর সময়ে বলাইদের মতো কোন প্রতিবেশীর তিনতলা ছাদে উঠিয়া চারিদিকে বাড়ির সমুদ্র দেখিতে পারিবে, বলাই-এর মতো কারও কাছে সমুদ্রের গল্প শোনা চলিবে। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে নীলার একটি ভাই মরিয়া গেল। নীলার মা কী অজানা অসুখে ভুগিতে ভুগিতে শয্যা গ্রহণ করিলেন। বড়মামার মেজোমেয়ে সন্তান প্রসব করিতে বাপের বাড়ি আসিয়া একখানা চিঠির আঘাতে একেবারে বিধবা হইয়া গেল। পানাভরা পুকুরটার অপরদিকের বাড়িতেও একটি মেয়ে আরও আগে সন্তানের জন্ম দিতে বাপের বাড়ি আসিয়াছিল, একদিন রাতভোর চেঁচাইয়া সে নিজেই মরিয়া গেল। আমবাগানের ওপাশে আট-দশখানা বাড়ি হইতে বিনাইয়া বিনাইয়া শোকের কান্না ভাসিয়া আসিতে শোনা গেল।

তারপর একদিন অনাদি নামে সদর হাসপাতালের এক কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে নীলার বিবাহ হইয়া গেল। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকলেই একরকম স্বীকার করিল যে, ধরিতে গেলে নীলার বিবাহটা মোটামুটি ভালই হইয়াছে বলা যায়। মেয়ের তুলনায় ছেলের চেহারাটাই কেবল একটু যা বেমানান হইয়াছে। কচি ডাল ভাঙিয়া ফেলিলে শুকাইয়া যেমন হয়, কতকটা সেই রকম শুষ্ক ও শীর্ণ চেহারা অনাদির, ব্রণের দাগ-ভরা মুখের চামড়া কেমন মরা-মরা, চোখ দুটি নিষ্প্রভ, দাঁতগুলি খারাপ। এদিকে মামাবাড়ির অনাদর অবহেলা সহিয়া এবং বাবা ও ছোট ভাইটির জন্য কাঁদিয়াও নীলার চেহারাটি বেশ একটু জমকালো ছিল, একটু অতিরিক্ত পরিপাটী ছিল তার নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির গঠন-বিন্যাসে।

কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবার নাই, মুখ বুজিয়া সব মানিয়া লইতে হইল নীলার। বিশেষ আর কী এমন পরিবর্তন হইয়াছে জীবনের? বাস কেবল করিতে হয় অজানা লোকের মধ্যে, যাদের কথাবার্তা চালচলন নীলা ভাল বুঝিতে পারে না; আর রাত্রে শুইয়া থাকিতে হয় একটি আধ-পাগলা মানুষের কাছে, যার কথাবার্তা চালচলন আরও বেশি দুর্বোধ্য মনে হয় নীলার। কোনদিন রাত্রে সংসারের সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর ছুটি পাইয়া ঘরে আসিবামাত্র অনাদি দরজার খিল তুলিয়া দেয়, হাত ধরিয়া উর্ধ্বশ্বাসে কী যে সে বলিতে আরম্ভ করে, নীলা ভাল বুঝিতেই পারে না। কেবল বুঝিতে পারে, আবেগে উত্তেজনায় অনাদি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চোখের দৃষ্টি তার উদ্‌ভ্রান্ত। মনে হয়, নীলার আসিতে আর একটু দেরি হইলে সে বুঝি বুক ফাটিয়া মরিয়াই যাইত। কোনদিন ঘরে আসিয়া দেখিতে পায়, অনাদির মুখে গভীর বিষাদের ছাপ, স্তিমিত চোখে দৃষ্টি আছে কিনা সন্দেহ। ঘুম আসে নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিলেও ঘুম যে আজ তার আসিবে না, নীলা তা জানে, কিন্তু হাই সে তুলিতেছে মিনিটে মিনিটে।

কী বলিবার আছে, কী করিবার আছে? নয় দাঁতের ব্যথা, নয় মাথা ধরা, নয় জ্বরভাব, অথবা আর কিছু অনাদিকে প্রায়ই রাত জাগায়, অন্যদিন সে রাত জাগে নীলার জন্য। সুযোগ পাইলে নীলা চুপিচুপি নিঃশব্দে কাঁদে। সজ্ঞানে মনের মতো স্বামীলাভের তপস্যা সে কোনদিন করে নাই, কী রকম স্বামী পাইলে সুখী হইবে, কোনদিন এ কল্পনা তার মনে আসে নাই, সুতরাং আশাভঙ্গের বেদনা তার

নাই। আশাই যে করে নাই তার আবার আশাভঙ্গ কিসের? অনাদির সোহাগেই সোহাগ পাওয়ার সাধ মিটাইয়া নিজেকে সে কৃতার্থ মনে করিতে পারিত, উত্তেজনা ও অবসাদের নাগরদোলায় ক্রমাগত স্বর্গ ও নরকে ওঠা-নামা করার যে চিরন্তন প্রথা আছে জীবনযাপনের, তার মধ্যে নরকে নামাকে তুচ্ছ আর বাতিল করিয়া দিয়া সকলের মতো সেও একটা বিশ্বাস জন্মাইয়া নিতে পারিত যে, স্বর্গই সত্য, বাকি সব নিছক দুঃস্বপ্ন। কিন্তু স্বামীই তো মেয়েদের সব নয়, গত জীবনের একটা বড় রকম প্রত্যাবর্তন তো নীলা আশা করিয়াছিল, যে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে শহরে তাদের সেই আগেকার বাড়িতে থাকা, সকলের না হোক অন্তত একজনের কাছে সেই রকম আদরযত্ন পাওয়া, অবসর-সময় বলাইদের মতো কোনও প্রতিবেশীর তিনতলা বাড়ির ছাদে উঠিয়া চারিদিকে বাড়ির সমুদ্র দেখা আর বলাই-এর মতো কারও মুখে আসল সমুদ্রের গল্প শোনার মোটামুটি একটা মিল আছে। এখানে নীলাকে বিশেষ অনাদর কেউ করে না, লজ্জায় কম করিয়া খাইলেও মামাবাড়ির চেয়ে এখানেই তার পেটভরা খাওয়া জোটে. এখানে তাকে যে দয়া করিয়া আশ্রয় দেওয়া হয় নাই, এখানে থাকিবার স্বাভাবিক অধিকারই তার আছে, এটা সকলে যেমন সহজভাবে মানিয়া লইয়াছে, সে নিজেও তেমনি আপনা হইতে সেটা অনুভব করিয়াছে। মামাবাড়ির চেয়েও এখানকার অজানা অচেনা নরনারীর মধ্যে ঘোমটা দেওয়া বধূজীবন যাপন করিতে আসিয়া নীলা তাই স্বস্তি পাইয়াছে অনেক বেশি। তবু একটা অকথ্য হতাশার তীব্র ঝাঁজালো স্বাদ সে প্রথম অনুভব করিয়াছে এখানে। গুমরাইয়া গুমরাইয়া যে সব তার শেষ হইয়া গিয়াছে, কিছুই তার করার নাই, বলার নাই, পাওয়ার নাই, দেওয়ার নাই—শানাই বাজাইয়া একদিনে তার জীবনের সাধ আহ্লাদ, সুখ, দুঃখ, আশা, আনন্দের সমস্ত জের মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

'কাঁদছ নাকি? কী হয়েছে?'

'কাঁদিনি তো!'

কাঁদিতে কাঁদিতেই নীলা বলে সে কাঁদে নাই। জানুক অনাদি. কী আসিয়া যায়? কাঁদা আর না-কাঁদা সব সমান নীলার। নীলার কান্নার মৃতসঞ্জীবনী যেন হঠাৎ মৃতপ্রায় দেহে মনে জীবন আনিয়া দিয়াছে এমনিভাবে অনাদি তাকে আদর করে, ব্যাকুল হইয়া জানিতে চায়, কেন কাঁদিতেছে নীলা, কী হইয়াছে নীলার? এখানে কেউ গালমন্দ দিয়াছে? মা বোনের জন্য মন কেমন করিতেছে? অনাদি নিজে না জানিয়া মনে কষ্ট দিয়াছে তার? একবার শুধু মুখ ফুটিয়া বলুক নীলা, এখনই অনাদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

কিন্তু কী বলিবে নীলা, বলার কী আছে? সে কী নিজেই জানে, কেন সে কাঁদিতেছে? আগে প্রত্যেকটি কান্নার কারণ জানা থাকিত, কোনও কান্না বকুনির, কোনও কান্না অভিমানের, কোনও কান্না শোকের, আর কোনও কান্না সমুদ্র দেখার সাধের মতো জোরালো অপূর্ণ সাধের। আজকাল সব যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। কান্নার সমস্ত প্রেরণাগুলি যেন দল বাঁধিয়া চোখের জলের উৎস খুলিয়া দেয়।

সেদিন অনাদি ভাবে, কান্নার কারণ অবশ্যই কিছু আছে, নীলা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। পরদিন আবার তাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে রীতিমত ভড়কাইয়া যায়, কান্নার কারণটা তবে তো নিশ্চয় গুরুতর। আরও বেশি আগ্রহের সঙ্গে সে কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং কিছুই জানিতে না পারিয়া সেদিন তার একটু অভিমান হয়। তারপর দুদিন নীলা কাঁদে কিনা সেই জানে না, দাঁতের ব্যথা আর মাথার যন্ত্রণায় বিব্রত থাকায় অনাদি টের পায় না।

পরদিন আবার নীলার কান্না শুরু হইলে রাগ করিয়া অনাদি বলিল, 'কী হয়েছে, যদি নাই বলবে, বারান্দায় গিয়ে কাঁদো, আমায় জ্বালিও না।'

এতক্ষণ কাঁদিবার কোনও প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না, এবার স্বামীর একটা কড়া ধমক খাইয়া নীলা অনায়াসে আরও বেশি আকুল হইয়া কাঁদিতে পারিত। কিন্তু ধমক খাওয়া মাত্র নীলার কান্না একেবারে

থামিয়া গেল।

'দাঁত ব্যথা করছে তোমার?'

অনাদি বলিল, 'না।'

'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'না।'

'তবে?'—নীলা যেন অবাক হইয়া গিয়াছে। দাঁতেও ব্যথা করিতেছে না, মাথার যন্ত্রণা নাই, কাঁদিবার জন্য তবে তাকে ধমক দেওয়া কেন, বারান্দায় গিয়া কাঁদিতে বলা কেন? দাঁতের ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা না থাকিলে তো তার প্রায় নিঃশব্দ কান্নায় অনাদির অসুবিধা হওয়ার কথা নয়!

তারপর ধমক দিয়া কয়েকবার নীলার কান্না বন্ধ করা গেল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে ধমকেও আর কাজ দিল না। মাঝে মাঝে তুচ্ছ উপলক্ষে, মাঝে মাঝে কোনও উপলক্ষ ছাড়াই নীলা কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল, তার একটা উদ্ভট ও দুর্নিবার পিপাসা আছে, নিজের নাকের জল চোখের জলের স্রোত অনেকক্ষণ ধরিয়া অবিরাম পান না করিলে তার পিপাসা মেটে না।

তারপর ক্রমে ক্রমে অনাদি টের পাইতে থাকে বৌ-এর তার কান্নার কোনও কারণ নাই, বৌটাই তার ছিঁচকাঁদুনে, কাঁদাই তার স্বভাব।

অনাদির মা-ও কথাটায় সায় দিয়া বলেন, 'এদ্দিন বলিনি তোকে, কী জানি হয়তো ভেবে বসবি আমরা যন্ত্রণা দিয়ে বৌকে কাঁদাই, তোর কাছে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলছি—বড্ড ছিঁচকাঁদুনে বৌ তোর। একটু কিছু হল তো কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। আগে ভাবতাম, বৌ বুঝি বড্ড আভিমানী, এখন দেখছি তা তো নয়, এ যে ব্যারাম! আমাদের কিছু বলতে কইতে হয় না, নিজে নিজেই কাঁদতে জানে। ওবেলা ওবাড়ির কানুর মা মহাপ্রসাদ দিতে এল, বসিয়ে দুটো কথা বলছি, বৌ কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে, বলা নেই কওয়া নেই ভেউ ভেউ করে সে কী কান্না বৌয়ের। সমুদ্দুরের চান করার গল্প থামিয়ে কানুর মা তো থ বনে গেল। যাবার সময় চুপিচুপি আমায় বলে গেল, বৌকে মাদুলি তাবিজ ধারণ করাতে। এসব লক্ষণ নাকি ভাল নয়।'

অনাদির মা কান পাতিয়া শোনে, দরজার আড়াল হইতে অস্ফুট একটা শব্দ আসিতেছে।

'ঐ শোন্। শুনলি?'

বাহিরে গিয়া অনাদি দেখিতে পায়, দরজার কাছে বারান্দায় দেয়াল ঘেঁসিয়া বসিয়া নীলা বঁটিতে তরকারি কুটিতেছে। একটা আঙুল কাটিয়া গিয়া টপটপ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে আর চোখ দিয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে জল। মাঝে মাঝে জিভ দিয়া নীলা জিভের আয়ত্তের মধ্যে যেটুকু চোখের জল আসিয়া পড়িতেছে সেটুকু চাটিয়া ফেলিতেছে।

শ্রেষ্ঠ গল্প

প শ্চি ম দি গ ন্ত

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

তিনঘণ্টার বেশি রামলোচনের ঘুম হয় না। এগারোটা সাড়ে এগারোটায় যখন সবাই শুয়ে পড়ে তখন অগত্যা তাঁকেও শুতে হয় কিন্তু ঠিক তিনটি ঘণ্টা পরে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। আগে আগে আরও কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করতেন, চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকতেন, কিন্তু আজকাল

আর সে বৃথা চেষ্টা করেন না। হুঁকো-কল্‌কে ঠিক করাই থাকে, হাৎড়ে হাৎড়ে দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে টিকে ধরাবার লম্পটা জ্বালেন, তারপর কল্‌কেটা ধরিয়ে অন্ধকারেই বসে বসে নিঃশব্দে তামাক টানেন। অবশ্য যতটা সম্ভব নিঃশব্দে—হুঁকোর বেশি আওয়াজ হলে মেজকর্তা, মানে তাঁরই মেজভাই, বিষম বিরক্ত হন।

তামাক খাওয়া শেষ করে তাঁর খাটো গামছাখানি প'রে রামলোচন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। নিস্তব্ধ দালান, দালানের ওধারের দরজা খুললে তবে উঠোনে বা কলঘরে যাবার পথ। আলো জ্বেলেই যাওয়া উচিত— বুড়ো মানুষ, হোঁচট্ খাওয়া বা ধাক্কা খাওয়ার সম্ভবনা তো পদে পদে—কিন্তু আলো জ্বালবারও হুকুম নেই। প্রথমত বেকার বড় ভাইয়ের জন্য বৃথা আলোব খরচ করতে মেজকর্তা বা ছোটকর্তা কেউ রাজি নন, তাছাড়া বাইরে আলো জ্বাললেও নাকি তাঁদেব ঘুম ভেঙে যায়। সুতবাং দালানের জানালা দিয়ে এসে পড়া ক্ষীণ নক্ষত্রের আলোতেই দৃষ্টিটা সইযে নিয়ে সাবধানে এগোতে হয় একপা একপা করে, দেওয়াল ধরে ধরে। অবশ্য পথটা এতদিনের অভ্যাসে একরকম জানা হয়েই গেছে—কোথায় আলমারির কোণ হাতে ঠেকবে, তারপব কোথায় বাসনের সিন্দুক, তাঁর আঙুলগুলো আন্দাজে আন্দাজে ঠিক খুঁজে নেয়। একটা টর্চ আছে বটে কিন্তু তাব ব্যাটাবি দেয় ভাগ্নে বাদল,—সে ব্যাটারি মাস-দুই চ'লে এক সময়ে নিঃশেষ হয়। কিন্তু বাদল তো আসে এ বাড়িতে ছ-মাস আট-মাস অন্তব, বাকি সময়টা যে-তিমিরে সে-তিমিরে।

কলঘর থেকে ফিরে আস্তে আস্তে দালানের দরজা বন্ধ ক'বে দিয়ে রামলোচন থমকে দাঁড়ান। বাইরের চেয়ে ভেতরে অন্ধকার একটু বেশি গাঢ়, সুতরাং কিছুক্ষণ ধরে দৃষ্টি সইয়ে নিতে হয়। তারপর চলে তাঁর চৌর্যবৃত্তির নিঃশব্দ অভিযান। কোথায় আনাজের ঝুড়িতে মেজবৌ ভুলে কলা ফেলে গেছেন হয়তো ; কিংবা মিট্‌সেফের মাথায় কোনও বৌমা তাঁর ছেলের বিস্কুটের বাক্স রেখে দিয়েছিলেন, তাড়াতাড়িতে ঘরে নিয়ে যেতে বা আলমারিতে তুলতে ভুলে গেছেন; কোথাও বা তারের ঝুড়ি ঝুলোনো আছে কড়িকাঠ থেকে—তার মধ্যে আছে মেজবৌমার মেয়ের তাল-মিছরি কী ন'বৌমার মেজছেলের গুঁজিয়া; এইগুলি ঘুরে ঘুরে হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করেন রামলোচন, টিপে টিপে পরিমাণটা বুঝে নেন, বিস্কুট হ'লে অন্ধকারেই গুনে দেখেন। চুরি করতে করতে তার 'আর্ট'-টা ওর জানা হয়ে গেছে; এমনভাবে নিতে হবে যে-কেউ সন্দেহ করতে না পারে। বিস্কুটের বাক্স যদি একেবারে ভর্তি থাকে তাহ'লে একখানার বেশি নেওয়া চলবে না, আবার খুব খালি হয়ে এলেও তাই। অথচ মাঝামাঝি অবস্থায় দুখানা কি তিনখানাও তুলে নেওয়া যায়, কারণ সে সময়টা অত হিসেব থাকে না। মিছরি কিংবা গুঁজিয়া যদি ঠোঙাভর্তি থাকে তো দুটো তিনটে পর্যন্ত সরিযে ফেলেন, নইলে লোভ সংবরণ করতে হয়, একটা বা একটুক্‌রো নিয়েই ক্ষান্ত হন।

এইভাবে এদিক ওদিক হাৎড়ে লুণ্ঠিত জিনিসগুলি বুকে ক'রে নিজের ঘরে ফিরে আসেন। সেগুলি বিছানার ওপর সযত্নে সাজিয়ে রাখা হলে তবে কাপড় ছাড়বার কথা মনে পড়ে। এই বস্তুগুলি তারপর অন্ধকারে বসে বসেই খাওয়া চলে, সেই শেষরাত্রেই। মিছরিটা চিবোতে পারেন না, গালে ফেলে পাক্‌লে পাক্‌লে খান। খাওয়া শেষ হ'লে আর এক কল্‌কে তামাক টেনে আর একবার গিয়ে শুয়ে পড়েন, নিশ্চিন্ত হয়ে।

কিন্তু বোধ হয় ঠিক নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে পারেন না, কারণ কান থাকে মেজকর্তার ঘরের দোরের দিকে। মেজকর্তা ওঠেন ঠিক সাড়ে চারটায়, তাঁর ছিটকিনি খোলার শব্দ পেলেই রামলোচনও সরকারি ভাবে শয্যাত্যাগ করেন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আওড়াতে আওড়াতে গিয়ে তামাক সাজতে বসেন। শীতকালে তখনও অন্ধকার থাকে, কিন্তু তাতেই বা কী, এখন আর আলো জ্বালতে বাধা নেই। মেজকর্তা নিজে যে সময় ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস সেইটেই ঘুম ভাঙবার প্রকৃষ্ট সময়, সুতরাং তখন আলো জ্বাললে বা কথা কইলে বিরক্ত হন না। তামাক খাওয়া শেষ ক'রে আর একবার তাঁর খাটো গামছাখানির

শরণাপন্ন হতে হয়। এবারে দালানে আলো জ্বালোনোই থাকে, কারণ মেজকর্তা উঠেই কলঘরে ছোটেন, দৈবাৎ তা না থাকলে রামলোচন সদর্পে আলো জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে যান। আর ভয় কাকে।

এরপর প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে পূজা-আহ্নিক সারতে সারতে বেলা ফরসা হয়ে যায়, গরমের দিনে রোদ উঠে পড়ে কট্‌কটে। কিন্তু তখনও এক বড়বৌ অর্থাৎ রামলোচনের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও মেয়েছেলে ওঠে না—তাদের ছেলেরা তো নয়ই। সেজকর্তা ছোটকর্তা উঠেও নিজেদের পরলোক-চর্চায় ব্যস্ত থাকেন বলে তরুণ-তরুণীদের নিদ্রাভঙ্গের কোনও কারণই ঘটে না। তা না হোক্, রামলোচন তাতে দুঃখিত নন। সবাই উঠে পড়লে ঝামেলা, ছেলেমেয়েরা চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু ক'রে দেয়, স্ত্রীলোক ও পুরুষে দালান-উঠোন যেন গিজ গিজ করতে থাকে। সে ভিড় অসহ্য মনে হয় তাঁর। তার চেয়ে এই ভাল। বড়বৌ স্নান করতে যান রান্নাঘরের চাবি খুলে দিয়ে, রামলোচন সেখানে ঢোকেন স্ত্রীকে সাহায্য করতে। প্রত্যহ উনান ধরিয়ে দেওয়া তাঁর কাজ, এটা তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন। বাড়ির আর কোনও কাজ তাঁকে দিয়ে কেউ করাতে পারে না, এইটি ছাড়া। তার কারণ, আর কেউ ওঠবার আগে একা রান্নাঘরে ঢোকা লাভজনক। গত রাত্রির অবশিষ্ট বহু ভোজ্য নানা রকমে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, হিসাবের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে এ ঘরে নিয়ে আসা বা ওখানেই উদরস্থ করা এমন কিছু কঠিন নয়। অবশ্য দু-একবার যে ধরা পড়বার উপক্রম না হয়েছে এমন নয় কিন্তু প্রতিবারই কোনমতে সে বিপদটা এড়িয়ে গেছেন।

এরপর জামাটি গায়ে দিয়ে লাঠি হাতে প্রাতর্ভ্রমণে বার হন। এ নাকি তাঁর ডাক্তারের উপদেশ, খুব ঝড়-জল না হ'লে ভ্রমণ বন্ধ থাকে না। কিন্তু লোকে অবাক হয় এই দেখে যে একেবারে লেকের গায়ে বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেদিকে বেড়াতে যান না। তিনি যান ওধারের রাজপথ ধরে—সোজা গিয়ে বড় রাস্তায় ওঠেন। এইবার উদ্দেশ্যটা বোঝা যায়, ওখানকার দোকান থেকে এক আনার জিলিপি বা সিঙাড়া কিনে বাড়ি ফেরেন। এটা হ'ল প্রকাশ্য জলখাবার। বাড়ির চায়ের পর্ব শুরু হয় একটু বেলাতেই—চাকরি ত কেউ করে না, সকলেই ব্যবসায়ী। অত বেলা অবধি থাকতে পারেন না বলে বেড়িয়ে এসেই জিলিপি-দুটি খেয়ে একঘটি জল খান প্রকাশ্যে। আগে আগে ভাইপো ভাইঝিদের ছেলেমেয়েরা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। এখন তারাও মানুষ চিনে নিয়েছে, বৃথা লোভ করে না।

চায়ের পাট শুরু হয় সাড়ে-সাতটা নাগাদ। তখন বিস্কুট বা টোস্ট যাহোক কিছু অদৃষ্টে জোটে, নইলে হয়তো গরম পরোটা। কিন্তু তাতেও অনেকদিন তাঁর হয় না। রান্নাঘরের দোরের কাছে মোড়া পেতে বসে এদিক ওদিক চেয়ে প্রশ্ন করেন, 'বড়বৌ, বাসি রুটি এক-আধখানা পড়ে আছে নাকি?' বড়বৌ বিষম চটে যান, গালমন্দও হয়তো দেন, তবু না দিয়েও থাকতে পারেন না। প্রার্থিত বস্তু হাতে পেলে প্রশান্ত মুখে গালাগাল শুনতে রামলোচনের আপত্তি নেই।

এসবের পালা শেষ ক'রে আর একবার বাইরে বেরোন। রোগ এক-রকমের নয়; অর্শের জন্য ওল বা কচু চাই; পেটের অসুখের জন্য গাঁদাল পাতা বা থানকুড়ি পাতা, ডুমুর, কচুশাক, ওলকোঁড়া, নিমপাতা—এর জন্য ঢাকুরিয়া অঞ্চলে গিয়ে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয় এই সময়টা। গড়পা বা বৈষ্ণবঘাটা পর্যন্ত এক-একদিন হেঁটে যান যদি বিনামূল্যে পলতা পাওয়া যায় এই আশায়,—ধনে-পলতা খেতে হবে, রক্ত পরিষ্কার করে। এরই মধ্যে অবশিষ্ট তিনটি দাঁতের গোড়ার পরিচর্যার জন্য বকুলছাল বা নিমছাল কি পেয়ারা পাতা সংগ্রহ করতে ভুল হয় না। এইসব বোঝা সংগ্রহ করে দশটা এগারোটার সময় বাড়ি ফিরে বড়বৌর অবসরের জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারের জন্য সাধারণ রান্না যা হচ্ছে তার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর এইসব রান্না করিয়ে নিতে হবে।—বড়বৌ রাগ করেন খুবই, কিন্তু না করলেও নয়, বৃদ্ধ স্বামী হাতে-পায়ে ধরাধরি করেন। বাড়ির ঝালমশলা-তেল-বিশিষ্ট সমস্ত ব্যঞ্জনগুলির হিসাব কিন্তু সংগ্রহ করা থাকে রামলোচনের, খাওয়ার সময় নিজের নানা রকমের পথ্যের সঙ্গে সেগুলোও মিলিয়ে বুঝে নেন। ওঁর বিশ্বাস এই উপকারী বস্তুগুলোর সঙ্গে ওসব জিনিস খেলে আর

দোষ নেই, ওর বিধিক্রিয়া এতে কেটে যাবে। আবার এবই এক ফাঁকে দই আনতে ভুল হয় না চার পয়সার। সামান্য যা টাকা নিজের হাতে আছে এবং ভাইপো ও ভাগ্নেদের কাছে চেয়ে-চিন্তে যা পান, তাইতেই এই সব চলে। তাই বলে তাঁর এই সব খাদ্য থেকে কণামাত্র কাউকে তিনি দেন না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক ফোঁটা দই কি একটুকরো কলার জন্য কেঁদে মরে গেলেও না। উদাসীন নিস্পৃহতার সঙ্গে সে সব তিনি উপেক্ষা করতে পারেন।

দ্বিপ্রহরের এই গুরুভোজনের পরে একটু দিবানিদ্রা দিয়ে উঠেই শুরু হয় চায়ের জন্য ধন্না দেওয়া। দুপুরের আগুনের যা জের থাকে উনুনে, তাইতেই জল গরম ক'রে নিয়ে তিনটে নাগাদ দুতিন কাপ চা তৈরি হয় মেজগিন্নি ও কোনও কোনও বধূর জন্য। তা থেকে ভাগ নেওয়া চাই-ই তাঁর। তারপর তামাক ও অপরাহ্নকৃত্যের পর আবার পাঁচটায় যখন সরকারি চা-জলখাবারের ব্যবস্থা হয় তখন সেটারও পুরোপুরি সুবিধা নিতে ইতস্তত করেন না।

এর পরের ইতিহাস আরও বিচিত্র। এই সময় তিনি সত্যি-সত্যিই বেড়াতে বেরোন। গলাবন্ধ কোটাটর ওপর মান্ধাতার আমলের চাদর ঝুলিয়ে ছড়িটি নিয়ে বেরোন। এ অভ্যাস তাঁর নাকি বহুকালের। প্রথম বয়সে—যখন কিছু পৈতৃক অর্থ ছিল হাতে, যখন এই সময় চোখ দুটো রঙিন করবার ব্যবস্থা ছিল,—তখন নাকি যেতেন মেয়েমানুষের কাছে। অবশ্য বড় নজরের সঙ্গতি বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না, খোলার ঘরের সস্তা স্ত্রীলোকের কাছেই যাতায়াত ছিল। এখন সে সামর্থ্যও নেই (বহুকাল ধরেই নেই, সুতরাং শখটা অন্যভাবে মেটাতে হয়। বড়রাস্তাটা যেখানে বেঁকে কলকাতার সীমা লঙ্ঘন করেছে সেখানে এবং আশেপাশে বিস্তর বস্তি আছে, সাধারণত ঝিয়েরা ঐ সব বস্তিতেই ঘরভাড়া ক'রে থাকে। সেখানে কিংবা ওধারের পাড়ার মধ্যে, রাস্তার কলের ধারে কি পুকুর-পাড়ে, যেখানে তারা কাজ-কর্ম করে, রামলোচন ঘুর-ঘুর করেন সেইখানেই। বকুল ঝি বলে—'ঠাকুর যেন ছোঁক্ ছোঁক করে বেড়ায়।' অবশ্য এরা অধিকাংশই খারাপ নয়, স্বামী-পুত্র নিয়ে বাস করে; কিন্তু খারাপ হ'লেই বা কী, রামলোচনেরও সে বয়স নেই। শুধু মেয়েছেলের সাহচর্য লাভ করা, তার সঙ্গে দুটো আলাপ করা—এইটুকুই তাঁর সাধ, এতেই তিনি কৃতার্থ। চিরকালই অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগে কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েদের সংস্পর্শে কেমন অস্বস্তি বোধ করেন। সুতরাং ঝোঁকটা ওঁর এদের দিকেই বরাবর।

বিচিত্র মানুষ রামলোচন!

পৈতৃক জমিজমা এবং সামান্য কিছু টাকা-কড়ি ছিল বৈকি। কাজকর্ম কোনদিনই করেননি, বসে খেয়েছেন এবং নাবালক ভাইদের অংশও বেচে উড়িয়ে দিয়েছেন; লেখাপড়া জানতেন না, চাকরি করার যোগ্যতা বা ব্যবসা করার মতো বুদ্ধি কোনটাই ছিল না। বরং শেষ বয়সে দোকানে খাতা লেখার কাজ বা ছোট ছোট ছেলে-পড়ানোর কাজ জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু খাতায় ভুল করার জন্য এবং ছেলেমেয়েদের ভুল শেখানোর জন্য কোনও চাকরিই টেকেনি বেশি দিন। অবশ্য খুব বেশি প্রয়োজনও ছিল না আর—ভাই ও ভাইপোরা ভাল, কেউ ওঁকে ভাসিয়ে দেয়নি। যদিচ, অনেকে বলে সেটা ওঁর জন্য নয়, বড়বৌ-এর জন্য। বড়বৌ সুগৃহিণী, সংসারটাকে মাথায় ক'রে আছেন, তাঁর মুখ চেয়েই তাঁর স্বামীকে সহ্য করে ওরা। আর বড়বৌও স্বামীর সামর্থ্য জানেন বলে প্রাণপণে খেটে যান। পরের বাড়ি রাঁধুনিগিরি করার চেয়ে নিজের দেওর ও দেওরপোদের সংসারে খাটা ভাল—এই তাঁর বিশ্বাস। বাইরে অন্তত সম্মানটা থাকে তাতে।

ভাইরা বড় হয়ে সবাই ব্যবসা ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিলেন, সে সব ব্যবসা ভাইপোদের হাতে পড়ে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে; আসবাবের দোকান, মনোহারী, ছাপাখানা, বইয়ের দোকান—কী নেই! অভাব নেই কোথাও, তাই বড়ভাইকে সহ্য করেন। তাছাড়া মানুষটা তো নিজেই মৃত্যুর

দিকে এগিয়ে চলেছে, আর ক-দিন! পেট খারাপ, কিছুই হজম হয় না, ছত্রিশ রকমের রোগ ও উপসর্গ দেহে জড়ানো। ডাক্তার বলেন এসময় ওঁর একবেলা অল্পকিছু আহার করা উচিত, তাতেই সুস্থ থাকবেন। কিন্তু সে সব কথা উনি বিশ্বাস করেন না। শরীর যত খারাপ হয় তত খেতে চান। আহারের লোভ তো বটেই—তাছাড়া ধারণা আছে যে, যত বেশি খাবেন তত শরীর সারবে। এই করেই হজমের ক্ষমতা নষ্ট করেছেন উনি, বেশি ক'রে খেয়ে উঠেই এমন কিছু খেতে শুরু করেছেন—হজমী বলে যার খ্যাতি আছে; আবার হজমী জিনিস খাচ্ছেন যখন, তখন শীগগিরই হজম হয়ে যাবে এই বিশ্বাসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারী খাবার খেয়েছেন।

তবু, এসবও অনায়াসে ক্ষমা করা যেত যদি স্বভাবের ঐ বড় দোষটা না থাকত।

স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর বনিবনাও কোনও কালে নেই, দুজনের ঘনিষ্ঠতা দেখেছে বলে কারুর মনে পড়ে না। এমন কী ওঁদের যে সন্তান হয়নি তার জন্য বড়বৌ আকারে ইঙ্গিতে স্বামীকেই দায়ী করেন। অথচ বাইরের টান ওঁর আছে প্রথম থেকে— আজ পর্যন্ত। বাড়িতে তরুণী ঝি রাখার উপায় ছিল না, তার জন্য অন্যান্য বধূদের বহু বাঁকা কথা শুনতে হয়েছে বড়বৌকেই। তাতেও রক্ষা ছিল না, ঘরে না পেলে পাড়ার আশেপাশে খুঁজে বেড়িয়েছেন।

আজ, এই এতকাল পরে, নখদন্তহীন অবস্থাতেই বা কম কি? বিকেলে যখন বেড়াতে বেরোন তখন পাড়ায় যতগুলি ঝির সঙ্গে দেখা হয় প্রত্যেকের সঙ্গেই খানিকটা ঘনিষ্ঠতা না করে ছাড়েন না—অথচ কেউ কোনদিন শোনেনি তাঁকে ভাইপো ভাইঝির বা নাতি-নাত্‌নিদের খবর নিতে! আর বাইরে?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম মোড়টিতেই হয়তো থেমে গেলেন রামলোচন, 'বলি অ লক্ষ্মী, ভাল আছ? মেয়ে ভাল? শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরেছে মেয়ে? ওর শাশুড়ি কেমন? ...ভাল...ভাল।'

লক্ষ্মী হয়তো প্রশ্ন করে, 'আপনার শরীর কেমন দাদাঠাকুর?'

'আমার আর শরীর! খেতে পাইনে ভাল, শরীর সারবে কী ক'রে? যা বাজার, না দুধ না দই—কী খেয়ে বাঁচি তারই নেই ঠিক।...যাব একদিন লক্ষ্মী তোদের বাড়ি, মেয়ের কী গয়না হ'ল দেখে আসব।'

ততক্ষণে হয়তো অন্নদা এসে পড়েছে।

'এই যে অন্ন, কবে এলি? শরীর ভাল? ইস্—আবার নতুন ফুল গড়ালি যে কানের—ও কী ফুল রে?'

'পেরজাপতি বাবাঠাকুর, পাখায় লাল পাথর বসানো। তাই ছত্তিশ টাকা পড়ল। কী সোনার দর হয়েছে!'

'ছ-ত্রি-শ টাকা! তা হবে বৈকি। প্রায় যে একশ' টাকা দর এখন সোনার। বেশ, বেশ দিব্যি মানিয়েছে কিন্তু তোকে অন্ন। নতুন রসান দেওয়া ফুল, মুখখানি বেশ জম্‌জম্ করছে।'

অন্ন মানুষ চেনে। সে বাসন নামিয়ে হাত ধুয়ে নিয়ে বলে, 'এই গড়াতে গিয়ে হাত একেবারে খালি হয়ে গেল বাবা...দোক্তা কিন্‌ব এমন পয়সা হাতে নেই, কী টানাটানি চলছে কী বলব!'

রামলোচন পকেটে হাত পুরে একটা আনি বার করেন, 'তাইত, তা অন্ন, এই আনিটা রাখ্! দোক্তা কিনে নিয়ে যাস্।' ...তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বলেন, 'আর বুঝলি, দরকার হ'লে চাস্, লজ্জা করিসনি!'

আজই সকালে ছোট ভাইপোর কাছ থেকে তিনটে টাকা পেয়েছেন, পকেট ভারী আছে।

ওখান থেকে এগিয়ে গিয়ে আর একটা পুকুরের ধারে থমকে দাঁড়ান। সামনের বাড়িতে বীণা কাজ করে। তাঁদেরই পুরোনো ঝি কাদুর মেয়ে বীণা, অল্পবয়সী, সুশ্রী মেয়েটি। শ্যামবর্ণের ওপর দিব্যি একটা লাবণ্য আছে, মুখে হাসি লেগেই থাকে বলে আরও ভাল দেখায়। বীণা এবাড়ি আসে ঠিক সাড়ে পাঁচটা ছটার সময়ে, সময়টা জানা আছে রামলোচনের। এখনই বাসন নিয়ে বেরিয়ে ঘাটে

আসবে মাজ্‌তে।

বীণা এসে ঘাটে বাসন নামালে রামলোচন একেবারে কাছে এসে উবু হয়ে বসেন। টেনে টেনে রস দিয়ে বলেন, 'কী লো, আজ মুখ ভারী ভারী কেন? বর বুঝি আসেনি কদিন?'

'কী যে বলেন দাদু,' বীণা মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'মুখের আক্‌ঢাক্‌ নেই। আজ একটু অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই।'

লোলচর্ম, ঈষৎ-কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে দেয় রামলোচন ওর দিকে, বীণার মসৃণ নিটোল বাহুমূলে হাত বুলিয়ে যেন ওর উন্নত যৌবনটা অনুভব করতে করতে বলেন, 'যাই বল্‌ বীণা, এমন হাত, একজোড়া তাগা না হ'লে মানায় না। বরকে বলতে পারিস না গড়িয়ে দিতে?'

একটা ঝাঁকানি দিয়ে বীণা হাতটা সরিয়ে নেয়, 'আমার বর তো আর বড়লোক নয়। কী যখন তখন গায়ে হাত দাও দাদু, লজ্জা করে না? আমরা না হয় খেটে খাই লোকের বাড়ি, তোমারও তো মান ময্যেদা আছে!'

অপ্রতিভ রামলোচন ফোক্‌লা দাঁত বার ক'রে হাসেন বোকার মতো, 'তাতে কী হয়েছে রে, হাজার হোক তুই তো নাতনি হলি লো সুবাদে!'

'তা হোক্‌, তুমি যাও—ওঠো এখন। কাজ করতে দাও।'

অগত্যা উঠতে হয় ওঁকে। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে অঘোর ঘরামির দাওয়া; রামলোচন ধপাস্‌ ক'রে সেখানে বসে পড়েন। অঘোরের মেয়ে সুকুমারীকে ডেকে বলেন, 'এক ছিলিক তামাক খাওয়াবি নাকি রে নাতনি? দ্যাখ্‌, খাওয়াস তো বসি নইলে চলে যাই।'

এমনি ক'রে দু-তিনটে পাড়া ঘুরে সকলকার খবর নিয়ে বাড়ি ফেরেন যখন, তখন আটটা বেজে যায়। এসেই রান্নাঘরের সামনে আবার ধন্না শুরু হয়—গরম রুটি, ডাল আর সামান্য একটু দুধ মিল্‌বে, সেই আশায়।

এই হ'ল তাঁর দৈনন্দিন জীবন। জীবনের যত সমস্যাই দেখা দিক চারিদিকে, যত প্রশ্নই তীব্র হয়ে উঠুক, ওঁর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রতিটি দিন এবং রাত্রি, অপর দিন ও রাত্রির সঙ্গে সমান। কোথাও কোনও তফাত, কোনও বৈচিত্র্য নেই।

আষাঢ়ের শেষাশেষি রামলোচন এবার বিষম অসুখে পড়লেন। জ্বর, তার সঙ্গে উদরাময়, ডাক্তাররা বললে খারাপ ধরনের অসুখ, বোধহয় গ্রহণী। তিনচার দিন পরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বড়বৌ সেবা করতে এসে দেখেন তোশকের নীচে কতদিনের বাসি পচা জিলাপি, ভাঙা বিস্কুট, শুক্‌নো লুচি। কবে কোন্‌ দোকানের হালখাতায় একসরা খাবার পেয়েছিলেন, কাউকে কখনও কোনও খাবারেরই ভাগ দিতেন না, তবু কোন্‌ চক্ষুলজ্জায় লুকিয়ে এনে সরাসুদ্ধ ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। সেগুলো পচে সমস্ত বাক্সটায় দুর্গন্ধ। বড়বৌ এসব সাফ করেন, গজগজ করেন আর গালাগাল দেন। তবু করতে হয় তাঁকেই; নইলে এত কে করবে আর? কার এত গরজ?

প্রায় মাসখানেক ভুগে জ্বরটা গেল, পেটটাও সামান্য একটু ধরে এল, রামলোচন সজ্ঞানে আবার ভাল ক'রে তাকালেন চারিদিকে। কিন্তু পা আর হ'ল না। উঠতে কিছুতেই পারেন না, পায়ে জোর নেই, কোমরও বোধ হয় ভেঙেছে। রামলোচনের বিলাপের শেষ নেই। কেউ তাঁকে ভাল ক'রে ডাক্তার দেখাচ্ছে না—এ অনুযোগ তো আছেই। বড়বৌকে চুপি চুপি বলেন, 'আছি, তবু তো মাছ-ভাত পেটে যাচ্ছে দুবেলা বড়বৌ, তুমি একটু মুখ পানে চাও। ওরা না দেখায়, বালাজোড়া বাঁধা দিয়ে ভাল ডাক্তার আনো।'

বড়বৌ উত্তর দেন, 'মরণ আর কী। কী এমন নিধি উনি, তাই বালা বাঁধা দিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে। কেন, ভাইরা ডাক্তার দেখাচ্ছে না? উপযুক্ত ছেলে থাকলেও এমন চিকিচ্ছে হত-না, ভাই-

ভাইপো যা করলে। আর বুড়োবয়সে কী একদিনে সেরে ওঠে নাকি?'

একটু চুপ ক'রে থেকে কাতর-কণ্ঠে বলেন, 'বড়বৌ, হাত পায়ের ফুলোগুলো কমে গেলে বোধ হয় একটু জোর পাব, তোমার বাপের বাড়ির দেশে কী এক সুতো পাওয়া যায় না? ধারণ করলে ফুলো কমে?'

বড়বৌ বলেন, 'হ্যাঁ, ডাক্তাররা বলছে পেটে কিছু হজম হচ্ছে না, তার দরুণ রক্ত নেই বলে হাত-পা ফুলছে—লাল সুতো বেঁধে উনি সে ফুলো সারাবেন!'

তবু লালসুতো এনে দু পায়ে বেঁধে দেন। আরও দুএকটা মাদুলি আসে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না, পায়ে আর জোর আসে না কিছুতেই।

সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে রামলোচনের এই পরনির্ভরতা। বিছনায় শুয়ে দৈহিক কাজগুলো সারতে হয় এজন্য তাঁর তত দুঃখ নেই, কারণ সে বড়বৌ করে—এখনও তাঁকে তিনবার ক'রে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল নিতে হয় মাথায় (এতবার স্নান করা সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থা), সে জন্য লজ্জাও নেই—কিন্তু আহারটার জন্যেও যে পরের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়, এর চেয়ে আর দুঃখ কী আছে? ডাক্তার বেঁধে দিয়েছেন পোরের ভাত, সিঙ্গিমাছের ঝোল আর কাঁচকলা সিদ্ধ, বিকালে বার্লি, রাত্রে দুধবার্লি বা খই-দুধ। এ খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, না পায়ে জোর পায়? এ শুধু ওদের ষড়যন্ত্র ওঁকে পঙ্গু ক'রে রাখার।

রামলোচন হাঁ ক'রে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন বাইরের দালানের দিকে। কিন্তু দালানের এ কোণের দিকে প্রায়ই কারুর প্রয়োজন হয় না—কদাচিৎ কেউ ছিটকে এসে পড়ে। তবে যদি কেউ আসে তার আর রক্ষা নেই, সঙ্গে সঙ্গে রামলোচনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তাকে তাড়া করে, 'অ ন-বৌমা, মালক্ষ্মী, এদিকে একবার শোনো-না। আমার মা-জননী কই গো, ছেলেকে কি মনে পড়ে না?'

আগে আগে দয়া-পরবশ হয়ে কিংবা ভদ্রতার খাতিরে, ইদানীং মজা দেখবার জন্য—হয়তো সে এসে দাঁড়াল। ভাল ক'রে ঠাউরে দেখে রামলোচন বললেন, 'ন-বৌমা নয় আমাদের নতুন বৌমা, মালতী? বেশ, বেশ—আহা, তুমি মা কত বড় বংশের মেয়ে, তোমার বাবাকে তো আমি চিনি—মহাশয় লোক ছিলেন। আহা অমন লোক কী আর হবে!'

মালতী হয়তো বললে, 'ওকি জ্যাঠামশাই, ছিলেন কী, আমার বাবা তো এখনও বেঁচে আছেন!'

'থাকবেন বৈকি মা, থাকবেন বৈকি! পুণ্যের শরীর তাঁর, দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবেন। তুমি দেখে নিও নতুন বৌমা, একশ বছর পরমায়ু পাবেন তোমার বাবা!...তা হ্যাঁ, একটা কথা শুনবে মা?'

'কী বলুন?' অতিকষ্টে হাসি চেপে বললে মালতী।

'চারটি মুড়ি একটু নুন-তেল মেখে নিয়ে আসতে পারো মা? খুব দুটিখানি?'

'না জ্যাঠামশাই, সে আমি পারব না। ডাক্তার আপনাকে তেল খেতে একেবারে বারণ করেছে!'

'ওসব ডাক্তারদের বুজরুকি মা, বুঝেছ? আমাকে মেরে ফেলবার মতলব। ওসব তুমি শুনো না বাছা,—যাও দুটিখানি মেখে নিয়ে এসো, লক্ষ্মী মা আমার!'

মালতী ঘাড় নেড়ে বললে, 'না সে আমি পারব না। মা জ্যাঠাইমা রাগ করবেন।'

এই বলে সে হয়তো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রামলোচন রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন, 'তা পারবেন কেন? কুঁড়ে পাথর নিজে গিলতে পারো খুব! রাক্কুসী!...ছোটলোকের ঘরের মেয়ে তো, ও আর কত ভাল হবে। ছোটলোকের ঝাড় সব।' ইত্যাদি।

সে রাগটা কমলে আবার উৎসুখ দৃষ্টি মেলে শুয়ে থাকেন। এবার হয়তো আসে চাঁপা, মেজভাইয়ের নাতনি। সঙ্গে সঙ্গে রামলোচনের কণ্ঠ মোলায়েম হয়ে আসে, 'চাঁপা ভাই, দিদি আমার, একবার শুনবি এধারে? একটুখানি, এক মিনিট?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাঁপা এসে দাঁড়ায়, 'কী বলছ?' সতেরো আঠারো বছরের ঝলমলে মেয়ে চাঁপা,সদ্য বিয়ে হয়েছে ওর, শাড়িতে ও গয়নায় যেন জ্বলছে।

'চাঁপা ভাই, নাতজামাই এসেছিল কাল?'

'কাল কেন আসবে, কাল কি আসবার দিন? কী দরকার তাই বলো না—'

'না তাই বলছি! যাই বলিস ভাই চাঁপা, আমার সলিল বড় ভাল ছেলে, অমন জামাই একটাও এ বাড়িতে আসেনি। যেমন রূপ তেমনি গুণ। আর বিদ্যেটাই কি সোজা? সলিল আমার রত্ন।'

'আচ্ছা তাই না হয় হ'ল। এখন আমাকে ডাকছিলে কেন?'

'চাঁপা, একখানা গবম লুচি খাওয়াতে পারিস দিদি?'

'লুচি? লুচি কোথা পাব?'

'তবে একটা গজা?' উৎসাহে, আগ্রহে, আকুলতায় মাথাটা ওঁর বিছানা থেকে ঝুলে পড়ে, 'একখানা খাস্তার গজা? গজা খেলে কিচ্ছু ক্ষতি হবে না আমার, তুই দেখে নিস!'

'হ্যাঁ, তারপর বড়দি আমাকে বকুক? তাকে একশ' বার ময়লা ঘেঁটে মরতে হচ্ছে, আর আমি কুপথ্যি খাইয়ে আরও রোগ বাড়িয়ে দিই। সে আমি পারব না।'

সবেগে মাথা নেড়ে, শাড়ির আঁচল দুলিয়ে চাঁপা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

রামলোচন পেছন থেকে গালাগালি দেন, 'মরণ! অন্ধারে মট্‌মট করছেন। তবু যদি বড়লোকের ঘরে বিয়ে হ'ত: ঐ তো বরের ছিরি, কালো রোগা ব্রেষ কাঠ! ঐতেই এত তেজ! তেজের মাথা খাও!'

আবারও গলাটা ঝুঁকিয়ে দালানের দিকে চেয়ে থাকেন, যদি কেউ আসে এধারে।

সেদিন বাড়িতে কী একটা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, বোধ হয় কোনও বৌয়ের সাধ কিংবা অন্নপ্রাশন কারুর ছেলেব। সারাদিন ভাল ভাল রান্নার গন্ধ রামলোচনের নাকে এসে পৌঁচেছে অত দূব থেকেও। সন্ধ্যা থেকে লুচি, কাটলেট, পাঁপর ভাজার গন্ধ। অনেকবার মিনতি করেছেন বড়বৌয়ের কাছে, অনেক পরলোকেব ভয় দেখিয়েছেন, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। সন্ধ্যাবেলা রাগ ক'রে দুধবার্লির গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, তাতে লাভের মধ্যে বড়বৌয়ের কুবাক্যই সইতে হয়েছে, পরে আর একগ্লাস বার্লিও জোটেনি। অতিথিদের শুনিয়ে গৃহস্থদের অপদস্থ করার ইচ্ছায় খানিকটা চিৎকার ক'রে কাঁদবার চেষ্টাও করেছেন—ফল হয়েছে এই যে, ভাইপো এসে ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে। অগত্যা ঘরে শুয়ে শুয়ে অতিথিদের আনন্দ-কোলাহল শোনা এবং পরিবেশনের শব্দ থেকে কী কী রান্না হয়েছে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করা—এছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি রামলোচন।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল। বাড়ির সমস্ত গোলমাল কম্‌তে কম্‌তে একসময়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভরসা ছিল যে, বড়বৌ মুখে যাই বলুক, আব একগ্লাস বার্লি অন্তত দেবে, কিন্তু সে আশাও একসময়ে ছাড়তে হ'ল যখন দালানের ঘড়িতে একটা বাজার শব্দ কানে এসে পৌঁছল।

রাগে, ক্ষোভে, ক্ষুধায় ঘুমোতে পারেন না রামলোচন। ইদানীং আর বড়বৌ এঘরে থাকেন না, রোগ খুব বেশি নেই, মিছিমিছি সারাদিন খাটুনির পর বিশ্রামটা নষ্ট করতে চান না। অয়েলক্লথের ওপর রামলোচন শুয়ে থাকেন, কতকগুলো ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পাশেই থাকে। 'পা পড়ে গেছে, হাত তো আর যায়নি!' ঝঙ্কার দিয়ে বলেন বড়বৌ, 'আমি কি আর দিনরাত ঐ করব?'

অবশেষে ঘড়িতে দুটো বাজল। কিছুতেই আর শুয়ে থাকতে পারেন না রামলোচন। নিজের অনাহার এবং ভাল ভাল খাদ্যের কল্পনা তাঁকে পাগল ক'রে তোলে। শেষ পর্যন্ত একটা অদ্ভুত মতলব মাথায় যায় ওঁর, কোনমতে বিছানার ধারে এসে দেহের ওপরের অংশটা অনেকখানি ঝুলিয়ে দুই হাতে মেঝেটা স্পর্শ করেন, তারপর হাতের ওপর ভর দিয়েই একটু একটু ক'রে এগিয়ে পা-দুটো টেনে

তক্তপোশ থেকে নামিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কাজটা দুর্বল শরীরের পক্ষে খুবই দুরূহ, হাত দুখানা থর থর ক'রে কাঁপে, সমস্ত দেহ ঘামে ভেসে যায়। তবু রামলোচন হাল ছাড়েন না। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণ চেষ্টায় শরীরের নীচের অংশকে আকর্ষণ করতে থাকেন।

খানিকক্ষণ ধরে এম্‌নি চেষ্টা করার পর একসময় সেটা ধপাস্‌ ক'রে আছড়ে এসে পড়ে মেঝের ওপর। যন্ত্রণায় একটা চাপা আর্তনাদ ক'রে ওঠেন রামলোচন, কিছুক্ষণ আর নড়তেও পারেন না। মনে হয় পা-দুটো বুঝি ভেঙেই গেল। কিন্তু খানিকটা পরে আবার নিজেকে সাম্‌লে নেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তিই জয়ী হয়ে ওঠে—দুটো হাতে ভর ক'রে পা টানতে টানতে এগিয়ে যান দরজার দিকে, খোঁড়া কুকুর যেমন ক'রে পেছনের পা-দুটো টেনে টেনে চলে—কতকটা সেই রকম ক'রে।

তারপর দরজটা ফাঁক ক'রে দালানে মুখ বাড়ান।

আঃ—কী মুক্তি! কতকাল পরে এ ঘরের বাইরে পা দিলেন তিনি!

আজকাল একটা পাঁচ বাতির আলো দালানে জ্বলে সমস্ত রাত। তাঁর অসুখের সময়ই এ ব্যবস্থা হয়েছিল, ছেলেপুলের ঘরে খুবই সুবিধা হয় বলে সেটা টিকে গেছে। ক্ষীণ আলো, তবু তাইতেই সর্বাগ্রে চোখে পড়ল তাঁরই ঘরের প্রায় সামনে এঁটো পাতা-গেলাস-খুরি স্তূপাকার করা আছে, তার সঙ্গে দুচারটে গামলা বাল্‌তি প্রভৃতি বাসনও।

লোভে ও ঔৎসুক্যে চোখ জ্বলতে থাকে ওঁর। দেহে যেন অপরিসীম বল অনুভব করেন। সামনে এগিয়ে লোলুপ-আগ্রহে সেই এঁটো পাতার রাশির মধ্য থেকে উচ্ছিষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করতে থাকেন—আধখানা লুচি, আলুর টুক্‌রো, মাছের কুঁচি, খানিকটা কাট্‌লেট, সিকিখানা চিংড়িমাছ, দরবেশের গুঁড়ো, পান্তুয়ার অর্ধেকটা—এমন কী আস্ত সন্দেশ রসগোল্লাও একআধটা খুঁজে পান। খেতে খেতে যেন নেশা লাগে, পাতাগুলো তুলে তুলে জিভ দিয়ে চাট্‌তে শুরু করেন। সারা মুখে, বুকে, সর্বাঙ্গে তরকারির ঝোল মিষ্টির রস, দই লাগে—তবু ভ্রূক্ষেপ নেই।

অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে খেয়ে একসময়ে শ্রান্ত হয়ে চুপ করেন রামলোচন। এইবার দালানটার দিকে ভাল করে তাকাবার অবসর মেলে।

ও কি, ওখানে শুয়ে কে! এত কাছে মানুষ ছিল তাঁর, আর এই কাণ্ড তিনি করেছেন এতক্ষণ ধরে, নিশ্চিত হয়ে?

ভয়ে রামলোচনের বুকের মধ্যেটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। টিপ্‌ টিপ্‌ করে শব্দ হয় সেখানে।

কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হন। না, ও ঘুমোচ্ছে। ঝি বোধ হয়, নতুন ঝি।

রামলোচনের মনে পড়ে ওঁদের পুরোনো ঝি নেত্যর মেয়ে সাবি বিধবা হয়ে মার কাছে ফিরে এসেছে, তারই সম্প্রতি বহাল হবার কথা শুনেছেন বড়বৌয়ের কাছে। সাবি যখন এগারো বছরের মেয়ে তখন বিয়ে হয়েছে—এখন সে-হিসেবে ওর কুড়ি একুশ বছর বয়স হবার কথা। কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে।

কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে ক্রমশ। তেমনি হাতে ভর দিয়েই এগিয়ে যান তার দিকে। একটা মাদুরের ওপর সাবি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। পরিশ্রান্ত দেহ, কাপড়চোপড় যে এলিয়ে পড়েছে তা ও টের পায়নি। ওরই মাথার ওপর আলোটা জ্বলছে, সেই আলোতে তার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে রামলোচনের দৃষ্টি লুব্ধ হয়ে ওঠে বহুকাল পরে, তিনি স্থান কাল পাত্র সব ভুলে যান। সেই খাবারের রস ও ঝোল মাখা হাতেই ওর নধর যৌবনপুষ্ট কাঁধ ও হাতের ওপর হাত বুলোতে যান। হাতই যেন রসনা ওঁর, সাবির তরুণ যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করেন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে!

কিন্তু সে স্পর্শে সাবির ঘুম ভেঙে যায়। মুহূর্ত কয়েক বিহ্বলভাবে ঘুমচোখে তাকিয়ে থেকে ঘুম-ভাঙার অর্থ খুঁজে পায় সে। বৃদ্ধের লোলুপ দৃষ্টি এবং সর্বাঙ্গে ঐ ভোজ্যের রস মাখা বীভৎস চেহারা দেখে ভয়ে বিকট চিৎকার ক'রে উঠল সাবি। লাফিয়ে সরে গিয়ে কেঁদে চিৎকার ক'রে একেবারে হাট

বাধিয়ে তুললে।

সে চিৎকারে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এল। তাদের খানিকক্ষণ সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর বড়বৌ মেঝেতে মাথা খুঁড়তে লাগলেন লজ্জায় ও অপমানে, বাকি সকলে যার যা মুখে এল বলতে লাগল।

সেই অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার মধ্যে ব্যাকুল অসহায় আর্ত রামলোচন বিহ্বল-দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলেন চুপ ক'রে—শুধু কী যেন একটা কৈফিয়ৎ দিতে গেলেন বারবার—কিন্তু কিছুতেই গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোল না, শুধু সেই চেষ্টায় ওঁর ঠোঁট দুটো থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল।

প্রেরণা

ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ

আশাপূর্ণা দেবী

অবশেষে সেই ঘটনাই ঘটল! সেই ভয়ঙ্কর নির্লজ্জ দুর্ঘটনা। যার আতঙ্কটা এতদিন ধরে একটা ছুঁচলো ছুরির মতো সংসারের পাঁজরে বিঁধে বসেছিল।

আতঙ্কের শেষ হয়েছে।

ছুরিখানা সেই পাঁজরকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেবিয়ে গেছে সমস্ত সংসারটাকে রক্তাক্ত করে দিয়ে।

বুলা পালিয়েছে।

এ বাড়ির ছোটবৌ বুলা। পুরো নামটা যার বুলবুল।

হিসেব মতো আমি এদের সংসারের কেউ নই, দৃশ্যত পরিচয় হচ্ছে—আমি এদের বাড়িওলার মেয়ে। কিন্তু শুনতে পাই আমি জন্মাবার আগে থেকেই এরা আমাদের একতলার ভাড়াটে, কাজেই হাঁটতে শিখেই আমি প্রথম বেড়াতে এসেছি নীচতলায়, এদের বাড়িতে।

তারপর তো কত শীত, কত গ্রীষ্ম, কত বছর গেল, কিন্তু বেড়াতে আসার প্রধান জায়গা আমার এটাই রয়ে গেল। আমি প্রায় এদেরই পরিবারভুক্ত হয়ে গেছি, এদের নাড়িনক্ষত্র সব আমি জানি।

আমি জানতাম এ বাড়ির প্রত্যেকের মনের মধ্যে অনুমানের প্রতিযোগিতা চলছে—বিঁধোনো ছুরিখানা সত্যিই এই ভয়াবহ নৃশংসতা করবে, না কোনও এক সময় তীক্ষ্ণতা হারিয়ে শিথিল হয়ে খুলে পড়বে।

অথচ এ নিয়ে স্পষ্ট আলোচনা কেউ কোনদিন করেনি। করেনি, কারণ করতে পারেনি। কেন পারেনি তাও আমি জানতাম।

বুলাকে চটাতে চাইত না কেউ। বুলার কাছ থেকে সবাই সেবা পায়, যত্ন পায়, কাজ পায়, বুলা নইলে কারও চলে না।

বুলার শ্বশুর রাজেনবাবু দিনে দু'বার নির্দিষ্ট সময় ধরে ডাকতেন 'ছোটবৌমা!' বুলা তাড়াতাড়ি বলে উঠত 'যাই বাবা!' আমি বুঝতাম বুলা এখন ওর শ্বশুরের হাঁটুতে কবরেজী তেল মালিশ করবে অনেকক্ষণ ধরে। রাত্রে বুলা এসে ডাকত—"বাবা, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?" রাজেনবাবু গলাটা কেমন একরকম সুরে ঝেড়ে নিয়ে বলতেন, "না, এই ঘুমটা এসেছিল।"

বুলা ফ্ল্যানেলের টুকরো আর কাঠকয়লার আগুন নিয়ে ঘরে ঢুকত। ঘুমের আগে হাঁটুতে সেঁক দিয়ে গরম কাপড় জড়িয়ে তবে ঘুমোন রাজেনবাবু।

বুলার শাশুড়ি সুশীলাবালা দিনে তিনশো ছাপ্পান্নবার ডাক দিতেন "ছোটবৌমা!"

সবগুলো ডাকের হিসেব দিতে না পারি, আমি জানতাম সুশীলাবালা বেশির ভাগই এমন সব কাজে ডাকেন, যার জন্যে না ডাকলেও চলে। যেমন "ছোটবৌমা, কাল থেকে আমার পানে সুপুরি কম দিও, ছোটবৌমা, আমাব বিছানাটা একবার রোদে দিলে পারো, ছোটবৌমা ভিজে কাপড়গুলো সব মেলা হয়েছে? ছোটবৌমা, তখন সদরে কে কড়া নাড়ল?" নিদেন পক্ষে একথাও বলবেন, "ছোটবৌমা ঘরে আজকাল পিঁপড়ের উপদ্রব এমন বেড়েছে কেন বলো তো?"

বুলার বিধবা বড়জা ডাকতেন দিনে অন্তত ন'শো নিরানব্বইবার। "বুলা, উনুনটা ধরিয়ে দাও এবার, বুলা, চায়ের জল চাপিয়েছ? বুলা, এখনও তোমার কুটনো কোটা হয়নি? বুলা. ময়দাটা কখন মাখবে? বুলা, হাত চালাও চটপট।"

বুলার আইবুড়ো ননদ উষা বুলার চাইতেও যে বয়সে বড়, আর বুলা বিয়ের আগে থেকেই যে বিছানায় পড়ে আছে, সে চিঁ চিঁ গলায় যখন তখন ডাকে, "ছোটবৌদি, তোমাব হল?"

বুলা তাড়াতাড়ি কাছে যায়, বলে,"কী উষা কী?" উষা মুখ ঝামটে বলে, "কিচ্ছু না। কিছু বলিনি।"

বিধবা বড়জায়ের অনেক বয়সের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, তারা প্রত্যেকেই অনেকবার করে ডাক দেয়, "ছোটকাকি!"

"ছোটকাকি, আমায় নীল খাতাটা যে এখানে ছিল?"

"ছোটকাকি, আমার বেল্টটা কোথায় রেখেছ?.." "ছোটকাকি, আমার স্কুলের বেলা হয়ে গেল।" "ছোটকাকি. দেখো না ও আমায় মারছে।"... "ছোটকাকি, আমার ফিতেটা বেঁধে দিয়ে যাও না।"

ছোটবৌমা, ছোটবৌদি, ছোটকাকি।

একই নামের হেবফের। কথাগুলোও একই ভাবের, একই সুরের, শুধু অক্ষরের হেরফের।

তবু বুলাকে আমি কোনদিন রাগতে দেখিনি। বুলা সব দিন, সব সময় হাসছে, সব সময় কাজ করছে, সব সময় ছেলেদেরকে বকছে ধমকাচ্ছে, ফিতে বেঁধে দিচ্ছে, জামায় সাবান লাগাচ্ছে। উষা যেন ওর চাইতে ছোট এইভাবে তাকে ভোলাচ্ছে।

আমার কাজও করে দিয়েছে কতদিন, ডেকে সেধে। 'ও কি ভাই, সেফটিপিন দিয়ে জামা পরেছ কেন? দাও বোতাম বসিয়ে দিই।' আমি 'না না'—করলে হাসত, ইস্ মেয়ের কী লজ্জা!

এই বুলা।

একে চট করে চটানো যায় না। তাই বুলার পাশের বাড়ির জানলা দেখায় চাঞ্চল্য দেখে আড়ালে আড়ালে শুধু এক আধটা মন্তব্য, শুধু সংসারের প্রত্যেকটি সদস্যর মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময়। সে দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে 'এ মেয়ে আর ঘরে থেকেছে!'

বড় জায়ের বড় মেয়েটা, যে এই সবে নাইনে উঠল সেও যোগ দেয় এই দৃষ্টি-বিনিময়ে, সেও কোনও সময় এসে ফিসফিস করে, 'ছোটকাকির একটা খামে চিঠি এল।' বলে, 'ওবাড়ির বিজুকাকার যেন আর কাজ নেই, খালি ছোটকাকির ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে আছেন।'

'এর জানলা খোলা তো?' সুশীলাবালা হিস্‌হিসিয়ে বলে ওঠেন।

'খোলা তো সব সময়।' ঠোঁট উল্টে বলে নাতনি।

আর অমনি সকলের মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ধুঁইয়ে ওঠে 'ভগবান জানেন কী সর্বনাশ করবে!'

ভগবান থেকে এবার সকলেই জানল।

সর্বনাশের মতো সর্বনাশ করেছে বুলা, শ্বশুরবাড়ির এই সহস্র বন্ধন ছিন্ন করে পালিয়েছে।

'অনেকদিনই জানতাম।' বলল বড়জা, 'বিজুকে আমি চিঠি ছুড়তে দেখেছি নিজের চক্ষে।'

সুশীলাবালা কপালে ঘা মেরে বলেন, 'আমি আরও আগেই জানতাম। টের পেয়েছিলাম ওর গুণ। নইলে আর আমার সুখেন সন্নিসী হয়।'

মাসিমার এ কথার কেউ প্রতিবাদ করে না। করলে মাসিমা রেগে আটখানা হবেন ভেবে, না প্রতিবাদ করলে বুলার অপরাধের ওজনটা কমে যাবে ভেবে, কে জানে!

নইলে অনায়াসেই তো বলতে পারা যেত 'সুখেন তো তোমার বরাবরই স্বামীজীদের পায়ে পায়ে ঘুরত, আঠারো বছর বয়েস থেকেই তো সুখেন হাফ-গেরুয়া। মিশন থেকে ধরে এনে তো বিয়ে দিয়েছিলে ওর।'

প্রতিবাদ করা রোগ আমার একটু ছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারলাম না। কারণ আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা চাকরি ধরে বসেছি ইস্তক মাসিমা মেসোমশাই আমাব সঙ্গে কথা কন না।

নইলে আমি আর এ বাড়ির জানি না কি?

সুখেনদার 'স্বামীজী-গিরির' গোড়া থেকেই তো জানি।

সত্যি বলতে কী, ছেলেটার চেহারা ছিল অতীব সুন্দব। ছেলেবেলায় বলতে গেলে আমি একরকম ওব রূপে বিমোহিতই ছিলাম। ও যদি মানুষের মতো হত, নির্ঘাত তা'হলে এ বাড়িতে একটা প্রেমে পড়াপড়ি ব্যাপার ঘটত।

কিন্তু ষোলো সতেরো বছর বয়েস থেকে ওর ওই পাকামি দেখা দিল। ওই স্বামীজী-গিরি। ছুটি হলেই মঠে মিশনে ছোটা, যত সব ধর্মগ্রন্থ আর মহৎ জীবনী এনে পড়া, মেয়েদের দিকে তাকিয়ে না দেখা, এইসব নানা দুর্লক্ষণ। আমি প্রথমটায় ঠাট্টাব চোটে ওর ঘাড় থেকে ভূত নামাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম সুখেন একেবারে বেদম সিরিয়স।

হাল ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়ায় মন দিলাম।

ওদিকে ক্রমশ সুখেন পাকামিতে আরও দুরন্ত হয়ে উঠল, চিন্তায় পড়ে মাসিমা ওর বিয়ের ঠিক কবলেন, আব বিয়ের আগের দিন সুখেন ভাগল।

তারপর সে কত কাণ্ড কত ছিষ্টি করে ধরে আনা, প্রায় পুলিশ প্রহরার মত পাহারা দিয়ে বিয়ে করতে পাঠানো—নানান ইতিহাস।

কিন্তু খেল দেখিয়েছিল সুখেন বিয়ের পর কটাদিন। জরিপাড় ধুতি পরেছিল, মাথায় গন্ধ তেল মেখেছিল রোজ দাড়ি কামিয়েছিল। রাত বারোটা পর্যন্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠের সদভ্যাস ত্যাগ করে সন্ধে থেকে শোবার ঘরেব আশে-পাশে ঘুরঘুর করেছিল।

তখন আবার বাড়িতে সে কী হাসাহাসির ঘটা! মাঝে মাঝে সে হাসি তিক্ত হাসিতেও পর্যবসিত হচ্ছিল। 'ছি-ছি-ছি। লাজলজ্জার বালাই নেই'...'বকধার্মিক আর কাকে বলে?' ...'খুব দেখালি বাবা যা হোক।'. .আব সমালোচনা চলেছিল বুলার। 'কী পাকা মেয়ে এল গো বৌ হয়ে! তপস্বীকে তপঃভ্রষ্ট করতে পারে, সে মেয়ে কি সোজা?'

একদিন মাসিমা এমন কথাও নাকি বলেছিলেন, তাঁর সাধু ছেলেকে এভাবে অধোগামী করায় নাকি বুলাব মহাপাপ ঘটছে। শাস্ত্রে নাকি এই রকম স্ত্রীলোককেই 'পাপিষ্ঠা' বলে। স্ত্রী হচ্ছে সহধর্মিণী, স্বামীর ধর্মপথের সহায়। পড়োনি রামকৃষ্ণর জীবনী? সারদামণির জীবনী?

তা' বেশিদিন আর বুলাকে এ সব কথা শুনতে হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি চৈতন্য হয়েছিল সুখেনের! হঠাৎ একদিন সকালবেলা ধরা পড়ল সেটা।

ঘুম থেকে উঠেই নাকি কোথায় চলে গেছে সুখেন।

কোথায়? কোথায়?

একটু পরেই জানা গেল 'কোথায়।' গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল সুখেন। স্নানান্তে এসে ঘোষণা

করল আজ সে নির্জলা উপবাস করবে, কাল থেকে তিনদিন মৌনী থাকবে, আর চারদিনের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে সংসার ত্যাগ করবে। আর আটকাবার চেষ্টা করলে? একবারে নিরুদ্দেশ।

সেই একদিন মাত্র আমি বুলার চোখে জল দেখেছিলাম। গাল দুটো কাঠের মতো শক্ত আর কালো কালো দেখাচ্ছিল, সেই গালের উপর একটা জলের রেখা গড়াচ্ছিল, আর শুকিয়ে যাচ্ছিল।

পরে একদিন বলেছিল বুলা, 'সেদিন দুঃখে কাঁদিনি আমি, কেঁদেছিলাম অপমানে।'

কিন্তু ওই সেই একদিন!

তারপর আর কেউ কোনদিন বুলার মুখ মলিন দেখেনি।

কিন্তু সেও তো ভাল না?

সেও তো দোষের, সেও তো নিন্দের?

স্বামী যার স্ত্রীকে ত্যাগ করে নিবৃত্তির পথে গেছে, তার কী করে প্রবৃত্তি হয় হাসতে, কথা বলতে, বাচ্চাগুলোর সঙ্গে হুড়েমি করতে? বাচ্চারা একেবারে 'ছোটকাকি' বলতে অজ্ঞান! হবে না কেন? ছোটকাকির মতো এত রং ঢং আর কে করবে? এত পদ্য, এত ছড়া, এত গল্প, এত নাটক শিখলই বা কী করে বুলা? এই তো বাড়িতে আরও তিনটে মেয়েমানুষ আছে, তাদের মধ্যে এত কথা কে কয়? এত গান কে গায়?

দিনগত পাপক্ষয়ের ধারশোধ করতে করতেই তো মরে যাচ্ছে সবাই। অথচ বুলা, যার প্রাণের মধ্যে প্রাণ থাকবার কথা নয়, মরমে মরে যাবার কথা, তার যেন ষোলো আনার উপর আঠারো আনা প্রাণের ঢেউ।

আর সে ঢেউ যে পাশের বাড়ির জানলায় গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে, তাও তো জানতে কারুর বাকি ছিল না?

'স্বামীকে বাঁধতে পারলি না, পর-পুরুষকে বাঁধছিস?' এ উক্তিটা হয়তো অনুক্ত থাকত, কিন্তু তার ঝাঁজটা ছড়িয়ে পড়ত বুলার উপর।

স্বামীকে অধোগামী করলে বুলার হয়তো মহাপাপ হত, কিন্তু সংসারটার তো একটা সুরাহা হত? ইশারায় ইঙ্গিতে একথা সবসময় শুনতে হত বুলাকে।

সুখেনের বিরহযন্ত্রণাটা ক্রমশই ফিকে হয়ে আসছিল, কিন্তু সংসারের একমাত্র রোজগারি ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে মঠে গিয়ে উঠলে সংসারে যে অসুবিধে সেটা তো আর ক্রমশ ফিকে হয়ে যায় না, বরং ক্রমশ ঘোরালোই হতে থাকে।

নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলো ভেঙে যায়, ছিঁড়ে যায়, ক্ষয়ে যায়, আর কেনা হয়ে ওঠে না, দৈনন্দিন প্রয়োজনের সীমানা সঙ্কীর্ণ করে আনতে হয়, করতে হয় আরও কত কত ছাঁটাই। রান্নার লোক ছিলই না, একমাত্র চাকরটাকেও ছাড়িয়ে দিতে হয়।

আর—

আর মাস কাবার হলেই বড়বৌদির মেজ মেয়েটা আমাদের দোতলায় উঠে এসে চুন চুন মুখে বলে, 'দিদা বললেন, ভাড়াটা এমাসটাও দিতে পারলেন না—'

আরও কিছু হয়তো শেখানো থাকত তাকে, আরও একটু বিনয়বাণী, আরও কিছু মিনতি, কিন্তু বলতে পারে না বেচারা, ড্যাস টেনে চুপ করে যায়।

আমি জানি, আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে যতই আত্মীয়তা ভাব থাকুক, এ কথায় মার ভুরুটা কুঁচকে ওঠে, বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, কিন্তু মেয়েটা মাটির দিক থেকে চোখ তোলে না বলেই সেদৃশ্য থেকে রক্ষা পায়।

রাজেনবাবু আর সুশীলাবালা, তাঁদের বিধবা বড়বৌ আর রুগ্ন মেয়ে, সকলেরই মনে হ'ত সংসারকে

এই অসুবিধেয় ফেলার জন্য বুলাই দায়ী, বুলারই ক্যাপাসিটির অভাব এটা। এর জন্যে বুলার উচিত অপরাধী অপরাধী ভাবে থাকা।

কিন্তু বুলা তা' থাকে না।

বুলা একেবারে অন্যরকম।

বুলা যে এ বাড়ির বৌ, সে কথা যেন ভুলে গেছে বুলা। বাড়ির বড় আইবুড়ো মেয়ের মতো থাকবে সে।

কিন্তু এটা কে বরদাস্ত করতে পারে?

তাই সবাই আড়ালে অস্ফুটে বলেছে, 'এ বৌ আর ঘরে থেকেছে!' বলেছে, 'না জানি কী সর্বনাশ করবে?' শুধু উষা নিশ্বাস ফেলে বলেছে, 'আমার জায়গাটা ছোটবৌদি সমস্ত দখল করে নিয়েছে।'

কিন্তু বুলা যখন চলে গেল, সব জায়গা ছেড়ে দিয়ে, তখন আরও অনেক জোরে নিশ্বাস ফেলল উষা। বলল, 'পৃথিবীর সবাই যা খুশি করতে পারে।'

কিন্তু এ কী খুশির খেলা?

সংসারের মুখে আগুন লাগাবার, সংসারের পাঁজর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করবার খুশি কেন জাগল বুলার?

আমিও ভাবলাম বুলার সঙ্গে এই খুশিটাকে যেন ঠিক খাপ খাওয়ানো যায় না।

আগেকার আমলে ঘরের বৌ ঝি কুলত্যাগ করলে কেউ হৈ চৈ করত না। 'রাত্তিরে কলেরা হয়ে মারা গেছে, রাত্তিরেই দাহ করা হয়ে গেছে,'... 'মাঝরাতে সাপে কেটেছিল, শেষরাতে কলার ভেলায় করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে,' এমনি একটা কিছু রটনা করে সমাজের মুখোমুখি আক্রমণ থেকে রক্ষা পেত লোকে।

ভিতরে ভিতরে তো সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, 'ঢাকে ঢোলে কাঠি, শুধু উলু দিতে মানা।'

এখন সমাজ নেই, জাত যাবার প্রশ্ন নেই, তাই মিথ্যা রটনারও প্রয়োজন নেই। এখন বৌ মেয়ে হারিয়ে গেলে, যত পারো হৈ চৈ করা চলে, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া চলে। 'ফিরে এসো' বলে কাকুতি মিনতি করা চলে।

রাজেনবাবু অবিশ্যি কাগজে ছাপালেন না, কিন্তু বাড়ি ছাপিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মনের জ্বালা যন্ত্রণা জানিয়ে এলেন। আর বাড়িতে যতটা সম্ভব চেঁচিয়ে রায় দিলেন, 'আজ থেকে যদি কেউ সেই হারামজাদীর নাম মুখে আনবি তো তাকে জ্যান্ত গোর দেব।' বললেন, 'এ বাড়িতে যেন তার চিহ্নমাত্র না থাকে, সব পুড়িয়ে জ্বালিয়ে নির্মূল করে দাও।'

বুলার চারটি বই ছিল, সেগুলো টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে উনুন ধরাবার জন্যে ঘুঁটের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন সুশীলাবাল, বুলার বিয়ের সময় তোলা ছবিখানা দেয়াল থেকে নামিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে কাচখানা ভাঙলেন, তারপর বড় নাতনিকে বললেন, 'এর থেকে সুখেনের ছবিটুকু কাঁচি দিয়ে কেটে রেখে বাকিটা উনুনে ফেলে দিগে যা।'

বুলার বড়জা নরম নরম মুখে বলল, 'ওর তোলা গহনাগুলো কি আপনার কাছে ছিল মা? না ওর কাছে?'

'আমার কাছে আবার কী?' সুশীলাবালা দাঁতে দাঁত চাপলেন, 'ঢলানি সর্বনাশী আমার কাছে কবে কী রেখেছে?'

'তাহলে সেগুলো নিয়েছে।' বড়জা বলল আরও নরম নরম মুখে। 'এক বস্ত্রে চলে গেছে বুলা'— এ তথ্যটুকু অন্তত পাড়াপড়শির মনকেও কিঞ্চিৎ নরম করে আনতে পারে ভেবেই কি বড়বৌ মুখটা অত নরম করল?

আমি অবাক হয়ে চাইলাম ওর দিকে, ভাবলাম ভুলে গেল নাকি? এত স্পষ্ট ঘটনা ভুলে যেতে

পারে মানুষ?

বেশি গহনা ছিল না বুলার। মামারা বিয়ে দিয়েছিল। তবু দিয়েছিল মোটামুটি। সে গহনাগুলো তো একখানি একখানি করে বেচেছে বুলা বড়জায়েরই বাপের বাড়ির স্যাকরার কাছে। বড়জাই ডেকে দিয়েছে।

আমি যেন কেমন করে সব টের পেয়ে যাই। গহনা বেচার সময় বড়জা যে প্রথমটা অপ্রতিভ হয়ে 'না না' করেছিল এ কথা আমি জানি, আর বুলা যে একটা অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে সে আপত্তি খণ্ডন করেছিল সেও জানি।

বুলার নাকি গহনা পরতে ভাল লাগে না। আর পরতে যখন ভালই লাগে না, তখন নিয়ে কী হবে? বাক্সে পড়ে পড়ে পচা বৈ তো নয়!

এত সব কথা বড়বৌদি কী করে ভুলে গেল, ভেবে অবাক লাগল আমার। কিন্তু কিছুতেই কেন তখুনি মনে করিয়ে দিতে পারলুম না কে জানে।

উষা আমারই বয়সী, উষা ছোটবৌদি বলত, কিন্তু আমি বলতাম না। আমি 'বুলা বলতাম। বলতাম, 'তুমি এত খাটো কী করে বলো তো?' বুলা হেসে বলত, 'খাটো মানুষদের যে খাটাই সর্বার্থ, না খাটলে কী নিয়ে তারা থাকবে বলো তো?'

'বুলা, সুখেনদাকে একটা চিঠি লিখব?'

'আর লোক হাসিও না ভাই।'

'কিন্তু স্ত্রী সংসার, বুড়ো মা বাপ, সকলের দায় এড়িয়ে সন্ন্যাসী হওয়াই কি ধর্ম?'

'ধর্ম, একথা আবার কখন বললাম?'

'চৈতন্য করে দেওয়া উচিত নয় ওকে?'

বুলা হেসে উঠে বলত, 'অচৈতন্য হওয়াই যার লক্ষ্য, তাকে একখানা চিঠির ঢিল ফেলে চৈতন্য করাতে পারবে?'

বুলা চলে যাওয়ার পর থেকে ওদের ওখানে আমার যেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু আরও বেশি বেশি যেতে হয়। বাড়ি ভাড়া যত জমছে, মাসিমা ততই আমাকে আদর করে করে ডাকছেন, আর সংসারের যত অভাব অভিযোগের কথা বলছেন কেঁদে কেঁদে।

কাঠ হয়ে বসে বসে শুনতে হয় আমাকে—মাসিমার সমস্ত কাপড় ছিঁড়ে গেছে, আর কিনতে পারা যাচ্ছে না, মেসোমশাইয়ের আর ওষুধ আনা হয় না, বড়বৌদির ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুল ছাড়িয়ে নেওয়া ছাড়া গতি নেই, আর উষা তো স্রেফ পথ্যির অভাবেই তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছে।

না, কথাগুলো সুশীলাবালার বানানো নয়। রাজেনবাবুর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাগুলো ফুরিয়ে যাওয়া ইস্তক সংসারে দারিদ্রের চেহারা কর্দয হয়ে উঠছে, দেখতে পাচ্ছি চোখের ওপর। এ আক্ষেপগুলো বানানো নয়, বানানো হচ্ছে শুধু শেষ আক্ষেপটা।

'কী জানি, কী কালনাগিনীই ঘরে এনেছিলাম মা, সংসারটা বিষে জর জর হয়ে গেল!'

অর্থাৎ এই সব কিছুর জন্যেই বুলাই দায়ী।

ভয়ানক একটা রাগ হত, কিন্তু কী বা বলব। বুলার হয়ে কিছু বলবার জো কি!

বুলার হয়ে তো দূরের কথা, বুলার কথাই কী বলবার জো আছে? বুলা যে লুকিয়ে অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে, আর বুলা সিনেমায় নামবে বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে, এ গল্প উষার কাছেও করতে সাহস করিনি।

কিন্তু এ গল্প কি চাপা থাকে?

আগুন কি আত্মপ্রকাশ না করে ছাড়ে? খবরের আগুন এসে লাগল রাজেনবাবুদের বাড়ি।

বড়বৌদির বড় মেয়ে নিয়ে এল সেই আগুন।

বুলা সিনেমায় নেমেছে।

কোনও এক সিনেমা পত্রিকায় ছবি দেখে এসেছে সে। নবাগতা বুলা ব্যানার্জির ভাবেভরা হাসিঝরা মুখের ছবি।

সাহিত্যিক বিজয় বোসের লেখা বইতে বুলার অভিনেত্রী জীবন শুরু।

বিজয় বোস।

অর্থাৎ ওদের বাড়ির বিজু। অর্থাৎ সমাধান হল একটা ধাঁধার, মীমাংসা হল একটা অমীমাংসিত অঙ্কের। বুলা চলে যাওয়া থেকে আজ পর্যন্ত যেটা জিজ্ঞাসার প্রশ্নের মতো তীক্ষ্ণ হয়েছিল।

বুলার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বিজুও যদি বাড়ি থেকে অন্তর্হিত হ'ত তাহলে দুই আর দুইয়ে চারের হিসেব মিলিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যেত, কিন্তু তা' তো হয়নি। বিজু দিব্যি বাড়ি বসে আছে, অবিকল অবিচল।

অতএব কী আর করা যায়?

বিজুদের বাড়ি গিয়ে তার মা বাপকে যাচ্ছেতাই করা যায় না, যায় না পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াতে। পারা যায় শুধু এ-বাড়ির লোকদের ও-বাড়ি যাওয়া বন্ধ করতে।

বিজু সাহিত্যিক, বিজুদের বাড়িতে অগাধ পত্র পত্রিকা, তাই বড়বৌদির মেয়ে দুটোর ওইটাই ছিল পড়ে থাকবার জায়গা, আর বিছানার রোগী ঊষার ও-বাড়িটা ছিল লাইব্রেরি।

'ওই পাজিটার বাড়ি যদি আর যাবি তো ঠ্যাং খোঁড়া করব তোদের।' বলে রেখেছেন রাজেনবাবু নাতনিদের। অতএব ওদের অসুবিধে ঘটেছে বিস্তর; কিন্তু 'লুকোচুরির' ছিদ্রপথ বন্ধ করবার মতো আইন আর পৃথিবীর কবে কোথায় হয়েছে?

সেই পথেই অগ্নিস্রাবী খবরটা এসে পৌঁছল এ-বাড়িতে। উত্তেজনার মাথায় ভুলে গেল এরা 'কোথা থেকে জানলি?' উত্তর দিতে হবে'

'কই আন তো সে বই দেখি?' বলল বড়বৌদি। মেয়েরা এনেছিল আগেই, এখন বিছানার তলা থেকে বার করে দেখাল।

দেখল বড়বৌ, দেখল তার বাকি ছেলেমেয়েরা, দেখল ঊষা। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ছবি নিয়ে বাঁচানো গেল না কর্তা গিন্নির কান।

বোমার মতো ফেটে পড়লেন সুশীলাবালা, 'কী বললে বৌমা?' বললেন, 'সেই লক্ষ্মীছাড়া নষ্ট মেয়েমানুষটার কথা নিয়ে এখনও এত কথা কেন তোমাদের? বললেন, 'জাহান্নামে যাক সে, নরকে যাক, তার ছবি এনে বাড়ি ঢুকিয়েছ তোমরা কোন্ লজ্জায়?' বললেন, 'দূর করে ফেলে দাও। মুখখানা আস্তাকুড়ে ঘসটে দাও পা দিয়ে।'

রাজেনবাবু পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'কোথা থেকে জানলি বল? বল? জবাব দে?' জবাব দেবার ক্ষমতা অবশ্য ওদের আর থাকে না। রাজেনবাবু চেঁচাতেই থাকেন, 'কেটে রক্তগঙ্গা করব সব কটাকে, খুন করে ফাঁসি যাব। আলোচনার আর প্রসঙ্গ জুটছে না? জগতে ঘেয়ো কুকুর নেই? পচা ইঁদুর নেই? নেই কৃমিকীট, নর্দমার পোকা? তাদের নিয়ে আলোচনা করতে পারো না?'

এরপর সত্যিই বন্ধ করতে হল লুকোচুরি, সত্যিই এ বাড়িতে বন্ধ হল বুলার প্রসঙ্গ। কিন্তু রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে যে বুলার মুখের পোস্টার। 'নবাগতা,' কিন্তু মুখখানা যে দেখাবার মতো।

'দেশত্যাগী হতে হবে এবার।'

বলেন রাজেনবাবু।

'গলায় দড়ি দিতে হবে এবার।'

বলেন সুশীলবালা।

আর উষা শুয়ে শুয়ে ভাবে, 'দেশত্যাগী হ'বার ইচ্ছেটা বাবার যদি আরও অনেক উগ্র হত।'

বাবা গেলে, মা নিশ্চয় সঙ্গ ছাড়বে না, আর উষাকে কি ফেলে রেখে যাবে মা বাপ ?

কিন্তু রাজেনবাবুর ইচ্ছের চাইতে সুশীলাবালার ইচ্ছেটা যদি বেশি জোরালো হয় ?

বোধ করি অনেকক্ষণ ভেবে উষা আমার কাছে বলেছে নিশ্বাস ফেলে, 'কী মনে হয় জানো রানু, তাতেও বুঝি কিছু বৈচিত্র্য হবে আমার। তবু তো বাড়িতে কিছু বদল হবে ?'

বললাম, 'বুলা চলে গেল, অতবড় বদল হল—'

উষা বলল, 'চুপ চুপ, সর্বনাশ ! মুখে এনো না ও-নাম, গলা কাটা পড়বে তোমার !'

কিন্তু বুলা আছে হাতের বাইরে, বুলার বোধ করি ভয় নেই গলাকাটা পড়ার, তাই সেই নাম স্বাক্ষর করে জলজ্যান্ত একটা চিঠিই পাঠিয়ে বসে এ-বাড়িতে।

এ-বাড়িতে একবার আসতে চায় বুলা, একবারটি দেখা করতে চায় এদের সঙ্গে।

'কী বললি ? আসতে চায় ? দেখা করতে চায় ? সেই অনুমতি চেয়ে চিঠি দিয়েছে ? উঃ, মেয়েমানুষের এত দুঃসাহস ? এত বড় বুকের পাটা ?'

বললেন রাজেনবাবু, বললেন সুশীলাবালা, বলল তাদের বাড়ির বড়বৌ। ছোট বৌয়ের আস্পর্ধা দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল সবাই।

চিঠিখানা যতগুলো কুচি করা সম্ভব, তা করে পুড়িয়ে ফেলা হল।

আর একদিন অফিসে আসে বুলা।

বড় গাড়ি করে।

পরিচালকের গাড়ি। এসে মুখ নিচু করে টেবিলে পিন ঘষে খানিকক্ষণ, তারপর বলে, 'ও-বাড়ির খবর কী ?'

'তাতে তোমার কী দরকার বুলা ?' আমি বলি হতাশ হয়ে।

বুলার চোখে জল টলটল করে। সেই হাসিখুশি বুলা।

আমি বলি, 'ওরা তোমার নাম মুখে আনে না বুলা, তোমার চিঠি ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।'

বুলা মাথা তুলে বলে, 'তা ছাড়া আর কী করবে বলো ? আমি ওদের মুখ পুড়িয়েছি।'

মুখ নিচু করে বসে রইল একটু, তারপর মুখ তুলে বলল, 'বুঝতেই পারছি আমার মুখ ওঁরা আর দেখতে পারবেন না। তুমি আমার একটা কাজ করবে রানু ? একটা জিনিস পৌঁছে দেবে ওখানে ?'

আমি হাত জোড় করি, বলি, 'তোমার জিনিস ডাস্টবিনে যাবে বুলা, যাবে আগুনে।'

বুলা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তবে কী হল রানু ? তবে কী জন্যে—' কথা শেষ করে না বুলা, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

কিন্তু তবু বুলা হার মানে না, চেষ্টা ছাড়ে না। সুশীলাবালা যে বলেন, 'সাংঘাতিক মেয়ে জাঁহাবাজ মেয়ে', মিথ্যে বলেন না। বুলার বুকের পাটা দেখে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গেছলাম। প্রত্যক্ষই দেখেছিলাম কিনা। ছিলাম সেখানে দাঁড়িয়ে, পিয়ন এসে 'সুশীলাবালা দেবী'র খোঁজ করছে, আমিই বলে দিলাম।

সুশীলাবালার কাছে পিয়ন !

হ্যাঁ টাকা এসেছে রেজিস্টার্ড ইনসিওরে, সই করে নিতে হবে। পাঠিয়েছে বুলা ব্যানার্জি।

টাকা পাঠিয়েছে বুলা, সুশীলাবালার নামে ! স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ কী ধৃষ্টতা বুলার, এ কী দুর্মতি ! কাঁটা হয়ে উঠি ! কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ভয়ঙ্কর একটা ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্রপাতের আশঙ্কায়। কী হয়, কী হয় !

ভয় করছে পিয়নটার জন্যে। নিরপরাধ লোকটা না মার খায়। বাড়িসুদ্ধ সবাই তো হুমড়ে পড়েছে এখানে।

কিন্তু ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্রপাত কিছু হল না, হঠাৎ যেন সমস্ত প্রকৃতি থমথমে হয়ে গেল ! মিনিট খানেক সমস্ত নিথর।

তারপর সুশীলাবালার গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল ' কে পাঠিয়েছে বললে ?'

'বললাম তো, বুলা ব্যানার্জি ! সইটা করে দিন তাড়াভাড়ি।'

'ক—কত টাকা ?'

'দুহাজার !'

'দু—হাজার !' আমার মনে হল শব্দটা যেন সমস্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, সকলের মুখ থেকে উঠল তার প্রতিধ্বনি।

'নেবার দরকার নেই, ফেরত দিয়ে দাও।'

ধরা ধরা গম্ভীর গলায় রায় দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন রাজেনবাবু। উচ্চারণটা কেমন যেন দুর্বল শোনাল, চলে যাওয়াটা শিথিল দেখাল।

'রানু, কী করি বল্ তো মা ?'

বললেন সুশীলাবালা।

'আমি কী বলব !' বললাম ধুসর গলায়। সত্যিই তো কী বলব ? এ টাকা যখন ফেরত যাবে, বুলার মুখটা কী রকম হয়ে যাবে, আমাকে দেখতে হবে না এইটাই যা রক্ষে।

আমি উত্তর দিলাম না, দিতে পারলাম না। আমার হয়েই যেন উত্তর দিল বড়বৌদি, 'ফেরত দিলে অবশ্য মনে খুবই আঘাত পাবে। যতই হোক পাঠিয়েছে আশা করে।'

'সেই কথাই ভাবছি। অথচ তোমার শ্বশুরের যা মেজাজ দেখলাম—'

'সইটা করুন তাড়াতাড়ি—' অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে পিয়নটা, 'না তো লিখে দিন নিতে চান না।'

'নাঃ বাবু, তুমি যেন ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এসেছ, একটু ভাবা চিন্তার সময় দিলে না। নাও, কোথায় সই দিতে হবে বলো।'

প্রকৃতির সমস্ত রোষ কেমন করে যেন নিবৃত্ত হয়ে গেছে। উদ্যত ঝড় শান্ত নিরুদ্যম। শুধু মেঘমুক্ত আকাশে এক চিলতে বিদ্যুৎ চমকাল, 'দেখলে তো বড়বৌমা, মিথ্যে বলি আমি ? দেখলে তোমার ছোটজাটির বুকের পাটা ?'

পিয়নটা মার খেল না দেখে বেঁচেছিলাম, কিন্তু গায়ের কাঁটাগুলো মিলোতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল আমার।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬৭

শ্মশান চাঁপা

সুবোধ ঘোষ

পৌষের সেই শেষ রাতে, কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের বুকজোড়া কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা নতুন সাহসের সুখে হন-হন ক'রে পা চালিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

মাত্র এই দিন তিনেক হল আমরা এই টাউনেরই নতুন একটা বান্ধব সমিতি হয়ে উঠেছি। যিনি আমাদের এই ক'জনকে নিয়ে এই সমিতি গড়েছেন, তিনি অবশ্য আমাদের মতো জুনিয়র নন। তিনি হলেন মিউনিসিপালিটির কমিশনার কাঞ্চনবাবু, আমাদের ফুটবলের নেতা ভোলাদা যাঁকে কাঞ্চনকাকা বলে ডাকেন, তিনি।

কাঞ্চনকাকা হলেন সমিতির প্রেসিডেন্ট, আর পেট্রন হলেন সেই কুমারসাহেব, তিনপাহাড় রাজ এস্টেটের কুমারসাহেব, টাউনের কাছেই মধুপুর রোডের ধারে এক নিরালায় যাঁর বাগানবাড়ি।

মানুষের উপকারের কাজ করছি আমরা, তবে মরা মানুষের উপকার। আমাদের কাঁধের উপর মচমচ শব্দে কাঁচা কাঠের একটা খাটিয়া দুলছে, আর সেই সঙ্গে খাটিয়ার উপর নড়বড় ক'রে দুলছে তহবিল তছরুপের মামলার আসামী উমেশপ্রসাদের কাটা-ছেঁড়া শবের মাথা আর হাত-পা। হাজতের ভিতরেই আত্মহত্যা করেছে উমেশপ্রসাদ।

মাঠের ঢালু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ছোট নদীটা এখানে এসে বেশ একটু চওড়া হয়েছে। নদীর বুকে অন্ধকারে ঢাকা বালিয়াড়ির উপর এখানে ওখানে যেন জ্বলন্ত রক্ত ছিটানো রয়েছে। বাঁশবনের গা-ভাঙা কটকট শব্দগুলি একটা মাথা-পাগলা হাওয়ার ঝড়ে হঠাৎ এক একবার ছুটে আসছে, আর নদীর আধ-হাঁটু জলের পাশে বালিয়াড়ির উপর দপ ক'রে ঝলসে উঠছে জ্বলন্ত অঙ্গার, পৌষের শেষ রাতের কুয়াশা যেন ভয়ে ভয়ে অসহায়ের মতো সেই নিভু-নিভু চিতারই হাসির জ্বালায় পুড়ছে। এ কেমন একটা জগতের কাছে এসে পড়েছি ?

ভোলাদা বললেন—ঐ তো শ্মশান।

শ্মশানের চেহারার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের ভয় হয়তো সত্যিই আরও ভয়াল হয়ে উঠত, কিন্তু কাঞ্চনকাকা আমাদের মনগুলিকে সেই সুযোগই দিলেন না। জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়ানো সেই শ্মশানের বুকের দিকে তাকিয়ে আমাদের পিছনে আস্তে আস্তে চলতে চলতে কাঞ্চনকাকা বললেন—আমাদের এই বান্ধব সমিতিটা যদি ঠিক থাকে, যদি আর একটু জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারি, আর টাকার দিক দিয়ে যদি কুমারসাহেবের ব্যাকিং পাই, তবে মিউনিসিপালিটির আসছে ইলেকশনের পর সুধাসিন্ধুকে আর চেয়ারম্যান থাকতে হবে না। আমি হব চেয়ারম্যান, বুঝলে ভোলা ?

হঠাৎ কাঞ্চনকাকা একটা হাঁক দিলেন—এইবার ডাইনে ঘুরে ঐ আপিস-ঘরের কাছে দাঁড়াও।

আগে কল্পনাও করতে পারিনি যে, এহেন একটা অদ্ভুত জায়গাতে, যেখানে শুধু মানুষের চেহারা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সেখানে একটা আপিস-ঘর থাকতে পারে, আর সেই আপিস-ঘরের ভিতরে টেবিলের পাশে একটা জলজ্যান্ত মানুষ বুকের কাছে মস্ত একটা রেজিস্টার খাতা আর হাতের কাছে একটা কলম নিয়ে বসে থাকতে পারে।

আমাদের হাঁপ-ধরা গলা থেকে একটা ক্লান্ত হরিবোল আপিস-ঘরের দরজার কাছে বেজে উঠতেই ভিতরের টেবিলের উপর লণ্ঠনের কালিমাখা আলোর পিছনে হঠাৎ চমকে উঠল একটা আবছায়াময় মাথা, আর এক জোড়া ধোঁয়াটে চোখ।

লণ্ঠনের আলো একটুখানি উসকে দিয়ে আর মুখ তুলে লোকটা আমাদের দিকে তাকাল। ভোলাদা আস্তে আস্তে আমাদের কানের কাছে বললেন—ঐ, ঐ লোকটাই হল ঘাটবাবু, চব্বিশ ঘন্টা যার

ডিউটি, আর মাইনে হল বাইশ টাকা সাত আনা।

—লোকটা কেমন যেন। ভোলাদা আবার ফিসফিস ক'রে বললেন। এর আগে অন্তত বার দশেক এখানে এসেছেন ভোলাদা। দেখেছেন ভোলাদা, লোকটা ঘুমোয় না। দিন হোক, আর রাত হোক, লোকটা ঠিক অমনি এক জোড়া জাগা চোখ নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে, কোন্ দিকে আর কিসের দিকে যে তাকিয়ে আছে, দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

ঘাটবাবুর মুখটা ভাল ক'রে দেখবার জন্য আমরা চোখ বড় ক'রে তাকিয়ে রইলাম। বয়সে লোকটাকে ভোলাদার চেয়ে অনেক বড় ব'লে মনে হল, বোধ হয় তিবিশেরও বেশি। শরীরটা শুকনো আর চিমড়ে, কিন্তু মুখটা সে-রকম নয়।

ভোলাদা বললেন—আমার বিশ্বাস, লোকটা জেগে জেগেই . . .।

কথাটা আর শেষ করলেন না ভোলাদা। আপিস-ঘরের টেবিলের কাছে তেমনি ক'রে ব'সে আস্তে আস্তে একবার কেশে নিয়ে ঘাটবাবু গম্ভীর স্বরে বলে—পাশের ঐ রেস্ট-ঘরের ভিতরে গিয়ে মড়া নামিয়ে রাখুন।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছন থেকে গা-ঘেঁষা অন্ধকারটা যেন ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কাঞ্চনকাকা বললেন—কী হে ঘাট ভাল ডিউটি দিচ্ছ দেখছি। বলি, এরকম হুকুম দিয়ে কথা বলতে শিখলে কবে ?

সঙ্গে সঙ্গে কালিমাখা লণ্ঠনের আলোর পিছনে যেন কুঁকড়ে গেল ঘাটবাবুর অদ্ভুত চেহারাটা। সত্যি, কাঞ্চনকাকার পার্সোনালিটি আছে, নইলে টাউনের একটা মানুষের ধমকে এইরকম ভয়ানক ছাই অঙ্গার আর ধোঁয়ার আত্মাটাও ভয়ে কুঁকড়ে যাবে কেন ? যাই হোক, টিনের একটা শেডের ভিতরে ঢুকে আমরা খাটিয়া নামিয়ে রাখলাম।

পাশাপাশি দুটি টিনের শেড, মাঝখানে জ্বালানি কাঠের একটা ছোটখাট পাহাড়। যত শাল কেঁদ আর কুলগাছের টেরা-বাঁকা আর গাঁটভরা টুকরো, যেন কতগুলি শক্ত-শক্ত কনুই কব্জি হাঁটু আর গোড়ালির স্তূপ।

কী আশ্চর্য, শেডের কাছে একটা চাঁপা গাছও যে রয়েছে দেখছি। এখানেও তাহ'লে চাঁপা ফোটে ? কাঞ্চনকাকা বললেন—না হে না, গাছটা আছে এই মাত্র, ফুল ধরে না।

—রাম ! ও রাম ! পাশের শেডে আপিস-ঘরের ভিতর থেকে কে যেন ধরা-গলায় আস্তে আস্তে ডাকছে। ভয়ে ভয়ে রাম-নাম করছে নাকি কেউ ?

হাসলেন কাঞ্চনকাকা।—ডোমটার ঘুম ভাঙাচ্ছে ঘাট। যে ডোমটা চিতা সাজায়, তার আসল নাম হল ভালুয়া। কিন্তু টাউনের লোকে ওকে রাম নাম দিয়েছে।

—কেন কাঞ্চনকাকা ?

—ভয়ে, ভয় তাড়াবার জন্য। রাম-নাম শুনে শ্মশানের ভূত-প্রেত দূরে সরে যায়।

আশ্চর্য, ধরা-গলায় আর ভয়ে ভয়ে রাম-নাম ক'রে ক'রে পাঁচ বছর ধ'রে এই ভূত-প্রেতের রাজ্যে প'ড়ে আছে লোকটা, ঐ ঘাটবাবু !

কাঞ্চনকাকা বলেন—যাবে কোন্ চুলোয় ? আর ও বেটাও তো একটা · · · আমার কেমন সন্দেহ হয় যে · · · ·।

হঠাৎ কথাটা থামিয়ে কাঞ্চনকাকা অন্য একটা অদ্ভুত কথা ব'লে ফেললেন। আসল কথা হল, লোকটার জন্মেরই কোনও ঠিক নেই।

তার পরে একটা গল্পই বলে ফেললেন কাঞ্চনকাকা—লোকটা কোথা থেকে একদিন টাউনে এসে জুটল। ভদ্রলোকদের মেসে বেশ ভদ্রলোকের মতোই থাকে, আর চাকরির চেষ্টা করে। ক'দিনের মধ্যে জুটিয়েও ফেলল একটা চাকরি। রাধু সাহার অত বড় কাপড়ের দোকানের ম্যানেজার হল

একটা নতুন লোক, শুনেই কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগল আমার মনে। সোজা রাধুর দোকানে গিয়ে একদিন চ্যালেঞ্জ করলাম লোকটাকে।

রাধু সাহার দোকানে, গণেশের মূর্তির পাশেই বসেছিল নতুন ম্যানেজার। কাঞ্চনকাকা লোকটার একেবারে সামনে এসে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনার পিতার নাম ?

প্রশ্ন শুনে হঠাৎ চমকে উঠে বোবার মতো তাকিয়ে রইল লোকটা তার পরেই পিতার নাম বলল।

কিন্তু রেহাই দিলেন না কাঞ্চনকাকা। এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন ছুঁড়লেন।—বাঁকুড়া জেলা না হয় হল, কোন্ গাঁ ? কোন্ থানা ? মামাবাড়ি কোথায় ? মামার নাম কী ? বাপ বেঁচে নেই, বেশ তো, কাকাদেরই নামগুলি বলুন।

চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে লোকটার বুকে ধড়ফড়ানি তুলে কাঞ্চনকাকা আবার প্রশ্ন করলেন—ব্রাহ্মণ যখন, তখন স্পষ্ট ক'রে বলেই ফেলুন না, আপনার গোত্র কী ? কোন্ গাঁই আর কোন্ মেল ?

কোনও উত্তর দিল না লোকটা । দেখে শুনে রাধু সাহাও অবাক হয়ে গেল। গণেশের মূর্তির প্রায় গা ঘেঁসে বসে আছে এই কেমন একটা অমানুষ !

লোকটাও হঠাৎ ছটফট ক'রে একটা লাফ দিয়ে গদি থেকে উঠে দোকানের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল, তারপর প্রায় একটা দৌড় দিয়েই চলে গেল।

গল্প শেষ ক'রে কাঞ্চনকাকা বললেন—কিন্তু তবু ঠিক চলে গেল না। কী অদ্ভুত জেদ। কবে আর কেমন ক'রে বেকুব চেয়ারম্যান সুধাসিন্ধুর মন ভুলিয়ে লোকটা আবার একটা কাজ জুটিয়ে নিল, আমি জানতেই পাইনি। একদিন এই শ্মশানেই এসে দেখি, সেই লোকটাই রেজিস্টার খাতা নিয়ে কাজ করছে।

এইবার শক্ত গলায় কাশলেন কাঞ্চনকাকা।—বেটা এখানে এসেও বদমায়েশি শুরু করল।

—অ্যাঁ, বদমায়েশি ?

—হ্যাঁ, থানা থেকে কমপ্লেন পেয়ে আমিই একদিন এখানে এসে রেজিস্টার খাতা চেক করলাম। দেখলাম, হ্যাঁ, কমপ্লেন মিথ্যে নয়। লোকটা মৃতের বাপের নাম গোলমাল ক'রে দেয়। ত্রিবেদী মশাই-এর মৃত ছেলের নামের পাশে বাপের নাম লিখেছে, অমুক রায়।

ভোলাদা—ভুল ক'রে নিশ্চয়ই।

রাগ করেন কাঞ্চনকাকা—তুমিও যে সুধাসিন্ধুর মতো কথা বলছ ভোলা। ভুল ক'রে নয়, ইচ্ছা ক'রেই এই কাণ্ড করত লোকটা। তারপরেও দেখেছি, আরও অনেকগুলি নামের ঐ দশা করে ছেড়েছে, আমি ওকে তাড়িয়ে ছাড়ব।

ভোলাদা—তাড়িয়ে লাভ কী কাঞ্চনকাকা ?

কাঞ্চনকাকা—লাভ আছে বৈকি।

ভোর হয়ে আসছে। বাঁশবনের কট্‌মট্ থেমেছে, পাখি ডাকছে, নদীর জল দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনকাকা বললেন—তা ছাড়া, এটা শ্মশান, এটাও একটা পবিত্র স্থান, এখানে ঐ রকম একটা ইয়েকে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

ভোলাদা বলেন—আমার কেমন বিশ্বাস লোকটা যেন জেগে জেগে . . .।

কাঞ্চনকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন—আরে রাখো তোমার বিশ্বাস। আমার কেমন সন্দেহ হয়, লোকটা হল একটা . . . .।

দু'জনেই তাঁদের কথার অর্ধেকটুকু বলে চুপ ক'রে গেলেন। মাঝখান থেকে আমাদের মনের ধারণাগুলি আরও গোলমাল হয়ে গেল। বুঝতেই পারলাম না, ভোলাদার বিশ্বাসটা কী ? আর কাঞ্চনকাকাই বা কী সন্দেহ করছেন।

ঘাটের কাজ যখন শেষ হল, তখন দুপুর হয়ে গিয়েছে। টাউনে ফেরার পথে সেই কুশ ঘাসে

ছাওয়া মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখা গেল, একটা টিনের ঘর রয়েছে, চারিদিকে মাদার গাছের বেড়া। ঘরই বটে, কিন্তু দেখে মনে হয়, মাঠের মাঝখানে যেন প্রকাণ্ড একটা ডাস্টবিন উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভোলাদা বললেন—ওটা হল ঘাটবাবুর কোয়ার্টার।

ক'দিন পরেই আমরা দেখলাম, আর দেখতে পেয়ে আমাদের চোখগুলিও যেন একটা অবুঝ বিস্ময়ে চমকে উঠল। সন্ধ্যাবেলা টাউনের সিনেমা হাউসের সামনের সড়কে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটবাবু। ছাই ধোঁয়া আর অন্ধকারের দেশে বাস করে যে লোকটা, সেই লোকটা আবার এই আলোর রাজ্যে কেন ? দেখতে খুবই অদ্ভুত লাগছিল। কালিমাখা লণ্ঠনের আলোকের পিছনে যার একজোড়া ধোঁয়াটে চোখ দেখেছি, তাকেই দেখছি, জ্বল-জ্বল একজোড়া চোখ নিয়ে পানের দোকানের আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় পান খাবার শখ হয়েছে।

মাধাই-এর দাদু অধর মুখুজ্জে খুবই ধীর স্থির ও শান্ত মানুষ। সাদা দাড়ির বোঝা বুকের উপর শুইয়ে দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা খাটের উপর শুয়ে থাকেন অধরদাদু, আর মাঝে মাঝে বাইরের পথের দিকে তাকান। এমন মানুষকেও সেদিন চমকে দিল ঘাটবাবু। পথের উপর দিয়ে ঘাটবাবুকে যেতে দেখতে পেয়েই হাতের এক ঠেলায় খোলা জানালার পাট সশব্দে বন্ধ করে দিলেন অধরদাদু।

একবার দু'বার, তিনবার, আরও অনেকবার দেখলাম, টাউনের ভিতরেই ঘোরা-ফেরা করছে ঘাটবাবু। দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, টাউনের কুকুরগুলিও বোধ হয় লোকটার গা থেকে পোড়া জীবনের গন্ধ পায়। সত্যিই, নারায়ণ মোদকের দোকানের সামনে একদিন দেখলাম, তিন চারটে খেঁকি কুকুর পিছনে থেকে খেউ খেউ ক'রে ঘাটবাবুকে যেন তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে। একটা শালপাতার ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে একমনে আর আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ঘাটবাবু।

আমাদের কাছ থেকেই বার বার ঘাটবাবুর চালচলনের খবর পাচ্ছিলেন কাঞ্চনকাকা, আর শুনে চমকে উঠছিলেন। বললেন—লোকটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে দেখছি।

বুঝতে পারি না, কিসের বাড়াবাড়ি। ক'দিন পরে বান্ধব সমিতির বৈঠকে কাঞ্চনকাকা আরও জোর গলায় তাঁর সন্দেহটাকে চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন।—খবর পেয়েছি, লোকটা চেয়ারম্যান সধাসিন্ধুর কাছেও একবার এসেছিল, চারদিনের ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্তও দিয়ে গিয়েছে। আমার সন্দেহ হয়, ভয়ানক সন্দেহ হয় ···।

কাঞ্চনকাকার এই ভয়ানক সন্দেহের চিৎকার শুনে আশ্চর্য হবার পর প্রায় ছ'টা মাস পার হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন বান্ধব সমিতির কাছে আবার একটা কাজের ডাক এল।

আবার আমাদের কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়া মচ্‌মচ্ করে, আর সেই সঙ্গে নড়বড় করে গলিত কুষ্ঠে ক্ষয়ে যাওয়া চরণবাবুর এইটুকু একটা শরীর। কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের উপর দিয়ে দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে আমরা এগিয়ে চলেছি ঘাটের দিকে। হঠাৎ ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের দিকে তাকিয়ে যেন একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন কাঞ্চনকাকা।—এই রে, যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। বেটা ঠিক কোনও এক ভদ্রলোকের সর্বনাশ ক'রে বসে আছে !

উপুড়-করা ডাস্টবিনের মতো দেখতে নয়, ঘাটবাবুর কোয়ার্টার যেন রঙিন একটা ছবির মতো ফুটে রয়েছে। কে জানে, কবে পাতকুয়োর ধারে পেঁপে গাছগুলি এত বড় হয়ে উঠল। মাদার গাছের বেড়ার উপর অপরাজিতার লতা ঝুলছে। টকটকে লাল গাঁদা ফুটে রয়েছে পাতকুয়োর সামনে। আর সব চেয়ে রঙিন হয়ে ঝলমল করছে আর একটা জিনিস। পেঁপের সারির কাছে দড়ির গায়ে একটা ভেজা রঙিন শাড়ি হাওয়ায় দুলে দুলে শুকোচ্ছে। শ্মশানের ধোঁয়ার জ্বালা আর মৃত্যুর ময়লা ছাই-এর রুক্ষতায় মাখা সেই ডাস্টবিনের মতো ঘরটাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে সেখানেই যেন একটা নতুন কুটিরে

শৌখিন জীবনের জয়পতাকা উড়ছে।

ইস্ ! সহ্য করতে পারছিলেন না কাঞ্চনকাকা।—লোকটা সত্যিই শেষ পর্যন্ত বিয়েও ফেলল। কিন্তু এই অন্যায়ের, এই ভাঁওতার, এই জোচ্চুরির ফল ওকে একদিন পেতেই হবে।

সত্যিই একটা শক পেয়েছেন কাঞ্চনকাকা। যে লোকটাকে নিতান্ত একটা অশুচি জীব ব'লে ম৻ করেন কাঞ্চনকাকা, যে লোকটা তার নিজের পরিচয় বলতে পারে না, সেই লোকটা শেষ পর্য কোথায় কোন্ এক সুখী ঘরের জাত সমাজ ও বংশের বেড়া ভেঙ্গে একটা মেয়েকে যেন চুরি ক'বে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কাঞ্চনকাকা আবার নিজের মনেই গজরে উঠলেন—জানতে হবে, লোকটা সত্যিই বিয়ে করেছে, না ইয়ে করেছে।

মাঠের উপর দিয়েই জোরে হর্ন বাজাতে বাজাতে মস্ত বড় একটা মোটরগাড়ি আমাদের পিছনে এসে দাঁড়াল। কাঞ্চনকাকা ব্যস্তভাবে আর উল্লাসের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন—আমাদের পেট্রন, আমাদের পেট্রন কুমারসাহেব, তোমরা একটু থামো।

কুমারসাহেবের গাড়িও থেমে রইল কিছুক্ষণ। দিব্যি ফরসা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা কুমারসাহেবের। ধবধবে আদ্দির জামা গায়ে। চোখেব কোণে সুর্মার সরু প্রলেপ। কোলের উপর একটা রাইফেল নিয়ে বসে আছেন কুমারসাহেব, এই মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরের ঐ হরতুকির জঙ্গলে তিতির শিকার করতে চলেছেন।

মোটরগাড়ির ফুট-বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনকাকা কিছুক্ষণ কুমারসাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলেন, মিউনিসিপালিটির আগামী ইলেকশনের কথা।

আবার হর্ন বাজিয়ে মাঠের উপর দিয়ে, আব ঘাটবাবুর কোয়ার্টারেব মাদার গাছের বেড়ার পাশ দিয়ে, কৃশ ঘাসের উপর মোটরের চাকার চওড়া দাগ এঁকে দিয়ে ছুটে চলে গেল কুমারসাহেবের গাড়ি। আমরা এগিয়ে চললাম ঘাটের আপিস-ঘরের দিকে এবং আপিস-ঘরের দবজার কাছে এসে কাঞ্চনকাকার রাগ একেবারে মত্ত হয়ে ফেটে পড়ল।

ঘাটবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন কবলেন কাঞ্চনকাকা।—সত্যি কথা বলো, বিয়ে করেছ না ইয়ে····।

ঘাটবাবু বলে—বিয়ে করেছি।

কাঞ্চনকাকা—ঠিক ক'রে বলো।

ঘাটবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। সপ্তপদী হয়েছে, কুশণ্ডিকা হয়েছে। নিয়মমত মন্ত্র পড়ে হোম করা হয়েছে। আর কী জানতে চান ?

শান্তভাবেই আর বেশ শ্রদ্ধা রেখে কথা বলছিল ঘাটবাবু। কথাগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা ভীরু-ভীরু আবেদনও ছিল। যেন কাঞ্চনকাকার কাছে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করছে ঘাটবাবু। যেন বিশ্বা করেন কাঞ্চনকাকা, মানুষ যেভাবে বিয়ে করে ঠিক সেইভাবেই এই বিয়ে হয়েছে। তবে যদি এর মধ্যে কোনও অন্যায় হয়ে থাকে, সে অন্যায় ঠিক ঘাটবাবুর জীবনের অন্যায় নয়, সে কথা ভুলে গেলেই তো হয়।

কাঞ্চনকাকা সব শুনে নিয়ে বললেন—তবু এ বিয়ে বিয়েই নয়। বুঝতে পারছ আমার কথাটা?

কাঞ্চনকাকার প্রশ্নের আঘাতে সেই মুহূর্তে ঘাটবাবুর চোখ দুটো ধোঁয়াটে হয়ে গেল। এই প্রশ্ন যেন ঘাটবাবুর প্রাণের অবৈধ অস্তিত্বটাকেই টানাটানি ক'রে চিৎকার করছে, সমাজের মানুষের ঘরে ঢুকে বিয়ে করার কোনও অধিকার নেই যে প্রাণের কোনও শখ আহ্লাদ আর ইচ্ছার।

আপিস-ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে কাঞ্চনকাকা আমাদের কানের কাছে আর একবার আস্তে আস্তে গজরালেন।—লোকটা সত্যি যদি কোনও বাজে ছুঁড়িকে ভাগিয়ে নিয়ে আসত তাহলে

কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু বুঝেছি, বেটা সত্যিই পরিচয় ভাঁড়িয়ে একটা ভদ্রলোকের মেয়েকেই বিয়ে করেছে, ছিঃ।

কী ভাবতে ভাবতে ঘাটের দিকে চলে গেলেন কাঞ্চনকাকা। আমরা ঘাটবাবুর কাছে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালাম।

দিব্যি মানুষের মতোই দেখাচ্ছে ঘাটবাবুকে। পরিষ্কার একটা টুইলের কামিজ পরেছে ঘাটবাবু। রোগা শুকনো চেহারাটার মধ্যে একটা চকচকে হাসি-হাসি ভাব যেন ফুটে রয়েছে। হাতে একটা নতুন ঘড়িও দেখলাম। আমাদের দেখে একটু খুশি হয়েই ঘাটবাবু ডাক দেয়—আসুন ভাই, একটু সুখ-দুঃখের গল্প করি।

প্রথমেই বলে—আমি আর এখানে থাকছি না। এ কাজ ছেড়ে দেবই দেব। এখানে কি মানুষে থাকে? স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই ভাগাড়ের কাছে থাকা অসম্ভব।

হঠাৎ ফিক ক'রে হেসে ফেলে ঘাটবাবু—আপনাদের বৌদির এখন পাঁচমাস।

হাসি-হাসি চোখ নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারপরেই আমাদের দিকে তাকায় ঘাটবাবু।—আপনাদের বৌদি দেখতে বেশ সুন্দর, মাইরি বলছি। একদিন ফটো দেখাব আপনাদের।

—এখুনি দেখান না।

ঘাটবাবু—ফটো তোলানো হয়নি এখনও।

—কবে তোলাবেন?

ঘাটবাবু হাসতে গিয়ে একেবারে গলে যায় যেন।—এই ধরুন, আর চার মাস, তারপর আরও ছ'মাস। বাচ্ছাটার অন্নপ্রাশনের দিনে টাউনে গিয়ে হরেবাবুর স্টুডিওতে একখানি বড় সাইজের ফটো তোলাব, মাগ-ছেলেকে নিয়ে এক সঙ্গেই। কেমন, কথাটা ভাল বলিনি?

প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ঘাটবাবুই আবার প্রশ্ন করে।—ছ'মাস বয়স হলেই তো অন্নপ্রাশন দিতে হয়, তাই না?

আমরা বলি—হ্যাঁ।

—রাম নাম সৎ হ্যায়! গম্ভীর স্বরে একটা ক্লান্ত আক্ষেপের কোরাস যেন হাঁপাতে হাঁপাতে আপিস-ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপরেই আর একটা। বিরক্ত হয়ে হাঁক দেয় ঘাটবাবু—ওদিকে চলে যাও। সার্টিফিকেট রেখে ওদিকে সরে পড়ো। যত সব!

সার্টিফিকেটগুলিকে অবহেলার সঙ্গে খাতার নীচে চেপে রেখে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে থাকে ঘাটবাবু। হরিবোল, রাম-রাম, ধোঁয়া, ছাই আর জ্বলন্ত অঙ্গারের এই পৃথিবীটাকে কোনও মতে যেন ঘৃণা চেপে সহ্য করছে ঘাটবাবু। দূরের জীবনময় সংসার থেকে খেদানো যত আবর্জনা যেন এখানে দিনরাত্রি মিছিল ক'রে আসছে। এখানে কি জীবনের শখ আর আহ্লাদ নিয়ে বাস করা যায়?

কুষ্ঠী চরণবাবু ছাই হয়ে যাবার পর আমরা যখন আবার মাঠের পথ ধরে ফিরে চললাম, তখন কাঞ্চনকাকা আমাদের কাছ থেকেই শুনলেন, ঘাটবাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চায়।

কাঞ্চনকাকা বললেন—ওর কথার এক ফোঁটা বিশ্বাস করো না। ও যাবে না, ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। আমার খুব সন্দেহ হয় লোকটা হল একটা ···।

হঠাৎ কথা থামিয়ে কাঞ্চনকাকা ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের দিকে চোখ বড় বড় ক'রে তাকালেন, তারপরেই আমাদের তাড়া দিয়ে বললেন—চলো, চলো, তাড়াতাড়ি চলো, অনেক বেলা হয়েছে।

আমরাও একটু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, কুমারসাহেবের মোটরগাড়ি ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের চারদিকে পাক দিয়ে ঘুরছে, থামছে, আবার চলে যাচ্ছে। যেন মাদার গাছের বেড়ার ঝোপে তিতির সন্ধান করছেন কুমারসাহেব।

অনেকগুলি মাস পার হয়ে যাবার পর আবার আমাদের কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়া মচমচ করে আর নড়বড় করে ফাঁসিতে মরা প্রচণ্ড ডাকাত ইন্দ্র সিং-এর শরীর।

কিন্তু ওকি ? ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের আবার এ দশা হল কেন ? ডাস্টবিনের মতো উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা টিনের ঘর। চারদিকে মোটরগাড়ির চাকার আঘাতে মাটির উপর ক্ষতের রেখা আঁকা হয়েছে, গেল বর্ষার জলেও মুছে যায়নি। কোথায় অপরাজিতার লতা আর কোথায় বা লাল টকটকে গাঁদা ? দড়িতে কোনও রঙিন শাড়ি দুলে দুলে শুকোয় না। তবে কি ঘাটবাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলেই গিয়েছে ?

ভুল ধারণা। দেখলাম, রেজিস্টার খাতা তেমনি বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে ঘাটবাবু। লোকটা শুকিয়ে পাকিয়ে বিশ্রী হয়ে গিয়েছে। কাঞ্চনকাকা সোজা সামনে গিয়ে প্রশ্ন করলেন— খুব না বলেছিলে যে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, তবে এখনও আছ কেন ?

ঘাটবাবু বলে—যাব।

কাঞ্চনকাকা—কবে ?

ঘাটবাবু—শিগগিরই।

কাঞ্চনকাকা—ভাল কথা, কিন্তু মিথ্যে কথা। যাবার হলে তুমি এতদিন চলে যেতে।

ঘাটের দিকে যেতে যেতে কাঞ্চনকাকা আবার যেন নিজের মনেই বলতে থাকেন।—বুঝেছি, তোমাকে না সরালে তুমি সরবে না।

কাঞ্চনকাকা চলে যেতেই আমরা ঘাটবাবুকে ঘিরে ধরলাম।—কই ঘাটবাবু, সেই ফটো কই ? সেই যে বলেছিলেন, তারপর এক বছর তো পার হয়েই গিয়েছে।

ঘাটবাবু বলে—ফটো তোলানো হয়নি।

—কেন ?

ঘাটবাবু—আপনাদের বৌদি এখানে নেই।

—কোথায় ?

ঘাটবাবু—বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে।

—ছেলে ?

ঘাটবাবু হাসে—ছেলে হয়েছে নিশ্চয়ই, এতদিনে না হবার তো কথা নয়।

—কবে আসবে ওরা ?

ঘাটবাবু আবার হাসে—আসবে, তবে আসতে একটু দেরি করবে নিশ্চয়, রাগ ক'রে চলে গিয়েছে কিনা !

আর কোনও কথা না ব'লে আবার দূরের দিকে আনমনার মতো তাকিয়ে রইল ঘাটবাবু।

এক বছর, দু' বছর, তারপর আর একটা বছর পার হয়ে গেল। বান্ধব সমিতির কাজ চলতেই থাকে। আর শ্মশানঘাটে গিয়ে ঘাটবাবুকে ঠিক তেমনই দেখতে পাই, বুকের কাছে রেজিস্টার খাতা আর হাতের কাছে কলম নিয়ে তেমনই বসে আছে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা বা রাত, সব সময়েই জেগে রয়েছে ঘাটবাবুর চোখ। ভোলাদা বলেন—আমার বিশ্বাস, লোকটা জেগে জেগেই কী যেন দেখছে।

কাঞ্চনকাকা ভোলাদার কথা শুনে তেমনি চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করেন,—বাজে কথা।

ঘাটবাবু নামে এই লোকটার কথার এক ফোঁটাও বিশ্বাস করা উচিত নয়, ঠিকই বলেছিলেন কাঞ্চনকাকা। এই যাব, শিগগির যাব, যাবই-যাব ক'রে ক'রে বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছে। কিন্তু যায় না।

আর, কোথায় বা সেই ফটো ? একে বারে ভুয়ো একটা কথার কারসাজি মাত্র। বাপের বাড়ি

থেকে বউ এইবার আসবে, এল বলে, এইবার নিশ্চয় আসবে বলে মনে হচ্ছে, এইরকম শুধু বাজে কথার ছলনায় আমাদের প্রশ্নগুলিকে এতদিন ধরে শুধু ঠেকিয়ে আসছে ঘাটবাবু। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওর বউ আর ছেলে এল না।

তারপর একদিন, সেদিন আমরা একেবারে শ্মশানের বালিয়াড়ির উপর নেমে এসে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে এক সাধুর সৎকার করছি। শুনেছি, ইচ্ছামৃত্যু বরণ ক'রে দেহত্যাগ করেছেন এই সাধু। কাঞ্চনকাকা বললেন—তোমাদের ঘাটবাবুকে এইবার চলে যেতেই হবে মনে হচ্ছে।

—কেন ?

কাঞ্চনকাকা—পুলিশও ওকে সন্দেহ করছে। সন্দেহভাজন ব্যাড ক্যারেক্টবের খাতায় ওর নাম চড়েছে।

ভোলাদা চমকে উঠলেন—কেন ! কী করেছে ঘাটবাবু ?

কাঞ্চনকাকা—আমাদের পেট্রন কুমারসাহেবই ওর নামে থানাতে ডায়েরি করিয়েছেন। লোকটা প্রায়ই রাত্রিবেলার অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে মধুপুব রোডে কুমারসাহেবের সেই বাগানবাড়ির পাঁচিলের আশেপাশে ঘুর-ঘুর করত। দারোয়ানেরা বলে, ভয় দেখাবার জন্য প্রেতের গলার স্বর নকল ক'রে লোকটা কাঁদত। একদিন ধরা পড়ে গেল ঘাট, মারও খেল, তারপর পুলিশ ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। রাত্রিবেলা টাউনের দিকে ওর যাওয়াও নিষেধ ক'রে দিয়েছে পুলিশ।

সাধুর চিতা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। হঠাৎ যেন একটা লাফ দিয়ে এসে চিতার কাছে হাজির হল ঘাটবাবু। উসকো-খুসকো চুল, লাল চোখ, ছেঁড়া খাঁকি কামিজ, ধুতির খুঁট কোমরে জড়ানো।

এসেই চিতার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করল ঘাটবাবু।—বাঃ, এ কেমন সাধু রে বাবা ! সাত মণ কাঠ শেষ ক'রে তবু এখনও ছাই হল না। ওরে রাম, লগি দিয়ে এটার আঁতড়ির পিণ্ডিটাকে পিটিয়ে দে তো একবার।

এ চিতা থেকে ও চিতা, ঘুরে ঘুরে যেন শুধু টিটকারি দিয়ে ফিরতে থাকে ঘাটবাবু। টাউনের জীবন, আর সেই জীবনের মানুষগুলিকে যেন এইখানে এক বধ্যভূমির মধ্যে বাগে পেয়েছে ঘাটবাবু, আর বেপরোয়া ঘেন্না ক'রে ক'রে প্রতিশোধ তুলছে।

আবার হাঁক দেয় ঘাটবাবু—ওটা কে পুড়ছে রে রাম ? নন্দ মুদি বোধ হয়।

রাম বলে—হ্যাঁ।

ঘাটবাবু হাসতে গিয়ে যেন মুখ ভেংচে ফেলে।—তিন আনার একটা সাবান একদিন ধারে চেয়েছিলাম ওর কাছে, কিন্তু দেয়নি।

নন্দ মুদির শ্মশান-বন্ধুরা রাগ ক'রে তাকায়—এসব আবার কী রকমের কথা বলছে ঘাটবাবু ?

রামের কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে বিড় বিড় করে ঘাটবাবু—বেশ গনগনে আঁচ হয়েছে চিতাটার, কিছু আগুন সবিয়ে রাখ্ রাম, আর আমার চা-এর কেটলিটা নিয়ে এসে চাপিয়ে দে।

আবার, দূরে আর একটা চিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—ওটা কে রে রাম ? সেই খেমটাওয়ালী নাকি ?

রাম বলে—হ্যাঁ।

ঘাটবাবু—কী হল ওর ? এত তাড়াতাড়িই বা এল কেন ? আসছে হোলিতে নাচবার বায়না নেয়নি ?

আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘাটবাবু চেঁচাতে থাকে—এখন আর কী-ই বা এমন মড়ার ভিড় দেখছেন। কার্তিক মাসটা আসুক, তখন দেখবেন খেলা কেমন জমে।

—আমার সন্দেহ হয়। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন কাঞ্চনকাকা, আর ঘাটবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে কড়া ধমক ছাড়লেন—কী পেয়েছে ঘাট, অ্যাঁ ? মৃতের প্রতি এরকম ব্যবহার করলে তোমাকে

আমি তিন দিনের মধ্যেই · · ·।

ঘাটবাবু হেসে ফেলে—চলেই যাব স্যার, কারও কাঞ্চনকায়া তো রবে না, তবে কী ছার আর কেন মায়া . . . ।

গুন্‌গুন্‌ ক'রে যেন একটা সুরেলা আনন্দ ভাঁজতে ভাজতে নদীর আধহাঁটু জলের উপর দিয়ে ছপ্‌-ছপ্‌ ক'রে হেঁটে আপিস-ঘরের দিকে চলে গেল ঘাটবাবু। ভোলাদা বলেন—লোকটা মদ খেয়েছে বোধহয়।

কাঞ্চনকাকা বলেন—মদ তো কুমারসাহেবও খান, কিন্তু তাই ব'লে কী এরকম অমানুষের মতো কথা কেউ বলতে পারে, যদি সত্যিই অমানুষ না হয় ?

যাবার আগে দেখলাম, একটু অন্যরকম হয়ে রয়েছে ঘাটবাবু। রেজিস্টার খাতা বুকের কাছে নিয়ে যেন ছটফট করছে। চোখের দৃষ্টিটাও আর সেইরকম নয়। মাথা হেঁট ক'রে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আর যেন কিছু দেখবার নেই। বহুদিনের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে চোখ দুটো এইবার ভরসা হারিয়ে একেবারে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। চলে যাবার জন্যই ছটফট করছে ঘাটবাবুর হাত-পাগুলি।

কিন্তু কী বিশ্রী ঘাটবাবুর এইসব কথা আর চিৎকার। যাবার আগে যেন একবার মানুষের জীবনের যত শ্রদ্ধেয় বেদনাগুলিকে এই শ্মশানের বালুতে আছড়ে আছড়ে হেসে নিচ্ছে লোকটা।

শেষ রাতের অন্ধকার। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এতক্ষণ আমরা সড়কের ধারেই একটা বটের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়ায় শান্ত হয়ে পড়ে ছিল আমাদের সমিতির পেট্রন কুমারসাহেবেরই এক রানীজীর দেহ।

কাঞ্চনকাকার কাছ থেকে লোক এসে খবর দিতেই সেই সন্ধ্যাতে আমরা দৌড়ে গিয়ে মধুপুর রোডের ধারে সেই বাগানবাড়ির ফটকে দাঁড়িয়েছিলাম। বাগানবাড়ির ভিতর থেকে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে একবার বের হয়ে এলেন কাঞ্চনকাকা। মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার। তারপর কুমারসাহেবের মোটরগাড়িও ভিতর থেকে বের হয়ে এল। মধুপুর রোডের অন্ধকার ভেদ ক'রে কুমারসাহেবের গাড়ি তখনই দূরের তিনপাহাড় গড়ের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল। মোটরগাড়ির গর্জনের মধ্যেই শুনতে পেলাম, গাড়ির ভিতরে একটা ছোট ছেলের গলার নাকানি আর ক্ষীণ স্বরের কান্না। তারপরেই কাঞ্চনকাকার নির্দেশমত দোতলার ঘরের এক পালঙ্কের উপর থেকে সিল্কের চাদরে ঢাকা রানীজীকে কাঁচা কাঠের খাটিয়ায় তুলে নিয়ে আমরা সোজা ঘাটের দিকে রওনা হয়ে এতদূর চলে এসেছি।

ভোলাদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম।—কে এই রানীজী ভোলাদা ? কুমারসাহেবের স্ত্রী ?

ভোলাদা বললেন—না।

—তাহ'লে কে ইনি ?

ভোলাদা বিরক্ত হয়ে বলেন—কুমারসাহেবদের নানা রকমের রানীজী থাকেন, ইনিও একরকমের রানীজী হবেন।

আবার সেই কুশঘাসে ছাওয়া মাঠ, সেই আপিস-ঘর, আর সেই ঘাট।

আর সেই রকমই বুকের কাছে রেজিস্টার খাতা টেনে নিয়ে কালিমাখা লণ্ঠনের আলোর পিছনে বসে রয়েছে আবছায়াময় ঘাটবাবু।

আমাদের হরিবোল থামতেই লাফ দিয়ে উঠে এল ঘাটবাবু আর কাঞ্চনকাকার দিকে একটা কাগজ তুলে দেখিয়ে হেসে ফেলল।—রেজিগনেশন স্যার, আর অবিশ্বাস করবেন না, এইবার চলেই যাচ্ছি।

কাঞ্চনকাকা কটমট ক'রে ঘাটবাবুর দিকে তাকালেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে ঘাটবাবুর কথার

উত্তরটা আমাদেরই কানের কাছে ফিসফিস ক'রে বললেন—ক'দিন আগেই চলে গেলে ভাল করতে বাছা। তা হলে এরকম একটা শাস্তির গলাধাক্কা আর খেতে হত না।

—কী বললেন কাঞ্চনকাকা ?

কাঞ্চনকাকা বলেন—কিছু না, অন্যায় করলে প্রতিফল পেতেই হয়, এই আর কী।

রেস্টঘরের ভিতরে খাটিয়ার উপর সিল্কের চাদর আবৃত রানীজী পড়েছিলেন। কাঞ্চনকাকা বললেন—ওর মুখের ওপর থেকে চাদরটা নামিয়ে দাও।

চাদর সরিয়ে দিয়েই ভাল ক'রে দেখলাম। হ্যাঁ রানীজীরই মতো সুন্দর মুখ বটে। কাঞ্চনকাকার নির্দেশ মতো একটা লণ্ঠনও ঝুলিয়ে দিলাম রেস্টঘরের কাঠের থামের গায়ে। লণ্ঠনের মৃদু আলো রানীজীর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে, আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে রানীজীর সুন্দর মুখের শোভা।

কাঞ্চনকাকার কথাবার্তা, চোখের চাউনি আর ঘোরা-ফেরার ভঙ্গি কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল। যেন একটু বিচলিত হয়েছে কাঞ্চনকাকার বেপরোয়া মনের সাহসগুলি। কোনও রাতের অন্ধকারকেই যিনি কোনদিন গ্রাহ্য করেননি, শ্মশানের ভয়গুলিকে এক ধমকে যিনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন, সেই কাঞ্চনকাকার চোখ দুটো যেন ছমছম করছে।

—মানুষটার গতর কী রকম ? ক'মণ কাঠ লাগবে শুনি। বলতে বলতে রেস্টঘরের ভিতর এসে ঢুকল ঘাটবাবু। কাঞ্চনকাকা ব্যস্তভাবে আমাদের ডাক দিলেন—তোমরা সবাই এদিকে চলে এসো।

রেস্টঘরের ইটের সিঁড়ি দিয়ে আমরা একসঙ্গে নেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেই নেড়া চাঁপা গাছের কাছে, ধোঁয়ার জ্বালায় কালো হয়ে গিয়েছে যে গাছটা।

আমরা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছি, রানীজীর মুখের দিকে একবার তাকাতে গিয়েই এই নেড়া চাঁপা গাছটারই মতো একেবারে থমকে আর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘাটবাবু। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেল, রানীজীর মুখের ঢাকা আর একটু নামিয়ে দিল, তারপর খাটিয়ার পাশে মেঝের ধুলোর উপর ধপ ক'রে বসে পড়ল ঘাটবাবু।

ভোলাদা আস্তে চেঁচিয়ে উঠলেন—ও কি ?

কাঞ্চনকাকা বললেন—থাক গে, কিছু বলো না। ওর যা ইচ্ছে হয় করুক।

রানীজীর সিঁদুরমাখানো সিঁথি, মাথাভরা এক রাশ কালো চুল আর টিপলাগানো কপালের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করছে ঘাটবাবু। একটা মরা মেয়েমানুষের সুন্দর মুখের উপর লুব্ধ সাপের মতো সিরসির ক'রে ঘাটবাবুর রোগা আর শুকনো হাতটা ঘুরছে। আবার মনে হয়, যেন অনেক যন্ত্রণায় ক্লান্ত একটা মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে ঘাটবাবু।

আমাদের মনে ছ্যাঁক ক'রে একটা সন্দেহ চমকে ওঠে। এ কি কাণ্ড ! শ্মশানের লোকটা দূরের টাউনের জীবনের একটা মানুষকে এরকম ভালবাসা দেখাচ্ছে কেন ? যেন বলতে চাইছে ঘাটবাবু · জীবনটাই একটা শাস্তি, ওর মধ্যে থাকতে নেই, চলে এসো আমার কাছে।

আর রানীজীর মুখটা দেখে মনে হয়, এক পলাতকার প্রাণ যেন জীবনের ভয় থেকে এতদিনে মুক্ত হয়ে এই ভস্ম আর অঙ্গারের রাজ্যে এক ঘাটবাবুর কাছে এসে শান্তির আশ্বাস নিচ্ছে।

ভোর হল, পাখি ডেকে উঠল, চিতা সাজিয়ে ফেলল রাম। শান্ত চোখ নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সবই দেখল ঘাটবাবু। নদীর বালিয়াড়িতে নেমে ভাল ক'রে দেখল, ভাল ক'রে চিতা সাজানো হয়েছে কিনা।

রাম-নাম-সৎ-হ্যায় ধ্বনির সঙ্গে শব নিয়ে আরও কয়েকটি দল এল। সবারই সঙ্গে আলাপ করে ঘাটবাবু। ভোরের শ্মশানের এই বাতাসকেই যেন ভালবেসে ফেলেছে আর একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে ঘাটবাবুর অশান্ত আত্মা।

—মোটা মোটা গেঁটে কাঠগুলি আর দিস না রাম, পুড়তে বড় দেরি করে, আর বড় ধিকি ধিকি

ক'রে জ্বলে।

বলতে বলতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে ঘাটবাবু। এখানে ঠাঁই নিতে এসে যেন কারও কষ্ট না হয়, যেন ব্যথা না পায় শবগুলি, বড় যত্ন আর বড মায়া নিয়ে কাজ দেখছে ঘাটবাবু।

একটু দূরে একটা ভিখারির চিতার দিকে তাকিয়ে ঘাটবাবু ব্যথার্তভাবে আক্ষেপ করে।—আঃ, বেচারাকে ওরকম আধপোড়া ক'রে ফেলে রাখিস না রাম, আরও কিছু কাঠ চাপিয়ে দে।

টাউন থেকে এত দূরে এই নিরালা মাঠের শেষে এই নদীর বালিয়াড়ির বুকে ছাই আর অঙ্গার-গুলিও যেন একটা সংসার, যেন ভালবেসে ঘরও বাঁধা যায় এখানে। দুই চোখে তৃপ্তি আর শান্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে ঘাটবাবু। তারপরেই কাঞ্চনকাকার হাত থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে চলে যায়।

রানীজীব চিতার জ্বলন্ত অঙ্গার জল ছিটিয়ে নিভিয়ে দেবার পর আমরা যখন টাউনে ফিরবাব জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন দুপুরও পার হয়ে গিয়েছে। দূরে দাঁড়িয়েই দেখলাম, রেজিস্টার খাতার উপর মাথা নামিয়ে আর মুখ লুকিয়ে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে ঘাটবাবু। ঘুম ? কী আশ্চর্য, এতদিন পরে ঘাটবাবুর চোখে ঘুম !

কাঞ্চনকাকা আস্তে আস্তে বললেন—উঃ, খুব শান্তি পেল লোকটা।

তারপরেই ব্যস্তভাবে বলেন—যাও তো ভোলা, ওর কাছ থেকে রেজিগনেশন চিঠিটা চেয়ে নিয়ে এসো।

ভোলাদা একটু দ্বিধা করেন।—ও যখন নিজেই চলে যাবে বলছে, তখন আমরা আর কেন।. .

কাঞ্চনকাকা—তবু আমার সন্দেহ হয় ভোলা। ওর কথা বিশ্বাস করো না। তাছাড়া, আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে। আমাদের পেট্রন কুমারসাহেব যার নামে পুলিশে ডায়েরি করিয়েছে, সেই লোকটাকে এখানে আর থাকতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়।

ভোলাদা এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয়—ও ঘাটবাবু।

পর মুহূর্তে রেজিস্টার খাতার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠেন ভোলাদা। পা টিপে টিপে আমাদের কাছে ফিরে এসে ফিসফিস ক'রে বলেন —শিগগির আসুন কাঞ্চনকাকা, এসে দেখে যান, লোকটা আবার নাম গোলমাল ক'রে রেখেছে।

কুমারসাহেবের এক রানীজী মারা গিয়েছেন, সার্টিফিকেটেও তাই লেখা আছে, কিন্তু এসব কী অদ্ভুত মিথ্যা কথা ! মৃতার নাম সুমিতা গাঙ্গুলি, বয়স পঁচিশ, সধবা, সন্তানবতী, একটি ছেলে, হার্টের অসুখে মৃত্যু, মৃতার স্বামীর নাম মাধব গাঙ্গুলি, রেজিস্টারের ছক-কাটা এক একটা ঘর পূর্ণ ক'রে মৃতার এই অদ্ভুত মিথ্যা পরিচয় লিখে রেখেছে ঘাটবাবু। আর সেই মিথ্যা কথাগুলির পাশেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে রয়েছে মিথ্যুক লোকটা।

কাঞ্চনকাকা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর গলার স্বরে একটু কর্কশ জোর এনে ডাক দিলেন—ওহে মাধব গাঙ্গুলি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাটবাবু মুখ তুলে তাকিয়ে বলে উঠল—বলুন।

এ কি কাণ্ড ! তাহ'লে এই ঘাটবাবুই হল মাধব গাঙ্গুলি, আর ঐ যে রানীজী এতক্ষণ ধরে চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, তিনিই হলেন এই মাধব গাঙ্গুলির ঘরের-মানুষ সুমিতা গাঙ্গুলি, যাঁর রঙিন শাড়ির রং অনেকদিন ঝলমল ক'রে বাতাসে দুলেছিল ঐ কোয়ার্টারের পেঁপে গাছের কাছে। এই ব্যাপার ! এতদিনে আমাদের কাছে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘাটবাবুরই বউ তাহ'লে একদিন এখান থেকে চলে গিয়ে রানীজী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তো, বউ-ছেলে নিয়ে ফটো তোলবার সুযোগ আর পেল না ঘাটবাবু।

কাঞ্চনকাকা বললেন—তোমার রেজিগনেশন চিঠিটা আমার কাছেই দিয়ে দাও ঘাট।

হেসে উঠল ঘাটবাবু—না।

তারপরেই চিঠিটা পকেট থেকে বের ক'রে আর ছিঁড়ে কুচিকুচি ক'রে দিয়ে বেশ শান্ত ও হাসি-হাসি চোখ নিয়ে ঘাটবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

কাঞ্চনকাকা আবার তাঁর চোখে হঠাৎ একটা শক পেলেন যেন। যেতে চায় না কেন লোকটা? হাসে কেন লোকটা? আর এই কি শাস্তি-পাওয়া মানুষের চেহারা? দিব্যি শান্ত দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে বেহায়ার মতো।

বোধহয় ঘাটবাবুকে একটু ভয় পাইয়ে দেবার জন্যই কাঞ্চনকাকা বলেন—এখানে, এই চিতার ধোঁয়ার মধ্যে এভাবে তোমার পড়ে থেকে আর লাভ কী ঘাট?

কিন্তু তবু কোনও হতাশার ব্যথা জাগে না, কোনও আক্ষেপ নেই, কোনও আতঙ্ক নেই ঘাটবাবুর চোখে। বরং কাঞ্চনকাকার দিকে তাকিয়ে আর চুপ ক'রে কী-যেন ভেবে নিয়ে, তারপর হঠাৎ উৎসাহে একটা আবেদন ক'রে বসে ঘাটবাবু। —আমাকে একটা খবব বলবেন স্যার?

কাঞ্চনকাকা বলেন—বলো, কিসের খবর চাও?

ঘাটবাবু—রানীজীর ছেলেটা কেমন আছে?

চমকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন কাঞ্চনকাকা। খবরটা বোধহয় জানেন কাঞ্চনকাকা, কিন্তু সেই খবর বলতে তাঁর মতো মানুষেরও মন দুরদুর ক'রে উঠছে। শুনলেই লোকটা আবার একটা শাস্তির আঘাত পাবে, তাই খবরটা না বলবার জন্যই বোধহয় কাঞ্চনকাকা অন্য কথা পাড়লেন।—তোমার মাইনে-টাইনে আর এক পয়সাও বাড়বে না ঘাট, তোমার চলে যাওয়াই ভাল।

ঘাটবাবু বলে—ছেলেটা নিশ্চয়ই বেশ বড় হয়েছে এতদিনে।

কাঞ্চনকাকা—হ্যাঁ বড় তো হয়েছে, কিন্তু···।

ঘাটবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কিন্তু? বলুন না স্যার।

কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে কাঞ্চনকাকা বলেন—কিন্তু যে ভয়ানক একটা রোগে ধরেছে, আর বেশিদিন টিকবে কিনা সন্দেহ।

ঘাটবাবুর সারা মুখ জুড়ে ঝক্ ক'রে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ ও তীব্র একটা আনন্দের বিদ্যুৎ যেন ঝলক দিয়ে ওঠে। —বলেন কী স্যার!

কাঞ্চনকাকা ভ্রূকুটি করেন—কী বললে ঘাট?

ঘাটবাবু—তাহ'লে বলুন, ছেলেটাও শিগগির আসছে, এল বলে!

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে দু'পা পিছনে সরে গেলেন কাঞ্চনকাকা, যেন একটা হিংস্র ও ভয়াল প্রেতের হাতের ধাক্কা খেয়েছেন।

রাম নাম সৎ হ্যায়! ধ্বনি শোনা যায়। হন হন ক'রে হেঁটে, আর কাঁধের উপর খাটিয়াতে ফুলছড়ানো বিছানার উপর শব শুইয়ে নিয়ে একটা দল ঘাটের আপিসের কাছে প্রায় এসে পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে আর মনের উল্লাসে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে ঘাটবাবু—ওরে ও রাম, দেখ তো কে এল?

রাম বাইরে থেকেই উত্তর দেয়—বোধহয় এক শেঠজী আসছেন।

ঘাটবাবু—ঠিক ক'রে দেখে বল্ রাম, একটা ছোট ছেলে নয় তো?

রাম বলে—আরে, না বাবু।

বদ্ধ মাতালের মতো চেঁচাতে থাকে ঘাটবাবু—আরে হ্যাঁ বাবু, না এসে থাকতে পারবে কেন, এল বলে, আসতেই হবে।

বউ ফিরে এসেছে, এইবার ছেলেও আসছে, লোকটা যেন শ্মশানের এই ধোঁয়ার মধ্যে আবার ঘর বাঁধবার আনন্দে লাফাচ্ছে। কী রকমভাবে হাত কাঁপাচ্ছে, যেন একটা ছোট ছেলেকে কোলে নেবার জন্য নিশপিশ করছে লোকটার হাত।

ঘাটবাবুর এই সব চিৎকার শুনতে বিশ্রী লাগে, শুনে আমরা সবাই চমকেও উঠি, কিন্তু কাঞ্চনকাকা

যেন একেবারে কেমন হয়ে গেলেন. যেন একটা বিভীষিকার দাঁতের শব্দ শুনছেন। দুটো অপলক চোখ নিয়ে, দম বন্ধ ক'রে আব দুই হাঁটুর কাঁপুনি কোনমতে সামলে কিছুক্ষণ ঘাটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কাঞ্চনকাকা, তারপরেই দু'লাফ দিয়ে আপিস-ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে ছিটকে পড়েন।

—কী হল কাঞ্চনকাকা ? আমরাও তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে কাঞ্চনকাকার কাছে দাঁড়াই। কিন্তু এ আর দাঁড়ালেন না। যেন তাঁর বুকের পাঁজরের ভিতরে ভয়ংকর কালো একটা ভয় ঢুকে পড়েছে। —আমাব সন্দেহ হয়, এতদিন ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।

ভোলাদা—কী ?

কাঞ্চনকাকা—পিশাচ, পিশাচ, লোকটা মানুষই নয়।

বলতে বলতে মাঠেব উপর দিয়ে প্রায় দৌড় দিয়েই ছুটে চলে গেলেন কাঞ্চনকাকা।

এইবার আমরাও চলে যাব। যাবার আগে ভোলাদাকেই আমরা প্রশ্ন করলাম—আপনি কী মনে করেন ভোলাদা ?

ভোলাদা—আমার বিশ্বাস, লোকটা মানুষই, তবে স্বপ্নের মানুষ।

—তার মানে ?

ভোলাদা—লোকটা জাগা চোখে স্বপ্ন দেখে, ওটা মনের একটা রোগ।

আপিস-ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রেজিস্টার খাতা বুকের কাছে টেনে নিয়ে শ্মশানের ধোঁয়ার দিকে তাকিযে যেন এক প্র তীক্ষায অপলক হয়ে আছে ঘাটবাবুব চোখ। লাল লাল অথচ মিষ্টি-মিষ্টি আর হাসি-হাসি দু'টো চোখ যেন চাঁপার মতোই ফুটে রয়েছে।

ভোলাদা বলেন—বলো দেখি, লোকটা কিসের স্বপ্ন দেখছে ?

আমরা একটু ভেবে নিয়ে বলি—বোধহয় বউ-ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হরেন-বাবুর স্টুডিওতে ফটো তোলাচ্ছে।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬১

পা শে র ঘ র

আশালতা সিংহ

"মালীকে তুমি বকবে না বলে পণ করেছ নাকি ? আজ দু-দিন থেকে আমার ফুলদানিতে বাসি ফুল রয়েছে। একবার চেয়ে দেখে না, এত যে গোলাপ ফুটেছে একটা তোড়াও কোনদিন বেঁধে দেয় না।" সপ্তদশবর্ষীয়া মালতী চঞ্চল চরণে মায়ের নিকটে আসিযা অভিযোগ করিল। রাগে তাহার সুন্দব মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বেণী দুলিয়া উঠিতেছে, কর্ণাভরণ ঝিকিমিকি করিতেছে, হাতের চুড়িবালার রিনিঝিনি শব্দ উঠিতেছে। মা মেয়ের ক্রোধে উত্তেজিত অপরূপ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, "রাগিস নে মালু, গোয়ালাটা আজ দিনকতক হ'ল ছুটি নিয়েছে। মালীকে দিয়ে আমি গরুর জাবনা কাটাচ্ছি, ঘাস-জল দেওয়াচ্ছি। এই ক'দিন সে বেচারা বড় সময় পায়নি যে ফুলের তোড়ার তল্লাস করবে।"

মালতী কহিল, "ওই ন্যাস্টি গরুর পালের জন্যে তুমি খামকা মালীকে আটকে রাখবে ? এদিকে বাবার এত সখের ফুলবাগান, তার দশা যাই হোক না কেন ?"

"না রে, ফুলের বাগানের দশা কিছুই হবে না। মালী ছুটি পেলেই জল দেয়, আগাছা পরিষ্কার ক'রে রাখে। কিন্তু হ্যাঁ রে, তাও বলি, তোরা কি একটু বাগানের কাজ করতে পারিস নে ? পড়িসনি শকুন্তলার কথা, আগেকার দিনে রাজার মেয়েরাও ঝারি-হাতে ফুলের গাছের গোড়ায় জল দিতেন।"

"বিকেলে যে আমার রাজ্যের কাজ, আমার কলেজের টাস্ক আছে, গা-ধোয়া, চুল-বাঁধা শেষ হ'তে-না-হ'তেই উর্মিলারা দল বেঁধে আসবে ব্যাড্‌মিন্টন খেলতে। ভদ্রতা আর চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস রয়েছে। তাদের শুধু শুধু ফিরিয়ে দিই কেমন ক'রে। খেলতে খেলতে কত দিন সন্ধ্যে হয়ে যায়। আমার মিউজিকের লেস্‌ন্ নেবার সময় হয়ে আসে। কখন সময় পাই বলো ?"

মালতীর কথা শেষ হইতে-না-হইতে পাশের ঘর হইতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং মিহি গলায় কে ডাকিল, "মালতী ! মালতী !"

"ঐ দেখ মিলি আর উর্মিলা এসেছে। চল্লুম। তুমি যেন কুমুদাকে দিয়ে পেয়ালা-চারেক চা আমার বসবার ঘরে পাঠিয়ে দিও। যত শীগগির হয়।"

মালতী বেণী দুলাইয়া ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল।

মিলি উর্মিলা আর লটি ততক্ষণ উর্মিলার ব্লাউজের অভিনব ছাঁট সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া মিলি কহিল, "কি করছিলে ভাই এতক্ষণ ! যদিও ভদ্রতা নয় তবুও শেষে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থেকে থেকে তোমাকে ডাকলুম।"

মালতী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "সরি (Sorry), আমার আজ একটু দেরি হয়ে গেছে।"

লটি হাসিয়া উর্মিলার গায়ে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কার কথা ভাবছিলে ভাই ? ভাবনায় এত অন্যমনস্ক যে আমাদের ডাক শুনতে পাওনি।"

"কার কথা আবার ভাবব বলো, তোমরা একটা কিছু বানিয়ে না বললে সুখ পাও না।"

"আশা করি আমাদের বানিয়ে বলবার অবসর যেন আর বেশি দিন না থাকে। অচিরে সমস্তই সত্য হয়ে উঠুক।"

"আমরাও তাই আশা করি।"

মালতী উত্তর দিল না। গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

"ও কি, রাগ করলে নাকি ভাই ? আমরা কিন্তু মনে করেছিলুম মিঃ দের অধ্যবসায় এবারে সফল হয়ে আসছে। আমাদের বাড়ির পার্টিতে তোমার মা'ও সেদিন এই ধরনের কি-একটা চৌধুরী-মাসিকে বলছিলেন। আমি আড়ি পেতে শুনেছি।"

এইবারে মালতী কথা কহিল, "আমার মা যা খুশি তা বলতে পারেন, তাঁর ইচ্ছামতো। কিন্তু আমার মনে হয়—"

"তোর কী মনে হয় রে ?"—উর্মিলা মুখ টিপিয়া হাসিল।

"আমার মনে হয় মেয়েদের জীবনযাত্রায় পুরুষকে যে একান্ত প্রয়োজন এই মনোভাবটাই ভুল।"

"ওরে বাস্ রে, তুই যে মস্ত কথা বল্‌লি ! জানি নে বাপু এ-সব কথার উত্তর। তোর মতো আমরা আধ্যাত্মিক চিন্তাও অত করি নে আর সমাজতত্ত্ব কিংবা মনস্তত্ত্ব নিয়েও অত আমরা মাথা ঘামাই নে। কিন্তু দেরি কি, এবার চল্ ব্যাড্‌মিন্টন খেলবি নে ?"

মালতী তাহার বন্ধুদের সহিত কথা কহিতেছিল এবং ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছিল। কুমুদার এতক্ষণ চা আনিবার কথা। কিন্তু এখনও আসিল না। আঃ, আজ বিরক্তিতে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিয়াছে !

"আমি এখনই আসছি ভাই, তোমরা দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করো।"

ভিতরে চায়ের তাগাদা দিতে আসিয়া দেখিল, বাবা সেই মাত্র কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটা সোফায় বসিয়া জিরাইয়া লইতেছেন। অদূরে স্টোভে চায়ের জল চড়ানো। মা চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া ধৌত করিতেছেন। কিন্তু দূরে বা নিকটে কোথাও দাসী কুমুদার চিহ্ন অবধি নাই।

মালতী বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "কুমুদা কোথায় গেল ? মা দেখছি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে ঝি-চাকরগুলোকে একেবারে মাটি ক'রে দেবে !"

তাহার মা মিনতি করিয়া কহিলেন, "রাগ করিস নে মা। কুমুদা আজকের মতো ছুটি নিয়েছে। কালীঘাটে তার কী মানত আছে শোধ দিতে গেছে। তুই অনেকক্ষণ চা চেয়ে গেছিস, আমি তখন থেকে ছটফট করছি। কিন্তু তোর বাবা এসে পড়লেন। মানুষটা তেতে-পুড়ে এল ! জুতো-মোজা খুলে নিলুম, দু-দণ্ড হাওয়া করতে একটু ঠাণ্ডা হলেন। ঐ তো দেখি চায়ের জল ফুটছে, তা তুই এক কাজ কর না মা, ততক্ষণ চা ভিজতে দে। ক' পেয়ালা তৈরি ক'রে নে। তোর বাবাকেও এক পেয়ালা দিস্। আমি ততক্ষণ চট্ ক'রে ওঁর জন্যে ডিমের কচুরি ক'খানা ভেজে নিই।"

মালতী অনেক চেষ্টায় আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, "মা, তোমাদের ভদ্রতাবোধ কি একেবারে নেই ? আমার বন্ধুদের বসিয়ে রেখে এখানে আমি ডিমের কচুরি আর চা করি। আর তারা হাঁ ক'রে কড়িকাঠ গুনতে থাক।"

মালতীর বাবা সহাস্যে কহিলেন "বুড়ির মায়ের সঙ্গে দেখছি বুড়ির একদণ্ড বনে না। কেন তুমি ওকে রাগিয়ে দাও গো। যা যা বুড়ি, তোর বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগাছা কর গে। তোর মাকে দিয়ে চা তৈরি করিয়ে আমি দু-মিনিটের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাহারা রইলুম। একটুও দেরি হতে দেব না।"

মালতী রাগ করিয়া কহিল, "তোমার না থাক্‌তে পারে কিন্তু আমার ভদ্রতাজ্ঞান যথেষ্ট রয়েছে। দাঁড়াও, আমি ওদের বলে আসছি, আর আমার ছবির এ্যাল্‌বামটা বার ক'রে দিয়ে আসছি। ততক্ষণে সেইটে দেখতে দেখতে ওদের সময় কাটবে। আমি এসে চা করছি। কিন্তু বাবা দেখো, আমি বলে দিলুম, ঝি-চাকরকে মা এত প্রশ্রয় দেয় যে শেষ পর্যন্ত সবাইকে বিগ্‌ড়িয়ে না দিয়ে থাকতে পারবে না। কুমুদা গেল কালীঘাটে মানত শোধ করতে, কেন গেল ? কেনই বা এসব কুসংস্কারকে আমল দেওয়া ?"

মালতীর মা এবারে একটু ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন, "ছিঃ মা, অমন ক'রে বলতে নেই। কুমুদা দুঃখী মানুষ হ'লেও তারও তো জীবনে এমন অনেক বিশ্বাস থাকতে পারে যা' তার কাছে কুসংস্কার নয়, পরম ধর্ম।"

"তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।" মালতী চলিয়া গেল।

মালতীর বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বুড়ির প্রকৃতিটা একটু অসহিষ্ণু। একটুতেই রেগে ওঠে। কিন্তু রাগলে ওকে চমৎকার দেখায়।"

কচুরি ভাজা শেষ করিয়া একটা প্লেটে সাজাইতে সাজাইতে মালতীর মা কহিলেন, "মিছে নয়, তুমি হাসি-তামাশা করছ বটে, কিন্তু ভয়ে এক এক সময় আমরা হাত-পা ওঠে না।"

"কেন ?"

"তোমার ঐ মেয়েটির কথা ভেবে। কি আদরই দিয়েছ ওকে, আর কেমন ক'রে মানুষ করলে। আমি শুধু ভাবি মাঝে মাঝে তোমার ঐ নাকতোলা মেয়ের বিয়ে হ'লে কেমন করেই বা সে সুখী হবে, আর কেমন করেই বা পাঁচজনকে সুখী করবে।"

"তোমার এ ভাবনা মিছে। বুড়ির মনটি আসলে খুব কোমল আর স্নেহশীল। আর দেখো আমার মনে চিরকালের একটা ক্ষোভ রয়েছে, বুড়ির বিষয়ে আমি আর কারও কথা শুনব না। ওকে আমার মনের মতো ক'রে মানুষ করব। বিয়ের কথা পরে ভাবলেও চলবে।"

স্বামীর এ-কথায় গৃহিণীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল, স্বামী প্রথমে

ওকালতি পাস করিয়া কলিকাতার হাইকোর্টে কিছুদিন ওকালতি করেন। আইন পাস করিবার চার-পাঁচ বছর আগেই তাঁহাদের প্রথম কন্যা কমলার জন্ম হয়। কয়েক বছর আদালতে বাহির হইয়া কিছুই যখন সুবিধা হইল না তখন জ্যোতিষচন্দ্র সংকল্প করিলেন বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টারি পাস করিয়া আসিবেন। স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ অনেক কথা হইতে লাগিল কিন্তু আসলে তখনও তাঁহার বাবা জীবিত, তাঁহার মত কোনোমতেই পাওয়া গেল না। তিনি আচারনিষ্ঠ সেকেলে ভাবাপন্ন ছিলেন। অত্যন্ত কড়া, রাশভারী লোক। কিন্তু জ্যোতিষ বাবার কাছে উৎসাহ না পাইয়া স্ত্রীর অলংকার কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাহায্যে এক রকম জোর করিয়াই ব্যারিস্টারি পড়িতে গেলেন। সেই হইতে পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি। জ্যোতিষ ফিরিয়া আসিবার আগেই তাঁহার বাবা মারা গিয়াছিলেন। কিন্তু মারা যাইবার আগে তিনি জ্যোতিষের বড়-মেয়ে কমলাব অত্যন্ত অল্প বয়সে খব কলীনের ঘরে বিবাহ দিয়া দিলেন। প্রবাসী জ্যোতিষকে এ-সম্বন্ধে কোনও কথা জানাইলেন না। তাহার মতামত নিলেন না। হয়তো এ তাঁর পুত্রের উপর এক প্রকার প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি-সঞ্জাত কাজই হইয়াছিল। অবশ্য নাতনির বিবাহে তিনি ধূমধাম খরচপত্র করিয়াছিলেন যথেষ্ট। কুলীন এবং সম্পন্ন বনিয়াদি বংশের ঘরে তাহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা হইল না। ক্রমশ দেখা গেল সে-পরিবারে বাহিরে ঠাট্-ঠমকের চেয়ে ঋণেব বোঝাই বেশি। যে ছেলেটির সহিত কমলার বিবাহ হয়, সে বিয়ের সময় আই-এ পড়িতেছিল, কিন্তু কিছুতেই পাস করিয়া উঠিতে পারিল না। কয়েকবার ফেল করিয়া বাড়িতে আসিয়া বসিল।

জ্যোতিষ ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত শুনিলেন এবং রক্তবর্ণ মুখে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে কহিলেন, "এত সামান্য কারণে যে বাবা আমার উপর এমন ক'রে প্রতিশোধ নেবেন, তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। যদি জানতুম, তাহ'লে কখনও যেতাম না।"

সেই হইতে কমলার জীবন আর কমলার অদৃষ্ট পিতামাতার মনেব উপর ভারের মতো চাপিয়া বহিয়াছে। প্রতিকারহীন বেদনায় তাঁহাদের দিন-রাত্রি নিঃশব্দে বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে। প্রতিকার করিবার তেমন কিছু ছিল না। কমলার শ্বশুর বিলাত-ফেরত বৈবাহিকের বাড়িতে বধূমাতাকে কখনও পাঠাইতেন না। ম্যালেরিয়ার সময়টাও নয়। ম্যালেরিয়ার সময়ে তাহার এক পাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া কমলা জ্বরে জ্বরে কঙ্কালসার হইয়া উঠিত, এমনি করিয়া ভুগিতে ভুগিতে তাহার দুই-তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে অত্যন্ত অকালে সংসার ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে একটি দিনের জন্যও পিতামাতার সস্নেহ আকুল আহ্বানে বাপের বাড়ি যাইতে বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পায় নাই। বছর দুই হইল তাহার শ্বশুর মারা গিয়াছেন। অতটা কড়াকড়ি শাসন আর নাই।

বড় মেয়ে অমন করিয়া দূরে চলিয়া গেল, চিরজীবনের জন্য অশেষ দুঃখ-দর্ভাগ্যের মাঝে নিমজ্জিত হইয়া রহিল, এই কথা যত মনে পড়িয়া যায়, ছোট মেয়েটিকে তাহার বাবা ততই আকুল আগ্রহে বুকের মাঝে টানিয়া নেন। মালতীর তাই বাবার কাছে আদরের সীমা নাই। মা'ও আদর করেন। কিন্তু তাঁহার মনের মাঝে ভবিষ্যৎদর্শী শঙ্কাকুল মাতৃহৃদয় আছে। তিনি মনে জানেন, মা বাবার কাছে বাপের বাড়িতে যতই আদর-যত্ন হোক, মেয়েমানুষের ভাগ্যবিধাতা তাহার ভাগ্যে ঠিক কি যে লিখিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে ! আর কমলার জন্য তার মায়েরও মনে দুঃখ হয়। কিন্তু সে দুঃখের সঙ্গে দৈবের উপর বিশ্বাস বলিয়া একটা বস্তু জড়িত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে তত তীব্রতর করে না। তিনি এক-এক সময়ে ভাবেন, 'কমলার অদৃষ্টই অমনি। কে জানে আমাদের হাত থাকলেও হয়তো জীবনে ওর অমনি কষ্টই হ'ত। অদৃষ্ট ছাড়া গতি নেই মেয়েমানুষের।'

জ্যোতিষ অমন করিয়া ভাবিতে পারেন না। তাঁহার বলিষ্ঠ পুরুষ-হৃদয় এই অন্যায়, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার সমস্ত জীবনের ব্যর্থতা তাঁহার নিদ্রাহীন রাত্রিকে তপ্ত, ব্যাকুল করিয়া তোলে। আর সেই আতপ্ত রোষ এবং ক্ষোভ হইতে যত মেঘ জমা হয়

সে সকলই স্নেহধারারূপে ছোট মেয়েটিকে অভিষিক্ত করিতে থাকে। হাজার বার তিনি আপন মনে বলেন, 'একে আমি সুখী করব। আমার সমস্ত চেষ্টা দিয়ে একে সুখী, আনন্দময়ী ক'রে তুলব।'

* * *

পরের দিন —

মালতীর কলেজের 'বাস' বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সে প্রস্তুত হইয়া খাতা এবং বই হাতে লইয়া ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়াইল। কেবল চুলে একটা সোনার ক্লীপ্ আট্‌কাইয়া লইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝরনাধারার মতো তাহার গুন্‌গুন্ গানের সুব উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল-—

চাঁদিনী রাতে বলো কে গো আসিলে . . . .

পরক্ষণেই তাহার তীক্ষ্ণ তিরস্কারের স্বর শোনা গেল, "মা, মালী কি আজও বাগানের কাজ করেনি ? আজ মণিকাদির জন্যে আমার দুটো ফুলের তোড়া নিয়ে যাবার কথা ছিল। তাকে আমি সকালেই সে-কথা বলেছি। . . . নাঃ, তোমাদের ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা এত বিশৃঙ্খল. . . . আর দেরি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কী অপ্রস্তুতেই না আমাকে আজ পড়তে হবে।"

মালী একপ্রকার দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রকাণ্ড দুইটা ফুলের তোড়া আনিয়া বাসে চড়াইয়া দিল। এতক্ষণ সে প্রাণপণে তাড়াতাড়ি করিতেছিল, কিন্তু তবুও কপাল-গুণে খানিকটা দেরি হইয়া গিয়াছে। দিদিমণির কাছে বকুনি খাওয়া তাহার কপালে অনিবার্য।

মালতীর বাবা খাইতে বসিয়াছেন, মা সামনে বসিয়া হাতপাখায় করিয়া মাছি তাড়াইতেছেন। পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—চিট্‌টি !

বেয়ারা চিঠি লইয়া আসিল। জ্যোতিষ হাতমুখ ধুইয়া রুমালে মুছিতে মুছিতে খামখানা খুলিলেন, পত্রখানিতে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ছিল। সে সমস্ত সংশোধন করিয়া এইরূপ পড়িলেন ঃ—

শ্রীহরি সহায়

১২ই আশ্বিন

সাং রসা। পলাশডাঙা

অসংখ্য প্রণামান্তর নিবেদন,

মা, আজ দুই বৎসর হইতে আমার বড় ছেলেটিকে লইয়া ভুগিতেছি। তাহার পেটে লিভার ও পিলে দুই প্রকাণ্ড হইয়াছে। এখানে মহকুমা হইতে ডাক্তার আনিয়া অনেকবার দেখাইয়াছি। কোনও ফল পাই নাই। তোমার জামাইও বহুদিন হইতে ভুগিতেছেন। আমার মনে বড় সাধ ছিল, কলিকাতায় তোমাদের ওখানে লইয়া গিয়া একবার বড় ডাক্তার দেখাই এবং হাওয়া পরিবর্তন করি। কিন্তু জানোই তো আমার শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিতে একটা দিনের জন্যও যাইবার উপায় ছিল না। তাঁর অবর্তমানে যাইবার উপায় হইয়াছে। ওঁর মত করাইয়াছি। এখন তোমরা একটি ভাল দিন দেখাইয়া লোক পাঠাইলেই আমার যাওয়া হয়। সে বাটীর কুশল সংবাদ অনেক দিন পাই নাই। তুমি ও পিতাঠাকুর মহাশয় আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি—

সেবিকা কন্যা কমলা।

চিঠি-পড়া শেষ হইয়া গেল। জ্যোতিষ কহিলেন, "আজই কমলাকে আনবার ব্যবস্থা করি। . . . কিন্তু, কে যাবে ? আচ্ছা এক কাজ করি, মনিঅর্ডার ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিই, আর জামাইকে লিখে দিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসুক। এই আশ্বিন মাসে, ওখানে ভরতি ম্যালেরিয়ার সময়। কালবিলম্ব না ক'রে যেন ওরা চলে আসে।"

ইহারই দিন তিন-চার পরে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াগাড়ির মাথায় গুটি-তিন-চার স্টীল

ট্রাঙ্কের বাক্স, ছোটবড় গুটিকতক পুঁটলি-পোঁটলা, এক নাগরি খেজুর গুড়, একটা বড় চাঙাড়িতে বড় বড় কদমা বাতাসা এবং আরও বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী সমেত কমলা তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া পৌঁছাইল। এ-বাড়িতে তাহাকে যেন বে-মানান দেখায়। সে নিজেও বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। দীর্ঘ বারো বৎসর সে পিতৃগৃহে আসে নাই। রাশভারী শ্বশুরের বর্তমানে পিতৃগৃহে যাইবার কল্পনামাত্র তাহাব কাছে সুদূর স্বপ্নের মতো ছিল। মলতী দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসল। এই তাহার দিদি। অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু গৌরবর্ণ অত্যন্ত পাণ্ডুর। কৃশ দেহরেখা। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখখানিতে একটি সলজ্জ দীনতার ভাব। পায়ে আলতা। লালপাড়ের একটি সাদা ফরাসডাঙা শাড়ি সাদাসিধা ধরনে পরা। এই বয়সের এমনি অনেক সুন্দরী মেয়েকে মালতী দেখিয়াছে জর্জেট ক্রেপ সিল্ক পরা, উজ্জ্বলতায়, অজস্র হাসি-আমোদের বন্যায় ভাসমান। কিন্তু সে সকলের চেয়ে অন্য রকম এই ম্লান দীননয়না তাহার প্রায় অপরিচিতা দিদির পানে একবার চাহিবামাত্র তাহার মনের ভিতর কী রকম করিয়া উঠিল।

সে নামিয়া আসিয়া দিদিকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া কমলার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "দিদি, এসো।"

মালতীর পাশের ঘরে তাহার দিদির থাকিবার স্থান হইয়াছে। বহুদিন পরে কমলা আপন পিতৃভবনে আসিয়াছে, তাহাকে তাহার মা-বাবা কত দিন নিজের কাছে পান নাই। তাহাব বারা তাহার প্রতি পিতৃকর্তব্য পালন করিতে পান নাই, তিনি যখন সুদূর বিদেশে ছিলেন তখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার কোনও অপাত্রে বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তাহার মা আপনাব স্নেহবুভুক্ষিত অন্তরে কত দিন মেয়েকে টানিয়া লইতে পান নাই। তাই এতদিন পরে সে আসাতে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে উৎসুক। তেতলায় মস্ত খোলা ছাদ। স্নানের ঘর, পাশাপাশি দুইখানি শয়ন-কক্ষ এবং ঢাকা বারান্দা, তেতলার এই দুইখানি পাশাপাশি ঘরে কমলা ও মালতী থাকে। বারান্দার একাংশে ফুলের টব সাজানো। সেইখানে বসিয়া মালতী কোনও-কোনদিন জ্যোৎস্না-উদাস সন্ধ্যায় কোনও নির্জন অপরাহ্নে এস্‌রাজ বাজায়। রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ, বনবাণী, মহুয়া পড়ে। বারান্দার অপরার্ধ কিন্তু সবুজ স্ক্রীন্ দিয়া আড়াল করা। সেখানে কমলার গৃহস্থালি। রাত্রিবেলায় বুঁচিকে উঠাইয়া দিতে হয়, নয়ত প্রায়ই বিছানা নোংরা করিয়া ফেলে। স্বামী বিজয়নাথের আজ মাস ছয় হইতে শক্ত ম্যালেরিয়া হইয়াছে, কুইনাইন পেটে পড়িবামাত্র বমি আরম্ভ হয়। স্ক্রীন্-দেওয়া এই ঢাকা বারান্দায় জলের বালতি, ঘটি গামছা তোয়ালে বেড্‌প্যান সমস্ত সরঞ্জামই রাখিতে হয়।

* * *

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। মালতী আপন মনে রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ হইতে পড়িতেছিল ঃ

মোর কিছু ধন আছে সংসাবে, বাকী সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
হে মোর স্বপনবিহারী
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি'
পরম পুলকে।...

শরতের সুনীল আকাশে বহু দূর দিগন্ত অবধি মেঘের লেশ নাই, জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিতেছে। নির্জন কক্ষের বাতায়নে বসিয়া তরুণী আপন মনের ঘনায়মান স্বপ্নের অঞ্জন মাখাইয়া পড়িতেছিল "মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকী সব ধন স্বপনে, নিভৃত স্বপনে।"

তখন পাশের ঘরের একাংশে সংসারের সুখ-দুঃখ লইয়া যে আলোচনা হইতেছিল সেখানে স্বপ্নের

ঘোর মাত্র ছিল না। কমলার স্বামী বিজয়নাথ বলিতেছিল, "কালকে মাসের পয়লা, অগস্ত্যযাত্রা যেতে নেই। তার পরের দুটো দিন অশ্লেষা, মঘা, তা'ও বাদ গেল। তার পর ৪ঠা কার্তিক আমাকে যেতেই হবে।" কমলা নতমুখে কহিল, "কার্তিক মাসে ওখানে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ায় পড়ে আছে সবাই। এ-সময়ে ওখানে নাই বা গেলে। তা ছাড়া মা বাবা যখন এত ক'রে বারণ করছেন।"

"তোমার মা বাবার কী বলো, সংসারে কোনও অভাব নাই, অনটন নাই। পাখার হাওয়ার তলায় দিব্যি আছেন। এদিকে আমাদের যে এখনও লাটের কিস্তি যায়নি। জমি-জমা যা ক্ষুদ কুঁড়ো আছে, তাও কী শেষে নীলেম হয়ে যাবে। এখানে বসে থাকলেই পেট ভরবে ?"

কমলা কোনও উত্তর করিতে পারিল না। এমন সময়ে তাহার ছোট ছেলে কানাই জাগিয়া উঠিল, "মা খিদে।" তাহার আজ সাত আট দিন হইতে খুব জ্বর হইয়াছে। উপবাসে আছে। পথ্যের মধ্যে জলবার্লি আর খইয়ের মণ্ড খাইয়াছে।

"মা, আমি খাব।"

"তুই কী স্বপ্ন দেখছিস কানাই ? এই মাঝরাত্রিতে খাবি কী রে, ঘুমো ঘুমো। ঐ শোন্ এখনই চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে। তোর কী ভয়ডর নেই রে প্রাণে। নে নে, ঘুমো।"

কানাই ততক্ষণে সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। মিটিমিটি করিয়া বৈদ্যুতিক আলোটার পানে চাহিয়া বলিতেছে, "এখানে চৌকিদারের হাঁক কোথা পাবে। সে তো সেই পলাশডাঙায় হাঁকত। দাও, দাও, আমাকে দাও, সেই তখন পটলা সুজির রুটি খেলে, আমাকে কিছু দাওনি।"

কমলার রাত্রি-জাগরণ ক্লান্ত মৃদু সকরুণ সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল, "ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মী বাবা আমার। সোনা মাণিক আমার।.... ঈস গা জ্বরে যেন আগুনের মতো পুড়ে যাচ্ছে। আবোলতাবোল বকো না বাবা। চুপ ক'রে ঘুমাও।" কিন্তু অবোধ বালকের প্রলাপ তাহাতে লেশমাত্র কমে না।

কমলার স্বামী বিজয়নাথ রাগিয়া গিয়া কহিল, "এই হতভাগা ছেলেগুলোর জ্বালায় রাত্রিবেলায় পর্যন্ত একটু ঘুমোবার জো নেই। মরণ হলে বাঁচি ওদের।'

"বালাই, ষাট ! অমন ক'রে বলতে নেই।" কমলা সভয়ে মনে মনে সহস্রবার ঠাকুর-দেবতার নাম লইয়া রুগ্ন বালকের শিয়রে হাত রাখিল।

পাশের ঘরে মালতীর কবিতা-পড়া কখন থামিয়া গিয়াছে। কাল রবিবার, কলেজে যাইবার কিংবা পড়াশোনার তাড়া নাই। তাই সে ভাবিতেছিল, এস্‌রাজটা পাড়িয়া বসিবে কি না, কিন্তু পাশের ঘরের বিচিত্র কলরব তাহাকে আকৃষ্ট করিল। কমলা তখন অশান্ত জ্বরপীড়িত ছেলেকে শান্ত করিতেছে, "ছি বাবা কাঁদে না। বাবা যদি একটু বকে তাহ'লে কী কাঁদতে হয় ধন। আসলে উনি তোমাকে কত ভালবাসেন।"

মালতীর মনের উপর দিয়া তাহার দিদির ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। দিদি মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পায় না। সকাল হইতে উঠিয়া স্বামীর আর ছেলেদের পরিচর্যা, ছেলেদের নিত্য রোগ। স্বামী অর্ধশিক্ষিত সংকীর্ণমনা। কিন্তু তবুও তার মুখে কী পরিতৃপ্তির আভাস ! সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত দিদি নিজের কথা বোধ হয় এক মিনিটের জন্যও ভাবে না। পাশের ঘরের কথোপকথন শুনিতে তার ভাল লাগে। মনে হয় তাহার সম্পূর্ণ অজানা এক জগতের যবনিকা যেন আস্তে আস্তে উঠিতেছে।

...... কমলার স্বামী বিজয়নাথ জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ও কি আবার যাচ্ছ কোথায় ? এই তো দু-ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে ছেলেটা ঘুমলো, এইবার নিজে একটু ঘুমিয়ে নাও। কতক্ষণই বা ঘুমুতে পাবে, এখনই আবার একটা-না-একটা কেউ উঠে পড়বে।"

"....এখনই আসছি। যাই দেখে আসি একটি বার গিয়ে কুমুদা কেমন আছে। তারও আবার তিন দিন থেকে জ্বর হয়েছিল কিনা। আজই সবে ছেড়েছে। একটু সাবু আর খান দুই পটলভাজা ক'রে দিয়ে

এসেছিলুম, দেখে আসি খেতে পেরেছে কি না।"

মালতীর মনে পড়িয়া গেল, বাড়ির দাসী এই কুমুদার যে আবার একটা অস্তিত্ব আছে এমন কথা সে কোনদিন মনেও করে নাই। এই কুমুদা একদিন মানত রাখিতে গিয়া সারাদিন উপবাস করিয়া কালীঘাটে গিয়াছিল ছুটি লইয়া, সেজন্য মায়ের সঙ্গে সে কত কলহ করিয়াছিল। ঝি-চাকরের দুর্নীতি এবং কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতেছেন বলিয়া মাকে শুনাইয়াছিল সে লম্বা বক্তৃতা। মালতীর এস্‌রাজ বাজানো আর হইল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া আকাশের দূর তারার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, তা'র দিদি কমলা জীবনে কী পাইয়াছে যে এমন সহজে এত দুঃখ, এত অশান্তি এত খাটুনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে বহন করিয়া চলিতেছে। কোনও অসন্তোষ নাই, মনে কোনও ভার নাই। নিজের কথা সে অহরহ ভাবে না, বরঞ্চ নিজের কথাটাকে অনেকের কথায় অনেকের কল্যাণে একেবারে চাপা দিতে পারিলেই যেন বাঁচে। তার দিদির জীবন হইতে প্রতিফলিত হইয়া একটা নূতন আলো যেন তার মনের উপর আসিয়া পড়িল। আসিয়া পড়িয়া অনেক গর্ব অনেক ধারণাকে যেন আস্তে আস্তে গলাইয়া দিয়া ভাঙিয়া গড়িতে লাগিল।

পাশের ঘরে মৃদু গুঞ্জনে তখনও কথাবার্তা চলিতেছে. বিজয়নাথ আস্ফালন করিতেছে, "সৌরিশ সরকারকে আমি দেখাব মজা, বুজলে কমলা। আমাদের বারিত্ পুকুরের সীমানা দিয়ে হেঁটে গেলে আমি তার পা ভাঙব। পুকুরে সরা তো দূরের কথা। মনে নেই তোমার সাজার উঠোনের এক কাঠা জমি নিয়ে আমাকে কত কথাই না শুনিয়েছিল। বাছাধন টেরটি পাবেন এইবারে। দাঁড়াও বাইরে থেকে আসি মুখ হাত ধুয়ে একবার। এসে অমনি শুয়ে পড়ব।"— বিজয়নাথ দরজাটা খুলিল। পাশের ঘর—মালতীর কক্ষ হইতে তখন এস্‌রাজের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মালতী এইবারে এস্‌রাজটা টানিয়া লইয়াছে। বিজয়নাথ মুখ হাত ধুইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ শুনিল। রুগ্ন সুপ্ত পুত্রের পাশে বসিয়া মুক্ত দ্বারপথে কমলা অনেকক্ষণ সেই সুর শুনিল। ক্ষণকালের জন্য তাহাদের মন হইতে বারিত্ পুকুবের সীমানা, সৌরিশ সরকারের স্পর্ধা, এক কাঠা জমি লইয়া মামলা করিবার প্রয়াস সমস্তই মুছিয়া গেল।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

ইষ্টি কুটুম

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

দেখতে দেখতে কত রোদ্ উঠল। রোদ লেগে উঠোনের এপাশটা মাজা বাসনের মতো ঝকঝক করছে। আবার ওধারে আম জাম ও নারকেলের ছায়া দুলছে। একটু বাতাস দিতেই ঝাঁকড়া খেজুর পাতাগুলি নড়ছে ছায়াগুলি কাঁপছে। হলুদ হলুদ ফ্যাকাশে চোখ মেলে ধরে গণেশ দেখছে। সেই কখন থেকে এক মুঠো মুড়ি খেয়ে চুপ করে দাওয়ায় বসে আছে। তার সারা দিনই প্রায় চুপচাপ একা একা দাওয়ায় বসে কাটে। রোগা পা দুটো নিয়ে ভাল করে হাঁটতে পারে না। সরু খাঁচার মতো বুকটাও এইটুকুন। পেটরোগা চিরকাল। তার ওপর কদিন আগে জণ্ডিসে ভুগেছে। পাঁচ বছরের ছেলে যতটা বাড়বার মোটেই বাড়েনি। জন্ম থেকে অপুষ্টি। তায় আবার জণ্ডিস—মাসি বলে ন্যাবা—হলুদ

ব্যামোর মতন অমন সাংঘাতিক পাজি ব্যামো আর আছে নাকি। আমার গণেশকে—আমার সোনার চাঁদকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। পিলে বড় হয়ে পেটটা ঢাকের মতন ফুলে আছে, শৈশব থেকে গণেশের মাথাটা বড়। সারা শরীরে মাথাটাই চোখে পড়ে। এখন বাতাবি লেবুর মতো গোলগাল মাথার চেয়ে পিলে ভরতি ফুলো পেটটা আগে চোখে পড়ে। হাত-পাগুলি আরও সরু হয়ে গেছে। ঝাঁটার কাঠির মতো জিরজির করছে।

সরু হাত পা বাতাবি লেবুর মতো গোলগাল মাথা ও ফুলো পেট নিয়ে রোগা ছেলেটা সারাদিন একলা দাওয়ায় বসে আছে। দেখে মাসির বড় কষ্ট হয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দোরে উঁকি দিয়ে গণেশকে দেখে যায় ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলেমিশে হুটোপাটি করার, খেলাধুলো করার শক্তি বোনপোর নেই।

তা হোক ফ্যাকাশে হলদে চোখ নিয়ে গণেশ কিন্তু একেবারে বিভোর হয়ে উঠোনের রোদ ছায়া দেখে। তার এই জগৎ ভারী সুন্দর। নারকেলের গুঁড়ির কাছে একটা কাঠবিড়াল ঘুরঘুর করছে। এই মাত্র একটা ছুঁচো উঠোনের এদিক থেকে ওদিকে ছুটে গেছে। ঘোষ বাবুদের পুকুর পাড়ের মস্ত উঁচু নিমগাছটা সে দেখতে পায়। এখন নিমফল পেকেছে। কাক শালিক উড়ে উড়ে এসে নিমফল ঠুকরে খায়। গণেশের চোখের মতো হলুদ হলুদ নিমের গোটা টুপটাপ নীচে ঝরে পড়ে। কিন্তু গণেশ সবচেয়ে আমোদ পায় বুলবুলিদের কাণ্ড দেখে। ঘোষ বাবুদের পুকুর পাড়ের শিরীষের উঁচু মাথা থেকে বুলবুলির ঝাঁক ঝাঁপ দিয়ে নীচের কচু উচ্ছে শেয়াল কাঁটা ও বনতুলসীর ভরাট জঙ্গলে ডুব দেয়। এত ঘন ঘাস ও ছোট ছোট কাঁটা গাছের জঙ্গল—দেখে গণেশের মনে হয় উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো সবুজ একটা দীঘি। শিরীষ ও এক সার মাদার গাছের তলায় জঙ্গলটা কম বড় নয়। সারাক্ষণ সেখানে সবুজ সাদা হলুদ নীল সব প্রজাপতি উড়ছে, দগদগে আগুন রঙের ফড়িং উড়ছে। একটা বুনো মিষ্টি ফুলের গন্ধ ওদের টেনে আনছে মধু খাবে। বুলবুলির ঝাঁক ঐ সবুজ ঢেউ খেলানো দীঘিতে ডুব দিয়ে উঠে ফুরুৎ ফুরুৎ উড়ে গিয়ে আবার শিরীষের ডালে বসে। ঠোঁটে একটা করে পোকা। দেখে গণেশের চোখের পলক পড়ে না।

হ্যাঁ, গণেশের এই জগৎ সুন্দর বিস্ময়কর—আবার বিষাদময়ও। আজ ভোরেব দিকে, তখনও গণেশ বিছানায় শুয়ে, একটা 'চোখ গেল' পাখি ডাকছিল। চোখ গেল চোখ গেল। ঘরের পিছনে চালতে গাছটায় বসে ডাকছিল ওটা। এত কষ্ট লাগে গণেশের ওই ডাকটা শুনলে। এখন নতুন করে মনে পড়তে তার দু চোখ ছলছল করে উঠল। চোখ গেল চোখ গেল। কেন ওর চোখ গেল। পাখিটা কী একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। গণেশ ভাবে।

ভাগ্যিস গণেশের চোখের ছলছল ভাবটা বেশিক্ষণ থাকে না। একটু পরেই তার চোখে বিস্ময় ও কৌতূহল দেখা যায়। শিরীষ গাছ ছেড়ে বুলবুলির ঝাঁক হঠাৎ কোন্‌দিকে যেন উড়ে গেছে। এখন সেখানে একলা একটা পাখি বসে আছে। পাখিটার চড়া মাজা গলার মিঠে বুলি দুবার গণেশের কানে এল। বৌ কথা কও, বৌ কথা কও। গণেশের দু কান খাড়া। পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাকল ঃ বৌ কথা কও। গণেশের শুকনো ঠোঁটে হাসি উঁকি দেয়। আহ্লাদে হাততালি দিয়ে ওঠে। ভারী মজা পায় সে পাখিটা ডাকলে। মাসি সেদিন বলছিল, বৌ-কথা-কও পাখি আর জন্মে মানুষ ছিল—মেয়েছেলে। একবার এক বাড়ির নতুন বৌকে ঘিরে পাড়ার আর পাঁচটা আইবুড়ো মেয়ের সঙ্গে ও-ও বাসর জেগেছিল। নতুন বৌয়ের মাথায় সাত হাত ঘোমটা। সারাক্ষণ ঘাড় গুঁজে চুপ করে বসে আছে। কথা বলে না। মেয়েরা ওকে কথা বলাতে চাইছিল। অ বৌ মুখ তোলো—কথা কও। এ-জন্মে পাখি হয়ে গিয়ে মেয়েটা সব মনে রেখেছে। আইবুড়ো থাকতে থাকতে মারা গিয়েছিল কিনা সেই বাসর জাগার কথা ভুলতে পারে না।

খুশির চোটে গণেশ ছোট ছোট হাত দুটো তুলে পাখিটাকে ডাকল ঃ এই হিস্...আয়...আয়...কী

হল গণেশ। মাসি ভেতর থেকে শুধোয়।

বৌ-পাখি মাসি। গণেশ উত্তর করে।

হুঁ, তোরও বৌ আসবে গণেশ—রাঙ্গা টুকটুকে বৌ। মাসি জানিয়ে দেয়।

গণেশের সারা গালে হাসি উপচে পড়ে। বৌ কাকে বলে সে শিখে গেছে। সেদিন পুব-পাড়ার পালেদের বাড়ির ছোট ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। বৌ-ভাতের কাজে মাসির ডাক পড়েছিল। গণেশ সঙ্গে গেছে। সারাদিন বিয়েবাড়ি থেকে মেঠাই মণ্ডা খেয়েছে ও 'নতুন বৌ' দেখেছে।

পাখিটা আর একবার মিঠে বুলিটা শুনিয়ে দিয়ে আচমকা উড়ে গেল। গণেশ কিছুটা হতাশ হল। চারদিক এখন চুপচাপ। আর পাখপাখালির ডাক নেই। দুপুর ঘন হয়েছে। রৌদ্র গাঢ় হয়েছে। জ্যৈষ্ঠের খরা দিন। থেকে থেকে শুকনো গরম বাতাস ছাড়ছে। আম জাম নারকেল পাতার ফরফর শব্দ হয়। ঘোষদের পুকুর পাড়ের ঢেউ খেলানো উচ্ছে কচু বনতুলসীর জঙ্গলে নতুন করে কাঁপন লাগে। ফড়িং প্রজাপতি নীরবে নড়াচড়া করে। পাকা নিমফলের গন্ধে এক ঝাঁক বোলতা কোথা থেকে ছুটে এসে এই ভরদুপুরে নিমের ডাল পাতা ঘিরে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে নাচছে। রুগ্ন গণেশ দাওয়ায় বসে হাঁ করে তাকিয়ে তার এই বিশাল সুন্দর বিস্ময়কর জগৎ দেখে।

একটু আগে মাসির কড়াই খুন্তার ঠুনঠান টুকটাক শব্দ শোনা গেছে। এখন আর শব্দ নেই। ডাল ও কচুশাক রান্না শেষ করে মাসি যেন ভাত চাপিয়েছে। ভাতের গন্ধ টের পায় গণেশ। হঠাৎ তার আবেশের ভাবটা কেটে গেল। দু চোখে ভয়ের চিহ্ন। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে উঠোনের রোদ ও আমজামের ছায়া দেখছিল। এবার গণেশ ঘাড় সোজা করে বসল। পাখির খাঁচার মতো শীর্ণ পাঁজরের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠেছে। আবার খাড়া হয়। অস্পষ্ট হয়ে শব্দটা কানে এসেছে। প্রথম এমন করে ডাকে ওটা। চাপা খর্‌খর্‌ আওয়াজ। তারপর শব্দটা চড়া হতে থাকে। খর্‌খর্‌...তোঠ্যাং...খর্‌খর্‌...তোঠ্যাং।...

মাসি! চাপা কান্নার গলায় গণেশ ডাকল।

কী হল বাপ্‌। ভিতর থেকে উত্তর করে মাসি। ভাতের ফেন গালছিল।

তক্ক বলে। যেন ভয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার।

হুঁ, তক্ষক...তা থাক না তক্ষক। এখানে আসবে না। ও আছে ওর জায়গায়, তোর ভয় কী বাবা। মাসি সান্ত্বনা দেয়।

গণেশ ড্যাবড্যাবে চোখে ঘোষবাবুদের পুকুর পাড়ের তেঁতুল গাছটা দেখে। ওদিক থেকে শব্দটা আসে। ঠিক এই দুপুরবেলা ডাকে ওটা। মাসি বলে তেঁতুল গাছের খোঁড়ালের মধ্যে তক্ষকটা বাসা বেঁধেছে।

গণেশ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়। কথাটা মিছে কী। তক্ষকটা কোনদিনই খোঁড়ল ছেড়ে বেরিয়ে পুকুর পাড়ে থেকে এদিকে আসে না। তা হলে গণেশের চোখে পড়ত। সারাদিনই তো দাওয়ায় বসে থাকে সে।

মিনিট কয়েক কাটল। আর শব্দ শোনা গেল না। এদিক থেকে ওটা ভাল। গণেশ ভাবে, দু তিনবার ডেকে এই যে চুপ করল—আবার সেই কাল দুপুরবেলা ডাকবে। কাজেই গণেশ সারাদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারে। চোখ থেকে ভয়ের ভাবটা সরে যায়। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে। আম জামের পাতা নড়ে। নারকেল পাত ঝিলমিল করে। উঠোনের ছায়া কাঁপে। নিমের মাথা ছুঁয়ে বোলতার ঝাঁক এখন জোরে জোরে ঘুরছে নাচছে। পাকা নিমফলের গন্ধে পৃথিবী ম ম। এমন সময় একটা ভারী নরম মিষ্টি সুর গণেশের কানে এল। কেমন নরম—যেন এক গাছা রেশমি সূতো। যেন গাছগাছালির বুকে রেশমি সূতোর বুনট তুলে পিছনের কামরাঙ্গা জঙ্গল থেকে উড়তে উড়তে ছোট্ট পাখিটা সামনের কাঁঠাল গাছে এসে বসল। তারপর আবার ডাকল, পর পর দুবার ডাকল : কুটুম আয় কটুম

আয়...পাখিটাকে গণেশ চেনে। মাসি চিনিয়ে দিয়েছে। তাই এখন চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাদে তার সব কটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। হাততালি দিল। মাসিকে ডাকল, মাসি মাসি, ইস্তি পাখি।

হ্যাঁ রে বাপ, ইষ্টি কুটুম পাখি। ভিতর থেকে মাসি জবাব দেয়। তারপর লম্বা শ্বাস ছেড়ে বলে, তা ইষ্টি কুটুম কী আর এখন গেরস্ত বাড়ি আসে। চালের কেজি চার টাকায় উঠল। একমুঠ খেতে দিতে হবে ভয়ে, একমুঠ খেতে হবে লজ্জায় কুটুম বাড়ি আসা কুটুমের বন্ধ হয়ে গেছে।

মাসির কথায় গণেশের কান নেই। সে স্থির চোখে দেখছিল, পাখিটা কাঁঠাল গাছ থেকে উড়ে শিরীষ গাছে গিয়ে বসেছে। আর তক্ষুনি সাক্ষাৎ এক কুটুমের মতো অন্ধ ভিখিরি উঠোনে এসে দাঁড়ায়। ‘মা—গো’, আবদারে গলায় বিপিন ডাকে, ‘এক মুঠ খেতে দাও।’ কেউ সাড়া দেয় না। বাড়িটা যেন পাথর হয়ে থাকে। ‘কিছু খেতে দেবে গো মা—বড় খিদে।’ বিপিন আবার ডাকে।

এবার মাসি কথা কয় ঃ ‘না গো বাছা। কেমন আকাল চলছে। নিজেদেরই জুটছে না—তোমায় খেতে দেই কোথা থেকে, মাপ করো।’

যেদিক থেকে শব্দটা এল সেদিকে মুখটা তুলে ধরে অন্ধ বিপিন এক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে কপালের ঘাম মুছে লাঠি ঠুকে ঠুকে উঠোন থেকে নেমে গেল। পাশের গাঁয়ের মানুষ। বিপিনকে সবাই চেনে। আগে আগে এ-দুয়ারে সে-দুয়ারে যা-হোক কিছু জুটত। এখন কেউ কিছু দেয় না। বিপিন চলে যেতে মাসি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ‘আয় বাপ—বেলা হল। চান করবি ভাত খাবি। তোর মেসো এইবেলা হাট থেকে ফিরবে।

‘মেচো ভাত খাবে।’ গণেশও সঙ্গে সঙ্গে বলে। ‘হঁ’ মাসি মাথা নাড়ে। সেই ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে গণেশের মেসো। বনগাঁ-র হাটে গামছা কিনবে। দশ গাঁয়ে ঘুরে গামছা ফেরি করে মেসো সংসার চালায়।

বেলা আরও চড়ে। রোদে আগুনের হলকা। ভাত খেয়ে গণেশ আবার এসে দাওয়ায় বসেছে। দুর্বল শরীর। ভরা পেটে ঝিমোনি আসে। কোন্ দিকে ঝোপের ভিতর ঘুঘু ডাকে। গণেশের চোখের ঘুম সরে যায়। ঘাড় সোজা করে ঘুঘুর ডাক শোনে—কুর্‌কুর্, কুরুর্‌র্‌র্...কুর্‌কুর্ কুরুর্‌র্‌র্—এত ভাল লাগে তার ঘুঘুর ডাক। শুনতে শুনতে তার মনে হয় কেউ বুঝি একটা ডগডগি গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। তার চোখের ওপর দু চাকার ছোট্ট গাড়িটা ভেসে ওঠে। বাঁশের ফ্রেমের ওপর বসানো একটা মাটির মালসা। মালসার মুখে চামড়ার ছালি। পিছনের দুটো চাকার সঙ্গে এক জোড়া কাঠি বাঁধা। গাড়ি টানলেই চাকা ঘোরে ও সঙ্গে সঙ্গে কাটি দুটো মালসার মুখে বাড়ি খেয়ে বাজনা বাজে ডগ্‌ডগ্ কুর্‌কুর্ ডগ্ ডগ্ কুর্ কুর্...কুরুর্ র্ র্...গাড়ি যত জোরে চলে তত বেশি বাজনা বাজে। বাজনা শুনতে শুনতে আবার গণেশের দু চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। ঠাণ্ডা দাওয়ার ওপর শরীরটা এলিয়ে দেয়। তারপর স্বপ্ন দেখে। লাল সুতো বাঁধা চাঁপার রঙের চমৎকার একটা ডগডগি-গাড়ি সে টানছে। বনধুতরো উচ্ছে ও কচু জঙ্গলের পাশ দিয়ে ঘোষ বাবুদের পুকুর পাড়ের সরু রাস্তা ধরে গাড়িটা টানছে। ডগ্‌ডগ্ কুর্‌কুর্ ডগ্ ডগ্ । বাজনা শুনে ফড়িং প্রজাপতির ঝাঁক নাচানাচি করছে। গণেশের গায়ে টুকটুকে লাল জামা পায়ে চকচকে জুতো। ঘোষবাবুদের নাতি সুবলের গাড়ির চেয়ে তার গাড়িটা বড়। বাজেও বেশি। মেসো মেলা থেকে কিনে এনেছে।

বাড়ি ফিরে পুকুরে ডুব দিয়ে এসে মেসো তখন ভাত খায়। মাসির সঙ্গে কথা বলে। উহুঁ, বনগাঁ-র হাটে আজ যাওয়া হয়নি গণেশের মেসোর। উত্তরপাড়ার লালু নস্করের সঙ্গে দেখা করে এসেছে।

‘কী বলছে লালু, ? মাসি চোখ বড় করে তাকাল। মেসো বড় বড় দাঁতে হাসল। ‘ওই এক কথা—আমার ছেলে কোথায়—ছেলে দিলে না।’

‘ও কি সত্যি আমাদের গণেশকে নিতে চায় ?

'সত্যি না তবে কী মিছে বলছি। তবে আর রোজ রোজ আমায় ডেকে পাঠাচ্ছে কেন।'

ঘরের চালে টিকটিকি ডাকে। মাসির চোখে চোখ রেখে মেসো আবার বলল, 'হাঁ করে বসে আছে লালু একটা ছেলের জন্যে। দু হাত বাড়িয়ে আছে। আমরা এখন দিলেই হল।'

বলে কেমন লোক লালু নস্কর ! লোকে বলে লালু মহারাজ কলকাতা শহরে তিনখানা বাড়ি তিনটে বাড়িতেই ভাড়াটে বসিয়েছে। কত বড় মশলার কারবার বড়বাজারে। মস্ত গুদাম। এত পয়সা। তবে কিনা পয়সাই সব না সংসারে।' গণেশের মেসো মাথা নাড়ল, 'দু দুটো বিয়ে করেও ছেলেপুলের মুখ দেখল না। মনে শান্তি নেই মানুষটার।

পিছনের কামরাঙ্গা গাছে এত পাখি এসে উড়ে বসেছে। শব্দ শুনে বোঝা গেল টিয়ের ঝাঁক। কামরাঙ্গা খেতে এসেছে। গণেশ দাওয়ায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। জেগে থাকলে একটা টিয়ে ধরে দেবার জন্য মাসির কাছে বায়না তুলত। লোনা জলের দেশে জন্ম। মাসি চিন্তা করে, আঁতুর থেকে বেরিয়ে বোনপো কেবল জলা আর নলখাগড়ার জঙ্গল দেখেছে, সাপ বিছা ব্যাং, আর পাখির মধ্যে ঐ তো বক আর পানকৌড়ি। এখানে শক্ত মাটির দেশে মাসির দাওয়ায় বসে গণেশ সারাদিন উঠোনের টুকটুকে রোদ দেখে, আম কাঁঠালের মিঠে ছায়া—গাছে গাছে রঙ-বেরঙের পাখি। বৌ কথা কও পাখি ডাকলে তার আহ্লাদ ধরে না, দোয়েলের শিস্ শুনে অবাক হয়, টিয়ে দেখে পাগল।

'কী হল, চুপ করে আছ।' গণেশের মেসো আবার দু গ্রাস ভাত গিলে মাসির মুখ দেখে।

গণেশের মাসি বড় করে শ্বাস ফেলল। 'ভাবছি, আমাদেরও তো ছেলেপুলে হয় না। ইচ্ছে ছিল গণেশকে কাছে রাখব বড় করে তুলব।'

'সাধ থাকলেও সাধ্যি কোথায় বোনের ছেলেকে পালবে। নিজেদেরই জোটে না। খাইয়ে পরিয়ে একটা ছেলেকে বড় করে তোলা কী মুখের কথা। তা ছাড়া অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে তোমার গণেশচন্দ্রের। নিয়ম করে ওষুধ পথ্য খাওয়ানো ডাক্তার দেখানো—অনেক পয়সার দরকার।

'ভাবি কেমন কপাল নিয়ে জন্মেছিল আমার বোন। ছেলেটাকে দেড় বছরের রেখে কলেরা হয়ে হুট্ করে একদিন চোখ বুজল। উনিশ বছরও পুরল না মেয়েটার। তার ছ মাস আগে গণেশের বাপ সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরল না। ঝড়ে মেছো নৌকো ডুবে গেল।'

'তা আজ আমি নস্করকে একরকম পাকা কথা দিয়ে এলাম। বলেছি, আপনি যেদিন বলবেন কর্তা, শালীর ছেলেকে নিয়ে আসব। বাপ-মা মরা দুধের বাচ্চাকে আমরা চার বছর পাললাম—আর পারছি না। যেমন দিনকাল পড়েছে। আমার ইস্তিরি খুব দুঃখ করছিল। হুঁ, তা বুঝি—গরিব মানুষ—নস্কর তখনই মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তোমার গিন্নি যাতে অখুশি না হয়, তুমিও খুশি হও আমি তার ব্যবস্থা করব। কাল ছেলে নিয়ে এসো, আমি তোমাকে এই দেব।' গণেশের মেসো এঁটো হাতের তিনটে আঙুল মাসির চোখের সামনে তুলে ধরল। টাকার অঙ্ক দেখে মাসির চোখ ঝকমক করে উঠল। তবে গলায় ভয়ের সুর শোনা গেল।

'আমার কেমন ভয় ভয় করছে।'

'ভয়টা কিসের শুনি ?'

গণেশের মাসি ঢোক গিলে বলল, 'কতরকম কথা শুনি। কারা নাকি এমন বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের লোকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে যেয়ে ওদের হাত-পা ভেঙ্গে চোখ গেলে দিয়ে অন্ধ আঁতুর বানায়, তারপর ওদের দিয়ে ভিক্ষে করায়।' ভিক্ষের সব টাকা কড়ি নিজেরা নিয়ে নেয়।'

'ধুত্তুরি যত সব বাজে কথা।' গণেশের মেসো শব্দ করে হেসে মাসির ভয়ভাবনা উড়িয়ে দিল। 'ঠিক করেছি, কালই তোমার বোনপোকে নস্করের কাছে পৌঁছে দিয়ে টাকাটা নিয়ে আসব। ফেরার পথে সাহাগঞ্জের হাট থেকে টিন কিনে আনব। পচা খড় ফেলে দিয়ে চাল করব। তা না হলে বর্ষায় টেকা যাবে না। চাল চুঁইয়ে জল পড়ে এবারও ঘর ভাসাবে।'

'হুঁ, তা-ও বটে।' মাসি সায় দেয়। চালের দিকে চোখ রেখে বিড়বিড়িয়ে বলে, 'জষ্ঠি শেষ হবে। বর্ষা এল বলে।'

রোদ মজে গেছে। উঠোনে আম জাম নারকেলের বড় বড় ছায়া এখন। মাসির কুমড়োর মাচার ওপর গুচ্ছের চড়ুই জুটে শোরগোল করছে। জেগে উঠে গণেশ আবার চুপ করে দাওয়ায় বসে আছে। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সে হতাশ হয়েছে। লাল সুতো বাঁধা একটা ডগডগি-গাড়ি টানছিল সে। কোথায় গেল গাড়িটা। তার গায়ে টুকটুকে রঙ্গিন জামা ছিল। কোথায় জামা। উদোম গা তার। পায়ে চকচকে জুতো নেই খালি পা। রোজ যেমন থাকে। একটা ছেঁড়া ময়লা প্যান্ট পরনে। তার এইটুকুন বুকের মধ্যে একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠল। বিমর্ষ হয়ে কুমড়ো মাচার চড়ুই দেখতে লাগল। তারপর একটা কপ্ কপ্ শব্দ হতে পুকুর পাড়ের সবুজ ঢেউ খেলানো কচু উচ্ছের জঙ্গলটার দিকে তাকাল। মা-ডাহুকটা ডাকছে। ঝোপের আড়ালে বসে ডাকছিল বলে গণেশ ডাহুকটাকে দেখছিল না। কেবল শব্দ শুনছিল। এভাবে পাখিটা সারাটা বিকেল ডাকবে। সন্ধে হলেও ডাকবে। অনেক রাত পর্যন্ত ডাকবে। কাল ডেকেছিল। পরশুও খুব ডেকেছিল। কদিন ধরে ডাকছে। কপ্ কপ্ কপ্ কপ্। কেন ওটা ডাকতে শুরু করলে আর থামতে চায় না গণেশ জেনে গেছে। মাসি বলেছে। ডাকতে ডাকতে পাখিটার গলা চিরে রক্ত বেরোবে। রক্তটা বাচ্চা পাখিটার চোখে ঢেলে দেবে। তখন বাচ্চার চোখ ফুটবে। চোখ না ফুটলে ডাহুকটার ছানা অন্ধ হয়ে থাকবে। ভাবতে গণেশের গা শিরশির করে ওঠে। বাচ্চার চোখ ফোটাতে মা-পাখিটা কত কষ্ট করছে। গণেশ তার মা-র কথা ভাবে। মাসির কাছে জেনে গেছে তারও একটা মা ছিল। স্বগ্গে চলে গেছে। স্বগ্‌গ কোথায় জিজ্ঞেস করতে মাসি আঙুল তুলে আকাশ দেখিয়েছে। ডাহুকের গলা শুনতে শুনতে পুকুর পাড়ের ঝোপের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সে আকাশ দেখতে লাগল। আকাশের সব রোদ মুছে গিয়ে এখন অন্ধকার নামছে। অন্ধকার আকাশে একটা সোনালি তারা ঝলমল করছে। গণেশ ভাবে ঐ বুঝি তার মা। তারা হয়ে আছে। মা দেখতে যে কেমন ছিল সে জানে না। সোনালি তারাটা দেখতে দেখতে তার বুকের ভিতর একটা নতুন করে চিন চিন করতে থাকে। খাঁচার মতো সরু বুকের ভিতর একটা নতুন জিনিস জন্ম নেয়। অভিমান। কালও মা-র ওপর তার অভিমান হয়েছিল। পরশু হয়েছিল। আজ আবার। ঘোষবাবুদের সুবলের মা আছে। পালেদের ঝণ্টু মণ্টুর মা ওদের কাছে আছে। কুমোর বাড়ির হারানের মা হারানের কাছে আছে। তার মা তাকে ছেড়ে স্বগ্গে বসে আছে। গণেশের শুকনো চোখ ছলছল করে উঠল।

'কী রে বাপ ! অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছিস ?' মাসি সামনে এসে দাঁড়ায়। গণেশ ঘাড় গুঁজে থাকে, মুখে কথা নেই। মাসির হাতে কেরাসিনের ডিবে। হাত থেকে আলোটা নামিয়ে দাওয়ায় বসল।

'কী হল, এদিকে তাকা।'

চোখ তুলে গণেশ একপলক মাসিকে দেখল। চুল বেঁধেছে মাসি, কপালে কাচপোকার টিপ। সন্ধেবেলা এ সময় মানুষটা একটু সাজগোজ করে।

'কাঁদছিস কেন !' আদুরে গলায় মাসি শুধোয়। হাতের পিঠ দিয়ে গণেশ চোখ মোছে। তবু ভিতর থেকে কান্নার ঝাঁকুনি ওঠে। ফলে তার বাতাবি লেবুর মতো গোলগাল বিশাল মাথাটা নড়ে নড়ে ওঠে।

'কী হল !' এবার মাসি ধমক দেয়। ই-ই-ই...গণেশ শব্দ করে কাঁদল ও 'মা' অস্পষ্ট গলায় বলল।

ধ্যেৎ বোকা ? বোনপোর মাথায় হাত বুলিয়ে মাসি সান্ত্বনা দেয়। 'মা নেই তো হয়েছে কী। আমি আছি, তোর মেসো আছে।

'শোন, গণেশ চুপ।'

কাল দশমী গঙ্গাপুজো, কাল কালীতলার মেলা। মেসোর সঙ্গে মেলায় যাবি।'

গণেশ কথাটা বুঝতে পারে না, হাঁ করে মাসির চোখ দেখে ভুরু দেখে।

'হ্যাঁ রে বোকা। মাসি আবার বলল, 'মেলায় গিয়ে ডগডগি-গাড়ি কিনবি, নতুন জামা হবে তোর, চকচকে জুতো, মেসো কিনে দেবে—এই তো বলে গেল।'

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সবটাই হেঁয়ালির মতো ঠেকে গণেশের। মেসো এ-সময় বাড়ি থাকে না গণেশ জানে। দুপুরে ভাত খেয়ে কাজেকর্মে আবার বেরিয়ে গেছে। তবু যেন এদিক ওদিক মাথাটা ঘুবিয়ে মেসোকে খুঁজল।

'কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে তুই আর তোর মেসো রিকসা চড়ে কালীতলা চলে যাবি। সুবলের গাড়িটার চেয়ে বড় একটা ডগডগি গাড়ি কিনে দেবে তোকে মেসো, দেখিস।'

বছর ঘুরতে চলল, নতুন জামা জুতো পরে পুকুরপাড়ের রাস্তা ধরে ঘোষবাবুদের সুবল তার ডগডগি গাড়িটা টেনে নিয়ে গেছে। কী চমৎকার শব্দ হচ্ছিল...ডগ্‌ডগ্ কুব্ কুর্...ডগ্‌ডগ্...কুরুর্ র্ র্.. অবিকল ঘুঘুর ডাকের মতো। ঘুঘু ডাকলেই গণেশেব ডগডগি গাড়িটা মনে পড়ে। যে জন্য মাঝে মাঝে, মাসির কাছে সে আব্দার করত, একটা ডগডগি গাড়ির জন্য বায়না ধরত। মাসি বলত, কালীতলার মেলা আসুক— মেলা থেকে তোর মেসো কিনে এনে দেবে।

সেই মেলা যে হঠাৎ এত কাছে এসে গেছে—কেবল কী তাই, গাড়িটা কিনতে মেসোর সঙ্গে সে-ও মেলায় যাচ্ছে। শুনে প্রথম অবাক হলেও মাসির মুখে হাসি দেখে শেষটায় সে-ও একটু একটু করে হাসতে লাগল। 'মেচোর সাথে মেলায় যাব ?' মাথা নেড়ে মাসিকে শুধোল সে।

'হুঁ', হাত ঘুরিয়ে ভুরু নাচিয়ে মাসি বোঝায় কেবল ডুগডুগি—কত বাঁশি খেলনা মেলায় আসবে। কত জামা কাপড়ের দোকান। জিলিপি সন্দেশ রসগোল্লা বিস্কুট লজেনস—কী না পাবি মেলায়—নাগব-দোলায় চড়বি সার্কাস দেখবি। ঘুরে ঘুবে মেসো তোকে সব দেখাবে। মেলা থেকে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না।'

হি-হি। দাঁত বের করে গণেশ হাসল। 'তোমাল জন্য ছন্দেশ লজন্ আনব।'

'আনবি। ওঠ, রাত হয়েছে, খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়বি—ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই মেলা।'

রাত্রে গণেশ দুবার জাগল। ঘরের পিছনের জঙ্গলে একবার শেয়াল ডাকল। আর একবার বিকট শব্দ করে একটা হুতোম ডাকল। অন্যদিন হুতোমের ডাক শুনে ভয়ে কাই হয়ে বিছানার সঙ্গে লেপটে থাকে সে। কানে আঙুল গুঁজে রাখে শব্দটা যাতে শুনতে না হয়। আজ সে মোটেই ভয় পেল না। অন্ধকারে জেগে কালীতলার মেলা দেখতে লাগল। চোখের সামনে অগুনতি বাঁশি খেলনা ডগডগির ছবি।

ভোরবেলা, তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, পুকুরপাড়ের নিমগাছে বসে চোখ-গেল পাখিটা ডাকল। একটু ফরসা হতে উঠোনের আমগাছে বৌ-কথা-কও পাখিটা দু-তিনবার ডেকে উড়ে গেল। তারপর রোদ উঠে গেল। গণেশ গুড়-মুড়ি খেয়ে নেয়। একটা ধোয়া জামা, তা-ও জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া মাসি তাকে পরিয়ে দেয়। চা মুড়ি খেয়ে মেসো রিকসা ডাকতে ছুটল। গণেশ দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করে। ক্রিক্ শব্দ করে একটা মাছরাঙ্গা ঘোষবাবুদের পুকুর থেকে ছোঁ মেরে ঠোঁটে করে একটা চকচকে সাদা মাছ তুলে শিরীষ গাছের ডগায় বসল। অন্যদিন গণেশ পাখিটাকে কিল দেখায়—মাব্ব তোকে, চেঁচিয়ে বলে। চুরি করে আর একজনের পুকুরের মাছ খায় দেখলে কার না রাগ হয়। আজ গণেশ একটুও রাগ করল না। ফিক করে একবার কেবল হাসল। আজ কোনও পাখির দিকেই তার তেমন নজর নেই। ঝিঙে ফুলের রং রোদ পেয়ে উচ্ছে বনধুতরোর ঝোপের মাথায় ফড়িং প্রজাপতির ঝাঁক এত নাচানাচি করছিল—সেদিকেও গণেশের নজর নেই। কেবল রাস্তা দেখছে। মেসো কখন রিক্‌সা নিয়ে আসে।

ঠুনঠুন্ শব্দ করে দু চাকার গাড়িটা কাঁঠালতলায় এসে দাঁড়ায়। একগাল হেসে গণেশ উঠে দাঁড়ায়।

পাঁজা করে তুলে মাসি তাকে রিক্সায় বসিয়ে দেয়। মেসো তার পাশে বসে। ঠুনঠুন করে গাড়িটা চলে যায়।

তারপর রিক্সা কোন রাস্তা ছেড়ে কোন রাস্তা ধরল। রিক্সা থেকে নেমে গণেশের মেসো গণেশকে নিয়ে কখন বাসে চাপল—বাস থেকেই বা তারা কোথায় নামল, মাসি ঘর থেকে কিছুই দেখল না, জানল না।

তখন ঠিক দুপুর। রোদ চড়চড় করছে। উঠোনে একরত্তি ছায়া নেই। ঘর ছাইবার টিন কিনে একটা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে মেসো ফিরল। ঘেমেটেমে একাকার। কিন্তু মুখে হাসি।

'কাঁদাকাটা করছিল ছোঁড়া।' উঠোনে নেমে মাসি শুধোল।

'আরে ধেৎ। কাঁদাকাটা করবে কী। নস্করের গাড়ি বাড়ি বাগান দেখে তোমার বোনপো মহাখুশি।' মাথার ওপর আমপাতার ঝোপের মধ্যে দুটো বুলবুলি বসে আছে। গাড়োয়ানের সঙ্গে ধরাধবি করে মেসো গাড়ি থেকে টিন নামায়! এমন সময় বাতাসে রেশমি সুতোর বুনট তুলে চিকন মিষ্টি গলাব পাখিটা ডাকল। কুটুম আয় কুটুম আয়। কাঁঠালের ডালে এসে বসেছে ইষ্টিকুটুম। আজ আর অন্ধ বিপিন উঠোনে এসে দাঁড়ায় না। অন্যদিন পাখিটা দুবার তিনবার ডেকেই তক্ষুনি আবার উড়ে চলে যায়। আজ নড়ছিল না। মাসির দাওয়ার দিকে চেয়ে আছে। একটু পরে আবার ডাকল ঃ কুটুম আয়। এদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মেসো বলল, 'তোমার গণেশকে খুঁজছে ইষ্টিকুটুম।' মাসি হাসে না। বড় করে শ্বাস ফেলল একটা। 'মিছে কী। আপন বোনের ছেলে। ওর চেয়ে বড় কুটুম আমার আর আছে কে!'

একটু থেমে থেকে মাসি আবার বলল, 'সারাদিন ছেলেটা দাওয়ায় বসে থাকত।' আজ ওকে দেখতে না পেয়ে পাখিটার প্রাণে কষ্ট হচ্ছে।'

গণেশের মেসো আর শব্দ করল না। গণেশ তখন বড়বাজারের একটা গলির ভিতর গুদোমের মতো গুমগুমে অন্ধকার ঘরের মেঝেয় চুপ করে বসে আছে। বাঁশি খেলনা ডুগডুগি খাবারের দোকান জামা-কাপড়ের দোকান, নাগর-দোলা মাসি যেমন বলছিল—মেলার কিছুই এখানে দেখছিল না। দেখল তার মতো আরও পাঁচ-ছটা বাচ্চা ছেলে, দুটো বড় ছেলেও রয়েছে—ওধারের দেয়াল ঘেঁষে মাটিতে বসে আছে। গণেশকে দেখছিল সব। একটা মেয়েও আছে।

গণেশ প্রথম বুঝতে পারে না ওদের হাত-পা ভেঙ্গে আঁতুর করে রাখা হয়েছে। ভাবল তার মতো ওরাও সারা বছর অসুখে ভোগে। তাই এমন শুকনো জিরজিরে হাত পা পেট কোমর। মেয়েটা যে কানা, গণেশের বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভাঙ্গা চড়ুইয়ের ডিমের মতো ওর বাঁ-চোখের ডিমটা গলে গিয়ে সামনের দিকে ঝুলছে। এত পচাগলা চোখ গণেশ আর দেখেনি।

'এই, তুই কেন এলি রে?' সবচেয়ে রোগা ছেলেটা শালিকের ছানার মতো চিচি গলায় গণেশকে শাসাল ঃ 'তোকে মার লাগাব।'

'আমাদের উটির ভাগ বসাতে এসেছিস খচ্চর।' একটা ছেলে গণেশকে ভেংচি কাটল।

আর একটা ছেলে তার নুলো হাত দেখিয়ে গণেশকে বলল, 'এক ঘুষি মেরে তোর নাকটা ফাটিয়ে দেব শালা। পালা এখান থেকে।'

এবার মেয়েটা কথা বলে। হাত নেড়ে গণেশকে শাসায় ঃ 'এই এদিকে তাকিয়ে আছিস কেন। তোর ঢেপ্সা হলদে চোখ লস্কর সাঁড়াশি দিয়ে টেনে তুলবে। তারপর মুচড়ে মুচড়ে হাত পা ভাঙ্গবে। তখন মজা টের পাবি।

গণেশ ভয় পায়। কান্নাও পেল তার খুব। মেলার কথা ভুলে গেল। এ সে কোথায় এল। মস্ত উঁচু অন্ধকার চালটা চোখ তুলে দেখল। আলো নেই, বাতাস নেই, গাছ নেই, পাখি ডাকে না। তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কাঁদতে গিয়ে কাঁদতে পারে না। ভয়ে কান্নাটা গিলে রাখে। এই মোটা ভুঁড়ি ও

পাকানো গোঁফ নিয়ে একটি লোক লাঠি হাতে দোরের কাছে বসে আছে। কটমট করে তাকে দেখছে।

চোখ নামিয়ে রাখল সে। তার মনে পড়ল এখন দুপুর, পুকুর পাড়ের নিমগাছে তক্ষকটা ডাকছে। এখানকার চেয়ে তক্ষকের ডাক ভাল। ভাবল সে। ভয় কম।

দেশ শারদীয় ১৩৮৮

ঘ র ন্তী

বিমল মিত্র

এ-গল্পটা হয়তো না লিখতে হলেই আমি খুশি হতাম। কিন্তু লেখক-জীবনের শুরু থেকেই ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া নিজের সুখ-অসুখের প্রশ্ন তো এখানে ওঠেই না, কারণ মিসেস চৌধুরীর বিশেষ অনুরোধেই এ-টা লেখা। তবু তিনি গল্পটা আমাকে যে-ভাবে শেষ করতে বলেছিলেন সে-ভাবে শেষ আমি করতে পারব না বলে দুঃখিত। তিনি যেখানেই থাকুন, এ-গল্প যদি পড়েন, যেন আমায় ক্ষমা করেন।

সেদিনের সেই ঘটনার পর মিসেস চৌধুরী যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানে না। জানি না এই বই তাঁর হাতে পড়বে কি না। তবু যদিই তাঁর নজরে পড়ে, তাঁর অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি—লাবণ্য ভাল আছে, লাবণ্যব একটি ছেলে হয়েছে, লাবণ্য নাম রেখেছে...

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

মিসেস চৌধুরীর হয়তো মনে নেই সব কথা। কিন্তু আমার আছে।

রাত তখন প্রায় বারোটা। লাবণ্যর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শেষে আমার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। বৃদ্ধা না হোন, মিসেস চৌধুরীকে যুবতী বলা চলে না। তবু ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে উগ্র সেন্টের গন্ধে ঘর ভরে গিয়েছিল। রুজ-মাখা গাল আর লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের ওপর যেন কে হঠাৎ কালি লেপে দিয়েছে।

বললেন—একটা ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি—তোমাকে একটা গল্প লিখতে হবে বিমল—

বললাম—ব্যাপার কী? কী হল?

—তুমি কথা দাও লিখবে? তুমি অনেককে নিয়ে লিখেছ, এ-ও তোমারই সাবজেক্ট—

—খুলে বলুন—কী ব্যাপার?

মিসেস চৌধুরী বললেন—লাবণ্যকে নিয়ে তোমায় একটা গল্প লিখতেই হবে—

—লাবণ্য কে?

—বলব তোমাকে সব, কিন্তু আগে কথা দাও—লিখবে ?

অগত্যা কথা দিতেই হল।

মিসেস চৌধুরী বললেন—যত বদনাম শুধু আমাদেরই বেলায়, কিন্তু তবু তোমাকে বলি, আমাদের আর যা-ই দোষ থাক, চরিত্রহীন নই। আমার বাড়িতে যারা আসে, আমি যাদের কাছে যাই—তারা কেউ আমাকে সতী সাবিত্রী বলে না জানুক, আমাকে শ্রদ্ধা করে সবাই। অন্তত সমাজকে আমি ঠকিয়েছি এ-কথা কেউ বলবে না। আমার কাছে সরল সোজা কথা। ফেল কড়ি মাখ তেল। কেউ বলতে পারবে

না আমার ঘরে এসে কাউকে পুলিশের হেফাজতে পড়তে হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কি কিছু জানে না? জানে বৈকি! সব জানে। আমার কিসের কারবার, আমার পেট চলে কিসে—সবই জানে। কিন্তু তবু বলে না কেন? তুমি তো দেখেছ আমার বাড়ির পাশেই পুলিশের থানা—তাদের নাকের ওপরেই তো আমার কারবার চলছে—তবু কিছু বলে না কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর মিসেস চৌধুরী অবশ্য আশা করেন না। তাই, আমিও চুপ করে রইলাম।

কথা বলতে বলতে মিসেস চৌধুরীর আধপাকা চুলের খোঁপা খুলে পড়ল। দু'হাতে সেটাকে সামলে নিয়ে আবার বললেন—এই রাত্তির বেলা তোমার ঘরে বসেই বলছি, আমায় কেউ কুলত্যাগিনী বলে জানে, কেউ বা বলে আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে—আমি সব জানি, সব স্বীকার করি, তোমাদের কাছেও আমি নিজেকে সতী-সাবিত্রী বলে বড়াই করি না, আমি যা আমি তাই-ই। আমার সুটকেস-এর মধ্যে যেদিন মিস্টার চৌধুরী এক প্রেমপত্র আবিষ্কার করলেন—সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করিনি—তা ছাড়া তোমরা তো জানো, এক গ্লাস বিয়ার খেলে কী-রকম ভুল বকতে শুরু করি,—

কথা বলতে বলতে যেন হাঁফাতে লাগলেন।

বললেন—তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, বরাবর জানো নিশ্চয়ই সন্ধেবেলা তিন কাপ চা খেয়ে তবে আমার নেশা কাটে, আজ সত্যি বলছি তোমায়, এক-কাপ চা-ও জোটেনি কপালে—

মিসেস চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝবে এ কী অমানুষিক ঘটনা।

তারপর লজ্জা ত্যাগ করে বললেন— তোমার চাকরকে একবার জাগাও চা করুক—

সত্যি মনে হল মিসেস চৌধুরী এক নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন যেন। সে-আঘাতে নেশার খোরাক পেতেও ভুলে গেছেন তিনি—এমনি কঠোর তার যন্ত্রণা। নইলে মিসেস চৌধুরীর মতো মেয়েমানুষ এই রাত্রে নিজের ব্যবসা ছেড়ে আমার বাড়িতেই বা আসবেন কেন। অথচ সে-আঘাত প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও যেন তাঁর নেই। দুর্বল অক্ষম আক্রোশে তিনি যেন ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছেন। আমিই বুঝি এখন তাঁর একমাত্র অস্ত্র। গল্প লিখে আমিই একমাত্র তাঁর প্রতিকার করতে পারি যেন।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু লাবণ্য কে আপনার?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলেন মিসেস চৌধুরী। বললেন —আমার কেউ না। আসলে আমার নিজের বলতে কে আর আছে বলো। আরও যেমন দশজন ছেলেমেয়ে আসে আমার বাড়িতে—লাবণ্যও তেমনি। এদের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক! কত মারোয়াড়ি, ভাটিয়া, গুজরাটি, বাঙালি আসে—মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, কেউ একঘণ্টা কেউ দু'ঘণ্টা, কেউ তিন ঘণ্টা, কেউ বা সারা রাত ঘর ভাড়া করে—তিনখানা ফারনিশ্ড্ ঘর আমার, ভাড়া নেয়—আবার কাজ ফুরোলে চলে যায়, লাবণ্যও ওদের মতো একজন—আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কিসের?

লাবণ্যর সঙ্গে যদি কোনও সম্পর্কই নেই, তবে তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা, তাকে নিয়ে এই গল্প লেখানোর প্রচেষ্টা কেন, বোঝা গেল না।

মিসেস চৌধুরী বললেন—কিন্তু তা বলে কি তোমরা আমায় অর্থপিশাচ বলবে? এই যে তোমরা আমার ঘরে যাও, নিজের পয়সা খরচ করে খাও-দাও, স্ফূর্তি করো, কখনও ঘর-ভাড়া চেয়েছি? ছোটবেলায় এককালে কবিতা লিখেছি, তাই তোমাদের সঙ্গে মিশি, কিন্তু এ-লাইনে এসে আর ও-সব হল না,—না হোক, সকলের সব জিনিস হয় না, ওই বাড়িভাড়া থেকে যে ক'টা টাকা আসে, তাইতেই আমার শেষজীবনটা একরকম কাটিয়ে দেব—

মিসেস চৌধুরীকে যারা জানে তারা বুঝতে পারবে ও তাঁর বিনয়ের কথা। যেমন তেমন করে কাটিয়ে দেবার মতো জীবন তাঁর নয়। এ ক'বছরে অনেক টাকা তিনি কামিয়েছেন।

একটু থেমে বললেন—ফুলচাঁদকে তুমি দেখেছ?

বললাম—দেখেছি—

—তার মতন অত বড়লোক, যে এককথায় দশহাজার টাকা বার করে দিতে পারে সে-ও যখন প্রথমে ওই লাবণ্যর জন্যে আটশো টাকা খরচ করবে বলেছিল, আমি রাজি হইনি—আমি যত বড় ব্যবসাদার মেয়েমানুষই হই না কেন, এককালে তো আমিও ঘরের বউ ছিলাম, রোজ সকালে স্নান করে তুলসীতলায় জল দিয়ে আমিও তো প্রণাম করেছি—আমিও তো ছেলেমেয়ের মা ছিলাম—আজ না-হয় তোমরা আমায় দেখছ অন্যরকম, এখন পাকা চুলে কলপ মাখি, তোবড়ানো গালে রুজ মাখি—

হঠাৎ মিসেস চৌধুরীর মুখে এ-কথা শুনে কেমন যেন অবাক লাগল।

বললেন—যাক গে, এ-সব কথা—আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে—তুমি আমার ওখানে চলো—সব গল্পটা তোমায় বলব—

—এখন? এত রাত্রে?

—তাতে কী হয়েছে?

শেষ পর্যন্ত সে-রাত্রে আমি অবশ্য মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাইনি। অনেক রাত পর্যন্ত মিসেস চৌধুরীই সমস্ত গল্পটা আমায় বলেছিলেন। গল্প যখন শেষ হল তখন রাত প্রায় তিনটে।

চলে যাবার সময় আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলেন—লক্ষ্মীটি, এটা তোমায় লিখতেই হবে—তবে ওই শেষকালটা শুধু বদলে দিও—যেমন ভাবে বললাম ওইভাবে শেষ কোরো—কেমন?

তারপর ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে বলেছিলেন—তাহলে কাল বিকেলবেলা আমার ওখানে যাচ্ছ তো?

পরের দিন ঠিক সময়ে গিয়েছিলাম মিসেস চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু দেখা তাঁর পাইনি। দরজায় তালা দেওয়া। শুনেছিলাম—মিসেস চৌধুরী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কোথায়, কেউ জানে না।

তাঁর সঙ্গে সে-ই আমার শেষ দেখা।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পর্ক সেখানেই শেষ হয়নি। অনেক গল্পের সূচনায়—যখন কী নিয়ে লিখব ভেবেছি—তখন মিসেস চৌধুরীর গল্পটার কথাও মনে হয়েছে বার বার। মনে হয়েছে—নিরঞ্জন আর লাবণ্যর গল্পটা লিখেই ফেলি। যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন তেমনি করেই না হয় শেষ করি। মিসেস চৌধুরী যেখানেই থাকুন এ-গল্প তাঁর হাতে পড়তেও পাবে। একদিন আমাকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন—সে-স্নেহ সে-ভালবাসার কিছুটা অন্তত তা হলে পরিশোধ হয়।

কিন্তু মন সায় দেয়নি।

ট্রামে বাসে সিনেমায় সংসারে সর্বত্র লাবণ্যকে খুঁজে ফিরেছে আমার মন। সন্ধেবেলা চৌরঙ্গির ধারে গালে সস্তা পাউডার আলতা মাখা ঠোঁট দেখে অনেকবার চমকে উঠেছি। ভেবেছি—এই-ই বোধ হয় মিসেস চৌধুরীর লাবণ্য। লাবণ্যর জীবন হয়তো এইখানে এসেই থেমেছে। আবার কখনও কোনও নতুন পরিচিত পরিবারের শান্ত সান্ধ্য পরিবেষ্টনীতে—পুত্র-কন্যার আনন্দ পরিবেশে—গৃহিণীর দিকে চোখ আমার অপলক হয়ে গেছে—এই-ই কি লাবণ্য? হয়তো নিরঞ্জনের উদার প্রেমের প্রাচুর্যে সে-লাবণ্য এখন মহীয়সী হয়ে উঠছে। কিন্তু তবু আমার অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা মেটেনি কোথাও। মিসেস চৌধুরীর কল্পিত পরিণতির সঙ্গে, লাবণ্যর বাস্তব জীবনের পরিণতির যেন কোথাও অসঙ্গতি ছিল। আমার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কোনদিন তার কোনও সমাধান খুঁজে পাইনি।

তা নিরঞ্জনের মতো পুরুষকে তো আজও দেখি সকালবেলা বাসে চড়ে অফিসে যেতে। টেনে বুনে একশো টাকাই না হয় মাইনে পাক। টুইলের শার্ট—আর মিলের কাপড়। এক কথায় মোটা ভাত

মোটা কাপড়। একটা পেট—একশো টাকায় একরকম করে চলে যায় বৈকি। আর লাবণ্য?

মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—লাবণ্যও ছিল ওই নিরঞ্জনের মতো সাদাসিধে—পঞ্চান্ন টাকা মাইনে আর পঞ্চাশ টাকা ডিয়ারনেস্—

তা সত্যি। আমিও ভাবি, ও-মাইনেতে ওর চেয়ে বিলাসিতা কী করে করা যায়। বিশেষ করে মেসের খরচ, বাসভাড়া, টিফিন। তারপর দু-একদিন কি সিনেমাতেও যেত না?

কেমন করে ওদের আলাপ হল কে জানে। গ্রহচক্রের কোনও ষড়যন্ত্রের ফলে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন—তারপর ওদের আর ছাড়াছাড়ি হল না কেন, তাই বা কে জানে! ওদের নিয়ে একদিন গল্প লেখাতে হবে এ-ধারণা থাকলে মিসেস চৌধুরীই সে কথা নিশ্চয়ই জেনে রাখতেন। কিন্তু আর যা-ই হোক, পছন্দের বাহবা দিতে হবে বটে নিরঞ্জনের।

মিসেস চৌধুরী বলেন—লাবণ্য রোগা হলে কী হবে—ওর গালের তিলটার জন্যে সকলের ওকেই খুব পছন্দ হত—

তা লাবণ্যকে আমিও কল্পনা করে নিতে পারি বৈকি। মিসেস চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে অনেক সময় বাসের ট্রামের মেয়েদের মিলিয়েও নিই। যেন মনে হয়—এক লাবণ্য আজ একশ' লাবণ্য হয়ে সারা কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর লিণ্ডসে স্ট্রিটের মোড়ের ওপর ছেলে আর-একটি মেয়েকে একসঙ্গে যেতে দেখলে—কেমন যেন মনে হয় ওরা সেই নিরঞ্জন আর লাবণ্য। অফিসের ছুটির পর ওরা আজ চলেছে মিসেস চৌধুরীর ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের বাড়িটার দিকে। মাসের প্রথম দিক। পাঁচ টাকা দিয়ে এক ঘণ্টার জন্য একটা ঘর ভাড়া করে ওরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসবে—ঘনিষ্ঠ হবে—একান্ত হবে—।

এক একদিন পেছন পেছন অনুসরণও করেছি ওদের। তবে কী মিসেস চৌধুরী আবার ব্যবসা শুরু করেছেন। সেই আগেকার মতন! সাহেব, মেম, মোটর, দোকান-পত্তর পেরিয়ে সামনে নিরঞ্জন আর লাবণ্য পাশাপাশি চলেছে। গায়ে টুইলের শার্ট। পায়ে মোটা কাবলি জুতো। পাশে গিয়ে দেখা যায়—নিখুঁত করে দাড়ি কামিয়েছে আজ। আর তারই পাশে লাবণ্য। নতুন কেনা স্কার্ট শাড়িটা পরেছে আজ। কানের দুল কেনবার পয়সাও নেই ওর। গলায় পরেছে ঝুটো মুক্তোর নেকলেস। একটু তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পাশ থেকে ভাল করে দেখতে লাগলাম। রাস্তার জনস্রোতের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে না ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। ওদের নিয়ে গল্প লিখতে হবে—ভাল করে দেখা চাই। মিসেস চৌধুরীর বর্ণনার সঙ্গে আজও এদের কোনও অমিল নেই যেন। লাবণ্যর পায়ের চটিটার পর্যন্ত যেন কোনও পরিবর্তন হয়নি। এত বছর পরেও কী সেই চটিটাই পরছে। নিরঞ্জনও কী দশ বছর আগের সেই টুইলের শার্টটাও বদলায়নি আজ পর্যন্ত।

সেই বিকেলের আলো-ছায়ায় মধ্যে জনবহুল রাস্তার স্রোতে মিসেস চৌধুরীর কাছে শোনা নিরঞ্জন আর লাবণ্য যেন আবার রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে হাজির হল আমার সামনে।

নিরঞ্জন বলছে—এ শাড়িটা পরে তোমায় খুব ভাল দেখাচ্ছে কিন্তু—

—কত দাম নিল এর?

আরও পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুনতে লাগলাম ওদের কথা।

নিরঞ্জন বলছে—দাম এখনও দিইনি, চেনা-শোনা দোকান—মাসে মাসে দু'টাকা করে দিলেই চলবে।

লাবণ্য বললে—কিন্তু কেন কিনতে গেলে শাড়িটা, তোমার জুতোটা তো বহুদিন ধরে ছিঁড়ে গেছে—জুতো একজোড়া কিনলে হয় তোমার—

নিরঞ্জন বলে—আসছে মাসে চাকরিটা পাকা হলে কিনব—তার আগে নয়—

লাবণ্য বলে—কিন্তু এখন থেকে কিছু টাকা তো জমানোও আমাদের দরকার—তা' না হলে

আর কতদিন মিসেস চৌধুরীর ঘর ভাড়া নিয়ে চলবে—গত মাসে দু'দিনের ভাড়া এখনও বাকি আছে যে।

নিরঞ্জনের মুখটা দেখতে পাই এবার ভাল করে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের ভবিষ্যৎ-হীন দিন-যাপনের ক্লান্তির ফাঁকে ফাঁকে যেন কোথাও এক টুকরো আশা উঁকি মারে। লাবণ্য আর সে বাড়ি ভাড়া করবে একটা। একটা স্বাধীন দু'ঘর-ওয়ালা ফ্ল্যাট। তিরিশ কিংবা চল্লিশ এমন কী পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবে। তারপর যদি ভবিষ্যতে কোনওদিন সুদিন আসে, সেদিন...

নিরঞ্জন চলতে চলতে হঠাৎ বললে—একটা ভাল বাড়ির সন্ধান পেয়েছি—জানো—

লাবণ্য চমকে ওঠে— কত ভাড়া?

—ভাড়া বেশি নয়, পঞ্চাশ—কিন্তু—

—সেলামি চায় বুঝি?

সেলামি ছাড়া বাড়ি পাওয়া কি সম্ভব নয়? চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়! চেষ্টা কী আর নিরঞ্জন কম করেছে? আজ দু'বছর ধরে পরিচয় হয়েছে।

অনেকদিন থেকেই চেষ্টা চলছে। একটা বাড়ি পেলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাহলে এমন করে আর মিসেস চৌধুরীর ঘর ভাড়ার জন্যে টাকা নষ্ট করতে হয় না। মাসে এখানে চার দিন এলেই তো চার-পাঁচে কুড়ি টাকা চলে গেল। এক-এক মাসে পাঁচদিন ছ'দিনও এসেছে। তবে মিসেস চৌধুরী লোক ভাল। ব্যবহার ভাল তাঁর। হাতে নগদ টাকা না থাকলে বাকিতেও চলে। তা'ছাড়া ক' ঘণ্টাই বা থাকে তারা। বাস-ট্রাম বন্ধ হবার আগেই বেবিয়ে আসতে হয়। তারপর আবার কতদিন পবে দেখা হবে! চলতে চলতে লাবণ্যর হাতটা ধরে নিরঞ্জন।

ওদের কথা শুনতে শুনতে আমিও যেন এগিয়ে চলি। হঠাৎ মানুষেব ভিড় আর দোকানপত্রের সার পেরিয়ে কখন নিরঞ্জন আর লাবণ্য কোথায় হারিয়ে যায়। একলা একলা মিসেস চৌধুরীর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। হঠাৎ যেন স্বপ্নও ভেঙে যায়! সেই পরিচিত বাড়িটার সামনের ঘরে একদল সাহেব মেম সেজেগুজে বসে আছে, ভেতর থেকে পিয়ানোর শব্দ আসছে। মিসেস চৌধুরীর বাড়ির সেই নেপালি দারোয়ানটা আর সেলাম করলে না আগেকার মতো!

মিসেস চৌধুরী বলতেন—টালিগঞ্জ থেকে বাসন্তী আসত, চেতলা থেকে আসত কল্যাণী, বেহালা থেকে আসত টগর—কিন্তু এক-একদিন এক-একজনের সঙ্গে—চৌরঙ্গির রাস্তা থেকে যাকে পেত ধরে আনত—কিন্তু লাবণ্য? বারবর নিরঞ্জনকে দেখেছি সঙ্গে—নিরঞ্জনের যখন চাকরি ছিল না, ও-ই লাবণ্যই তিন মাস মেসের খরচ জুগিয়েছে ওর।

ঘর-ভাড়া হয়তো শহরে আরও অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এমন রুচি আর শালীনতা পাবে না। বাইরে থেকে বোঝবার কিছু উপায় নেই। সামনে অর্কিড আর মর্নিং গ্লোরি দিয়ে ঘেরা। পেছনের দরজা দিয়ে সোজা চলে যাও ভেতরে। কোনাকোনি তিনটে ঘর। পর্দা ঠেলে ঘরের ভেতর যেতে হবে। একটা ঘরে ইংলিশ খাট, একটা ড্রেসিং আয়না আর দুটো চেয়ার—আসবাব বলতে এই। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। ব্যবস্থা পুরোদস্তুর বিলিতি। এখানে টাকা খরচ করেও তো আরাম।

মনে আছে হঠাৎ মিসেস চৌধুরী তাস খেলতে খেলতে উঠে পড়লেন একদিন।

জর্জেটটা সামলে নিয়ে বললেন—দেখি, ওদিকে গোলমাল কিসের—আমায় তাস দিয়ো না ভাই—

বাইরে থেকে যেন খানিকটা বচসার শব্দ কানে এল।

তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে ডেকে উঠল মিসেস চৌধুরীর অ্যালসেসিয়ানটা।

খানিক পরে মিসেস চৌধুরী ঘরে ঢুকে পাখার রেগুলেটারটা বাড়িয়ে দিলেন।

বললাম—ব্যাপার কী?

—আর বলো কেন, শেঠজি এসছিল। ফুলচাঁদ শেঠ। মদে চুর। একেবারে—একদিন বারণ করে দিয়েছি—তবু—

নির্বিকারভাবে আবার তাস খেলতে লাগলেন—নো বিড্—থ্রি ডায়মণ্ডস্—

সেদিন অনেকদিন পরে সেই ফুলচাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, লম্বাচওড়া একটা মোটর হঠাৎ সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। দেখি ফুলচাঁদ। কে বলবে চল্লিশ বছর বয়েস। নিজেই ড্রাইভ করছে।

মুখ বাড়িয়ে হেসে বললেন—কী খবর স্যার?

আমিও আশা করছিলাম কিছু খবর পাব। কিন্তু ফুলচাঁদই প্রশ্ন করলে—মিসেস চৌধুরীব খবর কিছু জানেন স্যার?

ফুলচাঁদ শেঠের ভাবনা নেই। হয় এ-পাড়ায় নয় ও-পাড়ায়—যেখানে হোক আড্ডা ও খুঁজে নেবেই। মিসেস চৌধুরী না থাক—মিসেস সরকার আছে! নার্সিং হোম আছে। কত কী আছে কলকাতা শহরে। ছোকরা বয়েস। দিন-দিন যেন বয়েস কমছে ফুলচাঁদের। তিনটে আসল আর দুটো ভেজাল ভেজিটেবল্ ঘি-এর কারবার। গাড়িটা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু সেদিনই সত্যি সত্যি বসলাম কলমটা নিয়ে। এবার লিখতেই হবে। মিসেস চৌধুরী যেমনভাবে শেষ করতে বলেছিলেন—সেইভাবেই শেষ করব না-হয়।

প্রথমেই লিখলাম—নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে সাপ্লাই অফিসের একতলার সিঁড়ির সামনে। লাবণ্যর অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। একে একে নামতে শুরু করেছে সবাই।

লাবণ্যও চমকে উঠেছে কম না। বললে—এ কী, তুমি?

নিরঞ্জন বললে—তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ তো কথা ছিল না তোমার আসবার—

—তা হোক, তবু এলাম—মিসেস চৌধুরীর বাড়ি যাব—আজ বড় যেতে ইচ্ছে করছে—

—কিন্তু টাকা? টাকা এনেছ? আমার তো হাত খালি, শুধু বাস-ভাড়াটা—

—সে এক-রকম বলে কয়ে ব্যবস্থা করা যাবে, আজ যেতেই হবে তোমায়—জানো লাবণ্য আমার চাকরিটা চলে গেছে—

—সে কী?

মিসেস চৌধুরী শুনেছেন সে-সব কথা। তিনি জানতেন লাবণ্যর সে কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস। ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়া বন্ধ হল লাবণ্যর সেই দিন থেকে। শুরু হল সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে চড়া। টিফিন বন্ধ। এক-একদিন নিজের জলখাবারটা রুমালে করে বেঁধে নিয়ে ভাগ করে খেয়েছে মিসেস চৌধুরীর ঘরে দরজা বন্ধ করে। চুলে তেল পড়তে লাগল এক-দিন-অন্তর। স্নো ফুরিয়ে গেলে আর কেনা হল না।

মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—ওদের জন্যে দিলাম কনসেসন করে—আমার ঘরের ভাড়ার রেট পাঁচ টাকা বরাবর—ওদের জন্যে ঠিক হল তিন টাকা—তা-ও সব সময় নগদ দিতে পারত না—বাকি পড়ত—

কিন্তু ওদিকে টালিগঞ্জের বাসন্তীর তখন গায়ে ঢাকাই শাড়ি উঠেছে। চেতলার কল্যাণী নতুন এক ছড়া হার গড়াল। বেহালার টগরও ব্রঞ্জের চুড়ি ভেঙে গিনি সোনার কঙ্কণ গড়িয়েছে। বাজার গরম বেশ।

সে-বাজারে মিসেস চৌধুরীই বা ছাড়বেন কেন? ঘর-ভাড়া পাঁচ টাকা থেকে বেড়ে দশ টাকা হল। তাতেও খালি পড়ে থাকে না। খদ্দের এসে ফিরে যায় বাইরে থেকে। মিসেস চৌধুরীর টেলিফোন সারা দিন রাত এনগেজড্ থাকে।

মনে আছে একদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি।

দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া করে মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আড্ডা দেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে—নতুন বইটা ওকে এক কপি উপহার দেব। তারপর ওঁরই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে শোনাব জায়গায় জায়গায়। মিসেস চৌধুরী সাহিত্যিক না হোন, সাহিত্য-রসিক। ওঁকে বই দিয়ে আমরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতাম। কিন্তু দূর থেকে দেখি, বাড়ির সামনে ভীষণ ভিড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে গোল হয়ে ফুটপাথের ওপর লোক জমা হয়েছে। কয়েকটা পুলিশও সেখানে দাঁড়িয়ে। মনে হল—নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল, কোনও কেলেঙ্কারি বেধেছে। এবারে মিসেস চৌধুরীব আর নিস্তার নেই। আমাদের আড্ডা ভাঙল বুঝি।

যাব কি যাব না ভাবছি। শেষকালে আমরাও কী জড়িয়ে পড়ব।

কথাটা ভাবতেই কেমন লজ্জা হল। ছি-ছি। আমরা কী বিপদের দিনে ওঁকে এমনি করেই ফেলে পালাব। সেই দিন সত্যি প্রথম উপলব্ধি হল—মিসেস চৌধুরী কতখানি একলা। পৃথিবীতে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার পর সারা জীবন একজন অভিভাবকের প্রয়োজন কেন এত অপরিহার্য।

মিসেস চৌধুরী, আপনি যেখানেই থাকুন, আজ অকপটে স্বীকার করছি—সেদিন আপনার জন্যে আমার মায়া হয়েছিল সত্যি।

যাক্ সে কথা। আপনার বাড়িতে গিয়েই আমি বলেছিলাম—আজ বড় ভয় পেয়েছিলাম—

আপনি তখন সালোয়ার পায়জামা পরে কৌচে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জিজ্ঞেস কবেছিলেন—কেন?

কিন্তু উদ্বেগের লেশমাত্র ছায়াও আপনার মুখে ছিল না।

আমি বললাম—বাড়ির সামনে ভিড় দেখে ভাবলাম বুঝি পুলিশের হ্যাঙ্গাম, কিন্তু—

পুলিশের নাম শুনে আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবাব কৌচে হেলান দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কিন্তু কী?

—কিন্তু দেখলাম ফুটপাথের ওপর বাঁদর নাচ হচ্ছে—

আপনি হেসে বলেছিলেন—না, সে সব ভয় নেই, পুলিশ আমার কিছু করবে না—তবে ভয় ফুলচাঁদকে নিয়ে—

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন, ফুলচাঁদ আপনার কী করতে পারে?

আপনি বলেছিলেন—না, আমার আর সে কী করবে? ফুলচাঁদ আমার চেয়ে বড়লোক হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার টিকি বাঁধা—কিন্তু ভয় অন্য ব্যাপারে—

—অন্য কী ব্যাপার?

—ভয় লাবণ্যর জন্যে—বলে আপনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন আমি জিজ্ঞেস করিনি—কে লাবণ্য। কী তার পরিচয়।

আপনার হয়তো মনে নেই আপনি নিজের মনেই যেন বলেছিলেন—লাবণ্যকে ফুলচাঁদ বহুদিন থেকে চাইছে—দু'শো পর্যন্ত খরচ করতে রাজি—আমিই রাজি হইনি—শেষে কোন্ দিন না—

মনে আছে এবারে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—লাবণ্য কে ?

আপনি সে-প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনি তেমনি কৌচে হেলান দিয়েই বলেছিলেন—ফুলচাঁদ যদি বাসন্তীকে চাইত আপত্তি করতাম না—কল্যাণীকে চাইলেও চলত—টগরের বেলাতেও কিছু বলবার ছিল না—আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোনে আনিয়ে নিতাম—কিন্তু তা বলে লাবণ্য? ছি-ছি—

লাবণ্যকে আপনি কেন অতখানি সম্মান করতেন তা সেদিন কিছুটা যেন বুঝেছিলাম, আর কিছুটা যেন বুঝতে চেষ্টাই করিনি। সেদিন মিসেস চৌধুরীই কী জানতেন, তাঁর সেই লাবণ্যকে নিয়েই

লেখানোর জন্যে একদিন রাত বারোটার সময় আমার বাড়িতেই আসতে হবে।

হয়তো মিসেস চৌধুরী নিজের জীবনে যা হারিয়েছিলেন, তা ফিরে পেয়েছিলেন লাবণ্যর মধ্যে। হয়তো সেই জন্যেই ফুলচাঁদের হাতে লাবণ্যকে তুলে দিয়ে নিজেকেই অপমান করতে চাননি! কে জানে!

তাই ফুলচাঁদের প্রস্তাবের উত্তরে মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন—দু'শো কেন—পাঁচ শো টাকা দিলেও লাবণ্যকে পাবে না—ওর দিকে তুমি নজর দিও না ফুলচাঁদ—

কিন্তু ফুলচাঁদকে আপনি চিনতে পারেননি। ফুলচাঁদ শেঠ জাত ব্যবসাদার। সাত পুরুষের ব্যবসাদার। কখন কিনতে হবে, কখন বেচতে হবে—তা সে জানে। সেও তাই ধাপে ধাপে উঠেছে। পাঁচ শো'তে রাজি না হয় সাতশো। সাতশো'তে রাজি না হয় আটশো—আটশো'তে রাজি না হয়—

আজও যেন চেষ্টা করলে দেখতে পারি—

দেখতে পারি—তেতলার থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছে নিরঞ্জন! পাশে লাবণ্য!

লাবণ্য যেন খুশিতে উচ্ছল—। বললে—দেখেছ, একটু মাটি নেই কোথাও বাড়িটাতে—

নিরঞ্জন বুঝতে পারলে না। বললে—কেন, মাটি দিয়ে কী হবে?

—একটা তুলসীগাছ পুঁততাম—হিন্দু গেরস্থের বাড়িতে তুলসীগাছ রাখতে হয় যে—

নিরঞ্জন বললে—তা সে একটা টবে পুঁতলেই চলবে—এই রান্নাঘরের পাশে—

—কিন্তু শোবার-ঘর কোন্‌টা করবে?

—দক্ষিণের ঘরটাই তো ভাল সবচেয়ে, জানলা খুললে আকাশ দেখা যায়—

—একটা খাট কিন্তু কিনতে হবে আমাদের—

নিরঞ্জন হেসে উঠল— সবুর করো, সবে তো চাকরি হল—আস্তে আস্তে হবে সব—আগে বাড়িটাই হোক—

বাড়ির মালিক বললেন—আমার এক কথা—ভাড়া চল্লিশ টাকা—যা সবাই দিচ্ছে আপনারাও তাই দেবেন—কিন্তু—

কিন্তু কী?

মালিক এবার আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন—ব্যবসায় আমার অনেক লোকসান গেছে এদানি—এখন ওই বাড়ি ভাড়াতেই সংসার চলছে একরকম, তা সেলামি কিছু দিতে হবে আপনাদের—

নিরঞ্জন দমে গেল। লাবণ্যও ফিরে আসছিল। এমন ঘটনা প্রথম নয়। আগে জানতে পারলে—

তবু নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে—কত?

যেন কম-সম হলে দিতে তৈরি সে।

মালিক বললেন—বেশি না, আর সব টেনেন্ট যা দিয়েছেন, তা-ই দেবেন— তার এক পয়সা বেশি নেব না—আমার কাছে সবাই সমান—

সাম্যবাদীর মতন পরম নিস্পৃহ ভঙ্গি করলেন তিনি।

—তবু কত?

—পুরোপুরিই দেবেন—ভাঙা-ভাঙতি ভালবাসি না আমি—

তবু দুর্বোধ্য হচ্ছেন দেখে দয়া করে খুলে বললেন—হাজারের কম আমি নিইনে—

ফুলচাঁদও সেদিন সেই কথাই বললে—আটশো'তে রাজি না হয় হাজার—

সংখ্যাটা পুরোপুরি হলে যেন অন্য রকম শোনায়। কিন্তু নিজের কানকে আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন মিসেস চৌধুরী। তাই হয়তো দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেননি। তবু কিন্তু আপনাকে ব্যস্ত হতে দেখা গেল না। আপনি তেমনি নির্বিকারভাবে টফি চুষতে লাগলেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক তখনই কী লাবণ্য আর নিরঞ্জনকে সামনে দিয়ে যেতে হয়। রাত তখন

সাড়ে ন'টা। চটি ফটাস্-ফটাস্ করতে করতে চলেছে লাবণ্য। সারা দিন অফিসের খাটনির পর বাড়ি ফিরতে পারলে সে বাঁচে। আপনার মনে হল—ও তো লাবণ্য নয়। আপনার ভাষাতেই বলি—আপনার মনে হল—ও তো লাবণ্য নয়, ও যেন আপনার বিগতজীবন, আপনার পরিশুদ্ধ আত্মা আপনাকে ব্যঙ্গ করে আপনার দিকেই পেছন ফিরে যেন চলে যাচ্ছে। আর ফিরে আসবে না কোনওদিন।

আপনি সেখানে বসেই নেপালি দারোয়ানকে ডাকলেন—জঙ্গী।

জঙ্গী তিন লাফে এসে য়্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে স্যালিউট্ করার পর আপনি বললেন—লাবণ্যকে ডেকে দে তো—

লাবণ্য এল।

আপনি আপনার আত্মার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। এবং সেই বোধ হয় প্রথম আর শেষবার।

তারপর তাকে আড়ালে নিয়ে এসে ফুলচাঁদের প্রস্তাবটা জানালেন। আপনার মনে হল পৃথিবীর প্রচ্ছদপটে আজ পর্যন্ত যত মানুষের পদছায়া পড়েছে, সেই কোটি কোটি সংখ্যাহীন জনসমুদ্রের তরঙ্গ যদি আবার উদ্বেলিত হয় তো হোক। নক্ষত্র-নীল আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক আবার কক্ষচ্যুত কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যদি দিগ্‌ভ্রান্ত হয় তো হোক। তবু আপনার আত্মা অচল অটল থাকবে ! লাবণ্য কিন্তু সমস্ত শুনে মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর যেন দাঁতে দাঁত চেপে বললে—ওকে একবার জিজ্ঞেস করি মাসিমা—

মর্নিং গ্লোরির আড়ালে অন্ধকারে একলা অপেক্ষা করছিল নিরঞ্জন। লাবণ্য সেখানে গেল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কী যেন পরামর্শ হল দু'জনে। দূর থেকে কিছু শোনা গেল না। তবু আভাসে বোঝা গেল—একজন বুঝি বোঝাতে চাইছে আর একজন যেন কিছুতেই বুঝতে চাইছে না।

এক সময়ে লাবণ্য এল। আপনার সামনে এসে মাথা নিচু করে বললে—আমি রাজি—

কথাটা বোধ হয় লাবণ্য একটু আস্তেই বলেছিল, কিন্তু আপনি দেখতে পেলেন—ঘরের ভেতর ফুলচাঁদ সে কথা শুনে নতুন ধরানো সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আর—আপনি যে আপনি—আপনারও মনে হল বারান্দায় চেইনে-বাঁধা অ্যালসেসিয়ানটা যেন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল।

বললাম—তারপর ?

মিসেস চৌধুরীর পাকা চুলের খোঁপাটা আবার একবার খুলে গেল। এবার সেটাকে আর সামলাবার চেষ্টা করলেন না। বললেন—তারপর ? সেই প্রথম, সেই শেষ। আর আসেনি তারা আমার বাড়িতে—ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের লোকেরা আর কোনওদিন সে রাস্তায় হাঁটতে দেখেনি নিরঞ্জন আর লাবণ্যকে। জিজ্ঞেস করলাম—তবে কোথায় গেল তারা—

মিসেসে চৌধুরী বললেন—আমিও তাই ভাবতুম—কোথায় গেল তারা। মনে হত—সেও বোধহয় অন্য মেয়েদের পর্যায়ে নেমে এসেছে—টালিগঞ্জের বাসন্তীকে জিজ্ঞেস করেছি, চেতলার কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করেছি—বেহালার টগরকে জিজ্ঞেস করেছি—তারা এখনও আসে কিন্তু বলতে পারে না কোথায় গেছে তারা—এমন কী ফুলচাঁদও না—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—তবে হয়তো ওই ঘটনার পর নিরঞ্জন ত্যাগ করেছে তাকে—

—তাও ভেবেছি অনেকবার।হয়তো অবিশ্বাসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নিরঞ্জন—আর ওদিকে আত্মধিক্কারে হয়তো আত্মহত্যা করেছে লাবণ্য। নিজের আত্মাকে আমি নিজের হাতে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পেরেছি জেনে মনে মনে খুব খুশিই হয়েছিলাম—সত্যি বলছি—খুবই খুশি হয়েছিলাম। মিস্টার চৌধুরী যেদিন বিয়ের পর আমার সুটকেসের মধ্যে একটা প্রেম-পত্র আবিষ্কার করে আমায় ত্যাগ করেছিলেন, তারপর জীবনে এই প্রথম এমন খুশি হতে পারা— সে যে কী আনন্দ। সে আনন্দে

সেদিন বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে তিন কাপের বদলে তিন-ত্রিক্‌কে-ন' কাপ চা-ই খেয়ে ফেললাম—

মিসেস চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তিনি কথা বলছেন আর চোখ বেয়ে জল পড়ে তাঁর গালের রুজ ঠোঁটের লিপস্টিক চোখের সুর্মা সব ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা তাঁর আগে কখনও দেখিনি। কী যে করব বুঝতে পারলাম না।

তারপর মিসেস চৌধুরী হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বার করলেন।

আমার দিকে সেখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন—তারপর এতদিন পরে আজ সকাল বেলা এই চিঠি— চিঠি পড়ে আমি তো অবাক—

দেখলাম নিরঞ্জন আর লাবণ্যর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। পনেরোর সি কালী সরকার রোড, তেরো নম্বর স্যুট। আজকের তারিখ।

আমি মিসেস চৌধুরীর দিকে নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে চাইতেই তিনি বললেন—এখন সেখান থেকেই আসছি—

বললাম—কী দেখলেন ?

—দেখলাম বিয়েতে যেমন হয় তেমনিই, লাবণ্য সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে, পরেছে চন্দনের ফোঁটা। নিরঞ্জনের গায়েও গরদের পাঞ্জাবি, মাথায় টোপর। হঠাৎ কোথা থেকে সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে পড়েছে, এতদিন কোথায় ছিল তারা সব কে জানে ! আজ হঠাৎ ওদের শুভকাঙ্ক্ষীর আর আশীর্বাদকের অভাব নেই। বাড়িটাও ভাল, রান্নাঘরের পাশে একটা টবে তুলসীগাছ প্রতিষ্ঠা করেছে, শোবার ঘরে একটা খাট, দক্ষিণ দিকের জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়—আয়োজনও করেছে প্রচুর—কিন্তু ভাল করে লক্ষ করে দেখলাম—ফুলচাঁদের স্পর্শের কলঙ্ক কোথাও নেই এতটুকু—চন্দনের ফোঁটায় সব ঢেকে গেছে—কিন্তু আমার যেন কিছু ভাল লাগল না—আমি জলস্পর্শ না করে সোজা চলে এলাম বাইরে, তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সমস্ত কলকাতাটা টো টো ক'রে ঘুরে এখন এই রাত বারোটার সময় তোমার এখানে—

গল্প বলতে বলতে মিসেস চৌধুরী কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এলেন। মনে হল এখনই যেন তিনি নিবে যাবেন—

বললাম—তা হোক, তবু নিরঞ্জনের উদারতা আছে বলতে হবে—

মিসেস চৌধুরী দপ্‌ করে উঠলেন—তা থাকগে উদারতা, কিন্তু গল্পে তুমি ওদের বিয়ে দিতে পারবে না—শেষটুকু তোমায় বদলাতেই হবে—

কেন ?

মিসেস চৌধুরী দম নিয়ে বলতে লাগলেন—হ্যাঁ, আগাগোড়া সব ঠিক রেখে শেষকালটাতে বদলে দেবে—বিয়ে ওদের কিছুতেই দিতে পারবে না তোমার গল্পে—ওর আত্মায় ঘুণ ধরেছে যে—আমি মিসেস চৌধুরী তার সাক্ষী—

বললাম—কিন্তু আত্মা তো মরে না—

—নিশ্চয় মরে, আলবৎ মরে, আমার আত্মা মরেছে—লাবণ্যর মরেছে—বাসন্তী, কল্যাণী, টগর সকলের মরেছে—আর তা ছাড়া যদি বিয়ে দিতেই হয় তো দু'দিন বাদেই ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিও—তারপর ধাপে ধাপে লাবণ্যকে কল্যাণী, বাসন্তী আর টগরের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে, আর তারপর একদিন জীবনের শেষ অঙ্কে দেখাবে—লাবণ্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে আমার মতন . . . পারবে না করতে ? লক্ষ্মীটি, শেষটুকু ট্রাজেডি করে দিও—'

আবার জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কেন ?

—ধরে নাও আমার শখ—আর কিছু নয়, একদিন আমাকে যদি তুমি ভালবেসে থাকো, আমিও যদি তোমার কোনদিন কোনও উপকারে এসে থাকি তো আমার এ অনুরোধটা রেখো ভাই—আব তা

তা ছাড়া "অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর"—এ কথাটা মানো তো ?

অতীতের সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে আর লাভ নেই আজ। তবু বলতে পারি, দশ বছর ধরে এ-গল্পটা লেখবার জন্যে আমাব চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের কাছে কতবার গল্প করেছি—কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করেনি। কিন্তু মানুষেব সংসারে চোখের সামনে জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধেব এত পরিবর্তন দেখেছি। এত অভাবনীয় বিস্ময়েব পরিসমাপ্তি ঘটেছে এত সহজ স্বাভাবিকভাবে যে, তা বলা যায় না। তবু সাহিত্যের কারবারে এসে দেখছি আজও জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণাই থাক, সাহিত্যে আমরা আজও তো ফরমূলা মেনেই চলি। তাই সধবা কিরণময়ীকে শেষ পর্যন্ত পাগল কবতে হয়—বিধবা বমাকে কাশী পাঠাতে হয় আমাদের। তাই—বিশ্বাস করুন মিসেস চৌধুরী—তাই আপনার অনুরোধ মতোই গল্পটা শেষ করব ভেবেছিলাম। লাবণ্যকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়ে দিতে পারলে আমিও আপনার মতোই খুশি হতাম। তাতে গল্পটা 'অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর' এই সাধারণ প্রবাদ-বাক্যটারও একটা উদাহরণস্থল হয়ে থাকত। জীবনে না হোক— সাহিত্যে অন্তত তাই-ই ঘটে।

সেই জন্যেই তো বলেছিলাম যে, গল্পটা না লিখতে হলেই আমি খুশি হতাম !

কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেসে চৌধুবী, আমি আপনাব সম্পূর্ণ অনুবোধটা রাখতে পারলাম না।

কেন পারলাম না—তারও একটা কারণ আছে বৈকি।

সেই কাবণটাই বলি। লজ্জায় ঘৃণায় ধিক্কারে আমার মাথা নিচু হয়ে এলেও আমাকে তা বলতেই হবে !

সেদিন কলকাতার বাইরে সি-পি-র একটা কোলিয়ারি অঞ্চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। একটা লাইব্রেরির উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতি পদের ভার নিয়ে।

সভা হল।

সভার শেষে ভিড় পাতলা হবার পর জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল ওয়েল-ফেয়ার অফিসার মিস্টার মজুমদারেব বাড়ি।

স্বামী-স্ত্রীর দু'জনেই ভারী অতিথিপরায়ণ। ছোট্ট বাঙলো। চারিদিকে বাগান করেছেন। ঘরটাও বেশ সাজানো। বেশ বোঝা গেল—গৃহের সর্বত্র গৃহিণীর একটি সুনিপুণ কল্যাণ হস্তের স্পর্শ লেগে আছে। চা পরিবেশন করতে লাগলেন মিসেস মজুমদার।

মিস্টার মজুমদার বললেন—মিসেস মজুমদার আপনার একজন ভক্ত, জানেন না বোধ হয়—ওই দেখুন আপনার সব ক'টা বই-ই কিনেছেন—

মিসেস মজুমদার সলজ্জভাবে হাসতে লাগলেন। সত্যিই পাশের আলমারিতে অন্যান্য বই-এর সঙ্গে আমার বই ক'টা রয়েছে দেখে নিয়েছি আগেই।

মিস্টার মজুমদার আবার বললেন—এখানকার মহিলা-সমিতিটা ওঁরই তৈরি—আর আজকে যে-লাইব্রেরির উদ্বোধন হল এ-ও ওঁর চেষ্টায় বলতে পারেন—সভাপতি হিসেবে আপনার নাম তো উনিই প্রথম সাজেস্ট করেন—

নিজের প্রশংসায় মিসেস মজুমদার যেন বড় লজ্জিত হচ্ছেন বলে মনে হল।

হয়তো তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পড়ল। হঠাৎ চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকল একটি পাঁচ ছ বছরের ছেলে। সুন্দর দেহশ্রী। ছেলেটিকে চিনতে পারলাম। সভায় এই ছেলেটিই আমার গলায় মালা পরিয়েছিল। ছেলেটি ঘরে ঢুকে মা'র কোলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। বললাম—এটি আপনাব ছেলে বুঝি—কী নাম তোমার খোকা ?

কাছে ডাকলাম তাকে।

ছেলেটি বিশুদ্ধ বাঙলায় বললে—নীলাব্জ মজুমদার—

—নীলাব্জ ! বড় সুন্দর নাম দিয়েছেন তো—

মিস্টার মজুমদার এবারও স্ত্রীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে হেসে বললেন—এ নামও ওঁরই দেওয়া, ও নাম দেওয়ার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য আছে জানেন, আমাদের দু'জনের নামের প্রথম দুটো অক্ষর নিয়ে—ওর নাম হয়েছে নীলাব্জ—

ওদের দু'জনের নাম জিজ্ঞেস করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে কিনা ভাবছি।

মিস্টার মজুমদার নিজেই আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন—আমার নাম নিরঞ্জন, আব ওব নাম লাবণ্য কিনা—তাই থেকে নীলাব্জ—কিন্তু আপনি আর একটা সিঙাড়া নিন—কী আর একটা সন্দেশ. . .

আমি কিন্তু ততক্ষণ নির্বাক হয়ে দেখছি। দেখছি মিসেস মজুমদারকে। এতক্ষণে তো নজবে পড়েনি। তাঁর চিবুকের ওপবে ডান দিকে একটা কালো তিল জ্বল জ্বল কবছে।

রানীসাহেবা

নিম অন্নপূর্ণা

কমলকুমার মজুমদার

যূথী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ পাখিটির ঘোরাফেরা দেখছিল, এ সময় তার হাত-দুটি অদ্ভুতভাবে উঁচু করা ছিল, একারণ, যে-ফ্রকটি তার পরনে ছিল সেটিতে একটিও বোতাম নেই এবং বোতামের জায়গা থেকে সোজা শেব পর্যন্ত ছিঁড়ে দু-হাট খোলা, ফলে বেচারিকে সর্বক্ষণই সাধারণভাবে চলাফেরার সময় তার আপনকার হাত দুটিকে উঁচু করে রাখতেই হয়, এতে করে মনে হয় তার ভারী আনন্দ হয়েছে—সে খুশি, অন্যথা অর্থাৎ যদি ভুল হয়, যদি সে হাত নামায়, ঝটিতি ফ্রকটি গা বেয়ে ঝরে পড়ে, খুলে পড়ে, তখন সে, যূথী সখেদ একটি 'আরে' বলে, পুনরায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জোর পটুত্বের সঙ্গে, ফ্রকটি আপনার কাঁধে তুলে দিয়ে থাকে।

সম্মুখের টিয়া কেমন ঘাড় বাঁকায়, সম্মুখের টিয়া কেমন পক্ষবিস্তার করে—কেমনে পক্ষবিস্তার করত লাল ঠোঁটদ্বারা কী যেন বা পাখাতেই খোঁজে, এসবই তার নজরে পড়েছিল। কখনও বা টিয়াপাখিটি তেতো বিরক্তির সঙ্গে এক পাহাড় ছোলা থেকে শুধুমাত্র একটি তুলে ছাড়িয়ে ফেলে, খোসাটি মাটিতে পড়ে, যূথী তা লক্ষ করেছিল এবং সে, তখনই, একটি ঢোক গিলে আর আর দিকে দেখেছিল। এবার, আবার তার সামনে, সবুজ পাখি সাদা দেওয়াল, অতি মনোহর এক দৃশ্য রচিত হয়েছে—তবুও যূথীর চক্ষুদ্বয় দুর্বৃত্ত এবং সে মরিয়া হয়েই, কোনক্রমে, পাখির বাটিতে আঘাত করে, ফলে দাঁড়টিতে দোলা লাগল, আর সেই সঙ্গেই দুচারটি ছোলাও ছিটকে পড়েছিল, সত্বর তৎপর ছোলাগুলি তুলতে গিয়ে ফ্রকটি তার খুলে যায়, ছোলাগুলি তুলে মুখে পুরেই তবে সে ফ্রকটি ঠিক করে, এখন সে দাঁড়ের কাছে এল, এক হাত দ্বারা অন্য হাতের কাঁধের কাছের জামার অংশটি ধরে, ডান হাতখানি জামায় মুছে মুছে আপনাকে প্রস্তুত করছিল, বোধহয় হাতে ঘাম জমেছিল, একথা প্রকাশ থাকে যে জামার একদা রঙিন অদ্য ম্লান ফুলগুলি মুছড়ে মুষড়ে গিয়েছিল। আর পাখিটি ভারী

অস্থির, পাখিটি ভারী তেরছা, নিজের দেহেতেই যেন বড় বেশি করে জোট পাকিয়ে গিয়েছে। অবশ্য সে পাখিটি একবারও আওয়াজ করেনি।

এসময়, যূথী একটু ভাবুক হয়েছিল। অন্যমনস্ক হয়েছিল, ভেবেছিল। ভেবেছিল—সে যদি পাখি হত—কেননা সে শুনেছে কোনও কোনও ময়রা দোকানের ঝাঁপ খুলেই রাস্তায় নামে, হাতে এক চ্যাংয়ারি খাবার, তাতে জিলিপি আছেই কচুরি নিমকি আর আর কী সব আছে, ময়রা 'চিলো চিলো' বলে চিৎকার করে, এবং তাব ঘটিয়াল ভুঁড়িখানি নসরপসর, আকাশ চিলে চিলময়—আকাশটা যেমত বা গাড়ির আড্ডা—ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়াব মতো চিলগুলো চিঁহিঁ চিঁহিঁ করে উঠে, তদনন্তর খাবাবগুলি সে, ময়রা, ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় আর বলতে থাকে, 'আমরা বাসি খাবার বেচি না, কাউকে দিইও না', এখানে অনেক ভিখারির ছেলেবা দাঁড়িয়ে, কেউ মার কোলে, সকালের সৌখিন রোদ এদেব পাশ কাটিয়ে রাস্তায় ইতস্তত, এরা যেমন বা আচারের শিশি থেকে বার হয়ে এসেছে, তারা মযরার মহানুভবতা দেখে, হাতখানি প্রসারিত করে চিলের খাওয়া দেখে ! —এই সূত্রে যূথীর, 'ভিখারি' কথাটা মনে পড়তেই, মুখখানি সিঁটিয়ে উঠেছিল, কেননা সে শুনেছে অনেক পাপ, সাতজন্ম পাপ কবলেই ভিখাবি হয়, ছেলেমানুষ যূথী একথা স্মরণেই ছোট একটা নমস্কারও করেছিল, অর্থ এই যে, তার অতি বড় শত্রুরও যেন এমন দশা না হয়। নমস্কার যেমন সে করেছিল, তেমন সে বোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, চিলকে দেখলে তার বড় ভয়, সে চিল হতে চায় না, কেননা চিল যদি হয়, তাহলে হয়তো চিলই তার ভয়ঙ্কর ঠোঁট দিয়ে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। এইটুকু ভাববার পর, সে আর বেশি সময় নেয়নি, একাবণে যে বেশি দেরি করলে, এ বাড়ির লোক— নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

ইদানীং পাখিটি কিয়ৎপবিমাণে শান্ত, তার ঠিক কিছু নীচে যূথীর জ্বলজ্বলে মুখখানি, ছেঁড়া লাল পাড় দিয়ে বেড়া-বেণী করা, চোখদুটি পিঙ্গল, এলেবেলে, হিঙ্গুল, মারাত্মক, মুখের ছোলাগুলি একান্তে ঠেলে দিয়ে, মাথাটা তার কী যেন লক্ষ করবার জন্য আনচান করছিল, পরক্ষণেই সে হাতটা তিন তিনবার কপালে আর বুকে ঠুকেই ধাঁ করে দাঁড়টায় যেই না ঠেলা দিতে গেল, পাখিটা তৎক্ষণাৎ তার লাল ঠোঁট দিয়ে যূথীর আঙুলে কামড়ে ধরেছে।

ছেলেমানুষ যূথীর চিৎকারে এই বাড়িখানি যেন বা 'শ্রীমধুসূদন' বলে উঠেছিল, পাখিটা এখনও যূথীর আঙুল ছাড়েনি, দাঁড় নড়ছে, এবং কয়েকটি ছোলা যূথীর মাথা এবং গা বেয়ে ঝরে পড়ে। কোনক্রমে, ভাগ্যক্রমে সে আপনার হাতখানি ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিল।

যূথী বোকার মতোই আঙুলটির দিকে চেয়েছিল, কেননা, আঙুল বেয়ে খরধার রক্ত পড়ে, আর যে কোনও কিছু করার মতো দক্ষতা তার নেই। এবাড়ির বৌটি বয়েসে নবীনা, সদ্যস্নাত মুখমণ্ডল, ব্লাউজটি পরা, সবেমাত্র সায়াটি পরে পরনের ভিজে গামছাখানি একহাতে খানিক টেনে যখন বার করছে তৎক্ষণাৎ এই ভয়াবহ চিৎকার তাকে বিদ্রাবিত করে, এবং পরক্ষণেই এই আতঙ্ককারী দৃশ্যে সে বক্ষোহীনা স্পন্দন-রহিত, ফলে সায়া থেকে উঠা লাল গামছাখানি তার হাতে তেমনি সম্বদ্ধ ছিল, সুন্দর খঞ্জন নয়নযুগল—স্ফীত, স্বপ্নহীন, ভীত, শক্ত, উজ্জ্বল, রগছোঁয়া, ভ্রূদ্বয়ে বিদ্যুৎ ইঙ্গিত, দেহ বয়সোচিত ধর্ম্মে উষ্ণ, এখন, এতদ্দর্শনে আগুনগরম সুতরাং আপনার আলুলায়িত কেশরাশি—যা সিক্ত—তার ঘাড়ে সপ্‌সপে্‌ হিম সঞ্চার করে, তাই তার রোমহর্ষ হয়। এবং এ তরুণ মুখখানি কক্ষের আঁধার থেকে সকালের তীব্র আলোয় ক্ষণেকের জন্য এসেই পুনশ্চ কক্ষে ফিরে যায়।

যূথীর পালাবার কোনও পথ ছিল না। ভয়ে, বিশেষত যন্ত্রণায় এবং কিয়ৎ-পরিমাণে লজ্জায় তার আনন পিঙ্গল, চক্ষুদ্বয় জলে কালো, মুখখানি পার্শ্ববর্তী শূন্যতায় আটকে জমে আড়ষ্ট এমত মনে হয়, আর যে, সে বিবিধ সুকৌশল ভঙ্গি সহকারে তা খুলে আনবার প্রাণান্ত চেষ্টা করে এবং ঠিক এই সময় ডান হাতের আঙুলটি চেপে ধরবার উচিতবুদ্ধি তার হয়েছিল, এতে করে গায়ের জামাটি, খুব আশ্চর্য যে, মাত্র এক পাশেই খুলে পড়েছিল। এবং যন্ত্রণায় আর একবার সে চিৎকার করেছিল ! এই

হৃদয়বিদারক শব্দে পরিচ্ছন্ন, শুভ্র, লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত বাড়িখানি বিড়ালের চোখের মতো বড় হয়ে গিয়েছিল এবং তন্নিমিত্ত এ গৃহস্থিত চিনিপাতা জীবন মুহূর্তকালের জন্য পাশার অক্ষের মতো নিষ্পেষিত শব্দ করে উঠে।

দ্বিতীয় চিৎকারে এবাড়ির বিধবা গিন্নি খেতু মিত্তিরের মা ছুটে আসবার চেষ্টা করেছিলেন, কেননা তাঁর ভিজে কাপড়— ভিজে কাপড়েই তাঁকে অনেক শুদ্ধ কাজ করতে হয়—মুখে তাঁর, এ সময়োচিত অষ্টোত্তর শত নাম—'বিদুর রাখিল নাম কাঙাল ঈশ্বর' পদে এসে থেমেই, 'কী হল কী হল' বাক্য, ভিজে কাপড়ে এখনও কিছু ব্যস্ততার শব্দ ছিল, এ কারণে যে সম্মুখবর্তী এ-দৃশ্যে কিরূপ ভঙ্গি যে করা উচিত তা ভাববার মতো তাঁর অবকাশ ছিল না, হয় তিনি বেশি করে আলো অথবা বেশি করে ঝাপসা কিছু দেখেছিলেন তাঁর দেহটি কেবলমাত্র কর্তব্যবশে সম্মুখে এবং শুচিবায়ুতার জন্য পিছনে দুলে গিয়েছিল, আর মুখে বারম্বার একই কথা ধ্বনিত হয়েছিল, 'ওমা কী সব্বনাশ গো, কী সব্বনাশ !' তাঁর স্বরের মধ্যে যথাযথ অসহায়তা ছিল। ইতঃমধ্যে নবীনা বৌটি কোনক্রমে এখানে এসেছিল, তখনও বাঁ হাতে সায়াটি আঁট করে ধরা, এবারে ঝটিতি গিঁট বেঁধেই যখন সে যূথীকে সাহায্য করতে যাবে তৎক্ষণাৎ থমকে গেল।

কেননা, খেতুর মা আপনার গায় গতর খেলিয়ে বলেছিলেন, 'বলি হ্যাঁগা, তুমি কী পাগল নাকি। বললে বড় অন্যায় হয়, সাধে কী তোমার ভাগাড়ে কোল. . . বলি চান করেছ না, ওকে ছুঁলে আবার কাপড় জুটবে. . . ?' ইত্যাকার বাক্যে বুঝা গেল খেতু মিত্তিরের মা খানিক নিশ্চিন্ত খানিক সম্ঝে উঠতে পেরেছিলেন, এবং আপন পুত্রবধূকে নিবারণ কবে এবার যূথীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'নে নে চোষ না হারামজাদি আঙুলটা, মরণ ! হ্যাঁরা কাটল কী করে ?'

যূথী চুপ, হয়তো তার মনে পড়েছিল যে, পাখিটা কথা বলতে পারে, ফলে আরও ভীত হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল , নবীনা বৌটি রক্তদর্শনে মুখখানিকে ঠেলে বাঁধা পুঁটলির মতো করেছিল, অজস্র চুলকে ঘাড় থেকে একটু হাটাবার জন্য মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'পাখি।'

'পাখি ! সাত সকালে কী অলুক্ষণে কান্ডরে বাবা' বলে খেতুর মা সাক্ষী-মানা কণ্ঠে বললেন, 'পাখি, আমার পাখির তো অমন স্বভাব নয়' এবং পাছে দোষ পড়ে— একথা নিশ্চয়ই স্মরণ করত পুনরায় বলেছিলেন, 'তুই সাত সকালে মরতে আমাদের বাড়ি ঢুকেছিলি কেন ?. . . . নে চোষ না আঙুলটা পোড়ারমুখী, আবার ধ্যানাপানা . . . নাও বৌমা, টক্ করে একটু চুন এনে দাও . . . '

বৌটি সত্বর চুন আনতে গেল।—যূথী, এখনও বুদ্ধিভ্রংশ, খেতুর মার কথায় খানিক হাঁ করে রক্তাক্ত আঙুলটি মুখে পুরবে কিনা ভাবতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ—এতাবৎ আপনার মুখে সযত্নে রক্ষিত ছোলাগুলি, যা সে মুখে পুরেই চিবোয়নি, একারণে যে চিবোলেই তো শেষ, তাই অতি কৃপণের মতোই মুখের একান্তে রেখেছিল এবং হাঁ করে আঙুল মুখে পুরবে, না মুখটা আঙুলের কাছেই নিয়ে যাবে এই বিষম দ্বিধায় অদ্ভুত হাস্যকর অবস্থা তার হয়েছিল—হঠাৎ ঠিক এই মুহূর্তে তার মুখনিঃসৃত ছোলা কটি পড়ে, গড়িয়ে, খেতুর মার জল-সাদা হাজাদষ্ট পায়ের নিকটে লেগেছিল। বেচারি যূথী ! উপরন্তু বেচারি যূথীর মুখ থেকে অল্প লালা তার নিজের হাতেই পড়েছিল এবং সে কম্পমানা !

অন্যপক্ষে, ছোলা পড়তেই, খেতুর মা ঝটিতি দু-এক পা সরে এসেছিলেন, মাটি থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি যূথীকে দেখে, রাগে রোষে আক্রোশে তাঁর গাত্রবস্ত্র যেমত বা শুষ্ক হয়েছিল , কী বলে যে গঞ্জনা শুরু করবেন তা সঠিকভাবে তাঁর ঠোঁটে গুছিয়ে নিতে পারছিলেন না, সহসা আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেল, 'ওমা মেয়ের কী নোলা গো ! . . . কোথা যাব গো. . . ' এসময় আপনার গণ্ডস্থলে তর্জনী ছিল, এর পরই দাঁতে দাঁত ঘষে বলতে লাগলেন, 'বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, এবার নিজের রক্ত পেট ভরে খাও. . . '

যে যূথী এতক্ষণে কাঁদেনি, হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার দরুণ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, তথাপি চোখ দুটি ভারী সজাগ ছিল, খেতুর মা আপনকার গা গতর ভিজে কাপড়ে ঘর্ষণ করত বললেন, 'একাঃ চড়ে তো.. দাঁত কপাটি ভেঙে দেব, আবার কাঁদনা হচ্ছে, ছ্যাঁচড়া আকুটে ভিকিরির মরণ ! পাখিটা তোর টুঁটি ছিঁড়লে আমি হরিনুট দিতুম.. হারামজাদি, ছোলাচুরি ! ফের যদি এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসবি তোঝেঁটিয়ে তোর খাল খেঁচে নেব... তাই বলি আমার পাখি কেষ্ট নাম ভেন্ন যে জানে না, সে কেন কামড়াবে... উঃ তো বাপ মা কি কিছু খেতে দেয় না... চোষ না রক্তটা !'

এমন সময় বৌটি একটি গোটা পানে খানিক চুন নিয়ে এসে দাঁড়াতেই, খেতুর মা সত্যিই ক্ষিপ্ত তিরিক্ষি হয়ে উঠে ছোট একটা লাফ দিয়ে উঠেছিলেন, বললেন, 'খুব যে দরদ দেখাতে এগিয়ে যাচ্ছিলে' বলেই, পরেই, হঠাৎ চুনসমেত পানটির দিকে নজর পড়তেই গায়ে যেন বিছুটি লাগল, খেঁকিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'তোমার কী কোনও আক্কেল নেই গা, বলি এই বাজারে একটা গোটা পান নষ্ট করলে, বলি.. আকালের কথা কী তোমার অজানা... না.. '

বৌটি তটস্থ, থ, জড়সড়, চকিতেই মেঝেতে পানটি বেখে দিলে, না পানটি হাত থেকে খসে মেজেতে পড়েছিল, তা বুঝা গেল না। রক্তের অজস্র ফোঁটার মধ্যে পানটি লক্ষ্য করেই খেতুর মা যূথীকে প্রচণ্ড কণ্ঠে বললেন, 'তোল বলছি, হাঁ কবে রইলি যে হারামজাদি !'

এবম্প্রকার বাক্যে বেচারি যূথীর প্রকৃতপক্ষে কী যে করা শোভনীয় তা সে নিজেই কিনারা কবতে পাবছিল না, সে একবার মেজের দিকে অন্যবার খেতুর মার দিকে আড়ে আড়ে চেয়েছিল। খেতুর মা এইটুকু বিলম্বেই অস্থির। মুহূর্তের মধ্যেই সকালের আলোকে বাঁকা চোখে দেখেন এবং নিমেষেই পান তাঁর নিজের হাতে তুলে, একবার মাত্র চুনসমেত পানটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই একথা ভেবেছিলেন যে তাকে এ কাজের পর আর একবাব স্নান করতে হবে, ভেবে পরক্ষণেই যূথীর বেড়া-বেণীটা হেঁচকাটানে নামিয়ে বেশ জবর মুঠো করে ধরার পরে পানটা তার কাছে এগিয়ে দিতে— সে, যূথী, অতি সহজভাবে সেটা নিয়ে নিজের আঙুলেব উপর চেপে ধরেছিল, এবং যুগপৎ আপনার দাঁত দ্বারা কাঁধের জামাটা কিঞ্চিৎ টান দিয়েছিল !

খেতুর মার ক্রোধ-উন্মত্ত বেণী আকর্ষণে যূথী বড় নিশ্চিত হয়, ঝাঁটা লাথি—এ সবে তার যেমন বা সকল কিছু বোধগম্য পরিষ্কার লাগে, সুতরাং এই সে চেয়েছিল, যেহেতু সে কোনমতেই দুই চোখে দুইদিকে দুভাবে আর দেখতে পাচ্ছিল না, এ ছাড়া এত আলো থেকেও সব কিছুতেই যেমন বা সন্ধ্যা, তাই যূথী ইত্যাকার নির্মম ব্যবহারেও অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল, এখন খেতুর মার সঙ্গে পা মিলিয়ে অক্লেশে চলতে পারবে। খেতুর মা আর কালবিলম্ব না করে তার চুলের মুঠি ধরে এক টান মেরেছিলেন !

খেতুর মা তাকে যখন নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পাখিটার পাশ দিয়েই তাঁদের যেতে হয়, ফলে, এ সময়ে যূথী খেতুর মার কাছে ঘেঁষে এসেছিল, এবং চোরা-গোপ্তা চাহনিতে পাখিটার প্রতি সে দেখে, পিতলের চক্চকে দাঁড়ের উপরে নিশিত তীব্র সাংঘাতিক রুক্ষ পা দুটি, আর তার ঠিক উপরেই পাখির সুডৌল উদর দেখা যায়,—শেষ রাতে চন্দ্রকিরণে প্রকাশমান শরৎকালীন মেঘ যেমন, হয়তো সবুজ কিম্বা পাণ্ডুর, কী নরম কী তুলতুলে ! সুওদর সুউমার—শুকউদর সুকুমার তথা কোমলতা, এরূপ যে প্রবচন, সেইটুকু প্রত্যক্ষের, দেখার মানসে মানুষ কী টিয়াপাখি পোষে !

যূথী আপনাকে নির্বিকারভাবে, খেতুর মার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। তাকে নিয়ে; রাস্তায় নেমে, এই পরিপ্রেক্ষিতহীন লাল গলিতে নেমেই, দুবার চিক্চিক্ করে থুতু ফেলে—মাথার কাপড়ে হাত দেবার কথা তাঁর মনেই হয়নি, একারণে যে গলি সুন্‌সান্—যূথীদের বাড়ির দরজার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। এবং দরজায় লাথি মারতেই দরজাটা আপনা থেকে খুলে গেল, এটা তিনি, খেতুর মা, আশা করেননি, ফলে দোমনা হয়ে ছেলেমানুষের মতো অহেতুক সর্দি টেনেছিলেন।

দরজা খোলার পর, ভিতরের ঝাপসা অন্ধকার কাটার পর দেখা গেল প্রীতিলতা।

প্রীতিলতা দেওয়ালে একটি পা ঠেস দিয়ে দণ্ডায়মান, হাতের আলগা মুঠোয় একগাদা, একথোকা চুল, যা অবহেলায় অনিয়মে মেহেদিপিঙ্গল, তবু সেখানে অন্ধকার ; সে জননী, তথাপি এ খেলা তার ভাল লাগে, অজস্র চুলে চুলে পাচনতুল্য গন্ধ, এ-হেন গন্ধে আপনাকে বড় পুরাতন বলে বোধ হয়, গায়ে ন্যাপথলির আর তোরঙ্গের মরিচার গন্ধে— মিলেমিশে—দিনগুলিকে যেমন বা সুদীর্ঘ করে, আর যে, তাকে, প্রীতিলতাকে, অযথাই, মন্দভাগ্যক্রমে, নিশ্চিহ্ন করেছে, বস্তুত সে নিজেকে খুঁজে না পেলেও, আপনাকে বুঝে না পেলেও অদ্য সে নিশ্বাস নেয়, আজও সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। ভেবেছে হায় আমার থেকে আমার ছায়া সুখী। সে চোখ ছোট করে দিনমান দেখে, সে চোখ সুতীক্ষ্ণ করত অন্ধকার দেখে!

খেতু মিস্তিরের মা প্রীতিলতাকে দেখে থমকেছিলেন, তারপর নিজের বেণীধৃতমুষ্টি দেখেই যেন বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ফিরে পেলেন, এবং অন্যহাতে ভিজে কাপড়ের খানিক দিয়ে ওষ্ঠদ্বয় আবৃত ছিল, এখন কথা বলার সময় মুখের কাপড় কিয়ৎ পরিমাণে সরানো হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'এই নাও বামুনের মেয়ে. . .' এই 'নাও' বাক্যের মধ্যে সত্যনিষ্টার গরব ছিল।

প্রীতিলতা, অল্প আয়াসেই মুখখানি বাঁকিয়ে তাদের দেখেছিল—ভাতে ব্যাঙ লাফিয়ে পড়লে চাষা যেমত লাফ দিয়ে উঠে— তেমন তেমন লাফ, তেমনই যেমন বা তার ভিতরে দিয়ে উঠল, কিন্তু দেহে কোনও সাড় দেখা গেল না, কেবলমাত্র হস্তধৃত চুলসমূহ, এ দৃশ্য দেখেই, সে চকিতে মুঠো ছেড়ে দিয়েছিল।

অন্যপক্ষে, খেতুর মা যূথীর বেণীও ছেড়ে দিয়েছিলেন, দিয়েই বললেন, 'তোমার মেয়ে কী বলব বাবা, বললে পেত্যয় যাবে না, সাত সকালে লোকে শুনলে বলবে খেতু মিস্তিরের মা কি লোক গা . . . ভদ্দরনোকের মেয়ে ঘেন্না পিত্তি নেই একেবারে ভিকিরির অদম গা. . পাখির ছোলা চুরি করতে গিয়ে কী কাণ্ড বাধালে . . . মুখ থেকে না পড়লে কী আমিই টের পেতুম . . .' এইটুকু বলেই খেতুর মা চারিদিকে চেয়েছিলেন, এ কারণে যে তাঁর মনে হয়েছিল, এখানে বারান্দায় কেউ নেই, আর যে—তিনি একাই বকে মরছেন, খেতুর মা আশা করেছিলেন এইটুকু বলতেই যূথীর মা যূথীকে আর আস্ত রাখবে না, কিন্তু কই ? ফলে তাঁর বড় অসম্ভব রাগ হয়, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং দৃঢ় হল, বলেছিলেন, 'বলি তোমার কী মনে হয় আমি মিথ্যে বলেচি. . .সংশাসনে না রাখলে মেয়ে কালে . . বাতাসি ছেনতাল হবে, ঝরঝরে হবে পরকালে . . . '

প্রীতিলতা, আশ্চর্য, মনোযোগসহকারে সকল কথাই শুনছিল, যেহেতু খেতুর মার গলায়, কথার টানের মধ্যে, লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ার ধাঁচ ছিল, মিল ছিল, বিশেষত যেখানে আছে, 'বন অধিষ্ঠাত্রী তুমি বনে বনে।' যেখানে, 'গৃহলক্ষ্মীরূপে তুমি সকলের ঘরে। দীনজনে রাজ্য পায় তব কৃপা বলে' সে, প্রীতিলতা, যেমত বা করযোড়ে যূথী-সংবাদ শুনছিল, কিন্তু তা হলেও এ কথা সত্য যে, 'ভিকিরি' কথা তাকে রক্তের প্রাচুর্য্য দিয়েছিল—চুরির কথাটা এ তুলনায় মাটির—আচম্বিতে প্রীতিলতার স্বল্পতোয়াসদৃশ দেহখানি রুষ্ট সাপের মতোই আলোড়িত হয়ে উঠে, আপনকার বরফ-দেওয়া চোখের দৃষ্টিকে, অমোঘভাবে ছোরা যেমন করে হাতে ধরে, তেমনি—সেইভাবে উদ্যত করে ধরেছিল। খেতুর মা কথা শেষ না করেই যেই তুড়ি দেওয়ার শব্দের মতো তাচ্ছিল্যভরে 'হ্যাঁ' আওয়াজ করেছেন, তদ্দণ্ডেই প্রীতিলতা 'ইঃ' ধ্বনি করে উঠে, আর ঠিক এ হেন সময় এক ঝাঁক জঙ্গি-বিমান উড়ে গিয়েছিল। এখানকার সকলেই এ বারান্দা প্রায়-ঢাকা-পাঁচিলের ওপরে, উপরে যে আকাশ, সেদিকে চাইল। তথাপি, প্রীতিলতা নিজেকে এখন, ইতঃমধ্যেই শাণ দেবার অবকাশ পেয়েছিল, সে মুখখানিতে ঈদৃশ ভঙ্গি করে যে যেমন মনে হয় সে কিছু খাচ্ছে অথবা তার জিহ্বা আঠায় জড়িয়ে গিয়েছে, এরপরই সে বিড়ালের মতো ফ্যাস্ করে উঠেছিল, বললে, 'নিজে যে বগলে সাবান দাও

বিধবা হয়ে, তা-বেলা কিছুটি হয় না. . . না ?' একবার নিজস্ব ভাষাটা অনুধাবন করেই পুনর্বার বললে, 'সে-বেলা কিছু হয় না'. . . এই সঙ্গে অঢেল শোনা ইংরাজি বলার জন্য—অবশ্য এ সকল শব্দ বাক্য নয়, গ্যাট ম্যাট হুট ফাট জাতীয় ইংরাজিআত্মক—তার জিহ্বা যারপরনাই কড়কে উঠল।

প্রীতিলতার ঘোর বাক্যস্রোতে খেতুর মার মুখাবৃত কাপড়ের অংশ ঝরে পড়ল, কোন দিকে যে অজস্র আলো তথা কোন দিকে যে দরজা তা বেচারি খেতুর মা, বুড়োমানুষ, ঠিক ঠিক ঠাওর করতে পারলেন না, অবশ্য অবশেষে তিনি অদৃশ্য হন। প্রীতিলতার কাছে খেতুর মার এই চিত্তভ্রমবশত হাঁকপাক বড় মজার মনে হয়েছিল এবং বেচারি এই প্রসঙ্গে হাসতে গিয়ে আপনকার বিবর্ণ, আর্ত বেদনাময় মুখখানিকে যন্ত্রণা দিয়েছিল ! তবু সে কাতর নয়, সে হেসেছিল, তার শতচ্ছিন্ন কাপড়ের আঁচল তুলতে গিয়ে মাকড়সার পায়ের দক্ষতায় তার আঙুলগুলি পুনরায় চুলগুলিকে সংগ্রহ করে, এবং সে প্রীতিলতা আপনকার অজস্র চুলের অঞ্জলিবদ্ধ অন্ধকারে মুখমণ্ডল ন্যস্ত করত বর-দেখা হাসি হাসল !

যূথী নিজের ব্যথাটাকে বড় করবার চেষ্টা করে তার মাকে হাতখানি দেখাচ্ছিল, তবু চুলের আঁধার এবং তার উপব ঘোরদর্শন রাত্রে বিদ্যুৎরেখাতুল্য হাসি, তাকে, যূথীকে, অনেকের কথা স্মরণ করিয়েছিল, যথা বাবা কোথায়, যথা লতি কই ? নিশ্চয়ই সে তাদেব আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, কেননা সে এক আপৎকালের সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সহসা, পলকেই তাব মাথায় যেমত বা বাত্যাপ্রবাহ খেলে গেল, আর যে, সে কেবলমাত্র এক পা পিছনে সরে, ভীতত্রস্তস্বরে আঃ আঃ করে বলেছিল, 'তোমার পায়ে পড়ি আর করব না আ . . করব না' এবং তার অল্পবুদ্ধিতে রক্তাক্ত হাতটি ঈষৎ উঁচু করে দেখিয়ে মার, প্রীতিলতার, দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা করুণা ভিক্ষা করতে চেয়েছিল এ কারণ প্রীতিলতা—সূক্ষ্ম, বিবশ, যদিও বিশীর্ণা যদিচ বহুদিবস হাভাতে তথাপি ইদানীং সরোষিত তীব্র ভয়ঙ্কর ফণা তুলে আসছিল—অজস্র ছেঁড়া-মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তাব অঙ্গাংশ সকল লাল—মলিন ছিন্ন কাপড়ে ধরা-পড়া একটি ঝড় !

যূথীর গলায় আর কোনও স্বর ছিল না, মুখমণ্ডল ভয়ে কালসিটে, তবু এটুকু ব্যবধান মধ্যে সে একটিমাত্র চোরা ঢোক গিলেছিল, যেহেতু প্রীতিলতা আর বেশি এগিয়ে আসতে পারেনি, যেহেতু গায়ে গতরে, তার নিজেরই, কোনও ক্ষমতা ছিল না, যেহেতু সে, প্রীতিলতা, যে যূথীর মুখে না-পাওয়ার দুর্দৈব তৎসহ না-মাজা বাসনেব মতো ময়লা—এই 'না-মাজা' কথাটা তার আপনার ইজ্জতে লেগেছিল, যেহেতু 'না-মাজা' কথাটায় এই সংসার, এখনকার দিনের পবিচ্ছন্ন দৈন্য-উপহত চেহারাটা ছিল, যেরূপে বীজমধ্যে বৃক্ষের ছায়া পর্যন্ত নিহিত থাকে , এবং দীনা প্রীতিলতাব মধ্যে দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল ; এখন সে থমকে দাঁড়াল।

প্রীতিলতা অন্য আর একদিক থেকে নিশ্বাস নেবার জন্য ছোট বারান্দার আর আর দিকে চাইল, এখানে সেখানে সাতবাস্‌টে অন্ধকার—বালতি আর টোল খাওয়া ডেকচির জল ছাড়া, আর কোথাও যে সকাল হয়েছে এ সত্যের উল্লেখ নেই, প্রায়-ঢাকা বারান্দার উপর দিয়ে এক লুপ্ত আকাশ দেখা যায়, যাতে করে মনে হয়—তারা যেখানে আছে, সেটা পৃথিবী। অবশ্য, মেঘমন্দ্র প্লেনের শব্দ, ক্বচিৎ মোটরের হর্ন, অথবা কখনও সাইরেন আছেই ; এতদ্ব্যতীত রাত্রে হরিধ্বনি থেকেও বীভৎস হয়ে উঠে মানুষের কণ্ঠস্বরের নামে উত্তাল উদ্দাম পোড়ার আওয়াজ, মনে হয় এক আপনাকেই কামড়ায়—ধনীরা সুখী কেননা এ-হেন মর্মন্তুদ আওয়াজে তারা পাশবিক অত্যাচারীর সদর্প-মাভৈ ধ্বনি শুনে আপনার দ্বার অর্গলবদ্ধ করে ; সুতরাং তারা নিশ্চিন্তে ঘুমায়। অন্যপক্ষে, সামান্যা রমণী প্রীতিলতা তাদৃশ চর্ম-লোল-কারী টঙ্কার শ্রবণে অল্পকাল নিমিত্ত নিশ্বাস স্থগিত রাখে, আপনার গৃহস্থালির কতিপয় ফাঁকা বাসনপত্রে হাঁড়িতে, এ আওয়াজ নির্দয়ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে, তখন সে আত্মরক্ষাহেতু আপনার বক্ষদ্বয়ে হস্তস্থাপন করে, তবু বেচারির শীর্ণ একটি হাত কপালে করাঘাত

করতে ছুটে যেতে চায়, এবং সে কোনরূপে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে 'নারায়ণ-নারায়ণ' বলে কোনক্রমে হাতের তালু দেয়ালের গায়ে এঁটে ধরে, হাঁকায়, মনে হয় সে যেন বা পালাচ্ছে, রুগ্ন শুষ্ক শক্ত হিম ওষ্ঠপুট জিহ্বা দ্বারা অল্প অল্প বুলাবার চেষ্টা করে এবং পাগল চোখে এদিক সেদিক তাকায়, মনে হয় এ রৌদ্রকর্মা, সে-আওয়াজ তাকে যেন টানছে, ডাকছে। সে 'না, না' বলে উঠেছে তবু ঘাম হয় এবং ঝটিতে 'লতি-যূথী' বলে ডাক দিয়ে আপন কন্যাদ্বয়ের সাড়া নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনস্থ করে ঝুল ঝেড়ে ফেলবে, পয়সা পেলেই পরনের কাপড় ধোপ-দুরস্ত করতে হবে তাহলে এ-দুঃসহ আওয়াজ তাকে—তাদের তার চিনতে পারবে না। কিন্তু অনেক শূন্যতা, অনেক পাগলা সেলাই তাকে, প্রীতিলতাকে অতিমাত্রায় ছোট করে।

এখন, প্রীতিলতা আপন গর্ভজাত কন্যা যূথীর দুঃখময় সুখের দিকে চাইল, ফলে হঠাৎ-নিভে যাওয়া মনটা দুর্দ্ধর্ষ লাল হয়ে উঠল, রক্তস্রোত স্ফীত তাতাথৈ, যদিও সে নিজে ভেবে পায়নি, এমনধারা এক বিচ্ছু খেউড়ে নিষ্ঠাবতী বিধবা খেতুর মাকে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য কবতে পারে, যার ফলে তার পেটটা যেন বা ভরে গিয়েছিল,পরিধেয় বস্ত্রসকল নিরবচ্ছিন্ন. তা ছাড়া শুভ্র, মুহূর্তের জন্য সে রৌদ্রকর্মা আওয়াজের ফাঁদ থেকে অনায়াসে অব্যাহতি পেয়েছিল—প্রীতিলতার দেহটা যেমত বা দেহ থেকে ছুটে বার হয়ে চলে গেছে, নিমেষের জন্য লজ্জাও তার হয়েছিল যেহেতু যূথী তার কথাটা, খেতুর মার প্রতি, নিশ্চয়ই শুনেছিল। তাদের মতো ঘরে এমন কুৎসিত কথা শুনলেও পাপ হয়। এ-কারণেই রক্ত তার দিঙ্‌মণ্ডলকে প্লাবিত করে, উক্ত কথার স্মৃতি মেয়ের মন থেকে মুছে দেবার নিমিত্তই সে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে গিয়েছিল, এবং এই আশাতীত দুর্বিভাব্য গতিবেগে যূথীকে পার হয়ে, ক্ষণেক থেমে, আশ্চর্য, পলকেই নিশ্চয় করে, অসম্ভব ঢঙে পুনশ্চ কন্যাকে প্রদক্ষিণ করে—বাজিকর যেমন মড়ার খুলিকে কেন্দ্র করে, সাপুড়ে যেমন সাপকে কেন্দ্র করে, পৃথিবী যেমন সূর্যকে—এসময় নাবালিকা যূথী আপনার রক্তাক্ত হাতখানি অন্য কোনও উপায় না দেখে তুলে ধরেছিল।

এখানকার, বারান্দার, ধূম্রসদৃশ আলোয় রক্তাক্ত হাতখানি দেখতে দেখতে প্রীতিলতার চিত্তবিভ্রম ঘটে ; সহসা, তাই, সে নতজানু হয়ে বসেই যূথীকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই সেঁকো কদর্য অভাবের মধ্যেও—যে গভীরতা গীতের শুদ্ধ পর্দায় থাকে, যে গভীরতা জলে প্রতিফলিত তারায়, যে গভীরতা শিশুর হাস্যের রহস্যের মাধুর্যের প্রাণধর্ম—এ-গভীরতা সহজেই সে খুঁজে পেলে ঘুমজড়িত কণ্ঠে সে বলেছিল, 'খুব কেটেছে।'

যূথী এখন মার বাহুবন্ধনে, ঈষৎ সলজ্জ আপন হাতের প্রতি নজর রেখে, অতীব ধীরে মাথা নাড়িয়েছিল।

এখন তারা ঘরে। যূথীর আঙুলটি বাঁধা হয়েছিল, সে মার কোলে ঠেস দিয়ে আর লতি আর এক পাশে, তারা দুই বোন একটি কথাও বলেনি, এক তর্কে বুঝেছিল যে আমরা বড় নিঃসহায়। এবং মার দিকে বড় বেশি করে ঘেঁষে এসেছিল, প্রীতিলতা এইটুকু উষ্ণতার মধ্যে এমন হতে পারে যে, সচেতন হয়ে উঠেছিল, কেননা সে যূথীর মাথার উপরে আপন গণ্ডস্থল স্থাপন করে, পরক্ষণেই তার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল, যেহেতু গন্ধকের মতো ঘৃতকুমারীর মতো এক ধরনের গন্ধ তাকে বিপর্যস্ত করে, সুতরাং প্রীতিলতা, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে বসে, আড়ে চাইল, সে এখন কঠিন। এ সময়ে তার মনে হয়, মনে পড়ে, কী অদ্ভুতভাবে দুইজনে পিঁপড়েকে অনুসরণ করেছিল, একজন হামাগুড়ি দিয়ে, আর একজন বেঁকে হাঁটুতে হাত দুটি রেখে, অল্পকাল পরে পরেই তাদের দ্রুতগতি দেখা যায়, মাটি থেকে মুখ সরিয়ে ঝটিতি যূথী লতিকে বলেছিল, 'এই, মা দেখছে কি না দেখ', এতে লতি যখন এদিকে চায়, তখন তার মাথাটা বই পড়ার মতো করে নেড়েছিল, আর যূথী সখেদে বলল, 'হ্যাঁ।' লতি হঠাৎ চাপা গলায় বললে, 'দিদি এই যে।' আঃ সুন্দর, রুক্ষ, দিবালোক, লাল আনুগত্য, সবুজ যেমন বৃষ্টির অনুগত, বৃষ্টি যেমন মেঘের, মেঘ যেমন বাষ্পের, বাষ্প যেমন নীলাব্ধিবসনার। এরপর

দুই বোন 'লাইন লাইন' বলে চেঁচিয়ে উঠল। এ লাইন বন্ধ জানলার ফুটো দিয়ে চলে যায় ; দুই বোনই দেখেছিল, মধ্যে পগার তারপর যে বিবাট বাড়ি তারই খানিকটা, যে বাড়ি থেকে কালোয়াতি গান আসে, ফোড়নের গন্ধ আসে, বিড়ালের ঝগড়াব শব্দ আসে। বেচারি লতি বলেছিল, 'দিদি আমরা যদি পিঁপড়ে হতাম'—প্রীতিলতা জননী হয়েও এ দৃশ্য কোনও এক অন্তবাল থেকে দেখেছিল, কোনও এক মন দিয়ে শুনেছিল ! এ কথা স্মবণে তাব গাযে যেন বা কাঁটা দিয়ে উঠল ! প্রীতিলতা ভীতা।

ঠিক এমত সময়ে একটি কাশির আওয়াজ, সে আওয়াজে বটগাছের শিকড় পর্যন্ত অস্থায়ী হয়ে যায়, প্রীতিলতার প্রাণপুরুষ কেঁপে উঠল। প্রীতিলতা আপনার দৃষ্টিকে রাঢ় করে কব্জা করে রেখেছিল সম্মুখের অনেকটা সিমেন্ট কবা ড্যাম্প সিক্ত দেওয়ালেব দিকে, অথচ বিস্ময়কর এ কথা যে, কে যেন বা তার দৃষ্টি দেহ মন সব কিছুকে জানলার দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে, যে জানলায় দু একটা গরাদ নেই, সেখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা। প্রীতিলতা অত্যন্ত শক্ত কবে নিজেকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিল, কেননা এসময় কাশিব এবং লাঠিব ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ক্রমে নিকটস্থ হয়, স্বল্পালোকে অদ্ভুত একটু ছায়া পড়বে, এবপব গলির মাঝেব নর্দমার ঝাঁঝবিতে লাঠিব আঘাতে ঠং করে একটা পাজি আওয়াজ সংঘটিত হবে, আর যে, তার পবক্ষণেই পৌছবে, তাদের সূক্ষ্ম গলিতে এবং তাদের বকে—ঐ জানলার পিছনে—ধপ কবে গাঁঠরি বাখার শব্দ হবে, আর যে তখনই শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘনিশ্বাস সমস্ত কিছু মিলে সঘন অধীরতাব শব্দ মিলে একটি পাতাহীন পৃথিবীর রুক্ষতার উদয় হবে। এই ভয়ঙ্কর নিশ্বাস সকলের শব্দ প্রীতিলতাব ঘাড়ের অতীব নিকটে অনুভূত হয়, সে বোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, কেননা ঘাড়েব এইটুকু গোপন-অতীব অল্পপরিসব স্থানেই কেবলমাত্র কাম, অভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে আশ্রয় করেছিল, কেননা দেহের মধ্যে অন্য কোথাও দেহ ছিল না, ফলে প্রীতিলতা বিমর্দিত, ত্রাসিত, শঙ্কার, জড়তার, ক্লৈব্যের, শৈত্যের, জাড্যের, হিমবাহ স্বেদবিন্দুর সঞ্চার হল, সে আপনাকে আর কোনক্রমে আর দৃঢ় করে ধরে রাখতে পারল না, ঝটিতি জানলার দিকে সে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়েছিল।

জানলার পিছনেই রক, সেখানে, ইদানীং পথশ্রমে যারপরনাই ক্লান্ত—দ্রুত নিশ্বাসে ব্যস্ত হাড়ের খেলা, এ খেলার আশপাশ দিয়ে অন্ধকার সহস্র ছেঁড়া চুলের মতো ভেসে ভেসে যায়। এবার ছোট ছোট স্বস্তির কাশির আওয়াজ, এবং অশীতিপর বৃদ্ধের সমস্ত মুখমণ্ডলে যেমত বা ছানিপড়া-মুখখানি, দুঃখময়, গ্রহকবলিত, মুমূর্ষু ঘাড়ের উপর নড়ছিল। অনেকটা কাঁচা সর্দি গড়িয়ে পড়ে স্থির, বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে এদিক ওদিক চাইল, তারপরেই ভগ্নস্বরে গান আরম্ভ করল। গানটা টহলদারি, রেখাবের নিজস্ব বেদনা এ গানের সুরে বর্তমান ছিল।

প্রীতিলতা কখন যে এ গানে আপনকার বোধ হারিয়েছিল, তা সে জানত না, গানটি শুনে শুনে, এই কয়দিনেই, তার ভাল লেগেছে এবং সে আপন মনে, অনেক সময়, গায়। এখন, সহসা সে বুঝতে পারল যে, সে অতিধীরে বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটি গাইছে, আর যে, ত্বরিতে লজ্জায়, কাঁধের পিছন থেকে কাপড় তুলে মাথায় দেবার কারণে তুলতে গিয়ে বুঝতে পারলে হাতে কাপড়ের পাড় মাত্র উঠে এসেছে, এবং আর কোনও উপায় নেই বলে মেনে নিয়ে সেটাকেই যথাযথভাবে রাখল। কিছু পরে, যূথী-লতিকে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে আপন দেহ থেকে মুক্ত করত প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, কারণ এখন, সে ধীরে ধীরে জানলার এক পাশে এসে, জানলার পাট বন্ধ করে দিয়ে, আপতত শায়িত বৃদ্ধকে এ কয়েক দিনেব অভ্যাসবশত উঁকি মেরে দেখবে। এইভাবে দেখার সময়ে তার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, অভুক্ত দেহ কি এক উত্তেজনায় রিমঝিম করে উঠেছিল। পলকেই স্থান পরিত্যাগ করে যে দেওয়ালে বহুকাল পূর্বে একটি আয়না ছিল, সেখানে এসেই থমকে দাঁড়াল, এখানে একমাত্র জায়গা যেখানে সে আপনাকে আবছায়া দেখতে পায় ! হায় ! সত্যিই যদি আয়না

থাকত।

খানিক সেখানে কালক্ষয় করে, উন্মত্ত যেমত, চঞ্চল পদবিক্ষেপে মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদের সজোরে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিল, এরা তিনজন কোনও কিছু ভাববার পূর্বেই প্রগল্‌ভ ভয়ঙ্কর কাশির আওয়াজ শুনতে পেলে। প্রীতিলতার কর্তব্যবুদ্ধিভ্রংশ হয়নি, সে অসম্ভব উল্টোপাল্টা কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'ওঠ না তোরা, বুড়ো কী মরবে ?'

দুই বোন বিশেষ সপ্রতিভ হয়ে উঠল, কর্তব্যপালনে এদের অল্পক্ষণ দিক্‌ভ্রম ঘটেছিল, তারা খানিক সন্তর্পণে বারান্দায় এল, অন্ধকারে খুঁজল। এরপর একজন দরজা খুলে দিলে, ইতিমধ্যে মার গলা এল, 'দেখিস ছুঁসনি যেন।' অন্যজন জল নিয়ে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ এখন উঠে বসে কাশছিল, ওদের দেখে আপনার টিনটা এগিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে দুইহাতে টিনটা মুখের কাছে আনতেই, এ লোল-দেহে যেমত বা বিদ্যুৎ খেলে গেল, দ্রুত একটি হাত সরিয়ে পার্শ্বস্থিত জগদ্দল বালিশের উপর রাখতে যেই গেল, সে-মুহূর্তে খানিক জল তার দেহের এখানে সেখানে পড়ে সাধারণ মনুষ্যদেহের হিম কল্পনা হয়ে দেখা দিল। বৃদ্ধ দু-একটা কাশি সহযোগে জল খায় . . . ।

যূথী লতিকে খুব অল্প-স্বরে বলেছিল, 'কী বোকা, জল গিলে গিলে খাচ্ছে।'

লতি গ্যাসের অন্তিম আলোর কিছুটা মুখে তুলে নিয়ে বললে, 'চিবিয়ে খাবে বুঝি !'

যূথী পাখির মতো মুখখানিকে উঠানামা করে বলেছিল, 'আমি তো করি', এবং পরে স্কুল মাস্টারনীর মতো করে স্পষ্ট বলেছিল, 'ওতে পেট ভরে যায়।'

লতি এ তত্ত্ব বুঝবার পূর্বেই হঠাৎ ভৌতিক আওয়াজ শুনল, 'ঘরকে যাওনা, ঘরকে যাওনা।' তারা দুই বোন দেখল বৃদ্ধ আপনার বোঁচকাটি দুই হাতে আগলে তাদের ও কথা বলছে। এতে করে দুই বোন ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু বৃদ্ধের রকম-সকম দেখে মুখটিপে হাসতে লাগল।

বোঝা গেল বৃদ্ধ এবার বেশ রাগ করেছে, যেহেতু, বলেছিল, 'খামাখা দাইড়ে আছ কেন, ঘরকে . . ভাল জ্বালা', এ কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'লতি যূথী. . .'

প্রীতিলতা জানত, বৃদ্ধ কাউকে কাছে আসতে দেয় না কেন, প্রথম যেদিন সে তাদের এ গলিতে এসে আশ্রয় নেয় সেদিনই। তাদের বাড়িতে ঠিক দুদিন পর যৎকিঞ্চিৎ চোকর সিদ্ধ হয়েছিল। তারা সকলেই শুয়েছে, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠেছিল। ব্রজ ঘুমের জন্য তখন হাঁকপাঁক করছে, কেন না সে কোনক্রমেই অবশ্যম্ভাবী তথা ভবিতব্যের দিকে আর চাইতে পারছিল না, কেননা আগামী কালের সূর্য শুধুমাত্র যে সে জড়ভরত, তা প্রমাণ করার জন্য পুনর্বার দেখা দেবে। কিন্তু এমত সময় প্রীতিলতার ধোঁযাটে কণ্ঠস্বর তাকে, ব্রজকে, ইহকালের স্যাঁতসেঁতে পৃথিবীর মধ্যে এনে দিয়েছিল। প্রীতিলতা বললে, 'বুড়ো হলে কী হয়, খুব টনটনে জ্ঞান। যখনই যূথী-লতি যায় অমনি মারমুখো হয়ে উঠে . . বোধ হয় জানে, বোঁচকায় অনেক টাকা আছে।

'দূর'।

'শুনেছি ভিখারিদের অনেক টাকা থাকে. . . .'

'দূর, লড়াইয়ের বাজারে. . . টাকা করতেই লোকে . . . বলে . . পয়সা দেবে কে. . .'

ব্রজর উত্তরের মধ্যে উর্ধ্বের সিলিঙের সমস্ত নগ্নতা ব্যক্ত হয়েছিল। ফলে প্রীতিলতা আপনার কব্জির একমাত্র লোহাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, 'মজা দেখছ, বুড়ো রোজ দাড়ি কামায় . . . .'

ব্রজ এ-হেন এজাহারে চোখ দুটি খুলেছিল, সম্মুখের অন্ধকার দেখে নিয়ে পুনরায় চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে আপনার দাড়ি দিয়ে হাতের বাজুর কাছে ঘষলে এবং কথার মোড় ফিরোবার জন্য বললে, 'বস্তায় মানে বোঁচকায় চাল আছে . . .'

প্রীতিলতা ব্রজর কথা শুনে প্রথমে বলেছিল, 'তাই-নাকি', তারপর বলেছিল, 'ও'—ছোট কথা

অর্থাৎ উত্তর দুটি তার নিজের কাছে কেমন যেন বোকা বোকা ঠেকেছিল। ইতিমধ্যে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই যা আত্মনিগ্রহ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, তা বৃদ্ধের গান, যা এখন সদ্য সদ্য শুনলেও মনে হয় বহুদিন পূর্বে শুনেছি—কেননা এই গানটির মধ্যে আধিদৈবিক পূর্ণতা ছিল, বর্ষার নিশ্চিন্ত ঘুমের মোহ অথবা সুন্দর প্রভাতের সোহাগ এ গীতির ধমনী, এ জগতের মধ্যে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, বাপ মা ভাইবোন আকাশ বাতাস, পুষ্করিণীতে হাঁসের সন্তরণ, সব কিছুই ছিল।

সকালবেলা, প্রীতিলতা একটু গুঁড়ো চায়ের পুরিয়া নিয়ে এসে, গতকালের যূথী-লতি সংগৃহীত কাঠ-কুটো দিয়ে উনোন জ্বালিয়ে জল চাপিয়ে দিয়েছিল। অদূরে ব্রজ উবু হয়ে বসে, দুটি হাত তার নিজেরই পায়ের তলায় চাপা, কেননা এ সময়ে তার দাড়ি বড় চুলকাচ্ছিল। চুলকালে পাছে প্রীতিলতার নজরে পড়ে, এবং তারই দুরদৃষ্ট অথবা হয়তো অকর্মণ্যতা স্পষ্টত ওতপ্রোত হয়ে উঠে। বেশিক্ষণ ব্রজকে এভাবে থাকতে হয়নি, যেহেতু তারা দুই বোন খাওয়া-খাওয়া খেলা করছিল।

তারা দুইবোন, যূথী এবং লতি, খাওয়া-খাওয়া খেলা করছিল, এ খেলার মধ্যে নিশ্চয়ই পেটভরা বা তৃপ্তির আনন্দ ছিল না, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদেব দক্ষতার কাবণে মা-বাবাকে গর্বিত করা। প্রীতিলতা অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়া থেকে চোখ ফেরাবার অথবা সকালের আলোকে পড়ে নেবার জন্য কপালে একটি হাত রেখে এদিকে চেয়েছিল। যূথী-লতির ন্যাকা, কদর্য, অস্বাভাবিক, পৈশাচিক চর্বণের চাকুম চাকুম শব্দ ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে বড় বিশ্রী লাগছিল, প্রীতিলতার দেহে এ কারণে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল, সে আর যেন স্থির থাকতে পারল না, ত্বরিতে উঠে ওদের দিকে না গিয়ে সদব দরজায় দিকে গিয়েই আপনাকে স্মরণ করার অর্থে আপনকার কেশদাম দুই হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করেই একবার ভেবে নিয়েছিল যে, পিছনের দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি যে, কেন সে বাইরের দিকে যেতে চাইছিল—থমকে দাঁড়াল ! তার পরক্ষণেই, ঘুরে সেইভাবে দাঁড়িয়ে, কর্কশ তীক্ষ্ণ আনুনাসিক আওয়াজ করে বলল, ‘বসে আছ, মারতে পারছ না ?’ ব্রজর পৌরুষ এতাবৎ একগলা জলে নিমজ্জিত হয়েছিল, আপনার কন্যাদ্বয়ের এরূপ খেলা তার সকল কিছুকে অপহরণ করে, তথাপি নিজে থেকে কোনও বিহিত করার মতো মানসিক ক্ষমতা তার আয়ত্তের বাইরে ছিল, কেননা ভয় ছিল যে যদি করে তাহলে প্রীতিলতা তার প্রতি হয়তো অদ্ভুতভাবে তাকাতে পারে। এখন প্রীতিলতার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠল, এসময় তার ছেঁড়া কাপড়টা প্রায় খসে যাচ্ছিল, সেটা নিমেষেই ধরে, প্রচণ্ডভাবে অফুরন্ত কিল চড় ঘুষি মারতে লাগল। প্রীতিলতা নিশ্চয়ই আপনার ক্রোধ সম্বরণ করতে পারেনি সেও লতিকে নিয়ে পড়েছিল। দুজনেই, কন্যাদ্বয়, যখন ধরাশায়ী, তখন প্রীতিলতা তার নগ্ন বক্ষদ্বয় দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাপড় সংযত করতে করতে ব্রজর দিকে চাইল, এবং যে ব্রজ তার প্রতি চেয়েছিল। এরপর স্বামী-স্ত্রী জোড়ে, ভূমিলুণ্ঠিত ব্যাকুল ক্রন্দরত মেয়ে দুটির প্রতি পিছন ফিরে দেখেছিল যূথী উদম ল্যাংট এ কারণে যে সমস্ত ফ্রকটা খুলে গুছিয়ে তার একান্তে, পাশে লতির সর্বাঙ্গসুন্দর দেহটি আভরণহীন, দুজনে মিলে মনে হয় এক মহতী কল্পনাব সৃষ্টি করেছে, মনে হয় এরা দুজনেই মধ্যযুগীয় কোনও স্থাপত্যের আহ্লাদিত ফ্রিজের (frieze) অংশ, বাপ মা ঐ দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার কালে দুজনে মুখোমুখি হয়েছিল, দুজনেই অপূর্বভাবে হেসেছিল, হয়তো আপন আপন চোখে জল রোধ করবার জন্যই হেসেছিল।

এদিকে উনুনের জল তখন ফুটন্ত। প্রীতিলতা তাড়াতাড়ি গুঁড়ো চায়ের পুরিয়া খুলে জলের উপর ফেলল এবং একটি ছোট চামচ দিয়ে গুলতে গুলতে ব্রজর দিকে চাইল। ব্রজর কাছে এ চাহনীর অর্থ অতীব সুস্পষ্ট সে অনন্য উপায়ে আপন মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এসময় এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে যাওয়ার মর্মভেদী শব্দে তীক্ষ্ণ ক্রন্দনধ্বনি আর ছিল না, ছেলেমানুষ দুটির মুখে শুধুমাত্র ক্রন্দনের ভঙ্গিমাত্র ছিল ! ক্রন্দনের অভিব্যক্তি কী অ-ছবিলা !

‘আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিতে, না লেখা না পড়া, খালি খাই... খাই.. কোথাকার দুর্ভিক্ষ

হাভাতের ঘর থেকে যে এসেছে ভগবান জানেন. . . . ' প্রীতিলতা বলেছিল।

এ কথায় ব্রজ ভেবেছিল পুনরায় মারবার হুকুম আছে, তাই তার দেহটা ঈষৎ উঠতে গিয়ে থেমে গেল, একারণ যে, এখন সে আর এক কথা ভাবছিল—ভাবছিল নয়ত, পাচ্ছিল—ভয়ঙ্কর দুঃসহ গলিত ঘৃণ্য কদর্য গন্ধ, অনেক মৃতদেহের গন্ধ—মানুষেরা কী আদতে মাছ—অভুক্ত তথা বুভুক্ষ জীবিতদের শবের গন্ধ নিশ্চয়ই এরূপই হয় ফলে এ কথায়, নিজের জন্য অবশ্যই ব্রজর যথেষ্ট লজ্জা হয়েছিল।

এখন প্রীতিলতা অনেক কথা বলে চলেছে, 'এই ধাড়িটাই ছোটটাকে পর্যন্ত নষ্ট করলে—কথা সব শুনলে গা জ্বলে যায়, সেদিন বলছে, ঘরে বসে শুনছি', বলে অসম্ভবভাবে যূথীর কণ্ঠস্বর নকল করে তথা ভেঙিয়ে বলেছিল, 'লতি মেঘ কি করে হয় জানিস—হাজার হাজার বাড়ির রান্নার ধোঁয়া মেঘ হয়, ওটা না রুই মাছের ঝোলের মেঘ—ওটা না সোনা মুগের ডালের মেঘ' . . . ' এ কথা শেষ করেই অদ্ভুত করে ভেঙাতে গিয়েই, প্রীতিলতা ভয়ঙ্কর ত্রাসে কম্পিত, সে বড় অবাক হয়, কেননা নিমেষেই তার সম্যক উপলব্ধি হয়েছিল যে বহিরাগত ত্রাস তার দেহে সঞ্চারিত এবং রক্তকে যা হেতুহীন করেছে। এইপ্রকার জ্ঞানোদয়ে সে বুঝেছিল তার সুন্দর আয়ত নয়নযুগলের একটি ছোট যুগপৎ অন্যটি বড়, এবং বিশেষ পরিমাণে উষ্ণ। প্রীতিলতা, এমন মনে হয়, তার ইদানীং স্বভাবসিদ্ধ যন্ত্রণায় চিৎকার—কি আর্তনাদ—করে উঠতে চেয়েছিল. এ কারণে যে তার মুখ চিৎকারকারীর ন্যায় ভাঙাচোরা অথচ কোনও আওয়াজ নেই। পরক্ষণেই যেহেতু সে স্ত্রীলোক সেইহেতু আপনাকে সংযত করতে পেরেছিল। এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি যে প্রীতিলতা সেই ত্রাসকে প্রতি-আক্রমণ করতে অথবা ত্রাসের ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিল। গরম চায়ের খানিকটা চুমুক দিতেই সে বুঝতে পারলে, দেহে অজস্র শিরা-উপশিরা বর্তমান, এবং সে আপনকার হাঁটুদ্বয় প্রজাপতির পাখার ন্যায় ধীরে বিভক্ত করল, ঝটিতি বন্ধ করে এবং পুনরায় এ কার্যে সে ব্যাপৃত হয়—কারণ তার গাত্র উত্তপ্ত, চোখে লজ্জা অথচ দেহ-প্রজ্বলন-হেতু বৃশ্চিক নিশ্বাস প্রবাহিত হয়নি অথচ তৃপ্তির পূর্বেই অথ খণ্ডিতা লক্ষণনিচয় ওতপ্রোত, মনে হয়, নিশ্চয় দেহগত ত্রাসকে দুষ্পূরণীয় কাম দ্বারা জর্জরিত করতে চেয়েছিল, বলেছিল, 'ওই বুড়োটাকে আজ বলে দিও, বড় ভয় ভয় করে . . কার মনে যে কী আছে . . বলা যায় না' বলেই শায়িত উলঙ্গ মেয়ে দুটিকে বলেছিল, 'মরণ—ওঠ্ না বুড়োধাড়ি নির্লজ্জ বেহায়া', বলেই গলা নামিয়ে বলল, 'বুঝলে . . . . '

ব্রজ বুঝল, যদিও এ-হেন আপৎকালে দীন-ভিখারি-জনিত প্রীতিলতার ইঙ্গিতের পিছনে কোনও সুস্পষ্ট ছবি সে দেখতে পায়নি অথবা আদৌ ছিল না। কেননা মন নির্জনতা-অন্বেষী নয়, কেননা মন দ্বীপ-সন্ধানী নয়, তথাপি বলেছিল, 'পাগল !' ইস্ ! ভাত যদি থাকত তাহলে সে অনায়াসে এ-মিথ্যা ভয়ের, ত্বরিতেই, সুযোগ নিতে পারত।

'না না বড় ভয় করে'— এ কথায়, অন্য কিছু নয়, প্রীতিলতার আপন ত্রাসের উল্লেখ ছিল। আয়না থাকলে, দেখতে পেত যে সে, যারা এখন সমস্ত শহর-কলকাতায় ভূগর্ভের অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে—তাদেরই মধ্যে একজন। কিন্তু সে হার মানবার মতো দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। কেননা তার কাছে একটা পাড়ই যথেষ্ট—যূথী কাদের বাড়ি থেকে মনোরম নয়ন-অভিরাম জরির পাড় নিয়ে এসেছিল, সেটি প্রীতিলতা আপনার গায়ে জড়িয়ে দুই মেয়েকে দেখিয়েছিল, তারা মাকে এরূপ সজ্জায় দেখে চকিতে শিল্পী হয়ে যায়, তারা রহস্য যে কী তা বুঝেছিল, যে রহস্যে বলাকা-চিহ্নিত শ্যাম আকাশের বৈচিত্র্য, নীল সাগরের বারিরাশির মধ্যে সন্তরণবিলাসী আলোক, তারই পূর্ণ হেমকান্তি ধরেছিল। যূথী-লতি আর স্থির থাকতে পারেনি, এরই মধ্যে যূথী বুদ্ধি করে জানলাটা আরও ভাল করে খুলে দিয়েছিল যাতে মায়ের দেহ জুড়ে যে আলো, তা দূর শতাব্দীর স্মৃতির মধ্যে, তাকে কোলে নেওয়া যায়—এরপর দুজনেই মাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল, মনে হয় তারা যেমত

বা অতিশয় ভীত, শঙ্কিত। (ভগবান! তুমি অন্তরে থাকতেও মানুষের এত ভয় কেন!) প্রীতিলতা অবশ্যই হার স্বীকার করবে না। সে কোনদিন মরা মাগুর মাছ খায়নি, কাউকে খেতেও দেয়নি। সে হাভাতের একজন হতে কোনক্রমেই পারবে না।

প্রীতিলতা মুখ ঘুরিয়ে বসে, এদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পরক্ষণেই সে সেইদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে। পুনরায় সেদিক থেকে অন্যদিকে। কিন্তু এই মেয়ে দুটি! মনে হয় এরা বীভৎস, এরা ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে. ব্রজর প্রতি রাগ করার কিছু নেই, এ কারণে যে ব্রজর প্লুরিসিই তার কাল,উপরন্তু তার অক্ষমতা—দুই মিলে তার সমস্ত স্বপ্ন শুধু নয়, জীবনকে বানচাল করেছে। এখন এ সময় একটা টিউশানি পর্যন্ত নেই, শহরে অনেকে নেই যারা আছে বোরখা-পরিহিত আলোয় ভৌতিক। তাবা সকলেই পরমায়ুকে সব কিছু বলে ধবে নিয়েছে। প্রীতিলতাদের কণ্ঠস্বর ফাঁকা হাঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়, এতে করে আর কারও না হোক প্রীতিলতাব গা ছম্ছম্ করে। তখন এ ভযকে ঠেকাবার জন্য বৃদ্ধের গীতটি প্রথমে গুনগুন করে গেয়ে যেন আরোগ্য-স্নান করে।

কিন্তু কতক্ষণের জন্য এ গীত! পলকেই প্রীতিলতার দৃষ্টিপথে উদয় হয় এখানে সেখানে জমে থাকা আবর্জনা যেমত অযত্নের গৃহের মাকড়সার জালের মতো শঙ্কাপ্রদ অন্ধকার! এ-অন্ধকার ফাংগাস-শীল। প্রীতিলতা মনকে ফেরাবার জন্য তৈজসপত্রের কিছুটা সংস্কার করতে মনস্থ করেছে কিন্তু বাড়িতে এক ফোঁটা ছাই নেই। ছাই নেই তাতে কী, যূথী-লতি তো আছে। যূথী-লতি ছাই নিয়ে এসে খবর দিল, 'মা আমরা মোড়ের পাঁশগাদায় গিয়ে ছাই তুলব, এমন সময় গিয়ে দেখি বুড়োটা...'

'বুড়োটা' শুনেই প্রীতিলতার গায়ে হিমপ্রবাহ খেলে গেল, আপনার শৃঙ্খলিত অস্থিসমূহের বিশৃঙ্খলতার শব্দ শোনা গেল, তবু আপনাকে সংযত করতে করতে সে বলেছিল, 'ছিঃ, বুড়োটা বলতে নেই .... আমাদের অমন করে কথা বলতে নেই. . '

যূথী এতে, এখন, থেমেছিল, ফলে লতি দিদির মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলতে লাগল, 'জানো মা, বুড়ো . . . মানে বুড়োমানুষ' বলে মার মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসবার চেষ্টা করেছিল, 'বুড়োমানুষ রাস্তায় বসে কাশছে, তার গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে. . . . '

শুনে যেটুকু মন সাড়া দিয়েছিল সেইটুকু দিয়ে এদের মা বলেছিল, 'বলিস কী!' বলেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু এরূপ সমাচার তার মধ্যে ধূমায়িত হয়ে এক অভূতপূর্ব বিদ্যুৎ-সম্ভূত রোশনাইয়ের সৃষ্টি করে, এমন কী দুটি হাত ছেলেমানুষের মতো হাততালি দেবার জন্য খানিক অগ্রসর হয়েছিল, সে সেইভাবে হাত দুটি রেখে কিম্ভূত এক প্রশ্ন করে ফেলল, 'আঃ কোথায় সে মর. . ' কথাটা 'মর'-এ এসেই থেমে গেল,'বে' অক্ষর যোগে সম্পূর্ণ হয়নি। যূথী-লতি মার এহেন পদ রচনাটা যথাযথ বুঝে উঠতে পারেনি, তারা অবাক হবে কিনা এ কারণে দুজনে দুজনের দিকে চেয়েছিল, ইতিমধ্যে শুনল তার মা পুনর্বার সংশোধন করে বলেছিল, 'বেচারাকে কোথায় দেখলি?'

'মোড়ে— কাশছে আর রক্ত পড়ছে. . . . ' এরপর তিনজনেই স্তব্ধ, তিনজনে তিন জনকে অদ্ভুত বিশেষ রূপে নিপট গম্ভীর দেখেছিল। প্রীতিলতা, এ কথা ঠিক যে, এই মুহূর্তের জন্য অন্তত ছেলেমানুষ ভাবেনি। সহসা এই স্তব্ধতাব মধ্যে থেকে, কচি কচি মুলো দিয়ে আধা সর্ষে বাটা দিযে ডেংও ডাটার চচ্চড়ি বেশ খানিকটা গুড় দেওয়া—স্বাদ পেল। এত করে একটি ঢোক গিলেই, গলিত শবদর্শনজনিত ভীতি তাকে, প্রীতিলতাকে, অতিমাত্রায় কুক্ষিগত করল। কখন যে আপনকার ছিন্নভিন্ন অঞ্চলপ্রান্ত খসে পড়েছিল তা তার খেয়াল হয়নি এ কারণে যে এখন সে সেই প্রথম ভোরের মোহমুক্ত সজল গীতটি গুনগুন করছিল, কেননা এই গীতে অদ্য সকালের একটি দৃশ্যকে সে মুছে দিতে চেয়েছিল।

প্রীতিলতা, তখন, ছোট করে আগুন জ্বালিয়ে একটু চোকর সিদ্ধ করছিল, যূথী আর লতি নিকটে বসে আনন্দে নিজেদের আর সামলে রাখতে পারছে না, তারা বাবু হয়ে বসে আপন আপন হাত

কোঁচড়ে ঠেসে রেখেছিল, মাঝে মাঝে কাঁধ উঠছিল। এমত সময়ে লতি জানলার বসানের দিকে দেখে বললে, 'মা দুটো আমলকী ফেলে দাও না—বেশ টকটক হবে।' জানলার বসানে বহুদিন পূর্বে আনা ত্রিফলা পড়েছিল। লতির কথায় প্রীতিলতা গোটাকয়েক আমলকী বেছে নিয়ে ফুটন্ত চোকরে ফেলে দিল।

লতি আহ্লাদে সমস্ত দেহকে কেমন একভাবে মুড়ে ফেলতে চাইল, অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়েছে সে, এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে অর্থাৎ মাকে খুশি করবার মানসে বলেছিল, 'ভাতের থেকে আমার চোকর খুব ভাল লাগে।'

যূথী আপনার নীরবতার বোকামি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যোগ দিল, 'ভাতের থেকে চোকর একশগুণে ভাল, হাই ক্লাস . . . ' মুখখানা এ সময় এমন বিসদৃশ করেছিল যে তার কানটা মলে দিতে ইচ্ছা করে।

প্রীতিলতা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে বললে, 'থাক, থাক, আর চোকরের গুণ গাইতে হবে না . . . লোককে যেন বোলো না আমরা চোকর খাই।' এই শেষ উক্তিতে প্রীতিলতা আপনাদের ঘরগত চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিল। এর পরেই সে চোকর পরিবেষন শুরু করে।

লতি আপনার পাশতলা থেকে একটি চামচ বার করে বললে, 'আমি সাহেবদের মতো খাই' এ কথা শেষ না হতেই যূথী সুকৌশলে চামচটা কেড়ে নিল, ফলে দুজনে মারপিট বেধে গেল। এ কারণে থালা উল্টে পড়েছিল, যূথী পা দিয়ে লতির থালাও উল্টে দিল। প্রীতিলতা খুব সহজেই দুজনকে প্রচণ্ড দুই চড়ে শান্ত করে পড়ে যাওয়া চোকরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত এক দেহভঙ্গি করে মুখ ফিরিয়ে ঘরে যেতে যেতে বললে, 'তুলে খেয়ে ফেল', এই কথাটা বার হতেই এক ঝলক ত্রাস এসে তার দেহে প্রবেশ করেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের জানলার দিকে চেয়েছিল, খানিকটা নির্ঝঞ্ঝাট স্থান সেখানে বর্তমান, খানিকটা অব্যক্ততা সেখানে ওতঃপ্রোত। এইটুকু দর্শনে প্রীতিলতা বলেছিল, 'বেচারা' আর যে, সে অন্যমনস্কভাবে কোনও আপনজনের সঙ্গে প্রত্যহের আগন্তুক হাড়ের খেলাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিল, ভেবেছিল 'বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, এমনই হতেন।' এ সব কথার কারণ এই যে, আপনজন হলে মানুষ অনায়াসেই নিগূঢ় বেদনা অনুভব করতে পাবে।

ব্রজ আজ দুদিন কোনও কিছু আনতে পারেনি, গতকাল সে বলেছিল, 'আজ এক অদ্ভুত জিনিস দেখলুম জানো —এক ভদ্রলোক লোঙ্গরখানায় . . . . ' আর কথা বার হয়নি, অনুক্ত কথার স্বর তার বিশ্রী দাড়িতে ঘোরাফেরা করতে লাগল, শায়িত প্রীতিলতা একটা চোখ খুলে ভয়ঙ্করভাবে চেয়ে থেকেই ঝটিতি উপুড় হয়ে শুয়েছিল, ব্রজ স্ত্রীর ব্যবহারে সত্যিই অস্থিহীন হয়ে পড়লে। সে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। অন্যপক্ষে, প্রীতিলতা, খানিক সামলে উঠে বসে হঠাৎ ব্রজর হাত ধরে, 'আমার বুকে হাত দিয়ে বলো, কখনও এসব গল্প . . . . আমার বড় ভয় করে', বলে আস্তে হাত সরিয়ে পুনরায় তড়িৎগতি স্বামীর হাতে হাত রেখেই ভীতভাবে বলে উঠল, 'আবার জ্বর—তাহলে. . . . '

'একটু গা গরম. . . .'

প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে ম্লান সন্ধ্যার মমত্ব ছিল, যে মমত্ব দীর্ঘশ্বাসের পরমার্থ, যে মমত্ব কিশোরীর লজ্জার লাল, আপনকার ধমনীসমূহকে ত্বক বিদীর্ণ করত বাইরে আনতে ব্রজর ইচ্ছা হল কেননা প্রীতিলতার প্রশ্নে নয় আগ্রহে, আগ্রহ নয় অনুভূতির মধ্যে সময়ের বিবেচনা ছিল, পূর্ণতা ছিল, যে পূর্ণতা দ্বার রমণীরা চিরকাল ভালবেসেছে। অতএব এরূপ প্রশ্নে ব্রজ কিছুটা ঘর্মাক্ত হল।

অন্যপক্ষে প্রীতিলতা আপনার আঁচল দ্বার স্থানটি সংস্কার করে, যূথীকে বলতে গিয়ে দেখল সে ঘুমিয়ে, লতির মুখে বুড়ো আঙুলটি, সে বলতে গিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল। ব্রজ মাটিতেই শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু প্রীতিলতা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে, 'ও কী মাথা খারাপ নাকি—আশ্চর্য আজ মাসখানেকও হয়নি ভুগে . . . . ' বলে মাদুরটা মাটিতে খানিকটা গড়িয়ে দিয়ে, একান্ত তখনও তার

হস্তগত, অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম ছোট একটি হাঁ করে ব্রজর প্রতি চোখ তুলে ধরেছিল, বলেছিল, 'জানো বুড়ো মিনষের নাকি মুখ দিয়ে . . . . .'

ব্রজ নিজের অসুস্থতার কারণে অর্থাৎ সে নিজে ভুগছে, স্ত্রীর কথায় ভীত হবার পূর্বেই বলেছিল, 'দূব. . .'

'আমারও তাই মনে হয়. . . দাঁত ফাঁত দিয়ে হয়তো পড়ে থাকবে. . . ' এই বলতে বলতে মাদুর পেতে দিয়ে বললে, 'ভেবেছিলাম তোমাকে বলব ওকে এখান থেকে চলে যেতে, তোমার শরীর. . . . '

'আঃ দূর'

'তা পরে ভাবলুম কিছু তো দিতে পারি না, অন্তত একটু জায়গা, কী বলো . গরিবকে দিলে ভগবান মুখ তুলে . . . '

পুনরায় অভুক্ত স্তব্ধতা। ব্রজ জ্বর-উত্তপ্ত চোখেই ভাবছিল, খুব আশ্চর্য নয়, প্রীতিলতা গান গাইত, প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে লালিত্য ছিল। এখন, বিশেষত আজ তার—একদা মায়াবিনী প্রীতিলতার—কণ্ঠস্বরে ক্রমাগত বালি ঝরার ভয়াবহতা। কে মনে নেই, একদা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'জ্বলন আঁধার নিভল আলো' এর মানে কী, ব্রজ নির্বোধের মতো এই হেঁয়ালির দিকে চেয়েছিল। তেমনি এই কণ্ঠস্বরের দিকে চেয়েছিল, অর্থ করতে পারেনি, হেঁয়ালির অর্থ যে পেট তা ব্রজর বুদ্ধিতে আসেনি—উদর যখন জ্বলে তখন সকলই অন্ধকার, উদর প্রজ্বলন হেতু আলোক, হায় কী অন্ধকারময়ী ! তারাই ধন্য, যারা খাবার দেখলে সত্যি সত্যি যারপরনাই ভীত হয়।

অনেকক্ষণ পর অসম্ভবভাবে ঘুম ভেঙে গেল, দেখল ছিন্নভিন্ন বস্ত্রে ভূষিতা প্রীতিলতা, আপনকার হাঁটুতে মাথা রেখে নির্লজ্জভাবে ঘুমিয়ে, অদূরে কন্যাদ্বয় দেওয়ালে—ভিজে ভিজে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কান্নার বীভৎসতা প্রকাশ করছে, একারণে ব্রজ রোজগারি বাপের মতো বিরক্ত, সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চড় মারাব জন্য কিঞ্চিৎমাত্র চেষ্টা করতেই, দেখল যে তার দুর্বল দেহটা দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে আঘাত খেলে : ইচ্ছা দেহটা যুত করতে পারেনি। খানিক দেওয়ালের কাছে সেইভাবে সে দণ্ডায়মান ছিল।

যূথী-লতি কান্না থামিয়ে চোখ বড় করে, প্রীতিলতা চোখ খুলে তাকিয়েছিল—প্রীতিলতা কিন্তু মাথা তোলেনি, ফলে যে দুঃখময় রেখা তার দেহে ভর করেছিল তা অদৃশ্য হয়ে যায়নি, কী দুগ্ধহীন-স্তনক্ষুব্ধ সে রেখা !

প্রীতিলতা বুঝেছিল, ব্রজ বার হচ্ছে, কেননা এখন সে অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার প্যান্টুলুনের ভাঁজ ঠিক করেছিল। প্রীতিলতা প্রশ্ন করল, 'কোথায় ?'

'বালিগঞ্জ ।'

প্রীতিলতা দক্ষিণ দিকে চাইল, কেননা বালিগঞ্জ দক্ষিণে, মনে হল সেখানে কী মৃত্যু নেই.. আর্তনাদ নেই ! যে আর্তনাদ আরও প্রবলতর হয়ে তাদের দরজায় ফিরিঙ্গি কায়দায় আঘাত করছে। প্রীতিলতা ভয়ে আপন মুখমণ্ডলে বস্ত্রপ্রদান করেছিল। সে ত্রস্ত শঙ্কিত। সমগ্র পৃথিবীটা যেন বা ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার নিমাই জগমণির মতো, অনেকটা ধুকুড়ীয়া বাগানের আখমাড়া ম'ম' করা রাণ্ডি যেন, যার হাস্যে সদ্য কাঁচা সর্দির আদুরে আওয়াজ, পাটের রকমারি রঙে উদ্‌ব্যস্ত রুমালে বটবৃদ্ধ শরীরটা ঢেকে বসে আর যাই হোক এ দৃশ্য খুব সুন্দর নয়।

প্রীতিলতা মুখমণ্ডলের বস্ত্র সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ফিরতে তো. . . .

হ্যাঁ সাতটা আটটা. . . .' ব্রজ এই উত্তর দিতে দিতে চলে গেল। প্রীতিলতার মনে হল কোথায় যেমন বা ব্রজ অদৃশ্য হয়ে গেল। কী দুর্দ্ধর্ষ রহস্য ! মানুষ যে দোমড়ান অনন্ত বৈ অন্য নয়, সে সত্য বুঝবার পূর্ব মুহূর্তে প্রীতিলতা প্রীতিলতার মধ্যেই থেমেছে এবং গুনগুন করে সেই গীতধ্বনি

করেছিল।

এখন সে শুয়ে, সে যখন ভাবছিল, ব্রজ দুটি ভাত না পেলে আর উঠতে পারবে না, ঠিক এমত সময়ে, যূথী প্রায় মার ঘাড়ের উপর পড়ে দ্রুত নিশ্বাসে বলেছিল, 'মা দেখো লতি কী কুড়িয়ে খাচ্ছে. . . . '

অচিরাৎ জ্যা-মুক্ত ছিলার মতন প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, সত্বর বারান্দায় গিয়ে লতির সম্মুখে দাঁড়াল। ক্ষণেকের জন্য মার মনে হয়েছিল, আমার কী যূথীর মতো হিংসে হয়েছে ! সঙ্গে সঙ্গে একটি চড়ের আওয়াজ শোনা গেল—এ চড় লতির গালে প্রীতিলতাই মেরেছিল সঙ্গে সঙ্গে লতির মুখ থেকে কী যেন ছিটকে পড়ল। পলকেই প্রীতিলতা এবং যূথী ছুটে গিয়ে দেখে, জলসিক্ত হরীতকী. . . । ছোট একটি নিরেট নিপট আর্তনাদ—আর্তনাদের সঙ্গেই ধ্বনিত হয়েছিল বহু পূর্বে সেনেটে উক্ত লাটিন ডায়লগ ঃ 'এবং তুমিও !' এ দৃশ্যে পরক্ষণেই প্রীতিলতা জলদগম্ভীর রৌদ্রকর্মা আওয়াজ শুনেছিল।

প্রীতিলতা সমাগত পবিত্র সন্ধ্যাকে কশ্চিৎ জলপ্রপাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেরূপ সদাই বিষণ্নভাবে শেষ হয়, তেমনি তার দক্ষিণ হস্ত থেকে ধ্যানপ্রসূত কতিপয় নকসা অদৃশ্য হল। সে সেই গীতটি ক্লান্তকণ্ঠে, ছোট ঘরের মধ্যে মন্থর গতিতে ঘুরে, ঘুরে, গাইছিল। ঘরে আর অন্য কারও নিশ্বাস ছিল না। এ কারণে যে যূথী-লতিকে বাপের জন্য অপেক্ষা করতে এই কিছুক্ষণ আগে মোড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এখন অন্ধকারে কোথায় যে সে, এ কথা ভুলে গেল, সে সত্যই দেওয়ালে হস্তদ্বারা অনুভব করত 'এই যে বোধ হয় আমি' এরূপ মনে করবার চেষ্টা করেছিল, এবং তৎসহ সমস্ত স্থাপত্যের প্রতি তার বীতশ্রদ্ধা এসেছিল, সমস্ত আকাশের কিছুটা নিদ্রার বাস্তবতা এখানে যে, সে তা জানত না অথবা কেউ তাকে জানায়নি—অনেকবারই সে সেখানে. দেওয়ালে, মাথা খুঁড়েছিল। কিন্তু তবু প্রীতিলতা খুব আশ্চর্য সহকারে দেখেছিল যে এরূপ সংঘাতপ্রসূত বেদনা উক্তির 'উঃ'-কারের মধ্যে বৃদ্ধের প্রভাতী গীতের রেশ বর্তমান।

ইতিমধ্যে, ইদানীং প্রত্যেহের সময়মাফিক নর্দমার লোহা আর লাঠির আওয়াজ, ভয়ঙ্কর আওয়াজ, সমস্ত দিককে বিমর্দিত করেছিল, এবং অন্ধকার কক্ষমধ্যে একাকিনী প্রীতিলতা চকিত ভীতা, আপনকার শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে কাকে যে সে রক্ষা করতে চাইল তা সঠিক বুঝা গেল না—যেহেতু এখানে অন্ধকার—সম্মুখের শূন্যতাকে অথবা নিজেকেই। (হায় প্রীতিলতা যদি বুদ্ধিমতী হত তাহলে সে দেখতে পেত, এই শূন্যতা ভেদ করে সে কখনও যায়নি !)

প্রীতিলতা ভীত হয়ে অদ্ভুতভাবে আপন আত্মরক্ষায় যত্নবান হয়েছিল। এবং একথাও ঠিক যে, সে সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আপন বস্ত্র পরিত্যাগ করে। এবং এতে করে সে আর একটি অন্ধকারে পরিবর্তিত হল।

আদতে আপনাকে ধরে রাখাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা অতীব সাধু কৌশল। ইত্যাকারে খানিক অসময় পার সত্যি হয়েছিল, কিন্তু আর পারা গেল না, কখন যে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা তার খোঁজ ছিল না।

তির্যক গ্যাসের আলোয় বসে বৃদ্ধ খানিক শ্রান্তি দূর করে শূন্যতার সংঘাত হেতু কম্পিত হাতখানি দ্বারা আপন কপাল মুছছিল. এরপর অসম্ভব মায়াজড়িত কণ্ঠে বলেছিল, 'হরি বল'—অনন্তর এখন, যখন সে কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থ বোধ করেছিল তখন সে গীতটির সুর ধরেছিল। অন্ধকার কক্ষমধ্যে ইদানীং অন্ধকারে পরিবর্তিত একটি দেহে সে গীত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, এ কারণে যে প্রীতিলতা এখনও তেমনিভাবে দণ্ডায়মান।

বৃদ্ধ গীতটি গাইতে গাইতে, খানিক স্খলিত পদে স্বভাব মতো বাইরে যাবার নিমিত্ত এখান থেকে

চলে গেল, শুধুমাত্র বস্তাটা সেখানে। প্রীতিলতা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেনি। খানিক বিবস্ত্রতা সত্ত্বেও ছুটে, থমকে, কাপড় সংগ্রহ করত কোনক্রমে জড়িয়ে, সদর দরজায় নিকটে এসে স্থির, এমত সময় সে আপনার নিশ্বাসের সময় পেয়েছিল, শব্দও নিশ্চয়। কত রকমারি নিশ্বাস প্রীতিলতা ফেলেছে উষ্ণ, দীর্ঘ, হারমানা !

এখন, সে, সদর দরজার এপাশে, অল্প গ্যাসের আলোয় সেই ঘুমন্ত ভাল্লুকের মতো বস্তাটা এবং সম্মুখেই অদ্ভুত এক ভঙ্গিসহকারে প্রীতিলতা, গৃহিণী, দণ্ডায়মান। মনে হয়, এক মুহূর্তের জন্য মুখ ফিরিয়েছিল, এমন হতে পারে সে ছায়া দেখতে চেয়েছিল। আঃ পরোক্ষ অনুভূতি !

ঝটিতি প্রীতিলতা রাস্তায় নেমে, বস্তাটায় হাত দিতেই, হস্তদ্বয় তড়িৎবেগে ফিরে, কিছুক্ষণের নিমিত্ত, আকাশহীন শূন্যতায় কম্পিত হতে থাকল। পবক্ষণেই যখন সে বস্তাটা ধবে কায়দা করার চেষ্টা করে, তখন দেখে—বৃদ্ধ হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে, একটু এসেই বৃদ্ধ কেমন যেন বা নেচে উঠল—বোধ হয় খোয়ার জন্য, তারপরই পাশের দেয়ালে হেলে পড়ে, দেওয়াল ঘষটে একটু এসেই সমগ্র জোর দিয়ে প্রীতিলতাব দেহের উপর ঝুঁকে পডল। পুরুষের স্পর্শে গৃহিণী প্রীতিলতা অচিরাৎ এক নৈসর্গিক বয়স ফিরে পেলে, সে পিঠেব ঝটকায এমনভাবে বৃদ্ধকে আঘাত করেছিল যে বৃদ্ধ টাল সামলাতে না পেরে রকে মুখ থুবড়ে পড়ল, কম্পিত, বিচলিত হাত দ্বাবা কোনক্রমে রকের কিনাবাটা ধরেছিল, চোখ দুটি চাইবার চেষ্টা করলে, মুখমণ্ডল যেন বা ফুলে উঠে, গ্যাসের আলো পেলে, মুখখানি এসময় অর্দ্ধ উন্মুক্ত ছিল , হঠাৎ বোতল থেকে তরল পদার্থ যেরূপ নির্গত হয তেমনই সশব্দে রক্ত পড়ল। এ দৃশ্যে, প্রীতিলতা মজ্জাগত মনুষ্যত্বের বশে তাকে সাহায্য করতে গিয়ে, থমকে, আপনকাব উদ্যত হস্তদ্বয় দেখেই সেই হাতে বস্তাটা তুলতে গিয়ে পুনরায় দেখল যে, রকেব কিনাব থেকে জর্জরিত হাত দুটি ধীরে নেমে গেল, ফলে সমস্ত শরীবটা তারই দিকে ঢলে পডতেই একটু সরে গিয়ে—রকে বসে পড়েছিল। শুধু মনে হল, এখনও কী মানুষেরা মৃদুস্বরে কথা কয়, ছোট করে হাসে।

প্রধূমিত কক্ষের মধ্যে প্রীতিলতা যেমত সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছিল, বহুবার সে জানলায় দাঁড়িয়েছে, গবাদ মুঠো করে পুনর্বার ফিরে গেছে। এমত সময় শুনল, দুটি কচি পদধ্বনি, এখানে এসেই যেন নিভে গেল। জানলা থেকে প্রীতিলতা বললে, 'রক থেকে দেখ তো কী হল বুড়োর'—এ কণ্ঠস্বর আজও প্রতিধ্বনিত হয়নি। যূথী-লতি দেখার পূর্বে—প্রীতিলতা বলেছিল, 'ঝট করে ক্লাবে খবর দে।'

কিছু পরে ক্লাবের ছেলেরা এল, এসে দেখে বললে, হ্যাঁ শাল্‌লা—চ বে ওঠা শালাকে . . . .'

যূথী-লতি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একবার বুড়োর বস্তার বা লাঠির বা মগেব কথা তাদের মনে হল না। ইতিমধ্যে মার কণ্ঠস্বর শুনেই তারা ভিতরে চলে গেল।

হঠাৎ হাঁড়ি উনুনে চড়েছে, তলায় আগুন, এসব দেখে তারা যেন এক পরীর রাজ্যে চলে গেল। তারা হাসল, তারা স্বাভাবিকভাবে চলতে গিয়ে সর্পগতিতে এগিয়ে গিয়েছিল।

যদিও যূথী প্রশ্ন করতে গিয়ে চুপ, তারা দুই বোন বাবু হয়ে বসে, বাপের জন্যেও একটা জায়গা করেছে, এমন সময় খানিক সুস্থ আওয়াজ। মেয়ে দুটি 'বাবা ! বাবা !' বলে উঠে গিয়েছিল।

'আজ খুব বরাত ভাল—চাল পেয়েছি,' বলে এক পকেট থেকে চাল বার করল। 'একি চাল কোথায় . . .'

'বলছি,—তোমার শরীর. . . .'

'জ্বর নেই—পাঁচটা টাকাও পেয়েছি. . .'

'বেশ বেশ . . . আর দেরি করো না, বসে পড়ো।'

গরম ভাতের সামনে বসে ব্রজর নিজেকে মানুষের মতো মনে হল, এবং প্রীতিলতাকে তারিফ

করবার জন্য বলেছিল, 'হ্যাঁ কোথায় গেলে. . .'

এ কথার উত্তর প্রীতিলতা প্রস্তুত করবার জন্য ডালভাতের ন্যাকড়াটার গিঁট খুলবার জন্য একটু ঘুরে বসতেই . . . ব্রজ তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলে, 'ওমা তোমার পাছার কাছে রক্ত . . .'

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতা ঘুরে বসেই শুনলে, লতি বলছে, 'জানো বাবা বুড়োটা মরে গেছে. . .'

প্রীতিলতা যুগপৎ বলেছিল, 'কী যে অসভ্যতা করো এদের সামনে, জানো না কিসের রক্ত—নোংরা' বলেই থেমে গিয়ে জিব কাটল।

ব্রজ দুবার 'ও ও' বলেই কেমন যেন থ হয়েছিল।

'নে খা-না তোরা', প্রীতিলতা দমকা আওয়াজ করে বলেছিল। অনন্তর গরম ভাত পাওয়ার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোনও কারণেই হোক, একটু সোহাগ-খোরাকি গলায় বলেছিল, 'বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে. . . খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না. . . .'

বেহাগ

সুশীল রায়

দূর থেকে বা কাছ থেকে যখনই কোনও গান এসে কানে ঢোকে অমনি হাঁটু দুলে ওঠে তাপসের। কখনও কখনও ঘাড় নড়ে ওঠে, আঙুলে বেজে ওঠে তুড়ি। ছেলেবেলা থেকেই নাকি তার গানের উপর স্বাভাবিক এই টান। বয়স বেড়েছে, কিন্তু এই টান তাতেও কমেনি, বরঞ্চ আগের থেকে অনেক বেড়েছে।

কোনও জলসা হোক, বিচিত্র অনুষ্ঠান হোক, স্কুল পালিয়ে চুপ করে তার সেখানে যাওয়া চাই। আদর ক'রে মা বলতেন, "আমার তপু গান-পাগলা। কালে ও মস্ত গাইয়ে হবে।"

জুতো বুরুশ করতে করতে সে গানের সুর ভাঁজে। রাস্তায় পায়চারি করতে করতে সে হাত নাড়ে। ভিতরে যে পদার্থ আছে, এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। এখন যা দরকার, তা হচ্ছে চর্চা।

কিন্তু কাউকে তার পছন্দ নয়, এমন একজন লোক তাপস পায় না যার সে শাগরেদি করতে পারে।

ভিতরটা তার সুরের আঁচে আগুন, বাইরে তার তাপ চেপে রাখা যায় না। পোশাকে-আশাকে চালে-চলনে তাপস হয়ে উঠল সত্যিকার একজন গাইয়ে। হাতের তিন আঙুলে চারটি আঙটি, পায়ে কাবলি স্লিপার, গিলে করা পাতলা আদ্দির জামা গায়ে।

ছেলের হালচাল দেখে দিগম্বরের ভাবনা হয়, বলেন, "লেখাপড়াও ছেড়ে দিল, ওর ভবিষ্যতের কথাই ভাবি।"

ভবানী দেবী বলেন, "ভাগ্য মানুষে নিজের সঙ্গেই নিয়ে আসে, তোমার ভাবনার দরকার নেই। তোমার পাঁচটি ছেলেই সমান বিদ্বান হবে—এতটা আশা করো কেন। হাতের পাঁচটি আঙুল কী তোমার সমান ?"

দিগম্বর বলেন, "সে কথা নয়। ভাবি, পড়াশুনা করলেই পাবত।"

ভবানী হয়তো একটু বিরক্তই হন, বলেন, "তুমিও লাট হলেই পারতে। সকলকে দিয়ে সব কাজ যদি হত তাহলে আর কথা ছিল না। আমার এ ছেলে হবে গাইয়ে।"

উৎসাহ পেয়ে তাপসেব মধ্যে এল উদ্যম। গানকেই সে তার প্রাণ ক'রে নিল। মনে মনে সে ভজনা করে গানের, গানের ভাবনা ছাড়া তার আর কোনও ভাবনা নেই। গুন-গুন ক'রে ভজন গায় তাপস—"চাকর রাখ জী।" গলা খুলতে ভরসা হয় না, গলা তার তৈরি কি না, তা এখনও পরখ ক'রে দেখা হয়নি।

মনে মনে বিশ্বাস করে তাপস, অন্তরাত্মা দিয়ে যা তপস্যা কবা যায় তার ফল হয়ই। ফল হল, তাপস পেযে গেল তাব ওস্তাদ।

বেল লাইনেব উপর দিয়ে সারাদিন মালগাড়ি আর প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাতাযাত করে, চাকায় ও বেলে ধাক্কা লেগে সাবাদিন এ দিকটায় লৌহ-আর্তনাদ বাজে। কিন্তু গভীব বাত্রে নেমে আসে শান্তি। মাঝে মাঝে দু-একটা ট্রেন শানিত হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে চাকাব শব্দে স্তব্ধতা চুবমাব কবে দিযে চলে যায় অবশ্য। কিন্তু এ ছাড়া সব শান্ত। সেই শান্ত অন্ধকারেব স্তব্ধ সমুদ্রেব ওপাব থেকে ভেসে আসে যেন এক মহাসংগীত।

কান পেতে তাপস সেই সংগীত শোনে। ক'দিন থেকেই শুনছে। কার এই গলা, কার এই গান—দিনেব প্রখর আলোয় সে সবই কেমন ঝাপসা হয়ে যায়।

ক'দিন খোঁজখবরের পর তাপস জানতে পারল বেল লাইনেব ওপারেব ব্যানার্জিপাডা লেনে দিন কয়েক হল এসেছেন নাকি একজন তরুণ গায়ক।— মহাদেব নন্দী।

ভাড়া বাড়ি। দু কামরার বাসা। এরই মধ্যে অন্দরেব ও আসবের আয়োজন করে নিতে হয়েছে। বাইরের দিকের ঘরের মেঝেতে লম্বা শতরঞ্জি বিছানো। এইখানে বসে গানেব বৈঠক।

পুরোদমে বৈঠক চলেছে। তবলায় বাজছে বোল, তানপুরায় ঝঙ্কার এবং সেই সঙ্গে মেয়েগলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গর্জে উঠছে পুরুষকণ্ঠ। দরজার বাইরে কতকগুলো জুতো ও স্লিপাব হুড়োহুড়ি করতে করতে এই মাত্র যেন থেমে গেছে, এমনি এলোমেলোভাবে স্তূপ করা।

দরজার বাইরে সন্তর্পণে কে এসে যেন দাঁড়াল। মিহি শান্তিপুবী ধুতি পরিপাটি করে কোঁচানো, গায়ে সূক্ষ্ম সুতিব গিলে করা জামা, জামার নীচে থেকে জালিগেঞ্জির আভা।

মহাদেব চোখ বন্ধ করে তান দিচ্ছিল। তার চোখে তাই এ দৃশ্য পড়ল না। কিন্তু ঘরের আর সকলে দেখল। সকলেই এক সঙ্গে তাকাল বাইরের দিকে। এতে সামান্য কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটে থাকবে। চোখ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মহাদেব তার সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারল, কিছু ঘটেছে যার জন্যে এই অমনোযোগ। তাই সে চোখ খুলল। এই অচেনা আগন্তুককে দেখেই তার গলা থেমে গেল। গান থামিয়ে মহাদেব বলল, "কাকে দরকার ?"

"আমি মহাদেব নন্দীর কাছে এসেছি।"

"আসুন।"

উঠে এল মহাদেব।

জিজ্ঞাসা করল মহাদেব, "আপনার নাম ?"

"শ্রীতাপসকুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু মুখোপাধ্যায় ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছি। তাপসকুমার নামেই আমার—"

মহাদেব বিনীত ভঙ্গিতে বলল, "থাক্ থাক্, আর পরিচয় দরকার নেই। আসুন, বসুন।"

তাপস ফরাসের এক পাশে আলগোছে বসল। পায়ের ধুলোয় শতরঞ্চির রং বদলে গেছে।

তাপস বলল, "সে কী। সব থেমে গেল যে। গান চলুক।"

চায়ের প্লেটে পান ছিল, একটা মুখে পুরে ওপাশ থেকে একজন বলল, "গান আলাদা জিনিস মশাই, চলুক বললেই কী চলে। এ কী টাইম্‌পিস ঘড়ি যে, দম দিয়ে কাঁটা ঘুরিয়ে দিলেই ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠবে।"

যে মেয়েটা গান শিখছিল, সে মুখে আঁচল তুলে নিয়ে হাসি ঢেকে ফেলল।

তাপসের নিজেকে যেন একটু অপ্রস্তুত বোধ হল। সে বুঝতে পারল, তার হঠাৎ এভাবে এসে পড়ায় সব যেন কেমন ভেস্তে গেছে. আড়ষ্ট হয়ে ব'সে ছিল সে, এবার একটু ঢিল হয়ে বসে সকলের মুখের দিকে তাকাল।

মহাদেব বলল, "কী খবর বলুন!'

পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমা সাফ করতে করতে তাপস বলল, "এলাম আপনার কাছে একটু শিখব-টিখব ব'লে। শুনেছি আপনি খুব ভাল ট্রেনার।"

মহাদেব হাসল, বলল, "নাম-টাম রটেছে তাহলে।"

যে লোকটি মুখে পান পুরল একটু আগে, সে বলল, 'রটেছে মানে ! তোমাকে টেনে আনলাম এ-পাড়ায়, আর নামটা প্রচারেরই ব্যবস্থা হবে না ?"

তাপস আপত্তি জানাবার চেষ্টা করে বলল, "না না। কারও মুখে শুনে আসিনি। নিজের কানে শুনে এসেছি।"

মহাদেব চোখ ইশারা করে বলল, "কী ?"

"আপনার গান। আপনার গলা। লাইনের ওপারে থাকি। রোজ রাত্রে শুনি।"

মহাদেব যেন তৃপ্তি বোধ করল। নিজের গলা দিয়ে নিজের নাম প্রচার সে নিজেই করেছে, এতে তার গৌরব যেন বাড়লই।

পান চিবতে চিবতে নিরাপদ বলল, "হবে না ? গলাখানা কেমন।"

মেয়েটি মিনমিন করে কী-যেন বলল, শোনা গেল না।

নিরাপদ বলল, "সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান, ব'লে যাননি রবি ঠাকুর ? সঙ্কোচ করে কথা বলা তোমার ফ্যাশান, নীলিমা। এতে রোজ রোজ তুমি নিজেকেই অপমান করছ। গলা ছেড়ে কইতে পারো না।"

নীলিমা বলল, "আপনার কথাটাই বলছিলাম। উঃ কী গলা।"

নিরাপদ হো-হো ক'রে হেসে বলল, "কার গলা ? আমার, না, মহাদেবের ?

নীলিমা আঙুল দিয়ে মহাদেবকে দেখিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এত খুঁত ধরতে পারেন।"

মহাদেব মুখ গম্ভীর ক'রে বসে বলল, "আমরা এখানে গান ঠিক শেখাই নে। গানের সাধনা করাই। সাধনা ছাড়া সংগীত নেই। থাকলেও আমরা মানি নে।"

তাপসের ঠিক যেন মনের মতো কথা। তার মুখের কথাটাই যেন বের হয়েছে মহাদেবের মুখ থেকে। সে বলল, "আমিও চাই এমনি লোক। ছেলেবেলা থেকে গানে ঝোঁক, মনের মতো ওস্তাদ পাইনি বলে তাই আজ পর্যন্ত শিখতে পারি নি।"

মহাদেব তানপুরায় টংকার দিল, তবলায় চাঁটি পড়ল, নীলিমা বাঁ হাঁটুর উপর কনুই রেখে বাঁ হাতে বাঁ কান চাপা দিয়ে বসল। শুরু হল বেহাগের আলাপ, আলাপের শেষে চোখ বন্ধ ক'রে গেয়ে উঠল মহাদেব—

নাম জপন ক্যোঁ ছোড় দিয়া—

বেহাগ

ক্রোধ ন ছোড়া, ঝুঠ ন ছোড়া,
তন মন ধন ক্যোঁ ছোড় দিয়া।

দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে তাপসও চোখ বুজল। তার সমস্ত তন্ত্রী ও তন্তুও যেন ওই বেহাগের বাগিনীতে ঘরবিবাগী হয়ে উঠেছে।

আসব ভাঙতে অনেক বেলা হল। এত বেলাব জন্যে তৈরি হয়ে আসেনি তাপস। খিদেয় নাড়ি জ্বলছিল, কিন্তু তার জন্যে তার কোনও কষ্ট নেই। আজ সে যে ধন পেয়েছে, এ ধন আর সে ছাড়বে না কিছুতে। তার নাম তাপস, কিন্তু কেবল নাম দিয়ে নয়, সে তার তপস্যা দিয়ে তাপস হবেই।

বান্ধব-নাট্য-মন্দির নাম দিয়ে নিরাপদরা এদিকে একটা ড্রামাটিক ক্লাব করেছে। আদি বান্ধব-মন্দির ভেঙে তাব এই নাট্যশাখাটা গড়ে তোলা হয়েছে। নবগঠিত এই ক্লাবেব কোনও গাইয়ে ছিল না, সেইজন্যেই মহাদেবকে এদিকে নিয়ে আসা। আদি ক্লাবের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যেই নিরাপদদের এই উদ্যোগ।

নিবাপদই বলে, "মহাদেব গাইযে যেমনই হোক, ও আমাদেব অ্যাসেট। ওকে দাঁড় করাতে পারলে আমাদেব ক্লাবও দাঁড়িয়ে যাবে।"

এইজন্যে মহাদেবের জন্যে নিরাপদর চেষ্টাব ত্রুটি নেই। সে যে একজন অসাধারণ আর্টিস্ট, নিরাপদব দল একথা প্রচার করে থাকে।

বান্ধব-মন্দিব আগে বছরে একবার পূজোর আগে কোনও একটা পৌবাণিক কাহিনী নিয়ে নাটক লিখিয়ে যাত্রা করত। তার মিউজিক ডিবেক্টর ছিল নিখিল বাগচী। নিখিলের নাম-ডাক ছিল এদিকে বেশ। কিন্তু মহাদেব আসার পর থেকে নিখিল চাপা পড়তে আরম্ভ করে। এই সুযোগে নিরাপদদের ক্লাব নিজেবা নাটক লিখিযে নিয়ে আরম্ভ কবল যাত্রা। গানে সুব দিল মহাদেব। রামের রাজ্যাভিষেক নিয়ে লেখা নাটক, খুব করুণ দৃশ্য আছে কয়েকটি এবং সেই সঙ্গে অভিশাপ ও নিয়তি নামে দুইটি ভূমিকা সৃষ্টি করে তাদেব মুখে দেওয়া হয়েছে বেদনার্ত গান।

এই গান শুনে অনেকে কেঁদেছে। চিকেব ফাঁক দিয়েও অনেককে চোখের জল মুছতে দেখা গেছে। এতে, আর কিছু না হোক, নিবাপদদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে' মহাদেবের নাম চালু হয়েছে এ-অঞ্চলের অন্দরে অন্দরে।

মেয়েরা আসতে আরম্ভ করেছে খুব। তারা গান শিখতে আসে। মহাদেবের গলাই কেবল আছে, এমন নয়, তার সঙ্গে বাড়তি আর একটা জিনিসও মহাদেবের আছে, নিরাপদরা এ-কথাও প্রচার করতে ত্রুটি করেনি, সি-জিনিসটি হচ্ছে হৃদয়। স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের অতি সামান্য বেতনে গান শেখায় মহাদেব।

এইজন্যে মহাদেবের অবসর কম। সকাল দুপুর বিকেল—তিন বেলাই তাকে বসতে হয় গান নিয়ে। দলে দলে মেয়ে আসে। তাপস সারাদিন এক কোণে বসে থাকে চুপ ক'রে।

নীলিমা বলল, "আমাদের দিকে নজর কিন্তু কমে যাচ্ছে মহাদেবদা।"

মহাদেব তাপসের দিকে চেয়ে বলল, "তোমরা দু'জন হচ্ছ আমার প্রথম শিষ্য, তোমাদের দিকে নজর কখনও কম হতে পারে ?"

তাপস বলল, "ঠিক। তা কখনও কম হতে পারে ? আমার কিন্তু একথা কখনও মনে হয়নি।"

নীলিমা একটু ঝাঁজ দিয়েই বলল, "আপনি মহানুভব। তার উপর বাপের টাকা আছে।"

মহাদেব বলল, "ও কথা থাক। তোমাদের দু'জনের জন্যে এবাব থেকে স্পেশাল ক্লাস নেব। সন্ধের পর।"

এতে তাপস চট্ করে রাজি হয়ে গেল। তার আর অসুবিধে কী। তার বাড়ি তো বেশি দূর না, লাইন পেরলেই। কিন্তু অসুবিধে নীলিমার। তাকে যেতে হয় ঢাকুরিয়া পেরিয়ে যাদবপুর।

মহাদেব বললে, "পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে। তার জন্যে ভাবনা নেই।"

কিন্তু পৌঁছে দেবার কোনও ব্যবস্থাই হল না। মহাদেব মনে মনে যে হিসেব করেছিল, তা গোলমাল হয়ে গেল। তাপস নিজের উদ্যোগেই যাবে, মহাদেব এই রকম ভেবেছিল—কিন্তু তাপস গা করে না। তার যেন রোজই কী কাজ থাকে। তা ছাড়া, তাপসকে নীলিমারও বিশেষ পছন্দ নয়। লোকটা কেমন আড়ষ্ট, আর কেমন-যেন অদ্ভুত ধরনের। গান শিখতে এসেছে, কিন্তু গলা খুলতে চায় না। বলে, "বসে বসে শুনি। ধীরে ধীরেই রপ্ত হয়ে যাবে।"

কয়েক বছর কেটে গেছে। আদি বান্ধব-মন্দিরে এখন কেবল তাস খেলা হয়, বান্ধব-নাট্য-মন্দির যাত্রা-থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে এখন খেলে ব্যাডমিন্টন। ক্লাব দুটোর পরিবর্তন বা বিবর্তন, যাই বলা যাক, একটা-কিছু ঘটেছে, কিন্তু মহাদেবের আর কোনও বদল নেই। সে বসেছে শিকড় গেড়ে। শিকদারবাগান লেনে সে ছিল অখ্যাত অজ্ঞাত ও অপরিচিত, দুটি ক্লাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে এদিকে এসে এখন হয়ে উঠেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরশিল্পী।

তার ছাত্রীদের মধ্যে অনেকের বিয়ে হয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—বেহালায়, বরাহনগরে, বনহুগলিতে, টালিগঞ্জে। তাদের এলাকায় কোনও জলসা হলে তাদের স্বামীদের উদ্যোগে ডাক আসে মহাদেবের। স্কুলমাস্টারি নিয়ে নীলিমাও বছর-দুই হল আসানসোলে চলে গেছে। পুরনোদের মধ্যে আছে একমাত্র তাপস।

জলসায় পুরনো ছাত্রীরা দেখে তাদের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে এসেছে সেই পুরনো লোকটি। কী যেন নাম ? মনে পড়ে তাদের—তাপসকুমার।

আসানসোল থেকে গরমের ছুটিতে নীলিমা কলকাতায় এসে ব্যানার্জিপাড়ায় এল একদিন। মহাদেবের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে ঢুকেই সে দেখল, ঘর ভরতি মেয়ে। মহাদেব তাদের গলা সাধার প্রণালী বুঝিয়ে দিচ্ছিল তখন। নীলিমা নমস্কার করে বসল। বসে ওদিকের কোণের দিকে তাকাতেই দেখল, সেই লোকটি—তাপসকুমার।

লোকটা পুরনো, কিন্তু একটু যেন নতুন বলে ঠেকল নীলিমার। পরনের জামা-কাপড়ে জেল্লা যেন কিছু কম।

তাপস ওখান থেকেই হাত তুলে নমস্কার ক'রে ঘাড় কাৎ করে জিজ্ঞাসা করল, "ভাল আছেন।"

নীলিমা বলল, "চলে যাচ্ছে।"

মহাদেব এতক্ষণে বলল, "এই যে, কী খবর বলো। আড়াই বছর কেটে গেল, একটা খবর পর্যন্ত নিলে না। কেমন আছ ? একটু মোটা হয়েছ দেখছি।"

নীলিমা স্পষ্টভাষী বলে বদনাম আছে, বলল, "খবর নেওয়া মানেই তো আপনাকে ডিস্টার্ব করা। এসে বসে আছি পাঁচ মিনিট, এতক্ষণে নজরে পড়লাম।"

নীলিমা উঠে দাঁড়াল, বলল, "আজ যাই। দিন-কয়েক আছি কলকাতায়, আবার পারি তো আসব। আপনিও বড় ব্যস্ত আছেন। আচ্ছা চলি, কী বলে গিয়ে, তাপসবাবু।"

মহাদেব বলল, "এসো।"

তাপস তার অনুকরণ ক'রে বলল, "আচ্ছা।"

পথে নেমে এল নীলিমা। আচ্ছা লোক যা হোক। যেমন ওস্তাদ, তেমনি তার শাকরেদ। এতদূর থেকে দেখা করতে এল, একটা ভদ্রতা বা সৌজন্য দেখাতে পারল না তারা। আর সে জীবনে কখনও আসবে না এখানে।

গত মাসে নিরাপদর বিয়েতে গিয়েছিল মহাদেব ও তাপস। বিয়ে থেকে আসার পর থেকে নিরাপদর সঙ্গে আর দেখা নেই। তাপসও যেন কেমন একটু মনমরা। সকাল দুপুর সন্ধ্যা ক্লাস হয়,

তাপস চুপচাপ বসে থাকে এক কোণে ; কারও দিকে তাকায়ও না, কোনও কথার মধ্যে থাকেও না।

জিজ্ঞেস করলে বলে, "ভাবছি। ওই সুরগুলো টুকে নিচ্ছি মনে মনে। এবার একদিন বসব শিখতে।"

"নিরাপদর সঙ্গে দেখা হয় ?"

"উঁহু। বিয়ের পর থেকে আর আসে না।"

"বিয়েতে গিয়েছিলে ? বউ কেমন হ'ল।"

তাপস একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, "গ্র্যাণ্ড। এগজাক্ট নীলিমার মতো দেখতে।"

"নীলিমা কে ?"

তাপস মাথা তুলে তাকায়, বলে, "তাকে চেনো না বুঝি ? একজন ছিল এখানে।"

দিগম্বরের এখন প্রায় দিগম্বর-অবস্থা। পেন্সন পাচ্ছেন, চলে যাচ্ছে। বড় ও মেজ ছেলে বিয়ে করেছে, দু'জনেই বম্বেতে আছে, কিছু পাঠাতে পারে না। ছোট দু'জন কলকাতাতেই ছোট চাকরি নিয়েছে, আয় বেশি না। আর একটির হিসেব নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না।

ভবানী দেবী বলেন, "বাদ দাও না ওকে। মনে করো, ও ছেলে তোমাব হয়নি।"

দিগম্বর ছোট গামছা পরে কলঘরে যাচ্ছিলেন, দাঁড়িয়ে বললেন, "ছেলে তো কোনটাই আমার হয়নি। আমার কথা বলছি নে, তোমার কথাই ভাবছি। আমি গত হলে কে দেখবে ?"

"আর চারজন যেমন দেখছে। ও-ও তেমনি দেখবে। তা ছাড়া গানে কী পয়সা নেই। মহাদেব নন্দী সংসার চালাচ্ছে না ?"

দিগম্বর বললেন, "সবাই তো মহাদেব নন্দী নয়, কেউ কেউ যে আবার তাপস মুখুজ্জে। সাত বছরে গান শেখা হয় না ? বিশ্বেস করি নে।"

দিগম্বর কলঘরে ঢুকে পড়লেন।

আব যারই যত উদ্বেগ থাক্, তাপসের বিন্দুমাত্র কোনও চঞ্চলতা যেন নেই। সে নিয়মিত হাজিরা দেয় মহাদেবের আসরে, নিয়মিত বসে থাকে এক কোণে, কখনও কখনও বা মাথা নেড়ে নেড়ে তাল দেয় গানের সঙ্গে সঙ্গে।

কাজ যে সে করে না একেবারে, এমন তো নয়। একটা আসরে এইভাবে সঙ্গ দেওয়া কী কাজ নয় ? আরও তো কত গাইয়ে আছে এ শহরে, তাদেব বৈঠকে এমন একজন লোক কী কেউ দেখেছে ?

মহাদেব বুদ্ধিমান লোক। সে তাপসকে লক্ষ করে, দরকার হলে দু-একটা কথা বলেও, কিন্তু তাকে কোনদিন সামান্য বাধা দেয় না।

একদিন মহাদেব ভিতরের ঘর থেকে এ ঘরে এসেই বলল, "এই যে এসেছ তাপস, এক কাজ করো, হারমোনিয়ামটা বের করো। ওরা সব এসে পড়ল বলে।"

প্রথমটা তাপস চমকে উঠেছিল, হঠাৎ তুমি সম্বোধনটা শুনে তার আশ্চর্য লাগে। একবার মহাদেবের মুখের দিকে চেয়ে নেয়, ও কিছু না, এতদিনের পরিচয়ের দরুন ওটা নেহাতই আন্তরিকতার নমুনা বলে তার মনে হয়। কিন্তু ওই একই কারণে তার দিক থেকে ও ধরনের সম্বোধন করা যে সম্ভব নয়, তা সে বোঝে। তাপস ধীরে ধীরে উঠে হারমোনিয়াম বের করল। না বলতেই তবলাও চৌকির তলা থেকে টেনে তুলল।

পূবের রোদ্দুর এসে পড়েছে জানালা দিয়ে। মহাদেব একটা সিগারেট ধরিয়ে চাপ চাপ ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগল। আজ তার মনে নতুন একটা খুশি যেন এসেছে। কিসের এ খুশি, বুঝতে চেষ্টা করল না তাপস।

মহাদেব বলল, "খুব চটেছে।"

তাপস বলল, "কে ?"

মহাদেব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কাঁধ দুলিয়ে একবার হাসল, বলল, "মেয়েদের কাণ্ড। বড় সেন্টিমেন্টাল। লম্বা অনুযোগ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে একটা।"

সে কে, তাপস দ্বিতীয়বার আর তা জিজ্ঞেস করতে পারল না।

ইতিমধ্যে একে একে আসতে আরম্ভ করল মেয়েরা। গান শুরু হয়ে গেল।

মনোরমা বলল, "বাবা বলছিলেন, নতুন কোনও গান দিতে। আমার মাসিমা এসব গান শিখে গেছেন আপনার কাছ থেকে। বাবার তাই এগুলো পুরনো লাগে।"

মহাদেব মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে, চোখে তার কৌতুক খেলে গেল, সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল, "তোমার মাসিমার কাছে বুঝি তোমার বাবা রোজ গান শোনেন ?"

মেয়েদের মধ্যে হাসাহাসি পড়ে গেল অমনি। মনোরমার মুখ লাল হয়ে উঠল।

মনোরমা গানের খাতা তুলে নিয়ে বলল "আপনি ভারী অসভ্য।"

বলেই সে হনহন করে চলে গেল। তাপসের মুখ দেখে মনে হল, সে যেন একটু খুশি হয়েছে। আপনি থেকে চট্ ক'রে তুমি বলে যে তাকে সম্বোধন করতে পারে, তার এমন-একটু শিক্ষা হওয়া ভাল। সেও মনোরমার মতো এমনি যদি লাফ দিয়ে উঠে চলে যেতে পারত, তবে মন্দ হত না। কিন্তু সে শক্তি যেন তাঁর নেই। কিসের মায়ায় সে যেন আচ্ছন্ন হয়েছে, কিসের বাঁধনে সে যেন বাঁধা পড়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই দিগম্বর মারা গেলেন। একটা অঘটন ঘটে গেছে মনে হল মহাদেবের। এই আসরের ওই কোণটা ফাঁকা। আজ আট-নয় বছর যে স্থানটা ছিল ভরাট, আজ তা শূন্য।

এগারো দিন বাদে ন্যাড়ামাথায় একটা রুমাল বেঁধে পুনরায় নিজের কোণটি দখল করে বসল তাপস। আসরের শূন্যতা পূরণ হল বটে, কিন্তু আসরটার কেমন যেন মৃতপ্রায় দশা। মেয়ের সংখ্যা খুব কম, যারাও আসে তারাও বড় গম্ভীর।

মহাদেব বলল, "মেয়েদের নিয়ে বড় মুশকিল। মনোরমা যা-তা কথা রটিয়েছে। মেয়েরা তাই আসতে চায় না। আমি নাকি ওদের বাপ-মা তুলে রসিকতা করি। সেদিন বলছিলাম না, খুব চটেছে ? সে কে জানো ?"

—"কে ?"

—"আসানসোলের নীলিমা। তাকে নাকি সেবার যথেষ্ট খাতির করা হয়নি।"

তাপস একটু নড়ে বসল, মাথা নিচু করল, কোনও মন্তব্য করল না।

মহাদেব বলল, "মেয়েরা বড় দাম্ভিক হয়, তাই না ?"

তাপস সামান্য একটু হাসল, বলল, "কী জানি।"

সামান্য একটু তামাশা থেকে এমন অসামান্য ব্যাপার ঘটবে, এতটা আশঙ্কা করেনি মহাদেব। মহাদেবও নিজেকে গাইয়ে বলে বিশ্বাস করে না, সে হচ্ছে গানের কারবারি। তার সেই কারবার এবার প্রায় যায়-যায় হয়ে উঠল। এবার তাব জীবিকায় এসে যেন হাত পড়েছে। কী করা যায় কিছু সে বুঝে পাচ্ছে না। নিরাপদর কাছে গিয়ে পরামর্শ নেবে কিনা ভাবছিল, কিন্তু নিরাপদও নাকি এখানে নেই। ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে। বউয়ের নাকি অসুখ। তবু বরাত ভাল মহাদেবের, এ-দুঃসময়ে তার সঙ্গী আছে একজন।

তাপস বলল, "আমিও যে কী করব, তাই ভাবছি। গানের দিকে এলাম, কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কী।" বাধা দিল মহাদেব, বলল, "নীরব কবি যদি থাকতে পারে, নীরব গায়ক থাকবে না কেন ? তুমি হচ্ছ সাধক, তুমি সেই নীরব কবি।"

তাপসের মন দমে গিয়েছিল, আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। তপস্যার তপোবন সে পায়নি, কিন্তু সে পেয়েছে আসরের একটি কোণ, সেই কোণে সে বসল দৃঢ় হয়ে।

মহাদেবের কথায় কাজ হয়েছে দেখে সে মনে মনে খুশি হল। এই অসময়ে একজন সঙ্গীকে হাতছাড়া করা ঠিক না।

মহাদেব বলল, "কদিন থেকেই ভাবছি। ঠিক ক'রে উঠতে পাবিনি। ভাবছি, বাড়তি সুবিধে দেওয়া হবে প্রচার করলে যদি মেয়েরা আবার আসে।"

তাপস বলল, "কী সুবিধে।"

"মেয়েদের পৌঁছে দেওয়া হবে। এতে তোমার কোনও অসুবিধে নেই নিশ্চয় ?"

তাপস বলল, "কী আর অসুবিধে।"

কিন্তু বীজ পুঁতলেই ফল ফলে না। সময় লাগে। মহাদেবের এই নতুন পরিকল্পনাব ফল ফলতে কিছু দেরি হল। মেয়েরা আসতে আবম্ভ করল একে একে। পুরনোর মধ্যে কেউ না, সব নতুন মুখ।

আসর ভাঙার পর তাপস তাদের ট্রামে-বাসে তুলে বা বাসায় পৌছে দিয়ে আসে।

এ কাজ তাপসের খুব খারাপ লাগছে না। ভাল ভাল জামা কাপড় পরা মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলতে বলতে যাওয়া দেখে পাড়ার পাঁচটা ছেলের কাছে তার তো কদর বাড়ছে। কদরের কী কোনও দাম নেই।

সে শান্তিপুরী ধুতি নেই, মিহি কাপড়েব গিলে করা জামা নেই, হাতে আঙটিও নেই ; এখন পবনে ঢোলা পাজামা ও ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি। আর্টিস্ট হলে এমনি এলোমেলো সাজই মানায়। সেদিক থেকেও তাপসের মনে কোনও গ্লানি নেই।

এইভাবে দিন কাটাতে কাটাতে তাপসের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, সে সত্যিই একজন আর্টিস্ট। হাতে একটি ছোট্ট পিতলের হাতুড়ি নিয়ে মাথা নিচু করে গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করতে কবতে সে চলেছে, জিতেন্দ্র গুপ্তেব ডাক্তারখানা থেকে ওদের প্রতিবেশী হরিপদ বলল, "কী সার্ গাইয়ে, কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে ?"

তাপস মাথা তুলে চেয়ে বলল, "তবলাটা নিয়ে আসি গিয়ে।"

মনে মনে হাসতে লাগল তাপস, এবার লোকে তাব সঙ্গে যেচে আলাপ করতে আবম্ভ করেছে। কই, অ্যাদ্দিন আছে এদিকে, কেউ তো কোনদিন তাপস কী তাপসবাবু ব'লে ডাকেনি। এখন সবাই বলে সার্, বলে গাইযে।

মাথা দুলিয়ে, গুন-গুন ক'রে আঙুলে তুড়ি দিতে দিতে টাটা রোদ মাথায় নিটে হেঁটে চলে তাপস।

ফেরার পরে হরিপদ বলল, "কদ্দুর এগল ?"

কথার মানে না বুঝে তাপস বলল, "ধীরে ধীরে চলেছে।"

হো হো করে হেসে উঠল হরিপদ। বলল, "হাল ছেড়ো না, যেমন বিড় বিড় করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাও, মনে হয় কেল্লা বুঝি ফতে করে ফেললে।"

কিন্তু হবিপদরা চেনে না তাপসকে। তার মনে সে জোর কই, সে সাহস ? সে যায় নিছক একজন চবণদার হয়ে। সে যে ইতিমধ্যে মহাদেবের আসরে পাতা শতরঞ্চিটার ধুলোরই শামিল হয়ে গেছে, তা জানে না হরিপদরা। কিংবা জেনেশুনেই তারা এই ন্যাকামো করে ?

তাপস তবলা নিয়ে ঢুকতেই চটে লাল হয়ে উঠল মহাদেব, বলল, "বেকুব না রাস্কেল, কী তুমি ? শেফালি ব'সে আছে কখন থেকে, তাকে দিযে আসতে হবে না ? তবলা এখন না এনে বিকেলে আনলে হত না ?"

তাপস ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হল, এখনই বুঝি তাকে মহাদেব বরখাস্ত ক'রে দেবে। চৌকিব নীচে তবলাটা তাড়াতাড়ি চালান ক'রে দিয়ে সে মহাদেবের চোখের দিকে চেয়ে বলল,

"দিয়ে আসছি। দুপুরে টাইম দিয়েছিল কিনা।"

ব্যঙ্গ ক'রে উঠল মহাদেব, "ইডিয়েটের মতো আর কথা বলো না। টাইমের জ্ঞান খুব দেখিয়েছে।"

শেফালিকে নিয়ে রওনা হল তাপস। শেফালির তানপুরাটা নিয়ে নিল নিজের হাতে। ধীরে ধীরে সে হেঁটে চলল তার পাশাপাশি। আর মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, "মানুষটি বড় ভাল বুঝলেন ?" আপনাদের অসুবিধে হলে মাথা গরম হয়ে যায়। তাই চটেছেন, ও কিছু না।"

ডিস্পেন্সারিতে বসে হরিপদ এই দৃশ্যটি দেখে মনে মনে হয়তো ঈর্ষান্বিত হল। কিন্তু হরিপদরা জানে না ঈর্ষার পাত্র তাপস নয়।

শেফালিকে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে আবার হরিপদর সঙ্গে দেখা। হরিপদ বলল,"কী রকম দেয় তোমাকে ?"

"কে ?"

"তোমার মনিব। মহাদেব নন্দী।"

তাপস বলল, "কী করে দেবে ? তার তো চলা চাই। বাড়তি যদি হয়, তবে নিশ্চয় পাব।"

হরিপদ বলল, "তোমার চলে কী করে ?"

"ভাইরা আছে। তারা চালায়।"

হরিপদ হাসল। কোনও কথা বলল না। ডিস্পেন্সারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল, তাপস তুড়ি দিয়ে আর মাথা নেড়ে কী-যেন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল।

ব্যানার্জিপাড়া লেনে ঝলমলে রোদ্দুরে বিচিত্র শাড়ির রং জ্বলে ওঠে রামধনুর বর্ণালির মতো। সে রঙের আগে আগে চলে আধময়লা পাজামা ও ঢিলে পাঞ্জাবির একটি অগ্রদূত। দিনের পর দিন চলেছে এইভাবে, এইভাবে কেটে যায় বছরও।

নিরাপদ বদলি হয়ে গেছে মুসৌরি। তাই তার সঙ্গে অনেকদিন আর দেখাসাক্ষাৎ নেই। ক'দিনের ছুটি নিয়ে এবার সে এসেছে। মহাদেবের সঙ্গে রাস্তায় তার দেখা। মহাদেবের আসর এখন জমজমাট, সেখবর দিতে সে ভোলেনি। নিরাপদ হেসে আকুল। একটা বাল্য-লীলার মতো মনে হয় সব। একটা ছেলেমানুষী রেষারেষির জন্য মহাদেবকে এখানে টেনে আনা। এখন সেই মহাদেবই এখানকার একজন পাকা বাসিন্দে।

নিরাপদ বলল, "যাব যাব। দেখে আসব তোমার আসর।"

মহাদেব বলল, "প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলাম মাঝখানে। তখন মনে হত— ফি-পদ বিপদময় নিরাপদ নাই কোনওখানে।"

নিরাপদ মহাদেবের পিঠ চাপড়ে দিল।

পরদিন মহাদেবের আসরে গিয়ে উপস্থিত হল নিরাপদ। উঁকি দিয়ে দেখল, সব নতুন মুখ—সব অজানা অচেনা। আর একটু ভিতরে ঢুকতেই দেখল একটা অতি পরিচিত পুরাতন মুখ বসে— তাপসকুমার। কিন্তু সে জেল্লা আর নেই, নেই সেই জলুস।

মহাদেব বলল,"এসো এসো। ভিতরে এসো।"

পাঁচ-ছয় বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ের হাত ধরে ঢুকল নিরাপদ।

মহাদেব বলল, "এ কে ?"

"কন্যা।"

"তোমার মেয়ে ?"

"হ্যাঁ।"

তাপস কোণ ছেড়ে উঠে এসে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল মেয়েটাকে। একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে মেয়েটার মুখের দিকে, কী যে দেখছে, বোঝা কষ্ট। তাপসের তাকাবার ধরন দেখে মেয়েটা নিরাপদর

কোল ঘেঁষে দাঁড়াল। আর এক পা এগিয়ে তাপস তাকাল মেয়েটির দিকে।

হঠাৎ মহাদেবের গলা শুনে তাপস সোজা হয়ে দাঁড়াল। মহাদেব বলল, "আমার চটিটা গেল কোথায়?"

চৌকির নীচে উঁকি দিয়ে পেল না তাপস, শতরঞ্জির ভাঁজ থেকে বের করে মহাদেবের পায়ের কাছে এগিয়ে দিল।

চটি পায়ে দিয়ে মহাদেব ভিতরে গেল।

নিরাপদর কাছে সব যেন কেমন অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক ঠেকল। সে আড়চোখে তাকাতে লাগল তাপসের দিকে।

তাপস মেয়েটির দিকে চেয়ে নিরাপদকে বলল, 'আপনার মেয়ে? গাণ্ড দেখতে হয়েছে কিন্তু।"

মহাদেব ফিরে এসে বলল, "চা করতে বলে এলাম। তাপস, সোনা চট ক'রে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো। জলদি এসো, মেয়েদের আবার পৌঁছে দিতে হবে।

হাত পেতে পয়সা নিয়ে তাপস মহাদেবকে বলল, দেখেছেন? এগজাক্ট নীলিমার মতো দেখতে।"

মহাদেব তাপসের মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, বলল, 'আচ্ছা যাও।"

নিরাপদ বলল, "ওর মায়ের মতোই নাকি দেখতে হয়েছে, ও কী বলছিল?

"নতুন কিছু না। পুরানো কথা। বলব অখন।"—ব'লে মহাদেব কী যেন চিন্তা করতে লাগল।

নিরাপদ বলল, "হঠাৎ যেন বড় চিন্তায় পড়লে।"

মহাদেব মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "চিন্তার কথাই বটে। ভাবছিলাম ওই তাপসটার কথা।"

নিরাপদ বলল, "ঠিক। লোকটা কী ছিল, কী হয়ে গেল। আমিও ভাবছিলাম তাই।'

বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে লাগল মহাদেব। বলল, বলব অখন।

সিগারেটের প্যাকেট হাতে হনহন ক'রে চলে আসছে তাপস হরিপদ ধরল, বলল, "সিগারেট ধরলে কবে থেকে?'

তাপস বলল 'না আমার না।"

"মনিবের বুঝি? দিনে মাইনের এ কাজে দরকার কী?"

কী করব তা হলে?

হরিপদ বলল, "কাজের অভাব? কমপাউণ্ডার হবে? চাকরি খালি আছে, দিতে পারি জোগাড় ক'রে।"

চাকরির কথা শুনে তাপস যেন ভয় পেয়ে গেল, বলল, "আঠারো বছর আছি যে লাইনে, সে লাইন কী ছেড়ে আসা ভাল?"

হনহন ক'রে চলে গেল তাপস। নিরাপদ তার মেয়েকে নিয়ে না চলে যায়, এই যেন তার তাগাদা।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬১

মাধবীর জন্য

প্রতিভা বসু

হঠাৎ মাধবীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আমি নিউ মার্কেটে ফুল কিনতে গিয়েছিলাম, দেখি এক ভদ্রমহিলা ওজন নিচ্ছেন দাঁড়িয়ে। ওজন নেবার মতোই বটে। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একজন ভদ্রমহিলার যতখানি বাড়া সম্ভব, উনি ঠিক ততখানি বেড়েছেন। আগে লক্ষ করিনি, হঠাৎ চোখে পড়ল। সাহেবি পোশাকে সজ্জিত পুরুষটিকে দেখে, ওঁকে তাঁরই স্ত্রী ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু একটু পরেই বুঝলুম ভদ্রমহিলাটি আমাদেবই মাধবী এবং ভদ্রলোকটি মাধবীব স্বামী। স্তম্ভিত হলাম।

'এ কী বকুল যে—'

'বাঃ, তুমি কোত্থেকে।' এই হল আলাপের সূত্রপাত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাধবী আমাকে রেহাই দিল না, জোর করে নিয়ে এল ওর বাড়িতে ; বলল, 'আমাব কথা তোমাকে শুনতেই হবে, আমি যে একটা অমানুষ বা পাষণ্ড নই, সে-কথা তোমার জানা দরকার।'

বাড়িটি বেশ। একতলা ছোট বাড়ি, সাজানো-গুছোনো—মাধবীর নিখুঁত হাতের ছাপ সর্বত্র। বছর দশেকের একটি মেয়েকে ও নিয়ে এল—'মাসিমাকে প্রণাম কর, লক্ষ্মী।'

আমি দুই চোখ মেলে লক্ষ্মীকে দেখতে লাগলাম—দেখতে লাগলাম বললে ভুল হয়, গিলতে লাগলাম, আর আমার চোখের তলায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী অস্বস্তিতে মবে যেতে লাগল। অবশেষে দুই হাতে ওকে কোলের উপর টেনে এনে মাথায় অজস্র চুমো খেয়ে বললাম, 'ওকে তো আমার কিছু দেওয়া উচিত, না মাধবী ? আমি হলাম মাসিমা।' হাত থেকে অতি প্রিয় এবং অতি দামী একমাত্র গহনা আমার হীরের আংটিটি ওর কচি নরম আঙুলে পরিয়ে দিলাম। ঢলঢল করতে লাগল, মাধবী রাগ করতে লাগল, কিন্তু তবু আমি কিছুতেই আর তা খুলে নিলাম না।

মাধবীর নতুন স্বামীটি দেখলাম বেশ ভালমানুষ। চা খেতে খেতে সামান্য আলাপ হল। কথাবার্তায় অতিশয় ভদ্র এবং মার্জিত। চা খেয়েই উনিই বেরিয়ে গেলেন কোথায়। মাধবী এবার ঘনিয়ে বসল কাছে।—'লক্ষ্মী, যা তো বাবা—তোর মাসির সঙ্গে আমার কথা আছে।' আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে লাগল। কী বলবে মাধবী, কী কথা আছে ওব ?'

'তুমি নিশ্চয় ভাযনক অবাক হয়েছ—'

মাথা নেড়ে বললাম, 'বলাই বাহুল্য।'

'তবে যে কিছু জিগ্যেস করছ না ?'

'কিছু একটা হয়েছে।' নেহাত উদাসীনভাবে কথাটা এড়াবার চেষ্টা করলাম।

'তোমার কী মনে হয় ?' আমার যা মনে হয়েছিল তা যে ঠিক নয় সে বিষয়ে যেন হঠাৎ আমি সন্দিগ্ধ হলাম। বললাম, 'তুমি যা বলবে বলো না।'

মাধবী কথা ঘোরাল, 'আমার স্বামীকে তোমার কেমন লাগল ?'

'ভালই তো।'

'কে বেশি ভাল—অশোক, না এই ভদ্রলোক ?'

এ নামটা আমার সয় না। শুনলে ভিতরে ভিতরে বিশ্রীরকম একটা যন্ত্রণা হয়। জবাব যে কী দেব ভাবতে একটু সময় নিয়ে বললাম, 'আমার চেয়ে তা তুমিই ভাল জানো।'

মাধবী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার প্রায় দশ বছর পরে দেখা, এই ক' বছরে যদি আমার স্বামীর মৃত্যু হয়ে থাকে তা কী খুব আশ্চর্য ?' একটু থেমে, 'আর মৃত্যুর পরে যদি আমি বিয়ে করি সেটা কী খুব অন্যায় ?'

মাধবীর কথার ধরনে প্রথমে যে বিষয়ে আমি চিন্তিত হয়েছিলাম তা ধূলিসাৎ হল। অশোকের মৃত্যু যে আমার পক্ষে বেদনাদায়ক হবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু সে বেদনা যে এত গভীরেও নাড়া দিতে পারে তা আমি জানতাম না। অনেকদিন আগেকার আরেকটা দুঃখের স্বাদ মনে পড়ল। নতুন করে অভিভূত হলাম। মুখ নিচু করে জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছিল ওর ?'

'খুব সম্ভব যক্ষ্মা।'

'যক্ষ্মা !'

'বোধ হয়।'

মুখ তুলে বললাম, 'বোধ হয় কেন ? অসুখটা কী তা কি শেষ পর্যন্তও জানা যায়নি ?'

'শেষ পর্যন্ত আমি জানিনে—কেননা আমার যখন সন্দেহ হতে শুরু হল তখনই আমি ওকে পরিত্যাগ করে আসি।'

'পরিত্যাগ ? কথাটা আমার মুখ থেকে যেন সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়ল, 'তবে যে তুমি বললে অশোকের মৃত্যু হয়েছিল ?'

'পরিহাস করেছি।'

'এ সব নিয়েও কি পরিহাস তোমার আসে ?'

'স্বচ্ছন্দে ! আমাকে নিয়েই বা অশোক কম পরিহাসটা করল কী ?'

'অশোক বেঁচে আছে ?'

'তাই তো জানি।'

নড়ে-চড়ে সহজ হয়ে বসে বললাম, 'তবে ওর জীবদ্দশায় ওর মেয়েকে তুমি পেলে কী করে ?'

'সেটুকু দয়া করবার উদারতা ও শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছিল আমাকে।'

নিশ্বাস ফেলে নীরবে বসে রইলাম। মাধবী বলতে লাগল, 'আশোকের সঙ্গে বিয়ে হবার পরে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম ভাঙা আর জুড়বে না, তালি আর টিকবে না। খুব অবাক হবে এবং বিশ্বাসও করবে না হয়তো যে বিয়ের পরে পুরো চার বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম, কিন্তু একদিনের জন্যেও আমবা একসঙ্গে শুইনি। প্রত্যেক রাত্রে একই ঘরে পাশাপাশি খাটে দুজনে দুজনের নিশ্বাস শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। একদিন আমি সারারাত কেঁদেছিলাম, আর সারারাত চুপ করে বসে ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। আমি বললাম, 'এরকম যন্ত্রণা কি জীবন ভরেই পাব ?' বললে, 'কেন, আমি কী তোমাকে কষ্ট দিই, আমি কী ভাল ব্যবহার করিনে ?'

কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'ভয়ানক কষ্ট দাও—ভাল যদি না-ই বাসবে তবে কেন এরকম করলে ?

বিষণ্ণ মুখে বলল, 'মাধবী, আমি লম্পট, আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু আমারও তো হৃদয় আছে, আমারও তো সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে—অনুতাপ আছে। কয়েকটা দিন, অন্তত আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও—একলা থাকার অবসর দাও—' দুই হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে ও কাঁদতে লাগল পাগলের মতো। আমি হাত ধরে উঠিয়ে বসালাম, শান্ত করলাম—বললাম, 'অশোক, আর আমি তোমাকে পীড়ন করব না, যেদিন মনে পড়বে আমার কথা সেদিনই তুমি আমার কাছে এসো, আমাকে ডেকো—কিন্তু দায়ে পড়ে ভালবাসার ভান দেখিও না, সে আমার সইবে না।'

'তার পরদিনই আমি মার কাছে চলে এলাম।'

'টানা ছ'মাস ছিলাম কিন্তু তবু সে আমাকে ডাকল না। ফিরে যেতে সে লিখেছিল, কিন্তু আমি জানতাম সেটা তার একান্তই আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে। স্ত্রীকে পিত্রালয়ে ফেলে রাখতে তার রুচিতে বেধেছিল। আমি ফিরে গিয়ে তার একটুও পরিবর্তন দেখলুম না। তবে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে কী হত জানিনে, কেননা শেষের দিকে আমাকে যেন ও ভালবাসতে শুরু করেছিল

মনে হত। কিন্তু আমি তার অবসর দিলাম না। অনেকদিন এমন হয়েছে যে, শুতে এসে দেখেছি, আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে মেয়ে নিয়ে খেলা করছে। বলেছি, 'ওঠো, এবার আমি শোব।' হাত দিয়ে নিজের পাশে দেখিয়ে দিয়েছে, 'শোও না।' 'ধ্যেৎ'—আমি অমনি প্রতিবাদ করেছি। 'তবে কিন্তু মেয়ে নিয়ে যাব।' 'অনায়াসে,' সাংঘাতিক ঠাণ্ডাভাবে আমি জবাব দিয়েছি।

'ঈশ,' অশোক হেসে বলেছে, 'মেয়ে যদি সত্যিই নিয়ে যাই তখন আর ফুটুনি খাটবে না। তার চেয়ে লক্ষ্মী মাঝখানে শুয়ে থাক আমি আর তুমি দু পাশে শুয়ে থাকি।'

'পাগল !' আমি আমলেই আনিনি কথাটা।

'নিশ্বাস ফেলে ও উঠে গেছে নিজের বিছানায়, আর আমি শুয়ে শুয়ে চিন্তা করেছি কেন আমার এই প্রতিশোধ নেবার এমন দুরন্ত অভিলাষ ? বিবেক বলেছে, এত দম্ভ ভাল নয়, —কিন্তু তবু আমি নিজেকে খর্ব করে ওর ডাকে সাড়া দিতে পারিনি, কেননা এটুকু আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতাম এখনও ও সম্পূর্ণভাবে তোমাকে ভোলেনি, ক্ষতের উপর সামান্য একটা প্রলেপ পড়েছে মাত্র। আর সেই প্রলেপটি হচ্ছে আমার সন্তান। অপমানের কথা নয়, তবু সন্তানের জন্যই আমার মূল্য এ কথা ভাবলে আমার দাহ হত। ঠিক এই রকম সময়ে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা। বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন খনিবিদ্যা শিখে। মেজদার সতীর্থ, সেই সূত্রে আলাপ হতে হতেই যে কেমন করে এত সহজে ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে গেল তা নিজেও বুঝতে পারলাম না। প্রথম প্রথম কিছুটা ভান করতাম অশোককে দেখিয়ে, মনে হত অশোকের ঈর্ষাবৃত্তিটা হয়তো জেগে উঠবে এ দেখে এবং ও কষ্ট পাবে, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য—তাও ও পেত না, বরং আমার ন্যাকামির আভাস পেলেই ও সরে পড়ত সেখান থেকে। শেষ পর্যন্ত দেখি আমার ভানকে বিনয়বাবু সত্যি মনে করে বসে আছেন, আর আমারও মনে হল আমি অশোককে কখনওই ভালবাসিনি—স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর ভালবাসা না পাওয়ার মতো পরাজয় আর নেই—আমি এতদিন সেই গ্লানিতেই পুড়ে পুড়ে সারা হয়েছি। আজ আমার দুয়ারে সত্যি সত্যিই যে প্রার্থী তাকে আমি ফিরাবই বা কেন। বঞ্চিত হবার জন্য জীবন নয়—বঞ্চনা যে করে তাকে পুজো করবার জন্যও জীবন নয়। সুখ চাই, সমৃদ্ধি চাই, প্রেম চাই—কেন পড়ে থাকব এখানে। কী আছে অশোকের, কী পেয়েছি আমি ওর কাছ থেকে। মনকে শক্ত করে ফেললাম আমি। একদিন রাত্তিরে ঘুমুতে গিয়ে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' বই পড়ছিল শুয়ে শুয়ে—মুখ তুলে তাকাল। আমি বললাম, 'আর কতকাল ভার হয়ে থাকব—তুমিই বা আর কতকাল তা বইবে !' 'কী হল তোমার ?' অত্যন্ত মধুর করে ও হাসল।

'তুমি তো জানো, হাসলে ওকে কী আশ্চর্য ভাল লাগে, মুহূর্তের জন্য মনটায় একটু মোহ এল, আমল দিলাম না। অত্যন্ত সহজভাবে বললাম, 'বিনয়বাবু আমাকে ভালবাসেন, তা বোধ হয় তুমি জানো না।'

'জানি—' কথাটা বলেই বইয়ে চোখ ডোবাল, আর আমি স্তব্ধ হয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর বুঝতেই পারো—মাস ছয়েক এইভাবে চলল, আর তারপর একদিন ওকে পরিত্যাগ করে চলে এলাম। সমস্যা হয়েছিল মেয়ে নিয়ে—অশোক নিজে থেকেই বলল, 'বিনয়বাবু রাজি থাকলে মেয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই। আমার আয়ু হয়তো শেষ হয়ে এসেছে, কেননা ভিতরে ভিতরে আমি বড় শ্রান্ত, আমার এই ঘুষঘুষে জ্বর আর ঘুরে ঘুরে কাশি, এটা আমার ভাল মনে হয় না, এজন্যেও লক্ষ্মীকে সরানো দরকার।'

মাধবী চুপ করল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে এমন একটা নিস্তব্ধতা এল যে আমি ভয়ংকর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। জিগ্যেস করলাম, 'লক্ষ্মী তখন কত বড় ?'

ভাঙা ভাঙা গলায় মাধবী বলল, 'চার বছরের।'—একটু থেমে বলল, 'প্রথমটা খুব কাঁদত

বাপেব জন্যে, কিন্তু বিনয়বাবু আসাধারণ লোক, তিনি স্নেহ দিয়ে প্রেম দিযে আমাদেব মা মেয়েকে ভবে রেখেছেন।'

আমার গলা দিয়ে আওয়াজ আসছিল না—কেশে বললাম, 'অশোক এত দিনও বেঁচে আছে কি না কী করে জানলে ?'

'পরশু কাগজে কী দ্যাখোনি তার ছবি বেরিয়েছে—সমস্ত সম্পত্তি সে গবিব ছাত্রদের বৃত্তির জন্য দান করেছে, বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি।'

না বলে পাবলুম না, 'মাধবী, ছবিটা একটু দেখাতে পারো ?'

মাধবী তক্ষুনি উঠে ভিতরের ঘর থেকে কাগজখানা নিয়ে এল, ছবিটার দিকে তাকাতে আমার ভয় কবছিল, একটুখানি চোখ বুলিয়েই এ-কথা সে-কথার পর অনেক সংকোচ নিয়ে বললাম, 'তোমার তো প্রয়োজন নেই বোধ হয়, ছবিটা আমি নিলে কি ক্ষতি হবে ?'

মাধবীর মনে ইচ্ছা বোঝা গেল না, কিন্তু সহজভাবেই সে ছবিটা আমাকে দিল। তাবপর আর বেশিক্ষণ সেখানে আমি ছিলাম না। হস্টেলে ফিরে এসেই অত রাত্তিরে স্নান কবলাম, তারপর খাব না বলে এসে ঘরে শুয়ে বইলাম। সমস্তটা রাত্তির একবিন্দু ঘুম এল না, জানলা দিয়ে রাস্তাব আলো আসত বলে জানলাটা বন্ধ কবেই রাখতাম রোজ, মধ্যরাত্রিতে উঠে সেটা খুলে দিলাম, তারপর আবছা আলোতে সন্তর্পণে বসে বার বার দেখতে লাগলাম অশোকের ছবিখানা। ছবিখানা বোধ হয় বর্তমান চেহাবার, তাই এমন বিবর্ণ, বিষণ্ন। মনের মধ্যে গুমরে উঠতে লাগল কত কথা, তন্নতন্ন করে যাচাই করতে লাগলাম কী সুখ আমি পেয়েছি এ-জীবনে। মা নেই, বাপ নেই—সাতকুলে কেউ নেই। দুটো ছোট বোন আছে, তাদের তো কোন জন্মে বিয়ে হয়ে গেছে, দেখাও হয় না। থার্ড ক্লাসে উঠেই মাস্টাবি কবে কবে পড়তে হয়েছে। মা-বাবাব মৃত্যুব পরে কাকাব আশ্রয়ে দু-বছর ছিলাম, কিন্তু দুটো যুগও মানুষেব এর চেয়ে সহজে কাটে। কাকিমা মানুষ ভাল ছিলেন, কিন্তু কাকা একটি মূর্তিমান শযতান। আমবা তিন বোনে তাঁর কাঁধে যে কী ভীষণ বোঝা এ-কথা তিনি দিনে অন্তত তিরিশ বার শোনাতেন এবং ঝি-চাকর রাখবার আর তাঁব ক্ষমতা নেই বলে আমাদের দিয়ে সব কাজ চালাতেন। কোনবকমে ম্যাট্রিকটা পাস করেই আমি বোনদের নিয়ে হস্টেলে এসে উঠলাম। দিনে তিনটে টিউশানি কবে তবে বোনেদের খরচ চালিয়েছি, কাকার অর্থ পয়সাও আব গ্রহণ করিনি। আই. এ. পাস করে যখন বি. এ. -তে ভর্তি হলাম, তখন আমার বন্ধুত্ব হয় মাধবীর সঙ্গে। সে-বন্ধুত্ব এমন প্রগাঢ় হযেছিল যে মাধবীর মা-বাবার সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত আমার একটা সম্বন্ধ হয়ে গেল।

আমি তখন বাইশ বছরের মেয়ে, বিদ্যাসাগর কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ি। সেই হস্টেলেই বোনেদের নিয়ে থাকি এবং সকাল-সন্ধ্যা দুটো টিউশানি করি। একদিন সন্ধ্যাবেলা টিউশানি সেরে ফেববার পথে মাধবীদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম, মাধবীর মা বসবার ঘরে একটি যুবকের সঙ্গে কথা বলছেন আমি যেতেই বললেন, 'ও মা, তুই জানিস না বুঝি, মাধবী তো চুঁচড়ো গেছে ওর পিসি-বাড়ি।' আমি সংকুচিতভাবে দরজায় দাঁড়িয়েই বললাম, 'তাই নাকি ?'

'তাই বলে কি ঘরেই ঢুকবিনে নাকি ?'—মাধবীর মা সস্নেহে আমাকে ডেকে আনলেন, তারপর যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অশোক, এই দ্যাখো আমার আর একটি মেয়ে। অশোককে তো তুই দেখিসনি, না ? তুই যেমন আমার মেয়ে, এও তেমনি আমার আর এক ছেলে।'

আমি চোখ তুলেই দেখলাম অশোক নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি চোখ তোলাতেও ওর চোখ নামল না। আমার মুখে কী দেখছিল জানি না, পরে ওর মুখেই শুনেছি, এ মুখ নাকি অতুলনীয়।

মাধবীর মা বললেন, 'মাস্টারি তো করে এলি, খাবিনে কিছু ? জড়সড় হয়ে বললাম, 'না, মাসিমা, আটটার মধ্যে আমাদের ফিরতে হয় জানেন তো।'

'ওঃ, আটটার এখনও ঢের দেরি—' মাসিমা কথা শুনলেন না, খাবার আনতে উঠে গেলেন। অশোক আমাকে বলল, 'আপনার কথা আমিও মাধবীর কাছে শুনেছি।'

মৃদু হেসে চুপ করেই রইলাম। অশোকের কথা আমিও মাধবীর কাছে শুনেছিলাম, কিন্তু কথা বলতে আমার সংকোচ হচ্ছিল। একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বলল, 'শুনেছি পার্ট-টাইম একটা স্কুলে পড়ান—এখনও তো দেখছি পড়িয়েই এলেন। এত পেরে ওঠেন আপনি ?'

আমি সকুণ্ঠে জবাব দিলাম, 'না পেরে উপায় কী ?'

'কেন ?' অতিশয় অসংগত এই প্রশ্ন, উচিত ছিল রাগ করা, কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রাগ করতে পারলুম না, ঈষৎ হেসে বললুম, 'যদি জানতেই চান, আরও দুটি ছোট বোন আছে আমার।'

'ও—' অশোক চুপ করে গেল। আমিও আর কথা বললুম না।

মাধবীর মা এলেন খাবার নিয়ে, 'এ কী অশোক, তুমি যে বড় চুপচাপ। বকুলেব সঙ্গে বুঝি কিছুতেই জমাতে পারছ না ?'

অশোক মৃদু হাসল। মাধবীর মা হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চেনা-অচেনার বালাই তো ওর দেখিনি কখনও—আজকে কিন্তু তোকে খুব সমীহ করছে অশোক।'

হঠাৎ আমাদের চোখাচোখি হয়ে গেল এ কথার পরে।

মাধবীদের বাড়ি থেকে আমাদের হস্টেল মিনিট দশেকের রাস্তা। অশোক আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। ফিরে যাবার সময় বলল, 'আশা করি আবার আপনার দেখা পাব।'

'আপনি তো এখানে থাকেন না।'

'থাকি না বটে, কিন্তু আসি প্রায় রোজই। তা ছাড়া, সম্প্রতি দিনকয়েক তো এখানেই আছি। আসুন না এর মধ্যে আর একদিন ?'

'আচ্ছা।' নমস্কার করে বিদায় নিলাম।

অবিবাহিত যুবক দেখলেই আমার তার সম্বন্ধে কৌতূহল হয়, কেননা সম্প্রতি আমার বোনের বিয়ে দেবার কথা আমি ভাবছিলাম। এদের দু-বোনের বিয়ে দিয়ে উঠতে পারলে আমার অনেক কষ্টের লাঘব। ছোটটি পনেরো বছরের, থার্ড ক্লাসে পড়ছিল, কিন্তু তার উপরেরটির সতেবো তো হল। বিয়ের পক্ষে এমন সুন্দর বয়স আর নেই, সবে কুঁড়ি ফুটেছে। মাঝে মাঝে ওকে ঠাট্টা করে দেখেছি, ও খুব উপভোগ করে। ফাস্ট ইয়ারে পড়ছিল, একটা টিউশানিও করে—নিজে এত কষ্ট করেছি বলে ওর কষ্টটা আমায় লাগে বেশি। আমি বড়, দায়িত্ব আমার, ওকে কেন কষ্ট করতে দেব। বাণী তা শোনে না, তাই আমি ভেবেছি ওকে এখনি বিয়ে দিয়ে দেব।

বাণী বলে, বিয়ে তো দেবে, কিন্তু পয়সা পাবে কোথায় ?'

কথাটা ভাববার মতোই, কিন্তু এমনও তো মানুষ আছে যারা পয়সা নেয় না। তা ছাড়া মার গহনা আমরা কিছু পেয়েছিলাম। সাবেকি—তাই শুধুই সোনা। তিন বোনেরটা দিয়ে এক বোনকে নিশ্চয়ই পার করা যাবে। বাণী বলে, 'নিজের কথা তো তুমি ভাবোই না, কিন্তু রানীকেও তো বিয়ে দিতে হবে ?' 'ওঃ রানী ! রানীর জন্য ভাবনা নেই, ও বড় হতে হতে আমি বি. এ. পাস করে একটা ভাল চাকরি পাবই, তারপর না খেয়ে টাকা জমাব।' বাণী ভবিষ্যৎ শুনে হাসে।

অশোককে দেখে আমার মনে কেমন একটা আশা হল। পরের দিন মাধবীকে কলেজে বললাম কথাটা। আমার যদি অর্ন্তদৃষ্টি থাকত, তবে দেখতাম মাধবীর মুখ সাদা দেখাচ্ছে, কিন্তু নিজের চিন্তাতেই আমি বিভোর। মাধবী বলল, 'খেপেছিস ? বাপের এক ছেলে—গাড়ি বাড়ি দাসদাসী নিয়ে মশগুল—সে কি আর অনাথ নিয়ে উদারতা দেখাবে ?' ভয়ানক আঘাত লাগল মাধবীব কথায়। চাপতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমার মুখ গম্ভীর হল, না-বলে পারলাম না, 'অনাথ মানে ? রাস্তার

ভিখারিও নয়, কারও কৃপাপ্রার্থীও নয়।'

মাধবী অপ্রস্তুত হল। যদিও কিছু না ভেবে ফস করে কথাটা বলে ফেলেছিল, তবু আমার মর্মমূলে তা এমন বিদ্ধ হয়ে গেল যে মাধবী অনেকবার ক্ষমা চেয়েও তা আর উপড়ে আনতে পারল না। বুঝতে পারল আমার মন মেঘমুক্ত করা সহজ হবে না. তাই হয়তো ভাবল মার হাতে ফেলে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ—অগত্যা পরেব দিন ওদের বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করে চলে গেল বিষণ্ণ মনে।

আবার আমার সঙ্গে অশোকের দেখা হল।

প্রায় সমস্ত দিনটাই ওখানে কাটিয়ে যখন হস্টেলে ফিরে এলাম তখন কেবলই মনে হতে লাগল, এত তাড়াতাড়ি দিন কাটল কেমন করে ? আর আমিই বা এত শিগগিব চলে এলাম কেন ? ঘর থেকে ঘবে, বারান্দা থেকে বারান্দায়, জানলা থেকে জানলায় এমন চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম যে, হস্টেলের প্রত্যেকটি মানুষ আমার ভাবান্তরে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বড়মানুষের ছেলেদের সাধারণত যা হয়ে থাকে অশোকেবও ঠিক তাই হয়েছিল। বাপ মাইকার ব্যবসা করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিল। চেহাবা ভাল আর বাপের টাকা আছে এটাই তো শ্রেষ্ঠ গুণ—উপরন্তু ওর বিশ্ববিদ্যালযেব ডিগ্রি ছিল বলে যে কোনও যুবতী মেযের মায়েব মনোহরণ করে বহু মেয়ে নিয়ে খেলবার একটা অনায়াস অবকাশ ও পেয়েছিল। আমাদেব মাধবী তখন ওর নতুনতম আবিষ্কার। ঠিক এই সময়েই আমাদের দেখা। কী যে নেশা হল জানি না, আমি ওকে প্রশ্রয় দিলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যেই এমন হল যে দেখা না-হলে আমাদের আব দিন কাটত না। প্রথম প্রথম মাধবীদের ওখানেই চলছিল, কিন্তু সেটা সুবিধের হল না, শেষে কোনদিন গড়ের মাঠে, কোনদিন সিনেমায, কোনদিন গঙ্গাব ধারে, কখনও বা ট্যাক্সিতে—এই কবে দিন কাটতে লাগল। মাসখানেক পবে ও একদিন বলল. 'বকুল, আমাকে কি তোমাব কখনওই খারাপ লোক মনে হযেছে ?'

নিঃসংশয়ে বললাম. 'না।'

'আমাকে ভাল করে জানবার অবকাশ তুমি পাওনি, তাই। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিনই মনে হয়েছিল আব সকলের মতো এ অবকাশ আর তোমাকে দিতে পাবব না, আমার মধ্যে যা মেকি তা সমস্তই এবার পুড়ে যাবে তোমার উত্তাপে। অনেকে অনেক কিছু বলতে পারে—যদি শোনো মন খারাপ কোরো না। তোমার কাছে যে-রূপ সেই তো আমার আসল।'

কথা বলতে বলতে ও কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমি বললাম, 'তুমি কি ভাবো আমার মন এতই কাঁচা. লোকের চোখ দিয়ে আমি যাচাই করব তোমাকে ?'

'হতেও তো পারে ?'

'কখনওই না।'

'আচ্ছা ধরো, কোনও সূত্রে জানতে পারো যে আমি ছদ্মবেশে একটি শয়তান—'

'থামো, থামো—' আমি বলে উঠলাম, 'আর বিনয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া শয়তানকেও তো মানুষ ভালবেসে ফেলতে পারে। জানো না রবীন্দ্রনাথের কথা—"খোকা বলেই ভালোবাসি ভালো বলেই নয়"।

ও বলল, 'তবু আমি আশ্বাস পাচ্ছিনে, বকুল। বকুল, তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ঠকাইনি, আমার সমস্ত প্রাণে মনে আমি তোমাকে গ্রহণ করেছি।' এমন ব্যাকুলতা ছিল কথাগুলোতে যে আমি বলবার কিছু খুঁজে পেলাম না। চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ, তারপর ফিবে এলাম হস্টেলে।

তার দিনকয়েক পরে একটু বিষণ্ণ মুখে বলল, 'বকুল, আমাকে বোধ হয় শিগগিরই বাইরে যেতে হবে।'

'কেন ?'

'বাবার বাত হয়েছে, ডাক্তাররা তাঁকে নিয়ে পুরী যেতে বলেন।'

'ও।'

আমার এই সংক্ষিপ্ত জবাবে ও সুখী হল না—একটু অপেক্ষা করে বললে, 'আর কিছু বলছ না যে ?'

'কী বলব ?'

'কেন, বলবার কি কিছুই নেই ?'

মৃদু হাসলাম, জবাব দিলাম না।

'না, না ও বকম বিমর্ষ হলে চলবে না।' অধীর আগ্রহে ও আমার হাত ধরে নাড়া দিল।

আমি বললাম, 'খববটা কি আমার পক্ষে খুব হর্ষ করার মতো ?'

'ও, তাই !' একটু থেমে, কিন্তু দুঃখ করবারও বোধ হয় কিছু নেই, কী বলো ? তোমাকে তো কম জ্বালাই না আমি। কিছুদিন—'

'নাও, ছেলেমানুষি কোরো না।' প্রায় ধমকে উঠলাম, 'এখন যে আমাদের কত ভাববার দিন এসেছে তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে ?'

'ভাবনা আবার কী। বাবাকে বলব, মত দিলে ভাল, না দিলেও ক্ষতি নেই— তোমার অনুমতি পাওয়া দিয়েই হচ্ছে কথা ! কিন্তু বকুল, একটা কথা—'

'বলো—'

'মানে—এই—' অনেক ইতস্তত করে থেমে থেমে ও বলল, 'বলছিলাম কী মাধবীরা কি এ-সব জানে ?'

'খুব সম্ভব না। আর জানলেই বা কী।'

'না, না, খবরদার—' অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে অশোক বলে উঠল।

আমার তা ভাল লাগল না বললাম, 'কেন বলো তো ?'

'না, কারণ কিছুই নেই, তবে ওঁরা আমাকে আশা করেছিলেন এই আর কী।'

হঠাৎ আমার মাধবীর কথা মনে হল, 'বড়লোকের ছেলে বাড়ি গাড়ি দাসদাসী নিয়ে মশগুল, সে আর অনাথ নিয়ে উদারতা দেখাবে।' প্রতিহিংসার একটা আনন্দ বিদ্যুতের মতো খেলে গেল হৃদয়ের মধ্যে।

বললাম, 'অশোক, তোমাকে বলাই ভাল—দ্যাখো, আমি একান্তই নিঃসম্বল মেয়ে, বাপ-দাদার সাহায্য কী বস্তু তা আমার জানা নেই—মাধবীর ভাষায় নিতান্ত অনাথ, এখনও সময় আছে ভেবে দেখবার—' বলতে বলতে আমি অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার কথায় ওর মন নেই, অন্য দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কী চিন্তা করছে।

'কী ভাবছ ?'

'উঁ—' হঠাৎ যেন জেগে উঠল ! 'না, বলছিলাম কী—' সেই পূর্ব কথারই জের টেনে বলল, 'পাঁচজনকে জানাবার দরকারই বা কী, আর দেরিই বা মিছিমিছি করছি কেন ?'

'দেরি মানে ?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি মনে মনে কী যেন ভাবছ।'

'বকুল, আমার যেন মনে হয় পুরী থেকে ফিরে এসে আর তোমাকে পাব না, তার চেয়ে এসো কালকেই আমরা নোটিশ দিয়ে আসি, তারপর যে করেই হোক, আর পনেরো দিন আমি বাবাকে ঠেকিয়ে রাখব—একেবারে রেজিস্ট্রি করে শেষে পুরী যাব।'

'পাগল ?' আমি আমলই দিলাম না কথাটায়। 'এ কি সম্ভব নাকি ? আমার টাকা কোথায় ? তা ছাড়া দুটো বোন মাথার বোঝা। কত দায়িত্ব, কত ভাবনা, হট করে একটা বিয়ে করলেই হল নাকি ?'

'তোমার আবার বাড়াবাড়ি—' অধীর হয়ে অশোক বলল। 'টাকার জন্য যদি আবার ভাবনাই

করবে, তবে এ-অভাগাকে দিয়ে হবে কী ? আর রানী, বাণী ? বেশ তো, তোমার কাছেই থাকবে ওরা।'

'আরে না, না, আমার অবস্থা তুমি বুঝবে না—আজন্ম সুখে লালিত তুমি, যখন যা ভাবো নিমেষেই তা করতে পারো, কিন্তু আমি—'

অশোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

তার দুদিন পরে ও পুরী চলে গিয়েছিল। যাবার আগে একটা মাস ওকে নিয়ে আমি এমন মত্ত হয়ে ছিলাম যে, অন্যদিকে মন দেবার আর আমার অবকাশ ছিল না। মাধবী কলেজে আসত না, শুনেছিলাম ওর অসুখ। এবার মনে হল খুব অন্যায় করেছি। সেদিনই বিকেলে টিউশানিব পরে ওকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, বাড়ি ফাঁকা—শুনলাম আজ প্রায় পনেরো দিন ওরা কোথায় গেছে, কবে ফিরবে তাও কেউ জানে না। মনে মনে যেন কেমন একটা মুক্তি পেলাম। আমাব কেবলই ভয় হচ্ছিল ওরা বুঝি সব জেনে ফেলেছে—ওদের দেখা না পেয়ে দুঃখিত হবার অবকাশ আর আমার হল না।

অশোক গিয়ে আমাকে রোজ একখানা চিঠি লিখতে লাগল। জীবনে চিঠি লেখা বা পাওয়া কী বস্তু, তা আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। আমি পেরে উঠতাম না ওর সঙ্গে। শেষে মাস দেড়েক পরে মনে হতে লাগল, এখনও যদি অশোক ফিরে না আসে আমি বুঝি চলে যাব ওখানে। দিন আর কাটে না—রাত্রে ঘুমুতে পাবিনি। লিখলাম, 'অশোক, তুমি তখন যা বলেছিলে তাতে সম্মত না হয়ে ভুল কবেছি, চিরটা দিন কেবল ভেবে ভেবে আমার স্বভাবই গেছে খারাপ হয়ে, সব বিষয়েই আমার ভাবনার বাড়াবাড়ি। তুমি নেই, এখন তো আমার দিন কাটে না। তুমি কি আমাকে আরও কষ্ট দেবে ?'

এর দিন দশেক পরেই ও ফিরে এল কলকাতায়। দেখা হতেই বলল, 'বকুল, বাবা কিন্তু খুব খুশি হযেছেন। একদিন তোমাকে যেতে হবে বাবার কাছে। আর ওঁর ইচ্ছে বিয়েটা হিন্দু মতে হয়।'

মুখে বললাম, 'ভালই তো।' কিন্তু মনে মনে চিন্তা এল। আমাব বিয়ে আমাকেই যেখানে দিতে হচ্ছে সেখানে রেজিস্ট্রিই উৎকৃষ্ট পন্থা। কোথায় নেব বাড়ি, কে আসবে কনে সাজাতে, কে করবে সম্প্রদান, কে কিনবে দানসামগ্রী—এ সব বিলাস কি আমার মতো নিঃস্ব মেয়েব জন্যে ? হিন্দু মতে বিবাহ ব্যাপারটাই আসলে বড়লোকের জন্য, যাদের টাকা এত বেশি আছে যে খরচ না করলে আর ধরছে না ঘরে, তাদের জন্যে। তা নয় তো এক রাত্তিরের একটা সামান্য আমোদের জন্য হাজারে হাজারে টাকা কী করে মানুষ অকাতরে খরচ করতে পারে ?

অশোক বললে, 'আজকে ধরো আষাঢ় মাসের সাতাশে—শ্রাবণ মাসের আঠারো তারিখেই একটা বিয়ের দিন আছে।'

'ওরে বাবা, একেবারে দেখছি তারিখও মুখস্থ করে এসেছ।'

'তবে কী—তোমার কি এখনও আরও কিছুদিন ভাবতে হবে নাকি ?'

'ভাবনার অবসান তো করেইছিলাম,' হেসে হেসে সত্যি কথাটাই বললাম, 'নতুন করে ভাববার খোরাক তো তুমিই জোগালে।'

'কেন বলো তো ?'

'বাঃ, হিন্দু মতে বিয়ে, সে কী একটা সামান্য কথা ? কোথায় রে বাড়ি, কোথায় রে টাকা—কোনও লাঠি, কোনও ছাতা, বাসন-কোসন—'

'নাও, ভারী তোমার গরব। দৈন্য না দেখিয়ে কাজের কথা শোনো তো। কাল রোববার। সকালবেলা আমি আবার আসব—তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়ি। রানী বাণীও যাবে।'

'ওদের আর কেন—ও বেচারারা এখনও জানে দিদি তাদের জন্যেই ব্যবস্থা করছে—'

'আহা, ওরা কী আর কিছু বোঝে ! নেহাত খুকি কিনা !'

'তা মুখোমুখি যখন কিছু বলিনি তখন নেপথ্যে থাকাই ভাল।'

'বেশ, যা ভাল বোঝো কোরো, কিন্তু প্রস্তুত থেকো মোটমাট '

পরের দিন বেলা প্রায় আটটার সময় ও আমাকে নিয়ে গেল। গাড়িতে বসে সাংঘাতিক ঝগড়া, কেন আমি সাদা শাড়ি পরে এলাম। আমি ছেলেবেলা থেকে সস্তা দামের মিলের সাদা শাড়ি পরেই অভ্যস্ত—নিজে উপার্জন করবার পরে কখনও কখনও যে শখ না হত এমন নয়, কিন্তু দুটি ছোট বোন আছে, কেনবার সমস্ত শখ ওদের দিয়েই মেটাতে হত। তাই সত্যি বলতে আমার ছিলই না রঙিন কোনও ভাল শাড়ি। বলতে গিয়ে তাড়া খেলাম এবং গাড়িব মোড় ফিরল অন্যদিকে। শাড়ির দোকানে এসে গাড়ি থামতেই আমার মুখ লাল হয়ে উঠল। কারও কাছে কখনও পাইনি, কাজেই কেউ কিছু দিতে চাইলে সেটা মনে হত দয়া, অনর্থক ঘা লাগল আত্মসম্মানে। বললাম, 'ছি ছি এটা তোমাকে মানায় না।' আমার কথা না শুনে তবু ও নামতেই আমার মুখেব ভাব বদলে গেল। বললাম, 'অশোক, আমাকে গরিব পেয়ে অপমান করছ ?'

'অপমান ! তোমাকে !' অশোকের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ দেখাল। নিঃশব্দে উঠে এসে গাড়িতে বসল, আর দ্বিতীয় কথা আমাদের হল না গাড়িতে।

ওদের বাড়ি এসে পৌঁছতেই বছর আঠারোব একটি মেয়ে এসে আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল ঘরে। কার্পেট মোড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়—উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। অশোক বলল, 'আমার বাবা, প্রণাম করো।' ভদ্রলোককে আমি জীবনে ভুলব না। অমন অদ্ভুত স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর আমি কখনও কোনও মানুষের শুনিনি—মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, 'থাক মা !' যে ঘরখানায় গিয়ে বসলাম সেখানা বুঝলাম আমার জন্যেই বিশেষ করে সাজানো হয়েছে। প্রায় মাটি সমান নিচু বিরাট একটি তক্তপোশে ধবধবে সিল্কের পুরু চাদর পাতা—তার পাশে পাশে চোখ ঝলসানো ব্রোকেডের তাকিয়া—মাঝখানে মস্ত বড় এক রুপোর থালায় ধান-দূর্বা আর ফুল-চন্দন। মেঝেতে কাশ্মীরী কার্পেট। ভদ্রলোক আমাকে সস্নেহে সেই তক্তপোশের উপর নিয়ে বসালেন, বললেন, 'অশোকেব মা নেই তা তো জানো, তিনি থাকলে ব্যবস্থা হত অন্য রকমের—এমনই অদৃষ্ট করে অভাগা এসেছে যে একটা দিদি ছিল সেটাও সইলো না কপালে—এই দ্যাখো তার স্মৃতি বহন করে বেড়াচ্ছি আজও—' মেয়েটিকে তিনি আঙুল তুলে দেখালেন। ঠিক যেন বাণী। অকৃত্রিম মমতায় তাকে কাছে টেনে নিলাম।

তোমারই সমস্ত, মা—তুমি হবে আমার ঘরের মূর্তিমতী লক্ষ্মী। তোমাকে দেখার আগে তোমার কথা শুনেই আমি ভেবেছিলাম এ কথা—দেখে মনে হচ্ছে তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি।'

এতখানি স্নেহভাষণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না—আমার আশা অতদূর যায়নি—সহসা চোখ ভরে জল এল আমার। মায়ের মৃত্যুর পরে বোধ হয় এই প্রথম চোখে জল। স্পষ্টই মনে হল এত সুখ আমার জন্যে নয়—সুখী হবার জন্য আমি জন্মাইনি। দাউ দাউ করে উঠল মনেব মধ্যে। অবশেষে এতদিনকার দুঃখের পাষাণ গলে গলে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। অশোক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, আর ওব বাবা হাত বুলুতে লাগলেন মাথায়। একটু শান্ত হলে উনি আমাকে একজোড়া জড়োয়া কঙ্কণ আর একছড়া সোনার হার দিয়ে আশীর্বাদ কবলেন, এবং একখানা মোহর দিলেন হাতে।

ফেরবার পথে অশোক বলল, 'তুমি অত কাঁদলে কেন ?'

'কাঁদব না ? তোমার বাবা আমাকে অত আদর করলেন কেন ? আদর কী এর আগে কখনও আমি পেয়েছি, সংসারে কী আমার জন্যেও আদর আছে ?'

পাগলি।' অশোক ঝুঁকে পড়ল আমার মুখের উপর—এই প্রথম ও এই শেষ—ও আমার সঙ্গে একটু অসংযত ব্যবহার করল, এবং আমিও প্রশ্রয় দিলাম।

হস্টেলের দরজায় নেমে প্রথমেই সেই কঙ্কণ আর হার ছড়া খুলে ভিতরে এলাম—কেউ জানতে পারল না। কিন্তু আগুন কি ছাইচাপা থাকে ? সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমাদের হস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, 'বকুল এ সব কী শুনি ?'

'কী শোনেন ?'

'তুমি নাকি একজন যুবকের সঙ্গে প্রণয় করছ ? এ রকম অপরিণামদর্শী হলে তার জন্য যথেষ্ট দুঃখভোগ করতে হয় শেষে তা জানো ?

আমাদের হস্টেলের এই কর্ত্রীঠাকুরানীর এ সব বিষয়ে অসাধারণ ঈর্ষার খবর হস্টেলবাসিনী আমরা প্রত্যেক মেয়েই জানতাম। তিনি দেখতে অসাধারণ খারাপ—যৌবনে নাকি এত বেশি খারাপ ছিলেন যে তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বলতেই ভয় করত হৃদয়ের দিক থেকে তিনি তো আর পাঁচজন মানুষের মতোই, কাজেই শারীরিক রূপের জন্য পৃথিবী যে বঞ্চনা তাঁকে করেছিল আসলে তারই একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাঁর মনে। অনেক প্রেম ইনি সইতে পারতেন না। যাকে চেনেন না, তারও যদি বিয়ের খবর পেতেন অকারণে রেগে যেতেন ও সেই রাগের ঝক্কি আমাদের পোয়াতে হত।

সভয়ে বললাম, 'আমি বিয়ে করছি।'

'বিয়ে !' বোমা এবার ফাটল। 'এ হস্টেলে ওসব চলবে না এত সব অবিবাহিত মেয়ে আছে, কই কেউ তো তোমার মতো এ রকম বিয়ে করতে চাইছে না।'

আমি এই একটু উদ্ধত হয়ে বললাম 'আর কাউকে দিয়ে আমার কী হবে ? বিয়ে তো করছি আমি। আর তা ছাড়া এ-হস্টেলে তো এমন কোনও নিয়ম নেই যে এখানে থাকলে কেউ বিয়ে করতে পারবে না।'

যাও, যাও, জ্যাঠামি কোরো না।' হাতের বইটা জোরে টেবিলের উপর ফেলে দিলেন। কিন্তু একটু পরে আবার সংযত হয়ে বললেন বকুল তুমি ভেবে দ্যাখো, কাজটা কিন্তু ভাল করছ না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

এর পর সুর বদলিয়ে তিনি বললেন বকুল, তোমাকে কি আমি ভালবাসি না ? আমি কি তোমার চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ নই ? আমার কথা শোনো বিয়ে তুমি কোরো না। পুরুষরা ভারী উচ্ছৃঙ্খল জীব। আজ তোমার চেহারা সুন্দর আছে, তাই—' এবার আসল কথায় উনি এলেন, 'ধরো কাল তোমার বসন্ত হল, তারপর তোমার মুখ বীভৎস দাগে ছেয়ে গেল—চুল উঠে টাক পড়ে গেল—তখন তোমার উপায় ?'

ভদ্রমহিলার কথা শুনে বুক কেঁপে উঠল, বললাম, 'ও সব বলছেন কেন, আপনার অসুবিধে করে আমি হস্টেলে থাকব না—আমি কালই চলে যাব।'

'না, না, চটো কেন—আহা চটো কেন। উনি দাঁত বের করে হঠাৎ হাসতে লাগলেন।

পরের দিন ভোরে উঠেই বেরিয়ে গিয়ে ফোন করলাম অশোককে। দেখা হতেই সব বললাম।

'তবে উপায় ? অশোকের মুখ শুকিয়ে গেল।

বললাম, 'ভয় পাচ্ছ কেন ? আমি আপাতত আমার কাকার বাড়িতে গিয়ে উঠি। এর মধ্যে তুমি আমার জন্যে একটা বাড়ির খোঁজ করো এক মাসের মধ্যে—আজকে দ্যাখো উনত্রিশ তারিখ, আর কটা দিন বা আছে, কেটে যাবে

'কোন পাড়ায় বাড়ি নেবে ?'

'হস্টেলের কাছেই নেওয়া ভাল—কেননা আমার তো বন্ধুবান্ধব সবাই সব—ওদের যেখানে সুবিধে সেখানে থাকাই ভাল।'

ফিরে এসে রানী-বাণীকে জিনিসপত্র গোছাতে বলে যারা বিশেষ বন্ধু তাদের ডেকে বললাম সমস্ত কথা—মুহূর্তে হস্টেলটি সরগরম হয়ে উঠল—কেউ উলু দিতে লাগল, কেউ গান ধরল, কেউ বা তবলা বাজায়—বেলা বারোটার সময় এমন মারাত্মক গণ্ডগোল আরম্ভ হল যে চেয়ে দেখি আশপাশের বাড়ির জানলায় সব জোড়া জোড়া চোখ। উত্তেজনা থামলে বললাম, 'কিন্তু আমাকে যে এখন হস্টেল ছাড়তে হচ্ছে।'

'কেন ?'

'বোঝাই তো।'

পুষ্প আমার সহপাঠিনীও বটে, বন্ধুত্বও তার সঙ্গে বেশি। সে চটে উঠল, 'ঈশ ! হস্টেল কি সুললিতা ব্যানার্জির একচেটে সম্পত্তি ?'

হঠাৎ শান্তিদি মুঠো পাকিয়ে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করল—

শোনো মিস্ ব্যানার্জি মা-বাপের মরজি
তাই করি সহ্যি তোমার ও-নাম।
হতো যদি হিড়িম্বা, হস্তিনী, কিংবা
জগজ্জগদম্বা, মিলতো স্বনাম !

ছড়া শুনে হা-হা করে হেসে উঠল সব একযোগে। আমি বললাম, 'শান্তিদি, কাজের কথা শোনো। ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করে এখানে থাকা আমার ভাল মনে হয় না। আজ আমি আমার কাকার বাড়ি চলে যাই, কাল ভোরে তুমি আর পুষ্প হস্টেলে অপেক্ষা কোরো, তিনজন মিলে একটা বাড়ি খুঁজে বার করব। পুষ্প খুনোখুনি করতে লাগল, 'খেপেছিস নাকি ? অত মিনিমুখো হয়ে অন্যায় সহ্য করে তুই চলে যাবি ? না, তা হবে না।' অনেক বলে-কয়ে ওকে শান্ত করলাম আর তার ঘণ্টা কয়েক পরে আমার শান্তির আবাস চিরতরে ভেঙে ফেলে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

তিন বছর পরে আবার দেখা কাকার সঙ্গে। বাইরের ঘরে বসেছিলেন, ট্যাক্সি থামতেই হুঁকো হাতে এগিয়ে, এ কী, তোরা যে ?'

হাসিমুখে বললাম, 'এলাম।' বলেই ব্যাগ থেকে দু-খানা দশ টাকার নোট বার করে কাকার হাতে দিয় বললাম, 'ট্যাক্সির ভাড়াটা চুকিয়ে, টাকাটা আপনার কাছেই রেখে দেবেন।

কাকা ইঙ্গিত বুঝে খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করলেন, 'যা যা, ভিতরে যা। এতদিনে মনে পড়ল !'

তার পরের কয়েকটা দিন অবর্ণনীয়। সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি—জিনিসপত্র কেনা—বাড়িঘর ঠিক করা—টাকাটাও আমার, পরিশ্রমটাও আমার, তবু কাকাকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে রাখতে হল। আমার নতুন বাড়ি ঝম্‌ঝম্ করতে লাগল, আর এতদিনের সমস্ত সঞ্চয় আমি দু হাতে উড়িয়ে দিলাম মনের আনন্দে।

বিয়ের তিনদিন আগে অশোক বলল, 'চলো, তোমাকে নিয়ে আংটি কিনতে যাব।'

বেরুলাম দু-জনে, এখানে ওখানে ঘুরে কেনা হল আংটি—গাড়িতে বসে ও আমার আঙুলে পরিয়ে দিল। হেসে বললাম, 'হীরের আংটি দিয়ে ভালই করলে, প্রয়োজন হলে আত্মহত্যা করা সহজ হবে।'

ফেরবার পথে হস্টেলে নামলাম। যেতেই শান্তিদি বললে, 'আজ দু দিন ধরে মাধবীর বাড়ি থেকে তোকে এমন জরুরি ডেকে পাঠাচ্ছে কেন রে ?'

'মাধবীরা এসেছে ?'

'নিশ্চয়ই, নয়তো ডেকে পাঠাবে কেন ?'

'তবে তো আজই যাওয়া উচিত আমার।'

পুষ্প বলল, 'আরে বোস, বোস—'

'না ভাই, মরবার সময় নেই আমার।'

গেলাম মাধবীদের বাড়ি। বসবার ঘর পার হয়ে খাবার ঘরে ঢুকতেই মাধবীর সঙ্গে চোখাচোখি।

'কোথায় গিয়েছিলি তোবা ?' উৎসাহভবে কাঁধে হাত দিলাম—মাধবী নিস্পন্দ। 'কী হয়েছে তোর ?' বলেই মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওকে আর মাধবী বলে চেনা যায় না। অমন সুন্দর লাবণ্যভরা মুখময় কে যেন দোয়তের কালি ঢেলে দিয়েছে। একখানা রঙিন খদ্দরের চাদরে সমস্ত দেহ আবৃত করে অতিশয় নিচু সুরে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, আমার ঘরে এসো।'

ঘরে গিয়ে বসতেই বলল, 'তোমার নাকি বিয়ে ?'

'হ্যাঁ।'

'কার সঙ্গে ?'

'তুমি কি কিছুই জানো না ?'

'জানি না ঠিক, তবে জনরব কানে এসেছে। সত্যিই কি অশোক ?'

'হ্যাঁ।'

'অশোক তোমাকে বিয়ে কবছে ?'

'আপাতত তো তাই ঠিক।'

'অশোক কি কখনও বিয়ে পর্যন্ত এগোয় ?'

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, 'এ সব বলে এখন লাভ কী মাধবী, যা হচ্ছে তা আর ফিরবে না।'

আমার কথার একটু ঝাঁঝ ছিল। কেননা, অশোক বলেছিল মাধবী আশা করছিল ওকে— বুঝলাম সেই ঈর্ষায় মাধবী আজ এত বিচলিত।

'আলবৎ ফিরবে।'

আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম ওব গলাব জোরে। 'তুমি কি পাগল হলে, মাধবী। এমন করছ কেন ?'

'এমন করছি কেন ?' মাধবী উত্তাল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি ওকে ভালবাসি, বকুল—বকুল, তুই ওকে ছেড়ে দে। বকুল, তোর কাছে আমি আজন্ম কেনা রইব—তুই ওকে ছেড়ে দে। তুই ওকে ছেড়ে দে।'

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না—উঠে পড়ে বললাম, 'মাধবী, আমি আজ যাই।'

হঠাৎ মাধবী দুই হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'বকুল, তুই কথা দিয়ে যা, এ বিয়ে তুই ভেঙে দিবি।'

'মাধবী, তা আর হয় না, তুমি ভালবাস একা, আমাদের ভালবাসা পরস্পরের। তা ছাড়া তোমার সুখী হতে ইচ্ছে করে, আমার করে না ? কী পেয়েছি এ জীবনে—অনাথ বলে তুমিও অবহেলা করেছ, আমি ছাড়ব না—কক্ষনো ছাড়ব না—ওঠো তুমি পা ছেড়ে।' ছিনিয়ে আনলাম পা।

মাধবী চোখ মুছে মুখোমুখি দাঁড়াল, 'বকুল, সব সত্যি, কিন্তু আমাকেও তো পথ বলে দেবেন তোর স্বামী। তাঁর সন্তান যে আমি এই চার মাস ধরে এত কষ্টে এত দুঃখে লালন করছি তার কী উপায় হবে ?'

'তার সন্তান !' বজ্রাহতের মতো আমি বসে পড়লাম মাটিতে।

'হ্যাঁ, তাঁর সন্তান !'

'অশোকের সন্তান ?'

'হ্যাঁ, অশোকের সন্তান। শুধু আমাকে নয়, বকুল, ফাঁদে ফেলে সে অনেককেই এই উপহার হয়তো দিয়েছে, তার ভালবাসার ভান আমরা বুঝিনি।'

'এত বড় লম্পট অশোক ! এত বড় লম্পট !'

ঘৃণায় দুঃখে অভিমানে অপমানে জর্জরিত হয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। সমস্ত রাত্রি জেগে চিঠি লিখলাম দুখানা। একখানা অশোককে, একখানা মাধবীকে। পরের দিন ভোর হতেই তা ডাকে ফেলে বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে। ট্রামে বাসে রিকশাতে সমস্তটা দিন কী করে যে কাটালাম জানি না। এ-লজ্জা আমি রাখব কোথায় ? কী কৈফিয়ত দেব সকলকে ? বাড়ি ফিরলাম চারটেতে। ফিরেই শুনলাম অশোক প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বসে আছে আমার জন্যে। কী করি—ইচ্ছা ছিল না দেখা করবার, কিন্তু ছোট বোনদের সামনে 'সীন' করতে পারলাম না।

আমি যেতেই অশোক মাথা নিচু করল। বললাম, 'আমার চিঠি পাননি ?'

'পেয়েছি।'

'তবে এসেছেন যে ?'

'পাপ করেছি আমি, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত কি তুমিও করবে ?'

'আমি করব কেন ?'

'আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে না হওয়া মানেই তোমারও প্রায়শ্চিত্ত। বকুল, মাথা ঠাণ্ডা করো—আমাকে ক্ষমা করো।

'অশোকবাবু !' আমার ডাক শুনে অশোক কেঁপে উঠল। 'যা বলছি শুনুন—আপনি আর আমার বাড়িতে আসবেন না।

'এই কি শেষ কথা ?

'হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা ?'

অশোক বেরিয়ে গেল বিবর্ণ মুখে।

মাধবীকে বিয়ে করতেও বাধ্য হয়েছিল শেষ পর্যন্ত! আমি সেই সময়ে ময়মনসিংহে কাজ জোগাড় করে চলে এসেছিলাম।

অশোকের বাবার দেওয়া সেই জড়োয়ার কঙ্কণ আর হার আমি আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলাম মাধবীকে। হীরের আংটটি পারিনি খুলতে। কত রাত্রে, কত দিনে, কত নিরালা অবকাশে এই আংটিটা আমাকে দুঃখ দিয়েছে, তবু খুলিনি। মৃত মানুষের চিহ্ন যেমন তার সন্তান—এই আংটিটাও আমার কাছে তেমন ছিল। আজকে দিয়ে এলাম অশোকের সন্তানকে সেটা।

সেই থেকে এই তো দশ বছর কাটল। মাস্টারি করে করে হাড় পাকা হয়ে গেল। এমন কী আমাকে দেখলে পর্যন্ত লোকেরা জিগ্যেস করে, 'আপনি বুঝি মাস্টারি করেন ?' তবু কেন পোড়া জায়গায় চাপ দিলে ঘা বেরিয়ে আসে ?

কিন্তু অশোক কেমন আছে এখন ? কে ওর সেবা করে ?. . . কী নিষ্ঠুর মাধবী !

ভাবছি কাল একবার অশোককে দেখতে যাব।

বাঈজী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আনোয়ারীবাঈ ঘরে ঢুকতেই মনোহরপ্রসাদ উঠে দাঁড়াল। হাত কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন করল, তারপর নিজের মেহেদিপাতার রংয়ে ছোপানো দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল। আনোয়ারীবাঈ কার্পেটের ওপর বসলেন। মনোহরপ্রসাদের মুখোমুখি। আজকাল বেশিক্ষণ আব দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। কোমর টন টন করে। বাতের মরসুম শুরু হয়েছে। ভরা শীতকালে আর উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না। মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈয়ের খুবই আশ্চর্য লাগে। মনেই হয় না, বছর বারো আগে হাঁটু মুড়ে বসে ঘণ্টাব পর ঘণ্টা গান গেয়েছেন। রাত ভোর হয়ে গিয়েছে ঠুংরি আব গজলে। এখন একটা গান গাইতে গেলেই হাঁপ ধরে।

কী ব্যাপার ভাইসায়েব, ভোর ভোর ? আনোয়ারীবাঈ চুল-সক খাঁজ ফেললেন কপালে। এত ভোরে ঘুম ভাঙানোতে মেজাজ খুশ নয় মোটেই।

একটা জরুরি খবর ছিল, মনোহরপ্রসাদ দাড়ি ছেড়ে হাঁটুতে হাত বোলাতে আরম্ভ করল। মুখে একটু হাসি হাসি ভাব।

আগের দিন ঠিক এমনিভাবেই মনোহরপ্রসাদ খবর আনত। ছিপছিপে ফরশা চেহারা, হাতের ছোয়ায় তবলা যেন কথা বলত। মুজরো নিয়ে বাইরে যাবার সময় আনোয়ারীবাঈ সব সময়ে মনোহরপ্রসাদকে সঙ্গে নিতেন। কোনও ঝামেলা নেই, বদ অভ্যাস নেই। ঘাড় হেঁট করে নিজের কাজ করে যেত। আনোয়ারীবাঈয়ের শুধু তবলচিই ছিল না মনোহরপ্রসাদ, এধার ওধার থেকে খববেব টুকরোও সেই সংগ্রহ করত।

আজ রায়-বেরিলির খানসায়েব এসেছেন। এখানে থাকবেন হপ্তা খানেক। খানসায়েব ঠুংরির বড় ভক্ত, দেখি একবাব যোগাযোগ করে। কাল পরশু আপনার কোনও বায়না নেই তো কোথাও ?

মনোহরপ্রসাদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চাইত আনোয়ারীবাঈের দিকে।

না, বায়না আর কোথায়, আনোয়ারীবাঈ ঘাড় নাড়তেন, বায়না থাকলে আর তুমি জানতে পাবতে না ?

তা ঠিক। মনোহরপ্রসাদও ঘাড় নেড়েছে। এমনি নানা খবর।

আজ রাতে মীর্জা হোসেন আসবেন গান শুনতে। সন্ধ্যার ঝোঁকে মনোহরপ্রসাদ সংবাদ আনল।

আজ রাতে ? সর্বনাশ ! বিস্ময়ে আনোয়ারীবাঈ চোখ কপালের মাঝ বারবর তুলেছেন, আজ যে ডাক্তার জনার্দন সুকুল আসবেন। তিনদিন আগে খবর পাঠিয়েছিলেন।

ও ঠিক আছে, নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিয়েছে মনোহরপ্রসাদ, আমি তাঁকে বারণ করে এসেছি। বলেছি আপনার তবিয়ৎ খারাপ। দিন সাতেক পরে আসর বসবে।

কিন্তু কাজটা কি ঠিক হল ভাইসায়েব ? আনোয়ারীবাঈ আমতা আমতা করেছেন।

মীর্জা হোসেন কাল সকালে হায়দ্রাবাদ ফিরে যাচ্ছন। বছর খানেকের আগে আর এ মুখো হবেন না। আর সুকুল সায়েব তো ঘরের লোক।

আনোয়ারীবাঈ রাজি। কোনদিন মনোহরপ্রসাদের কথার ওপর কথা বলেননি। এটুকু জানতেন, মনোহরপ্রসাদ যা করবে আনোয়ারীবাঈয়ের ভালর জন্যই। নিজের দিকে চাইবে না, গায়েও মাখবে না দুঃখ কষ্ট। সুকুল সায়েবের চেয়ে মীর্জা হোসেন পয়সা কম ঢালবে বলে নয়, হোসেন সাযেব গানের অনেক বেশি সমঝদার। ঠিক জায়গায় তারিফ করতে জানেন, বুঝতে পারেন গলার সূক্ষ্ম কাজের কেরামতি। সুকুল সায়েবের এ সবের বালাই নেই। গান শুরু হতেই তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়েন। ঠিক গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে ঘাড় নেড়ে বলেন, কেয়াবাত ! কেয়াবাত ! বড়

মিঠে গলা বাঈজীর। ভারী মিঠে।

আজ নিশ্চয় এ সব কথা বলতে মনোহরপ্রসাদ আসেনি। গান ছেড়ে দিয়েছেন আনোয়ারীবাঈ। মনোহরপ্রসাদও আর তবলা ছোঁয় না। গান বাজনার সম্পর্ক নেই, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক ঘোচেনি। সময় পেলেই মনোহরপ্রসাদ ঘুরে যায় একবার। পা মুড়ে বসে ফেলে আসা সুখ-দুঃখের গল্প চলে। জমানা বিলকুল বদলে গেছে, সে সম্বন্ধে আক্ষেপ।

অনোয়ারীবাঈ বিস্মিত হলেন, হেসে বললেন, আর জরুরি খবরে দরকার কী ভাইসায়েব। তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, এবার যা কিছু জরুরি খবর আসবে একেবারে ওপার থেকে।

মনোহরপ্রসাদ এ কথার কোনও উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে কার্পেটের একটা ফুল খুঁটতে খুঁটতে আস্তে বলল, মোতি এসেছে শহরে।

মনোহরপ্রসাদের কথার টুকরো কানে যেতেই আনোয়ারীবাঈ টান হয়ে বসলেন। একটা হাত রাখলেন কানের পাশে। মনোহরপ্রসাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, কে এসেছে ? কে এসেছে শহরে ?

মনোহরপ্রসাদ মাথা তুলল, গলাও চড়াল একটু, মোতি এসেছে, মোতি। খবরের কাগজে বেরিয়েছে মেজর বর্মা লক্ষ্ণৌতে বদলি হয়েছেন।

বুঝতে বেশ একটু অসুবিধা হল আনোয়ারীবাঈয়ের। অস্পষ্ট কতকগুলো হিজিবিজি লেখা। অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন। বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন কিছুক্ষণ, মোতি, মোতিবাঈ, মোতিবাঈ এসেছে শহরে।

দু একদিনের কথা নয়। দেড় যুগেরও বেশি, তখন কত বয়স মোতির। বড় জোর পাঁচ কি ছয়। দুপাশে বেণী দোলানো, রঙিন শালোয়ার পাজামা পরা ফুটফুটে মেয়ে। ছুটে ছুটে বেড়াত এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে দোস্তি। চেয়ে চেয়ে আনোয়ারীবাঈয়ের আশ আর মিটত না। কোনদিন যে মনের মানুষের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল আনোয়ারীবাঈ, পাতানো নয়, সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী, পরের যুগের গজল-ঠুংরি-খেয়ালের সুরে বাঁধা জীবন নয়, পা ফেলা নয় তবলার বোলের তালে পা মিলিয়ে, মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখে ঘেরা জীবন, সামাজিকতার গণ্ডির মধ্যে সাবধানে পা ফেলে চলা, মোতি আনোয়ারীবাঈয়ের সেই ফেলে আসা জীবনেরই চিহ্ন।

শুধু মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈ চমকে উঠতেন। আগুন জ্বলে উঠত মাথায়। যখন দু একজন গানের ওস্তাদ, আশপাশের দু একজন রসিক আদমি মোতিকে আদর করতে করতে বলত, আর কেন আনোয়ারী, এবার মেয়েকে গান বাজনা শেখাতে আরম্ভ করো। এখন থেকে শুরু করলে তবে বয়সকালে মার মতন মিঠে গলা পাবে, নাম রাখবে লক্ষ্ণৌর।

মুখে আনোয়ারীবাঈ কিছু বলেননি, কিন্তু মনে মনে শিউরে উঠেছেন। মানুষজন সব সরে যেতে, বাড়ি খালি হয়ে যেতে মোতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেছেন। মোতির ঠোঁটে, গালে চুমু খেতে খেতে বলেছেন, না, তোকে আমি কিছুতেই এ পথে নামতে দেব না। কিছুতেই না।

মনের ইচ্ছাটা আড়ালে ডেকে মনোহরপ্রসাদকে বলেও ছিলেন অনেকবার।

মোতিকে আমি সরিয়ে দিতে চাই এখান থেকে। নাচ গান হৈ হল্লা এসব যেন ওর জীবনে কোনও দিন না আসে।

মনোহরপ্রসাদ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এ আবার কী কথা ! আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে গান বাজনা শিখবে না তো বেনারস গিয়ে মালা জপবে বসে বসে ? তীর্থধর্ম শুরু করবে উঠতি বয়সে ?

তীর্থধর্ম করবে কেন এ বয়সে ! সংসার করবে। মনের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঘর পাতবে। নিজের ফেলে আসা সাজানো সংসারের কথা ভেবেই আনোয়ারীবাঈ উদগত নিশ্বাস চাপলেন।

ঘর সংসার করবে মেয়ে। তা বেশ, কিন্তু জেনে শুনে চকের আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়েকে কে

এগিয়ে আসবে বিয়ে করতে। ওড়না ফেলে কে মাথায় ঘোমটা দেওয়াবে। দু একজ কাচা বয়সের কচিডানা মেলে সবে উড়তে শেখা ছোকরা হয়তো রাজি হতেও পারে। বিয়ের ভড়ং রে নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করবে কদিন। তারপর সখ মিটলে কিংবা বাপের দেওয়া মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেলে ফেলে পালাবে মোতিকে। তখন !

কাজটা যে সোজা নয়, তা আনোয়ারীবাঈ ভালই জানেন। আর জানেন বলেই মনোহরপ্রসাদকে ডেকেছেন শলা-পরামর্শ করতে।

একটা উপায় আছে। আনোয়ারীবাঈ এগিয়ে এসে একটা হাত রাখলেন মনোহবপ্রসাদেব হাতের ওপর।

কী উপায় ? মনোহরপ্রসাদ নড়ে নড়ে সোজা হয়ে বসল।

বার কয়েক ঢোক গিললেন আনোয়ারীবাঈ। কপালে জমে ওঠা ঘামের বিন্দু সুরভিত রুমাল দিযে মুছে নিলেন, তারপর বললেন, এমন করা যায় না ভাইসায়েব, আনোয়ারীবাঈয়েব মেযে নয় মোতি। ছেলেবেলায় মা-বাপ হারা কোনও অনাথা। তিন কুলে দেখবাব কেউ নেই। কোনও ভদ্রলোক যার ছেলেপিলের সাধ অথচ ভগবান কিছু পাঠাননি কোলে, তেমন কেউ মোতিকে নিতে পারে না ? নিজের মেয়ের মতন মানুষ কবতে পাবে না ?

সর্বনাশ, বিলিয়ে দেবেন মেয়েকে ! কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে আনোয়াবীবাঈ বাঁচবেন কী কবে ?

আনোয়ারীবাঈ বাঁচতে চায় না। মেয়েকে বাঁচাতে চায়। আনোযারীবাঈয়ের গলা ধবাধবা।

মনোহরপ্রসাদ বোঝাতে চেষ্টা করল। ব্যাপারটা আনোয়াবীবাঈ ভাল কবে ভেবে দেখুন। হঠাৎ উচ্ছ্বাসের ঘোরে এমন একটা কাজ করলে আপসোসের অন্ত থাকবে না। শেষ জীবনে যখন পঙ্গুত্বের অভিশাপ নামবে, দেহ জরাগ্রস্ত হবে, হাজার চেষ্টাতেও গলায় মিঠে সুব ফুটবে না, তখন এই মেয়েকে আশ্রয় কবেই তো বাঁচতে হবে। এবই রোজগাবে দিন কাটাতে হবে। আব কী অবলম্বন থাকবে ?

অবলম্বন ? আনোয়ারীবাঈ হাসলেন। করুণ হাসি। মনোহরপ্রসাদেব দিকে চেয়ে বললেন, শেষ জীবনে মেযের চেয়ে আরও বড় কিছু অবলম্বনের খোঁজ করব ভাইসাযেব। সারাটা জীবন তো ছিনিমিনি খেললাম নিজেকে নিয়ে, তখন মালেকের কথা ভাবব। তাঁর হাতেই ছেড়ে দেব নিজেকে।

এব ওপর আর কথা চলে না। তবু মনোহরপ্রসাদ একবার শেষ চেষ্টা কবল, কিন্তু মোতি থাকতে পারবে আপনাকে ছেড়ে ?

আনোয়ারীবাঈ আবার হাসলেন, মানুষের পরমায়ুর কথা কেউ বলতে পারে ? হঠাৎ যদি মাবাই যায় আনোয়ারীবাঈ, তাহলেও তো আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে মোতিকে। হাজার কাঁদলেও আমাকে ফিরে পাবে না। না, ভাইসায়েব, আনোয়ারীবাঈ গলার সুর নরম করলেন, ভেজা ভেজা স্বর, একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে। মোতিকে আমি এ নরকে বাড়তে দেব না। ওকে কোথায়ও সরিয়ে দিতেই হবে। তুলে দিতে হবে কোনও ভদ্র মানুষের হাতে।

মনোহরপ্রসাদ ঘাড় নেড়েছিল বটে, কিন্তু কোনও সুবিধা করতে পারেনি।

অনোয়ারীবাঈ ভোলেননি কথাটা। গান-বাজনার শেষে ক্লান্ত দুটি চোখ তুলে সেই এক মিনতি জানিয়েছিলেন মনোহরপ্রসাদকে। আর দেরি নয়, মেয়ে বড় হচ্ছে। বুঝতে শিখছে। যা কিছু করতে হয়, এই বেলা। গাছ একটু বড় হয়ে গেলেই তাকে ওপড়ানো মুশকিল। মাটিব গভীবে চলে যায় শিকড়, ডালপালা বিস্তৃত হয় দিকে দিকে, তখন টানাটানি করতে গেলে ক্ষতিই হয়। লক্ষ্ণৌতে সে বকম কেউ না থাকে, মনোহরপ্রসাদ আশপাশে ঘুরে দেখুক। ঘোরবাব সব খরচ আনোয়ারীবাঈ দেবেন, কিন্তু আর দেরি নয়।

বরাত ভাল মনোহরপ্রসাদের। এদিক ওদিক ঘুরতে হয়নি। কাছে-পিঠেই খোঁজ পাওয়া গেল। সুন্দরবাগে নতুন এক ভদ্রলোক এসেছেন, স্ত্রীকে নিয়ে। যে বাড়িতে উঠেছেন, সেই বাড়িওয়ালা মনোহরপ্রসাদের দোস্ত। কথায় কথায় ব্যাপারটা তার কাছ থেকেই জানা গেল।

ভদ্রলোক সরকারের বড় চাকরে। সারা ভারতবর্ষে চাকরির অন্ন ছড়ানো। ঘুরে ঘুরে সেই অন্ন খুঁটে তুলতে হয়। বছর তিনেক পর পর বদলি হন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা। পয়সাকড়ি, ইমানইজ্জত সব আছে, কেবল সুখ নেই। বছর চারেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে ছিল, আজমগড়ে দুদিনের জ্বরে মেয়েটি শেষ। চিকিৎসার সুযোগও পাওয়া গেল না। সেই থেকে ভদ্রলোকের স্ত্রী অনবরত কাঁদেন আর বুক চাপড়ান। অভিশাপ দেন ভগবানকে। ভদ্রলোক এসব কিছু করেন না। অফিসের সময়টুকু ছাড়া চুপচাপ ঘরে বসে থাকেন দরজা জানলা বন্ধ করে।

মনোহরপ্রসাদ আসমানের চাঁদ পেল হাতের মুঠোয়। তকলিফ করে আসমানে চড়তে হল না, চাঁদ নিজেই যেন নেমে এসে ধরা দিল।

দোস্তের মারফত আলাপ হল। প্রথম প্রথম দু-একটা সান্ত্বনার মোলায়েম কথা, মিঠে মিঠে উপদেশ, দুনিয়াব কিছুই স্থায়ী নয় সে সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা। তারপর আস্তে আস্তে কথাটা পাড়ল। খুব সাবধানে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মনোহরপ্রসাদের দিকে, তারপর ধীরগলায় বললেন, কিন্তু যাদের মেয়ে তারা ছাড়বে কেন ?

ছাড়বে কেন ! মনোহরপ্রসাদ কপালে হাত চাপড়ালেন, বাপ গেছে অনেকদিন, মা যে অবস্থায় আছে, দুবেলা দুখানা রুটিও দিতে পাচ্ছে না মেয়েকে। কোনদিন দেখব মা আর মেয়ে দুজনেই খতম হয়ে গেছে। নযতো, মা কি আর সহজে ছাড়তে চায় মেয়েকে !

ভদ্রলোক উঠে ভিতরে গেলেন, বোধহয় পরামর্শ করলেন স্ত্রীর সঙ্গে, তারপর বাইরে এসে বললেন, একবার দেখাতে পারেন মেয়েটাকে ?

বহুৎ খুব, বলেন তো কালই নিয়ে আসতে পারি।

বেশ। তাই নিয়ে আসবেন।

সোজা মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারীবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করল। সব ঘটনা জানাল। পরের দিন সকালে মোতিকে নিয়ে যাবে তাও বলল।

মনোহবপ্রসাদ ভেবেছিল, সব ঠিকঠাক হলে আনোয়াবীবাঈ বোধহয় রাজি হবেন না। প্রাণ ধরে ছাড়তে পাববেন না মেয়েকে। কিন্তু আনোযারীবাঈ একটুও আপত্তি করলেন না। সামান্য বাধাও নয। কেবল বললেন, লোক বেশ ভাল তো ভাইসায়েব ? মোতির কোনও কষ্ট হবে না ?

নিজের পেটের মেয়ে হারিয়েছে, এখন যাকে নেবে, তাকে নিজের মেয়ের মতনই মানুষ করবে। আর তাছাড়া লোক খুব ভদ্র। খানদানি ঘরের ছেলে, শুনলাম লেখাপড়াও খুব জানে।

আনোয়াবীবাঈ আর কিছু বললেন না, কিন্তু পরের দিন মনোহরপ্রসাদ মোতিকে নিতে গিয়েই অবাক। দামি শালোয়াব, দোপাট্টা, পায়জামায় ঝলমল করছে মেয়ে। গলায় মুক্তার মালা, কানে পান্নার দুল। পায়ে ভেলভেটের নাগরা।

সর্বনাশ, এই বুঝি অভাব অনটনে দিন কাটানো মেয়ের পোশাকের বহর !

কথাটা মনোহরপ্রসাদ বলল আনোয়ারীবাঈকে।

এত সব দামি জামা গয়না পরিয়েছেন কেন ? গরিবের মেয়ে, এই কথাই তো জানানো হয়েছে।

তবে ? এই এতক্ষণ পরে একটু যেন ছলছলিয়ে এল আনোয়ারীবাঈয়ের চোখ। ভিজে ভিজে গলা।

সব খুলে ফেলব ?

মনোহরপ্রসাদ ভাবল দু-এক মিনিট, তারপর বলল, শালোয়াব পাজামা না হয় থাক, গয়নাগুলো খুলে নিতে হবে।

আনোয়ারীবাঈ এক এক ক'রে সব খুলে নিলেন। মেয়েকে সারারাত ধরে বুঝিয়েছেন। নতুন জায়গায় গিয়ে বেফাঁস যেন কিছু না বলে ফেলে, কান্নাকাটি না করে। বাইরে যাবেন আনোয়ারীবাঈ। তীর্থ ধর্ম করতে। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের যেতে নেই। ফিরে এসে মোতিকে তিনি নিয়ে আসবেন।

কার কাছে যাব মা ! মোতি অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করেছে।

তোমার কাকা-কাকির কাছে। দেখবে কত যত্ন কববে, ভালবাসবে, জিনিস কিনে দেবে।

মোতি আর কথা বলেনি। এখানে মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম। মাঝে মাঝে আনোয়ারীবাঈ শহবে যান মুজরো নিয়ে। খুব দূরে কোথাও নয়, ধাবে কাছেই। কানপুব, বেরিলি, ফয়জাবাদ। সেই সময মোতি থাকে বুড়ি ঝির কাছে। এখানে থাকলেও আনোযারীবাঈ ধারে কাছে ঘেঁষতে দেন না মেয়েকে। গান বাজনার আসরে এসে কাজ নেই। সারেঙ্গীব সুব আর তবলার বোলে শুধু সুর নয়, বিষও আছে। একবার নেশা ধরলে আব রক্ষা নেই।

মোতিকে নিয়ে যাবার সময় ধাবে কাছে আনোযারীবাঈকে দেখা গেল না। এদিক-ওদিক চেয়েও মনোহরপ্রসাদ তাঁর খোঁজ পেলেন না।

ভদ্রলোকের নাম ব্রজবিলাস শকসেনা। আদি নিবাস মজঃফরপুর। বিলেতে ছিলেন বছর চাবেক। স্ত্রী পর্দানসীন নন, কেবল আনকোবা শোক পেয়ে বাইরে বেরনো বন্ধ কবেছেন। মোতিকে দেখে ব্রজবিলাসবাবুর স্ত্রী পর্দা ঠেলে সদরে চলে এলেন। দু হাতে মোতিকে বুকের মধ্যে জাপ্‌টে ধবে ভেঙে পডলেন কান্নায়। ব্রজবিলাসবাবু কাঁদলেন না বটে, কিন্তু তাঁর মুখ চোখেব ভাবে মনে হল, মেযেব শোকটা আবার নতুন করে যেন দেখা দিল।

মোতিকে তাঁরা ছাড়লেন না। কথা হ'ল মনোহরপ্রসাদ বিকেলে এসে মোতিকে নিয়ে যাবে, আবাব পরের দিন সকালে মোতির জামাকাপড় বিছানাপত্র যা আছে সবসুদ্ধ নিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে মোতিকেও।

যাবার মুখে ব্রজবিলাসবাবু মনোহরপ্রসাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

একটা কথা ছিল।

বলুন।

কিছু টাকা, ওর মাকে দিতে চাই। যদি আপনি নিয়ে যান সঙ্গে করে।

মনোহরপ্রসাদ দুহাত জোড় করল। বিনীত গলায় বলল, কসুর মাফ করবেন। টাকা নিতে ওর মা হযতো রাজি হবেন না। তাহলে মেয়েকে বিক্রি করার সামিলই হবে। মেয়েকে মানুষ করে তুলুন আপনাবা তাতেই উনি খুশি হবেন।

তারপর থেকে মেয়ের সঙ্গে আর আনোয়ারীবাঈয়ের দেখা হয়নি। দেখা হয়নি বটে, তবে খোঁজ-খবর পেয়েছেন মনোহরপ্রসাদের মারফত। বছর তিনেক পরেই ব্রজবিলাস বদলি হলেন মীরাট, সেখান থেকে দেরাদুন ছুঁয়ে গেলেন আগ্রা। সব জায়গা থেকেই চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিলেন মনোহরপ্রাসদের সঙ্গে। চিঠিতে বেশির ভাগই মোতির কথা। মোতির মা যে বাঈজী ছিলেন, সেকথা মোতির কাছ থেকেই তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কোনও আক্ষেপ নেই। পিছন দিকে চাইতে আর তাঁরা রাজি নন। পুনর্জন্ম হয়েছে মোতির। আনোয়ারীবাঈয়ের মেয়ে নয় মোতি, এখন সে মোতিকুমারী শকসেনা, ব্রজবিলাস শকসেনা, সিনিয়র অফিসরের একমাত্র মেয়ে।

তারপর বছব কয়েক কোনও খবর নেই। পুরনো ঠিকানায় চিঠি দিয়েও মনোহরপ্রসাদ কোনও

উত্তর পাননি। হঠাৎ চিঠি এল মজঃফরপুর থেকে। লিখেছেন মায়াবতী শকসেনা, ব্রজবিলাসের বিধবা স্ত্রী। সামনের মাসে মোতির বিয়ে, আর্মি অফিসর মোহনচাঁদ বর্মার সঙ্গে। তাঁর স্বামী হঠাৎই মারা গেছেন। অফিসের টেবিলে হার্টফেল করে। এই বিয়েতে মনোহরপ্রসাদ অনুগ্রহ করে যদি পায়ের ধুলো দেন তো সবাই কৃতার্থ বোধ করবে।

মনোহরপ্রসাদ যেতে পারেনি, কিন্তু আনোয়ারীবাঈকে পড়িয়ে শুনিয়েছিল সে চিঠি। তখন আনোয়ারীবাঈয়ের অবস্থা পড়তির মুখে। রোগে ধরেছে। লোকের আসা-যাওয়া অনেক কম। প্রায় খালিই পড়ে থাকে জলসাঘর। বাড়িভাড়াও কিছু কিছু বাকি পড়েছে। ভাবছেন সরে গিয়ে কোথাও আরও ছোট বাড়ি ভাড়া করবেন। চকের আরও ভিতরের দিকে।

সেদিন বাক্স হাতড়ে একটা মুক্তার মালা বের করেছিলেন আনোয়ারীবাঈ। ঝুটো নয়, খাঁটি মুক্তা। বোম্বাইয়ের আমির মকবুল আলির উপহার। খুব বড় বড় জায়গায় যেতে আসতে আনোয়ারীবাঈ গলায় দিতেন। মোতির বিয়েতে সেটাই পাঠিয়ে দিলেন।

বিয়েতে মনোহরপ্রসাদ যায়নি, কিন্তু দিন পাঁচেক পরে বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ পড়েছিল খবরের কাগজের পাতায়। খুব ধুমধাম। দু হাজারের ওপর মাননীয় অতিথি। জাঁদরেল সব অভ্যাগতের লিস্ট। সে খবরও মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারীবাঈকে শুনিয়েছিল। আজকাল কী যে হয়েছে আনোয়ারীবাঈয়ের। বোধহয় বয়স হয়েছে বলেই, একটুতেই জল জমা হয় চোখের কোণে। দুটো ঠোঁট থরথরিয়ে কাঁপে, আর ঠিক বুকের বাঁ পাশে অসহ্য যন্ত্রণা। নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়।

আনোয়ারীবাঈ বিড় বিড় করে বললেন একবার মোতিকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে। দূর থেকে একটু দেখে আসা।

মনোহরপ্রসাদ এ কথার কোনও উত্তর দেয়নি। অবশ্য মায়াবতী শকসেনাকে চিঠিপত্র লিখে মোতির সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো করা যায়, কিন্তু মেয়ে সুখী হয়েছে, ভাল ঘরে, ভাল বরে পড়েছে, এই তো যথেষ্ট। চোখে দেখতে যাওয়া মানেই তো মায়া বাড়ানো। আরও কষ্ট পাওয়া।

মনোহরপ্রসাদ লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছিল।

তারপর কয়েক বছর আর কোনও খোঁজ-খবর নেই। কোনও চিঠিপত্রও দেননি মায়াবতী শকসেনা।

মাঝে মাঝে দেখা হলেই আনোয়ারীবাঈ বলেছেন, আর কটা দিনই বা বাঁচব, যাবার আগে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করেছে মোতিকে।

মনোহরপ্রসাদ আমল দেয়নি। বলা যায় না মেয়েমানুষের মন। এমনিতে আনোয়ারীবাঈ খুব শক্ত, বাইরে কাঠিন্যের দুর্ভেদ্য আবরণ, কিন্তু চোখের সামনে নিজের মেয়েকে দেখতে পেলে, সে নির্মোক হয়তো খসে পড়বে। কেঁদে ফেলবেন আনোয়ারীবাঈ। অযথা একটা গোলমালের সৃষ্টি। আর্মি অফিসর মোহনচাঁদ বিরক্ত হবেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়াও বিচিত্র নয়।

হঠাৎ সকালে খবরের কাগজটা ওল্টাতে ওল্টাতে মনোহরপ্রসাদের চোখে পড়ে গেল। বার বার পড়ল খবরটা, কাগজটা চোখের কাছ বরাবর নিয়ে, তারপরই খবরটা নিয়ে গেল আনোয়ারীবাঈয়ের কাছে।

মেজর মোহনচাঁদ বর্মা জলন্ধর থেকে বদলি হয়েছেন লক্ষ্ণৌ। সামনের সোমবার থেকে নতুন জায়গার কার্যভার গ্রহণ করবেন।

আনোয়ারীবাঈ এগিয়ে এসে একেবারে মনোহরপ্রসাদের দুটো হাত জড়িয়ে ধরলেন।

আমি মোতিকে দেখব। চুপচাপ দেখে চলে আসব। ওর বাড়ির রাস্তায় বসে থাকব, ও বাইরে বেরোবার সময় একবার শুধু চোখের দেখা দেখব। ভাইসায়েব, এইটুকু উপকার আমার করতেই

হবে। আমি বুঝতে পারছি, আর আমি বেশিদিন নেই।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারীবাঈ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

আচ্ছা দেখি। মনোহরপ্রসাদ হাত ছাড়িয়ে বাইরে চলে এল।

বাইবে চলে এল বটে, কিন্তু কথাটা ভুলল না। বিকেলের দিকে টাঙ্গায় চড়ে হাজির হল বাদশাবাগে। বেশি ঘুরতে হল না। বাস্তার ওপরেই খাসা ঝকঝকে দুতলা। বোগেনভিলার গেট, নিচু পাঁচিল আইভি-জড়ানো। রাস্তা থেকেই পুরো লন নজরে আসে। বাহারে গাছের ছিটে দেওয়া মখমল নবম লন।

এগিয়ে গিয়ে তকমা-আঁটা দরোয়ানের সঙ্গেও মনোহরপ্রসাদ আলাপ জমিয়ে ফেলল। মেহ্‌মান আদমি, ঘুবে ঘুবে দেখছে সারা শহর। চমৎকার বাড়ি। যেমন বাড়ি তেমনি বাগান। ভাগ্যবান মালিকটি কে ?

মালিক আডভানি সায়েব, দরোয়ানের ভাগ্যে এমন শ্রোতা সচরাচর জোটে না, টুলে বসে আয়েস কবে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল, উপস্থিত ভাড়া নিয়েছেন মেজর বর্মা। নতুন এসেছেন এখানে। সামনেব রবিবার খানাপিনা আছে। শহরের জাঁদরেল লোকদের আমন্ত্রণ। এখানকার সমাজে পবিচিত হতে চান মেজর সায়েব।

বটে, মনোহরপ্রসাদ কল্পিত বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল, খানাপিনা হবে কোথায় ? কার্লটন হোটেলে ?

উহুঁ, হোটেলে কেন, সায়েব এই লনে বন্দোবস্ত করতে বলেছেন। বাইরের লনই তো ভাল।

দবোযান বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়ল।

তা তো নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল মনোহরপ্রসাদ, তারপর একটু থেমে বলল, বিবিজী নেই বাডিতে, না সায়েব একা।

হ্যাঁ, বিবিজী আছেন বৈকি ! জিনিস কিনতে হজরতগঞ্জ গেছেন। বিবিজীই তো সব। তিনি ঘোবান, সায়েব ঘোবেন।

দবোযানেব গলা পরিহাস-তরল। মনোহরপ্রসাদ আর কথা বাড়াল না। ধন্যবাদ জানিয়ে টাঙ্গায় এসে উঠল।

ওই কথাই ঠিক হল। সন্ধ্যার ঝোঁকে মনোহরপ্রসাদ টাঙ্গা নিয়ে আসবে। আনোয়ারীবাঈ সঙ্গে যাবেন। নিচু পাঁচিল, রাস্তা থেকে দেখার কোনও অসুবিধা নেই। আর তেমন হলে বেড়ার কাছ ঘেঁষে দাঁডালেই চলবে। দরোয়ানের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ভিতরে না ঢুকতে দিতে পারে, বেড়ার বাইরে দাঁডালে আপত্তি করবে না। খানাপিনার ব্যাপার যখন, লনে আলোর বন্দোবস্ত নিশ্চয় থাকবে। আনোয়ারীবাঈয়ের দেখতে কোনও অসুবিধা হবে না। ঠিক চিনতে পারবেন আত্মজাকে। চোখ ভরেই শুধু নয়, মন ভরেও দেখতে পাবেন।

টাঙ্গায় উঠেই আনোয়ারীবাঈ অস্বস্তি বোধ করলেন। বুকের বাঁ দিকে তীব্র ব্যথা। টনটন করে উঠল চোখের দুটো পাতা।

কী হল, কষ্ট হচ্ছে ? মনোহরপ্রসাদ আনোয়ারীবাঈয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

না, ঘাড় নাড়লেন আনোয়ারীবাঈ, কোনও কষ্ট হচ্ছে না। কেবল বুকের ভিতর অসহ্য দাপাদাপি। এত বছর পরে মেয়েকে দেখতে পাবেন, যে মেয়েকে দু হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন পঙ্কিল পরিবেশ থেকে, বাঈজীর ঘৃণ্য জীবন থেকে উন্নীত করেছেন গৃহস্থ-বধূর পর্যায়ে। তাই বুঝি হৃদয় অধৈর্য হয়ে পডছে, অপেক্ষা করতে মন সরছে না।

টাঙ্গা যখন গিয়ে পৌঁছল তখন অতিথি-অভ্যাগতেরা সবাই এসে গিয়েছেন। জোর বাতির নীচে

ঝলমলে রঙিন পোশাকের সার। এতদূর থেকেও প্রসাধনের উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল, মদির সুবাস। কিছু কিছু লোককে মনোহরপ্রসাদ চিনতে পারল, শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবার। আমিনাবাদের রিটায়ার্ড জজ কেশরী সুকুল থেকে শুরু করে নবাবের বংশধর আমিনউদ্দিন। সেরা ব্যবসায়ী মিস্টার মোডিব পাশাপাশি ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার হেনরি উড। তাদের সঙ্গে রয়েছেন আত্মীয়া আর বান্ধবীব দল। কলরবে জায়গাটা সরগরম। মাঝখানে মেজর বর্মাকে দেখা গেল। ঘুরে ঘুরে তদারক করছেন, মাঝে মাঝে চোখ ফেরাচ্ছেন বাড়ির দিকে স্ত্রীর আসার প্রত্যাশায়।

দরোয়ানই বলল, মেমসায়েব এখনও নামেননি, বোধ হয় সাজছেন।

আনোয়ারীবাঈ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন গাড়ি-বারান্দার দিকে। ঐখান দিয়েই তো মোতি আসবে। আনোয়ারীবাঈয়ের আত্মজা, তাঁরই রক্ত-মাংসে গড়ে তোলা স্বতন্ত্র সত্তা।

হঠাৎ আলোড়ন উঠল অতিথিদের মধ্যে। সবাই দাঁড়িয়ে উঠলেন। মেজর বর্মা এগিয়ে এলেন দু-এক পা।

পাতলা ফিনফিনে ব্লাউজ—কটি উদঘাটিনী, হালকা সবুজ রংয়েব আরও পাতলা শাড়ি। অন্তর্বাস দিনের আলোর মতন স্পষ্ট। আঁকা ভ্রু, ঠোঁটে কৃত্রিম লালিমা, দু-গালে রুজের রক্তিম আমেজ, সুর্মাটানা দুটি চোখকে আয়ত করার দুর্লভ প্রচেষ্টা, চুড়ো-বাঁধা কটা চুলের রাশ।

চেয়ে চেয়ে দেখলেন আনোয়ারীবাঈ। সেদিনের সে মেয়েটির সামান্যতম পরিচয়ও নেই মিসেস বর্মার মধ্যে। শান্ত সুন্দর মেয়েটা কী মন্ত্রে রূপান্তরিত হল আজকের এই উৎকট বিলাসিনীতে। যে পোশাক পরে আনোয়ারীবাঈ নিভৃতে বিশেষ কোনও অতিথির সামনে আসতেও লজ্জা পেতেন, কী করে মোতি হাজার অতিথির মাঝখানে এসে দাঁড়াল সেই পোশাকে!

মিসেস বর্মাকে নিয়ে যেন লোফালুফি শুরু হল। অপূর্ব ভঙ্গিতে মোতি এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে সরে সরে যেতে লাগল। কোথাও কোনও পুরুষের চটুল উক্তিতে নিচু হয়ে তার গালে আলতো করাঘাত করে বলল, Naughty boy, আবার কোথাও কোনও পুরুষের বাটনহোল থেকে গোলাপ তুলে নিয়ে নিজের কবরীতে গাঁথল। কারও টেবিলে বসে হেসে গড়িয়ে পড়ল অতিথিব গায়ের ওপর, লিপস্টিক-রক্তিম ঠোঁট দুটো ফাঁক করে মোহিনী হাসি উপহার দিয়ে আবার সরে গেল অন্য টেবিলে।

মনোহরপ্রসাদের টনক নড়ল আচমকা মণিবন্ধে টান পড়তে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আনোয়ারীবাঈ কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। থর থর করে কাঁপছে গোটা শরীর।

টাঙ্গা অপেক্ষা করছিল, আর দেরি করল না মনোহরপ্রসাদ। সাবধানে আনোয়ারীবাঈকে ধবে গাড়িতে নিয়ে এল। কী ভাগ্যিস, জোর ব্যাণ্ড শুরু হয়েছে লনে, আনোয়ারীবাঈয়ের উচ্ছ্বসিত কান্নাব আওয়াজ কারও কানে যায়নি।

কী হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ লাগছে? মনোহরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল।

এতদিন পরে নিজের মেয়েকে চোখের সামনে দেখলে কষ্ট হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। এরজন্যই আনতে চায়নি আনোয়ারীবাঈকে।

না, না, শরীর আমার খুব ভাল আছে। কিন্তু কী হল ভাইসায়েব! বাঈজীর মেয়ে বাঈজীই হয়ে রইল! ছেলেবেলা থেকে কাছ ছাড়া করেও রক্তের দোষ ছাড়াতে পারলাম না। পোশাক-আশাক, রং-ঢং, চালচলন—এ সবে চকের রাস্তায় দাঁড়ানো বাঈজীদেরও যে হার মানাল! এ কী হল ভাইসাব, এ আমার কী হল!

দু-হাতে মুখ ঢেকে আনোয়ারীবাঈ আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

শারদীয়া দেশ পত্রিকা ১৩৬৩

দো লা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বিয়ে আমি বেশি বয়সেই করেছিলাম। চল্লিশ পাব কবে দিয়ে। অবশ্য এই বয়সে এসে বিয়ে করবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কথাটা শুনে আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছেন। বিশেই হোক আব চল্লিশেই হোক বিয়ের কথায় মন কদমফুলের মতো বোমাঞ্চিত হয় না কার। মুখে যতই না না বলুক, মনে মনে কে না ভাবে 'আর একবাব সাধিলেই খাইব।' কিন্তু বাবা-মা যতদিন ছিলেন সাধাসাধি কম কবেননি, দাদা বউদিও যথেষ্ট সেধেছেন। কিন্তু আমি মত দিইনি। পরিবারের চেয়ে তাব বাহিরের জীবনই আমাকে বেশি আকৃষ্ট কবত। কোনরকমে গাড়িভাড়াটা জোগাড় করতে পাবলেই বেরিয়ে পড়তাম। ঘুরে বেড়ানোটা এক সময় আমাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছিল—তাই বলে শুধু যে ভবঘুরে ছিলাম তাও নয়। দু-একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল। তাদের নিয়মিত সদস্য আমি ছিলাম না। ধর্মানুষ্ঠানেও যোগ দিইনি। তবু চাঁদা তোলাব কাজে, সেচ্ছাসেবকদের নিয়ে দুর্ভিক্ষে বন্যায় দুর্গতদেব মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে ভালবাসতাম। নামযশের লোভ যে একেবারেই ছিল না সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে সেই লোভেই একমাত্র প্রেরণার বস্তু ছিল না। কিন্তু নিজের কথা নিজে বড় বেশি বলে ফেলেছি।

আমার জীবনকাহিনীর এই যে খসড়া আপনাকে পাঠাচ্ছি, আপনি ইচ্ছা করলে আপনার গল্পে তাব প্রথম দিকটা ছেঁটে দিতে পাবেন। কারণ আপনার গল্পের সঙ্গে এই অংশের বিশেষ কোনও যোগ থাকবে না। আপনার গল্প হবে অষ্টম হেনরির প্রাইভেট লাইফ, তাব পাবলিক লাইফ নয়।

আমি যখন একটা দেশি মার্চেন্ট অফিসে চাকরি নিয়েছি তখন থেকেই গল্পটা আরম্ভ করতে পাবেন। একেবারে কনিষ্ঠ কেবানি হতে হয়নি। সহকারি ম্যানেজারেব পদই পেয়েছিলাম। ডিগ্রিটা ছিল। বযসও হযেছে। তাছাড়া ডিবেক্টব বোর্ড খবরের কাগজে নামটামও দেখে থাকবেন। ছবিও হযতো দু-একবার বেরিয়েছে—দেখবার মতো ছবি নয়। দাঁড়কাকেব মতো চেহারা। তবুও লোকে দেখত।

ওই একটু পরিচয়ের জোরেই কাজটা ভাল পেয়েছিলাম। সেই তুলনায় মাইনে অবশ্য ভাল নয়। তবে নিজের মেসের খরচটা চলে যেত আর বই কেনার বিলাসিতাটাও বাখতে পারতাম।

ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, বেশ ছিলাম। দাদা বউদি ছেলেপিলে নিয়ে এলাহাবাদের বাসিন্দা হয়েছেন। বাড়িও করেছেন সেখানে। দাদা সরকারি চাকুরে। বউদি মহিলা-সমিতির নেত্রী। ভাইপো ভাইঝিরা ওখানেই পড়ে, বড়রা চাকরি বাকরি করে। মাঝে মাঝে আমি ছুটিছাটায় যাই আসি। বউদি তখনও ঠাট্টা করেন, 'কী ঠাকুরপো, বিয়েটা একেবারেই কবলে না ? জীবনের একটা দিক একেবারেই না দেখে চলে গেলে ?'

তিনিও জানেন, ও প্রশ্নের এখন আর কোনও জবাব নেই। কথাটা একেবারেই ঠাট্টা। আমিও তাই জানি।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। আমাদের অফিসের একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের মতিবাবু—মতিলাল দে—মারা গেলেন। মারা যাওয়ার বয়স তাঁর অনেকদিন আগেই হয়েছিল। শতায়ু হও বলে আমরা এখনও আশীর্বাদ করি বটে—কিন্তু সত্তর পর্যন্ত হাত পা চোখ কান নিয়ে টিকে থাকতে পারলেই খুশি হই। মতিবাবু প্রায় ওই বয়স অবধি বেঁচেছিলেন, কিন্তু ঠিক হাত পা চোখ কান নিয়ে নয়। রোগে দাবিদ্র্যে মরবার দশ-পনেরো বছর আগে থেকেই তিনি অর্ধমৃত হয়েছিলেন। শেষের দিকে অফিসে আসতেন লাঠিতে ভর করে। চোখে চশমা দিয়েও কিছু দেখতে পেতেন না। কান-দুটো তো আগে থেকেই গিয়েছিল। হাতের কলমটা পর্যন্ত কাঁপত, ফিগারগুলি সমানে পড়ত না। ওপরে উঠত, নীচে

নামত, এঁকে বেঁকে যেত। কাজ করবার ক্ষমতা আর তাঁর ছিল না। তবু অফিসেই তিনি ছিলেন। তাঁর চেয়ারখানিতে তিনি সেদিন পর্যন্ত বসে গেছেন। প্রমোশন যেমন হয়নি, তেমনি চাকরিও যায়নি।

এই মতিবাবুর কাছে আমি কিছু কৃতজ্ঞ ছিলাম : ছাত্রজীবনে বার দুই ওঁর আশ্রয়ে বাস করেছি। তার পরেও টিউশনি করে আমাকে পড়াশুনো চালাতে হয়েছে। মতিবাবু দুই-একটা দুর্লভ টিউশনির সন্ধান দিয়েছেন। দাদার অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁর কাছে টাকা চাইতে লজ্জা হত। মতিবাবুর অবস্থা আরও খারাপ ছিল। তবু তাঁর কাছে হাত পেতেছি।

তাই মতিবাবু যখন শয্যা নিলেন আমি সপ্তাহে দু-দিন পারি একদিন পারি তাঁর বাদুড়বাগানের বাসায় যেতে লাগলাম। ভারী দরিদ্র পরিবার। পুরনো বাড়ির একতলার দুখানা-ঘরে কোনরকমে মাথা গুঁজে আছেন। আসবাবপত্রের মধ্যে গোটাকয়েক বাক্স তোরঙ্গ তক্তপোষ আর দু-তিনখানা হাতলহীন চেয়ার। আমি সে চেয়ারে বসতাম না। রোগীর বিছানার পাশেই বসতাম। কোনও কোনও দিন ওঁর স্ত্রী আলাদা আসন পেতে দিতেন। বড় মেয়ে চায়ের কাপটি এনে সামনে ধরত। সে যদি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকত, আমার পরিচর্যায় এগিয়ে আসত মেজো সেজোরা। পাশে দাঁড়িয়ে তালপাখা নিয়ে বাতাস করত। আমি হেসে বলতাম, 'আমাকে হাওয়া করতে হবে না, তোমার বাবাকে করো।'

ওঁদের মা বলতেন, 'তোমাকে ওরা দেবতার মতো দেখে। আমাদের আত্মীয়ও নেই, বন্ধুও নেই। এই বিপদের দিনে তুমিই যা এসে খোঁজখবর নাও।' আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতাম, 'অমন কথা বলবেন না। উনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন।'

ওঁর স্ত্রী বলতেন, 'সে কথা আর সংসারে ক'জন মনে রাখে বলো।'

রোগের যন্ত্রণার চেয়েও ভবিষ্যতের চিন্তাটাই মতিবাবুর বেশি। তিনি চোখ বুজলে স্ত্রী আর চারটি মেয়ের কী গতি হবে সেই কথাই বার বার বলতেন। এদের আগে আর পরে ওঁদের আরও ছেলে মেয়ে হয়েছে। তারা কেউ নেই। আছে শুধু ওই ক'টি 'কুফল'।

আমি বলতাম, 'আপনি ওসব ভেবে মন খারাপ করবেন না।'

বলতাম বটে, কিন্তু আমি নিজেই বিশেষ ভরসা পেতাম না। যাদের থাকে না তাদের কিছুই থাকে না। মতিবাবুরও কোনও কুলে কেউ নেই। দূর সম্পর্কের দু-একজন যারা আছে তারা তো কাছেই ঘেঁসে না। হাজার খানেক টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স একবার করেছিলেন। প্রিমিয়াম না দিতে পারায় বহুদিন আগেই তা ল্যাপস করে গেছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার নিয়ে নিয়ে তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

মৃত্যুর পর আরও একটা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হল— এখানে সেখানে কিছু দেনাও করেছেন। মুদির দোকান থেকে শুরু করে ডাক্তারের ওষুধের দাম, বাড়িওয়ালার ভাড়া পর্যন্ত বাকি।

মতিবাবুর স্ত্রী আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'বাবা এই অবস্থায় তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না। মেয়েগুলোকে নিয়ে আমাকে তাহলে পথে দাঁড়াতে হবে।'

পুরনো বন্ধুর খোঁজ নিতে এসে এত বড় দায়িত্ব যে ঘাড়ে চাপবে ভাবিনি। বললাম, 'ভাববেন না, আপনাদের একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না।'

সদ্যবিধবা তাঁর দু-চারখানা গয়না কোনও ট্রাঙ্ক কি ঝাঁপির ভিতর থেকে বের করলেন কে জানে। আমার সামনে এনে ধরে দিয়ে বললেন, 'এছাড়া আমার আর কিছু নেই। এ দিয়ে তুমি ওঁর কাজটুকু করে দাও।'

আমি বললাম, 'ওঁর কাজ আটকাবে না। আপনি ওসব তুলে রাখুন।'

বড় মেয়ের নাম শান্তি। সে বলল, 'মা, উনি তো আমাদের পর নন। ওঁর কাছে অত সঙ্কোচ কিসের। উনি এরই মধ্যে আমাদের জন্য অনেক করেছেন। এই গয়না বিক্রির কটা টাকায় তার যে সিকির সিকিও শোধ হবে না।'

শান্তির বয়স তখন কত আর। আঠারো উনিশ হবে। ও যে দেখতে এত সুন্দর, বোনদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী এর আগে লক্ষ করিনি। হাতে দুগাছি প্লাস্টিকের চুড়ি ছাড়া অলঙ্কারের কোথাও কিছু নেই। পরনে আটপৌরে একখানা শাড়ি। কিন্তু তাতে ওর রূপের অসামান্যতা ঢাকা পড়েনি। উজ্জ্বল রং, তীক্ষ্ণ নাক মুখ চোখ—আপনাদের গল্পের নায়িকা হবার জন্যে যা যা দরকার সবই আছে। কিন্তু এতদিন আমি যেন ভাল করে দেখিনি। হাসবেন না। সত্যিই দেখিনি। কেবল সমস্যার কথাটাই ভেবেছি। বোঝার গুরুভারের কথা ভেবেই ক্লিষ্ট হয়েছি। কিন্তু ওর যে এত রূপ আছে তা দেখিনি। আজ একটি কৃতজ্ঞ তরুণীর মধ্যে নারীর রূপকে আমি প্রথম দেখলাম। কৃতজ্ঞতা যে এত মধুর তা যেন আমি জীবনে এই প্রথমে অনুভব করলাম। যে ভারকে অত গুরুতর মনে করেছিলাম তার গৌরব রইল, ভার যেন আর রইল না।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। মাইনের টাকার বেশির ভাগ আমি মতিবাবুর স্ত্রীর হাতে এনে ধরে দিলাম। তিনি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'সব দিলে তোমার চলবে কী করে। তোমারও তো মেস খরচা আছে।' আমি বললাম, 'সে একরকম চলে যাবে। সে জন্য ভাববেন না।'

তিনি বললেন, 'সে কী হয় বাবা। তুমি আমাদের জন্যে ভাববে, আমাদের জন্যে সব করবে, আর আমরা পোড়া ছাই একটু ভাবতেও পারব না। তুমি এখান থেকেই দুটো ডালভাত খেয়ে যাবে।'

শান্তি বলল, 'খেয়েই দেখুন না, অতুলদা। ক' দিন থেকে আমরা বোনেরাই রান্নার ভার নিয়েছি। আপনার মেসের ঠাকুরের চেয়ে খুব খারাপ হবে না।'

আমি বললাম, 'ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরানীরা চিরকালই ভাল রাঁধে।'

এত তরল স্বরে ওর সঙ্গে কোনদিন কথা বলিনি। এই প্রথম বললাম।

শান্তি হেসে বলল, 'সে কথা স্বীকার করেন তা হলে ?'

শুধু শান্তি নয়, ওদের চার বোনের মুখেই দেখলাম হাসি ফুটেছে। শান্তি, সুধা, তৃপ্তি, দীপ্তি। বয়সে দেড় বছর থেকে দু-বছরের ব্যবধান। গড়নে প্রায় এক। কারিগরের একই ছাঁচে ঢালা মূর্তি। রঙটা ওরই মধ্যে কারও এক পোঁচ বেশি ফর্সা, কারও বা একটু শামলা।

চার মুখে সেই চারটি হাসির রেখা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এতদিন আমি ওদের সান্ত্বনা দিয়েছি, প্রবোধ দিয়েছি, আশ্বাস দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি, আজ দেখলাম সব চেয়ে বড় দান হল আনন্দদান। আমার কথায় যে ওরা হেসেছে এর চেয়ে বড় বিস্ময়কর যেন আর কিছু নেই। আমার একটি মাত্র কথায় যে চারটি হাসির ঝরনা ছুটে বেরোতে পারে তা দেখে সেদিন সত্যিই বড় অবাক লেগেছিল।

প্রথম মাসে আমি শুধু প্রতি রবিবারে আসতাম। ওদের সঙ্গে বসে খেতাম, গল্প করতাম, হাসতাম, হাসাতাম। দ্বিতীয় মাসে ওদের দাবি বাড়ল। তৃতীয় মাসে আমাকে মেস ছেড়ে দিয়ে ওদের দুখানা ঘরের একখানার বাসিন্দা হতে হল। শান্তির মা বললেন, 'তুমি সব দিচ্ছ, ওদেরও কিছু দিতে দাও। ওরা তোমাকে রেঁধে খাওয়াক, সেবা করুক, পরিচর্যা করুক। তাহলে ওদের আর ভিখারির মতো নিতে হবে না। আমিও ভাবতে পারব—আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেই নিচ্ছি। তুমি আর আমাদের পর মনে কোরো না বাবা।'

এদিকে দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট চালাতে গিয়ে আমি গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছি। শুধু মাইনের টাকায় কুলোয় না। ব্যাঙ্কে যে সামান্য কিছু সঞ্চয় আছে তাতেও হাত পড়ে। আমি তাই শান্তিদের কথায় সম্মতি দিলাম।

মির্জাপুরের তিন তলার একখানা ঘরে আমি একা থাকতাম। পুবের দক্ষিণের দুদিকের জানলাই খোলা ছিল। সেই তুলনায় বাদুড়বাগানের এই অপরিসর ছোট্ট ঘর মোটেই বাসযোগ্য নয়। জানলা

একটা আছে, তাও পশ্চিম দিকে। দিনের বেলায় ঘরখানা আধা অন্ধকার হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিনের সেই বাদুড়বাগান আমার কাছে পৃথিবীর সেরা ফুলবাগান হয়ে উঠল। চার বোনে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘরখানা ঝেড়ে-পুঁছে পরিষ্কার করল। তক্তপোষ পাতল। বইয়ের র‍্যাকটি সাজিয়ে দিল। টিপয়ে রাখল একটা ফুলদানি।

সন্ধ্যার সময় সুইচ টিপে আলো জ্বালতে গিয়ে আমি একটা শক খেলাম। বিদ্যুতাঘাত। ছোট তিন বোন তো হেসেই অস্থির।

শান্তি হাসল না। একটু অপ্রতিভভাবে বলল,'আপনাকে বলা হয়নি, সুইচটা খারাপ আছে।'

আমি পরদিনই মিস্ত্রি ডেকে সব ঠিক করে নিলাম। শুধু এ ঘরের নয়, ও ঘরেরও। বাড়িওয়ালার ভরসায় আর রইলাম না।

তারপর দু মাস যেতে না যেতেই কথা উঠল, আমি কে, আমার পরিচয় কী। পরিবারের বন্ধু কথাটা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। আমাদের সমাজ আত্মীয়তার বন্ধন ছাড়া আর কোনও বন্ধন মানে না।

শান্তির মা বলল, 'বাবা, আমাকে সবাই ঠাট্টা করে। দোতলার ওরা তো দিনরাত ওই নিয়েই আছে।'

আমি সব বুঝতে পেরে বললাম, 'তাহলে আমি চলে যাই। মেসের সেই ঘরটা না পেলেও একটা সিট নিশ্চয়ই পাব।'

শান্তির মা বললনে, 'না, তা হয় না। তোমাকে আমরা ছাড়তে পারি না।'

আমি বললাম, 'ভাববেন না। দূরে গেলেও আমি আপনাদের কাছেই থাকব। যেটুকু করছি, সাধ্যমত তা করতে চেষ্টা করব।'

তিনি বললেন, 'তুমি আর কতদিন তা করবে। ভিখারির মতো আমরাই বা সারাজীবন তা কী করে নেব। যাতে অসঙ্কোচে নিতে পারি, যাতে কেউ আর কোনও কথা না বলতে পারে তুমি তার একটা উপায় করে দাও।'

এ উপায়ও আমাকেই করে দিতে হবে। আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু বুকের ভিতরটা অত চুপচাপ ছিল না। তা তোলপাড় করছিল।

আমি ভেবে দেখলাম শান্তির সঙ্গে আমার দূরত্বের ব্যবধান অনেক কমে গেছে, ও আমার বিছানার পাশে এসে বসে, হাসে গল্প করে। র‍্যাকের বাংলা বইগুলি টেনে টেনে নিয়ে পড়ে। আমার র‍্যাকে ওর পড়বার মতো বই বেশি ছিল না। ওর ফরমায়েশ মতো পাড়ার লাইব্রেরি থেকে আমি আপনাদের লেখা সব আধুনিক গল্প আর উপন্যাস জোগাড় করে এনে দিই। কিছু কিছু কিনেও আনি।

মাঝে মাঝে এমন কথা শান্তি বলে লঘুগুরুর ব্যবধান মানলে যা বলা যায় না ; এমন প্রসঙ্গ তোলে যা এতখানি বয়সের ব্যবধানে ওঠবার কথা নয়। এমনভাবে হাসে, এমনভাবে তাকায় যে আমার মনে হয় আপনাদের বর্ণিত পূর্বরাগের লক্ষণগুলির সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যায়। অবশ্য আপনাদের বর্ণনার ওপরই শুধু আমি সেদিন নির্ভর করিনি। আমাদের নিজের যে বোধ-শক্তি আছে সেদিন সেও সেই কথা বলেছিল। সে বোধ ছিল বাসনারঞ্জিত।

তবু আমি বললাম, 'কিন্তু শান্তির মত—।'

শান্তির মা একটু হেসে বললেন, 'তার মত আগেই নিয়েছি। সেজন্য তুমি ভেবো না।'

অফিসে বেরোবার আগে শান্তির ফের দেখা পেলাম। অন্যদিনের মতো সেদিনও পানের খিলিটি হাতে দিতে এসেছে।

আমি তাকে একান্তে পেয়ে বললাম, 'তোমার মার কথা শুনেছ ? তোমার কী মত ?'

শান্তি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল, 'আমি কী জানি ?'

যদিও জানি মেয়েরা এসব কথা স্পষ্ট করে বলে না, ঠিক ওইরকমই ঘুরিয়ে বলে, ফিরিয়ে বলে, হাসিতে বলে, আভাসে বলে, তবু আমি ফেব জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি সব ভেবে দেখেছ ? তোমার মতটা শুনতে চাই।'

শান্তি তেমনি হেসে বলল, 'আমি আবার কী ভাবব। এতক্ষণ মার কাছে থেকে শুনলেন তাতে বুঝি হল না ?"

তাতেই হল। পাঁজিতে শুভদিন দেখে বিয়ে করে ফেললাম শান্তিকে। ঘটাপটা কিছুই করলাম না, ওদের তো এক পয়সাও ব্যয় করবার শক্তি নেই। যা করবার আমাকেই করতে হবে। ওদের আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ ছিল না। তাদের কাউকেও নিমন্ত্রণ করতে দিলেন না আমার শাশুড়ি। তিনি বললেন, 'বিপদের দিনেই যখন কাউকে পেলাম না, এখন আমার কাউকে দরকার নেই।'

আমিও দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া বিশেষ কাউকে বললাম না। তারা শান্তিকে দেখে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'সাবাস। তোমার সবুরে মেওয়া ফলেছে।'

তাড়াহুড়োতে আমি প্রথমে নতুন বাড়ি ঠিক কবতে পাবিনি। বাদুড়বাগানের ওই পুরনো বাসাতেই এক বছর ছিলাম। বাইরের দিক থেকে শান্তিব বিশেষ কিছু বদলাল না। যা বাপের বাড়ি ছিল তা হঠাৎ স্বামীর ঘর হয়ে দাঁড়াল। শান্তির সিঁথিতে সিঁদুর উঠল, হাতে শাঁখা। শাড়িটা দামি হল, বঙটা প্রগাঢ। কিছু গয়নাগাঁটিও ক'রে দিলাম। অবশ্য একেবাবে গা ভরে দিতে পারলাম না। ওর যে আরও তিন বোন আছে। তাদের গা যে একেবারে খালি। ওদেরও দুখানা একখানা করে গড়িয়ে দিলাম। তাতে আমার শাশুড়িরও আপত্তি, শ্যালিকাদেরও। সুধা বলল, বাঃ রে আমাদের কেন দিচ্ছেন। আমাদের তো আর বিয়ে করেননি।'

আমি বললাম, 'ভবিষ্যতে করতেও তো পারি।' তা শুনে ওরা চাবজনেই খুব এক চোট হাসল।

তৃপ্তি বলল, 'যেটিকে বিয়ে করেছেন সেটিকে আগে সামলান। তারপর আমাদের দিকে চোখ দেবেন।'

আমি ওর বেণী ধরে কাছে টেনে এনে বললাম, 'তবে রে দু-নম্বর ফাউ—।'

ওদের প্রত্যেকেরই বাড়ন্ত গড়ন, ফুটন্ত যৌবন। বিয়ে ওদের একজনেরই হয়েছে। কিন্তু হাওয়া লেগেছে সবারই গায়ে, গায়ে হলুদের রঙ বসে গেছে সবাই-এর মনে।

আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা আমি তুলে দিলাম। এব জন্যে বেশি কিছু চেষ্টা করতে হল না। আমাদেব মধ্যে যে দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক ছিল তা আগেই ঘুচে গেছে। শ্রদ্ধার ভয়ের কোনও দুস্তব ব্যবধানই আর নেই। বয়সের বোঝা নামিয়ে দিয়ে আমি ওদের সমস্তরে নেমে এসেছি। বড় সুখের এই অবতরণ।

মাইনের টাকাটা শাশুড়ির হাতে দিতে গেলে শাশুড়িও একটু রসিকতা করে বললেন, 'এখন তো বাড়ির গিন্নি হল শান্তি।'

শান্তি হেসে বলে. 'মা, তুমি যদি অমন কথায় কথায় খোঁচা দাও ভাল হবে না কিন্তু।' বহুদিন পরে সংসারে যেন সুখের বান ডেকেছে।

টাকা শান্তি নিজের কাছে রাখল না, হিসাব নিকাশ, সংসারের আর পাঁচটা ব্যবস্থা বন্দোবস্তের ভারও আমার শাশুড়ির হাতেই রইল। কিন্তু শান্তি মনে মনে জানল, সে-ই কর্ত্রী। তার জন্যেই সব। যে ছিল দাতা শান্তির জন্যেই আজ সে গ্রহীতা বনে গেছে। তার এই মনোভাব গোপন রইল না। চালচলনে ফুটে বেরোতে লাগল। নিজের যৌবন দিয়ে সে যে আর চারটি জীবনকে রক্ষা করেছে এ গর্ব তার যাবে কোথায়।

বাইরের দিক থেকে সংসারের আর কোনও পরিবর্তন হয়নি। শুধু বৃদ্ধ মতিলালের জায়গায়

প্রৌঢ় অতুলচন্দ্র এসে বসেছে। কিন্তু ভিতরের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে প্রায় বৈপ্লবিক বলা চলে।

আমিও বদলাতে লাগলাম। এতদিন সমাজসেবা করেছি, তার সঙ্গে অর্থনীতির বিশেষ যোগ ছিল না। টাকাকড়ি যা হাতে আসত তা দীন দুর্গতদের জন্যে ব্যয় করতাম। স্কুল টিস্কুলও দুএকটা করেছি। কিন্তু এখন সব ছাড়িয়ে একটি পরিবারের জন্যে অর্থচিন্তাই আমার প্রবল হয়ে উঠল। এই পরিবারটিকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা, শ্যালিকাদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা করার জন্যে আমার আগেকার অভিজ্ঞতা বিশেষ কোনও কাজে লাগল না। অফিসে যে মাইনে পাই তাতেও ওইটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আনা সম্ভব নয়। তাতে বাদুড়বাগান থেকে নড়বার কথা ভাবতেও পারি না। অথচ নড়তেই হবে। শুধু শান্তির বোনদের জন্যেই নয়, ভবিষ্যতে ছেলেপুলেও তো হবে, তার জন্য তৈরি হওয়া চাই। বিয়ের পর বয়স আমি পাঁচজনের কাছে কমিয়ে বললেও তা তো আর সত্যি কমছে না। আব যৌবনে ধন উপার্জন করতে না পারলে যে হাল হয় তা তো আমি আমার শ্বশুরকে দেখে বুঝতে পেরেছি।

তাই আমি প্রথম দিকে গোটা দুই পার্ট টাইম কাজ নিলাম। তাতে রাত এগারোটা বারোটা হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে। চার বোনের কেউ ঘুমোয় না, কিন্তু সবাই ঝিমোয়। আমি রাগ করে বলি, 'তোমরা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেই পারো।'

শান্তি বলে, 'বাজে বকো না। তাই কেউ পারে নাকি ?'

'আচ্ছা, দিন নেই, রাত নেই, ভূতের মতো এমন খাটছ কেন বলো তো?'

আমি গলা নামিয়ে বলি, 'একটা পরীর জন্যে।'

আমার সেই নিচু গলার কথাও কী করে সুধাদের কানে যায়। সে ফস করে বলে বসে, 'তাই নাকি, অতুলদা ? মাত্র একটা পরী ? আপনার সঙ্গে তাহলে আমাদের কথা বন্ধ।'

আমি তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে নিয়ে বলি, 'শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু। একটি নয়—চারটি। উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা। আমার চারটি অপ্সরী।'

আমি ওদের তিনজনকে পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দিলাম।

আমার শাশুড়ি বললেন, 'স্কুল টিস্কুল আবার কেন। এখন দেখে শুনে বিয়ে থা দিয়ে দাও। একটি একটি করে পার করো। তোমার ঘাড়ের বোঝা নামুক।'

সুধাকে ডেকে বললাম, 'তোমারও তাই ইচ্ছা নাকি ?'

সুধা হেসে বলল, 'দোষ কী।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'উঁহু, আজকাল শুধু রূপসী হলেই হয় না। বিদুষী না হলে ভাল বর জোটা শক্ত।

আমার ইচ্ছা সত্যিই ওদের তিন বোনকে একটু দেখে শুনে বিয়ে দিই। ওরা পড়তে থাকুক। আর ইতিমধ্যে আমি তৈরি হই। পণ যৌতুকের টাকা জোগাড় করি।

শান্তি বলে, 'নিজের শরীরের দিকে যে একেবারেই তাকাও না।'

আমি জবাব দিই, 'এতদিনে তাকাবার লোক পেয়েছি। নিজের দিকে তাকানো মানে নিজের আয়নার দিকে তাকানো। সে হল নিজের ছায়া। যখন নিজেকে ছেড়ে আর একজনের দিকে তাকাই তখনই ছায়ার বদলে কায়াকে পাই।'

শান্তি অত তত্ত্বকথা শুনতে চায় না। সে বসে বসে আমার পিঠের ঘামাচি মারে, আর দু-একগাছি করে পাকাচুল তোলে।

একদিন বলল, 'আর তোলবার কিছু নেই। তুলতে গেলে কাঁচা ক' গাছিকেই তুলতে হয়। তার চেয়ে কলপ কিনে আনো।'

আমার বুকের মধ্যে কিসের একটা খোঁচা লাগে। একটু বাড়িয়ে বলছে শান্তি। আমার চুলগুলি পাকতে শুরু করলেও অত পাকেনি। অত বুড়ো হইনি আমি।

ওর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণটা আমার অজানা নেই। দোতলার বাড়িওয়ালার মেয়ে মল্লিকা ওর সখী। তার সেদিন বিয়ে হয়ে গেল। বরের বয়স পঁচিশের নীচে। দেখতেও কার্তিকের মতো। গান বাজনাও জানে। কিন্তু কার্তিকের বদলে বুড়ো শিবকে তো শান্তি জেনে শুনেই বরণ করেছে।

আমি চুলের জন্য কলপ কিনলাম না। ভাবলাম পারি যদি কীর্তির কলপ পরব।

তিনটে চাকরি করে আর পারি নে। তাতে খাটুনিই সার। সংসারের হাল যে কিছু ফিরেছে তা নয়। জীবিকা পাল্টাবার জন্যে আমি কিছুদিন আগে থেকেই চেষ্টা করছিলাম। সেই চেষ্টা এবার কাজে লাগল। আমার কয়েকজন জেলখাটা বন্ধু এখানে ওখানে বেগার খাটছিলেন। তাদের নিয়ে তাদের সাহায্যে শহরের বাইরে আমি ছোট একটা এগ্রিকালচারাল ফার্ম দাঁড় করালাম। পোলট্রি, ডেয়ারি আস্তে আস্তে সবই হল। ঘুরে ঘুরে শেয়ারও কম বিক্রি করলাম না। অফিস করলাম শহরেই। আর দোতলার চারখানা ঘর নিয়ে নিজেদের থাকবার ব্যবস্থা করে নিলাম। ঠিক চার বোনের জন্যে চারখানা ঘর দিতে পারলাম না। তবে ওদের শোবার বসবার পড়বার জায়গা আর বেড়াবার জন্যে ছাদের ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে গেল। ডেয়ারি ফার্ম খুলে বন্ধুবান্ধব এবং তাদের পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগ্নেদের দু-চারটে চাকরির ব্যবস্থাও আমরা করতে পারলাম। যারা একেবারে অনাত্মীয়, যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁরাও যে কাজকর্ম না পেলেন তা নয়। অনেক বেকার ছেলের বাপ-মায়ের আশীর্বাদ পেলাম। বহু পরিবার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল, যেমন একটি পবিবার হয়েছিল। কৃতিত্বটা আমার একার নয় তা আমি জানি। আমার বন্ধুদেরও যথেষ্ট অংশ আছে এতে। তবু তাঁরা বলতে লাগলেন, 'তোমার জন্যেই এত বড় কাজটা আমাদের হয়েছে।' নিজেকে কোনদিনই তেমন একটা কাজের লোক মনে করিনি। কিন্তু তাঁরা বললেন, আমি না এগিয়ে এলে নাকি কিছু হত না। আমি জোর করে আমার সেই বন্ধুদেব টেনে না তুললে তাঁরা আমরণ অবসরশয্যাতেই পড়ে থাকতেন। কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ডেয়ারির কাজ ভালই চলতে লাগল। মুনাফাও মন্দ হল না।

গল্পের মতো শোনাচ্ছে, না ? আপনারা গল্পকাররাও সত্য ঘটনাকে ভয় করেন। কারণ সত্য হল গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর। কিন্তু সেই বিস্ময়কে আস্তে আস্তে সইয়ে আনাই তো আপনাদের কাজ। আপনার কাজ আপনিই করবেন। আমাব সে শক্তি নেই, সময়ও নেই।

সবাই বলতে শুরু করল তিন চার বছরের মধ্যে আমি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছি। তা নাকি প্রায়ই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো।

আমি স্ত্রীকে ডেকে হেসে বললাম, 'সে প্রদীপ কোথায় জ্বলছে জানো ?

শান্তি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'হয়েছে।'

ওর মুখে যে জবাবটি প্রত্যাশা করেছিলাম তা পেলাম না। ওর মুখে প্রদীপের যে আলোটি নতুন শিখায় জ্বলে উঠবে ভেবেছিলাম তা জ্বলতে দেখলাম না।

কিন্তু তা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাববার কি হা-হুতাশ করবার আমার সময় ছিল না। তার একটু আগে প্রণব দত্ত অফিসের একটা জরুরি কাজ নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। বড় একটা কনট্রাক্ট হাতে প্রায় এসে পড়েছে। তাতে হাজার খানেক টাকা আসবে। আমি অফিস আর ফার্মের ব্যাপার নিয়েই তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। স্ত্রীকে একটু দেখাতে চাই যে তার খুশি হওয়াটাই আমার একমাত্র কাম্য বস্তু নয়। পুরুষের আরও অনেক কাজ আছে, কীর্তির আলাদা ক্ষেত্র আছে। প্রণব দত্ত অফিসের সেক্রেটারি আর আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি, ইকনমিকসের এম. এ.। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন ছেলে। বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ রাখে। আমি ওকে সুধার জন্য মনোনীত ক'রে রেখেছি। আমার শাশুড়িরও তাই পছন্দ। তাই আমার সামান্য ইশারায় শুধু বাড়ির দোরগুলি নয়, জানলাগুলিও ওর জন্য খুলে গেছে। বাড়ির সব জায়গায় সবাই-এর কাছেই ও অবারিত। ওর ভূমিকাও অনেক। ও তিন

বোনের কলেজের পড়াও দেখিয়ে দেয়। চার বোনেরই চিত্ত বিনোদন করে। কখনও সিনেমায় নিয়ে যায়, কখনও লেকে, কখনও বোটানিক্যাল গার্ডেনে। শ্যালিকারা আর তার দিদি সবাই ওর সান্নিধ্যে সুখী। আমি মাঝে মাঝে যে তাতে একটু চমকে না উঠি, খোঁচা না খাই তা নয়। কিন্তু গৃহলক্ষ্মীকে আমি সব সময় চোখে চোখে রাখব তার সময় কই। এতদিনে বাণিজ্যলক্ষ্মীর সঙ্গেও আমার শুভদৃষ্টি হয়েছে। সে দৃষ্টির মাদকতা তো কম নয়।

সারা দিনরাত আমি ব্যস্ত থাকি। অনেক রাত্রে ফিরে এসে শান্তিকে ঠিক আগের মতো আর পাইনে। কখনও শুনি সে সিনেমা থেকে এখনও ফেরেনি। কখনও শুনি বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছে। তার এত বন্ধু আছে নাকি ? অসম্ভব নয়। অবস্থা ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

যেদিন বাড়িতে থাকে সেদিনও মিলনটা নিষ্কণ্টক হয় না। কথায় কথায় কেন যে খিটিমিটি লেগে যায় বুঝে উঠতে পারিনে। বুঝতে পারিনে কার দোষ বেশি। নানা কারণে আমার মেজাজও ভাল থাকে না। ব্যবসা চালাবার ঝামেলা অনেক। নানা রকম লোককে নিয়ে কারবার।

তাই মাঝে মাঝে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'তোমার কী। তুমি তো সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছ। একখানা হেলিকপ্টার কিনে দিলে উড়েও বেড়াতে পারো।'

শান্তি বলে, 'দেখো, দিতে হয় দাও , না দিতে হয় না দাও। আমি দিনরাত অত খোঁটা আর সইতে পারব না।'

ঝগড়া লাগে। প্রায় প্রতিরাত্রে ঝগড়া লাগে। কারণে অকারণে সামান্য কারণে। খিটিমিটি বাধে। কেন এমন হয় আমি ঠিক বুঝতে পারিনে।

ঝগড়াঝাঁটির পর ও যখন পাশ ফিরে ঘুমোয় আমি ওকে চেয়ে চেয়ে দেখি। আমার শান্তি, আমার সেই শান্তি। ওর জন্যেই তো সব। ওর জন্যেই তো আমার এত বিভব প্রতিপত্তি, আমার এই নবযৌবন লাভ। যে যৌবনকে আমি শুধু ঘরের কাজে লাগাইনি, যে যৌবনকে দিয়ে আমি একটা প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছি, আরও দশজনের অন্নের সংস্থান করেছি। আমার আসল শক্তি যে কোথায়—তা তো আমি জানি, আমার আসল অন্নপূর্ণা যে কে তা তো আমার অজানা নেই,তবু কেন ওকে পাইনে। ওর জন্যে এত পেলাম, কিন্তু ওকে পেলাম না কেন।

একদিন আমি জোর করে ওর ঘুম ভাঙালাম, মান ভাঙালাম। জড়িয়ে ধরলাম বুকের মধ্যে। ও হঠাৎ বলে বসল, 'ছাড়ো ছাড়ো।' আমার এক ডেন্টিস্ট বন্ধুর পরামর্শে সব দাঁত ফেলে দিয়ে দু-পাটি দাঁতই বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম। দামি সেট। আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। শান্তি বলল, 'তাছাড়া তোমার মুখে কিসের একটা গন্ধ। দাঁতগুলি পরে শুলেই পারো !'

বললাম, 'আমি নতুন করে নেশাভাঙও করি নে, কিছুই করি নে। যা ছিলাম তাই আছি। যখন খেতে পেতে না তখন কিন্তু আর গন্ধটন্ধ কিছু ছিল না।'

শান্তি বলল, 'ফের সেই খোঁটা ?'

আমি বললাম, 'কেনই বা নয় ? তুমি কি ভাবো আমি কিছু বুঝতে পারি নে ? আমি কিছুই টের পাই নে ? আমার গায়ের বাতাসটুকু পর্যন্ত তোমার আর এখন পছন্দ হয় না। এমন অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম আমি আর দুটি দেখিনি। একবার ভেবে দেখো তখন যদি না দেখতাম, কোথায় ভেসে যেতে।'

শান্তি বলল, 'সেই ভেসে যাওয়াই ভাল ছিল। এর চেয়ে মরণ ভাল আমার।'

এমনি চলল রাতের পর রাত।

মাঝে মাঝে থামে। তখন একেবারে কথা বন্ধ।

কিন্তু সেই অসহযোগও তো আমার কাম্য নয়।

কী যে আমি ওর কাছে চাই, আর কী যে পাই নে তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। সব সময়েই যে ঝগড়াঝাঁটি চলে তা নয়। শান্তি কোনও কোনদিন আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। হাসেও, কথাও বলে। কিন্তু আমার যেন মনে হয় আগে যা ছিল, আসলে এখন তার অভিনয় চলে। বাইরের দিক থেকে সম্পর্কটা ঠিকই আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আবার যে পরিবর্তনটা ঘটেছে তার নামও বিপ্লব।

তারপর যা ঘটবার তা ঘটল। শান্তি মৃত্যু কামনা করলেও মরল না। মৃত্যুর ওপর দিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল প্রণবকে।

এই আশ্চর্য কাণ্ড কী করে ঘটল আমি তার বিস্তৃত বিবরণ দেব না। সেটা আমর পক্ষে রুচিকরও নয়, সুখকরও নয়। ওসব ব্যাপার আপনি নিজেই অনুমান করে নিতে পারেন। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে ফাঁকে ফাঁকে তিনটি নরনারীর মনোবিশ্লেষণ দিয়ে আপনি শ'দেড়েক দুই পাতা দিব্যি পাববেন ভরে ফেলতে। বউ-পালানোর গল্প তো আপনি আর কম লেখেননি। পড়েছেন আরও বেশি। দেশে বিদেশে ও কাহিনীর তো আর অভাব নেই। কিন্তু দেখেছেন কখনও ? আমিও পড়েছি, শুনেছি কিন্তু দেখিনি। স্ত্রী কারও সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পর স্বামীর দশা যে কী রকম হয় কোনদিন তা চাক্ষুষ দেখা ছিল না। এবার দেখলাম।

স্বামী পালিয়ে গেলে কি সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তার স্ত্রীর ওপর সহানুভূতি দেখাবার লোক পাওয়া যায়। কিন্তু পলাতকার স্বামীকেও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। বন্ধুদের কাছ থেকে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে নিজের অধস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকেও পালাতে হয়। তার আর মুখ দেখাবার জো থাকে না। কারও সহানুভূতি পর্যন্ত অসহ্য হয়। কারণ বন্ধুদের সমবেদনার তলায় যে চাপা বিদ্রুপ আর পরিহাস লুকিয়ে আছে তা কি আর তার টের পেতে বাকি থাকে ? কুলের কালি দেখা যায় না, কিন্তু স্বামীর মুখের কালি সকলের চোখে পড়ে।

প্রথমে ভাবলাম সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই। না দাদা বউদির কাছে নয়, এ মুখ নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াতে পারব না। অন্য কোথাও গিয়ে কিছুদিন পালিয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু বেরোবার জো রইল না।

আমার শাশুড়ি এসে আমার সামনে কেঁদে পড়লেন, 'বাবা, তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না।' তাঁর সেই কান্নায় গলবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়, তবু বিরক্তি চেপে শান্তভাবেই বললাম, 'আমি তো আর একেবারে চলে যাচ্ছি নে।'

তিনি বললেন, 'না, এখন তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। এই অবস্থায় আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। যে মুখপুড়ি গেছে সে তার কপাল নিয়ে গেছে। তার সব পুড়ুক, সব ছারখার হয়ে যাক। তার কুষ্ঠ হোক, মহারোগ হোক তার। কিন্তু তোমার মনের যা গতিক তাতে তোমাকে তো ছাড়তে পারি না। তোমার জীবনের যে অনেক দাম।'

তাঁর চোখের জল আমার কাছে নির্মল বলে মনে হল। মাতৃস্নেহের স্বাদ পেলাম তাঁর কথায়, ব্যবহারে। সেই মুহূর্তে ওইটুকু আশ্রয়ই বা আমার আর কোথায় জুটত ?

শুধু তিনিই নন, সুধারা তিন বোনে এসে আমাকে ঘিরে ধরল।

সুধা বলল, 'অতুলদা, আপনি যেতে পারবেন না। একজনের অকৃতজ্ঞতা, একজনের পাপের শাস্তি আপনি আমাদের সবাই-এর ওপর চাপিয়ে দেবেন কেন ?

ওরা তিনজন এখন কলেজের ছাত্রী। এখনও ওদের কারও রোজগারের ক্ষমতা হয়নি। ওরা আমাকে শুধু সেই ভয়েই ধরে রাখতে চায় ? সেই অনাহারের ভয়ে ?

কিন্তু ওদের দিদির কাছ থেকে অত বড় ঘা খেয়েও আমি ওদের অতখানি অবিশ্বাস করতে পারলাম না। আর তা না করে তৃপ্তিই পেলাম। সত্যিই তো এতদিন ধরে ওদের কাছ থেকেও তো কম

শ্রদ্ধা প্রীতি পাইনি, কম সেবাশুশ্রূষা নিইনি।

আমি কোথাও গেলাম না। শুধু অফিস আর বাড়ি আলাদা করে দিলাম। নতুন একটা ফ্ল্যাটে এনে তুললাম ওদের।

অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর মা আর বোনেরা আমার অন্নাশ্রিত হয়ে রইল। আমি থাকতে চাইলাম তাদের হৃদয়ের আশ্রয়ে।

আশ্চর্য, শান্তির মুখের আদল ওদের সব কটির মুখে। একই রকমের গলা, একই রকমের উচ্চারণের ভঙ্গি। হাঁটা চলার ধরনও একই রকম। সেই একজনের প্রতিচ্ছায়া আমি ওদের প্রত্যেকের মধ্যে দেখতে পেলাম, যে আমাকে সব দিয়েছিল, আবার সবই কেড়ে নিয়েছে।

বন্ধুবান্ধব কেউ এসে শান্তির কথা জিজ্ঞাসা করলে তার মা আর বোনেরা সবাই বলে দেয় সে মরে গেছে। হঠাৎ হার্টফেল করে মরে গেছে। হৃদয়ের পরীক্ষায় সে ফেল করেছে না পাশ, করেছে কে জানে ? বোধ হয় পাশই করেছে। ফেল করবার দুর্ভাগ্য একা আমার।

ওরা বলে সে মরে গেছে। কিন্তু স্মৃতি কি এত সহজে মরে ? জ্বালা কি অত অল্পে জুড়োয় ?

আমার দগ্ধ ঘায়ে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে ওদের কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি নেই।

ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান আছে, তালপাখার হাওয়ার আর দরকার হয় না। রাঁধুনী আছে, হাত পুড়িয়ে কাউকে রাঁধতে হয় না। কিন্তু খাওয়ার কাছে আমার শাশুড়ি এসে রোজ বসেন। শ্যালিকারা আমার ঘর আর টেবিল গুছিয়ে দেয়, ফুলদানি ফুলে ভরে রাখে। সন্ধ্যায় ফিরে এলে কাছে বসে গল্প করে।

সবাই আছে শুধু একজন নেই। সে মরে যায়নি, সরে গেছে।

দিদির নাম ওরা কেউ মুখে আনে না। সুধার রাগ সবচেয়ে বেশি। কারণ শান্তি তো শুধু আমাকে ঠকিয়ে যায়নি, ওকেও বঞ্চিত করে গেছে।

বছর ঘুরে এল। আমার শাশুড়ি সেদিন রাত্রে আমার ঘরে এসে বসলেন। আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কারবারের কথা জানতে চাইলেন। আরও কিছুক্ষণ ভূমিকার পর বললেন, 'ওদেব তো একটি একটি করে এবার পার করা দরকার।'

আমি বললাম, 'আমারও তাই ইচ্ছা। সুধা বলে এম. এ. পাশ না করে ও বিয়ে করবে না। বোনদের কাছে বলেছে কোনদিনই করবে না। চিরকুমারী থেকে দিদির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি আর দীপ্তিও নাকি সেই পণ করেছে। যত সব ছেলেমানুষি।'

শাশুড়ি বললেন, 'ছেলেমানুষি ছাড়া কী। কিন্তু এরই মধ্যে অনেকে অনেক কথা বলতে শুরু করেছে। এভাবে থাকলে ওদের তিনজনের নামেই বদনাম রটবে। কারোরই বিয়ে হবে না। তার চেয়ে তুমি বরং সুধাকে— ।'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'ছিঃ কী বলছেন আপনি।' শাশুড়ি তখনকার মতো চুপ করে গেলেন।

শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে আমি নিজের মনেই হাসলাম। মৃতা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। কিন্তু যে স্ত্রী ঘর ছেড়ে গেছে তার বোনকে নিয়ে ফের ঘর বাঁধবার সাধ থাকলেও সাহস আছে কার ? একই দুর্বার রক্তের ধারা তো তারও শিরায়।

পরদিন সুধা কলেজে বেরোচ্ছিল, আমি ওকে ডেকে হেসে বললাম 'আর শুনেছ নাকি তোমাব মায়ের কথা ? তিনি তোমাকে তোমার দিদির আসন পাকাপাকিভাবে দখল করতে বলেছেন। তার আর ফিরে আসার লক্ষণ নেই।'

আমি কথাটা হেসেই বলেছিলাম। স্ত্রীর বোনের সঙ্গে এসব রসিকতা কে না করে ? আগেও তো কত করেছি। সুধা কিন্তু হাসল না। সে যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। মুখখানা একেবারে শ্বেত পাথরের মূর্তির মুখ।

সুধা বলল, 'আপনি তাও পারেন।'

তারপর মুখ ফিরিয়ে জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল।

কেন জানি না, আমার হাত দুটি আপনিই মুষ্টিবদ্ধ হল। বাঁধানো দুপাটি দাঁত আক্রমণ করল পবস্পরকে। আমি নিজের মনেই বললাম, 'পারি বৈকি, আমি সব পারি। অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে, ইচ্ছা করলে আমি না পারি কী ? যে ঘা আমি খেয়েছি তার চতুর্গুণ কি আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না?'

কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই আমার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। ধিক্কার দিলাম নিজেকেই, ছি ছি ছি। গাড়িতে করে ডেয়ারির কাজ দেখতে চলে গেলাম।

ফিরে এলাম অনেক রাত্রে। দেখি সুধা তখনও জেগে আছে। আমার জন্যেই নাকি জেগে আছে। আমাব সঙ্গে গোপন কথা বলবে বলে।

সেই রাত্রে আমার ঘরে একা চলে এল সুধা। গম্ভীর। শান্ত মুখ।

মৃদুস্বরে বলল, 'অতুলদা, আপনি কি রাগ করেছেন ?'

আমি বললাম, 'না রাগ করব কেন।'

সুধা বলল, 'আমি বড়ই দুর্ব্যবহার করেছি।' 'দিদি যা করে গেছে সে অন্যায় তো কিছুতেই মুছবে না। এরপর আমরাও যদি—। ছি ছি ছি। আমাকে মাপ করুন, অতুলদা।'

সুধা আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল।

আমি বললাম, 'মাপ করবার কী আছে। তুমি তো কোনও দোষ করোনি, শুধু বুঝতে ভুল করেছ। আমি তোমাকে ঠাট্টা করেছিলাম, সুধা। সেটুকু করবার অধিকারও কি আমাব নেই ?'

বলে আমি ওর হাত তুলে ধরতে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাতখানাকে সরিয়ে নিল। যে সুধাকে আমি বেণী ধরে টেনেছি, গাল টিপে দিয়েছি, আজ সে আমার সামান্য স্নেহস্পর্শটুকু সহ্য কবতে পারে না, আমি আজ এতই অস্পৃশ্য। এত বড় স্পর্ধা, এত দুঃসাহস ওব । আমি যদি ওকে এই মুহূর্তে বুকে তুলে নিই, ও কী করতে পারে।

কিন্তু আমি কিছুই করলাম না। শুধু এক মুহূর্ত সময় নিয়ে বললাম, 'আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কবছিলাম।'

সুধা বলল, 'কিন্তু মা যা বলেছেন, তাই হয়তো ঠিক। আপনি যদি তাই চান, আমার—আমার কোনও আপত্তি নেই।'

বলে মুখ নিচু করল সুধা। জানি না হাসল কি না।

আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'আমি কাউকে চাই না, তোমাদের কাউকে চাই না। চলে যাও এ ঘর থেকে।'

সুইচ অফ করে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। সুধার ব্যবহারের কথা ভেবে নিজের মনেই হাসলাম। আমাকে কী ভেবেছে ওরা ?

আমি কি বকরাক্ষস যে ওরা একটির পর একটি পালা করে আত্মদান করবে ? একবার তো এক ভীমের হাতে হত হয়েছি, আর কতবার নিহত হব ?

তারপর দিন আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমাদের চালচলন কথাবার্তা শান্ত সংযত ঠিক আগের মতো।

ইতিমধ্যে আমি আরও কয়েকবার চলে যেতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'তোমরা তো আর নাবালিকা নও। নিজেরাই বেশ থাকতে পারবে। আমি আলাদা জায়গায় গিয়ে থাকি। খরচপত্রের জন্যে ভেবো না। তা যেমন আসছে তেমনি আসবে।'

সুধা বলল 'অতুলদা, আপনি একথা মুখে আনছেন কী করে ? আপনার চেয়ে আপনার টাকাটাই কি বড় ? আপনি নিশ্চয়ই সেদিনের রাগ ভুলতে পারেননি।'

ওর চোখ দুটি ছলছল করে উঠেছিল।

ও-চোখ আমি আগেও দেখেছি। সেই জল। তারপর প্রচণ্ড জ্বালা।

সুধা এম. এ. পাশ করেছে। কিন্তু বিয়ে করেনি।

তৃপ্তি দীপ্তিও ইউনিভার্সিটিতে ঢুকল। সব খরচ আমিই চালাচ্ছি। তার বদলে ওদের সেবাশুশ্রূষা আর কৃতজ্ঞতাও পাচ্ছি।

সুধার মা তাঁর সেই প্রস্তাব তুলে নেননি। সুধাও আরও দু-একবার বলেছে তার কোনও আপত্তি নেই।

আমি যদি চাই তা হলে পাই।

কিন্তু সে পাওয়ার মানে যে কী তা কি আমি আর জানি নে ? আমি আর চাইব কোন ভরসায় ?

মুখেও বলি, নিজের মনেও বলি, চাই নে চাই নে চাই নে। এই জীবনের কাছ থেকে আমি আর কিছু চাই নে। আমার চাইতে নেই।

আমি দিনরাত কাজকর্মে ডুবে থাকি। বিশেষ করে শহরের বাইরেই আমার বেশি সময় কাটে। আমি সেখানেই শান্তি পাই। সেই কাঁচা ঘাস, সাদা দুধ আর সবুজ গাছপালার রাজ্যে আমি মাঝে মাঝে দু চোখ মেলে দিয়ে বসে থাকি।

কিন্তু সেই চোখই যদি একমাত্র চোখ হত, তাহলে আর কোনও দুঃখ ছিল না।

ওরা তিনজন সুধা তৃপ্তি দীপ্তিরাও কেউ থেমে নেই। তিন সমান্তরাল রেখায় তিনটি জীবনধারা ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে আমি সেদিকেও তাকাই। একজনের চলে যাওয়ার লজ্জাকে ওরা ভুলেছে, দুঃখকে মনে করে রাখেনি। নিজেদের কৃতিত্ব দিয়ে গৌরব আর গর্ব দিয়ে ওরাও যার যার নিজের স্বতন্ত্র পৃথিবীকে গড়ে নিচ্ছে। দিনের পর দিন ওদের গুণগ্রাহী বন্ধুদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আমি এক একদিন চেয়ে চেয়ে দেখি। তারা আসে, যায়, হাসে, ঠাট্টা-তামাসা করে। কিন্তু আমি হঠাৎ ওদের মধ্যে গিয়ে পড়লেই ওরা যেন কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সুর কেটে যায়, তাল ভঙ্গ হয়। আমি কি এতই অপয়া। আমাকে দেখলেই কি ওদের সব কথা মনে পড়ে ? সব ব্যথা নতুন হয় ?

বন্ধুদের ফেলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে।

সুধা বলে, 'অতুলদা, আপনি কদিন ধরে বড় কাশছেন। একটা ওষুধ-টষুধ খান।'

আমি বলি, 'ভয় পেয়ো না। সামান্য কাশি। টি বি. নয়।' সঙ্গে সঙ্গে সুধার হাসিমুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

আমি নিজেও বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

তৃপ্তি বলে, 'আপনার খাবারটা এখন এনে দিই, অতুলদা।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, 'না, না, এখন থাক।'

দীপ্তি বলে, 'অন্তত এক কাপ দুধ খেয়ে যান।'

আমি বলি, 'তোমরা খাও। গোয়ালা কি আর দুধ খায় ?'

ওরা স্তব্ধ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তিনটি তরুণীর মূর্তি। শ্বেত পাথর দিয়ে গড়া। তিনটি চঞ্চল ঝরনা হঠাৎ যেন এক প্রচণ্ড শাপে বরফের স্তূপ হয়ে গেছে।

আমি তো তা চাইনি।

আমি চাই নে ওরা আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পাক, আমি চাই নে আমার মুখের কথায় ওদের মুখের হাসি শুকিয়ে যাক।

আমি ওদের কাছে দুর্ভাগ্য আর দুঃস্বপ্নের প্রতীক হয়ে থাকতে চাই নে।

তবু ওরা আমার চোখে কী দেখে ওরাই জানে।

শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৬৫

চিমনির ধোঁয়া

নবেন্দু ঘোষ

হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে এল।

রোজকার মতো বুড়ি-ঝি ঋন্টুর মা সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত কাজ করে আজও তার ছেলের বাড়িতে গেছে। আবার আসবে সেই বিকেল পাঁচটায়। এই সময়টাই সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে মাধুরীর। বড় একা একা লাগে। আজও লাগছিল। তেতলায় দু'টো কামরা আর একটা রান্নাঘরের ফ্ল্যাট তাদেব, তাব মধ্যে বারবাব এঘব ওঘর ছুটোছুটি কবছিল সে। ভাবল হয়তো খিদে পেয়েছে, একটা কিছু খেলে হত। কিন্তু শেলফ্ খুলে একটা নোন্‌তা বিস্কুট মুখে দিয়েই মনে হল যে নোন্‌তা নয়, মিষ্টি কিছু খেলে হত। রসোগোল্লা বাখা ছিল, তার থেকে একটা মুখে দিয়েই কিন্তু আবাব মনে হল যে, তার আসলে খিদে পাযনি। আসলে তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে। দিল্লি কিংবা বোম্বাই, কাশী কিংবা বৃন্দাবন এমন কোথাও নয়—যেতে ইচ্ছে করছে তাদেব গাঁয়ে, পলাশপুরে, ইছামতীর ধারে। সেখানে হযতো বাব্‌লা গাছে হলদে রংয়েব ফুল ফুটে আছে এখন, সেই কতকালের পুরনো মোটা শিমুলগাছটার গায়ে জড়ানো গুলঞ্চলতাব ওপর বিকেলের পড়ন্ত রোদের সোনামাখানো ছোঁয়াচ। নদীর ওপারে যে মাঠটা, সেই মাঠের শেষে নীল আকাশটা যেন অনেক দুবেব একটা রহস্যলোকের খবর বলাব জন্য ঝুঁকে পড়েছে—আব সে যেন—। সে এখন উত্তর কলকাতায়, মাধব কুণ্ডু রোডের তেতলা এক বাড়িব নয় নম্বর ফ্ল্যাটে। একা।

এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাধুরী তাকাল চারিদিকে। শুধু বাড়ি আর বাড়িব ছাদ। শুধু লোহা আর ইটেব ইমারত। শোবার ঘর থেকে আকাশ দেখা যায় একটুখানি, কিন্তু সেই আকাশ জুড়ে আছে ভাবত স্টিল ফ্যাক্টরির মস্ত চিম্‌নিটা। দিনরাত সেই চিম্‌নি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। মাধুবীর ভাগের এই আকাশটুকু কোনও সময়ই পরিষ্কার থাকে না। ওই চিম্‌নির ধোঁয়ায় তা সব সময়েই মলিন। বড় একঘেয়ে লাগে এক সময়ে। ঘরের জানলা দিয়ে বাস্তা দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে সব সময়েই রিক্সা আর মোটরগাড়ি যাচ্ছে, নানারকমের শব্দ আসছে চাবদিক থেকে, আসছে এবাড়ি-ওবাড়ির মানুষদের গলার আওয়াজ, কাকের ডাক-সবই কেমন যেন রুক্ষ, কর্কশ, ছন্দহীন—বাবাঃ—হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে এল।

বাইবের দবজায় তালা লাগিয়ে ছাদে পালাল মাধুরী। তবু ভাল এখানটা। আকাশটা আকাশের মতোই বড় মনে হয়। দূরে অন্যান্য বাড়ির ছাদে মেয়েদের, ছেলেদের দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে সব দিকে তাকাতে রুচি হল না তার। রেলিং-এর এক কোণে বসে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে এক বছর ধরে ফেলে আসা পলাশপুরের আকাশকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় ? কলকাতার এই আকাশ মোটেই তেমন নীল নয়, তেমন উদার নয়। এখানকার মেঘও তেমন কাশফুলের মতো সাদা নয়। এক বছর ধরে সেই আকাশ সে অনেক দূরে ফেলে এসেছে।

এক বছর আগে বিয়ে হয়েছে মাধুরীর। বিধবা মায়ের চোখের বালি ছিল সে। কুড়িতে পা দিয়েছিল সে। তখন মা তাকে দেখত আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত। মাধুরী বুঝত মায়ের মনের দুঃখটুকু, সে চাইতও যে চটপট হয়ে যাক তার বিয়েটা, মা'র নিঃশ্বাস সহজ হোক। আর কোন মেয়েই বা বিয়ে না চায়। বিয়ের কথা বলাবলি করে সে তার সইদের সঙ্গে কত হাসাহাসিই না করেছে। কত রোমাঞ্চকর মধুর ছবিই না তৈরি করেছে মনে মনে। সেই বিয়েই হঠাৎ হয়ে গেল তার—এই এক বছর আগে। সই নন্দিতার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সে বরযাত্রীদের একজনের নজরে পড়ল। লোকটির বয়স প্রায় চল্লিশ, একটু রোগা লম্বাটে চেহারা, গায়ের রং বেশ ফর্সা, গলায় একটা সরু

সোনার চেন আর নাকটা বেশ টিকোলো। সব মিলিয়ে ভাল না বললেও মন্দ বলা যায় না এমনি চেহারা লোকটির।'কলকাতায় ব্যবসা করে, মা-বাপ ভাইবোন ওসব ঝামেলাই নেই। মাসে অন্তত পাঁচশো টাকা রোজগার। মা শুনে প্রথমটায় রাজি হতে পারছিল না। লোকটির বয়স একটু বেশি। কিন্তু আত্মীয়বন্ধুদের যুক্তিতর্কে শেষ পর্যন্ত মা মত দিতে বাধ্য হল। সব মিলিয়ে একমাসের মধ্যেই কথা পাকা হয়ে প্রায় বিনা পণেই বিয়েও হয়ে গেল। মাধব কুণ্ডু রোডের এই তেতলা বাড়ির নয় নম্বর ফ্ল্যাটে সে সেই লোকটির পিছু পিছু এসে ঢুকল। লোকটির নাম সদানন্দ মুখুজ্জে। নামটা বাইরের দরজায় ছোট্ট একটা পেতলের প্লেটে ইংরিজিতে লেখাও ছিল। দেখে মাধুরীর মনে বেশ সম্ভ্রম জেগেছিল স্বামী সম্পর্কে। কিন্তু পলাশপুরের বনফুল-ঝোলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের আড়ালে বসে, ঘুঘু ডাকা উদাস-মধ্যাহ্নে আরতি আর নন্দিতার সঙ্গে ফিস্‌ফিস করে বিবাহিত জীবনের যে রোমাঞ্চকর ও তীব্রমধুর দৃশ্যগুলো সে কল্পনা করেছিল তা তার জীবনে দেখা দিল না তো ! সবাই বলেছিল যে সেরা শহর কলকাতায় খুব মজা, কিন্তু কী আশ্চর্য, মাধুরীর কিন্তু দুদিন বাদেই কান্না পেতে লাগল। এই অপরিচিত ইটের অরণ্যে, এই লক্ষ লক্ষ লোকের বেসুরো কোলাহলে সে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল, একা একা বোধ করতে লাগল। সদানন্দ মুখুজ্জ্যের বাড়ি বর্ধমান জেলার নবীপুর নামে একটি অজ পাড়াগাঁয়ে। সেখানে মাধুরী এখনও যায়নি। সদানন্দের পৈত্রিক ভিটেতে কোনমতে বাতি জ্বালাত তার এক বিধবা পিসি। আপন নয়, সদানন্দের বাবা'র মামাতো বোন। বিয়ের পর কলকাতায় এসে সেই বুড়িপিসিকে এ বাড়িতে দেখেছিল মাধুরী। বুড়ি কানে কম শুনত, একটু খিটখিটেও ছিল। তবু সে মাধুরীকে কাজ করতে দিত না। তবু তারই সঙ্গে একটু গেঁয়ো কথা বলে সময়টা কাটিয়ে দিত মাধুরী। নবীপুরে কি কোনও নদী আছে, হ্যাঁ পিসিমা ? নেই ? কোনও বিল ? আচ্ছা মাঠ নেই ? আমাদের ডাকাতে মাঠের মত ধু-ধু মাঠ ? রথের মেলা কোন জায়গাতে বসে ? আর গাজনের মেলা, হ্যাঁ পিসিমা ?

পিসি হাসত, আবার বিরক্তির সুরেই বলত, "তুমি তো গাঁয়ের মেয়ে বাপু, গাঁয়ে কি সুখ জানো না ? তোমার ভাগ্যি ভাল যে, আমার সদানন্দের হাতে পড়ে কলকাতায় এসে থাকতে পারছ। গাঁয়ে আছে কী বউমা, যে ওসব শুধোচ্ছ ? শোনো বাছা, তোমায় একটা কথা বলি। আমার সদানন্দ বড় শৌখিন মানুষ, তুমি তোমার গেঁয়ো ভাবটি কমাও, বুঝেচ ?"

মাধুরী কিন্তু বুঝত না। সদানন্দও এ নিয়ে মাঝে মাঝে বকেছে তাকে। তার বন্ধুরা দু'একবার নেমন্তন্ন খেতে এসেছিল বিয়ের পর। তাদের সামনে সে ঘোমটা টেনে যেত। স্বামীর বন্ধুরা হাসাহাসি করেছিল। সদানন্দ বকেছিল তাকে, "ঘোমটা নিশ্চয় টানবে, কিন্তু অতটা কেন ? একটু স্মার্ট হও, বুঝলে ? খালি ওদের সামনে বেশিক্ষণ থেকো না—ব্যস"—। মাধুরী চেষ্টা করত কিন্তু পুরোপুরি পারত না। শহরের লোকদের চাউনি কেমন যেন। বড় ধারালো। পলাশপুরের মানুষদের মতো সোজা তাকায় না এরা, এরা তাকায় বাঁকা চোখে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে দেখতে ওরা যেন তার সারা শরীরটার জরিপ করতে থাকে।

সেই পিসি দু'মাস বাদেই নবীপুর ফিরে গেছে। ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। বুড়ির বড় শখ কলকাতায় থাকার, কিন্তু সদানন্দ শোনেনি। আড়ালে মাধুরীর কাছে বলেছে, "ওসব ঝামেলা দূরে থাকাই ভাল—আরও দূরে, আমি তোমায় ভালবাসি দেখলে বুড়ির কাছে ন্যাকামি বলে মনে হবে—তাছাড়া এখানে খরচ বেশি বাপু। আর দেশের দশ বিঘে জমির দেখাশোনাও তো দরকার।" অগত্যা পিসি গেছে। এই এক মাস ধরে পিসির দুটো চিঠি এসেছে পর পর—পিসির নাকি বউমাকে দেখার জন্য মন পুড়ছে। সদানন্দ খেঁকিয়ে উঠেছে চিঠি পড়ে, "আরে ধ্যেৎ—এ বুড়ি তো ভারী জ্বালালে মাইরি।" না, সদানন্দ তার পিসিকে নবীপুর ছাড়া আর কোথাও মরতে দেবে না।

পিসি যাবার পর থেকেই একা একা ভাবটা বেড়ে গেছে। এ বাড়িতে বারোটা ফ্ল্যাট—কিন্তু

থাকে আঠারো জন ভাড়াটে। তাদের বাড়ির মেয়েদের সংখ্যা কম নয়। নিবারণ গুপ্তের বৌ প্রভাদির ফ্ল্যাটে কিংবা সত্যপ্রকাশবাবুর ললিতাদিদের ওখানে দিব্যি আড্ডা জমে। তাকে তখন থেকেই সবাই ডাকা-ডাকি করে। যায়ও সে মাঝে মাঝে কিন্তু তার বেশিক্ষণ ভাল লাগে না ওদের কথাবার্তা। একটু বাদেই আবার সে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে ছটফট করে আর ঝন্টুর মা না-আসা পর্যন্ত পলাশপুরের কথা ভাবে। তরপর ঝি এলেই আবার সে রান্নাঘরে গিয়ে ব্যস্ত হয়। চা করে নিজে খায়, ঝন্টুর মাকেও এক কাপ দিয়ে গল্প করে। হ্যাঁ ঝন্টুর মা, তোমাদের গাঁয়ে ক'ঘর বাসিন্দে ? হিন্দু বেশি না মুসলমান ? বামুন বেশি না শুদ্দুর ? সেখানে গাছপালা কী কী আছে সেদিন বলেছিলে ? আচ্ছা তোমাদের গাঁয়ে নাটা-কাঁটা আছে ? বেতঝোপ আছে ? ময়না-কাঁটা ? বাঁশ ঝোপের ছায়া তোমার কেমন লাগত বলো তো-হ্যাঁগা বাছা ? গাঁয়ের জন্য তোমার মন পোড়ে না ?

মাস দুই আগে মা এসে দু'দিন ছিলেন কলকাতায়। কিন্তু তাদের বাড়িতে খেলেন না। নাতি না হওয়া পর্যন্ত তাদের অন্ন খাবেন না। সদানন্দ শুনে আড়ালে হেসে বলেছিল, "সে গুড়ে বালি, বুয়েচ—জমানা বদলে গেছে বাবা—তোমার মায়ের জন্য আমার দুঃখ হচ্চে কিন্তু।" দু'দিন থেকেই মা অনাদি-কাকাব সঙ্গে গযাতে তীর্থ করতে চলে যান। তাবপব আবাব যে কে সেই। একা, বড় একা।

ঝন্টুর মা বিকেলে চা খেয়েই বাসনেব পাঁজা নিয়ে বসে, আর মাধুরী বসে রান্না নিয়ে। কিন্তু দুজনের রান্নায় কত সময়ই বা লাগে ? সাতটাতেই সব সাবা হয়ে যায়। মাধুরী খবরের কাগজ নয়তো লাইব্রেরি থেকে সপ্তাহে একবার করে আনা উপন্যাস দুটোর একটা নিয়ে বসে। পড়তে খুব ভাল লাগত না আগে, তবু পড়ে আজকাল। সময় কাটাতে হবে তো ! সে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে, সুতবাং নিজেকে একেবারে বোকা মনে করে না। পড়তে পড়তে হাই তোলে সে, আর ঘড়ির দিকে তাকায়। সদানন্দ ফিরতে বড় দেরি করে। ঝন্টুর মা'র আটটায় যাবার কথা। সে সাতটার পর থেকেই উসখুস করে এবং সাড়ে সাতটা হবার আগেই নিজের ভাত নিয়ে চলে যায়। দরজা বন্ধ করে একেবারে একা হয়ে বই মুড়ে রেখে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসে মাধুবী। ভাবে। ঠিক এই সময়ে পলাশপুরের ঝিঁ ঝিঁ ডাকা অন্ধকারে হয়তো যুঁই আর ভাঁটফুলের সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে—হয়তো দত্তদের দেবদারু গাছটার আড়ালে এখন একটি বড় তারা কাঁপছে আর কাঁপছে. . । ভাবে আর মনে মনে রাগ করে মাধুরী। কেমনধারা লোক বাপু ! কী এমন কাজ যে, ফিরতে প্রায়ই রাত হয় ? তার স্বামী নাকি জমির দালালি করে, শেয়ার মার্কেটেও ঘোরাঘুরি করে, আরও কত কী যে করে তা মাধুরী ভাল বোঝে না। শুধু এটুকু বোঝে যে, টাকার দরকার ; কারণ মাঝে মঝে তাকে জড়িয়ে ধরে সদানন্দ বলে, "তোমায় ভাল করে সাজাতে হবে মাধুরী—পা থেকে মাথা পর্যন্ত গয়নায় মুড়ে দেব তোমায়, দেখো না ! টাকা বুঝলে, মাধুরানী, টাকাই সব এ দুনিয়ায়।" তার স্বামী লোক মন্দ নয়, একটু বয়স বেশি, একটু বাতিক-গ্রস্ত মানুষ অনেকটা তার হরু কাকার মতো। লোকটাকে পুরো বোঝে না মাধুরী, তবু মন্দ লাগে না। শুধু এই দেরি করে ফেরাটা পছন্দ নয়—বড় একা একা লাগে তার। এক একদিন মনে হয় যে, সে চেঁচাবে—ওগো এসো, এসো ! এই স্বামী-স্ত্রীর খেলাটা মন্দ নয়, একা-একা ভাবটা কমে তাতে। শরীরের মধ্যে কোথাও একটা দাহ আছে তা যেন খানিক শান্ত হয় এই খেলায়। কিন্তু তবু আসে না সদানন্দ। রাগ করে নিজে খেয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে মাধুবী। তারপর এক সময়ে কড়া নড়ে। তখন রাত কত সে খেয়াল আর থাকে না তার, ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দেয় সে। ঝিমোতে ঝিমোতে সে আসন পাতে, স্বামীকে খেতে দেয়, তারপর বসে বসেই আবার ঢুলে পড়ে ! তারপর সে স্বপ্ন দেখে যে, কে যেন তাকে দৃঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। ঘুমে জড়ানো চোখ মেলে সে দেখে যে, সে বিছানায় আর সদানন্দ তাকে আদর করছে। তাকে তাকাতে দেখে সদানন্দ হ্যা হ্যা করে হাসে আর বলে "অবাক হলে ? তোমায় তুলে এনেছি ওঘর

থেকে—ইস্ কী ঘুম বাবা ! কি গো, চিনতে পারছ না ? চেঁচিও না বাবা—আমি পর-পুরুষ নই গো, আমি তোমার সদানন্দ—" চুলে হাত বুলিয়ে দেয় সদানন্দ, তার খোঁপা খুলে দেয়। মাধুরীর বিশ্রী লাগে। ইচ্ছে হয় পালিয়ে যায় সে। পলাশপুরের নীল নির্জন আকাশ-পথের তলা দিয়ে হাঁটে। সেখানকার নিঃশব্দতায় সবুজ প্রাণ চপল তীব্র নিঃশব্দ প্রাণের বিচিত্র ছন্দ। সেখানে ডাকাতে মাঠের ওপর যখন হাঁসখালির চরের দিক থেকে সোনালী রংয়ের চাঁদ উঠে আসে তখন মনের মধ্যে বিচিত্র এক মাদকতা ছড়িয়ে যায়। সেখানে সদানন্দ তাকে আদর করলে হয়তো দেহের দাহ কমাবার এই আদিম খেলাটা এতখানি গ্লানিকর মনে হত না।

মাধুরী বলে, "হ্যাঁগা, গাঁয়ে চলো না—"

"কোন্ গাঁয়ে ?"

"আমাদের পলাশপুরে—নয়তো তোমাদের নবীপুরে—"

"আরে দূর দূর, গাঁয়ে কী আছে রে পাগলি ?"

"কেন ছায়া আছে, ফুল আছে, খোলা মাঠ আর নদী—সেখানকার আকাশ বাতাস—"

"আরে দূর দূর—কী যে বলে—এখানে কি ফুল নেই ? কালই দেখো রজনীগন্ধা আনব—"

"কিন্তু গাঁয়ের মতো ?"

কথা শেষ করতে দেয়নি সদানন্দ, বলেছে, "কিন্তু এই শহরের মতো টাকা আছে সেখানে ? এ্যাঁ ? বুঝলে মাধুরানী, টাকা—টাকাই সব। টাকা হলে চাঁদেও বেড়াতে পারবে তুমি"—

বলেই সে টাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বোঝাতে থাকে মাধুরীকে। মাধুরী খানিকটা বুঝতেও পাবে সেসব কথা। একটিও টাকা নেই এমন একটি অবস্থার কথা ভেবে তার কষ্টই হয়। তার নিজের অতীতের কথা যখন মনে পড়ে যায়, তখন টাকা-ছাড়া ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভয়ই পায় সে, কিন্তু তবু—পলাশপুরের সেই অভাবের দিনেও সন্ধ্যার আলোতে তীব্র আনন্দরস সে পান করেছে—পেয়েছে নিবিড় শান্তির স্বাদ। সদানন্দ তাকে জগৎসংসার সম্পর্কে বলে যেতে থাকে, মাধুরী আব ভাবতে পারে না। সদানন্দ বলে তারপর উচ্চাকাঙ্খার কথা, বলে সে কত কী করতে চায়। সে তার ব্যবসার কথা বলতে বলতে বিনয়ের খুব প্রশংসা করে। বিনয় হচ্ছে সদানন্দের মামার মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে। বেশ চৌখস ছেলে, বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ, দেখতে শুনতে ধারালো আর সদানন্দের দালালির ব্যাপারে সে খুব সাহায্য করে। আজ সদানন্দের যে ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকা হতে চলেছে তা ঐ বিনয়ের জন্যে। বিনয় নিজেও কী-সব কন্ট্র্যাক্টরি ব্যবসা করে বেশ কিছু রোজগার করে। এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কেই সদানন্দের মনে সন্দেহ আর অবিশ্বাস হলেও বিনয় সম্পর্কে তার অগাধ বিশ্বাস। শুনতে শুনতে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে মাধুরী।

"বুঝলে, ছোঁড়া খু-উব—হ্যাঁগা, ঘুমুলে ?"

"উঁ ? না—শোনো—আজ গোবর্ধনবাবু এসে তাঁর টাকা কটা ফেরত চেয়ে গেছেন।"

"আরে গোবর্ধন শালাকে আরও ক'দিন ধরে রাখতে হবে—টাকাটা মোহিনীবাবুকে চড়া সুদে ধার দিয়েছি।"

শুধু সুদের অঙ্কই মাসে কেমন বাড়ছে সে হিসেবটাও সদানন্দ তাকে দিতে থাকে। তারপর এক সময় সে নাক ডাকতে থাকে। হ্যাঁ, টাকাও দরকারি, কিন্তু—হঠাৎ তার ভাবনা থেমে যায়। দশ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে মণীশ পালিতের মাতলামোর শব্দ ভেসে আসে। মণীশ পালিত নেশার ঘোরে সিরাজদ্দৌলার অভিনয় করছে—

"জানি আমি আজও জানি, আজও যদি পলাশীর মাঠে পরাজয় স্বীকার করে আমাকে ফিরে আসতে না হত তাহলে তেমনই আনন্দে তোমরা আবার আমাকে অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু কেন এই পরাজয় ?"

মণীশ পালিতের বৌ রমার গলা ভেসে আসে—"আঃ কী হচ্ছে ?"

সিরাজদ্দৌলা বলে যেতে থাকে, "বলো, বলো, কেন এই পরাজয় ? তোমাদের মীরমদন প্রাণ দিল, মোহনলাল অগ্নিবর্ষণে শত্রুসেনা বিধ্বস্ত করল—"

"বলি থামবে কি না ?"

"কেঁদো না লুৎফা—প্রেয়সী—"

"আমি লুৎফা নই—আমি রবার্ট ক্লাইভ—"

"ক্লাইভ ! আমার শত্রু—সে আসছে ! সিপাহসালার, পলাশীপ্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করুন—"

রমার তীক্ষ্ণ গলা দু'চার পর্দা চড়ে যায় হঠাৎ, "থামো, থামো বলছি"—

"ও বাবা—এলোকেশী সর্বনাশী ! আচ্ছা বাওয়া—আমি আর স্পিকটি নট্—"

মণীশ পালিত নিঃশব্দ হয়। মণীশ পালিতের বউবাজারে একটি কাপড়ের দোকান আছে, ভালই চলে। কিন্তু রোজ রাতে মাতাল হয়ে ফেরে লোকটা। হাসি-খুশি বউটাকে জ্বালায়, পাড়া সুদ্ধ সবাইকে জ্বালায়, মাত্লামো করে। তারপর রাত যখন গভীর হয়, যখন শেয়ালদার দিক থেকে ট্রেনের শব্দ স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসে তখন কেমন যেন গুম্ গুম্ একটা শব্দ . .

—ভুঁ—উঁ—উঁ—উঁ

ভারতমাতা স্টিম ফ্যাক্টরির সাইরেন বাজছে। একদল মজুর এখন বেরোবে, আর একদল আসবে। ফ্যাক্টরির চিমনি দিয়ে গল্ গল্ করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কালো ধোঁয়া। ধোঁয়াটে আকাশটা প্রতি মুহূর্তে মলিন, মলিনতর হয়ে যাচ্ছে, বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। কী নোংরা, মাগো—

ছাদেও ভাল লাগে না। মাধুরী সিঁড়ি বেয়ে আবার নীচে নামল।

পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকতেই প্রভাবতী হই হই করে উঠল, "আয়, আয় ভাই— বোস্—

প্রভাবতীর ফ্ল্যাটে সারা দুপুরই আড্ডা জমে থাকে। আজও ছ'নম্বরের ললিতাদি, নির্মলাদি, তিন নম্বরের বিধবা লীলাদি এবং পাশের বাড়ির বারো নম্বরের দুটি বউ বসে আছে। প্রভাবতীর স্বামী নিবারণ গুপ্ত পুলিশ কোর্টে ওকালতি করে বেশ দু'পয়সা করেছেন, কিন্তু ছেলেপুলে হয়নি, আত্মীয়কুটুম্বের বালাইও নেই। তাই দিনরাত পান-দোক্তা খায় আর আড্ডা দেয় প্রভাবতী।

নির্মলা বলল, "মাধুরীর বর বুঝি দিনের বেলাতেও থাকে ? হ্যাঁরে ?"

মাধুরী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে হাসে।

প্রভা বলল, "আহা থাক্, আমাদের সদানন্দবাবুর আনন্দময়ী ও—আর, একবছর হল বিয়ে হয়েছে—ওর এখন সব দোষ মাফ্—নে নে পান খা মাধুরী।"

লীলা বলল, "আহা, তোমার কোল জুড়ে একটি বাচ্চা থাকলে বেশ হ'ত প্রভা—"

প্রভা হাসল, "কেন ভাই, কেন ? কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কেন আমার বিপদ বাড়াতে চাইছ ? তোমরা যাই বলো, আমার বর কিন্তু আমায় বাঁজা বলে না—"

সবাই হেসে উঠল।

পাশের বাড়ির গোলগাল ফরসা-মতো বউটি যার নাম বেলা, সে হঠাৎ বলল, "জানো, কাল কি হয়েছে দিদি ?"

"কী রে ?"

"আমার দেওর কাল কারখানায় ভূত দেখেছে—"

"অ্যাঁ ! ভূত না পেত্নী রে ?"

"ভূত— কে একটা লোক নাকি মেশিনে কাটা পড়েছিল—"

বউটি গল্প বলতে শুরু করল। সবাই ঘন হয়ে বসল মেঝেতে। পড়ন্ত দিনের আলোতেও কেমন

ভয় ঘনাল। বউয়ের দেওরের দেখা ভূতের গল্প শেষ হতেই লীলা বলতে শুরু করল তাঁর শ্বশুরবাড়ি দেওঘরের দেখা একটি ভূতের গল্প। সে ভূত নাকি কাকে ভালবেসে না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। সেই রোমাঞ্চকর গল্প শেষ হতেই নির্মলা শুরু করল তার খুড়শ্বশুরের দেখা ভূতের গল্প। তিনি লক্ষ্ণৌতে ডাক্তারি করেন। একদিন রাতে রোগী দেখার জন্য একজন ডাকতে এল। চোখে ঘুম নিয়ে ঘুটঘুটি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে একটি গলিতে এক মুসলমানের বিরাট বড় বাড়িতে ঢুকলেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু বাড়ি অন্ধকার, কোথাও আলো নেই দেখে অবাক হলেন তিনি, বিরক্তও হলেন। সেই লোকটার পেছন পেছন একটি কামরায় ঢুকে তিনি বাতি জ্বালাতে বললেন। লোকটা জবাব না দেওয়ায় তিনি পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বেলে দেখলেন যে, বিছানায় কে যেন শুয়ে আছে। তার সারা শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। কাছে গিয়ে চাদর সরাতেই তিনি দেখলেন যে, একটি কংকাল শুয়ে আছে . . .

"ওমা—ও দিদি"—ললিতা গল্প শুনতে শুনতে সভয়ে প্রভাবতীকে জড়িয়ে ধরল। প্রভাবতী খিল খিল করে হেসে উঠল।

"মর ছুঁড়ি—ভয়ের কী আছে লা ? এখনও যে দিন"—

নির্মলা গল্প শেষ করতেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে মণীশ পালিতের বউ রমা এসে হাজির হল। তাব পরনে পুরুষদের মতো পাজামা ও পাঞ্জাবি।

"ওমা—ওমা—এ কী রে ?"

"ওরে এ যে রমা—

"হি হি হি—"

রমা সোজা এসে প্রভাবতীকে জড়িয়ে ধরে বলল, "প্রভা, আমি তোমায় ভালবাসি—আই লাভ ইউ—"

"এই—এই—ভাল হবে না কিন্তু ছুঁড়ি। আমার বর দেখলে পুলিশ কোর্টে টেনে নিয়ে যাবে তোকে—"

"তোমার বরের চেয়েও আমি তোমাকে বেশি ভালবাসব মাই ডিয়ার। লজ্জা করো না, এ যুগ আলাদা, এ হচ্ছে ফ্রিডমের যুগ, ইচ্ছে মতো বেলেল্লাগিরি করার যুগ—স্টানিশ ম্যাটিশ ধাটিন্ টিন্-"

"হি হি হি হা হা হা -"

"উ মাগো-"

"ওলো ওটা কী বললি ? ও রমা ?"

"রমা নই রমেশ আমি—ওটা ইংরিজিতে ভালবাসার কথা বললাম—স্টানিশ ম্যাটিশ ধাটিন্ টিন্—"

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই। বাবারে, রমার পেটে পেটে এত !

"ও রমা, তুই এমন রসিক মানুষ অথচ মণীশবাবুকে একটু সামাল দিতে পারিস না ?"

"দিদিগো, আমার ইয়ে যে অন্য রসের ভক্ত - সে রসে যে ব্রহ্মদর্শন হয় —"

কে বলবে যে রমার দশ বারো বছরের দুটি ছেলেমেয়ে আছে। ঐ নিয়েই বেচারি ভুলে থাকে। মাঝে মাঝে ব্যাটাছেলে সেজে ব্যাটাছেলেদের নামে বিষোদ্গার করে, গাল দিয়ে শান্তি পায়। আর কথায় কথায় ছড়া কাটে রমা।

রমা বলল, "ভাই, আমারও আজকাল ইচ্ছে হয় মদ খাই ! ঐ যে একটা সিনেমা দেখেছিলাম—"

"ওমা-সে আবার কী কথা লা ? ওতেই কি পুরুষের ভালবাসা পাওয়া যায় ?"

"থাক থাক—ওদের ভালবাসার জন্য আর আকুলিবিকুলি নেই আমার — বলে না 'পুরুষের

ভালবাসা-মোল্লার মুরগি পোষা'— ওদের ভালবাসার কথা আর বলো না। ঐ যে বলে না — 'কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিনী।"

সে কী কথা—মণীশবাবু একটু মদ খায় এই যা, ভালও তো বাসে তোকে—"

"রক্ষে করো দিদি—আমি জানি সে কেমন ভালবাসা—বলে না, 'তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমার আঙিনা চষি'—বাবুর আমার সেই ভালবাসা—"

হঠাৎ মাধুরী উঠে দাঁড়াল।

"ও কীরে সদানন্দময়ী—উঠছিস যে ?"

"যাই দিদি — কলটা খুলে এসেছি—এতক্ষণে মনে পড়ল।"

পালিয়ে বাঁচল মাধুরী।

বিছানায় বসে জানলা দিয়ে তাকাল মাধুরী। সেই চিমনিটা থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দিনরাত জ্বলে বাবা—রাবণের চিতাব মতো। না, তার মেয়েদের আড্ডাও ভাল লাগে না। খালি আবোলতাবোল গল্প। ভূত, ডাকাত, খুনজখম, —গল্পেব ছিরি কেমন। নয়তো কে কার বৌকে নিয়ে পালল, কোন মেয়ে কুমারী অবস্থাতেই মা হল, কে কাকে বিষ দিল—শুনতে শুনতে দমবন্ধ হয়ে আসে। এ সময়ে পলাশপুরে তাদেব বাড়ির পেছনকার আমবাগানে ছায়া নিশ্চয়ই ঘন হয়ে উঠে, পুব দিকে হেলে পড়েছে। দত্তদের পুকুরে সবকারদের হাঁস চারটে মনের সুখে সাঁতার কাটছে আর তিনকড়ি স্যাঁকরার বাঁশবনে ঘুঘুরা ডেকে চলেছে। এই সময়টা একা-একা পুকুরঘাটে বসে কী অদ্ভুতই যে লাগত তার ! মনে হত যেন লতাপাতা গাছপালারাও ফিসফিস করে কোনও —

কে ? কে যেন কড়া নাড়ছে ! ঝন্টুর মা এত তাড়াতাড়ি ফিবে এল ? "কে ?"মাধুরী উঠে বসল। তার শরীরের মধ্যে শিরশির করে উঠল একবার। বিনয়দা নয় তো ?

পরমুহূর্তেই অনুচ্চকণ্ঠে জবাব এল, "আমি।"

মাধুরী যা ভেবেছিল, তাই।

দরজা খুলতেই বিনয় হাসল, বলল, "ঘুমোচ্ছিলি বুঝি ?"

মাধুরী ঘাড় নাড়ল।

বিনয়ের চোখেমুখে যেন চোরের ছায়া, সে চকিতে একবাব চারদিকে বুলিয়ে নিল, তারপর বলল, "কী, বসতে টসতে বলবি না বুঝি মাধুরী ?

মাধুরী বলল, "এসো—"

ঘরে এসে বসল বিনয়, বলল, "ইস্ কী গুমোট ! এক গেলাস জল দে তো।"

মাধুরী জল আনতে গেল।

বিনয়ও পলাশপুরের লোক, ছোটবেলা থেকেই মাধুরীকে চেনে সে। সদানন্দের সুবাদে সেই পরিচয় এখন সম্পর্কে দাঁড়িয়েছে। বিনয় সদানন্দকে বলেছে যে, সে মাধুরীকে বৌদি বলে ডাকতে পারবে না, তাকে এতটুকু থেকে বড় হতে দেখেছে সে। সদানন্দ তাকে অভয় দিয়ে বলেছে মাধুরীকে নাম ধরেই ডাকতে। সদানন্দ বিনয়কে বিশ্বাস করে, কারণ বিনয় তার মামার মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে। কিন্তু মাধুরী আজকাল তার স্বামীর বিশ্বাসভাজনটিকে আর বিশ্বাস করতে চাইছে না। বিনয়ের চোখের চাউনি, হেঁয়ালিভরা কথা আর সদানন্দের অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে আসার মধ্যে সে আজকাল এক নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে।

জল নিয়ে ফিরে এল মাধুরী।

এক নিশ্বাসে জলটা শেব করল বিনয়, হেসে বলল, "তেষ্টা কিন্তু মিটল না।"

"আরও জল এনে দেব ?"

"শুধু জল ?"

"রসোগোল্লা আছে — দেব ?"

বিনয় মাধুরীর দিকে তাকাল, তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল, ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু হাসির আভাস বজায় রেখে সে গলা নামিয়ে বলল, "কিন্তু তাতেই তো সব তেষ্টা মেটে না মাধুরী।"

"সব তেষ্টা মানে ?" মাধুরী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল। যে ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট তা বুঝেও না বোঝার ভান করতে গিয়ে শরীর তার টান-টান হয়ে উঠল।

বিনয় মুচকি হাসল, "তাও বলতে হবে ? তেষ্টা কি জলেরই হয় ? বড়লোক হওয়ার তেষ্টা, গণ্যমান্য লোক হওয়ার তেষ্টা, ভাল কাজ করার তেষ্টা—তেষ্টার কী অন্ত আছে মাধুরী ?"

মাধুরী গম্ভীর মুখে বলল, "এ তো তেষ্টা নয় বিনয়দা—এ লোভ—"

শিকারী বেড়ালের মতো বিনয় তাকাল, মাধুরীর এই কথার অর্থ সে কি বুঝতে পারেনি ? বেশ পেরেছে—তাই মাধুরীর মন ভাল করে যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করল, "লোভ ?"

মাধুরী প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ লোভ"— কিন্তু তার ভয় হল এমন স্পষ্ট করে বললে আবার বিনয় হয়তো ক্ষেপেই যাবে, হয়তো তাতে তার স্বামীর ক্ষতি হবে। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তোমাদের এই শহরের হাওয়ায় শুধু লোভ আর লোভ, বিনয়দা—"

বেড়াল বুঝল যে ইঁদুর কথা ঘুরিয়ে দিল, সেও মেনে নিল এই খেলার ভঙ্গি, বলল, "হয়তো তাই। আমি তাকে তেষ্টাই বলি, আর এই তেষ্টারই নাম জীবন।"

মাধুরী হঠাৎ মাথা ঝাঁকাল, কণ্ঠস্বরে তরলতা টেনে এনে বলল, "বাবাঃ, এ সব বড বড় কথা আমার মাথায় ঢুকছে না, ও সব কথা তুমি ছাড়ো দেখি বিনয়দা— '

বেড়াল হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল, "বেশ, বড় বড় কথা না হয় ছোট আর সহজ করেই বলছি—"

"কিন্তু ও কথা তবু বলতেই হবে ?"

"হ্যাঁ—এ কথা ছাড়া যে তোর কাছে আমার এখন অন্য কোনও কথাই নেই মাধুরী।"

"তার মানে ?" মাধুরীর শরীর আবার টান টান হয়ে উঠল। রাস্তার মধ্যে একটা মোটব বোধ হয় হঠাৎ ব্রেক কষল। একটা হই হই—হল্লা। কেউ হয়তো চাপা পড়ল কিংবা চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। আকস্মিক সেই শব্দের ধাক্কায় বিনয়ের কথার অর্থ যেন আরও স্পষ্ট এবং আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠল।

"তার মানে ?" বিনয় হাসল, একটু থেমে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল মাধুরীর উক্তিকে, যেন সে তার পরেই মানেটা ব্যাখ্যা করবে। পায়ের উপর একটা পা তুলে সে জাঁকিয়ে বসল, তারপর পকেট থেকে দামি সিগারেট বের করে ধরাল। হঠাৎ শেয়ালদা স্টেশনের কোনও ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ একটানা শব্দটা ফালি ফালি করে বাতাস কেটে কেটে ঘরের চার দেয়ালে প্রতিহত হল, মাধুরীর দু'কানের পর্দাতে একটা বধির ঝনঝনানির সৃষ্টি করল।

"জবাব দিচ্ছ না যে ?" হঠাৎ কেমন যেন জেদ চাপল মাধুরীর।

বিনয় সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, "মানে আবার কী মাধুরী ? মানুষ কি মানে ভেবে ভেবেই সবসময় কথা বলে ? অবশ্য যে শোনে সে ইচ্ছে করলেই মানে খুঁজে বের করতে পারে।"

দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে আবার প্রশ্ন করল মাধুরী, "তার মানে ?" হঠাৎ একটা কিছু কুচি কুচি করে কাটতে ইচ্ছে করল।

"মানে ফ্যানটা চালিয়ে দাও—সদাদা দেখছি নতুন টেবল-ফ্যান কিনেছে—"

নিজেকে গুটিয়ে নিল মাধুরী, ফ্যানটা চালিয়ে দিল।

"আঃ"—বিনয় রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "তুই কী রে ? এককাপ চায়ের

কথাও বলছিস না ! সদাদার কাছে কিন্তু এবার নালিশ ঠুকে দেব—মাইরি বলছি—"

মাধুরী এবার জিভ বের করল, "ওমা, আমি ভুলেই গেছি—দিচ্ছি চা করে বিনয়দা—"

সে ছুটে রান্নাঘরে গেল। লজ্জা পেল সে। এ সব কী করছে সে ! কী বলছে সব ? বিনয়ই বা কী বলছে ? স্টোভে আগুন দেয় সে, ধীরে ধীরে স্টোভের আগুনের নীল শিখাটা সশব্দে জ্বলে ওঠে। কেৎলিতে জল ভরে স্টোভে বসায় সে। হঠাৎ খুট্ করে একটা শব্দ শুনে সে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখল যে বিনয় বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে। মাধুরীর রক্তে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। বিনয় দরজা বন্ধ করে ঘুরতেই তাকে দেখতে পেল। সে হাসল।

"ভেতরে যদি কুকুর চলে আসে—তাই বন্ধ করলাম মাধুরী"—বলেই সে ভেতরে চলে গেল।

কুকুর ? তে'তলায় ? বিনয়ের তো অদ্ভুত ভয় ! ভয় না অছিলা ? স্টোভের কাছাকাছি যায় সে। স্টোভটা জ্বলছে। সশব্দে। হঠাৎ মাধুরীর মনে হয় সে যেন একটা খাঁচায় বন্দিনী বুনো পাখি। মনে হয় পালিয়ে যায় সে। কিন্তু কোথায় ? ছাদে ? যেখানে মহানগরীর ধূম্রনিশ্বাসে কলঙ্কিত বিবর্ণ আকাশটা মাথার ওপর কুটিল হয়ে আছে ? যে আকাশের নীচে ছড়িয়ে আছে ইটপাথর আর লোহা দিয়ে গাঁথা অন্তহীন সৌধাবলী—যেন অন্তহীন কারাগার—

"জল চাপিয়েছিস ?"

চমকে ঘুরল মাধুরী। বিনয় রান্নাঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

"তুমি আবার এখানে এলে কেন বিনয়দা—যাও ও ঘরে। এখুনি চা আনছি"—

"একা বসে থাকতে ভাল লাগে নাকি রে ? দুটো কথা বলার জন্যেই তো আসা।"

"তুমি বিয়ে কবে কবছ, বিনয়দা ?"

হঠাৎ যেন একটু চুপসে যায় বিনয়। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে, "বিয়ে কেন ?"

"তাহলে কথা বলার লোক পাবে।"

'আমি বিয়ে করব না এখন।" বিনয় আবার আত্মস্থ হয়ে হাসল।

"কেন ?"

"আমি একজনকে ভালবাসি।"

"বটে ! কে সে বলো না ?"

"সব কথাই তোকে বলতে হবে এমন কোনও দলিল করে দিয়েছি নাকি আমি ?"

মাধুরী জবাব খুঁজে পায় না। স্টোভের দিকে হাসির ভান করে মুখ ফেরায়। নীল আগুন কাঁপছে।

"মাধুরী তুই ঘামছিস।"

"হবে।"

"কিন্তু তাতেও বেশ দেখাচ্ছে তোকে।"

মাধুরী কাঠ হয়ে গেল। নড়ল না সে, স্টোভেব আগুনের দিকেই তাকিয়ে রইল।

বিনয় হঠাৎ একেবারে কাছে ঘেঁষে এল, দু'হাতে মাধুরীর কাঁধ ধরে সবলে, আচমকা তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "তুই গাঁয়ের মেয়ে হলেও সাংঘাতিক চালাক মাধুরী কিন্তু আমিও তো বোকা নই যে তোর মন বুঝব না—কেন আর কষ্ট দিচ্ছিস বল তো ?"

"তার মানে ?"

"মানে বুঝিসনি তুই ?" বলেই বিনয় তার মুখটা নামাতে গেল মাধুরীর মুখের দিকে।

তার আগেই বিনয়ের গালে চড় মারল মাধুরী। বেশ জোরে—পুরো পাঁচ আঙুল দিয়ে সশব্দে।

বিনয় দু'পা পিছিয়ে গিয়ে তাকাল।

মাধুরী ছুটে বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে।

বিনয় দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

করিডর দিয়ে ছুটে গিয়ে বাইরের দরজা খুলে মাধুরী দু'চোখে আগুন জ্বেলে চাপা গলায় বলল, 'বেরিয়ে যাও।"

মুহূর্তকাল ভাবল বিনয়, তারপর মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল সেই খোলা দরজা দিয়ে। শিকারী বেড়াল জানে কখন শিকার ছেড়ে দিতে হয়। দরজা পার হবার সময় মাধুরীর আবার গলা শুনতে পেল সে, "আর কোনদিন এখানে এসো না।"

দরজাটা বন্ধ করে কয়েকমুহূর্ত তাতে ঠেস দিয়ে হাঁপাল মাধুরী। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে তার। ধীরে ধীরে সে তার শোবার ঘরে গিয়ে বসল। রান্নাঘরে স্টোভটা জ্বলছে। জ্বলুক। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। সেই চিমনিটা। কালো ধোঁয়া গল গল করে বেরোচ্ছে। পলাশপুরে ডাকাতে-মাঠের ওপারে কি এখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে ? কেমন যেন ভয় করছে, একা-একা লাগছে।

মহানগরীতে সূর্যাস্ত দেখা যায় না। মাধুরীও তা দেখতে পেল না। কিন্তু অন্ধকারে ছেয়ে যাবার আগে সে দেখল কেমন করে ঐ চিমনির ধোঁয়ায় আর এবাড়ি-ওবাড়ির কয়লার ধোঁয়ায় সারা শহর ধোঁয়াটে হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ অন্ধকার ঘনাল আর একসঙ্গে দপ্ করে রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠল। বাড়ির পর বাড়িগুলো অন্ধকারে আর আলোয় ঠাসাঠাসি করে দৈত্যদের মতো ঝিমোতে লাগল। আর সেই ভয়-ভয় একা-একা ভাবটা নিয়ে মাধুরী আবার কাজ করতে শুরু করল। রান্না শেষ করল সে। ঝন্টুর মা চলে গেল। সদানন্দ ফিরল রাত করে। ঘুমের ঘোরে স্বামীর শ্বাসরোধী আদরে ছটফট করতে লাগল মাধুরী—যেমন সে গত এক বছর ধরে করছে। তারপর পলাশপুরের আকাশ-বাতাসের কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হল যেন তার শরীরের কোথাও আগুন জ্বলছে। হঠাৎ অনেকদিন আগেকার তাদের গাঁয়ের একটা অগ্নিকাণ্ডের কথা তার মনে পড়ে গেল। তেলিপাড়ায় একদিন আগুন ধরেছিল বৈশাখের এক সন্ধ্যায়। সেদিন জোর হাওয়াও ছিল। লাল আগুন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে একটা কুঁড়ে থেকে আর একটা কুঁড়েতে ছড়াচ্ছিল। সে কী হট্টাগোল, হই হই কাণ্ড ! আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে করতেই কিন্তু পাড়াকে পাড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আশ্চর্য, পলাশপুরের আগুনের রং-ও আলাদা। ভাবতে ভাবতে মধুরীর মনে হল কোথাও একটা গুম্‌গুম্ শব্দ হচ্ছে। যেন এই শহরের মাটির তলায়। কেমন যেন ভয় হল। সদানন্দকে আঁকড়ে ধরে সে ভয় কমাবার চেষ্টা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। মাধুরীর শহর জীবনের আরও একটি দিন ও রাত শেষ হল।

তারপর মাধুরীর বিবাহিত জীবনের আরও দিন কাটল। মাস কাটল। দু'বছর কাটল। তাদের পাড়ার রাস্তাটা আরও চওড়া হয়ে মাধব কুণ্ডু রোড থেকে স্ট্রিট হয়ে গেল। দেশে রাজনীতির কত ওলটপালট হল, কত ভুখ মিছিল গলা ফাটিয়ে বিপ্লবের রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে শহর কাঁপাল, তারপর মিছিল ভেঙ্গে যে যার বাসায় ফিরল। কত মানুষ মরে মিটে গেল, কিন্তু শহর কলকাতার জনসমুদ্রে একটি ঢেউও কমল না। কমল না তার শব্দ কোলাহল, আলো, অন্ধকার, আর ঐ ভারতমাতা স্টিল ফ্যাক্টরির চিমনির ধোঁয়া।

সিলিং ফ্যানের তলায় বসে নতুন-কেনা রেডিওতে গ্রাম্য-গীতি শুনতে শুনতে মাধুরী এখনও ঐ চিমনির ধোঁয়ায় তার ভাগের আকাশটুকুকে দিনরাত কলঙ্কিত হতে দেখে আর পলাশপুরের কথা ভাবে। ক'মাস আগে তার মা মারা গেছে। পলাশপুর আরও দূরে সরে গেছে বলেই পলাশপুরের কথা আরও বেশি করে মনে পড়ে তার। আর এখনও তার একা-একা লাগে, মনে হয় সে যেন বন্দিনী।

সেদিনও পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটে, প্রভাবতীর ঘরে মেয়েদের আড্ডা জমেছিল। মাধুরী গেল।

"আয় ভাই মাধুরী, আয়—"প্রভাবতী ডাক দিল।

ললিতা বলল, "অবাক করলি তুই মাধুরী—এই ক'বছরেও একটা হল না তোর—গ্রাকসো

কোম্পানি যে ফেল মারবে রে ?"

প্রভাবতী বলল, "নারে, তুইও আমার মতো বাঁজা হয়ে থাক। সব বর কী সমান হয়—অনেক বর বাঁজা বৌদের বেশি আদর করে।"

ললিতা হাসতে হাসতে বলল, "ঐ আনন্দেই থাকো দিদি—ধন্যি তুমি।"

বিধবা লীলাদি এই সময় ঘরে ঢুকে প্রভাবতীর পানের বাটা টেনে নিয়ে বলল, "আজ নাকি বালিগঞ্জের দিকে কোন্ এক ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল বাপু—'

"তাই নাকি ! ওমা—"

"কে বললে দিদি ?"

পান মুখে দিয়ে লীলা বলতে শুরু করল। তারপর দুনিয়ার সমস্ত ডাকাতেরা এসে পাঁচনম্বর ফ্ল্যাটে মিছিল করে চলতে শুরু করল। সে-যুগের রঘু আর বিশে ডাকাত থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশের মানসিংহে গিয়ে গল্প যখন শেষ হল তখন মাধুরীর রক্তে বেশ একটা শিহরণ খেলে যাচ্ছে। বাবাঃ, পৃথিবীতে এমন সব হিংস্র লোকেরা আছে !

ডাকাতের গল্প শেষ হতে না হতেই মানুষদের ওপর অত্যাচারের গল্প শুরু করল ললিতা। একমাস ধরে খবরের কাগজে যা যা পড়েছে তা সব গড়গড় করে বলল সে। যত সব বিকৃতমনা পাষণ্ড ও দুর্বৃত্তদের কাহিনী শুনতে শুনতে সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে ছোরা রাখার উপদেশ দিল লীলা। সবাই সমর্থন করল তা। শুনতে শুনতে মাধুরীর শরীরে কেমন যেন একটা কাঁপুনি ধরে। এ কোথায় এসেছে সে ? পলাশপুরের সেই নিশ্চিন্ত জীবন তার কোথায় গেল ?

ঘরের ভেতর হঠাৎ হুড়মুড় করে ঢুকল রমা।

"এই যে—এতক্ষণে আসর জমল'—ললিতা বলল।

রমা বলল, "শ্ শ্ শ্ —শীগগির সবাই দরজার গোড়ায় এসো—"

"কেন রে ?"

"এসোই না —"

সবাই গিয়ে বাইরের ভেজানো দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। কয়েক সেকেণ্ড বাদে দেখা গেল যে একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের সুদর্শন যুবক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

রমা বলল, "দেখলে ?"

"কী ?"

"ঐ যে ছোঁড়া গেল ?"

"কে ও ?"

"উনিই সেই—"

"আ মলো যা—খুলেই বল না—"

"নির্মলাদির রতন ঠাকুরপো—"

"ওঃ—"

"বুঝেচি—'

"ইনিই।"

ঘরে ফিরে গিয়ে কেচ্ছা জমল। কিছুদিন ধরেই ব্যাপারটা সবার চোখে পড়েছে। নির্মলার অধঃপতন ঘটেছে। দেওরের বন্ধু ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছে। আর আসে ঠিক দুপুরবেলা যখন তার স্বামী যতীন রেল অফিসে কাজ করতে যায়। নির্মলার দু'টি বাচ্চা হয়েও বাঁচেনি। তার স্বামী দেখতে শুনতে রতনের মতো না হলেও বেশ কিন্তু। রমাই প্রথম সন্দেহ করেছিল, তারপর ঝি-চাকরেরা প্রমাণ জড়ো করেছে। ছি ছি ছি, মেয়েদের নাম ডোবাল নির্মলা।

রমা বলল, "আমি আগেই জানতাম দিদি—গেরস্তের বৌ অমন পটের বিবি সেজে থাকে গো কেন দিনরাত ? সাজ না সাজ—ঐ যে বলে না, 'সাজ করতে দোল ফুরোয়'—ও হল তাই—"

ললিতা বলল, "যাই বল্ ভাই, ওর স্বামীর নিশ্চয় কোনও দোষ আছে--"

"কিসের দোষ ? পুরুষেরা সবাই খারাপ কিন্তু তবু দু'এক জনকে বাদ দিতে হয়—"

"যেমন আমার উকিল ভাই"—প্রভাবতী পান মুখে দিতে দিতে বলল।

রমা চোখ ঘুরিয়ে বলল, "তবু উকিলবাবুর ওপর নজর রাখিস দিদি"—

সবাই হেসে উঠল।

"সত্যি পুরুষেরা বড় বজ্জাত'—ললিতা বলল।

বেলা বলল, "বিলেতের মেয়েদের দেখ—কেমন স্বাধীন !—"

রমা বলল, " আরে আমরাও আগের চেয়ে ঢের স্বাধীন হয়েছি বাবা—এবার দেখবে আমরাও ইচ্ছে মতো বিয়ে করব, য'টা খুশি—"

"হি হি হি—"

"হা হা হা—"

"কেন করব না—মিনষেরা তিনটে চারটে বিয়ে করে কী মজা পায় তা আমরাও পরখ করব ভাই । বুঝলে দিদি, এসো আমরা একটা মহিলা সমিতি করি—"

"কী করবি বাপু ?"

"কেন ? মেয়েদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করব, পণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়ব, পুরুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইনকেলাব জিন্দাবাদ হল্লা করতে করতে মিছিল নিয়ে মনুমেন্টের তলায় গিয়ে চুল এলো করে দিয়ে বক্তিতা দেব—স্টানিশ ম্যাটিশ ধা টিন টিন—"

"হি হি হি—"

"উরে বাবারে—হিঃ হিঃ হিঃ—"

"দিদি হাসি নয়, তুমি হবে সেই সমিতির প্রেসিডেন্ট—"

"রক্ষে কর ভাই—প্রেসিডেন্ট বরং আমার উকিলকে করিস—"

"দূর সে তো পুরুষ—না না, তুমিই হবে—"

"আচ্ছা নে হলাম—সমিতির নাম কী ?"

বেলা বলল, "অবলা সমিতি !"

রমা বলল, "মেরে ফেলব তোকে— আমরা অবলা কোন্ দুঃখে লা ? আমাদের সমিতির নাম হবে সবলা সমিতি—"

"হাততালি দে ভাই তোরা—বেশ নাম হয়েছে—"

হাততালি।

হঠাৎ ললিতা বলল, "আমার জন্যে তোরা একটা পাত্তর দেখিস তো রমা, আমি আবার বিয়ে করব—"

মুহূর্তের মধ্যে কামরার ভেতরে স্তব্ধতা নেমে এল। সত্যি ললিতার দুঃখ আছে। তার স্বামী অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত। সেই মেয়েটি নাকি বাগবাজারের দিকে থাকে। রিফিউজি।

লীলাদি ফোঁস্ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "আহা ভেঙে পড়লে চলবে কেন ললিতা—তুমি ভালবাসলে সেও ভালবাসবে—"

রমা ঠোঁট উলটে বলল, "বাজে কথা দিদি—পিরিত আর গীত জোরের কাজ নয়—"

"শুনেছি সে বেটি নাকি ললিতার পায়ের নখেরও যুগ্যি নয়—"

"নয়ই তো, কিন্তু কথায় বলে না যে পিরিতের পেত্নীও ভাল ? ব্যাপারটা তাই যে"—হঠাৎ সে

গা ঝাড়া দিয়ে বলল, "ঝ্যাটা মারো ওসব দুঃখের কথায়—ঐসব কথাই যদি শুনতে হবে তাহলে আমাব মাতালদিগ্র অ্যাকটিংই না হয় শুনব—না ভাই এসো তার চেয়ে একটু ফষ্টিনষ্টি কথা বলি—"

"বল্ না ছুঁড়ি"—প্রভা মুখে জরদা পুরে বলল।

রমা বলল, "ভাতার ম'ল ভাল হল, দুই সতীনে পিবিত হল—"

"কাবা রে ?"

"আবে জগমোহনবাবুর দুই বৌ—আজ কাল আব ঝগড়া হয় না—ওদেব এস্টেটের ম্যানেজার মালিক মারা যাবার পর ঝগড়া মিটিযে দিয়েছে—"

"ছি ছি ছি—ছি ছি ছি—"

"আব জানো—তোমাদেব বালিগঞ্জের তারিণীবাবুব বউ তিননম্বব স্বামীব ঘব কবছে ক'দিন ধবে—"

"অ্যা ! এই না, সেদিন দু'নম্বরকে তালাক দিল—"

"ছি ছি ছি—ছিঃ—"

"ছি ছি কেন ভাই—এ যুগের ব্যাপাবই যে সব্বোনেশে ! এ যুগে—

"সাতভাতারী সাবিত্রী,
বাবোভাতাবী এয়ো,
একভাতারী পোড়াকপালী,
দুয়ার দিয়ে না যেয়ো।"

"ঠিক, ঠিক—"

"বেশ বলেছিস ভাই—"

হঠাৎ ঘরে নির্মলার আবির্ভাব ঘটল। আবার স্তব্ধতা নেমে এল ঘবে। সবাই তাকাল নির্মলার মুখেব দিকে, গালের দিকে, চোখেব দিকে। রমা মাধুরীর হাতে একটা চিমটি কাটল।

"কী দিদি—চুপ করে কেন ?" নির্মলা একটু হাসল বসতে বসতে।

প্রভাবতী বলল, "বোস ভাই বোস্—চুপ আবার কোথায়—ভাবছিলাম মেযেদেব আমাদের কী দুঃখ—"

নির্মলা হাসল, "তোমার দুঃখটা কিসের ?"

"আছে ভাই আছে—হ্যাঁলা, এতক্ষণ ছিলি কোথায় ?"

নির্মলার মুখে ক্ষণকালের জন্য যেন একটু রক্তিম আভা দেখা গেল। রমা মাধুরীর হাতে আবার চিমটি কাটল। উঃ।

নির্মলা বলল, "ঘরেই তো ছিলাম—আমাদের রতন এয়েছিল—আমাদের কানু ঠাকুরপোদের এক ভাই—"

মাধুরীর হাতে আবার চিমটি কাটল রমা।

মাধুরী অবাক হয়ে গেল—নির্মলা মিথ্যে কথা বলল।

নির্মলা বলে যেতে থাকল, "সেই সকালে বেরিয়ে যায় আপিসে—তাই মাঝে মাঝে খাবার ছুটিতে একটু আবদার করে খেতে আসে—"

"প্রভাবতী বলল, "ভালই তো, ভালই তো—"

রমা'র চিমটির চোটে মাধুরী এবার হাসি চাপবার জন্য উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়েই শব্দ শোনা গেল—"খুন—খুন—খুন—পাকড়ো-ও-ও"

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তার জানালার দিকে। একদল লোক ডানদিকে ছুটে চলে গেল।

তাদের পেছনে পেছনে জনকয়েক লোক একজন লোককে ধরে নিয়ে ডাকছে—"রিক্শা-এই রিক্শা—" লোকটির পিঠ বেয়ে তাজা টকটকে লাল রং-এর রক্তধারা নেমেছে। দেখতে দেখতে গা গুলিয়ে উঠল। মা—গো—।

মাধুরী প্রভাবতীর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। পেছন পেছন এল লীলা।

"আমিও যাই মাধুরী—অসীমা হয়তো জেগেছে এতক্ষণে—"

"লীলা তার ভাগ্নে যোগেনের সঙ্গে থাকে। যোগেন ভাল চাকরি করে। যোগেনের বউ অসীমা, বি-এ পাস —বড় দেমাকী মেয়ে। দিনরাত নাটক নভেল পড়ে আর পড়ে পড়ে ঘুমোয়। লীলাই সংসার চালায়। আবার ভাগ্নের মুখের দিকেও চেয়ে নেই লীলা, তার স্বামীর ইনসিওরেন্সের টাকা, জায়গা জমি সব পেয়েছে সে। যোগেনের সংসার চালিয়েও স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করে, শহর দেখে সিনেমা দেখে।

"ও মাধুরী—দিনভর তো একা একা থাকিস—চ' কাল দুজনে সিনেমা দেখে আসি"—

"সিনেমা ! উনি রাগ করবেন দিদি—"

"ওমা—এর জন্যে তুই আবার মতামত নিতে যাবি নাকি ? এইতো কাছেপিঠে আমার সঙ্গে যাবি, তাতে আবার জিজ্ঞেস করবি ? একা একা পাগল হয়ে যাবি নাকি ?"

"আচ্ছা দেখা যাবে দিদি—"

ঘরে ফিরে গিয়ে একা একা আচার খেতে খেতে ভাবে মাধুরী। রমাদি কেমন অদ্ভুত লোক। নির্মলাদি—ছি ছি ছি। ইস্, রমাদি কেমন ছড়া কাটতে পারে ? একদিন তার খোঁপায় হাত দিয়ে বলেছিল, "দেখ দিদি দেখ, 'জামাই যে মরদ তা মেয়ের খোঁপাতেই পরিচয়'—"। জিভ টাক্‌রায় লাগিয়ে একটা শব্দ করে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাধুরী। নিজের খোঁপাটায় হাত দিয়ে দেখল। এই খোঁপা থেকে তার সদানন্দবাবুকে চেনা যায় ? হঠাৎ চুল এলো করে দিল সে। তার চুল বেশ লম্বা, কিন্তু সদানন্দ একদিনের জন্যও তার চুল নিয়ে কিছু বলেনি এখনও।— হি হি হি হি ! মনুমেন্টের তলায় সেও কী 'বক্তিতা' দেবে—প্রিয় বোনেরা, স্টানিশ ম্যাটিশ ধাটিন টিন ?—হি হি হি —উঃ বাবা—রমাদি'টা খুব রগুড়ে। কিন্তু সত্যি কথাও বলে। পুরুষেরাই মেয়েদের কষ্ট দেয়। ললিতাদির বড় কষ্ট। হ্যাঁ, সবলা সমিতির সেও মেম্বার হবে। শেয়ালদা'র দিক থেকে একটা ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ ভেসে এল। বাবারে বাবা, কী শব্দ এই শহরে। আর ধোঁয়া ? দূরে কারা যেন হাসাহাসি করে উত্তেজনাহীন অশ্লীল গালি-গালাজ করছে। মা-বোন নিয়ে। হিন্দিতে। বাতাসে যেন কেমন একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ।

উঃ মাগো—লোকটার কত রক্ত পড়ছিল। নিশ্চয়ই মরে গেছে এতক্ষণে। কী লাল রক্ত ! একা একা লাগছে। বড় ধোঁয়া। ঐ চিমনির ধোঁয়া। আরও অসংখ্য চিমনি আছে অমন। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। ইঞ্জিনের ধোঁয়া, চিমনির ধোঁয়া, উনুনের ধোঁয়া, চিতার ধোঁয়া। পলাশপুরে ঝর ঝর ঝিরঝির বাতাসে নাটাকাঁটার ফুলের সুগন্ধ। বিষ্টিভেজা মাটির সুবাস। সূর্যাস্তের রং-এ আর ছায়াতে মায়াময় পলাশপুরের সন্ধ্যা. . . . । কখন আসবে লোকটা . . . এ-দেহের দাহ . . .

সদানন্দ আজ তাড়াতাড়িই ফিরে এল। রাত আটটার আগেই।

"মাধুরী—মাধুরানী—ও মাধুরীলতা"—

"কী বলছ ?"

"দেখো তোমার জন্য কী এনেছি"—

মাধুরী কাছে গেল, "কী এনেছ ?"

সদানন্দ হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল, "উঁ-হুঁ-আগে আদর চাই।"

"ম্যা—ও"—

কিন্তু সদানন্দ নাছোড়বান্দা। কাছে এসে সশব্দে চুমু খায়, তারপর একটা প্যাকেট খোলে। তাতে স্নো, পাউডার, আলতা। তার সঙ্গে একটা লিপস্টিক।

"ওমা—লিপস্টিক !"

"হ্যাঁ—তুমি লাগাবে—তুমি যে সদানন্দ সাহেবের মেম গো—লাগাও, লাগাও একটু—কিন্তু খবরদার, শুধু আমার সামনে লাগাবে, রাতের বেলা"—

"ছি ছি—এসব আবাব কেন ?" বলতে বলতে আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে একটু রং লাগাল মাধুবী, তারপর খিলখিল করে হাসতে লাগল, "ওমা—ছিঃ"—

"ছিঃ কেন ? বেশ দেখাচ্ছে তো—এই, অত জোবে হেসো না—দেখি দেখি, আর একটু আদর করি আমার মেমসাহেবকে—উম্—উম্—"

হঠাৎ বিশ্রী লাগে। সদানন্দের মুখ-চোখের চেহাবা দেখে কেমন যেন খারাপ লাগে মাধুবীর। সদানন্দ যেন খাঁচার পাখিকে আদর করছে।

"দেখছ কী মাধুবানী—আরও আছে—

বলতে বলতে পকেট থেকে একটা গয়নার বাক্স বের কবে সদানন্দ। একটা আধুনিক ডিজাইনের নেকলেস, আর একজোড়া কানপাশা।

"কী, নডছ না যে ! পছন্দ নয় বুঝি ?

"কী যে বলো—কত দাম পড়ল ?"

"সে খবরে তোমার দরকার কী—নাও পরো দেখি। বলিনি যে তোমায় গয়নার মুড়ে দেব আমি। আরে দেখো না, দু'তিন মাসেই নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাব আমবা—বালিগঞ্জে। হেঁ হেঁ হেঁ—একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়িও কিনব, গাড়ি ছাড়া আর চলছে না—কন্ট্রাক্টবি কি সহজ ব্যাপাব—"

"সত্যি ? গাড়ি কিনবে ?"

"তবে ? বাঁচতে হলে বাবা ভালভাবে বাঁচতে হবে। ছলে বলে কৌশলে—টাকা আনতেই হবে।"

গয়না পরে নিজেকে দেখে মাধুরী। বড় ভাল লাগে তার নিজেকে। পেছন থেকে তার ঘাড়ের কাছে মুখ এনে সদানন্দ বলল, "কী মাধুরানী, পছন্দ হল ? অ্যাঁ ?"

তৃতীয় দফা আদর করতে শুরু করল সদানন্দ। তখন আষাঢ় শেষের মেঘ ডেকে উঠল বাইরে।

'বিষ্টি হবে"—বলেই একটা জানলার দিকে তাকাল সদানন্দ। ওদিকের একটা বাড়ির একটা জানলাতে একটি ছোকরাকে দেখা যাচ্ছে। ছোকরা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে।

হঠাৎ সদানন্দের মুখচোখ কুৎসিতভাবে কঠিন হয়ে উঠল, জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে মাধুরীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে বলল, "এসব চলবে না—বুঝলে ?"

"কী ?"

"জানলা খুলে বাজারের মেয়েদের মতো নিজেকে জাহির করা"—

"ছি ছি—কী বলছ !"

"ঠিক বলছি—খবরদার, এ-জানলা আর কক্ষনও খুলবে না"—

সদানন্দের হাবভাব দেখে বিশ্রী লাগল মাধুরীর। মনে হল সে পালিয়ে যায় কোথাও। যেদিকে হোক। কিন্তু মুখে কিছু বলল না সে। খারাপ কথা বলতে ইচ্ছে করে না তার।

আকাশে মেঘ আবার ডাকল।

বৃষ্টি নামল দু' ঘন্টা বাদে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেই বিদ্যুতের আলোতেও

চিমনিটাকে দেখতে পেল মাধুরী। তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে সদানন্দের নাক ডাকার আগেই মাধুরী বলল, "শুনছ ?"

"বলো মেমসাব"—

"কাল সিনেমা দেখতে চলো"—

"উঁ ?"

"সিনেমা"—

"সময় নেই—"

"তাহলে আর কোথাও চলো—চলো পুরী যাই—সমুদ্র দেখা যাবে—"

সদানন্দ খেঁকিয়ে উঠল, "হবে হবে, ওসবের ঢের সময় আছে—তার আগে টাকা চাই। টাকা—বুঝলে ? টাকা কামাবার বয়স চিরকাল থাকে না।"

মাধুরী আর কথা বলল না। কিন্তু সদানন্দ ঘুমভরা গলায় বলে যেতে লাগল। বাজে কথায় ও বাজে খেয়ালে সময় নষ্ট করার সময় নেই তার। তার লাখ লাখ টাকার দরকার ! সে বাড়ি করবে, গাড়ি করবে, ফ্যাক্টরি, মিল কিনবে, জীবনে বড় হবে। কথা বলতে বলতে সে যেন নিজেই নিজেকে হিসেব শোনাতে লাগল। কোন কাজে কত লাভ হয়েছে, কার কাছে এ মাসে কত সুদ পেয়েছে, এখন পর্যন্ত ব্যাঙ্কে কত টাকা জমেছে।

হঠাৎ মণীশ পালিতের গলা ভেসে এল দশ নম্বর থেকে। আজও মাতাল হয়েছে সে, আর 'বিল্বমঙ্গল'নাটক থেকে আউড়ে যাচ্ছে। মণীশ পালিতের অ্যামেচার স্টেজে বেশ নাম আছে।

শোনা গেল,—"এই পরিণাম !

এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিংবা চিতাভস্ম পবন উড়ায়।"

রমাদির গলা ভেসে এল, "বলি, আজ আবার কোন পার্ট হচ্ছে ?"

জবাবে শোনা গেল, "'বিল্বমঙ্গল' থেকে বলছি—নে চুপ করে শোন্ আমার কেমন ডেলিভারি—

'আরে রে নয়ন,
মন্মথের তুই রে প্রধান সেনাপতি !
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রু ডেকে আন ঘরে !'

"বলি ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—কিছু খাবেন না ?"

"চোপ রও—ইউ শাট্ আপ"—

দাঁতে দাঁত চেপে সদানন্দ বলল, "শালা—শূয়ার—সারারাত জ্বালাবে শালা"—

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বিল্বমঙ্গলের 'ডেলিভারি' আর শোনা গেল না। বাইরে বৃষ্টির জোর বাড়ল, আকাশের বুকে কে যেন এদিক থেকে ওদিকে বার বার একটা লোহার বল গড়িয়ে দিল। কাঠ মনে করে গলিত শবদেহ ধরে নদী পার হবার মতো প্রাকৃতিক অবস্থা যখন বাইরে তৈরি হয়ে গেল, তখন ঘরের ভেতর সদানন্দের নাক ডাকতে শুরু করল, আর কামরার অন্ধকারে চোখ মেলে মাধুরী ভাবতে লাগল যে, কলকাতার বৃষ্টির শব্দও আলাদা ঢংয়ের। ঝরঝর বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাইপ বেয়ে জল নামার কলকল শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে হর্ন দিতে দিতে যাচ্ছে মোটরগুলো। এখানে হাওয়া যত সব রাস্তা আর গলির মুখে মুখে থমকে দাঁড়ায়, আর পলাশপুরে কেমন হু হু হাওয়া বইত— হেমন্তকালে সবুজ ঘাসের ওপর কেমন সোনালী আলো

পড়ত. . . আর সেই তেলিপাড়াব আগুন . . . কী লাল !

দুপুরবেলা দরজা বন্ধ করে নতুন গয়না পরে নিজেকে দেখছিল মাধুবী। বেশ দেখাচ্ছে তাকে। সোনার স্বাদ যে বেশ তীব্র তা আজ বুঝতে পারল সে। এমনি সময় দরজায় টকটক শব্দ হল।

দবজা খুলে দেখল লীলাদি।

"চ', সিনেমা দেখতে যাব।"

"আজ ?"

"বাঃ,—কাল তোকে বললাম না। চচল্ চল্—দেবি করিসনে—দুপুরের শো'তে দেখব—পাঁচটায় শেষ হয়ে যাবে"—

"কিন্তু"—

"ঐ দেখ—সিনেমাতে কী এমন অপরাধ বাপু"—

"আচ্ছা চলো—"

সত্যিই তো কী এমন অপরাধ ! মাধুরী সেজেগুজে বেরোল।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা রিকশায চড়ে দু'জনে 'পূরবী'তে গেল। বাস্তাঘাটে কত লোক, কত শব্দ। ট্রাম-বাস ছুটছে—তারে তারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মানুষ ছুটছে। দেখতে দেখতে কেমন যেন নেশা লাগে।

লীলাই টিকিট কাটল। যথাসময়ে সিনেমা শুরু হল। প্রেমের দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে লীলা তার হাত ধরে ফিসফিস করে মাঝে মাঝে বলতে লাগল, "দেখ, কেমন করে ভালবাসাব কথা বলতে হয়।" লীলার কথায় হাসি পায় তার, তবু বেশ লাগে। এ এক নতুন স্বাদ। সদানন্দের আইন ভেঙ্গেছে সে, খাঁচা থেকে বেরিয়েছে।

ফেরার পথেও আবার তারা রিক্শা চড়ল। পথে লীলা তাকে বোঝায় কোন্ বাসে কোথায় যেতে হয়। বাবাঃ, বাসের নম্বরও বলিহারি, তিন নম্বর, পাঁচ নম্বব, আট, আটের-এ, এগারো, এগারো-এ, তেত্রিশ নম্বর। —ক-ত নম্বর ! রাস্তায় জনস্রোতকে দেখে মনে হয় যেন একটা সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে মোটরেরা ছুটে যাচ্ছে। কোনটা যেন হরিণ, কোনটা বাঘ, কোনটা মত্তহস্তী ! চাবদিকে শব্দ, কোলাহল, একটা গুমগুম শব্দ। হঠাৎ মনে হল—রিক্শা বড় আস্তে চলছে। মোটর হলে বেশ হ'ত ! খুব জোরে ছোটার একটা দুরন্ত বাসনা জাগে মাধুরীর। রক্তে যেন এক চঞ্চল বিদ্যুৎ বলাকা ডানা ঝাপটাচ্ছে।

বাড়ির কম্পাউণ্ডে পা দিয়ে লীলা বলল, "কেমন, হারিয়ে যাওনি তো ?"

মাধুরী হাসল।

গলা নামিয়ে লীলা বলল, "কাউকে বলিসনি কিন্তু —ওই রমা-ম'মা কাউকে বিশ্বাস কোরনি বাপু—যা করবার চুপচাপ করবে। আমি বিধবা মানুষ, সিনেমা দেখেছি শুনে ওদের কত কথা—কিন্তু কী করা যায়, তুই-ই বল মাধুরী—বিধবা মানুষ, একা একা হাঁপিয়ে উঠি—"

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে মাধুরী দেখল যে ঝন্টুর মা তখনও আসেনি। আর এলেই বা কী? কিসের ভয় ? সে কি চুরি করেছে, খুন করেছে ?

সেই জানলার ধারে গেল সে—যে জানলাটা রাতের বেলা সদানন্দ কুৎসিত ইঙ্গিত করে বন্ধ কবে দিয়েছিল। মাধুরী সেটা খুলে দিল। কোথায়, কেউ তো নেই ! থাক না খোলা। কে-একটা ছোকরা জানলা দিয়ে তাকালেই বা কী ? সেখান থেকে রাস্তার দিকের জানলার কাছে গেল সে। সিনেমা দেখে ফেরার সময় লীলাদি পান কিনেছিল। এখনও মুখে আছে তা। জানলা দিয়ে পিচ ফেলল সে। ওমা, একজন লোকের মাথায় পড়ল তা। লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকাল।

মাধুরী ঝট করে সরে গেল দু'পা। হি-হি-হি কী কাণ্ড— লোকটা নিশ্চয় মনে মনে গাল দিচ্ছে তাকে। জানলা দিয়ে সেই অতি-পরিচিত চিমনিটা দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল করে। হাওয়াব ধাক্কায় সেই ধোঁয়া তাদেব ফ্ল্যাটের দিকেই যেন আসছে। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। কেমন যেন একা-একা লাগছে—সিনেমা দেখে এসেও যেন সেই শূন্যতা-বোধ কমছে না। আচারের শিশি খুলে আচাব খেতে বসল মাধুরী।

তারপর আরও দু'তিনদিন লীলার সঙ্গে সিনেমা দেখল মাধুরী। রাস্তাঘাট প্রায় চেনা হয়ে এল তার। আর তারপর একদিন একাই বেরোল। বেরোবার আগে হালকা করে লিপস্টিক ঘষল ঠোঁটে আর নতুন কানপাশা-জোড়া পরল।

একা। একা-একা দিব্যি রাস্তা চিনে চলল সে। চড়ে পড়ল একটা বাসে। হাওড়ার বাস সেটা। দেখাই যাক না হাওড়ায় গিয়ে। হঠাৎ যদি সদানন্দের সঙ্গ দেখা হয়ে যায় ? তাহলে কী বলবে ? একটা মিথ্যে অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করতে করতে সে হাওড়া স্টেশন পৌঁছে গেল। তারপর সেখান থেকে একটা বাসে গেল বালিগঞ্জে। সেখান থেকে আবার ফিরে চলল শেয়ালদা। চলতে চলতে সে আড়নয়নে লক্ষ করল যে পুরুষেরা কেমন লক্ষ করছে তাকে। পুরুষেরা ভারী হ্যাংলা, রমাদি'ব কথাই ঠিক। কিন্তু তবু কেমন যেন একটা মজাও লাগল তার। একটা সিরসির আনন্দ। রক্তে যেন চঞ্চল বিদ্যুৎ-বলাকা। শহরটা কত বড় ! ইস্পাতের মতো তার ধূসর আকাশ। অন্ধকার দ্বীপের মতো তার মনটা। একা একা ঘুরে কী খুঁজছে মাধুরী। পলাশপুর ? চারদিকে অবিরাম মুখর শব্দ। ইট-কাট-লোহার অরণ্যে মানুষের বিপুল বন্যা। আর বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। গলানো পিচের গন্ধ। ডাস্টবিনের পচা খাবার আর তরকারির খোসার গন্ধ। ভুলে-যাওয়া গন্ধের মতো পলাশপুরের ডাকাতে-মাঠ একবার মনের কোণে উঁকি মেরে গেল। মাধুরী ভাবে—কোথায় ? কী চাই ?

মন ভরে না, তবু একটা বিচিত্র স্বাদ এই স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোতে। সেই স্বাদের কথা ভাবতে ভাবতে মাধুরী বাসায় ফিরল কিন্তু ফ্ল্যাটে ঢুকল না। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে সে প্রভাবতীদের ফ্ল্যাটে ঢুকল। প্রভাবতী আদর করে বসিয়ে পান খেতে দিল।

"নে নে খা—ঠোঁট অবশ্য আমাদের মতো কালচে না যে পান খেয়ে লাল করতে হবে"—বেলা বলল।

মাধুরী হাসল। লিপস্টিকের ব্যাপারটা ধরতে পারেনি কেউ।

আড্ডা চলল। অ্যাক্সিডেন্টের গল্প শুরু হল। কোথায় বাস উল্টেছে, কোন মানুষ কোথায় চাপা পড়েছে, কোথায় ক'টা এরোপ্লেন চুরমার হয়েছে—এইসব গল্প। তারপর শুরু হয় রকেটের কথা। চাঁদ আর মঙ্গলগ্রহে যাবার গল্প। শুনতে শুনতে মাধুরীর কেমন যেন চাঁদে যাবার একটা শখ জন্মাল মনে।

তারপর কথা ঘুরে যায়, এটম বোমার গল্প ওঠে। কয়েকটা বোমা ফাটলে কী হবে সেই সব ভয়াবহ কথা বলাবলি করে তারা। ভূতের গল্পের মতোই চিত্তাকর্ষক তা। ভয় করে শুনলে, তবু শুনতে ইচ্ছে করে। ভয় পাওয়ার সুখের জন্যই শুনতে ইচ্ছে করে।

রমা বলল, "অ দিদি—এবার একটু চা চড়াও—বোমা ফাটলেই তো অক্কা পাব সবাই—এসো, বাকি কটা দিন ফূর্তি করে নিই। তাছাড়া আজকাল বড় ইচ্ছে হয় যে কেউ বসে বসে খাওয়াক—"

"সে কী লা—খবর কী ?"

"খবর খুব সাধারণ—আর রেঁধে পারি নে বাপু—দাও দিদি, দুটো বিস্কুটই দাও—'আমার নাম যমুনাদাসী, আমি পরের খেতে ভালবাসি'—"

সবাই হাসতে থাকে।

ললিতা জিজ্ঞেস করল, "নির্মলা আজ কোথায় রে রমা ?"

"ওমা তোমায় বলিনি বুঝি, সেই মুখপোড়ার সঙ্গে বেরিয়েছে—"

"নির্মলার কানু ঠাকুরপোদের এক ভাই ?"

"তা কোথায় গেল ?" বেলা প্রশ্ন করল।

রমা তেড়ে বলল, "তা আমি কী জানি বাপু—ও কী আমায় বলে গেছে—"

"ওমা—নির্মলার পেটে পেটে এত !"

"ছি ছি ছি—ছিঃ—"

রমা চোখ ঘোরাল, "অত ছি ছি কেন ভাই—মনে কি আব ইচ্ছে জাগছে না তোমাদের ?"

"ছি ছি —যাঃ—"

"যাঃ কেন মাই ডিয়ার, লুকিযে লাভ কী ? তবে আব ভাবনা কোবো না—

আমাদের সবলা সমিতি যখন দেশেব শাসন-ভার হাতে পাবে তখন আমাদেব পুরনো বরদের আমার নাকচ করে দেব—"

"হি হি হি — সে কবে ?"

"এটম বোমা ফাটলে পর—"

"এটম বোমায শুধু ব্যাটাছেলেবাই মববে বুঝি ।"

"নির্ঘাত—মেয়েরা শক্তির অংশ তো, তাই ওবা বেঁচে যাবে—"

"তাহলে তালাক দেব কাদের ?"

"থুড়ি—আমাদেব লোকগুলো বেঁচে থাকবে—"

"আব দ্বিতীয়বার বিয়ে কববি কাদের ?"

"মঙ্গলগ্রহেব লোকদের—তবে তাবা দেখতে কেমন জানি না ভাই—তবে শুনেছি লাল লাল হবে—'

হি হি কবে হেসে লুটিয়ে পড়ল সবাই।

বাত দশটা নাগাদ সদানন্দ ফিরল সেদিন। হাতে শালপাতায মোড়া একটি বেলফুলেব মালা আর বজনীগন্ধা।

"ধরো—নিউ মার্কেট থেকে আনলাম—এই মালাটা খোঁপায জড়াও দেখি—আর এই চিকেন রোস্ট এনেছি—লাগাও ভোজ—"

রজনীগন্ধাগুলো ভাসে রেখে খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়াল মাধুরী।

"দেখি, দেখি"—সদানন্দ তার মুখটি কাছে নিয়ে এল। চোখদুটো কেমন যেন জ্বলছে তার। আর মুখটা মুখের কাছে আনতেই একটা উগ্র গন্ধ পেল মাধুরী।

মুখ সরিয়ে মাধুরী বলল, "কিসের গন্ধ ? ইঃ—"

হা হা করে হাসল সদানন্দ, "চটে গেলে তো—জানতাম চটবে—"

"রাগবে না বলো—ছুঁয়ে বলো—এট্টু মদ খেয়েছি, সবচেয়ে দামি মদ—স্কচ্—"

"মদ ।"

"আরে ও একটু খেতে হয় পাগলি। কন্ট্র্যাক্ট বাগাতে হলে একটু আধটু—রেগো না, আমি ঐ শালা পালিতের মতো বিল্বমঙ্গল আওড়াব না—আর আমার কথা কি জড়িয়ে যাচ্ছে ? আমি কি টলছি ? আরে একটুখানি ইয়ে করার ফল কী হয়েছে জানো ? পঞ্চাশ হাজার টাকার কন্ট্র্যাক্ট বাগিয়েছি —নেট্ দশ হাজার টাকা লাভ—"

তবু মাধুরী নড়ল না।

"ওকি, রাগ কমল না ? আমার মাধুরানী—"

"হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নাও—"

কিন্তু সদানন্দ ছাড়ে না, হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে জড়িতকণ্ঠে বলল, "আমায় তোর ভাল লাগে না—নারে ?"

"কী যে বলো—ছাড়ো—"

"আমি বুড়ো—তাই না ? এ্যাঁ ?

"বাজে কথা বলো না—"

"বাজে কথা নয় ? সত্যি ? সত্যি ? তাহলে একটু হাসো হাসো মাধুরীলতা—"

বিশ্রী লাগে মাধুরীর, তবু সে হাসে।

হঠাৎ সেই জানলাটার দিকে নজর পড়ল সদানন্দের।

"এ জানলা খোলা কেন, অ্যাঁ ?"

মাধুরী তাকাল। এই যাঃ জানলাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে সে।

"কী ? কথা বলছ না যে !"

"কী আবার বলব—জানলা বন্ধ করে থাকা যায় নাকি !"

সদানন্দ লাফিয়ে কাছে এল, "আলবৎ যায়—আমি বন্ধ করতে বলেছি, ব্যস্, বন্ধ থাকবে—"

"অমন চেঁচাচ্ছ কেন ?"

"চেঁচাচ্ছি কেন ? তবে রে—"

হঠাৎ সদানন্দ একটা চড় মেরে বসল মাধুরীকে। মাধুরী এর জন্য তৈরি ছিল না, হকচকিযে গেল। তারপর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। সদানন্দ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—চড় মেরেই তার নেশাটা হঠাৎ তরল হয়ে গিয়েছিল।

খানিক বাদেই রান্নাঘরে গিয়ে মাধুরীর কাছে দাঁড়াল সদানন্দ। তখন মাধুরী থালা সাজাচ্ছে,

"মাধুরী—"

মাধুরী জবাব দিল না।

"মাধু—আমার মাপ করো—বেশ খুলে রেখো তুমি জানলা—"

মাধুরী বলল, "খেতে বসো--"

"আগে বলো মাপ করেছ—বলো" বলতে বলতে হঠাৎ মাধুরীর পায়ের কাছে ধুপ করে বসে পড়ল সদানন্দ।

"ওকি— ওঠো, ওঠো বলছি—ছিঃ" —মাধুরী সদানন্দকে হাত ধরে ওঠাল।

সদানন্দ হঠাৎ পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করল। বলল, "তুমি ধরো—"

"এ কিসের টাকা ? কত টাকা ?"

সদানন্দ আবার হাসল হা হা করে, পাঁচহাজার টাকা—সব একশ টাকার নোট—আগের কন্ট্রাক্টের একটা কিস্তি আজ পেলাম, আরও তিনহাজার পাব—ব্যস্, সামনের মাসেই বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে যাব, আজ তার আগামও দিয়ে এসেছি। গাড়িটা সেখানে গিয়েই কিনব বুঝেচ — সেখানে গ্যারেজ পাব কিনা—"

মাধুরীর রাগ কমে গেল—হাতের মধ্যে তার একশ টাকার পঞ্চাশটা নোট করকর করতে লাগল।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন মাধু, যাও, সেফটার মধ্যে রেখে দাও—ও টাকা তোমার, মাইরি বলছি। তুমি আসার পর থেকেই তো আমার কপাল খুলে গেছে গো—মাইরি বলছি—"

গডরেজের আলমারির সেফের মধ্যে গুনে গুনে নোটগুলো রাখল মাধুরী।

গুনতে বড় আরাম লাগল তার।

তারপর খাওয়াদাওয়ার পর সদানন্দের সে কী আদর আর ভালবাসা দেখানো। মুখ দিয়ে তার

তখনও হুইস্কির গন্ধ বেরোচ্ছে—সে গন্ধে মাধুরীর রীতিমত কষ্ট হতে লাগল। চিকেন রোস্ট চিবোবার সময় আর বউকে আদর করার সময় সদানন্দের মুখচোখ একই রকম লালাস্রাবী দেখায়।

কিন্তু আদর করতে করতে রাত জাগার অভ্যেস সদানন্দের নেই, তাই একসময়ে সে নাক ডাকিয়ে মাধুরীকে রেহাই দিল। মাধুরী উঠে বসল বিছানায়। জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। বর্ণহীন আকাশ—সেই আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে তখন। সেই চাঁদের আলোয় সেই চিমনিটাকে একটা প্রাগৈতিহাসিক দানবের মতো ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে তা দিয়ে। এখনও আগুন জ্বলছে ফ্যাক্টরিতে। আরও অনেক ফ্যাক্টরিতে। যেন যজ্ঞের আগুন জ্বলছে. শহরে ঘুম এসেছে এখন, তবু একটা গুম-গুম-গুম-গুম শব্দে চলছে। যেন কারা প্রার্থনা করছে—দাও, দাও, দাও। রূপ দাও, যশ দাও, জয় দাও, অর্থ দাও, অফুরন্ত যৌবন দাও, মৃত্যুহীন প্রাণ দাও।

একফালি চাঁদের আলোতে বাড়ি-ঘরগুলো সব কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। এ শহরের লক্ষ লক্ষ লোকেরা কি সবাই এখন ঘুমিয়েছে ? আবার জাগবে তো ? আচ্ছা, মাধুরী যদি হঠাৎ মরে যায় ? ভাবতে ভয় লাগল মাধুরীর। না, না, বাঁচতে হবে। কিন্তু চাইলেই কি বাঁচা যায় ? মানুষ যেমন বাঁচতে চাইছে তেমনি মরতেও চাইছে যে। কে জানে, কখন কে মরবে। মাধুরীর ভয় হল। ভয়ে ভয়ে সদানন্দের গা ঘেঁষে সে চোখ বুজল।

সাধারণত সকাল দশটা নাগাদ সদানন্দ বেরোয়, কিন্তু পরদিন সে একটা পর্যন্ত বাড়িতে রইল। কী-সব কাগজপত্র দেখল, কী-সব চিঠিপত্র লিখল,তারপর ধীরেসুস্থে খেয়েদেয়ে মাধুরীকে একপ্রস্ত আদর করে কাজে বেরোল।

বলে গেল, "ফিরতে একটু দেরি হবে হয়তো মাধুরানী—হয়তো এগারোটা হবে—ভেবোনি।"

একা-একা লাগে মাধুরীর। খানিকক্ষণ সে নভেল পড়ল, তারপর উঠে বসল। আলমারি খুলে একশ টাকার নোটগুলো গুনতে বসল। নোটগুলো বেশ করকরে, নতুন। তারপর কী ভেবে সে সাজতে বসল। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে ভুলল না সে। তারপর তালাবন্ধ করে তরতর করে নীচে নেমে গেল।

শেয়ালদার মোড় থেকে বাস ধরল সে। গেল শ্যামবাজার। শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ। বালিগঞ্জ থেকে নিউ আলিপুর। সেখান থেকে এসপ্ল্যানেড। চলতে চলতে ব্যস্ত জনতার বিপুল স্রোত দেখল সে। দেখল হরিণের মতো, বাঘের মতো, মত্তহস্তীর মতো ধাবমান মোটর আর বাস। দেখল ট্রামের তারে তারে বিদ্যুতের চমক। দেখল অসংখ্য পুরুষের লুব্ধ চাউনি। দেখল, বিশ্রী লাগল, আবার ভালও লাগল। ভাল লাগল এই ভেবে যে, সে অবলা নয়, গাঁয়ের মেয়ে হলেও গেঁয়ো নয়। ঘুরতে ঘুরতে মাধুরী জীবনের স্বাদ পেল। দেখল শহরের বিবর্ণ, ধোঁয়ায় ক্লিষ্ট আকাশে মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রা। অনুভব করল যে, এই দিনের আলোর আড়ালে যেন এক গন্ধ-মদির অন্ধকার আছে। সে অন্ধকার যেন তার রক্তের মধ্যেও আছে। সেই অন্ধকারের স্বাদই যেন জীবনের স্বাদ।

বিকেলের আলো ম্লান হয়ে এল। বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়েই মাধুরী একপাশে সরে দাঁড়াল। ওপর থেকে একটি সুদর্শন যুবক নেমে আসছে। নির্মলাদির সেই রতন ঠাকুপো। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় রতন একবার তাকাল তার দিকে। তার চোখে যে মুগ্ধতার ছায়া ঘনাল তা টের পেয়ে মাধুরী মনে মনে হাসল, আর তার কানদুটো গরম হয়ে উঠল।

ওপরে উঠে মাধুরী দেখল যে ঝণ্টুর মা দশনম্বরের ঝি র সঙ্গে গল্প করছে। তাকে ডেকে কাজে লাগিয়ে দিল সে।

"ওমা, তোমায় কী সুন্দর দেখাচ্ছে গো দিদিমণি—কোথায় গেছলে ?"

"বাজারে—যাও যাও, হাত চালিয়ে নাও ঝণ্টুর মা—আজ উনি একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।"

ঝন্টুর মা রান্নাঘরে গিয়ে বাসন মাজতে বসল।

নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল মাধুরী। সে সুন্দরী। তার তন্বী সুঠাম দেহ। কিন্তু এ কী দাহ ? কেন এই একা-একা ভাব ? বিছানায় বসে সে জানলার দিকে তাকাল। সেই চিমনিটা আকাশের বুকে মাথা তুলে রয়েছে। তা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। যজ্ঞের ধোঁয়া। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। মাধুরীও জ্বলছে। তার নিশ্বাস দিয়েও যেন ধোঁয়া বেরোচ্ছে, তার দেহের ভেতরেও যেন যজ্ঞের আগুন জ্বলছে। হঠাৎ তার ভাগের আকাশটুকু আজ মাধুরীর ভাল লাগল। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে মাধুরী হঠাৎ একটা কথা ভেবে হাসল। সে ভাবল যে বিনয়কে একটা চিঠি লিখবে। লিখবে—শ্রীচরণেষু, বিনয়দা আপনি যে আজকাল খুব বড়লোক হয়েছেন সে খবর আমি রাখি। কিন্তু বড়লোক হলেই কি সবাইকে ভুলে যেতে আছে ? দোষত্রুটি সবাই করে, কিন্তু তাই বলে ক্ষমা কি পাওয়া যাবে না ? বিনয়দা, আপনি কবে আসছেন বলুন। আমি আজকাল বড় একা একা দিন কাটাচ্ছি। উনি সকালে বেরিয়ে অনেক রাতে ফেরেন—দুপুরবেলাটা একা একা আমার কী কষ্টে যে কাটে তা আর কী বলব ! একদিন দুপুরে গল্প করতে আসুন না ? আসবেন তো ?

ভাবতে ভাবতে রাঙা হয়ে উঠল মাধুরী, বালিসে মুখ গুজল। আর ঠিক সেই সময়েই শহরের রাস্তায় বাতিগুলো দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলে উঠতে লাগল। পলাশপুরের তেলিপাড়ায় একদিন যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সেই চিমনিটা দিয়ে গাঢ় কালো ধোঁয়া গলগল কবে বেরোতে লাগল। তাতে রক্তের ছিটের মতো আগুনের স্ফুলিঙ্গ সন্ধ্যার আকাশে জ্বলতে নিবতে লাগল।

গন্ধরাজ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রেল লাইন ছাড়িয়ে কতদূরে ময়ূরাক্ষী ? আরও কত দূরে ?

কাঁকর-ছড়ানো মাটি। অসুর-মুণ্ডের মতো ছোট-বড় ঢিবি ছড়িয়ে আছে আচক্রবাল। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনও এক রণক্ষেত্রের স্মরণ-চিহ্ন এই মাঠ। কোনও কোনও ঢিবির ওপরে লক্ষ্মীছাড়া চেহারার এক আধটা খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে। হাঁপানি রোগীর গলায় অতিকায় মাদুলির মতো এক একটা হাঁড়ি ঝুলছে কোনও-কোনটাতে। রুক্ষ মাটির যা শ্রী—এক ফোঁটাও রস গড়ায় বলে মনে হয় না।

ক্যান্‌ভাসার শ্রীসুধাংশু চক্রবর্তী, হাল সাকিন বারোর সাত ছকু খানসামা লেন, জিলা কলিকাতা—একবার থমকে দাঁড়াল। এ জেলায় এই তার প্রথম আবির্ভাব। শুনেছিল ময়ূরাক্ষী পার হয়ে—একটা শাল-পলাশের বন ছাড়ালেই ব্রজপুর গ্রাম। ময়ূরাক্ষী নদী, শাল-পলাশের বন, গ্রামের নাম ব্রজপুর। তিনটে একসঙ্গে মিলে মনের মধ্যে একটা কল্পলোক গড়ে উঠেছিল দস্তুরমতো। সুধাংশু চক্রবর্তী কল্পনাতে আরও খানিক জুড়ে নিয়েছিল এদের সঙ্গে সঙ্গে। হোক শীতকাল, থাকুক চারদিকে শস্যহীন মৃত্যুপাণ্ডুতা—তবু ব্রজপুর এদের চাইতে অনেকখানি আলাদাই হবে নিশ্চয়। তার গাছে গাছে

কোকিল ডাকতে থাকবে, ফুলের গন্ধ বয়ে বেড়াবে বাতাস, তার মাঠে মাঠে শ্যামলী ইত্যাদি ধেনুরা চরে বেড়াবে। বেণু বাজবে এবং সন্ধে হলেই শ্বেতচন্দন ঘষা একখানি পাটার মতো পূর্ণচাঁদ উঠে আসবে আকাশে।

কিন্তু কোথায় কী !

আপাতত মাঠ আর মাঠ। দেড় বছরের পুরনো জুতোটা নতুন জুতোর মতো মচ্ মচ্ আওয়াজ করছে তলার কঠিন কাঁকরে। এদিকে কি আলভাঙ্গা ক্রোশ ? তিন মাইল পথ যে আর ফুরোয় না।

সামনেই ছোট খাল একটা। রাস্তাটা তার মধ্যে গিয়ে নেমে পড়েছে অনেকখানি ঢালুতে। হোক মরা খাল—তবু তো এতক্ষণে জলের দেখা পাওয়া গেল। মনে হচ্ছিল, সে বুঝি বোখারা-সমরখন্দের কোনও মরুভূমির ভেতর দিয়ে পথ হাঁটছে !

একটা গরুর গাড়ি ছপ্‌ছপিয়ে উঠে এল খাল পেরিয়ে। চাকা থেকে তরল কাদা গলে গলে পড়ছে তার। গাড়োয়ান সাঁওতাল। খোলা ছইয়ের ভেতরে রুপোর হাঁসুলিপরা একটি কালো মেয়ে বসে আছে—নিবিড় চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে সে তাকাল সুধাংশুর দিকে। এক ফালি জলের সঙ্গে একটি তরল দৃষ্টি যেন সুধাংশুর সারা শরীরটাকে জুড়িয়ে দিলে।

—ভাই, ময়ূরাক্ষী কতদূর ?

গাড়ির ভেতরে মেয়েটি হেসে উঠল । গাড়োয়ান আপাদ-মস্তক লক্ষ করে দেখল সুধাংশুর। বিদেশি।

বললে, এটাই তো ময়ূরাক্ষী নদী।

—অ্যাঁ ! এই নদী !

কয়েক বছর আগে যে সুধাংশু চক্রবর্তী বাস করত মেঘনা নদীর ধারে এবং অধুনা বাস্তুহারা হয়ে সে বারোর সাত ছকু খানসামা লেনে বাসা বেঁধেছে, তার পক্ষে এটা শোনবার মতো খবর বটে ! নদী এর নাম ! এবং কাব্য করে একেই বলা হয় ময়ূরাক্ষী !

কিন্তু বিস্ময়টা ঘোষণা করে শোনাবার মতো কাছাকাছি কেউ ছিল না। গরুর গাড়িটা ততক্ষণে বাঁধের মতো উঁচু রাস্তাটার ওপরে উঠে গেছে—শুধু খোলা ছইয়ের মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল মেয়েটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে এখনও।

আপাতত নদী পার হতে হচ্ছে তা হলে।

খেয়া পাড়ি দেবার সমস্যা নেই—সাঁতারও দিতে হবে না। এক হাতে জুতো, আর এক হাতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে ধরলেই চলবে। সুধাংশুও তাই করল। পায়ের তলায় কিছু দলিত শ্যাওলা, ভাঙা ঝিনুকের টুকরো আর এঁটেল কাদা অতিক্রম করে সে ওপারে পৌঁছল। জুতোটা একরকম করে পরা গেল বটে, তবে পায়ের গোড়ালিতে আঠার মতো চটচট করতে লাগল।

নদী তো মিটল। এবারে শাল-পলাশের বন ?

সেও কাছাকাছিই ছিল, কিন্তু এর নাম বন? গোটা কয়েক মাঝারি ধরনের গাছ দাঁড়িয়ে আছে জড়াজড়ি করে। সুসঙ্গের পাহাড়ে-দেখা নিবিড় মেঘবর্ণ অরণ্য স্বপ্নের মতো ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে। এটা পার হলেই ব্রজপুর। সুধাংশুর কল্পনা ফিকে হতে শুরু করেছে।

ব্রজধামই বটে, তবে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পরে।

লাল মাটির দেওয়াল—কিংবা টিনের চাল। খান দুই নোনাধরা দালান। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের চারিদিকে অজস্র পোড়া মাটির ছোট ছোট ঘোড়া। ও জিনিসটা সুধাংশু আগেই চিনেছে—ধর্মঠাকুরের ঘোড়া এগুলো।

কিন্তু ঘোড়া জ্যান্তই হোক আর মাটিরই হোক সে কখনও কথা কয় না এবং যুগের মাহাত্ম্যে

ধর্মঠাকুর সম্প্রতি নির্বাক। পতিতপাবনী এম ই স্কুলের হেড্‌মাস্টার নিশাকর সামন্তের হদিশটা পাওয়া যাবে কার কাছ থেকে ? কাছাকাছি কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। দুপুরের রোদে গ্রামটা ঘুমিয়ে আছে যেন ।

আরও দু পা এগোতেই একটি ছোট দোকান।

তোলা উনুনে খোলা চাপিয়ে একটি লোক খই ভাজছে। বাঁশের খুন্তি দিয়ে নাড়ছে গরম বালি। পট্‌-পট্‌ করে ধান ফুটছে—মল্লিকা ফুলের মতো শুভ্র খইয়ের দল খোলা থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে চারপাশে।

সুধাংশু তাকেই নিবেদন করল প্রশ্নটা।

—স্কুল ?—দু তিনটে বিদ্রোহী খইয়েব আঘাতে মুখখানাকে বিকৃত করে লোকটা বললে, এগিয়ে যান সামনে। লাল রঙের বাড়ি। ওপবে টিনের চাল। বাঁক ঘুরলেই দেখতে পাবেন।

এ বাঁকটা আর ডালভাঙা ক্রোশ নয় - -কাছাকাছিই ছিল এবং টিনের চালওয়ালা লাল রঙের বাড়িটাও আর বিশ্বাসঘাতকতা করল না। আশায-আনন্দে উৎসুক পা চালিয়ে দিলে সুধাংশু। 'দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোম্পানিব' মালিক অক্ষয়বাবু আগেই চিঠি দিয়েছেন নিশাকর সামন্তকে। দু'জনে কীরকম একটা বন্ধুত্ব আছে। নিশাকব সামন্ত তাঁর ওখানে সুধাংশুকে আশ্রয় দেবেন এবং তাঁরই বাড়িতে দিন চারেক থেকে আশেপাশের স্কুলগুলোতে বইয়ের ক্যান্‌ভাস করবে সুধাংশু। স্কুলের দর্শন পেয়ে তাই স্বভাবতই প্রসন্ন হয়ে উঠল মনটা। অর্থাৎ থাকবাব জায়গা পাওযা যাবে, কিছু খাদ্য জুটবে এবং হাত-পা ছড়িয়ে আরামে ঘুমিযে নেওয়া যাবে ঘন্টা কয়েক !

স্কুলে টিফিন পিরিয়ড চলছে খুব সম্ভব। বাইরে দাপাদাপি করছে একদল ছোট ছোট ছেলে। একটা টিনের সাইনবোর্ডে কাত হয়ে ঝুলছে স্কুলের নাম। পিটা মুছে গেছে—মনে হচ্ছে অতীতপাবনী।

জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে যাওয়া বারান্দাটা পার হয়ে সুধাংশু এসে ঢুকল টিচার্স-রুমে। খান কয়েক কাঠের চেয়ার—মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। কাচভাঙা আলমারিতে ছেড়া-খোঁড়া খান ত্রিশেক বই, র‍্যাকে সাজানো গোটা কয়েক ম্যাপ। আলমারির মাথা থেকে তিন-চারখানা বেতের ডগা উঁকি মারছে। আর এই দীনতার ভেতরে সম্পূর্ণ বেমানানভাবে শোভা পাচ্ছে দেওয়ালে একটি সুহাসিনী সুন্দরী মহিলার মস্ত একখানা অয়েলপেইন্টিং। খুব সম্ভব উনিই পতিতপাবনী।

ঘরে পা দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুধাংশু। কলাইকরা বড় একখানা থালায় একটি লোক তেল আব চীনে বাদাম দিয়ে মুড়ি মাখছে প্রাণপণে। খুব সম্ভব দপ্তরী। ছ'জোড়া চোখ লোলুপভাবে তাকিয়ে আছে তাব হাতের দিকে। টিফিনের ব্যবস্থা।

সুধাংশু একবার গলা খাঁকারি দিলে।

ছ'জন মানুষ একসঙ্গে ফিরে তাকালেন। শীর্ণকান্তি জীর্ণদেহ ছ'টি খাঁটি স্কুল-মাস্টার। আসন্ন টিফিনের ব্যাপারে ব্যাঘাত পড়ায় স্পষ্ট অপ্রীতি ফুটে উঠেছে তাঁদের চোখে।

সমবেত ছ'জনের উদ্দেশ্যেই কপালে হাতটা ঠেকাল সুধাংশু। তারপর বললে, নমস্কার। আমি কলকাতা থেকে আসছি।

ততক্ষণে তার কাঁধে কলেজ-স্কোয়ারের স্ফীতোদর ছিটের ঝোলাটি চোখে পড়েছে সকলের। একজন চশমাটা নাকের নীচের দিকে ঠেলে নামালেন খানিকটা। বিরসমুখে বললেন, বইয়ের এজেন্ট তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বসুন একটু।

একটা খালি টিনের চেয়ার ছিল একটেরেয়। সুধাংশু বসতেই ঠক-ঠক করে দুলে উঠল বারকয়েক। একটা পায়া একটু ছোট আছে খুব সম্ভব।

—আমি নিশাকরবাবুর কাছে এসেছিলাম—কলাইকরা থালায় মুড়ি মাখবার শব্দটা সুধাংশুর অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল।

—হেড্‌মাস্টারমশাই ?—প্রথম সম্ভাষণ যিনি করেছিলেন, তিনিই বললেন, তিনি তিন মাসের ছুটিতে দেশে আছেন। তাঁর খুড়িমা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে তারপর বিষয়-সম্পত্তির কী সব ঝামেলা মিটিয়ে তবে ফিরে আসবেন।

চমকে উঠল সুধাংশু। ঢোঁক গিলল একটা।

—দিন চারেক আগে আমাদের পাবলিশার অক্ষয়বাবু তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন—

একটা প্লেটে করে খানিক মুড়ি নিজের দিকে টেনে নিয়ে আর একজন বললেন, সেটা নিশ্চয় বি-ডাইরেক্টেড হয়ে সাঁইথিয়ায় চলে গেছে—আপনি ভাববেন না।

না, ভাবনার আর কী আছে ! মুড়ি চিবোনোর শব্দে সুধাংশু আবার ঢোক গিলল। মধ্য দুপুরের তীব্র ক্ষুধা এতক্ষণে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠেছে তার। নিশাকরবাবুর বাড়িতে থাকার এবং খাওয়ার কথা লিখেছিলেন অক্ষয়বাবু—এই দুপুরেও অন্তত দুটি ভাতের একটা নিশ্চিত আশা মনের মধ্যে জেগে ছিল তার। সুধাংশু এতক্ষণে বাস্তবভাবে অনুভব করল—ব্রজপুর সত্যিই অন্ধকার। তার কানু মথুরায় নয়—সাঁইথিয়ায় বিদায় নিয়েছেন।

কিছু ভাবতে না পারার আচ্ছন্নতায় সুধাংশু ঝিম ধরে বসে রইল কতক্ষণ। কী অদ্ভুত লোলুপভাবে যে মুড়ি খাচ্ছে লোকগুলো ! একজন আবার টুকটুকে একটা পাকা লঙ্কায় কামড় দিচ্ছে—সুধাংশুর শুকনো জিভের আগায় খানিকটা লালা ঘনিয়ে এল। রিফ্লেক্স্ অ্যাক্শন ! আঃ—অত শব্দ করে অমনভাবে চিবোচ্ছে কেন ওরা ? ওদের খাওয়া কি শেষ হবে না কখনও ?

আর থাকা যায় না। ওই একটানা শব্দটা অসহ্য।

—বই দেখবেন না ?

—হাঁ—হ্যাঁ নিশ্চয়।— তিন চারজন ঘাড় ফেরালেন। মুড়ির পাত্রগুলো শূন্য হয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে। দু জন উঠে গেলেন হাত ধুতে।

—এই দেখুন—মুড়ি ছড়ানো টেবিলটার ওপরেই একরাশ বই ছড়িয়ে দিলে সুধাংশু।

—ওঃ ! গ্রেট ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং ? আপনাদের অনেকগুলো বই তো আমাদের রয়েইছে মশাই !—

ধুতির কোঁচায় হাত মুছে একজন একটা বই তুলে নিলেন : 'জ্ঞানের আলো', 'স্বাস্থ্য সমাচার', 'ভূগোলের গল্প'— সবই তো আছে আমাদের।

—এবারেও যাতে থাকে, সেইজন্যেই আসা— অনুগত বিনয়ে সুধাংশু হাত কচলাল : তা ছাড়া আমাদের নতুন ট্রান্স্লেসনের বইটা দেখেননি বোধ হয় ? বাই কে-পি পাঁজা, এম-এ, বি-টি, হেডমাস্টার, বামুনপুকুর এইচ-ই স্কুল—

—হুঁ !

—বাড়িয়ে বলছি না স্যার, বাজারের যে কোনও চল্‌তি বইয়ের সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখুন। সিম্‌প্লেস্ট প্রোসেস্, নতুন নতুন আইটেম, একটা ওয়ার্ডবুকও আছে সঙ্গে—

ঠং ঠং করে ঘন্টা বাজল। অবশিষ্ট টিচারেরা গোগ্রাসে মুড়ি শেষ করলেন।

প্রথম লোকটি হাই তুললেন : আপনি আপাতত এই এরিয়ায়ই তো আছেন ? কাল তা হলে একবার দশটার দিকে আসুন। তখনই কথাবার্তা হবে। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার—এবার আমার ওপরেই ভার। আচ্ছা—নমস্কার—

—নমস্কার !—অগত্যা থলের মধ্যে বইগুলো পুরে সুধাংশু উঠে পড়ল।

আসুন। অর্থাৎ আবাহন নয়—বিসর্জন। আপনি যান, কিন্তু যাওয়া যায় কোথায় ?

গ্রামটা যখন মাঝারি, তখন জেলা বোর্ডের একটা ডাকবাংলো কোথাও থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এই জীর্ণ চেহারার দীন ক্যান্‌ভাসার—চৌকিদার কি আমল দেবে ? আর যদি বা থাকতেও দেয়—খাওয়া ছাড়াও দৈনিক দুটো টাকা চার্জ তো নির্ঘাত। স্কুল বইয়ের ক্যানভাসারের পক্ষে দৈনিক দু টাকা দিয়ে ডাকবাংলোয় থাকা আর বারোর সাত ছকু খানসামা লেন থেকে চৌরঙ্গির ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠা—এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ নেই কিছু।

অতএব—

অতএব ব্রজধাম ছেড়ে আবার স্টেশনের দিকে যাত্রা ? উঁহু, সেও অসম্ভব। এ এরিয়াতে আশে-পাশে পাঁচ-ছ'টা স্কুল রয়েছে। তাদের বাদ দিয়ে চলে গেলে নিস্তার নেই। অক্ষয়বাবু ঠিক টের পেয়ে যাবেন, এবং অক্ষয়বাবু কড়া লোক।

ক্ষিদেয় পেটের নাড়িগুলো দাপাদাপি করছে। সেই খইয়ের দোকানটাকে মনে পড়ল। কয়েকটা কালো ছিটধরা চাঁপা কলাও ঝুলতে দেখেছিল সেখানে। কিঞ্চিৎ ফলারের ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়।

শুধু চাঁপা কলা নয়, মোষের দুধও ছিল এবং একটু মোদো-গন্ধধরা ভেলিগুড়। পনেবো পয়সায় খাওয়াটা নেহাত মন্দ হল না। আচমকা সুধাংশুব মনে হল, এমন খই-কলার ফলার কাছাকাছি থাকতে দুপুরবেলা খানিক শুকনো মুড়ি কেন চিবিয়ে মরে মাস্টারেরা ?

শীতের নরম রোদ। পেটে খাবার পড়ে গা এলিয়ে আসছে। একটু শুতে পারলে হত।

কাছেই ধর্মঠাকুরের বটগাছ। ছিমছাম জায়গাটি। দেবতার স্থান, অতএব সর্বজনীন সম্পত্তি। এখানে হত্যে দেবার নাম করে খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিলে কেউ আপত্তি করবে না নিশ্চয়।

যা ভাবা—তাই কাজ। ব্যাগের ভেতর থেকে সন্তর্পণে ভাঁজ করা র‍্যাপারটা সে বের করে আনল। পথে বিছানাটা এক জায়গায় রেখে এসে ভারী ভুল করেছে সে। নিশাকরবাবুর ওখানে বিছানা নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই—বন্ধু লোক !—অক্ষয়বাবু বুঝিয়েছেন।

ফিরেই যেতে হবে। থানা গাড়তে হবে তিন মাইল দূরের স্টেশনেই । ওখান থেকে যতটা 'এরিয়া' কভার করা যায়। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে বটগাছের তলায় শুয়ে পড়ল সুধাংশু। ধর্মঠাকুরের মাটির ঘোড়াগুলো কেমন পিট-পিট করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কতক্ষণ ?

—ও মশাই—কত ঘুমুবেন ? উঠুন—উঠুন—

ঘোড়াগুলো ডাকছে নাকি ? সুধাংশু ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

—আপনি এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন, আর আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিন্—চলুন এবার—

ঘোড়া নয়। একটি মানুষ এবং স্কুলের একজন মাস্টার।

—কেন বলুন তো ?

সুধাংশুর মনে পড়ল, এই লোকটিকেই টিচার্স-রুমে বসে মুড়ির সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা চিবুতে দেখেছিল সে।

মাস্টার মিটি-মিটি হাসলেন : আছে মশাই, ব্যাপার আছে। সাধে কী আর এসেছি—ওপরওলার হুকুমে।

—ওপরওলার হুকুমে !—সুধাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ?

—ছোঃ !—মাস্টার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : ওকে কে পরোয়া করে মশাই ? সেক্রেটারির কুটুম বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হয়েছে—নইলে ওর বিদ্যে তো ম্যাট্রিক অবধি। গুণের মধ্যে খালি সেক্রেটারির কান ভারী করতে পারে। আমিও শশধর বাড়ুয্যে মশাই—আই-এ পাশ করেছি,

হেডমাস্টারের লেখাতে ভুল ধরেছি দু-দুবার। গজেন বিশ্বাসকে আমি গ্রাহ্যও করি না।

—তবে কার তলব ? থানার দারোগার নয় তো ?—এবার ভয়ে সুধাংশুর গলা বুজে এল।

—দারোগা আবার কেন ?—শশধর বাঁড়ুয্যে হা-হা করে হেসে উঠলেন : আপনি কি চোর ডাকাত ? দারোগা নয়—ম্যাজিস্ট্রেট ডেকেছে। চলুন।

ম্যাজিস্ট্রেট ! রহস্য অতল !

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুধাংশু উঠে পড়ল।

এবং কী আশ্চর্য—যেতে হল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নয়, শশধর বাড়ুয্যের বাড়িতে।

বাড়ি রাস্তার ধারেই। সামনে একটি ফুলের বাগান। লাল মাটির দেওয়াল আর টিনের চাল। একটি ছোট ধানের মরাই আর এক পাশে।

বাইরের ঘরে ঢুকেই সুধাংশু থমকে গেল। শশধর বাড়ুয্যের বাড়িতে এতখানি আশা তার ছিল না।

একখানি তক্তপোষের ওপরে পরিষ্কার একটি সুজনী পাতা। শাদা কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিল এবং পাশে একটি চেয়ার। আর সব চেয়ে আশ্চর্য—টেবিলের ওপরে কোনাভাঙা সস্তা একটি কাচের ফুলদানিতে সপত্র একগুচ্ছ গন্ধরাজ ! এই শীতকালে গন্ধরাজ !

কিন্তু গন্ধরাজের চাইতেও বিস্ময়কর অভ্যর্থনার এই আয়োজনটা। মনে হচ্ছে—সুধাংশুর সম্মানেই ঘরখানাকে এমন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন কনে দেখতে এসেছে সে।

শশধর বললেন, বসুন, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাকছি।—বলেই আবার হেসে উঠলেন হা-হা করে। তারপর পা বাড়ালেন ভেতরের দিকে।

সুধাংশু থ হয়ে রইল। এ আবার কোন্ পরিস্থিতি ! একটা দুর্বোধ্য নাটকের মতো ঠেকছে সব। অসময়ের গন্ধরাজের একটা মৃদু সৌরভ রহস্যলোক সৃষ্টি করতে লাগল তার চারদিকে।

—মন্টুদা—চিনতে পারছ না ?—কপালের ওপর ঘোমটাটা একটুখানি সরিয়ে শ্যামবর্ণ একটি তরুণী মেয়ে ঢুকল ঘরে। হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল।

তটস্থ হয়ে সুধাংশু উঠে দাঁড়াল। মন্টুদা—কে মন্টুদা ?

—দেখুন, আমি তো আপনাকে —

—চিনতে পারোনি—না ? কিন্তু আমি তোমাকে দূর থেকে দেখেই চিনেছি। সকলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারো—কিন্তু আমাকে নয়। কেমন ধরে আনলাম—দেখো।

একটা ভুল হচ্ছে—মারাত্মক ভুল ! বলবার চেষ্টায় বার দু'তিন হাঁ করল সুধাংশু।

—আহা-হা, আর চালাকি করতে হবে না। তোমাকে আমি জব্দ করতে জানি। বেশি দুষ্টুমি করো তো সব ফাঁস করে দেব—মেয়েটি মৃদু হাসল : দাঁড়াও—তার আগে তোমার চা করে আনি। দিনে এখনও সে পনেরোবার চা খাওয়ার অভ্যাসটি আছে তো ? না—রত্নার শাসনে এখন কমেছে একটু ?

রত্না ? এবার আর হাঁ-টা সুধাংশু বন্ধ করতে পারল না।

— ঐ দেখো, সাপের মুখে চুন পড়ল !—মেয়েটি সকৌতুকে হেসে উঠল।

গায়ে একটা জামা চড়িয়ে শশধর ফিরে এলেন। মেয়েটি একটুখানি নামিয়ে আনল মাথার ঘোমটা।

শশধর বললেন, তুমি তা হলে চায়ের ব্যবস্থা করো ওঁর জন্যে। আমি একবার ঘুরে আসি বাগ্‌দিপাড়া থেকে। দেখি বিল থেকে দুটো চারটে কই মাছ ওরা ধরে এনেছে কিনা !

—দেখুন শশধরবাবু—

—পরে দেখব মশাই। এখন সময় নেই—

শশধর বেরিয়ে গেলেন।

মেয়েটি হাসল ঃ পালাবার ফন্দি ? ও হবে না। অনেকদিন পরে ধরেছি তোমাকে। এখন চুপ করে বসো। আমি চা আনছি —

অতঃপর আবার সেই বিব্রত প্রহর যাপনের পালা সুধাংশুর। এ কী হচ্ছে—এ কোথায় এল সে ! মন্টুদা বলে তার কোনও নাম আছে একথা সে এই প্রথম শুনল ! এবং রত্না ! সেই-ই বা কে ? বারোর সাত ছকু খানসামা লেনে যে তার ঘর আলো করে রয়েছে, তাকেও তো সে এতকাল নিভাননী ওরফে বুলু বলেই জানত !

একটা ভুল হচ্ছে—ভয়ঙ্কর ভুল। ভুলটা ভেঙে দিয়ে এই মুহূর্তে তার ভদ্রলোকের মতো সরে পড়া উচিত।

কিন্তু —

কিন্তু চা আসছে এবং এ-সময় এক কাপ চায়ের নিমন্ত্রণ তুচ্ছ করবার মতো মূঢ়তাকে সে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। চা-টা খাওয়া শেষ হলেই এক ফাঁকে ঝোলাটা কাঁধে করে সে উঠে পড়বে। তারপর এক দৌড়ে শালবন ছাড়িয়ে ময়ূরাক্ষী পার হতে আর কতক্ষণ !

সামনে ফুলদানি থেকে গন্ধরাজের মৃদু সৌরভ ছড়াচ্ছে। শীতের ফুল ! সমস্ত ঘরে একটা রহস্যময় আমেজ ছড়িয়ে রেখেছে। পড়ন্ত বেলায় ঘরময় শীতল ছায়া ঘনাচ্ছে। মশার গুঞ্জন উঠেছে। র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে সুধাংশু অভিভূতের মতো বসে রইল।

ভেতর থেকে গরম ঘিয়ের গন্ধ আসছে। খাবার তৈরি হচ্ছে—এবং নিশ্চয় তারই সম্মানে। সুধাংশুর মুখে আবার লালা জমে উঠল। রিফ্লেক্স্ অ্যাকশন ! ঘই জিনিসটা লঘুপাক, কিন্তু চাঁপা কলা আর মোষের দুধও যে এমন অবলীলাক্রমে হজম হয়ে যায়—সে রহস্যই বা কার জানা ছিল ! চায়ের প্রলোভনটা আরও শক্ত পাকে জড়িয়ে ধরল ঘিয়ের গন্ধ। রাত্রে স্টেশনের হোটেলে তো জুটবে ট্যাঁড়শ-চচ্চড়ি আর কড়াইয়ের ডাল—এক টুকরো মাছ যদি পাওয়া যায়, তার স্বাদ মনে হবে পিস্‌বোর্ডের মতো। তার চাইতে এখান থেকে যথাসাধ্য রেশন নিয়ে নেওয়া যাক। হোক ভ্রান্তি-বিলাস, তবু ধরে নেওয়া যাবে এটা বাংলা দেশের পুরনো আতিথেয়তার নমুনা মাত্র।

গন্ধরাজের সৌরভ ছাপিয়ে লুচির গন্ধ আসছে। সুধাংশু প্রতীক্ষা করে বসে রইল।

একটু পরেই একহাতে সধূম লুচির থালা, আর একহাতে লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল মেয়েটি।

—এত কেন ?

—খাওয়ার জন্য।—মেয়েটি হাসল ঃ নাও—আর ভদ্রতা কোরো না। সামনেই গাড়ু-গামছা রয়েছে—ধুয়ে নাও হাতমুখ।

যা হওয়ার হোক। এস্‌পার কি ওস্‌পার ! মেঘনার ধারের সুধাংশু চক্রবর্তী আর বিস্মিত হবে না ঠিক করল। দেশ ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালানোর চরম বিস্ময়টাকেই যখন রপ্ত করতে হয়েছে—তখন শিশিরে আর ভয় নেই তার।

বেপরোয়া হয়ে লুচি-বেগুন ভাজায় মনোনিবেশ করল সে।

মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়েছিল, আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কত রোগা হয়ে গেছ আজকাল !

শুনে রোমাঞ্চ হয় যে সুধাংশুও একদিন মোটা ছিল !

মেয়েটি বললে, সেই দশ বছর আগে যখন রত্নাকে নিয়ে পালিয়েছিলে, সেদিন কত কথাই উঠেছিল গ্রামে, কিন্তু আমি তো জানতাম—যা করেছ, ভালই করেছ !

রত্নাকে নিয়ে পালানো ! হে ভগবান, রক্ষা করো ! সুধাংশুর গলায় লুচি আটকে আসতে লাগল। তাদের হেড্‌মাস্টার থাকলে এখন সাক্ষী দিয়ে বলতেন, স্কুলে বরাবর গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পেয়েছে সে !

—কাকিমা তো অগ্নিমূর্তি !—মেয়েটির চোখে স্মৃতির দূরত্ব ঘনিয়ে আসতে লাগল ঃ আমাকে এসে বললেন, কণা, তুই দুঃখ পাসনি। ওর কপালে অনেক শাস্তি আছে—দেখে নিস্। সত্যি বলছি মন্টুদা—বিশ্বাস করো আমাকে। আমি খুশি হয়েছিলাম। জাত বড় নয়—রত্না সত্যিকারের ভাল মেয়ে। আর তোমাকেও তো জানি। প্রাণে ধরে রত্নাকে তুমি কখনও দুঃখ দেবে না।

আহা, এই কথাগুলো যদি বুলু শুনত ! তার ধারণা, স্বামী হিসেবে যে বস্তুটি তার কপালে জুটেছে, পুরুষের অপদার্থতম নমুনা হচ্ছে সেইটিই ।

—সত্যি, রত্নার কষ্ট চোখে দেখা যেত না। সৎমা কী অত্যাচারই করত ওর ওপরে। কতদিন খেতে পর্যন্ত দেয়নি। তবু মেয়েটা মুখ ফুটে একটা কথা পর্যন্ত বলেনি কখনও। এমন ঠাণ্ডা লক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না। জাতটা কিছু নয় মন্টুদা—জীবনে সত্যিই তুমি জিতেছ :

অজানা-অদেখা রত্নার জন্যে এবারে সুধাংশুরও দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে পড়ে গেল, ঝগড়া কববার আগে কোমরে হাত দিয়ে বুলুর সেই দাঁড়ানোব ভঙ্গিটা।

লুচির থালা শেষ হতে সময় লাগল না।

—আর দুখানা এনে দিই মন্টুদা ?

—না—না—সর্বনাশ !

কণা বলে চলল, তোমার চেহারা বদলেছে মন্টুদা—কত ভারী হয়েছে গলার আওয়াজ। তবু আমি কি ভুল কবতে পারি ? সেই চোখ, সেই কোঁকড়া চুল, সেই মুখের আদল, সেই হাঁটবার ভঙ্গি। বাড়িব সামনে দিয়ে যখন ধর্মখোলার দিকে চলে যাচ্ছিলে, তখনই আমি চিনে ফেললাম ! তারপর উনি যখন স্কুল থেকে ফিরে এসে বললেন যে, কলকাতা থেকে বইয়ের এজেন্ট এসেছে, তখনই আর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। এখনও তো সেই বইয়ের কাজই করছ ?

—হু !—সংক্ষিপ্ততম উত্তরই সব চেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা।

—শোনো—কণার গলার স্বর নিচু হয়ে এল ঃ আমি ওকে বলেছি, তুমি সম্পর্কে আমার মামাতো ভাই। —কণা অর্থগভীর হাসি হাসল ঃ তুমি কিন্তু আসল ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়ো না—কেমন ?

—না—না !—সুধাংশু আন্তরিকভাবে মাথা নাড়ল ঃ তা কখনও বলতে পারি ! তা হলে আজ ববং উঠি আমি। রাত হয়ে যাচ্ছে—আমাকে আবার স্টেশনে যেতে হবে।

—বা রে, ভেবেছ কী তুমি ? এম্‌নি ছেড়ে দেব ? ওঁকে মাছ আনতে পাঠালাম—দেখলে না ? আমার রান্না খেতে তুমি কত ভালবাসতে—এরই মধ্যে ভুলে গেলে ? ও সব হবে না। যাও দেখি—কেমন যেতে পারো।

—কিন্তু বিছানাপত্র কিছু সঙ্গে নেই—

কণা গরিব হতে পারে, কিন্তু তোমাকে শুতে দেবার মতো একখানা লেপ আর একটা বালিশ তার জুটবে। বেশি ভদ্রতা কোরো না আমার সঙ্গে— বুঝেছ ?

বুঝেছে বৈকি সুধাংশু। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রতারকের একটা চমৎকার ভূমিকায় নেমে পড়েছে সে। এখন আর সহজে পালাবার উপায় নেই। শশধর তাকে কখনওই দেখেনি এবং কণা তাকে মন্টুদা বলে প্রমাণ করার জন্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অতএব জালিয়াতিটা অন্তত আজ রাতে ধরা পড়বে না। কাল ভোরেই তাকে পালাতে হবে—এবং এ এরিয়া ছেড়ে। তাবপরে অক্ষয়বাবু রইলেন আর সে রইল।

বাগানে টিনের গেট খুলে কে ভেতরে ঢুকল। পাওয়া গেল চটির আওয়াজ।

শশধর ফিরে এলেন। হাতের বাঁধা ন্যাকড়াটার মধ্যে উত্তেজিত দাপাদাপি চলছে।

উল্লসিত হয়ে শশধর বললেন, অতিথি-সেবার পুণ্যে আজ ভাল মাছ পাওয়া গেল কণা! দশটা বড় বড় কই।

কণার মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

—মন্টুদার ভারী প্রিয় মাছ। মনে আছে মন্টুদা—রেলের বাঁধের তলা থেকে একবার তুমি আর আমি ছিপ দিয়ে এক কুড়ি কই ধরেছিলাম ? তারপর বাড়িতে ফিরে মার হাতে সে কী পিট্টি !

শশধর সস্নেহ হাসি হাসলেন। ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারটায় ঃ ভাই বোনে মিলে খুব দুষ্টুমি হত বুঝি ? তা বেশ, কিন্তু শিবেনবাবুকে এখনও চা দাওনি ?

শিবেনবাবু ! সুধাংশু আর একবার ঢোঁক গিলল। নিজের নামটা প্রায় অষ্টোত্তর শতনামের গণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে।

—তুমি আসবে বলেই দেরি করছিলাম।

—দাও—দাও। —শশধর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঃ বিকেলের চা-তো এখনও জোটেনি ওঁর। কুটুম মানুষ—বদনাম গাইবেন।

—মন্টুদা খুব ভাল ছেলে—কারও বদনাম করে না—কণা ভেতরে চলে গেল।

খাওয়ার দিক থেকে কিছুমাত্র ত্রুটি হল না। বারোর সাত ছকু খানসামা লেনের সুধাংশু চক্রবর্তী এমন টাট্‌কা কই মাছ চোখে দেখেনি দেশ ছাড়বার পরে। এ অঞ্চল নাকি কাঁকরের জন্যে বিখ্যাত, কই চালে তো একটি দানা কাঁকরেরও সন্ধান পাওয়া গেল না !

শশধর গল্প করলেন অজস্র। দেশের কথা, স্কুলের কথা। যোগ্যতায় বি-এ ফেল হেড্‌মাস্টার নিশাকর সামন্তের পরেই তাঁর স্থান—এ কথাও ঘোষণা করলেন বার বার। শুধু সেক্রেটারির কুটুম ওই গজেন বিশ্বাস ! মামার জোরেই অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার—নইলে একটা ইংরেজি সেন্‌টেন্সও কারেক্ট করে লিখতে জানে নাকি ?

—আপনাকে ভাবতে হবে না মশাই। আপনি আমার কুটুম—গ্রেট্ ইণ্ডিয়ানের সব বই আমি ধরিয়ে দেব স্কুলে। ও দায়িত্বটা এখন আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।

বাইরে কন্‌কনে শীতের রাত। ভারী হাওয়ায় অসময়ের গন্ধরাজের গন্ধ। মাটির দেওয়ালে কেরোসিনের আলোর কাঁপনলাগা ছায়া। বিমিশ্র অনুভূতি বিজড়িত একটা স্তব্ধ মন নিয়ে সুধাংশু আধশোয়া হয়ে রইল লেপের মধ্যে। আশ্চর্য ! জীবনটা এত আশ্চর্য—কে জানত !

মন্টুদা ?

কণা এসে ঢুকল।

—জেগেই আছি। শশধরবাবু কী করছেন ?

—ওঁর তো এখন মাঝ-রাত। পড়া আর মড়া। শুনছ না— নাক ডাকছে ?—কণা খিল্‌-খিল্ করে হেসে উঠল ঃ ওই নাকের ডাকের ভয়ে পাড়ায় চোর আসতে পারে না।

সুধাংশু অপ্রতিভের মতো হাসল। টেবিলের পাশ থেকে চেয়ারটা নিয়ে বসল কণা। কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগল লণ্ঠনের বাড়ানো কমানো চাবিটা। কিছু একটা বলতে চায়—বলতে পারে না।

সুধাংশু সংকুচিত হয়ে আসতে লাগল মনের ভেতরে। আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখল কণার দিকে। এক কালে সুশ্রীই ছিল মুখখানা। এখন পরিশ্রম আর চিন্তার একটা ম্লান আবরণ ছড়িয়ে পড়েছে তার ওপরে।

তারপর ঃ

একটা কথা বলব ভাবছি মন্টুদা। বলব কিনা বুঝতে পারছি না।

—বলো। এত সংকোচের কী আছে ?

—না, তোমার কাছে সংকোচের আমার কিছুই নেই।—কণা ভেতরের দিকে মাথা ফিরিয়ে

একবার কী দেখল,যেন কান পেতে শুনল শশধরের নাকের ডাকটা। তারপর মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসল : রত্না অমন করে মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে তোমার ঘরে হাঁড়ি ঠেলার ব্যবস্থাই যে আমার পাকা হয়ে গিয়েছিল সে কথা কি তুমি ভুলে গেলে ?

সুধাংশু শিউরে উঠল। লণ্ঠনের আলোয় আশ্চর্য দেখাচ্ছে কণার চোখ। ঘন বর্ষার মেঘের মতো কী যেন টলমল করছে সেখানে। কণা বললে, ভয় নেই তুমি ভেবো না—আমি রাগ করেছি। আমি তো জানি রত্না কত ভাল মেয়ে !—কণার চোখ থেকে টপ করে এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল বুকের ওপর : আমি সুখে আছি, খুব সুখে আছি মণ্টুদা !—

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে কণা আবার হেসে উঠল। শ্রাবণের মেঘ-রৌদ্রের লীলার মতো তার হাসি-কান্না দেখতে লাগল সুধাংশু।

কণা বলে চলল, দশ বছর পরে দেখা, ভেবেছিলাম, কথাটা বলা ঠিক হবে না। তারপর ভেবে দেখলাম, পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলতে পারি।—গলার স্বর নামিয়ে কণা বললে, মণ্টুদা, কুড়িটা টাকা দেবে আমাকে ?

কুড়ি টাকা ! ক্যানভাসার সুধাংশু চক্রবর্তী সভয়ে নড়ে উঠল।

আঁচলের গিঁট থেকে একটা চিঠি বের করলে কণা। বললে, এইটে পড়ো।

সুধাংশু বিমূঢ়ের মতো হাত বাড়িয়ে নিল চিঠিখানা। বোলপুর থেকে কোন্ এক বিনু চিঠি দিয়েছে দিদিকে। তার ম্যাট্রিকের ফি এ মাসেই দিতে হবে—দিদি যেন একটা ব্যবস্থা করে দেয়।

হতবাক হয়ে চিঠিটার দিকে সে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

—অবাক হয়ে গেলে তো ? দশ বছর আগে যে ছোট্ট বিনুকে দেখেছিলে, সে আর ছোটটি নেই। ম্যাট্রিক দেবে এবার। ভাল ছেলে—ভাল করেই পাশ করবে। অথচ ফিয়ের টাকা নিয়ে মুশকিল। বাবার অবস্থা তো সবই জানো—কোনমতে আধপেটা খেয়ে আছেন। অথচ এদের কাছেও চাইতে পারি না। নিজেরই সংসার চলে না, তবু বাবাকে যখন পারেন দু পাঁচ টাকা পাঠান। এই কুড়িটা টাকার জন্যে ওঁকে আর কী ভাবে চাপ দিই বলো ?

সুধাংশু তেমনি নির্বাক হয়ে রইল।

কোমল গভীর গলায় কণা বললে, একদিন তোমার কাছে সবই আমার চাইবার দাবি ছিল মণ্টুদা। আজ সেই সাহসেই কথাটা বলতে পারলাম। রত্নাকে আমি সবই তো দিয়েছি—কণার চোখে জল চকচক করতে লাগল : মোটে কুড়িটা টাকাও কি আমি চাইতে পারব না ?

অভিনেতা সুধাংশুর কাছে অভিনয়টা কখন সত্যি হয়ে উঠল সে নিজেই জানে না। তেমনি গভীর গলায় সেও বললে, নিশ্চয় কণা—নিশ্চয়।

বালিশের তলায় রাখা মানিব্যাগটার দিকে হাত বাড়াল।

—এখুনি ?—কণা বললে, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। তুমি কলকাতা গিয়েও বিনুকে পাঠিয়ে দিতে পারো। ঠিকানাটা নিয়ে যাও বরং।

ব্যাগটা বের করে এনে সুধাংশু বললে, না—না। অঢেল কাজ নিয়ে থাকি, কলকাতায় গিয়ে ভুলে যেতে কতক্ষণ ? টাকাটা তুমিই রাখো কণা।

শীতের হাওয়ায় ঘরে গন্ধরাজের মৃদু সুরভি। দেওয়ালে ছায়া কাঁপছে। আশ্চর্য তরল কণার চোখ। জল গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু এবার আর সে তা মুছতে পারল না।

* * *

শাল-পলাশের বনে ভোরের কুয়াশা। পায়ের তলায় শিশিরভেজা ধুলো। ময়ূরাক্ষী আর কতদূরে ?

ঠাণ্ডা নরম রোদে—শালের পাতায় সোনালি ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে আর মন্থর পা ফেলে

চলতে চলতে হঠাৎ ক্যান্‌ভাসার সুধাংশু চক্রবর্তীর মনে হল—অভিনয়টা সত্যি সত্যি করেছে কে —সে—না কণা ? কে বলতে পারে, এই পরিচয়ের ছদ্মবেশটা কুড়িটা টাকা আদায় করার এক চক্রান্ত কিনা ?

কিন্তু তা হলে কি এত মিষ্টি লাগত গন্ধরাজের গন্ধটা ? এই সকালে কি এত সুন্দর দেখাত এ শাল-পলাশের বন ? আর সামনে—সামনে ওই তো ময়ূরাক্ষী। ময়ূরের চোখের মতোই সোন আলো-ছড়ানো কী অপরূপ নীল ওর জল।

এই কুড়িটা টাকার হিসেব সহজে বোঝানো যাবে না ব্যবসায়ী অক্ষয়বাবুকে। এ এরিয়ার কাজ সবই তো পড়ে রইল। আর অক্ষয়বাবু কড়া লোক।

এর ঋণ শোধ করতে হবে এক মাস রেশন না এনে, কণার চোখের জলের দাম শোধ করে দি হবে বুলুকে। পিঠের বোঝাটার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুধাংশুর। এত বই—রাশি রাশি বই শুধু চিনির বলদের মতো বয়েই বেড়ায় সে—তার নিজের ছেলের কর্পোরেশনের স্কুলে পড়াব খব জোটে না। তবু একজন তো ম্যাট্রিকের ফি দিতে পারবে—একজন তো কৃতী হতে পারবে জীবনে

কুড়িটা টাকার চেয়ে ঢের বেশি সত্য বুকের পকেটে এই গন্ধরাজ দুটো। অসময়ের ফুল। কাচে ফুলদানিটা থেকে চুরি করে এনেছে সুধাংশু—পালিয়ে এসেছে ভোরের অন্ধকারে। যে অন্ধকা ব্রজপুর একটা স্বপ্নমাধুরী নিয়ে পেছনে পড়ে রইল !

সামনে ময়ূরাক্ষী। কী আশ্চর্য নীল সোনালি ওর জল !

শারদীয় যুগান্তর ১৩৬১

সাইকেলের রেস

বাণী রায়

ছেলেটি চিরকাল চাঁদ চাইত।

পৃথিবীর বয়স হয়েছে নিঃসন্দেহে। পৃথিবী বড় প্রাচীন। অনেক দেখেছে সে—অনে শিখেছে। কিন্তু, চাঁদকে চাওয়া দেখে জোনাকির দুঃখে কতবার কেঁদেছে ?

তিন চার ভাই বোনের একটি ভাই দরিদ্র সংসারে। বাবা তাদের পাকিস্তানের রিক্ত ব্যবসায় কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটে। তার মধ্যে আছে রোগ, আছে দুর্ঘটনা। তার মধ্যে-চাঁদ চাওয়াব সখ কা সাজে?

ছেলেবেলা থেকে কিছু গম্ভীর, একটু বিষণ্ণ ও। মনে হ'ত যেন ওর অনেক প্রাপ্তিযোগ আছে জীবন বোধহয় ওরই সঙ্গে অকথ্য খারাপ ব্যবহার করছে। ভাগ্য একমাত্র ওকেই গাড়ি থেকে ঠেে ফেলে দিয়েছে। যেখানে যাবার, ও সেখানে যেতে পারছে না।

নড়বড়ে দেহ, অতটুকু ছেলের সবটাই বেমানান। প্রকাণ্ড কাঁধের ওপরে বসানো যেন একা বুড়োর মুখ। যদি শরীরের নীচের অংশটা ঢেকে কাপড় পরিয়ে, উঁচু টুলের ওপর ওকে দাঁড় করি দিত কেউ, মনে হ'ত মুখ দেখে এ অবশ্যই একটি ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধ নিঃসন্দেহে।

ওই যে বাচ্চা ছেলে, তারই গাম্ভীর্য কত। মেপে মেপে পা ফেলে। কথা বলে গম্ভীর বদনে। দে যায়, ছোটদের হৈ চৈ থেকে একটু দূরে বসে কী যেন ভাবছে একা একা। সারা শরীর স্থির, মুখে

পেশী শক্ত। শুধু মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে এক-একটা ঢিল তুলে ছুঁড়ছে নিরুদ্দেশে। ওইটুকু শিশুসুলভ চাপল্য না থাকলে মনে হ'ত এ বুঝি পথ-চলতি খোকা হঠাৎ ক্রুদ্ধ দেবতার শাপে বুড়ো হয়ে ওখানে বসেছে।

কী ভাবত ও ? সাতসমুদ্র তেরো নদীর কথা অবশ্যই নয়, আজকালের ছেলেমেয়ে ওসব ভাবে না। হয়তো ভাবত, পুরাণের স্বর্ণডিম্বপ্রসূ রাজহংসীকে যদি ও ধরতে পারে, তা হলে এক দিনেই সোনা পাবার কৌশল শিখে নেয়।

মা অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে ওকে একটু বিশেষ চক্ষে দেখত। বোধহয় তাদের মতো ও হুড়োহুড়ি করত না, তাদের মতো অসভ্য বিলাসে ওর রুচি ছিল না। একটু স্বতন্ত্র, একটু সুদূর গম্ভীর এই ছেলেটিকে মায়ের মাঝে মাঝে কাছে এনে গবিবেব সংসারে একটু বেশি যত্ন করতে ইচ্ছা হ'ত। কি বা সম্ভব ?

উনুনের ধারে বসে অন্য ছেলেমেয়ের চোখ এড়িয়ে মা চুপি চুপি ডাকত, "রূপো, এধারে আয় তো বাবা।"

দুর্লভ দিনে তেল ও বেগুন দুই-ই আছে। তাই বেগুন ভাজা হচ্ছে। মা প্রশ্ন করল, "খাবি একখানা গরম গবম ভাজা ?"

চোখ চকচকে হয়ে ওঠে, কণ্ঠার হাড় ওঠানামা করে। তবু সে হার মানে না, "বেগুন ভাজা শুধু মুখে কেউ খায় নাকি ? রেখে দাও ভাতের পাতে খাব ।" চলে যেতে যেতে দুর্বল শিশুত্ব দাবি জানায় একবার, "ওই বড়খানা আমাকে দিও, মা।"

মা আদর করে ডাকে, "রূপো রূপো !"

রূপীন চটে ওঠে, "রূপো বলো কেন ? রূপীন বলতে পারো না ?"

সান্ধ্য আকাশের তারার মতো মলিন হাসি মায়ের ক্লান্ত মুখে, "গরিবের ঘরে আমার সোনা তো নেই। তাই তোকে তবু রূপো বসে ডাকি। লোকে জানুক ঘরে রূপো আছে।" চুপ করে থাকে সে। মনে তার অতল সমুদ্রের স্বপ্ন, সোনার খনির স্বপ্ন। সোনা আনবে সে, সোনা আনবেই। সোনার রংয়ে মায়ের জগৎ মুড়ে দেবে সে।

কঠিন ছিল বোধহয় পণ। দুর্বল দেহের অন্তরে কোথাও দুর্বলতা ছিল না। সমস্ত কিছু জয় করে শক্ত হয়ে থাকে সে। কোনও জায়গায় একটুও হার মানবে না।

বাড়িতে কোনও খাবার এলে ভাইবোনেরা কাড়াকাড়ি, ছেঁড়াছেড়ি করে। ওর লোভে প্রাণ দিশাহারা হয়ে ওঠে। ওরা তো ভালমন্দ খেতে পায় না। কিন্তু, আস্তে আস্তে সরে যায় ও। ইতরামি করে ফেলে নিজেকে নষ্ট করা যেন ওর পোষায় না।

এমনি একটি ছেলের গল্প আজ শোনাতে এসেছি। জাতির আশা যারা, তারা তো বহু দিনই ধ্বংসের মুখে ! সাধারণ লোভ ও অভাবের পাকচক্রে সেইসব শিশুরা হয়ে পড়েছে, যা হওয়া উচিত নয়। আমাদের দিনের যত পাপ, তাদেরই কি স্পর্শ করছে ? তাদের দিকে তাকিয়ে চোখে জল আসে। মনে হয়, এই সব শিশুর দল, কিছুই তো দিতে পারিনি তাদের, তবু এতটা অধঃপতনও কি দেখতে প্রস্তুত ছিলাম !

এই মেরুদণ্ডভাঙ্গা, লোভী, নিম্নগামী কিশোরের দলে একজন তার নড়বড়ে মাথা যদি তুলবার চেষ্টা করে, তার দিকে চোখ পড়বেই।

শীতের মুখে সেবার অসুখে পড়ল। পাশের বড় বড় বাড়িগুলো বিরক্তিতে জেগে থাকে রূপীনের কাশি শুনে। ক্রমে একটু ভাল হ'ল ও, কাকাব অফিসের হোমিওপ্যাথ কেরানির সেধে দেওয়া ঔষধ খেয়ে। বাড়ির জানালার পাশে ময়লা বিছানায় শুয়ে থাকত, রাস্তা দেখত বসে বসে। কখনও বা ছেঁড়া ছবির বই।

আর ভাবত, ভাবত দিনরাত। সে কী ভাবনা ! শিশুর অত ভাবনা বিস্ময়কর।

চোখের সামনে ঘটে যেত কত কী। বাড়িওলার বাড়ি মা বেড়াতে যেয়ে বাচ্চা মেয়ের আবদারে দেওয়ালির বাজি আঁচলের নীচে লুকিয়ে বাড়ি ফিরছে। মায়ের অপরাধী লজ্জিত মুখও তাকে কোমল করতে পারেনি। ছেলের তিরস্কারে মা ছল্‌ছল্‌ চোখে বলল, "কী করব ? কালী পূজোর দিন ওরা একটাও বাজি পোড়াতে পারবে না—"

"কী দরকার ?" রূপো রুখে উঠল, "তাই বলে চুরি করতে হবে ? আমি—আমি বলছি আমি বড় হয়ে সব এনে দেব।"

প্রবল আবেগে কাশি উঠে এল রূপোর।

ছোট বোন ক্ষুদি ভেংচে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নাচল, "উনি আমাদের সঁব দেঁবেন, রোঁজ শোনান। ইল্লি ! তুই তো বড় হবি না। তুই ভুগে ভুগে মরে যাবি, হারু খুড়ো বলেছে।"

রূপোর সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভয় তার মৃত্যুকে শুধু নয়, জীবনের কাছে পরাজয় স্বীকারকে। তার পণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। নিশ্বাস তার শুধু নোনা ধরা দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে মরে যাবে, সোনার স্বপ্নকে বীজন করবে না।

তারপরে হয়তো জেদের বশেই ছেলেটি সেরে উঠতে আরম্ভ করল। বাবা রিক্ত ব্যবসায়ী। বিনা মূলধনে ব্যবসা করবার অমানুষিক চেষ্টায় পাকিস্তান ও কলকাতায় ছোটাছুটি করে। ওরা থাকে কস্‌বায়, বাবার বৈমাত্রেয় ভাই হারুর সঙ্গে অ্যাজবেস্টাজ-এর ছাদের নীচে দরমার বেড়া দিয়ে ভিন্ন হয়ে। হাতে থাকে না কিছু মায়ের। বাবা এসে খরচপত্র দিয়ে যায়। এমনি সময়ে রুগ্ন ছেলের একটা টনিক কিনে দিয়ে গেল।

টনিক-মাহাত্ম্যে হোক আর যে কারণেই হোক, রূপো সেরে উঠল এবং চলাফেরাও করতে লাগল। ছোট তক্তপোষে ময়লা বিছানা একটা জুটেছিল। সেখানে বসে পড়াশোনা করত, আবার চুপ করে ভাবত কত কী। কতদিন দেখা যেত সান্ধ্য তারার দিকে চেয়ে বিমনা হয়ে কত কী ভাবছে।

হয়তো ওর পণ ছিল সংসারে ভদ্রতা আনা। অর্থের অভাবে সংসার অভদ্র হয়ে গেছে। সেই সংসারকে আবার কী করে ভদ্র করা যায় ?

এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেল। রূপীনের দিদি মোহিনী বিদ্যায় ইতি দিয়ে ভাঙা হারমোনিয়ামে সুর-সাধনা করছে। ওপাশের বাড়ির নীরেনদা মাঝে মাঝে সুর বাতলে দিয়ে যায়।

দিদিটিকে রূপোর বড় স্থূল লাগত। অভাবের সংসারেও গায়ে দিব্যি পদার্থ আছে। নিজের হাতে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে জামা করে গায়ের খাপে খাপে। চোখে কাজল দিয়ে কপালে কুঙ্কুমের টিপ আঁকে। ঠোঁটে হাল্কা করে আলতা দেয়। পুরু-পুরু ঠোঁটে লালসার ভাব ফুটে ওঠে। শাড়ি যেন কেমন এলোমেলোভাবে গায়ে দিয়ে রাস্তার দিকের কপাটে এলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

মা দেখেও দেখত না। দেখেই বা ফল কী ? মুখে বোধ হয় জন্মক্ষণে মেয়েটির ছোঁয়ানো হয়েছিল হাড়ির কোদাল। সে মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য ?

"ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটার গোঁসাই।" ছড়া কাটে মোহিনী। মা চুপ করে থাকে। সত্যি তো, সোমত্ত মেয়ের কত সাধ-আহ্লাদ আছে। চারপাশে আজকাল কত কী দেখছে এরা। মা হয়ে কোনও সখ পূর্ণ করতে পারে না সে। চুপ করে চেয়ে দেখা ভিন্ন গতি কী ?

দু'বেলা ভাত-ডাল জোটে নিয়মিত বাবার প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে। যে নিরন্ন, সে চায় অন্ন। যার অন্ন জোটে, সে তো মনের স্বাভাবিক নিয়মবশে আরও কিছু চাইবেই।

চোখ মেলে দেখে মা, পাশের বাড়ির নীরেন আসছে গান শেখাতে। গানের শিক্ষা নেবার সময়ে ছাত্রীর গায়ে কাপড় থাকচে না ঠিকমত। ওস্তাদের চোখে কিসের পিপাসা ঝলসে উঠছে ?

এরি মধ্যে একদিন ঝুলন-পূর্ণিমায় পাশের মাঠে যাত্রা হ'ল। দেখতে গেল সকলে। জনারণ্যে যে

যার মতো হারিয়ে গেল।

রূপেনও গিয়েছিল সেখানে। বেশিক্ষণ ঐ ভিড়ে বসে থাকা সহ্য হ'ল না ওর। চার পাশের জনতা অতি সাধারণ। অসংস্কৃত রেফিউজির দল। এর মধ্যে নিজের মনের সোনার স্বপ্ন প্রতিমুহূর্তে ধুলো হয়ে যায় !

গ্যাসের আলো জ্বালা, ছেঁড়া শতরঞ্চের ফরাস। তার মধ্যে ঝরে পড়ছে রামায়ণ-মহাভারতের মণিমুক্তা। যে গ্রহণ করতে পারে, তারই জন্য। এখানে দূরে বসে হরি কর্মকারের স্ত্রী চোখ মুছে সাবিত্রীর যমগৃহ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার কথা শোনে—ওধারে হরি কর্মকারের স্ত্রীর উপপতি দু'হাতে তালি বাজায় যুধিষ্ঠিরের সত্যভাষণে। অহল্যার পাষাণ হওয়ার কাহিনী মিট্‌মিটে আলোয় বাতাসে ভেসে আসে দরমা-বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

রূপেনের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। লোকের ভিড়ে, তার দুর্বল শবীব এখনও সারেনি। বাড়ি চলে এল সে।

তারই তক্তপোষে—নীরেনদা আর দিদি ! মোহিনী এলানো চুল হাতে জড়িয়ে, শাড়ি গুছিয়ে উঠে বসল। নীরেন উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে চলে গেল। মোহিনীর হাতে টাকা।

রূপেন কোনও কথাই বলতে পারল না। কে যেন তার গলাটা রোধ কবে ধবল। সমস্ত জীবনের সাধনা তার দিদি যেন গুঁড়ো গুঁড়ো কবে ভেঙে দিল। অতি কষ্টে আকাশেব দিকে উঠেছিল সে, একটানে তাকে মাটিতে নামিয়ে আনল। পরের দিন সকালেই লক্ষ কবলে দেখা যেত রোগা ছেলেটির চোয়ালের হাড় জেগেছে। চোখের কালিব কুণ্ড আর একটু বেশি কালি হয়েছে। মুখের বেখাগুলো বাচ্চা বয়সেই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আরও একটু কঠিন হযেছে তাবা।

দৃঢ়সঙ্কল্প আরও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করল সে। তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই হবে। আব, তাবই মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবার পঙ্ক-গহ্বর থেকে উন্নীত হয়ে যাবে। আব তো দেবি কবা চলে না। ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে সকলে।

আর দেরি করা চলে না। স্কুল-ফাইনালের দেরি আছে। উচ্চ আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনায় ভাল ছিল না রূপেন। মফঃস্বলের ছেলে, তায় বারে বারে নীড়ভ্রষ্ট। সুতবাং একটু পশ্চাৎপদ। এছাড়া স্বাস্থ্যহীনতা মস্তিষ্কে ওর খোঁচা দিত। তাই মাথার ক্ষেত্রে যে কিছু হবে না—সে বুঝেছিল।

তবু, সেই কিশোর জ্বলে উঠতে চায়। একদিন যে নিভে যেতে হবে সকলকেই, সে জানে। জানে সে। তার চারপাশে দেখছে অবিরত মৃত্যু। মৃত্যু সেখানে মহত্ত্ব নিয়ে আসেনি। সেই অবিরাম নিভন্ত অনলে শেষ হয়ে যাবার আগে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে সে জ্বালিয়ে যাবে একবার দারিদ্র থেকে সম্পদের পথের আলো, দীনতা থেকে মহত্ত্বের আলো।

এমনি হয়তো অনেক কিশোর জ্বলে উঠতে চায়, জ্বালিয়ে দিতে চায়। তাদের আমি জাতির সম্পদ হিসাবে সঞ্চয় করতে বলি। কিন্তু সকলেই কি পারে মাথা তুলতে ? শতাব্দীর শ্রেণী-বৈষম্যের পীড়ন তাদের মাথার ওপরে জগদ্দল শিলার মতো চেপে বসেছে। সে মাথা তোলার শক্তি তারা হারিয়েছে।

কী করে নাম হবে ? নাম হ'লে তবেই তো জগতে স্থান হবে। স্থান হ'লে তবেই তো সোনার স্বপ্ন সফল হবে। কী করে সে ব্যতিক্রম এনে দেখিয়ে দেবে ?

কাকে দেখিয়ে দেবে ? জগতকে, প্রতিবেশীকে, দিদিকে, নীরেনকে দেখিয়ে দেবে সে সামান্য নয়। সে যে কোন্ দিকে অসামান্য তাই প্রমাণ করতে পাবলে যত গ্লানি, যত দুঃখ, সব কিছুর মোচন হয়ে যাবে।

এই সময়ে সাইকেল প্রতিযোগিতা হল কলকাতার বুকে। দেখতে গিয়েছিল সে। বিজয়ীকে ঘিরে সে কী উল্লাস, সে কী সম্মান প্রদর্শন ! কত উপহার, কত টাকা ! তারপর ভবিষ্যতে সোনার

শীলমোহর।

যানবাহনের মধ্যে একমাত্র সাইকেল রূপেনের আয়ত্তের মধ্যে। এই অর্থে যে, হারুখুড়ো বাসের পয়সা বাঁচাতে দুচাকা পায়ে চালিয়ে অফিসে যান। বাষ্পযানের ভিড়ে মানুষ-চালানো দু'চাকার গাড়ি।

মনে হত রূপেনের এই যে, কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে যাত্রা হারুখুড়োর দূরের পাল্লায়, কখন সে যাত্রা শেষ হয় ? জরাজীর্ণ সাইকেলে ততোধিক জীর্ণ হারুখুড়ো লাফিয়ে ওঠেন শুকনো পাতার মতো। তারপরে কাঁপা পায়ে একাগ্রচিত্তে সাইকেল চালান দেহের, মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন।

রূপেন কল্পনা করে, চারপাশে ঝক্‌ঝকে গাড়ি, গদিআঁটা বিদ্যুতের ট্রাম, বিরাট বাস, ল্যাণ্ডো-ব্রুহাম, অশ্ববাহিত, স্রোতের মতো চলছে। তারই মধ্যে ভিড় ঠেলে, অ্যাক্‌সিডেণ্ট বাঁচিয়ে মানুষ দু'পায়ের শক্তি দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। গন্তব্যস্থানে পৌছতে হবেই তাকে। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা! সাইকেলের রেস।

সাইকেলের রেসই ঘোরে মাথায় রূপেনের। হারুখুড়োর হাতে-পায়ে ধরে সাইকেল চালানো শিখেছে সে। জগতের যানবাহনের রেসে একমাত্র সাইকেল ওর আয়ত্তে।

স্থানীয় ছেলেরা একটা সাইকেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করল ছোটখাটোভাবে। বড় প্রতিযোগিতাটা তাদেরও অনুপ্রাণিত করেছে রূপেনের মতো। নাম দিয়ে বসল রূপেন।

হারুখুড়ো কিন্তু একদিনের জন্যও সাইকেল ধার দিতে রাজি হলেন না, "না বাপু, ও রেসে-টেসে সাইকেল দেওয়া চলবে না আমার। স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। সাইকেলটির কিছুমিছু হ'লে না খেয়ে গোড়াগুষ্ঠী মরতে হবে আমাকে। গাড়ির ভাড়া যুগিয়ে অফিসে যাওয়া রোজ, আমার ক্ষ্যামতা নেই।"

থু-থু করে থুতু ফেললেন হারুখুড়ো বিনা কারণে—"হঃ, এই আরশোলার মতো চ্যাহারা নিয়ে তুমি ছোঁড়া রেসে নাববে ! হঃ !"

মা বাধা দিল, "রূপো, বাবা আমার, এসব বুদ্ধি ছাড়, বাবা। এখনও যে শরীর তোর সারেনি। তোর বাবাও এখানে নেই।"

না থাক, বিজয়ী টাকা পাবে, পুরস্কার পাবে, সেটাই বড় কথা নয়। বিজয়ীর চিত্র যাবে পত্র-পত্রিকায়। অসাধারণ কাজ সে করেছে। সে সাধারণের উর্ধ্বে অবশেষে তো উঠতে পেরেছে।

কিন্তু নিজের সাইকেল নিয়ে যেতে হবে যে। অভ্যাসের প্রয়োজন নেই। দূরত্বে অগ্রগামীর প্রতিযোগিতা নয়। এ হচ্ছে এন্‌ডিওরেন্স-এর রেস্‌। কে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে দুই পায়ের এই শক্তির প্রতিযোগিতায়। কার শরীর কতটা সহ্য করে, ভেঙে পড়ে না। সহ্যের সীমার দুরন্ত কঠিন পরীক্ষা সাইকেলের রেস।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়লা বিছানায় ভাবছে রূপেন শুয়ে শুয়ে। অনেকদিন পরে আজ আবার মাথাটা ধরেছে ওর।

"নীরেনদার নূতন সাইকেলখানা চাইলে পাওয়া যায়।" আড় চোখে তাকিয়ে মোহিনী কেশসংস্কারের ব্যস্ততার মধ্যে বলে উঠল।

সেদিন থেকে ভাইবোনের কথাবার্তা বন্ধ। রূপেনের গা জ্বলে উঠল। কিন্তু, নয় কেন ? উপায়ান্তর নেই। নীরেনের চমৎকার নূতন সাইকেলখানা পেলে অবশ্যই রূপেন পারবে সহনশীলতার রেসে জয়লাভ করতে। নীরেনকেও তো দেখিয়ে দিতে চায় রূপেন। নয় কেন ?

সাইকেলের ব্যবস্থা হয়ে গেল। যেখান থেকে আঘাত, সেখান থেকেই সহনশীলতার চেষ্টা !

যথারীতি এল রেসের দিন। গেল চলে। এল পরের দিন। পাড়ার ছেলেরা দিন-রাত্রি জাগিয়ে

বাখল কোলাহলে।

"রূপেন চালিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা।" সোৎসাহ গুঞ্জন শোনা গেল চতুর্দিকে।

ওরই মধ্যে ভিড় জমে গেল। বড়দরের কিছুই নয়। আগের সেই সাইকেল রেসের সঙ্গে অনেক প্রভেদ। তা'হলেও নিশান উড়ল—পথে লোক দাঁড়াল। আর কী চাই ?

অবশ্য ধীরে ধীরে পথ জনশূন্য হ'তে লাগল—কাদা-মাটির মধ্যে কাগজের নিশান লুটিয়ে গেল। মুষ্টিমেয় প্রতিযোগীর মধ্যে নেমে পড়ে সিনেমায় যেয়ে বসল অনেকে।

এসব দেখার অবস্থা ছিল না রূপেনের। চোখ-কান-নাক প্রায় সবই বন্ধ তার তখন। কেবল মস্তিষ্কের মূর্ছাপন্ন নির্দেশ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে অলঙ্ঘ্য আদেশে এক অন্ধকার পথে। সে পথের শেষে কী আছে রূপেন জানে না। শুধু জানে পথ ছাড়া ওর গতি নেই। নেমে যেতে ও পারে না।

অনেক দূরে ক্ষেত্র। তবুও মা একবার এসেছিল। ছেলেকে দেখল দশজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। একদিনের মধ্যে চেহারা ছেলের বদলে গেছে। চামড়ার নীচে হাড় ক'খানা দু'চাকার গাড়ি আঁকড়ে রয়েছে শূন্যে। সামান্য যে ক্ষীণ মেদ-মজ্জা দেখা দিয়েছিল টনিক-মাহাত্ম্যে তা-ও ঝরে গেছে ধুলোর সঙ্গে মিশে। কয়েকটি ছেলে সঙ্গে চলছে পথ পরিষ্কার করতে করতে, আর ওকে পাহারা দিতে দিতে। চোখ বন্ধ করে মাতালের মতো টলে টলে চলেছে ছেলে। শাদা হয়ে গেছে আঙুলের গাঁট সাইকেল আঁকড়ে থেকে।

মা ডুকরে উঠল, "নেমে আয়, বাবা। চল, আমরা যাই। এমন সর্বনেশে রেসে দরকার নেই আমাদের।"

স্বেচ্ছাসেবকরা থামিয়ে দিল, "চুপ, চুপ। আপনার ডাক কানে গেলে ও দিশেহারা হয়ে পড়ে যাবে। আপনার ছেলের জন্যে আপনার গৌরব হওয়া উচিত। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আর একটু হ'লেই রেকর্ড ভাঙবে আমাদের রূপেন। আপনি বাড়ি যান, মা।"

মা অগত্যা চলে এল। সংসারে কাজ আছে। তা ছাড়া, ওই দৃশ্য সহ্য হয় না।

আসবার আগে শুধু আকাশে প্রার্থনা পাঠিয়ে গেল অসহায় মানুষী, ছেলের কল্যাণে। আকাশে উড়ছে চক্‌চকে উড়োজাহাজ। চারপাশে ছুটছে বিভিন্ন বাষ্প ও বৈদ্যুতিক যান। মধ্যে একা ছেলে তার পাল্লা দিয়েছে সাইকেলের রেসে।

এর পরে আর গল্প বলে কী করব ? যা বলব, অমনি পাঠক বলবেন, 'ঠিক ভেবেছিলাম। এমনি করেই শেষ হবে।'

পাঠক অনেক জানেন। জীবন দেখে হয়েছে তাঁর জ্ঞান। কিন্তু, আমিও যে ওই জীবন দেখেই লিখছি। অনিবার্য ঘটনা ভিন্ন আমিই বা কী লিখব ?

গরিবের ঘোড়ারোগ না হলেও সাইকেল-রেস্। উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয়নি উদ্যোক্তাদের। অর্থের অভাব। পথ পরিষ্কার করা ও পাহারাদারের আয়োজন ছিল অতি নগণ্য।

তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। তারাও ছোট, তারাও অর্ধাহারে ক্লান্ত—বিশীর্ণ। ছুটে-আসা লুবকির লরিখানা ঠিক সময়ে তারা রুখতে পারেনি। রূপেন অনেকক্ষণ ধরেই চোখে দেখতে পাচ্ছিল না।

মুখ থুবড়ে পড়ল ছেলেটা পথের ধুলোয়। ক্ষণিক-বিলাসে ধুলো রক্তরাঙা হয়ে উঠল। একটি বিত্ত ব্যবসায়ীর পিতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠল। এক মায়ের চোখের জলে উনুনের আগুন নিভে গেল। এক দণ্ডের জন্য ধূসর ধুলোতে গোলাপ ফুটল মানুষের রক্তে। ওইটুকু রং ধরাবারই সাধ্য ছিল সাইকেল-রেসের।

আমার গল্প শেষ হ'ল।

শারদীয় যুগান্তর ১৩৬০

জেন্টলম্যান

রঞ্জন

কথাটা মনে পড়ল সেদিন সকালে বাথরুমে! একটু অদ্ভুতভাবে। হাতে আমার টুথব্রাশ, সামনে টুথপেস্টের টিউব। মাসের শেষ, তাই টিউব প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। যখন ভরতি থাকে তখন আস্তে আমি ওটার লেজের দিকে চাপ দিই, আর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ টুথপেস্ট। কম নয়, বেশি নয়। কিন্তু যে-টিউব তার অন্তিম অবস্থায় পৌঁছেছে তার সাধ্য নেই অমন মিতাচারী হবার। তাই আমার ফুরিয়ে আসা টিউব সম্বন্ধে যখন আমার মনে সন্দেহ ছিল আধ ইঞ্চি পেস্টও তার মধ্যে আছে কি না, তখন স্বভাবতই আমি ওটার গলা টিপলুম জোরে, আর অমনি বেরিয়ে এল প্রয়োজনাতিরিক্ত টুথপেস্ট, প্রায় দু ইঞ্চি। অপচয় হল। কিন্তু আমার ততক্ষণে মাজনের কথা মনে ছিল না। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল অজিত ঘোষের মুখ। ওর দশা হয়েছে আমার ওই টুথপেস্ট-টিউবটার মতো। সবই প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে। বাকি যা আছে তা মাথায় এসে উঠেছে ওর সাধ্য নেই হিসেবি হবার। মাথার দিকে একটু টিপলে বেরিয়ে আসে বেহিসেবি দু ইঞ্চি।

* * *

অজিত ঘোষের টিউব যখন ভরতি ছিল তখন আমি ওকে জানতুম না। আমি ছাড়া প্রায় সবাই জানত। আজও কলকাতায় এমন প্রধান ব্যক্তি অফিসে ক্লাবে অল্পই আছেন যাঁদের সঙ্গে অজিত অন্তরঙ্গ নয়। ম্যাকনিল কোম্পানির নম্বর ওয়ান মিস্টার উইলিয়াম আর্চারকে অজিত বিল্ বলে ডাকে অনায়াসে। ওয়ালটার হ্যারিসন কোম্পানির বড় সায়েব আর সবায়ের কাছে অ্যান্টনি ক্যাম্বেল হতে পারে, অজিতের কাছে অনেক দিন থেকে টোনি বয় মাত্র। এর কারণ বোঝাও শক্ত নয়, কেননা অজিত ঘোষ প্রথম সারির একটা ম্যানেজিং এজেন্সির অফিসে প্রবেশ করেছিল এমন দিনে যখন ওই সব চাকরিতে অল্প ভারতীয়দেরই প্রবেশাধিকার ছিল। সরকারি চাকরিতে আই. সি. এস. বা আই পি যেমন এক দিকে আর আজকালকার আই. এ. এস. অপর দিকে, অজিতের সঙ্গে স্বরাজোত্তর নেতাজি সুভাষ স্ট্রিটের কালো সাহেবদের ব্যবধান ততখানি বা তার চেয়েও বেশি। অজিত শুধু য়ুরোপিয়ান কভেনান্টেড অ্যাসিস্টান্ট ছিল না, তার নিয়োগ হয়েছিল বিলাতে, যার নাম বোধ হয় হোম অ্যাপয়েন্টমেন্ট। অজিতের অধিকার ছিল এই চাকরিতে। ওর পিতামহ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, ওর বাবা ছিলেন স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় আই. এম. এস.-দের অন্যতম। ওর নিজের শৈশব কেটেছে ইংল্যাণ্ডে কোনও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাবলিক স্কুলে, ছুটি কাটত সুইজারল্যাণ্ডে বা দক্ষিণ ফ্রান্সে, পিতামহী ও পরে মায়ের সঙ্গে।

প্রথমে কাজ করেছিল হোম অফিসে, পরে বদলি হয় প্রথমে করাচি শাখায়, তারপরে বম্বেতে এবং সবশেষে, কলকাতায়। এটা অজিতের কাছে শোনা নয়, যাঁরা জানেন বলেন, অজিত এতদিন ওর কোম্পানির ডিরেক্টর হত নিশ্চয়ই। এখন ওর জায়গায় অন্য ভারতীয় আছেন।

এত কথা বলার প্রয়োজন ছিল এইটা বোঝাতে যে, এত উপরে ছিল বলেই অজিতের পরবর্তী পতনে এত শব্দ হয়েছিল, আজও এ সম্বন্ধে গল্প শোনা যায় এ-মহলে ও-মহলে। এত উপর থেকে পড়েছে বলেই ওর নিজের আঘাত লেগেছিল এত বেশি।

বাইরে থেকে অনেকের কাছে অজিত-পতন আকস্মিক বলে মনে হয়েছিল। এত বড় বাড়ি একদিনে ধসে যায় না। নীচে থেকে তার ভিত ক্ষয়ে যাচ্ছিল অনেক দিন থেকেই, কিন্তু অজিতের বাইরের জীবনযাত্রায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন কেউ দেখতে পায়নি। রেসে অজিতকে দেখা গিয়েছে

আগেকার মতো। তফাত যদি কেউ লক্ষ করত তবে শুধু দেখা যেত যে, অজিত আগের চাইতে একটু বেপরোয়া এবং দুটো রেসের মধ্যে সে 'বারে' যেন একটু বেশি সময় কাটাচ্ছে। ক্যালকাটা ক্লাবে আগেও অজিতের নিত্য উপস্থিতির কথা সবাই জানত। দু-একজন ছাড়া কেউ লক্ষ করেনি যে, অজিত আগে কেউ ডাব্‌ল্ চাইলে তাকে বর্বর মনে করত, এখন সে নিজেই ডাব্‌ল্ ছাড়া নেয় না। তারও কিছুদিন পরে বারম্যান জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আজ জিন কেন সাহেব ?' অজিত একটু জোর করে হেসে দিয়েছিল, 'আজ সুবেসে জিন পিতা থা, উসি লিয়ে। ঔর এক।'

অজিতের সমৃদ্ধিতে এই সামান্য ফাটল তার থ্রি হান্ড্রেড ক্লাবের বন্ধুরাও লক্ষ করেনি। সেখানে তার প্রতাপ যেমন ছিল তেমন আছে। বন্ধুদের দৃষ্টি সন্ধ্যার সামান্য পরেই আচ্ছন্ন না হলে তারা দেখত, অজিত বারোটার পর কী রকম যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। একটা প্রচ্ছন্ন কিন্তু অপ্রতিরোধ্য কিছু ওকে যেন সজোরে দমিয়ে রাখতে সর্বক্ষণ চেষ্টা করতে হচ্ছে। কারও চোখে পড়েনি এ-সব। তারা ভেবেছে, এমন হয় সবারই। কেউ কোনদিন বা কয়েক দিনের জন্য বেশি খায়, তারপর কম। অজিত যে মাসের পর মাস ওই অধিক পানের পর্যায়ে থেকে গিয়েছে তা বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, তার প্রধান কাবণ তার উদারতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ঠিক আগেকার মতো সে সই করেছিল বন্ধুদের জন্য। দেড়টা দুটোর সময় কেউ যদি যাবার কথা বলত অজিত তাকে গায়ের জোরে ধরে রাখত। অজিত যে সত্যি তার সঙ্গ চায় না, শুধু নিঃসঙ্গতাকে ভয় পায়, এটা সঙ্গীদের মনে না হলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না নিশ্চয়ই।

দিনের বেলায় অজিত অফিসের কাজ কবত। এই কাজের গুণাগুণে যদি কোনও তারতম্য ঘটে থাকে তা বাইরের লোকের জানার কথা নয়। দু-চারজন সহকর্মী লক্ষ করেছিল, অজিত বেশির ভাগ দিন বাইরে লাঞ্চ খাচ্ছে। কেউ মন্তব্য করেনি, কেননা এমন হওয়া বিস্ময়কর নয়। অজিতকে কিছুটা এন্টারটেন করতেই হয়। দু-চারজন কেরানি লক্ষ করে থাকবে, অজিত লাঞ্চের পরে একটু বেশি মেজাজ গরম করে। বলা বাহুল্য, তাদের কারও সাহস ছিল না এ নিয়ে কথা বলবার। শুধু নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে, ঘোষ সাহেব যেন আজকাল মাত্রা একটু চড়িয়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যাক, অজিতের পতনের পরে কেরানিরা এই সময়কার ঘটনাগুলির উপর অনেক প্রলেপ দিয়ে অনেক রসাল কাহিনী রচনা কবেছে। কেরানিদেরও দোষ দেওয়া উচিত হবে না, তার বন্ধুরাও পরবর্তী কালে প্রচুর কাহিনী রচনা করে তার অনুপস্থিতিতে পরিবেষণ করে পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।

* * *

কিন্তু আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক। রেসে বেশি হেরেই হোক, বা স্টক এক্সচেঞ্জে বেশি লোকসান দিয়েই হোক, অজিতের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। অফিসের কাজে মন বসাতে পারে না। বাইরে টাকা রোজগারের প্রাণান্তকর চেষ্টায় অজিত এমন কয়েকটা কাজ করতে বাধ্য হল যা কিছুদিন আগেও পাবলিক স্কুলের সন্তান অজিত ঘোষের পক্ষে একান্তই অভাবনীয় ছিল।এমনই সময় তার সর্বনাশ সম্পূর্ণ করবার জন্য তার স্ত্রী জয়া কলকাতা ছেড়ে চলে গেল দিল্লিতে তার বাবার কাছে। অজিতের দশা হল সেই নৌকার মতো যা থেকে মাঝি লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়েছে প্যারের দিকে।

জয়াকে দোষ দেবার অধিকার আমার নেই। আমি তাকে কখনও দেখিওনি। আমি শুধু ঘটনার বর্ণনা করেছি নৌকার উপমা দিয়ে, মাঝিকে দোষ দিতে নয়। এর পরেই অজিত কয়েকদিন আর অপিসে গেল না। অফিস থেকে যখন টেলিফোন এসেছিল তখন সে বাইরে। অফিসেও খবর কিছু কিছু পৌছল বড় সাহেবের কানে। তিনি প্রথমে এসব গ্রাহ্য করেননি। অজিত তাঁর প্রিয়পাত্র। সাহেবের নেশা রাগ্‌বির আর রাগার খেলতে অজিত ছিল উৎসাহী ও পারদর্শী। কিন্তু ক্রমে সাহেব অধৈর্য হলেন। আরও খবর নিয়ে বিব্রত হলেন। এখন তিনি করবেন কী ? বরাবর তিনি ভাল রিপোর্ট

দিয়ে এসেছেন অজিত সম্বন্ধে। এখন কী করে ফিরিয়ে নেবেন সব কথা ? অথচ কিছু ব্যবস্থা না করেও উপায় নেই। ক্রমে অজিতের দুর্নাম উপচে পড়বে কোম্পানির নামে। তার আগেই অজিতকে নিয়ে একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কী করে ? এদিকে দেখাও নেই অজিতের।

এই দিনগুলির ইতিহাস একটু অস্পষ্ট। শুধু এই জানি যে, কয়েকদিন পরে বড় সাহেব একটি চিঠি পান অজিতের। অজিত পদত্যাগ করেছে। পদত্যাগপত্রের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছে, সে এখন বিপদে পড়েছে। কিন্তু এই বিপদ নিয়ে সে কোম্পানিকে বিব্রত করবে না। তার সায়েবকে তো নিশ্চয়ই নয়, তাই এই পদত্যাগ। তাড়াতাড়ি গৃহীত হলে বাধিত হবে। তা ছাড়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি পেলে সুবিধা হয়।

সায়েব যতটা দুঃখিত হলেন প্রায় ততটাই আশ্বস্ত হলেন। কোনও একটি ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট যেন কী বলতে গিয়েছিল অজিতের সম্বন্ধে। সাহেব ধমকে বললেন, 'আই অ্যাম সরি ফর অজিত, বাট ডোন্ট ফরগেট, টু দি লাস্ট হি হ্যাজ প্লেড দি গেম, ইন রিজাইনিং লাইক দিস হি হ্যাজ এগেন অ্যাক্টেড অ্যাজ এ জেন্টলম্যান। হি হ্যাজ ডান এক্‌জাক্টলি হোয়াট হিজ স্কুল উড হ্যাভ উইশ্‌ড্।'

* * *

'জেন্টলম্যান'—এই কথাটা অজিতের সম্বন্ধে আমি যে কতবার শুনেছি, তার ইয়ত্তা নেই। এই পাবলিক স্কুলের তৈরি জেন্টলম্যানের কথা আমি ইংরেজি উপন্যাসে প্রবন্ধে পড়েছি। অজিতের সঙ্গে দেখা হতে তাই আমার কৌতূহল স্বভাবতই জাগরিত হল। প্রত্যক্ষ পরিচয় হোক জেন্টলম্যানের সঙ্গে। যদি কেউ বলে এটা আমার জন্মগত স্নবারির অন্যতম পরিচয়, তবে সে ভুল করবে। জেন্টলম্যান কথাটা খাস বিলেতেই বিদ্রূপের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তাকে দেখা যায় কার্টুনে বা হাসির গল্পে। দ্বিতীয়ত আমার সঙ্গে অজিতের দেখা হয় তখনই যখন তার জেন্টলম্যানত্ব অন্তিমে এসে উঠেছে, আমার সেই টুথপেস্টের টিউবের মতো।

খাতে খাতে বলি। অজিত তখন ক্যালকাটা ক্লাবে পোস্টেড, কেউ বলে আড়াই হাজার, কেউ সাড়ে তিন। থ্রি হান্ড্রেড ক্লাবে তার প্রবেশ নিষেধ। প্রথম কারণ, বাকি হাজার ছয়েক। আর দ্বিতীয় কারণ, শেষদিনে সে মত্তাবস্থায় মাবামারি করেছিল কোন রানার সঙ্গে। অজিতের স্বাস্থ্য সহস্র রজনীর লক্ষ অমিতাচারেও ভেঙে পড়েনি। নাক ভেঙেছে রানার। ক্লাবে ক্লাবে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সব ক্লাবের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল অজিতের মুখের উপর। শুধু ক্লাবগুলির নয়, অনেক বন্ধুর বাড়িরও। অজিত তখন একা। সঙ্গী খোঁজে আপন বন্ধুশ্রেণীর বাইরে। সেখানে জেন্টলম্যান নেই, ভদ্রলোক আছে। কিন্তু ক্লাস ওআর থাক্। অজিতের জেন্টলম্যানত্বের পরিচয় আমি খুব স্পষ্টভাবে কখনও পাইনি। কিন্তু ওকে আমার খারাপ লাগত না। ওর ব্যবহারে একটা স্বাভাবিক সৌজন্য ছিল। ও বিলাতি হোটেলে গিয়ে এমনভাবে অর্ডার দিত যেন হোটেলের মালিকই অজিত ঘোষ। বেয়ারারা ওকে দেখেই বুঝত ও সায়েবের জাত, আদেশ দেওয়াই ওর অভ্যাস। বেয়ারারা পছন্দ করে এই জাতকে। এরা আট আনা বকশিশ দিলে যে সেলাম পায়, তা নবাগতদের জোটে না দ্বিগুণ বখশিশ দিলেও। দ্বিতীয়রা বেশি বখশিশ দিলে তারা ভাবে, নতুন কিনা, আমাদের কিনতে চায় টিপ্‌স্ দিয়ে, বোকা কোথাকার। অজিতের আরও গুণ ছিল। ও গল্প জানত ভূরি ভূরি। ইংরেজিতে যাকে স্মাটি গল্প বলে তার স্টক ছিল ওর বিরাট, ওর নির্ভুল উচ্চারণে সেই সমস্ত কাহিনী বলে ও হাসাতে পারত সবাইকে। আমাকেও। মোদ্দা কথা আমি ওকে পছন্দ করতুম। পছন্দ করতুম এতদূর পর্যন্ত যে, ও যে দু-তিনবারে আমার কাছ থেকে শ দুয়েক টাকা ধার করেছে তা ধার দেবার সময় আমার আদৌ মনে হয়নি।

* * *

পরে জেনেছি আমি অজিতের একমাত্র উত্তমর্ণ নই। মাসের পর মাস চলে গিয়েছে, অজিত ধার

শোধ তো দেয়ই নি, তার উল্লেখমাত্র করেনি কোনও দিন। সমস্ত বিষয়টাই যেন অশ্লীল, ভাল্গার। টাকা-পয়সা নিয়ে আলোচনা করবে, যাদের টাকা-পয়সা নেই, এই মধ্যবিত্ত বা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। জেন্টলম্যান তার সঙ্গে পর্যন্ত টাকা রাখে না, কেননা তার সই গ্রাহ্য হয় সর্বত্র। অজিতের এই অবস্থা ঘুচে গিয়েছে অনেককাল, কিন্তু অভ্যাসটা যায়নি। এদিকে আমারও এই শ দুয়েক টাকার আসন্ন কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাই তাগাদা দিইনি। তবু ভাল লাগত না। যার পকেটে পয়সা নেই, সে কেন রোজ রোজ অন্যের পয়সায় মদ খাবে ? যার নিজের সাধ্য নেই অন্যের আতিথ্য ফিরিয়ে দেবার, সে কেন গ্রহণ করবে সকলের আতিথ্য ?

ইতিমধ্যে একদিন কার কাছে যেন শুনলুম যে, অজিত গত শনিবার রেসে গিয়েছিল এবং সেখান তিন শো না অমনি কত টাকা হেবে এসেছে। এমন খবরে আমার খুশি হবার কথা নয়। আমি তাই অজিতের এক ভূতপূর্ব বন্ধুকে বললুম, বস্তুত সে-ই আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল অজিতের সঙ্গে, 'অজিত আমার কাছ থেকে দু'শো টাকা ধার করেছিল বেশ কয়েক মাস আগে। সেটা ফিবিয়ে না দিয়ে, হি হ্যাজ নো বিজনেস টু গো অ্যাণ্ড লুজ মনি অ্যাট দি রেসেস।'

বন্ধু বলল, 'তোমার তো মাত্র দু'শো টাকা। আরও কতজনের কাছে ওর কত ধার তার ঠিকানা নেই। হয়তো হঠাৎ হাতে পেয়েছিল শ তিনেক টাকা। সে ওর ধারের সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। তাই নিশ্চয়ই ভেবেছে, রেসে গিয়ে ওই টাকাটা বাড়ানো যাক, অন্তত দু-চারজনের দেনা শোধ করে নতুন ধার নেবার পথ করা যাবে।'

আমার তখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। আমি সোজা আমার টেলিফোনের কাছে গিয়ে অজিতকে ডাকলুম।

'হ্যালো।'

'ঘোষ হিয়ার।'

সেই গলা, যেন অজিত এখনও অমুক কোম্পানির সবচেয়ে সিনিয়র ভারতীয় অ্যাসিস্টান্ট। আমার নাম আমি ঘোষণা করলুম।

অজিত বললে, 'আহা ! যুগ যুগ ধরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তারপর, কী খবর ? আজ সন্ধ্যায় কী করছ ?'

সন্ধ্যায় অজিতের সঙ্গে সাক্ষাতের অর্থ আমার অজানা ছিল না। আমি তাই একটু ইতস্তত করে বললুম, 'তা অনেকদিন দেখা হয়নি। কিন্তু, কিন্তু, তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। আমার—'

অজিত আমার কথা শেষ হতে দিল না। বলল, 'আজ সন্ধ্যায় বাড়ি থাকবে ? আমি চলে আসব, এই ধর এইটিশ, কী বলো ?

একটু নিরাশ হলুম, কিন্তু সাধারণ সৌজন্য বিনিময়ের পরে সম্মতি জানিয়ে টেলিফোন রেখে দিলুম। মনে মনে স্থির করলুম, সন্ধ্যায় অজিত এলে সকল সংকোচ শিকায় তুলে টাকাটা দাবি করব। অজিতের বন্ধুর কাছে ফিরে এসে বললুম, 'দি সেম ওল্ড অজিত ! অ্যাণ্ড ভেরি ক্রাফ্‌টি টু। আমাকে কথাটা তুলতেই দিল না।' অজিতের বন্ধু বলল, 'না, ও বুঝেছে তুমি ধারের কথাটা বলতে সংকোচ করছ। তোমার ওই এম্‌ব্যারাস্‌মেন্ট বাঁচাবার জন্যই তোমাকে বলতে দেয়নি। আজ সন্ধ্যায় এসে অন্তত কিছু টাকা তোমায় নিশ্চয়ই দিয়ে যাবে। ভুলো না, অজিত ইজ এ জেন্টলম্যান।'

জেন্টলম্যান ! আমার বিরক্তি বাড়ল।

* * *

অজিত এল সেই সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে। আমার একটু দেরি হয়েছিল ফিরতে। কিন্তু আমার বেয়ারার সঙ্গে অজিতের দোস্তি। আমি এসে দেখি, বেয়ারা বাড়ি নেই, আমার বসবার ঘরে অজিত আরামে বসে আছে। মাথার ওপরের পাখাটাই শুধু খোলেনি, কাছের আর একটাও। মুখে সিগারেট ;

সামনে আমার সিগারেটের টিন খোলা, তাই বঝুতে কষ্ট হয় না কার সিগারেট পুড়ছে। বুঝে কষ্ট হয়।

আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে অজিত বলল, 'আমি একটু পাঠিয়েছি তোমার বেয়ারাকে।' তারপর বেশ কিছু সময় নিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে যোগ করল, 'তোমার ফ্রিজে দেখলুম একদম বরফ নেই। আমি বাবলুকে টেলিফোন করে দিয়েছি কিছু বরফ দিতে।'

অজিত এমন স্বাভাবিক স্বরে কথা বলছিল, এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে চলাফেরা করছিল যে, আমি তাকে প্রায় ঈর্ষা করলুম। আমি কেন এমন স্বাভাবিক হতে পারি নে ! এতটুকু এদিক থেকে ওদিক হলে কেন আমার ভাবনার শেষ থাকে না ? কোথাও একটা বিল দিতে দেরি হলে কেন ভেবে মরি ? অথচ অজিতকে দেখো। তার অন্যতম উত্তমর্ণের সঙ্গে কেমন অবিশ্বাস্য স্বাভাবিকতার সঙ্গে ব্যবহার করছে ! আমারই বাড়িতে এসে এমনভাবে কথা বলছে যেন বাড়িটা ওরই। আমিই যেন আগন্তুক শুধু তাই নয়, আমার সন্দেহ হল, আমিই ওর কাছ থেকে টাকা ধার করেছি, না ও আমার কাছ থেকে ? এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্য নিজের কাছে কবুল না করে পারলুম না—না, পাবলিক স্কুলের শিক্ষা সম্বন্ধে বর্তনাম প্রগতিশীল মত যাই হোক না কেন, সেখানে ওটা চিরকালের মতো গেঁথে দেওয়া হয় যে, তুমি দুনিয়ার মালিক। তুমি কারও চেয়ে হীন নও, হেয় নও। প্রভুত্বে তোমার জন্মগত অধিকার। নেতৃত্বে তোমার দাবি প্রশ্নাতীত। আর সব মানুষ 'মেন', তুমি অফিসার। এই গুণ সওদাগরি অফিসে যেমন দেখা যাবে, তেমনি দেখা যাবে ক্লাবে, আবার ঠিক তেমনি দেখাতে হবে বার্মার অঞ্চলে বা ডুবন্ত জাহাজে।

এই ডুবন্ত জাহাজের সঙ্গে অজিতের তৎকালীন অবস্থার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য তার নিজেরও অজানা ছিল না নিশ্চয়ই। কিন্তু সে যে ক্যাপ্টেন তাতে কারও সন্দেহ করবার অবকাশ ছিল না। অজিতকে এমন 'মাস্টার অব দি সিচুয়েশন' আমি অনেক দিন দেখিনি। আমার তাই টাকার সামান্য প্রশ্ন উত্থাপন করবার কথা মনেও এল না। আমি প্রায় হেসে বললুম, 'কী ব্যাপার, য়ু সীম টু বি ফুল অব বীনস্।'

'হোয়েন হ্যাভ আই নট বীন ? কথাটা বলে অজিতেরই মনে হল, একটু সংশোধন চাই। বলল, 'মাঝে কয়েকটা মাস বাদে।' আবার অট্টহাস্যে যোগ করল, 'কিন্তু সে সব শেষ হয়ে গেছে। অনেক দিন আমার কোনও পার্টি হয়নি। গত জন্মদিনে আমি কাউকে খাওয়াইনি। তুমি আমায় খাইয়েছিলে। আজ আবার একটা গ্র্যাণ্ড পার্টি হবে, যেমন এক সময় হত ক্যালকাটা ক্লাবে বা থ্রি হান্ড্রেডে প্রায় ওহো ! তোমাকে তো বলাই হয়নি। দেবদান—অব্ ছত্তিশগড়— হো হো—রাত তিনটের সময় আমি ওকে বডিলি তুলে বাড়ি পৌঁছেছিলুম। বর্ধমানকে জিজ্ঞেস কোরো, আমার অন্য একটা ফেমাস পার্টিতে রুনুর কী অবস্থা হয়েছিল। রুনু অব্ সেরাইগাঁও।'

* * *

এগুলি অজিতের পক্ষে চাল নয়। সত্যি ওর অতীতে এমন সহস্র পার্টির স্মৃতি ওর মনে এখনও গাঁথা হয়ে আছে। এখন গায়ে একটা বুশ শার্ট, পরনে খাকি ট্রাউজার্স, কিন্তু জুতো পুরনো হলেও চকচকে। অনেকগুলি ভাল অভ্যাস ওর সুদিনের সঙ্গে বিদায় নেয়নি, দুর্দিনের উপহাস হয়ে বেঁচে আছে। আমি ওর স্মৃতি মন্থনে বাধা দিয়ে বললুম, 'আজকের পার্টি মানে ? কোথায় ? কাকে কাকে বলেছ ?'

'এইখানে, রাইট্ হিয়ার। আমার ফ্ল্যাটের চেহারা এখন এমন নয় যে, ভদ্র কাউকে ডাকতে পারি। তাই তোমার এখানে আসতে বলেছি, এখনই এসে পড়বে। হয়তো এখন যে লিফ্ট্ উঠছে সেটাতেই দু-চারজন আসছে।'

অবাক কাণ্ড ! আমার বাড়িতে অজিতের পার্টি ! একবার অনুমতি নেবার কথা ওর মনে হয়নি ! ওই যে আগেই বলেছি, অজিত পাবলিক স্কুলের সন্তান। ও পৃথিবীর মালিক। আমি শুধু একবার বললুম, 'একটু আগে বলতে হয়। কোনও ব্যবস্থা নেই, কোনও আয়োজন নেই।'

অজিত বলল, 'আমি তোমার বেয়ারার সঙ্গে সব ঠিক করে ফেলেছি। মায় খাবার পর্যন্ত।' ঘড়ি দেখে বলল, 'সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। বাবলু শুড হ্যাভ বীন হিয়ার উইথ দি হুইস্কি বাই নাউ।'

অজিতের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবলু এল। তার পিছনে লিফ্‌টম্যান আনল একটা পরিচিত আকার ও ছাপের কাঠের বাক্স। অজিত জিজ্ঞাসা করল, 'সোডা কোথায় ?'

'লিভ ইট টু মি, বস্। লিফ্‌টেই আছে।' বাবলুর ওই অভ্যাস। যে ওকে খাওয়াবে, তাকেই বস্ বলবে। ও বাঙালি হলেও লাহোরে পড়েছে। তাই অনেকগুলি পাঞ্জাবি অভ্যাস ওর চরিত্রে এসে গিয়েছে। কিন্তু অজিতকে অনেক দিন কেউ বস্ বলেনি, বাবলুও না। অজিতের ভাল লাগল।

ধারের কথাটা আমার তখন ঠিক মনে ছিল না বোধ হয়, কিন্তু ভাল আমার লাগছিল না। কী দরকার ছিল এই পার্টির ? তা ছাড়া অজিতের পার্টি সম্বন্ধে আমি যা জানতুম তাতে অস্বস্তি বাড়ছিল বৈ কমছিল না। নিজের বাড়িতে ও-রকম পার্টি হয়, ভাড়াটে ফ্লাটে নয়। আমার ডান দিকের ফ্লাটে থাকেন একটি ফিরিঙ্গি পরিবার, ভদ্রলোক ক্যাথলিক অ্যাসোসিয়েশনের উৎসাহী কর্মী। আমার বাঁ দিকের ফ্লাটে থাকেন মদ্র এক বড় চাকুরে, রেলওয়ের বোধ হয়। তাঁর বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে যে শব্দ কানে আসে তা আমোদের নয়, পুজোর ঘন্টার। এঁরা সব কী বলবেন ?

কিন্তু আমার কিছু করবার উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে অজিতের দশজন বন্ধু এসে হাজির হয়েছিলেন। ছ বোতল হুইস্কি এসে গিয়েছিল। পর্যাপ্ত সোডা। যাঁরা জলের সঙ্গে খান, তাঁদের জন্য জল। বরফ। খাবার। একজন অতিথি ছিলেন সংগীতে উৎসাহী। তিনি এসেই আমার রেডিওটা খুলে দিয়েছিলেন। আরেকজন অতিথি ছিলেন, নিজে গায়ক। তিনি হিন্দি উচ্চাঙ্গ সংগীত ধরেছিলেন। কথারও কমতি ছিল না, বলা বাহুল্য। সব মিলিয়ে তাই হচ্ছিল, যা এমন পার্টিতে হয়ে থাকে।

* * *

অজিত নিজেকে অবহেলা না করে অভ্যাগতদের দেখাশোনা করছিল। কিন্তু কথা বলছিল না বেশি। পাঁচ বোতল যখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন রাত সাড়ে দশটা। যারা যেতে চাইল অজিত তাদের বাধা দিল না। হাসতে হাসতে 'গুড বাই' বলল। গৃহস্বামী হিসাবে আমি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করলুম তাদের লিফ্‌ট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে। একে একে সবাই গেল, বাকি রইল অজিত, তার এক বন্ধু (যার নামটা আমি ধরতে পারিনি), আর আমি। আর সর্বশেষে বোতলের সিকি বা তারও কম। অজিত পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাতের উপর হাত রেখে বলল, 'আই থিংক ইট হ্যাজ বীন এ ফাইন পার্টি, ডোন্ট য়ু এগ্রি ?'

আমি আন্তরিক সম্মতি জানালুম। অজিতের বন্ধুও। লোকটি দেখতে একটু বোকা-বোকা, বেশি কথা বলে না।

এবার অজিত তার বন্ধুর দিকে চেয়ে বললে, 'নাউ ফর এ স্পট্ অব্ বিজনেস্।'

আমার তখন ব্যবসায় সংক্রান্ত কথায় কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না। আমি তখন ক্লান্ত। তাই নীরব রইলুম। তা ছাড়া কথাটা আমাকে বলা নয়।

অজিত বলল, 'তার আগে একটা লাস্ট ড্রিঙ্ক হোক।'

আমি জানতুম আপত্তি বৃথা। তাই গেলাস এগিয়ে দিলুম। অজিত তিনটে গ্লাসে সমান ভাগে ভাগ করে শেষ হুইস্কি পরিবেশন করল : 'নাউ ফর দি রিচুয়াল।'

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বলতে হবে না অনুষ্ঠানটি কী। অজিত একটা দেশলাই ধরিয়ে কাঠিটা শূন্য বোতলে ফেলে দিতেই হুস্ করে একটা শব্দ হল, জানা গেল ভিতরে খাঁটি জিনিস ছিল। পর পর ছটা বোতলের সশব্দ ময়না-তদন্তে আমি আমার প্রতিবেশীদের কথা ভাবছিলুম। কিন্তু অনুষ্ঠানের যে একটা প্রতীকমর্ম ছিল, তা আমার জানবার কথা নয়।

সবশেষে অজিত আবার চেয়ারে বসল সোজা হয়ে, বলল, 'নাউ ফর দি বিজনেস্।' অজিতকে

দেখে তখন আমার মনে হল, সত্যি সে একদিন বড় বিলাতি অফিসে বিভাগীয় বড় সাহেব ছিল। চাকরি গেছে, কিন্তু আর সব কিছু বজায় আছে। সেই বিশাল চেহারা, সেই গম্ভীর স্বর, সেই ইংরেজি অ্যাকসেন্ট।

* * *

'কানু, আমার বন্ধু বিশেষ অবশিষ্ট নেই।'

পানে মানুষ একটু ভাবপ্রবণ হয়। ভদ্রলোক বললেন, 'বেশি আছে কি না জানি নে, তবে একজন নিশ্চয়ই আছে।'

'নেমলি ?'

'মী।'

'ভেরি ওয়েল, আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?'

'নিশ্চয়ই।' ভদ্রলোক ব্যবসায়ী। সতর্কতার সঙ্গে একটু পরে যোগ করলেন, 'এনিথিং রিজনেবল।'

'যদি বলি, কারও কারও কাছে অনুরোধটা পুরোপুরি রিজনেব্‌ল না-ও মনে হতে পারে?'

'লুক অজিত, য়ু নো, আমি পাঁচ পুরুষ বড়লোক নই। আমি নিজে গত বিশ-বাইশ বছর কী করেছি, তা আন্দাজ করা তোমার পক্ষে নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। তারপর কিছু টাকা গেছে ব্যারাকপুরের বাড়িটায়। অতএব আমার সংগতির মধ্যে যা সম্ভব—আমার যা যা কমিট্‌মেন্ট আছে— তা আমি নিশ্চয়ই করব।'

'ডোন্ট গেট মি রং। আমার অনুরোধে তোমার আর্থিক ক্ষতি হবে না আশা করি।'

'না, না, আমি তা ভাবিনি। আমি শুধু—'

অজিত হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'আচ্ছা, আমার স্বাস্থ্যটা কেমন আছে ? এত অনিয়ম ও অমিতাচারের পরও ?' বলে অজিত একবার তার রাগবি-খেলা কব্জি ঘোরাল। বুকের ছাতি স্ফীত হল। সত্যি ওর স্বাস্থ্যটা দেখবার মতো।

বন্ধু কানু তারিফ করে বললে, 'চমৎকার স্বাস্থ্য। আমি বলব এ-ওয়ান।'

'গুড্।'

অজিত এক চুমুকে তার গেলাস শেষ করে বলল, 'এই চিঠিটা নাও। সীল করা আছে। এরই মধ্যে আমার অনুরোধ আছে। কাল অফিসে যাবার আগে এটা খুলতে পারবে না।

কানু হেসে বলল, 'দ্যাটস্ ফানি। কাল কেন ?'

অজিত রহস্য হালকা করে বলল, 'শুধু এইজন্য যে, অফিস যাবার আগে আমার অনুরোধ সম্বন্ধে কিছু তুমি করতে পারবে না।' হেসে যোগ করল, 'আমি জানি, তোমার চেক-বই তুমি বাড়িতে রাখো না।'

কানু এবার আর হাসল না। তার মনে সন্দেহ ছিল না, আমারও না, যে, অজিত আরও একটা ধার চাইছে। অজিতের সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাই কি স্বাভাবিক নয় ?

কানু বলল, আচ্ছা, কথা দিলুম, কাল অফিসে যাবার আগে তোমার চিঠি খুলব না।'

এর কিছুক্ষণ পরেই কানু বিদায় নিল। আমি ক্লান্ত বলে ক্ষমা চাইলুম। লিফ্‌ট্ পর্যন্ত গেলুম না। অজিত যেমন ছিল তেমনি বসে রইল। আমি ভাবছিলুম এবার উঠলে তো হয়। আমার আবার কাল অফিস আছে।

অজিত বলল, 'যদি কিছু মনে না করো, আই'ল্ হ্যাভ অ্যানাদার ড্রিঙ্ক। হ্যাভ য়ু গট সাম হুইস্কি ইন দি হাউস ?'

কিছু ছিল। অজিতের এমন আতিথেয়তার পরে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করব কী করে ? কিন্তু আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছিল। বললুম, 'তুমি নিজেই বের করে নাও প্লিজ, আমি উঠতে পারছি না।'

অজিত ধন্যবাদ দিয়ে উঠল। নিজের গেলাসে যা ঢালল, তার নাম পাতিয়ালা পেগ। আমি দেখেও দেখলুম না। অজিত বলল, 'এবার তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'বলো।'

'তোমাকে একটা পোস্ট-ডেটেড চেক দেব, ফর দি ফুল অ্যামাউন্ট। আর তুমি আমায় গোটা দুয়েক টাকা দেবে, ফর দি ট্যাক্সি। বাবলু আমার চেঞ্জটা ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেছে।'

আমি অফিসের ট্রাউজার্স পরেই বসে ছিলুম। পকেট থেকে ক্লান্ত হয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে আমি অজিতকে দিলুম।

অজিত একটা সীল-করা খাম আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও, এটা অবশ্য চেক নয় ঠিক, ববং হুণ্ডি বলতে পারো। পরশু টাকাটা পাবে, কার কাছে ইত্যাদি লেখা আছে এর মধ্যে। তার আগে খুলো না কিন্তু।'

আমি বললুম, 'দ্যাটস্ অল রাইট্।'

অজিত উঠলে, আমি বললুম, 'গুড বাই।'

আমি লিফ্‌টের কাছে গিয়ে হঠাৎ কী মনে করে জিজ্ঞেস করলুম, 'আচ্ছা, এই কানু কে ? একে আগে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।'

'না। তুমি বোধ হয় দেখো নি।'

'কী করে ? কোন্ অফিসে ?'

'না, ও চাকুরে নয় তোমার মতো। ওর নিজের বড় ব্যবসা আছে, যদিও নামকরা নয়—ব্যবসা এক্সপোর্টের।'

আমি আর কিছু জানতে চাইলুম না। বললুম, 'গুড নাইট্।'

লিফটে নামতে নামতে অজিত বলল, 'গুড বাই।'

* * *

এবার ফিরে আসা যাক আমার বাথরুমে। সেইখানে আমার টুথপেস্টের টিউবে চাপ দিয়ে অজিতের কথা মনে হয়েছিল।

পরপ্রভাতে আমার মাথা ধরেছিল। আমি স্নান সেরে অফিস গেলুম। তারও পরের দিন অজিতের চিঠি খুলে দেখলুম।

'আমার বন্ধু কানাই গুপ্তকে এই চিঠি দেখালে, সে তোমাকে দু'শো পঞ্চাশ টাকা দেবে। রসিদ দিতে হবে না। ঋণ এতদিন শোধ দিতে পারিনি বলে ক্ষমা চাইছি। আরও অনেকের কাছেই আমার এই রকমের ধার আছে, মোট প্রায় হাজার কুড়ি। মোটামুটি এই রকম অঙ্কই কানাই দেবে বলে আশা করছি। আমার স্বাস্থ্য ভাল।'

'আর-একটা অনুগ্রহ চাইব। তুমি টাকা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। আর-কিছু জানতে চাইবে না। আমার কী হল তাও নয়, তা হলেই আমার জন্য বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে।'

'কানাই কেন টাকা দেবে তাও নয়, তা হলেই তোমার বন্ধুর অন্তিম উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো হবে।'

'না, যাবার আগে তোমার কাছে সত্য গোপন করব না। কানাই এক্সপোর্টের ব্যবসা করে। কী বপ্তানি করে শুনলে তুমি শিউরে উঠবে। কিন্তু সেন্টিমেন্টাল হয়ো না, এর চেয়ে নৃশংস ব্যবসাও আছে, শুধু সেগুলোতে আড়াল আছে আর আমার বন্ধুর বেলায় তা নেই। সে মানুষ মারে না। মরা মানুষের শব চালান দেয় বিদেশে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। আমি ব্যবস্থা করেছি কাল বিকালের মধ্যে আমার শব ওর কারখানায় যাবে। ওর এজেন্ট আমার ফ্লাটে আসবে ভোর চারটেয়, তাই তোমার পার্টি থেকে দুটোর আগে আমায় বেরুতেই হবে।'

'কানাইকে লেখা চিঠিতে দুটি শর্ত করেছি। এক, আমার সমস্ত দেনা ও শুধবে। তাতে যদি ওর লাভের মার্জিন একটু কম থাকে তা হলেও। আমি জানি ও আমার কথা রাখবে, মান রাখবে।'

'দুই, আমি ওকে বলেছি, আমার শরীর হার্ড কারেন্সির বদলে ও আমেরিকায় পাঠাবে না। আমার এ-অনুরোধ ও রাখবে। আমার বাসনা ছিল, দক্ষিণ-ফ্রান্সে মরা। একটু সংশোধিত আকারে সে-বাসনাও পূর্ণ হতে চলল। পৃথিবীকে আমি ভোগ করেছি। তাই এমন নিমকহারামি করব না যে, বলব, যেতে কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু বেশি খেদ নেই। সান্ত্বনা, দুর্নাম নিয়ে বিদায় নিচ্ছি না। বোলো আমি ভদ্রলোক ছিলুম।

এ-গল্পে সে কথাটাই বলা রইল।

শারদীয় দেশ পত্রিকা ১৩৬২

চি নে মা টি

সন্তোষকুমার ঘোষ

শশী বলল, মেমসাহেব খুব ভাল। দয়ার শরীর। চ,' তোকে এখুনি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

কুঞ্জ বলল, এখন থাক শশীদা। পরে। বরং মাটি কুপিয়ে নিই আরেকটু।

শশী বলল, না রে। বাইরের লোক বাগানের কাজে হাত দিলে সাহেবের বড় গোসা হয়। আগে ঘরের লোক হয়ে যা। তখন সব তোকে শিখিয়ে দেব। কেয়ারি করা। জল ঢালা, ইস্তক সব ফুলের নাম।

—সব ফুলের নাম শশীদা ?

—সব। চ' এবার,—শশীদা বলল, ভয় কিসের। মেমসাহেব সাহেব হলেও মেম তো। মেম মানে হল গিয়ে মেয়েমানুষ।

উলের কাঁটা থামিয়ে চোখ তুললেন মেমসাহেব। —কী শশী ?

দণ্ডবৎ বিনয়ে শশী বলল, একে নিয়ে এলাম। আমার দেশের ছেলে। এখানে এক দিদির বাড়ি থাকত, জামাইবাবু তাড়িয়ে দিয়েছে। যদি কাজে ভর্তি করে নেন। সাহেবের খাস খানসামার কাজ একে দিয়ে বেশ হবে।

মেমসাহেব বললেন, আচ্ছা তুমি একে রেখে যাও। আমি দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করে দেখি।

সেলাম করে শশী বেরিয়ে যেতেই কুঞ্জর বুক টিপঢপ শুরু হল। সামনের একটা দেয়ালের আয়নায় ছায়া পড়েছে দু'জনের, সিল্ক-ঢাকা মোমের একটি মূর্তির পাশে ধুলোকালো ঝাঁকরাচুল এক ছোকরার। কুঞ্জর দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করছিল, সে ধপ করে বসে পড়ল মেমসাহেবের পা ঘেঁষে।

সাদা ধবধবে দু'টি ননীনরম পা, আলগা ছুঁয়ে একটি হরিণাজিন চটি। কুঞ্জ তখনও কাঁপতে থাকল।

মেমসাহেব বললেন, আহা, মাটিতে বসলে কেন।

তাহোক, মাটিতেও কুঞ্জ কিছু কম সুখে নেই। মাটি কই, কার্পেট ; মেঝের লজ্জা ঢাকে, মানুষের পায়ের শব্দ ঢাকে। আর এখান থেকেও তো উড়ে উড়ে পড়া সিল্কের গন্ধ পাচ্ছে কুঞ্জ ; মৃদু ঝিমঝিমে,

কে জানে কী এসেন্স। দীর্ঘ দুটি ভুরুর নীচে দুটি চোখ, গলার একটা ভাঁজে ঈষৎ স্পষ্ট পাউডারের দাগ। মেমসাহেব বললেন, এখানে কোথায় থাকতে তুমি ?

—পটলডাঙ্গায়।

—দিদির কাছে ? কেমন দিদি ? জামাইবাবু তাড়িয়ে দিল ? কী কাজ করে তোমার জামাইবাবু ?

কুঞ্জ একটা ছাপাখানার নাম করলে।

আরও দু'একটা টুকটাক কথা জিজ্ঞাসা করলেন মেমসাহেব।

বোধহয় খুশি হলেন। উলকাঁটা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন, দীর্ঘশিখা দেহ, আঁচল কুড়িয়ে নিলেন।

—বেশ আজ থেকেই কাজ করবে তুমি।

শীর্ষরক্তাভ শুভ্র আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে পলক পড়ল না কুঞ্জর। এত সুষমা থাকতে পারে শরীরের গঠনে ? চকিতে বকুলদির কথা মনে পড়ল। ধোঁয়াজ্বালা রান্নাঘরে বাটনা বেটে বেটে ক্ষয়ে যাওয়া কটি আঙুল, থেতলানো, ভোঁতা। এই সতেরো বছর পর্যন্ত যত মেয়েমানুষ দেখেছে কুঞ্জ, তাদের কারুর সঙ্গে এই মেমসাহেবের তুলনা নেই—এই সুষমা, এই মহিমা, কোথায় পাবে তার চোখ-বসে-যাওয়া, কণ্ঠ-উঁচু, হাড়কালি, স্বামীর ভয়ে জুজুবুড়ি বকুলদি।

কুঞ্জ বলল, আমাকে রাখলেন মেমসা'ব ? কিন্তু, কিন্তু সাহেব—

মেমসাহেব হাসলেন,—সাহেবের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার কথাই শেষ কথা। সাহেব কিছু বলবেন না।

ঠিক তখুনি বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

তালিম দেওয়াই ছিল। মশ্‌মশ্ আওয়াজ হতেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, কাঠপুতুল, জোড়াগোড়ালি অ্যাটেনশন।

—কে ?—চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, অর্ধমনস্ক পাখাটাকে পুরোদম করে দিয়ে।

ইন্দ্রাণী বললেন, নতুন লোক। বহাল করলুম আজ থেকে। উড়েটাকে দিয়ে কোনও কাজ পাওয়া যেত না।

চৌধুরী বললেন 'ও', শুনলেন কিনা সন্দেহ, টুঁটিটেপা টাইটাকে ঢিলে করতে গলায় হাত দিলেন।

কুঞ্জর হাত ততক্ষণ সাহেবের জুতোর ফিতেয় পৌঁছে গেছে। চৌধুরী সাহেব বাধা দিলেন না, কৌচে গা ঢেলে দিয়ে বললেন, বেশ চটপটে।

খাওয়া শেষে চৌধুরী সাহেব বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটান, ঠিক ওলটান না, পাখাতেই ওলটায়, সাহেব ধরে থাকেন মাত্র, কয়েক মুহূর্তের ঝিমুনি, ঘোড়াঘুম। মেমসাহেব সেই অবসরে পশমের কাঁটা নিয়ে বসেন, পায়ের কাছে কুকুরটা মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গকুণ্ডলী।

কুঞ্জ বারান্দায় এল। বিকেলবেলার একটুখানি রোদ, বাগানের ঝাউ গাছের পাতার পাহারা এড়িয়ে যতটুকু পড়তে পারে। দেয়াল ঘেঁষে একটা লতা, টকটকে ফুল। তারপর যতদূর চাও, শুধু ফুল, যত্ন করে লাগানো, কুঞ্জ নাম জানে না। এখানে ওখানে ছোট গাছ, বেশি বাড়েনি, কিন্তু স্তবকের মতো, সমান করে ছাঁটা। আজ আট মাসের ওপর কুঞ্জর চুলে কাঁচি পড়েনি, কিন্তু এ গাছগুলোর দশ আনা চার আনা ছাঁট নিয়মিত।

আস্তে আস্তে কুঞ্জ নেমে এল নীচে, সাবধানে, ঘাস বাঁচিয়ে সুরকিপথ ঘেঁষে। এ-বাগানে ঘাসেরও চাষ হয়।

শশীর ঘরে তখনও টোয়েন্টি নাইনের ধুম। এ পাশের বাংলো থেকে এসেছে সতীশ ওপাশ থেকে মধু, সামনের বাড়ির ড্রাইভার নিত্যানন্দও।

কুঞ্জকে দেখে শশী উঠে এল।

—কিরে, ঠিক হল কিছু ?

কুঞ্জ হাসি-হাসি মুখে সব বললে।

কেমন-বলেছিলাম-কিনা ঢঙের মাতব্বরী গলায় শশী বলল, তা তুইও তো কম হাঁদা না। মেমসাহেব তোকে রাখলেন, তুই আবার সাহেবের কথা তুলতে গেলি কেন। আরে হাঁদারাম, একি তোদের আমাদের ঘরের বৌঝি পেয়েছিস যে সোয়ামীর মত না নিয়ে এক পা চলা নেই ? আমাদের মেমসাহেব হলেন স্বাধীন, নামে মাত্তর ইস্ত্রী। উনি ক'টা সমিতির পিসিডেন জানিস ?

কুঞ্জ জানত না, বড় বড় চোখে চেয়ে রইল।

শশী বলে গেল, এখানে বরাত জোরে টিকে যাস যদি, সব জানবি। শুধু আমাদের মেমসা'ব কেন, লেডি অপর্ণা, মিসেস চাকলাদার এঁদের সব্বাই। এঁরা সব অন্য জাতের জেনানা বে ! তুই এখন ফিরে যা। সাহেবেব বেরোবার সময় হয়েছে।

সাহেব বেরোলেন না বেরোলেন ইন্দ্রাণী। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, হাই তুললেন ছোট্ট কবে, পেশীর কুঞ্চন ঢাকতে একটা হাত মুখের সমুখে ধরলেন।

তারপর যে-হাতে মুখের কুঞ্চন ঢেকেছিলেন সেই হাতের ইশারায় ডাকলেন কুঞ্জকে।

কুঞ্জ ছুটে এল। কুঞ্জর গন্ধ পেয়ে ঘর থেকে ছুটে এল লুপি। যে হাতের ইশারা করে ইন্দ্রাণী ডেকেছিলেন কুঞ্জকে, সেই হাতের ইশারেতেই চুপ করতে বললেন কুকুরকে। কুঞ্জকে বললেন, অত শব্দ করে ছোটে ? লুপি ভয় পেয়েছিল। সাহেবের যদি ঘুম ভেঙে যেত ।

লজ্জা-ভয়ে কুঞ্জ বলল, ও।

ওকে দিয়ে দু'একটা টুকরো কাজ করিয়ে নিলেন মেমসাহেব। তারপর কক্ষান্তরে গিয়ে নতুন বেশে পরিবর্তিত হয়ে এলেন। বললেন আমি একটু বেরুচ্ছি কুঞ্জ। তুমি একটু বসো। ঘুম ভাঙলে সাহেবের যদি কিছু দরকার হয়।

মেমসাহেবের বেরিয়ে যাবার পরও ঘরে এসেন্সের গন্ধ রইল। উনি গিয়ে গাড়িতে পা দিলেন, অমনি ইঞ্জিন প্রাণবন্ত হল ; সিটে মাথা এলিয়ে দিলেন, অমনি চাকা গড়াতে শুরু করল। পেট্রোলেব গন্ধে চাপা পড়ল এসেন্সের গন্ধ, তারপর দুটোই মিলিয়ে গেল, কুঞ্জর চমক ভাঙল তখন।

একটু পরেই ঘুম ভাঙল সাহেবের। চোখের কোণ অল্প অল্প লালচে। আস্তে আস্তে বার দুই ডাকলেন, ইন্দু ইন্দু।

সাড়া না পেয়ে বড় চোখ মেললেন। দেখলেন কুঞ্জকে।

—মেমসাব কই রে।

—এক্ষুণি তো বেরুলেন।

মেমসাহেবের ভয় করেনি, করছে কুঞ্জর। সাহেবের হুকুম না নিয়ে বেরিয়েছেন, যদি সাহেব খেপে যান।

সাহেব কিছু করলেন না, শুধু বললেন, এক্ষুণি ? ক'টা বেজেছে। সাড়ে চার—তাই তো।

নিজেই ঢুকলেন গোসল ঘরে।

এই গল্পটা কুঞ্জ ক' দিন পরে রসিয়ে-রসিয়ে কবেছিল বকুলদির কাছে।

কপাল খুলে গেছে কুঞ্জর। সাহেবের কখন কী দরকার হয়, সেই জন্যে খাসদালানের বারান্দার কোণে একটা কুঠুরিতে ওকে আস্তানা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়। দুটো কামিজ কিনতে ওকে পুরোপুরি দশ টাকার নোট দিয়েছেন মেমসাহেব। তার কথাটাই হাজারবার ব্যাখ্যান করে শোনাল কুঞ্জ। কেমন সোজা, কেমন স্বাধীন। একলা-একলা বেরিয়ে যান গাড়ি করে। কাকস্য পরোয়া।

গালে হাত দিয়ে শুনছিল বকুল। সব শেষে বলল, অথচ তোর জামাইবাবুকে না বলে সিনেমায় গেছলাম বলে সেবার আমাকে কী মারটাই না মেরেছিল, তোর মনে নেই কুঞ্জ ?

মনে আবার নেই।

ঘোড়া-গাড়ি করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে একদল লোক সকালের দিকে সিনেমার হ্যাণ্ডবিল বিলি করে গিয়েছিল ; তারই একটা কুড়িয়ে রেখেছিল বকুলদি। বেলা পড়তেই দেখিয়েছিল কুঞ্জকে। চট করে দুটো টিকিট নিয়ে আয় তো ভাই।

—টাকা ?

সে বন্দোবস্তও বকুলদি করেছে বৈকি। পুরনো কাপড় আর ফুটো বাসন বেচে আজই পেয়েছে টাকা—নগদ দুটাকা দশ আনা। এ-টাকার খবর প্রাণকৃষ্ণ রাখে না।

কুঞ্জর তবু হাত সরে না, পা পড়ে না। বলল, জামাইবাবু জানলে বকবেন।

—টের পেলে তো।—বকুল ভরামুখ হেসে বলল,—কদিন থেকে ওভারটাইম খাটছে, রাত দশটার আগে বাবু ফেরেনই না। আমরা তার আগেই ফিরে আসব, দেখিস। বিকেলের রান্না সেরে দিইচি, ফিরে এসে দু'খানা রুটি সেঁকে নেব'খন।

সেদিনই প্রাণকৃষ্ণ ফিরেছিল তাড়াতাড়ি। পুরোঘন্টা কাজ শেষ হতে ছুটল ওভারটাইমের লিস্টি দেখতে। নাম নেই। মেজাজ গেল বিগড়ে। শালা, দুটো পয়সা উপরি আয়ের যদি জো থাকে। মুখ দেখে দেখে খাতিরের লোক বেছে বেছে লিস্ট তৈরি হয়। ফিরে এসে বাড়িতে দেখে বৌ নেই। সিঁড়ির ধাপে বসে একটার পর একটা বিড়ি টেনেছে প্রাণকৃষ্ণ।

সেই বিড়ির আগুন কুঞ্জ দেখতে পেল গলির মুখ থেকেই। বুঝলে বেগতিক। বুকের ভেতরটা হিমহিম লাগল। একটু খোলাবাতাস পুরে নিতে কুঞ্জ পিছিয়ে রইল।

গ্যাসের আলো গলির ইদিকে নেই। একটা কেরোসিনের ডিবে আছে, সেটা আবার রোজ জ্বলে না। তবু দেখতে পেলে প্রাণকৃষ্ণ শক্ত করে ধরেছে বকুলদির চুলের মুঠি, রাবণ যেমন করে সীতার ধরেছিল। হিড়হিড় করে প্রাণকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল বকুলদিকে।

অনেকক্ষণ পরে পা টিপে টিপে ফিরে এসেছিল কুঞ্জ। সারাটা রাত রকে শুয়েই কাটল। আকাশের গায়ে কাঁটা দেওয়া অজস্র তারা। কিন্তু সেদিকে তো চোখ নেই কুঞ্জর। ওর নিজের গায়েও কাঁটা দিয়েছে ! হয়তো কার্তিকের হিমে ; হয়তো অনেকক্ষণ ধরে বকুলদির কান্না শুনে শুনে।

পরের দিন, প্রাণকৃষ্ণ কাজে বেরিয়ে গেলে বকুলদি ওকে কালো কালো দাগ দেখিয়েছিল। শুধু তাই না। নাকে, গালে, কানের লতিতে অনেকগুলো ছড়ে যাওয়া দাগ।

—জামাইবাবু বুঝি দেয়ালে তোমার মুখ ঘষে দিয়েছিল বকুলদি ? গলাটাকে করুণ করে কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করেছিল।

ফিক করে হাসল বকুল,—দূর বোকা, এসব দাগ অন্য জিনিসের। তুই বুঝবি না। একটু থেমে বলল, এ হল ভালবাসার। ভালবাসারও আঁচড় পড়ে জানিস ?

কুঞ্জ তখনও অবোধ চোখে চেয়ে চেয়ে আছে দেখে বকুল বলল, সত্যি কাল আমাদেরই দোষ হয়েছিল ভাই। মেয়েমানুষ, সোয়ামীর অধীন। কত্তার হুকুম না নিয়ে আমাদের বেরুনো উচিত হয়নি।

দিদি মানে হল বকুলদি—পাড়া সম্পর্কে। বয়সে বছর দুই-এর বেশি বড় না। আগে বুঝি কুঞ্জ নাম ধরেই ডাকত, সেই পুকুরে চান করা, ফুল তোলা, ফলচুরি করার আমলে। তারপর বকুলের বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র প্রাণকৃষ্ণ কলকাতায় চাকরি করে।

বিয়ের পর একবার বাপের বাড়ি ফিরে গেল বকুল, চওড়াপাড় শাড়ি, মোটা টানা সিঁদুর।

দু'বছরের বড় তো ছিলই, আর যেন বছর দুই বয়স বাড়িয়ে এল।

ভাই বোনের খাতার পাতা ছিঁড়ে বকুল বরকে ভারী ভারী চিঠি লিখত; সেই চিঠি ডাকে দিতে হত কুঞ্জকেই। খামের ওপরে যত্ন করে লেখা ঠিকানাটা দেখে দেখে ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

এবারে কলকাতা পাড়ি জমাবার আগে সেই ঠিকানাটুকু কাগজে লিখে এনেছিল কুঞ্জ। রাস্তাঘাট ঠাহর হতে হতে লাগল দিন চারেক। এ ক'দিন ফুটপাতে শুয়েছে, খেয়েছে মুড়ি, কলের জলে ভিজিয়ে। তারপর অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছেছিল ঠিক।

খোলার দোচালা, টিনের বেড়া, দর্মার ঝাঁপ, চটের পর্দা। বুকটা দমে গিয়েছিল, তবু ফুটপাতের চাইতে ভাল। ভরসা করে দরজায় টোকা দিলে।

বকুল ছিল রাস্তাতেই, একটা বে-আব্রু কলে চান করছিল। অচেনা লোক দেখে শপশপে কাপড়ে ফিরে এল তাড়াতাড়ি, ঘড়াটা মাটিতে রেখে, ঘোমটাটা টেনে দিল।

কুঞ্জ দেখল, শুকনো লিকলিকে হাত, চোখে কালি, আরও বছর চারেক বয়স বেড়েছে বকুলের।

আর নাম ধরে ডাকা চলল না। বলল, বকুলদি ?

বকুল বলল, কুঞ্জ ! আমি বলি কে না কে। আয় ঘরে বস। কবে এলি।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল বকুল। মাসিমা নেই ? কবে গেলেন ? মেসোমশাই নিরুদ্দেশ ? আহা। এখানে থাকবি বলে এসেছিস, ভাল কথা। কিন্তু বড় যে মুস্কিলে ফেললি ভাই। এই তো দেখছিস ঘরদোরের অবস্থা, শুতে দিই কোথায় ? তোর জামাইবাবুর তো ছাপাখানার সামান্য কাজ, আমাদেরই চলে না।

তা হোক, তবু ওরই মধ্যে বন্দোবস্ত হয়ে গেল। রকে শোবে কুঞ্জ, যা হোক দু'মুঠো খাবে। চেনা আর একটা ছাপাখানায় কুঞ্জকে প্রুফতোলার কাজ জুটিয়ে দেবার ভরসা দিল প্রাণকৃষ্ণ।

বদল কি প্রাণকৃষ্ণরই কম হয়েছে। বিয়ের সময় ছিল বাগানো টেরি তেল চপচপে চুল, ছোকরা ছোকরা দেখাত। এবার কুঞ্জ দেখল, প্রাণকৃষ্ণর মাথার সমুখের দিকটা অনেকটা ফর্সা হয়ে এসেছে, পেছনের দিকে যা কয়েক গোছ চুল আছে তার অনেকটাই সাদা। সামান্য দু'চার বছরে এতটা বয়স বেড়ে যায় মানুষের। সেবারে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঘন ঘন কাঁচি সিগারেট ফুঁকত; এবারে বিলকুল খাঁকি, তাও হিসেব করে প'হরে প'হরে ফোঁকে, খুক খুক কাশে।

তা কাশুক, প্রাণকৃষ্ণর মুখের বড়াই আছে তেমনি। প্রথম আলাপেই কুঞ্জ বলেছিল, আপনি একটা কাজ জুটিয়ে দিন জামাইবাবু। ছাপাখানার আপনিই তো ম্যানেজার।

ম্যানেজার ? প্রাণকৃষ্ণ বলল, না ঠিক ম্যানেজার আমি নই। তবে বলতে পারো বটে। ম্যানেজার নামে যেটা আছে সেটা ছাপাখানার কাজের বোঝে কী। আমাকেই সব চালাতে হয়। বিশ বছর কম্পোজ করছি, ক' সিলিপে ক' ইস্টিক, চোখ বুলিয়ে বলে দেব। পারবে তুমি বলতে ? পারবে আমাদের গ্র্যাজুয়েট মুখুজ্যে ? ম্যানেজার হতে কত প্রেস থেকেই তো কত সাধাসাধি করে। মাইনে ! বুয়েচ ভায়া, পুরনো চাকরি। তাছাড়া ওসবে অনেক ঝক্কি— তা দেব তোমাকে একটা কাজ জুটিয়ে।

দিলও শেষ পর্যন্ত। প্রুফটানার কাজ। এ কাজটা সহজ, শিক্ষানবিশি নেই, সাকরেদি নেই। দিনকতক গ্যালি টানাটানি করলেই ওস্তাদ।

মাইনেপত্তর ঠিক হল কিনা, কত ঠিক হল কে জানে, প্রাণকৃষ্ণ জানতে দিল না কুঞ্জকে। বলল, এখন শুধু খেটে যা। মইয়ের নীচের ধাপে আছিস, নজর রাখবি ওপরে, ওই ম্যানেজার মুখুজ্যে যেখানে বসে আছে তোকে গিয়ে পৌঁছতে হবে ওখানে, বুইচিস।

ছিল বেশ। দুটো খেত, পরত, শুত— কোনদিন রকে, জোর-বিষ্টির দিনে সিঁড়ির নীচে চাদর

বিছিয়ে।

ভোর সাড়ে আটটায় বেরিয়ে যেত প্রাণকৃষ্ণ, কুঞ্জ তার কিছু পরে। আগে কম্পোজ হবে তবে তো প্রুফ।

বাজার করে নিয়ে এসে কুঞ্জ দেখতে পেত কাঁখালে করে বাস্তা থেকে জল তুলে আনছে বকুলদি, পাবছে না। কোমর বেঁকে গেছে, ঠোঁট দুটো আলগা। আসতে আসতে হাঁপাচ্ছে।

ছুটে যেত কুঞ্জ। সরো বকুলদি, আমি ধরে দিচ্ছি জল।

এই ক' বছর শ্বশুরঘর করে, জল টেনে, বাসন মেজে আর উনুন ধরিয়ে শরীরে আর কিছু নেই বকুলদির, শুকিয়ে কাঠিসার তো হয়েছেই, সবটুকু লাবণ্য ঝবে গেছে।

সবটুকু বুঝি নয় ! এখনও যখন কাপড় কেচে, গা ধুয়ে ঘবে এসে ঢোকে বকুলদি, অনেক কষ্টে দবজার কপাটের আড়াল করে ওর দিকে পেছন ফিরে কাপড ছাড়ে, হাত আয়না সমুখে রেখে টেনে টেনে চিরুনি চালায়, কুঞ্জর চোখে ধাঁধা লাগে। অনেক দিন আগে দেখা ওদের গ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামলা কিশোরীকে মনে পড়ে। এখনও তবে একেবারে মরে যায়নি বকুলদি, ফুরিয়ে যায়নি। এখনও যদি একটু জিরিয়ে নিতে পারত, খেতে পারতে পেট ভরে, তবে বকুল আবাব তাজা হয়ে উঠতে পারত, বাতাস লাগত হাড়ে, গালে মাংস, রক্ত আসত শরীরে।

কিন্তু শুধু খেতে পেলেই কি সুখী হত বকুল। প্রাণকৃষ্ণ খেয়ে উঠে গেছে, পাতের কাছে বসে বকুলদিকে শুকনো মাছের কাঁটা চুষতে দেখে কুঞ্জর তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু ভাল করে নজর করে মাঝে সন্দেহ হয়েছে, শুধু খাওয়া পরা আর বিশ্রামের অভাবই বকুলদির আসল অসুখ নয়, আরও কিছু আছে।

প্রাণকৃষ্ণর এঁটো তুলে নিতে এসে থালার চারপাশে লেগে থাকা দু'চারটে ভাত কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেত বকুলদি। কোন কোন দিন কুঞ্জর চোখে ধরা পড়ে গেছে।

—তোমার বুঝি আজ খাওয়া হয়নি, বকুলদি ?

এক রকম হাসি ফুটত বকুলদির মুখে। লজ্জা ঢাকে হাসি, কিন্তু হাসির দৈন্য ঢাকে কিসে।

—হবে না কেন, তাই বলে জিনিস নষ্ট করব কেন। তোর একদম বুদ্ধি নেই কুঞ্জ।

বুদ্ধি আছে প্রমাণ করবার জন্যেই কুঞ্জ মাঝে মাঝে পাতে আদ্ধেকটা ভাত রেখে উঠতে গেছে। বকুল তা হতে দেয়নি।

—ভাত নষ্ট করছিস যে ?

—খিদে নেই। তাছাড়া নষ্ট হবে কেন ?

—কে খাবে তোর পাতেরটা ?

ভয়ে ভয়ে, কতকটা চোখ বুজে কুঞ্জ বলেছে, কেন তুমি।

বকুল চটে উঠেছে, কিংবা ভান করেছে।—এই বুদ্ধি হয়েছে তোমার এত বয়সে। সোয়মীর প্রসাদ খেলে পুণ্যি হয়, তোর পাতেরটা খেলে আমার কী !

কুঞ্জ বলতে চেয়েছে 'আমার পুণ্য হবে' কিন্তু কথা সরেনি। কিন্তু আসলে তো খেতে পাওয়ার দুঃখই শুধু নয় বকুলের, আরও একটা আছে। ভয়।

এই ভয় স্পষ্ট নয়, প্রত্যক্ষ নয়, তবু আছে। বাতাসের মতো ; নিঃশ্বাসের মতো। অজানিতে চোখের পলক পড়ার মতো।

বিকেলে গা ধুয়ে এসে ভাল একখানা কাপড় পরে বৈকি বকুল, প্রাণকৃষ্ণর গলার আওয়াজ শুনলেই মুখে কেমন একটা ছায়া নামে।

সে ছায়া অবশ্য মিলিয়ে যায় মুহূর্তেই। একটু পরে হাসে বকুলদি, বকুলদিকে হাসতে হয়।—

আজ এত দেরি ?

সারাদিন পরিশ্রমের পর মেজাজ তিরিক্ষি প্রাণকৃষ্ণের। ঘর্ঘর গলায় কী বলে বোঝা যায় না। তারপর হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে দু'একটা ইয়ার্কি দেয় বৌয়ের সঙ্গে। বকুলদিও হাসে, হাসতে হয়। তবু সে হাসি, কুঞ্জ ঠিক ধরতে পারে, পেতলের কলসির কানার মতো, অন্তরের ছায়া লুকিয়ে যায়, ঘোচে না।

শুধু বকুলদি কেন স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে কুঞ্জর অভিজ্ঞতাই এমনি। এই বস্তিতে আরও তো ক'ঘর পরিবার আছে। ও-পাশে ললিতাদি এ-পাশে নীলুদিরা। এমনিতে বেশ আছে। স্বামীর জন্যে রান্না করে, জামা রিপু করে, একসঙ্গে শোয়, বছর বছর বিয়োয়, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের পর্দা দুলতে থাকে। একই সুখ, একই দুঃখের শরিক দু'জনে, তবু দু'জন যেন সমান নয়। একে প্রভু অপরে দাসী।

নইলে সামান্য একটু অন্যমনস্কতার জন্যে ভাতটা একটু ধরে যায় যেদিন, সেদিন বকুলদির মুখ অমন শুকিয়ে যায় কেন, চোখে মুখে ফুটে ওঠে কেন আতঙ্ক। বলে, আজ তোর জামাইবাবু আমাকে আস্ত রাখবে না কুঞ্জ। কী করে ধরে গেল বল দেখি।

অবশ্য প্রাণকৃষ্ণও বলে। হাসতে হাসতে। একবারে পাঁচসিকে পয়সা বাজী ধরেছিল রেসে। কিছু ফিরে আসেনি। ছাপাখানার কালি ধুয়ে মুছে বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রাণকৃষ্ণ বলেছিল, তোর দিদি একেবারে খেপে যাবে কুঞ্জ। কাপড় কাচা সাবান, সুতো আর মশলা কেনার পয়সা হিসেব করে দিয়েছিল। ওকে আমি কৈফিয়ত দেব কী। বলতে বলতে গলাটাকে ভারী করে আনে প্রাণকৃষ্ণ। চোখ মুখও গম্ভীর, তবু কুঞ্জ জানে সব কৃত্রিম। বকুলদির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা রাখে না প্রাণকৃষ্ণ। যেমন রাখে না পাশের ঘরের ললিতাদির স্বামী পশুপতি।

এক একদিন বাসায় ফিরতে পশুপতির খুব রাত হয়ে যায়। দরজার ওপর দুমদাম আওয়াজ করে।

ললিতা যদি বলে, আজ আবার ওসব খেয়েছ,—মুহূর্তে বিনয়ে কাদা হয়ে যায় পশুপতি। ধরাধরা গলায় বলে, মাইরি না। আর কোনও দিন ওসব ছোঁব না। এই তোমার পা-চ্ছুয়ে বলছি—

পা ছুঁতে যায় বটে, তখন শখের জোয়ারের পর অনুতাপের ভাঁটা চলছে, কিন্তু সত্যি কী আর ছোঁয়, না ললিতাদি ছুঁতে দেয়।

এরপরও যদি বুঝেসুঝে চুপ করে না যায় ললিতাদি, অমনি বিনয়ের খোলস ছেড়ে ফুঁসে উঠবে পশুপতি। দু'চার ঘা বসিয়ে দেবে।

এসব দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে কুঞ্জর। তবু দিন মন্দ কাটছিল না। কেটে যেত-ও, যদি না প্রাণকৃষ্ণর চাকরিটা অমন হঠাৎ চলে যেত।

গেল, কাজে ঢিলেমির জন্যে নয়, গরহাজিরার জন্যে নয়, সিসে চুরির দায়ে। কিছুদিন থেকেই টাইপ কমতে শুরু করেছিল। কেস-কে-কেস দুদিনে খালি। নজর রাখা শুরু হল। সাতদিনের মাথায় ধরা পড়ল প্রাণকৃষ্ণ, হাতে নাতে। সঙ্গে সঙ্গে সাফ জবাব হয়ে গেল। থানা পুলিশ হল না, বিশ বছরের চাকরি। বাবুরা মাফ করলেন। কিন্তু চাকরিটি কেটে দিলেন। সেই সঙ্গে কুঞ্জরও। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই নয়। শালাভগ্নিপতিও হয়। কে না জানে প্রাণকৃষ্ণেরই লোক।

সব শুনে গুম হয়ে বসে রইল বকুল।

—এবার কী উপায় হবে।

প্রাণকৃষ্ণ ভরসা দিল, কিছু ভেবো না, একটা জুটবেই। এত বছর ধরে আছি এ লাইনে।

জুটল না তত সহজে। কেলেংকারির খবর দ্রুত ছড়ায়। সবাই কী করে টের পেয়ে গেছে চুরির দায়ে বরখাস্ত হয়েছে প্রাণকৃষ্ণ। আরও মাসখানেক কাটল।

চিনেমাটি

এই এক মাস প্রাণকৃষ্ণ বসে থাকেনি। চায়ের দোকানের রকে বসে বসে অব্যর্থ ঘোড়ার কুষ্ঠিকুলজী বিচার করেছে। পাঁচ ধরে দশ আনা ফেরত এসেছে এইমাত্র, তাতে সংসার চলে না।

বকুলের সঞ্চয়ের শেষ কড়ি পর্যন্ত ক্ষয়ে ক্ষয়ে এল, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণর আশা অক্ষয়। রোগা জিবজিরে বুকে চাপড় মেরে বলল, সবুর, আর কটা দিন। একটা হদিশ পেয়েছি। ঠিক মতো গেঁথে তুলতে পারলেই ব্যস, পায়ের ওপর পা থুয়ে বুঝলে বকুল। বকুল ভাষাহীন, ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়ে থাকে। বোঝে কিনা বোঝা যায় না।

একদিন বিকেলে এসে তাড়া দিলে প্রাণকৃষ্ণ। চটপট তৈরি হয়ে নাও তো বকুল, সিনেমায় যাব।—সিনেমা ! সকালে শুধু মুড়ি খেয়ে কেটেছে, এ বেলাব জন্যে তাও নেই। বকুল বলল,—সিনেমা !

ধমক দিল প্রাণকৃষ্ণ। হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না, যাও সাবান দিয়ে মুখটা ধুয়ে এসো, চটপট।

সাবান কোথায় ?

কেন ললিতার কাছে ধার করে চালিয়ে নাও না। দেবে না ? আলবৎ দেবে।

যতক্ষণ শাড়ি বদলাল বকুল, ততক্ষণ প্রাণকৃষ্ণ ওব প্ল্যান উন্মোচন কবল। আরে, জোর একটা টিপস্ পেয়ে গেছি। নিরুপমা পারফিউমাবির নাম শুনেছ ?

পারফিউমারি কী বস্তু বকুলের জানা ছিল না।

সাবান, তেলের কোম্পানি আর কী। আজ ললিতা তোমাকে সাবান মাখতে দিতে খুঁৎ খুঁৎ কবছিল, দুদিন বাদে তুমি ওকে বাক্স বাক্স সাবান দিতে পারবে। তবে আমবা এখানে থাকব না এই যা।

আঁচলটা বেড় দিয়ে সবে মাথার ওপর তুলছিল বকুল, হঠাৎ ওর হাত আলগা হয়ে গেল।—এখানে আর থাকব না ?

বাহাদুর গলায় প্রাণকৃষ্ণ বলল, তবে আর বলছি কেন। নিরুপমা পারফিউমারির অর্গানাইজার সুবোধ চক্কোত্তির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমাকে ওরা বাইরে পাঠাতে চায় বিহাব উড়িশ্যার সোল এজেন্ট করে। মালটা চালাতে হবে আর কী। ট্রেনে ট্রেনে ঘোরাঘুরি করে।

এতক্ষণে বকুল বুঝতে পেরেছে।—ফিরিওলা হবে তুমি ?

কম্পোজিটারের বউ বকুল। সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে বড় হুঁশিয়ার।

ফিরিওয়ালা তো আরও একধাপ নীচে।

—আরে দূর দূর। ফিরিওয়ালা হতে যাব কেন ? আমার অধীনেই কত ফিরিওয়ালা থাকবে দেখো। এই কুঞ্জ ছোঁড়াটাকেও আমি একটা কাজ দিয়ে দেব। এ সব কাজে বহুৎ দায়িত্ব বকুল, বিস্তর টাকা জমা দিলে তবে জোটে। নেহাত সুবোধ চক্কোত্তির আমাকে খুব মনে ধরেছে তাই—

তাই সুবোধ চক্রবর্তীর পয়সায় সিনেমা যেতে হল।

সিনেমায় কী হয়েছিল, সেদিন বোঝেনি কুঞ্জ। ফিরে এসে বকুল ভাল মন্দ কিছুই বললে না। কেমন গল্প, ক'টা গান, কিছু না। কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলে না।

দিনতিনেক বাদে প্রাণকৃষ্ণ বলল, চটপট তৈরি হয়ে নাও। বিকেলে বেড়াতে যাব। সুবোধ চক্কোত্তি আসবে গাড়ি নিয়ে।

বকুলের মুখ মড়াফ্যাকাসে হয়ে গেল, প্রাণকৃষ্ণ সেটা নজর করল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু কুঞ্জ দেখে নিয়েছে ঠিক।

—আজকে ? আবার !

বিবর্ণ মুখ প্রাণকৃষ্ণ দেখতে পায়নি কিন্তু বিরস গলা শুনল ঠিক। চটে গিয়ে বলল, কী রাজকার্য করছ এখানে বলো দেখি। সুবোধ চক্কোত্তির মেলা পয়সা বকুল, খাবার লোক নেই, লোকটা তাই মনমরা হয়ে থাকে। নইলে টাকাকে টাকা জ্ঞান করে না। আজ ডায়মণ্ডহারবার যাবে।

—যাক না। বকুল বলল, যত খুশি বেড়িয়ে বেড়াক। আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন।

কথার ছিরিতে প্রাণকৃষ্ণ খেপে গেল—টানাটানি আবার কিসের ; যেতে ইচ্ছে হয় যাবে, না হয় যাবে না।

স্থির চোখে, একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকাল বকুল, বলল, বেশ চলো।

ফিরে এসে সটান শুয়ে পড়ল। কুঞ্জ আগেই মুড়ি-বাতাসা খেয়ে নিয়েছিল। সেদিন আর উনুন জ্বলল না। নাটকীয় সেই ঘটনাটা ঘটল আরও দিন চারেক পরে। একটা টাকা দিয়ে লোকটা ওকে ফরমাস করল, যাও তো খোকা, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো, দু'খিলি পান।

ঝাঁ ঝাঁ দুপুর—দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, ফিরে আসতে কুঞ্জর মিনিট পনেরো লাগল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে যাবে, পারল না।

রুদ্ধশ্বাস বকুলদি, আরক্তমুখী বলছে, যান এখনই বেরিয়ে যান আপনি নইলে—

মিটিমিটি হাসছে সুবোধ।—নইলে কী।

—নইলে উনি এসে আপনাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবেন।

—প্রাণকেষ্টর কথা বলছ ? —তেমনি হাসছে সুবোধ—আরে না সে আসছে না বকুল, তোমার ভয় নেই। প্রাণকেষ্টকে মোড়ের দোকানে বসিয়ে এসেছি—সে এখন চিংড়ির কাটলেটের কাঁটা চুষছে।

সেই মুহূর্তে কী হল কুঞ্জর, ঘরে ঢুকল ঝড়বেগে, অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সুবোধের গায়ে, হাতের কাছে কিছু না পেয়ে শুধু নখে রক্তক্ষত করে দিতে লাগল।

ছিটকে পড়ল অবশ্য মুহূর্তেই। সুবোধ চক্রবর্তী লিকলিকে হলেও কুঞ্জর মতো পুঁচকেকে কায়দা করার জোর রাখে। মেঝেয় ঠোকর খেয়ে কেটে গেল কপালের খানিকটা, আর, তখন, আর জ্ঞান রইল না কুঞ্জর। হাতের মুঠোয় ছিল ক'আনা পয়সা, দেশলাই, সিগারেটের প্যাকেট। সব আবীর ছোঁড়ার মতো ছুঁড়ে দিল সুবোধের চোখ লক্ষ করে। চশমাটা চুরমার হয়ে পড়ল মাটিতে, তারই দু' এক টুকরো বিঁধে থাকবে সুবোধের চোখে। দু'হাতে মুখ ঢেকে সুবোধ মাথা হেঁট করে অপমানে ঘর থেকে সুড়সুড় বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সে তো শুধু প্রথমাঙ্কের যবনিকা। প্রাণকৃষ্ণের প্রবেশ হল বেলা গড়িয়ে যেতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, সুবোধ আসেনি ?

হাঁটুতে মুখ গুঁজে, বসেছিল বকুল, এতক্ষণে ভেঙে পড়ল কান্নায়। গোঙানির সঙ্গে বিনিয়ে বিনিয়ে কী বললে, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল না কুঞ্জ।

প্রাণকৃষ্ণ ততক্ষণে কঠিন হাতে ঠেলছে বকুলকে।—যাওনি ? যাওনি তবে সুবোধ চক্কোত্তির সঙ্গে ?

মিনমিনে স্বরে বকুল একবার বলতে চেষ্টা করল, তুমি ছিলে না—

—সতি-নক্কি ! কই পাতানো ভাইয়ের সঙ্গে গলাগলি করে যাওয়ার সময় এই হিসেব তো ছিল না। ওর সঙ্গে কিসের এত গুজগুজ ফুসফুস ! ও শালাকে আজই মেরে তাড়াব।

দম নিল প্রাণকৃষ্ণ, ফের হতাশার ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে শুরু করল : আর কী, যা কিছু আশা-ভরসা ছিল, সব ফরসা হয়ে গেল। কী খোয়া যেত তোমার সুবোধের কথাটা রাখলে। আর মাসখানেকের মধ্যেও একটা কাজ যদি জোটাতে না পারি, তখন কোথায় থাকবে তোর এত তেজ। বেশ্যাবিত্তি

করেও কূল পাবিনি।

মেরে তাড়াতে হল না, কুঞ্জ সেদিন নিজে থেকেই সরে পড়ল। তারপরেও কিন্তু একদিন লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিল বকুলের সঙ্গে। দেখল তালাবন্ধ।

মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, দেখল গাড়ি থেকে নামল বকুল।

ভাঙা চশমা জোড়া লাগেনি, নতুন চশমা সুবোধের চোখে। ভুরুর ওপরে ছোট একটা ব্যাণ্ডেজ।

উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে হন হন রাগে কুঞ্জ চলতে শুরু করল।

সব শুনে শশী বলল, বাগেব কী আছে। বকুল ঠিকই কবেছে কুঞ্জ। শশীর সব ঠাণ্ডামাথা বিবেচনা। বলল, স্বামীর ইচ্ছেই তো ইস্তিরীর ইচ্ছে। স্বামীর ভালই তো ইস্তিরীর ভাল। তাব আবার আলাদা সুখ কী, আলাদা ইজ্জৎ কী।

কুঞ্জ তবু বলল, তাই বলে পরপুরুষের—

শশী বলল, —পরপুরুষ আবার কী। স্বামী যার হাতে সঁপে দেন তার মধ্যেই তো স্বামীকে ধ্যান করতে হয়। গোপিনীবা যেমন করেছেন। নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে সঁপে দিতেন, পড়িসনি ? এর মধ্যে কোনও পাপ নেই কুঞ্জ; বকুলের কোনও দোষ নেই।

দোষ তো নেই, কিন্তু মন বোঝে কই। মাঝে মাঝে বকুলের কাছে যায় বটে, কিন্তু গলির কাছাকাছি এসে নাকে হাত দেয়। এখানে কি সে কখনও ছিল !

এখন মনে হয় দুঃস্বপ্নের মতো। আঢাকা নর্দমার গন্ধ, ফুটো চালে উঁকি দেওয়া শত নেত্র ইন্দ্র আকাশ, আর শত ছিদ্র কাপড়ে রোগা-রোগা কতগুলো মেয়েমানুষের ঘোরাঘুরি।

ওখানে শুধু ফলে ফুলে রামধনু, সবুজ ঘাস-গালিচা, ঝাউউদাস হাওয়া আর, আর মেমসাহেব।

একটি স্বপ্ন সুড়ঙ্গের মতো সম্মোহিত দিন রাত্রি।

কোথায় কোন স্পোর্টসে বখশিস বিতরণ করে এসেছেন মেমসাহেব। এসেই শুয়ে পড়েছেন বিছানায়। মাথা ধরেছে। একটু ওডিকোলন ছিটিয়ে দিলেন কপালে, তাতেও ব্যথা কমল না, অস্ফুট গোঙানি শুনতে থাকল কুঞ্জ, দূরে বসে। একটু পরে মেমসাহেব ওকে ইশারায় ডাকলেন, ভেজা রুমালটা শুকিয়ে গিয়েছিল, আবার ভিজিয়ে আনতে বললেন।

শয়নকক্ষলগ্ন স্নানঘর। এটুকু পথ যেতে আসতে কুঞ্জর তিনমিনিট কেটে গেল। এতক্ষণ ধরে নিবিড় স্পর্শে ইন্দ্রাণীর কপালের সবটুকু তাপ আহরণ করেছে রুমালটা, সেই তাপটুকু কুঞ্জ শুষে নিতে চাইছে করপৃষ্ঠের রোমকূপ দিয়ে। বেসিনে জল ঝরছে, ঝরছে তো ঝরছেই, ইন্দ্রাণী কাতর গলায় ডাকলেন, কুঞ্জ ! কী করছিস এতক্ষণ ধরে।

চকিতে সংবিত ফিরে এল। থরথর হাতে ভিজে রুমালটা মেমসাহেবের হাতে কুঞ্জ তুলে দিল।

একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন চৌধুরী সাহেব। সুইচবোর্ডে হাত দিতেই ইন্দ্রাণী বলেছেন, প্লিজ, ডোন্ট।

মাথা ধরেছে ?

পাশ ফিরে শুয়ে ইন্দ্রাণী বলেছেন, ইয়েস, বিস্টলি।

তখনকার মতো কেটে গেছে বটে, কিন্তু সেই স্বপ্নমোহ বারবার ফিরে এসেছে কুঞ্জর।

আর্ট এগ্‌জিবিশনে যাবেন, বিছানা থেকে উঠে মেমসাহেব চোখে জল দিতে গেছেন, বিছানাটা ফের ঠিক করতে গিয়েও কুঞ্জর হাত সরেনি। চাদবে বালিশে একটি দিব্যদেহের ছাঁচ, একটি অস্পষ্ট মধুর সুরভি।

জুতো পালিশ করতে গিয়েও দেরি হয়েছে, ধমক খেয়েছে, তবে কুঞ্জর হুঁস হয়েছে।

আরেক দিন।

দামি শাড়িখানা কুঞ্জই ধুতে দিয়েছিল। ভাঁজ খুলেই মেমসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কী, এমন করে আঁচলটা কাটলে কে।

তলব পড়ল কুঞ্জর।

—এটা কে ধুতে দিয়েছিল, তুমি ?

কুঞ্জ স্বীকার করল। তৎক্ষণাৎ ওকে শাড়িটা দিয়ে ইন্দ্রাণী বললেন,—যাও, এক্ষুণি এটা ওদের দোকানে দেখিয়ে নিয়ে এসো। বলো পুরো দাম কাটব আমি।

কুঞ্জ তবু নড়ে না।

মেমসাহেব ধমক দিলেন আবার—যা-আও ! দাঁড়িয়ে আছে যে।

পলক পড়ছে না কুঞ্জর চোখের। ওর পেছনের দেয়ালে বিজলি আলো, সামনে মেমসাহেব। হঠাৎ কুঞ্জর নজরে পড়েছে, মেমসাহেবের গায়ে ওর সম্পূর্ণ দেহের ছায়া। কুঞ্জর চিনতে ভুল হয়নি, সে ছায়া ওর নিজেরই। নিনখ শুভ্র পায়ের আঙুল, আঙুল ছুঁয়ে সাপের মতো বেয়ে বেয়ে উঠেছে সে ছায়া, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে বাধা পেয়ে পেয়ে, বাধা না মেনে, ছায়া করাঙ্গুলি থরথর করে কাঁপছে ইন্দ্রাণীর দুঃশাসন উচ্চচূড় স্তনে, কুঞ্জর রুগ্ন, ধুকধুক বুক ছায়া হয়ে মিশে আছে ইন্দ্রাণীর অবারিত গ্রীবামূলে, আর ইন্দ্রাণীর ঈষৎভিন্ন অধরোষ্ঠ কুঞ্জর ছায়া-কণ্ঠে আসক্ত।

মাথায় কুঞ্জ ইন্দ্রাণীর চেয়ে ছোট, কিন্তু ছায়া হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী ফের অসহিষ্ণু ধমক দিলেন, কই গেলে না ? যাও ?

যাবে, কুঞ্জ এবার যাবে। কায়া দিয়ে যার পায়ের পাতাটুকু ছোঁবারও অধিকার কোনদিন পাবে না, ছায়া হয়ে তার সর্বদেহের নিবিড় স্পর্শ পেয়েছে। কুঞ্জর আর আপশোস নেই।

কিন্তু কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। ক' দিন ধরে স্পষ্ট টের পেয়েছে কুঞ্জ।

বাগানে জল দেওয়া বন্ধ। ঘাস বিবর্ণ, হলিহক, ভায়োলেট, পপি আর প্রিমরোজ নির্জীব। গাছগুলো ঝাঁকড়া চুল হল, তবু ছাঁট নেই। শশী বলল. এ বছর আর ফুল হবে না, বাড়তি খরচ সাহেব সব বন্ধ করে দিয়েছেন। একটু থেমে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে আবার বলল, আমারও জবাব হয়ে যাবে কুঞ্জ।

—জবাব হয়ে যাবে শশীদা ?

কুঞ্জর শহর বাস বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, গলায় আর তেমন আন্তরিকতা ফোটে না। এমন কী শশীর সুপারিশেই যে এখানে ঢুকেছিল সেটাও যেন ভাল মনে নেই কুঞ্জর। —জবাব হয়ে যাবে শশীদা। কারুর পুত্র বিয়োগের খবর পেয়ে মেমসাহেব ফোন তুলে যে সুরে শোকাতুরাকে সান্ত্বনা দেন ; কুঞ্জর গলাতেও সেই নিরুত্তাপ নাগরিকতা।

আসল খবর জানা গেল ক্রমে ক্রমে। শেয়ারের খেলায় ফকির হয়েছেন চৌধুরী সাহেব। কাঁচা টাকা প্রায় সবই খাঁচাছাড়া চিড়িয়ার মতো উধাও, স্থায়ী জিনিসের মধ্যে এই বাড়ি, এই গাড়ি আর কিছু জমি—সেখানেও স্পেকুলেশন—সেও বঁড়শে-বেহালার দক্ষিণে, নিচুডাঙ্গায় ভূমগুলের মতো তারও তিন ভাগ জল একভাগ স্থল।

ভেজানো দরজার বাইরে কুকুরটা ট্যা ট্যা করে, কেউ ফিরেও চায় না, দরজার আড়ালে সাহেব-মেমের কলহ চলে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোয় কুঞ্জ, কী কথা হয় বোঝে না, শুধু চাপা গলার ক্রুদ্ধ তর্জন কানে আসে।

মাঝেমাঝে কুঞ্জ চমকে ওঠে, এই এখুনি পর্দা ঠেলে মেমসাহেব বেরিয়ে আসবেন, একটি মাত্র আঙুলের ইশারায় ওর জবাব হয়ে যাবে। যে পথে গেছে বাগানের ফুল, লনের ঘাস, দেয়ালের কলি, সেই পথেই কুঞ্জকে যেতে হবে।

শক্ত করে টুলটা চেপে ধরে কুঞ্জ, চোখের পাতা ভিজে ওঠে। যাবে না, যেতে পারবে না। কাঁপা কাঁপা আঙুল দিয়ে কুর্তার পকেটটা হাতড়ায়, মুঠি করে ধরে। কে জানে কুঞ্জ ওখানে কী রেখেছে।

পা টিপে টিপে দরজায় চোখ রাখে। সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন টুলের ওপর পা রেখে। একটা হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে স্পষ্টই উত্তেজিত।

—দেখাবে না, দেখাবে না তুমি আমাকে তোমার হিসাব ?

—না। সংসার খরচের টাকায় তোমাকে হাত দিতে দেব না ; এটা আমার।

—তোমার। এমন স্বরে সাহেব হেসে উঠলেন যে কুঞ্জর মনে হল জানলার সার্সি ঝনঝন করে উঠল।

—তোমার ! তোমাকে কে চেনে ইন্দু। সবাই চেনে মিসেস চৌধুরীকে। এর কোন জিনিসটা তোমার ? সংসার খরচের টাকার কথা ছেড়ে দাও। এই মুহূর্তে তোমার বাক্সের চাবি ছিনিয়ে নিতে পারি। দেখতে পারি কত আছে তোমার পাশ বইয়ে। এমন কী, এক টানে ছিঁড়ে নিতে পারি তোমার কানের ওই বার্লিংটনের বাড়ির জড়োয়া দুল—

কুঞ্জ শিউরে উঠল, দেয়ালটা ধরে, সামলে নিল, সরল না তবু। সভ্য মানুষটির মুখোশ বুঝি একেবারে খসে-খসে যাবে।

কিন্তু, না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রাণী, দেবী প্রতিমার মতো, সাহেবের মাথাও যেন ছাড়িয়ে গেছেন। দেবীর মতো অস্ত্র-শস্ত্র নেই হাতে কিন্তু ভঙ্গিটা এক। তাছাড়া দ্রুত ওঠা পড়া বুকের সাহস প্রোজ্জ্বল চোখের ঘৃণা, ওই তো তাঁর আয়ুধ।

একটি কঠিন আঙুল তুললেন ইন্দ্রাণী, একটি নিশিত ছুরিকার মতো, রঞ্জিত নখাগ্রে বিজলি ঝলসে গেল—যাও, এক্ষুনি চলে যাও তুমি। যাও।

সেই মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর পায়ের কাছে কুঞ্জ মূর্ছিত হয়ে পড়তে পারত। পেরেছেন, ইন্দ্রাণী পেরেছেন। তার কুড়িবুড়ি বকুলদি যা পারেনি, একটি মাত্র নির্ভীক আঙুল তুলেই মেমসাহেব সেই অসাধ্য সাধন করেছেন।

সাহেব বেরিয়ে যেতেই মেমসাহেব শুয়ে পড়লেন, আলো নিবিয়ে। পা টিপে টিপে সেই ঘরে ঢুকল কুঞ্জ। কী ঠেকল পায়ে। একটা কাঁটা বোধ হয় মেমসাহেবের চুলের।

সেই যে বেরিয়ে গেলেন সাহেব, আর সাতদিনের মধ্যে ঘরমুখো হলেন না। বাগান তো কবেই শুকিয়েছিল, এমন ধুলোর সর পড়েছে বারান্দায়, পর্দায়, আসবাবে। মেমসাহেবের ভ্রূক্ষেপ নেই ! ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু মিলিয়ে গেছে, এসেছে একটু কঠিন দৃঢ়তা। পোশাকের সেই ঝিমঝিম এসেন্স গন্ধটুকু নেই, এ ক'দিন মেমসাহেব মোটে প্রসাধনই করেননি। কাছেও ডাকেননি কুঞ্জকে। তবু দূর থেকে দেখেই কুঞ্জর বুক ভরে গেছে। ইন্দ্রাণী বিদ্রোহী, —বন্দিনী, তবু বিজয়িনী।

সাতদিন পরে ফের ঘরের মধ্যে গুনগুন আলাপ শুনে কুঞ্জর অবাক লাগল। শশী বলল, সাহেব কাল ফিরেছেন যে। অনেক রাত্তিরে গাড়ি এল, শুনিসনি ? সাহেব গিয়েছিলেন বোম্বাইয়ে।

—কেন ? —অর্থ নেই, তবু কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করল।

পুরনো চাকর, কী করে সব খবরই যেন চটপট জানা হয়ে যায় শশীর। একটা ফিলিম কোম্পানি খোলার ইচ্ছে সাহবের অনেক দিনের। এবার শেয়ার বাজারে মার খেয়ে সেই ইচ্ছেটা আরও প্রবল হয়েছে। যা কিছু ঝরতি-পড়তি পুঁজিপাটা আছে সব একত্র করেছেন। বোম্বাই থেকে পাকড়ে এনেছেন জনকয়েক চাঁইকে। বেশির ভাগ টাকা তারাই দেবে, বাংলা বই কলকাতাতে তোলা হবে।

—তারা সব কোথায় ? কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করল।

—তারা উঠেছে একটা বড় হোটেলে। আজ বিকেলে জোর একটা পার্টি।

সাহেব বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। শিস্ দিলেন খানিকক্ষণ, নীল আকাশটার দিকে চেয়ে। লুপিকে কোলে তুলে আদর করলেন।

মেমসাহেবও এসেছেন পিছনে পিছনে। চৌধুরী বললেন, আমি তাহলে এখন চললুম। ছ'টার

আগেই ওদের নিয়ে আসব। তুমি সব ব্যবস্থা এদিকে ঠিক করে রেখো, হোটেলে ফোন করলেই ওরা সব ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়ে যাবে।

—পারব না।

সাহেব চটলেন না, হাসলেন, —নটি গ্যল্ ; সেম এ্যাজ এভর।

—বিকেলে আমার কাজ আছে। আর্ট গ্যালারিতে সিম্পোসিয়ম। —টু হেল উইথ ইয়োর সিম্পোসিয়ম। সাহেব বললেন, —না না, এ কাজটা তোমাকে করতেই হবে ইন্দু ; এটা হাসিল হলে আমার ভাল, তোমার ভাল। ইউ ক্যান ডু ইট, এ্যাণ্ড আই নো ইউ উইল।

মেমসাবে জবাব দিলেন না, ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন। উঁকি দিয়ে কুঞ্জ দেখেছে, সোফায় ইন্দ্রাণী আধশোয়া হয়ে। করপল্লবে দু'চোখ আচ্ছাদিত। অনেক পরে মেমসাহেব উঠলেন, চাবি দিয়ে খুললেন আলমারি। কুঞ্জ তখনও দেখছে। থরে থরে সাজানো শাড়ি, জামা, পেটিকোট। ভাঁজ খুলে খুলে মেমসাহেব দেখলেন।

নিঃশ্বাস পড়ল না কুঞ্জর। সাহেব নেই। এই অবসরে তবে পালিয়ে যাবেন মেমসাহেব। বেছে নিচ্ছেন শুধু নিজের পছন্দমত দু'চারখানা জামা কাপড়।

কিন্তু না। মেমসাহেব সবই ফের একে একে গুছিয়ে রাখলেন আলমারিতে। শুধু চোখ ঝলসানো এক প্রস্থ পোশাক নিয়ে গোসল কামরায় ঢুকলেন।

একটু পরে বেরিয়ে এলেন নবরূপে ; আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরলেন কর্ণাভরণ, যাতে তাঁকে সব চেয়ে মানায়।

কুঞ্জর তলব পড়ল খানিকক্ষণ বাদে। আজ ক'জন লোক আসবে, মেমসাহেব বললেন, তুমি দরজা জানালাগুলো একটু ঝেড়েপুঁছে রাখো।

বেলা পড়তে না পড়তেই হোটেলের গাড়িতে খাবার এল। নার্সারির লোক পৌঁছে দিয়ে গেল গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত পদ্ম। ধবধবে ঢাকনা পড়ল ছোট ছোট টেবিলে ; ঝকঝকে চিনে-মাটির বাসন বেরুল অনেকদিন পরে।

তারপরে বেলা গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণে ঘস ঘস শব্দ শোনা গেল কয়েকটা গাড়ির ; সিঁড়িতে এক সঙ্গে অনেকগুলো ঠকঠক জুতো।

কুঞ্জ দেখল, সব সিল্ক পাৎলুন হাওয়াই কুর্তার দল।

সবার সঙ্গে আলাপ করছেন মেমসাহেব, হেসে হেসে করমর্দন করছেন। ওদের সবার জন্যেই মেমসাহেব পিয়ানোতে একটা গৎ বাজালেন ; তারপর,—চৌধুরী সাহেবের ইশারায় বেছে বেছে খেতে বসলেন এমন একটা লোকের পাশে, যার ভুড়ি ঠেকেছে প্লেটের কিনারে, রোমশ একটি হাতের চার আঙুলে চারটি আংটির ঝিকিমিকি।

কয়েকটি খাবার নিজের পাতে নিল লোকটা ; কটা দিল মেমসাহেবের ডিশে ! হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। মেমসাহেব হাত সরালেন না। সরেও বসলেন না পর্যন্ত। কুঞ্জর তখন চোখ দুটো জ্বলছে।

তারপর কী একটা রসিকতা করল লোকটা, সবাই হেসে উঠল। চৌধুরী সাহেবও যোগ দিলেন। মেমসাহেব লাল হলেন, কিন্তু মুহূর্তে মাত্র। যেন রাগ করলেন। তারপর নিজেও সেই হাসিতে যোগ দিলেন।

চৌধুরী সাহেব বললেন, এসব বলে ইন্দুকে তুমি লজ্জা দিতে পারবে না ছবিলাল। ও 'প্রুফ' হয়ে গেছে কবে। স্টেজ-শাই নয়। এম্পায়ারে নেচেছে ও তো কয়েকবার।

রিয়েলি ! ছবিলাল বলল,—আসুন না মিসেস চৌধুরী, এই ছবিতেই নেমে পড়ুন তবে।

মেমসাহেব বললেন। আই এ্যাম মাইণ্ড ইফ আই ডু— হেসে উঠলেন খিল খিল করে। কুঞ্জ কথাটা

বুঝল না—হাসিটা বুঝল।

তারপর কুঞ্জ সরে এসেছে বাগানের এক কোণে। শরীরের সব কটা রগ যেন শলতে হয়ে জ্বলছে।

ওর কুর্তার পকেটে হাত দিতেই সযত্নে রাখা কটা জিনিস বেরুল। কুঞ্জ একটার পর একটা ছুঁড়ে ফেলে দিল—যত দূর পারে।

শাড়ির আঁচলের কাটা টুকরো, চুলের কাঁটা। চিরুনি থেকে ফেলে দেওয়া কয়েক গাছি দীর্ঘ চুল, কয়েকটি রঞ্জিত নখাগ্র।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে কুঞ্জ। ওর এতদিনের গোপন সংগ্রহ, এত দিনের চুরি, পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে দিতে দিতে অস্ফুট ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, বাঁদি—সব বাঁদি।

ইঁদুর

সোমেন চন্দ

আমাদের বাসায় ইঁদুর এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে না। ওদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে-বেয়ে তর্‌তর্ করে ছুটোছুটি করে। যখন সেই নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক কোনও বিপদ সে হাজির হয়, অর্থাৎ কোনও বাক্স বা কোনও ভারী জিনিসপত্র সেখানে পথ আগলে বসে, তখন সেটা অনায়াসে টুক্ করে বেয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু রাত্রে আরও ভয়ঙ্কর। এই বিশেষ সময়টাতে তাদের কার্যকলাপ আমাদের চোখের সামনে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুরু হয়ে যায়। ঘরের যে কয়েকখানা ভাঙা কেরোসিন কাঠের বাক্স, কেরোসিনের অনেক পুরনো টিন, কয়েকটা ভাঙা পিঁড়ি আর কিছু মাটির জিনিসপত্র আছে, সেখান থেকে অনবরতই খুট্‌খুট্ টুংটাং ইত্যাদি নানা রকমের শব্দ কানে আসতে থাকে। তখন এটা অনুমান করে নিতে আর বাকি থাকে না যে এক ঝাঁক ন্যুব্জদেহ অপদার্থ জীব ওই কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে এখন রাতের আসর খুলে বসেছে।

যাই হোক, ওদের তাড়নায় আমি উত্যক্ত হয়েছি, আমার চোখ কপালে উঠেছে, ভাবছি ওদের আক্রমণ করবার এমন কিছু অস্ত্র থাকলেও সেটা এখনও কেন যথাস্থানে প্রয়োগ করা হচ্ছে না? একটা ইঁদুর-মারা কলও কেনার পয়সা নেই? আমি আশ্চর্য হব না, নাও থাকতে পারে!

আমার মা কিন্তু ইঁদুরকে বড় ভয় করেন। দেখেছি, একটা ইঁদুরের বাচ্চাও তার কাছে একটা ভালুকের সমান। পায়ের কাছ দিয়ে গেলে তিনি তার চার হাত দূর দিয়ে সরে যান। ইঁদুরের গন্ধ পেলে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, ওদের যেমনি ভয় করেন, তেমনি ঘৃণাও করেন। এমন অনেকের থাকে। আমি এমন একজনকে জানি যিনি সামান্য একটা কেঁচো দেখলেই ভয়ানক শিউরে ওঠেন, আবার একজনকেও জানি যাঁর একটা মাকড়সা দেখলেই ভয়ের আর অন্ত থাকে না। আমি নিজেও জোঁক দেখলে দারুণ ভয় পাই। ছোটবেলায় আমি যখন গরুর মতো শান্ত এবং অবুঝ ছিলাম তখন

প্রায়ই মামাবাড়ি যেতুম, বিশেষত গভীর বর্ষার দিকটায়। তখন সমুদ্রের মতো বিস্তৃত বিলের ভিতর দিয়ে যেতে বর্ষার জলের গন্ধে আমার বুক ভরে এসেছে, ছই-এর বাইরে জলের সীমাহীন বিস্তার দেখে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছি, শাফ্‌লা ফুল হাতের কাছে পেলে নির্মমভাবে টেনে তুলেছি, কখনও উপুড় হয়ে হাত ডুবিয়ে দিয়েছি জলে, কিন্তু তখনই আমার কেবলই মনে হয়েছে, এই বুঝি কামড়ে দিল !—আর ভয়ে-ভয়ে অমনি হাত তুলে নিয়েছি। সেখানে গিয়ে যাদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তারা আমার স্বশ্রেণীর নয় বলে আপত্তি করবার কোনও কারণ ছিল না, অন্তত সে রকম আপত্তি, আশঙ্কা বা প্রশ্ন আমার মনে কখনও জাগেনি।

সেই ছেলেবেলায় বন্ধুরা মাঠে গরু চরাত। তাদের মাথার চুলগুলি জলজ ঘাসের মতো দীর্ঘ এবং লালচে, গায়ের রঙ বাদামী, চোখের রঙও তাই, পাগুলি অস্বাভাবিক সরু-সরু, মাঝখান দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা, পরনে একখানা গামছা, হাতে একটা বাঁশের লাঠি, আঙুলগুলি লাঠির ঘর্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। তাদের মুখ এমন খারাপ, আর ব্যবহার এমন অশ্লীল ছিল যে, আমার ভিতর যে সুপ্ত যৌনবোধ ছিল তা অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে উঠত, অথচ আমি আমার স্বশ্রেণীর সংস্কারে তা মুখে প্রকাশ করতে পারতুম না ! তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করত, আমার মুখ লাল হয়ে যেত। তাদের মধ্যে একজন ছিল, যার নাম ভীম। সে একদিন খোলা মাঠের নতুন জল থেকে একটা প্রকাণ্ড জোঁক তুলে সেটা হাতে করে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললে, সুকু, তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারব।

আমি ওর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলুম, ভয়ে আমার গা শিউরে উঠল, আস্তে-আস্তে বুদ্ধিমানের মতো দূরে সরে গিয়ে বললাম, দ্যাখ ভীম, ভাল হবে না বলছি, ভাল হবে না ! ইয়ার্কি, না?

ভীম হি হি করে বোকার মতো হাসতে হাসতে বললে, এই দিলাম, দিলাম—

সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে, ভীমের সাহসের কথা ভাবতে আজও অবাক লাগে। অনেকের অমন স্বভাব থাকে— যেমন অনেকে কেঁচো দেখলেও ভয় পায়। আমি কেঁচো দেখলে ভয় পাই নে বটে, কিন্তু জোঁক দেখলে ভয়ে শিউরে উঠি। এসব ছোটখাট ভয়ের মূলে বুর্জোয়া রীতিনীতির কোনও প্রভাব আছে কিনা বলতে পারি নে।

একথা আগেই বলেছি যে আমার মা-ও ইঁদুর দেখলে দারুণ ভীত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে ওঠে। ইঁদুর যে কাপড় কাটবে সেদিকে নজর না দিয়ে তখন তাঁর দিকেই নজর দিতে হয় বেশি। একবার তাঁরই একটা কাপড়ের নীচে কেমন করে জানি নে একটা ইঁদুর আটকে গিয়েছিল। সে থেকে থেকে কেবল পালাবার চেষ্টা করছিল, ছড়ানো কাপড়ের ওপর দিয়ে সেই প্রয়াস স্পষ্ট চোখে পড়ে। মা পাঁচ হাত দূরে সরে থেকে ভাঙা গলায় চিৎকার করে বললেন, সুকু, সুকু!

প্রথম ডাকে উত্তর না দেওয়া আমার একটা অভ্যাস। তাই উত্তর দিয়েছি এই ভেবে চুপ করে রইলাম।

—সুকু ? সুকু ?

এবার উত্তর দিলুম, কেন ?

মা তাঁর হলুদ-বাটায় রঙিন শীর্ণ হাতখানা ছড়ানো কাপড়ের দিকে ধরে চোখ বড় করে বললেন, ওই দ্যাখ !

আমি বিরক্ত হলুম। ইঁদুরের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর কী ! এত ইঁদুর কেন ? পরম শত্রু কি কেবল আমরাই ? আমি কাপড়টা ধরে সরাতে যাচ্ছি অমনি মা চেঁচিয়ে উঠলেন, আহা ধরিসনে, ওটা ধরিসনে।

—খেয়ে ফেলবে না তো !

—আহা, বাহাদুরি দেখানো চাই-ই !

—মা, তুমি যা ভীতু ! —ইঁদুরটা অনবরত পালাবার চেষ্টা করছিল, বললুম আচ্ছা, মা, বাবাকে একটা কল আনতে বলতে পারো না ? কোনদিন দেখবে আমাদের পর্যন্ত কাটতে শুরু করে দিয়েছে !

—আহা, মেরে কী হবে ? অবোধ প্রাণ, কথা বলতে পারে না তো ! আর কল আনতে পয়সাই বা পাবেন কোথায় ? মা'র গলার স্বর কিছুমাত্র কাতর হল না, কোনও বিশেষ কথা বলতে হলেও তাঁর গলার স্বর এমনই অকাতর থাকে এবং অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায় । শেষ হওয়ার পর আর এক মিনিটও তিনি সেখানে থাকেন না। তিনি অমনি চলে গেলেন।

একটা ইঁদুর-মারা কল কিনতে পয়সা লাগবে, এটা আমার আগে মনে ছিল না। তাহলে আমি বলতুম না। কারণ এই ধরনের কথায় এমন একটা বিশেষ অবস্থার ছবি মনে জাগে যা কেবল একটা সীমাহীন মরুভূমির মতন। মরুভূমিতে অনেক সময় জল মেলে, কিন্তু এ-মরুভূমিতে জল মিলবে, এমন আশাও করি নে। এই মরুভূমির ইতিহাস আমার অজানা নয়। আমার পায়ের নীচে যে বালি চাপা পড়েছে, যে বালুকণা আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে, তারা ফিস্‌ফিস্ করে সেই ইতিহাস বলে। আমি মন দিয়ে শুনি। জ্ঞান হওয়াব পর থেকে আঠাবো বছর বযেস অবধি এগিয়ে আবোল-তাবোল অনেক ভেবেছি, কিন্তু অবোল-তাবোল ভাবনা মস্তিষ্কের হাটে কখনও বিক্রি হয় না। ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ এবং বিশ্বাস, দুই-ই প্রচুর ছিল, তাই ঈশ্বরকে কৃষ্ণ বলে নামকরণ করে ডেকেছি, হে কৃষ্ণ, এ পৃথিবীর সবাইকে যাতে একেবারে বড়লোক করে দিতে পাবি তেমন বর আমাকে দাও। রবীন্দ্রনাথের পবশমণির কবিতা পড়ে ভেবেছি, ইস্, একটা পবশমণি যদি পেতুম ! সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোককে সত্যই জিজ্ঞেস করে বসেছি, আচ্ছা পরশমণি পাথর আজকালও লোকে পায় ? কোথায় পাওয়া যায় বলবে ?

আমি যখন ছোট ছিলুম, আমাদের বৃহৎ পরিবারের লোকগুলির নির্মল দেহে তখনও অর্থহীনতার ছাযাটুকু পড়েনি। বুর্জোয়ারাজের ভাঙনের দিন তখনও ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যাযনি। শুরু না হওয়ায় আমি এই মানে করেছি যে তখনও অনেক জনকের প্রসারিত মনের আকাশে তার ছেলের ভবিষ্যৎ স্মরণ করে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। আমাকে আশ্রয় করেই কম আশা জন্ম নিয়েছিল! অথচ সে সব আশার শাখা-প্রশাখা এখন কোথায় ? আমি বলতে দ্বিধা করব না, সে সব শাখা-প্রশাখা তো ছড়ায়ইনি, বরং মাটিব গর্ভে স্থান নিয়েছে। একটা সুবিধা হয়েছে এই যে পাবিবারিক স্বেচ্ছাচারিতার অক্টোপাশ থেকে রেহাই পাওয়া গেছে, আমি একটু নিরিবিলি থাকতে পেবেছি।

কিন্তু নিরিবিলি থাকতে চাইলেই কি আর থাকা যায় ? ইঁদুররা আমায় পাগল করে তুলবে না ? আমি রোজ দেখতে পাই একটা কোরোসিন কাঠেব বাক্স বা ভাঙা টিনের ভিতর ঢুকে ওরা অনবরত টুংটাং শব্দ করতে থাকে, ক্ষীণ হলেও অবিরত এমন আওয়াজ করতে থাকে যে অনতিকাল পরেই সেটা একটা বিশ্রী সঙ্গীতের আকার ধারণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুধু আমার কেন অনেকেরই বিষম বিবক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটা কুকুর যখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে আস্তে আস্তে কাঁদতে থাকে, তখন সেটা কেউ সহ্য করতে পারে ? আমি অন্তত করি নে। অমন হয়। যখন একটা বিশ্রী শব্দ ধীরে ধীরে একটা বিশ্রী সঙ্গীতের আকার ধারণ করে তখন সেটা অসহ্য না হয়ে যায় না। ইঁদুরগুলির কার্যকলাপও আমার কাছে সে রকম একটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আর একদিন মা চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, সুকু ! সুকু !

বলেছি তো প্রথম ডাকেই উত্তর দেওয়ার মতো কঠিন তৎপরতা আমার নেই।

মা আবার আর্তস্বরে ডাকলেন, সুকু ?

আর তৃতীয় ডাকের অপেক্ষা না করে নিজেকে মার কাছে যথারীতি স্থাপন কবে তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশে যা দেখলুম তাতে যদি বিস্মিত হবার কারণ থাকে তবুও বিস্মিত হলুম না। দেখলুম কী, আমাদের ক্বচিৎ-আনা দুধের ভাঁড়টি একপাশে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে আর তারই পাশ

দিয়ে একটি সাদা পথ তৈরি করে এক প্রকাণ্ড ইঁদুর দ্রুত চলে গেল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, কোনও বিশেষ খবর শুনে কোনও বিশেষ উত্তেজনা বা ভাবান্তর প্রকাশ করা আমার স্বভাবে নেই বলেই বার-বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। কাজেই এখানেও তার অভিনয় হবে না, একথা বলাই বাহুল্য। দেখতে পেলুম, আমার মা'র পাতলা কোমল মুখখানি কেমন এক গভীর শোকে পাণ্ডুর হয়ে গেছে, চোখ দুটি গরুর চোখের মতো করুণ, আর যেন পদ্মপত্রে কয়েক ফোঁটা জল টল্‌টল করছে, এখুনি কেঁদে ফেলবেন। দুধ যদি বিশেষ একটা খাদ্য হয়ে থাকে এবং তা যদি নিজেদের আর্থিক কারণে কখনও দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটা যদি অকস্মাৎ কোনও কারণে পাকস্থলীতে প্রেরণ করবার অযোগ্য হয়, তবে অকস্মাৎ কেঁদে ফেলা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মা অমনি কেঁদে ফেললেন, আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, এমন একটা অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই। মার ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা আমার চোখের দৃষ্টিপথকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিল, আরও গভীর করে তুলল। আমি দেখতে পেলুম আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য প্রচুর অগ্নিবর্ষণ করছে, নীচে পৃথিবীর ধূলিকণা আরও বেশি অগ্নিবর্ষী। আমার হৃদয়ের ক্ষেতেও পুড়ে খাক হয়ে গেল। একটি নীল উপত্যকাও দেখা যায় না, দূরে জলের চিহ্নমাত্র নেই, জলস্তম্ভও নেই, মরীচিকা দিয়েছে ফাঁকি। ভাবলুম স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য গ্রন্থরাজি কোথায় পাওয়া যায় ? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী অমূল্য। সমগ্র মানব-সামাজের কল্যাণব্রতী শ্রী অরবিন্দ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ (তখনও ভাবতুম না দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কখনও শুরু হবে)। আমার মুখভঙ্গি চিন্তাকুল হয়ে এল, হাঁটু দুটি পেটের কাছে এনে কুকুরের মতো শুয়ে আমি ভাবতে লাগলুম—ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে নিয়েছি ভাল করে ভাবার জন্য—ভাবতে লাগলুম, এমন কোনও উপায় নেই যাতে এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ?

সন্ধ্যার পর বাবা এলেন, খবরটা শুনে এমন ভাব দেখালেন না যাতে মনে হয় তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন অথবা কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েছেন, বরং তাড়াতাড়ি বলতে আরম্ভ করলেন—যদিও তাড়াতাড়ি কথা বলাটা তাঁর অভ্যাস নয়—বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে। আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলুম এমন একটা কিছু হবে। আরে, মানুষের জান নিয়েই টানাটানি, দুধ খেয়ে আর কী হবে বলো !

দেখতে পেলুম, বাবার মুখটি যদিও শুক্‌নো তবু প্রচুর ঘামে তৈলাক্ত দেখাচ্ছে, গায়ের ভারী জামাটিও ঘামে ভিজে ঘরের ভিতর গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন একটা বিপর্যয়ের পরেও তাঁর এই অবিকৃতপ্রায় ভাব দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম। এই ভেবে যে, ক্ষতি যা হয়েছে হয়েছেই, তার আলোচনায় এমন একটা অবস্থা—যার কোনও পরিবর্তন নেই বরং একটা মস্ত গোলযোগের সূত্রপাত হবে—সেই থেকে রেহাই পাওয়া গেল, খুব শিগ্‌গির আর আমার মানসিক অবনতি ঘটবে না।

কিন্তু বাবা কিছুক্ষণ পরেই সুর বদলালেন : তোমরা পেলে কী ? কেবল ফূর্তি আর ফূর্তি ! দয়া করে আমার দিকে একটু চাও। আমার শরীরটা কি আমি পাথর দিয়ে তৈরি করেছি ? আমি কি মানুষ নই ? আমি এত খেটে মরি আর তোমরা ওদিকে ফূর্তিতে মেতে আছ ! সংসারের দিকে একবার চোখ খুলে চাও ? নইলে টিকে থাকাই দায় হবে।

আমার কাছে বাবার এই ধরনের কথা মারাত্মক মনে হয়। তাঁর এই ধরনের কথার পেছনে অনেক রাগ ও অসহিষ্ণুতা সঞ্চিত হয়ে আছে বলে আমি মনে করি।

সময়ের পদক্ষেপের সঙ্গে স্বরের উত্তাপও বেড়ে যেতে লাগল। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই কঠিন উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যে অদ্ভুত নগ্নতা প্রকাশ পাবে, তাতে আমার লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এমন অবস্থার সঙ্গে আমার একাধিকবার পরিচয় হলেও আমার গায়ের চামড়া তাতে পুরু হয়ে যায়নি, বরং আশঙ্কার কারণ আরও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে।

যে পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় তার ব্যর্থতার মাঝখানে এই নগ্নতার দৃশ্য আরও একটি বেদনার কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাবা বললেন, আর তর্ক কোরো না বলছি! এখান থেকে যাও, আমার সুমুখ থেকে যাও, দূর হয়ে যাও বলছি!

মা বললেন, অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। চেঁচামেচি করে পৃথিবীসুদ্ধ লোককে নিজের গুণপনার কথা জানানো হচ্ছে, খুব সুখ্যাতি হবে!

শুনতে পেলুম, এর পরে বাবার গলার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বোমার মতো ফেটে পড়ল! —তুমি যাবে? এখান থেকে যাবে কিনা বলো? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে? শয়তান মাগী! বাবা বিড়বিড় করে আরও কত কী বললেন, আমি কানে আঙুল দিলুম, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম একটি অসাড় মৃতদেহ হয়ে, আমার চোখ ফেটে জল বেরুল. বিপর্যয়ের পথে বর্ধিত হলেও আমার মনের শিশুটি আজন্ম যে শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছে তাতে এমন কোনও কথা লেখা ছিল না। মনে হল যেন আজ এই প্রথম বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলি চরম প্রহরী সেজে আমার দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। আগে এমন দেখিনি বা শুনিনি। তবু আমার অনুভূতির এই শিক্ষা কোত্থেকে এল? বলতে পারি আমার এই শিক্ষা অতি চুপি-চুপি জন্মলাভ করেছে, মাটির পৃথিবী থেকে সে এমনভাবে শ্বাস ও রস গ্রহণ করেছে যাতে টুঁ শব্দও হয়নি। ফুলের সুবাস যেমনি নিঃশব্দে পাখা ছড়িয়ে থাকে তেমনি ওর চোখে পাখা দুটিও নিঃশব্দে এই অদ্ভুত খেলার আয়োজন করতে ছাড়েনি। আরও বলতে পারি আমার মনের শিশুর বাঁচবার বা বড় হবার ইতিহাস যদি জানতে হয় তবে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু সেই শিক্ষা আজ কাজ দিল কই? বরং আরও কর্মহীনতার নামান্তর হল, আমার কাঁচা শরীরের হাত দুটি কেটে ভাসিয়ে দিল জলে, দুই চোখকে বাষ্পাকুল করে কিছুক্ষণের জন্য কানা করে দিল। আমি কী করব? আমার কিছু করবার আছে কি?

—শয়তান মাগী, যা বেরিয়ে যা!

আবার ভেসে এল অদ্ভুত কথাগুলি। এসব আমি শুনতে চাইনে তবু শুনতে হয়। বাতাসের সঙ্গে খাতির করে তা ভেসে আসবে, জোর করে কানের ভিতর ঢুকবে, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার মনের মাটিতে সজোরে লাথি মারবে।

—যা বলছি!

গোলমাল আরও খানিকটা বেড়ে গেল।

কিন্তু পরে মা বাষ্পাচ্ছন্ন স্বরে ডাকলেন, সুকু! সুকু!

ঠিক তখুনি উত্তর দিতে লজ্জা হল, ভয় করল, তবু আস্তে বললাম, বলো?

মা বললেন, দরজা খোল্।

ভয়ে-ভয়ে দরজা খুলে দিলুম, ভয় হল এই ভেবে যে এবার অনেক বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, যা শুনতেও ভয় পাই ঠিক তারই সামনে এক গম্ভীর বিচারপতি হয়ে সমস্ত উত্তেজনাকে শূন্যে বিসর্জন দিয়ে রায় দিতে হবে!

কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা আর হল না। মা ঘরের ভিতর ঢুকেই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাতলা পরিচ্ছন্ন শরীরখানি বেঁকে একখানা কাস্তের আকার ধারণ করল। কেমন অসহায় দেখাল ওঁকে।

ছোটবেলায় যাঁকে পৃথিবীর মতো বিশাল ভেবেছি, তাঁকে এমনভাবে দেখে এখন কত ক্ষীণজীবী ও অসহায় মনে হচ্ছে। যাকে বৃহত্তম ভেবেছি, সে এখন কত ক্ষুদ্র, সে এখনও শৈশব অতিক্রম করতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। আর আমি কত বৃহৎ, রক্তের চঞ্চলতায়, মাংসপেশীর দৃঢ়তায়, বিশ্বস্ত পদক্ষেপে কত উজ্জ্বল ও মহৎ, ওই হরিণের মতো ভীরু ছোট দেহের রক্ত পান করে একদিন জীবন গ্রহণ করলেও আজ আমি কত শক্তিমান! আমাকে কেউ জানে? এমনও তো হতে পারত, আজ

লণ্ডনের কোনও ইতিহাস-বিখ্যাত য়ুনিভার্সিটির করিডরের বুকে বিশ বছরের যুবক সুকুমার গভীর চিন্তায় পায়চারি করছে, অথবা খেলার মাঠে প্রচুর নাম করে সকল সহপাঠিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অথবা ত্রিশ বছরের নীলনয়না কোনও খাঁটি ইংরেজ মহিলার ধীর গভীর পদক্ষেপ ভীরুর মতো অনুসরণ করে একদিন তাঁর দেহের ছায়ায় বসে প্রেম যাচ্ঞা করেছে। এমন তো হতে পারত তবে সোনালী চুল, দীর্ঘ পক্ষ্মাবৃত চোখ, দেহের সৌরভ— আহা, কে সেই ইংরেজ মহিলা ? সে এখন কই ?... আর সেই স্বর্ণাভ রাজকুমার সুকুমারের মা ঐ ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সামান্য কাপড় বিছিয়ে শুয়ে ? এখান থেকে কত ছোট আর অসহায় মনে হয়। এক অর্থহীন গর্বে বুকটা প্রশস্ততর করে আমি একবার মার দিকে তাকালুম। ডাকলুম, মা ? ও-মা ?

কোনও উত্তর নেই। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোনও ভগ্ন নারীকণ্ঠ আমার কানের দরজায় এসে আঘাত করল না। ঘুমিয়ে পড়েননি তো ?

পরদিনও আবহাওয়ার গভীরতা কিছুমাত্র দূর হল না। মার এমন অস্বাভাবিক নীরবতা দেখে আমার ছোট ভাইবোনেরা প্রচুর আস্কারা পেয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। তারা নগ্নগাত্র হয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে লাগল। স্কুলহীন ছোট বোনটি তার নিত্যকার অভ্যাসমত প্রেমকুসুমাস্তীর্ণ এক প্রকাণ্ড উপন্যাস নিয়ে বসেছে, অন্য দিকে চাইবারও সময় নেই। সেদিন অনেক রাতে সারা বাড়ি গভীর ধোঁয়ায় ভেসে গেল, সকলের নাক-মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল, দম বন্ধ হয়ে এল। ছোট বোনদের খালি মাটিতে পড়ে ঘুমুতে দেখে রান্নাঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এখনও রান্না হয়নি, মা ?

চোখের জলে ভিজে উনানের ভিতর প্রাণপণে ফুঁ দিতে দিতে মা বললেন' না। এখন চড়াচ্ছি।

—এত দেরি হল কেন ?

মা চুপ করে রইলেন।

বুঝতে পারলুম। সেই পুরনো কাসুন্দি। বুঝতে পারলুম এ জিনিস এড়াতে চাইলেও সহজে এড়াবার নয়,—ঘুরে-ফিরে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়, পাশ কাটাতে চাইলে হাত চেপে ধরে. কোনরকমে এড়িয়ে গেলেও হাত তুলে ডাকতে থাকে। এই ডাকাডাকির ইতিহাসকে যদি আগাগোড়া লিপিবিদ্ধ করি তবে সারা জীবন লিখেও শেষ করতে পারব না, কেউ পারবে না, তাতে কতকগুলি একই রকমের চিত্র গলাগলি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়াবে, আর শৌখিন পাঠকের বিরক্তিভাজন হবে। আমি তো জানি পাঠকশ্রেণী কে ? তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে কান্নাকাটির ন্যাকামি চলবে না, কিংবা কিছুটা লিখলেও টাকার হিসাবটাকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে হবে বা হাসি মুখে বরণ করতে হবে। যেমন আমার বাবা অনেক সময় করেন—প্রচুর অভাবের চিত্রকেও এক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে পরম আনন্দে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসতে থাকেন। কিংবা যেমন আমাদের পাড়ার প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা রক্ষিতমশায় করেন—ঘরে অতি-শুকনো স্ত্রী আর এক পাল ছেলেমেয়েদের অভুক্ত রেখেও পথে-ঘাটে রাজা-উজির মেরে আসেন। বা আমাদের প্রেস-কর্মচারী মদন—শূন্যতার দিনটিকে উপবাসের তিথি বলে গণ্য করে, কখনও পদ্মাসন কেটে বসে নিমীলিত চোখে দুই শক্ত দীর্ঘ বাহু দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঈশ্বরকে সশরীরে ডেকে আনে। এমন হয়। এ ছাড়া আর উপায় কী ? স্বর্গের পথ রুদ্ধ হলে মধ্যপথে এসে দাঁড়াই, জীবন আমাদের কুক্ষিগত করলেও জীবনকে প্রচুর অবহেলা করি, প্রকৃতির করাঘাতে ডাক্তারের বদনাম গাই, অথবা উর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করি। এসব দেখে আমি একদিন সিদ্ধান্ত করেছিলুম যে দুঃখের সমুদ্রে যদি কেউ গলা পর্যন্ত ডুবে থাকে তবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্তের নাম করতে গিয়ে যাদের জিহ্বায় জল আসে সেদিন আমি তাদেরই একজন হয়েছিলুম। বন্ধুকে এক ধোঁয়াটে রহস্যময় ভাষায় চিঠি লিখলুম : "এরা কে জানো? এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে। যে ফুল অনাদরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে মাটিতে এরা তাই। এরা তৈরি করছে বাগান অথচ ফুলের শোভা দেখেনি। পেটের ভিতর সূঁচ বিঁধছে প্রচুর,

কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নয়। পরিহাস ! পরিহাস ! · · · ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অজ্ঞতায় নিজের মনে যে কল্পনার সৌধ গড়ে তুললুম, তাতে নিজের মনে-মনে প্রচুর পরিতৃপ্ত হলুম। যে উপবাসকৃশ বিধবারা তাঁদের সক্ষম মেয়েদের দৈহিক প্রতিষ্ঠায় সংসাব যাত্রার পথ বেয়ে-বেয়ে কোনওরকমে কালাতিপাত করছেন, তাঁদের জন্যে করুণা যেমন হল, মনে-মনে পুজো করতে লাগলুম আরও বেশি।

কিন্তু সে সব ক্ষণিকের ব্যাপার। শরতের মেঘের মতো যেমনি এসেছিল তেমনি মিলিয়ে গেল, মগজেব মধ্যে জায়গা যদিও একটু পেয়েছিল, বেশিদিন থাকবার ঠাঁই পেল না। আজ ভাবছি আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। নইলে এক অসম্পূর্ণ সংকীর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে থাকত, তখন সে ভাবনা নিয়ে মনে-মনে পরিতৃপ্ত থাকতুম বটে, কিন্তু গতির বিরুদ্ধে চলতুম, এক ভীষণ প্রতিক্রিয়ার বিষে জর্জবিত হতুম।

এমন দিনে এক অলস মধ্যাহ্নের সঙ্গে আমি সাংঘাতিক প্রেমে পড়ে গেলুম। সেই দুপুরটিকে যা ভাল লেগেছিল কেবল মুখে বললে তা যথেষ্ট বলা হবে না। সেদিন যতটুকু আকাশকে দেখতে পেলুম তার নীলকে এত গভীর মনে হল যে চোখের ওপর কে যেন কিছু শীতল জলের প্রলেপ দিয়ে দিলে। ভাবনার রাজ্যে পায়চারি করে আমি আমার মীমাংসার সীমান্তে এসে পৌঁছলুম সেই মধ্যাহ্নে, সেখানে রাখলুম দৃঢ় প্রত্যয়। আকাশের নীলিমায় দুই চোখকে সিক্ত করে আমি দেখতে পেলুম, চওড়া রাস্তার পাশে সারি-সারি প্রকাণ্ড দালান, তার প্রতি কক্ষে সুস্থ সবল মানুষের পদক্ষেপ, সিঁড়িতে নানারকম জুতোর আওয়াজ, মেয়েপুরুষের মিলিত চিৎকার-ধ্বনি পৃথিবীর পথে-পথে বলিষ্ঠ দুয়ারে হানা দেয়, বলিষ্ঠ মানুষ প্রসব করে, আমি দেখতে পেলুম ইলেকট্রিক আর টেলিগ্রাফ তারের অরণ্য, ট্রাক্টর চলেছে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে—অবাধ্য জমিকে ভেঙে-চুরে দলে-মুচড়ে, সোনার ফসল আনন্দে গান গায়, আর যন্ত্রের ঘর্ষণে ও মানুষের হর্ষধ্বনিতে এক অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি হল। একদা তা বাতাসে মাটির মানুষের প্রতি উপহাস করে বিপুল অট্টহাসি হেসেছে, সেই বাতাসের হাত আজ করতালি দেয় গাছের পাতায়-পাতায়। কেউ শুনতে পায় ? যারা শোনে তাদের নমস্কার।—তাই অলস মধ্যাহ্নকে মধুরতর মনে হল। দেখলুম এক নগ্নদেহ বালক রাস্তার মাঝখানে বসে এক ইটের টুকরো নিয়ে গভীর মনোযোগে আঁক কষছে। কোন্ বাড়ি থেকে পচা মাছের রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে বেশ, সঙ্গীত পিপাসুর বেসুরো গলায় গান শোনা যাচ্ছে হারমনিয়ম-সহযোগে এই অসময়ে, রৌদ্র প্রচণ্ড হলেও হাওয়া দিচ্ছে প্রচুর, ও বাড়ির এক বধূ রাস্তার কলে এইমাত্র স্নান করে নিজ বুকের তীক্ষ্ণতাকে প্রদর্শনের প্রচুর অবকাশ দিয়ে সংকুচিত দেহে বাড়ির ভিতর ঢুকল, দুটি মজুর কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়লা-মলিন বেশে আবার দৌড় দিচ্ছে। এ দৃশ্য বড় মধুর লেগেছে—অবশ্য কোনও বুর্জোয়া চিত্রকরের চিরন্তনী চিত্র বলে নয়। এ চিত্র যেমন আরাম দেয়, তেমনি পীড়াও দেয়। আমার ভাল লেগেছে এই স্মরণীয় দিনটিতে এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রাজত্বে খানিকটা পায়চারি করতে পেরেছে বলে। চমৎকার ! চমৎকার !

অনেক রাত্রে ইঁদুরের উৎপাত আবার শুরু হল, ওরা টিন আর কাঠের বাক্সে দাপাদাপি শুরু করে দিল, বীরদর্পে চোখের সামনে দিয়ে ঘরের মেঝে অতিক্রম করতে লাগল, কোথাও কোনও বাক্সের ভেতর থেকে লেজ বার করে দারুণ উপহাস করতে লাগল।

রান্না শেষ করে এসে মা সকলকে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন, ওরে মণ্টু, ওরে ছবি, ওরে নারু, ওঠ্ বাবা ওঠ্ !

মণ্টু উঠেই প্রাণপণ চিৎকার আরম্ভ করে দিল। ছবি যদিও এতক্ষণ তার উপন্যাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল, এখন বই-টই ফেলে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল।

—ওরে ছবি, খেতে আয়, খাবি আয় !

বার বার ডাকেও ছবি টুঁ শব্দটি করে না।

মা ভগ্নকণ্ঠে বললেন, আমার কী দোষ বল্ ? আমার ওপর রাগ করিস কেন ? গরিব হয়ে জন্মালে····

মার চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠল, গলা কেঁপে গেল। আমি রাগ করে বললুম, আহা, ও না খেলে না খাবে, তুমি ওদের দাও না ?

মধ্যরাত্রির ইতিহাস আরও বিস্ময়কর।

এক অনুচ্চ কণ্ঠের শব্দে হঠাৎ জেগে উঠলুম। শুনতে পেলুম বাবা অতি নিম্নস্বরে ডাকছেন, কনক, ও কনক, ঘুমুচ্ছ ?

বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধরে ! ভারী চমৎকার মনে হল, মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলুম, আর আমার প্রতি ভালবাসা কামনা করতে লাগলুম তাঁর কাছ থেকে। যুবক সুকুমার একদিন তার বৌকেও এমনি নাম ধরে ডাকবে, চিৎকার করে ডেকে প্রত্যেকটি ঘর এমনি সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত করে তুলবে।

—কনক ? ও কনক ?

প্রৌঢ়া কনকলতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনও উত্তর দিলেন না, কোনবার কঁকিয়ে উঠলেন, কোনবার উঃ-আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিম্নগামী হলুম। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলুম। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলুম, শরীর দিয়ে ঘামের বন্যা ছুটল।

ওদিকে মধ্যরাত্রির চাঁদ উঠেছে আকাশে, পৃথিবীর গায়ে কে এক শাদা মসলিনের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে এনেছে ঠাণ্ডা জলের স্রোতের মতো বাতাস, আমার ঘরের সামনে ভিখিরি কুকুরদের সাময়িক নিদ্রাময়তায় এক শীতল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও বাড়ির ছাদে নিদ্রাহীন বানরদের অস্পষ্ট গোঙানি শোনা যায়। মধ্যরাত্রের প্রহরী আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবে কখন ?

অবশেষে প্রৌঢ়া কনকলতার নীরবতা ভাঙল ; তিনি আবার আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, অল্প একটু ঘোমটা টেনে কাপড়ের প্রচুর দৈর্ঘ্য দিয়ে নিজেকে ভালভাবে আচ্ছাদিত করলেন. তারপর এক অশিক্ষিতা নববধূর মতো ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন। অঙ্গভঙ্গির সঞ্চালনে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গীতের আয়নায় আমার কাছে সমস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি লক্ষ করলুম দুই জোড়া পায়ের ভীরু অথচ স্পষ্ট আওয়াজ আস্তে আস্তে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে বাবা গুন্‌গুন্ সুরে গান গাইতে লাগলেন। চমৎকার মিষ্টি গলা, বেহালার মতো শোনা যাচ্ছে। সেই গানের খেলায় আলোর কণাগুলি আরও শাদা হয়ে গেছে, মনে হয় এক বিশাল অট্টালিকার সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে সেই গানের রেখা পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ রাত্রির বাতাস অপূর্ব স্নেহে মন্থর হয়ে এসেছে। একটা কাক রোজকার মতো ডেকে উঠেছে। বাবাকে গান গাইতে আরও শুনেছি বটে, কিন্তু আজকের মতো এমন মধুর ও গভীর আর কখনও শুনিনি। তাঁর মৃদু-গম্ভীর গানে আজ রাত্রির পৃথিবী যেন আমার কাছে নত হয়ে গেল। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিনকার প্রাণখোলা হাসিতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠলুম। হাসির ঐশ্বর্যে বাড়ির ইটগুলিও কাঁপছে। বাবা বললেন, পণ্ডিতমশাই, ও পণ্ডিতমশাই, উঠুন। আর কত ঘুমুবেন ? সকালে না উঠলে বড়লোক হওয়া যায় কি ? উঠুন ?

আমি অনেক কষ্টে চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম, কখন ভোর হয়ে গেছে। বাবার স্নেহময় কথায় আমি কখনও হাসিনে, কেমন বাধে, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে কি না, এক কুড়ি বছর তো পেরিয়ে চললুম।

মশারির দড়ি খুলতে-খুলতে বাবা বললেন, পৃথিবীতে যত গ্রেট মেন দেখতে পাচ্ছ, সকলেরই ভোরে ওঠবার অভ্যাস ছিল। আমার বাবা, মানে তোমার ঠাকুরদারও এমনি অভ্যাস ছিল। আমরা

যত ভোরেই উঠি না কেন, উঠেই শুনতে পেতুম বাইরের ঘরে তামাক খাওয়ার শব্দ হচ্ছে। অমন অধ্যবসায়ী না হলে আর একটা জীবনে অত জমি-জমা, অত টাকা-পয়সা করে যেতে পারেন ! তিনি তো সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমরাই কিছু রাখতে পারলুম না। কিন্তু উঠুন পণ্ডিতমশাই, যারা ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে জীবনে তারা কখনও উন্নতি করতে পারে না।

অতটা মাতব্বরি সহ্য হয় না, জীবনে একদিন মাত্র সকালে উঠেই বাড়িসুদ্ধ লোক মাথায় তুলেছেন !

সমস্ত বাড়িটা খুশির বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠল। ওদিকে মণ্টু সেলুনে চুল ছাঁটাবার জন্য পয়সা চাইতে শুরু করেছে, ঘণ্টাখানেক পরে ও পয়সা না পেলে মেঝেয় আছাড় খেয়ে তারস্বরে কাঁদবে। নারু পক্-পক্ বাক্যবর্ষণ করে সকলের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টায় আছে ! ছবি এইমাত্র তার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় নায়িকার শয়নঘরে নায়কের অভিযান দেখে মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠছে।

বাবা দারুণ কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন, এঘর-ওঘর পায়চারি করতে লাগলেন।

এক সময় আমার কাছে এসে বললেন, তোমরা থিয়োরিটা বাব করেছ ভালই, কিন্তু কার্যকরী হবে না, আজকাল ওসব ভালমানুষি আর চলবে না। এখন কাজ হলো লাঠির। হিটলারের লাঠি, বুঝলে পণ্ডিতমশাই ?

আমি মনে মনে হাসলুম। বাবা যা বলেন তা এমনভাবে বলেন যে মনে-মনে বেশ আমোদ অনুভব করা যায়। তাঁর কী জানি কেন ধারনা হয়েছে, আমরা সব ভালমানুষের দল, নিজের খেয়ে পরের চিন্তা করি, শুষ্কমুখ হয়ে শীতল জল বিতরণ করতে চাই, নিজেরা স্বর্গচ্যুত, অথচ পরের স্বর্গলাভের পথ আবিষ্কারে মত্ত !

আবার বললেন, তোমাদের রাশিয়া কেবল সাধুরই জন্ম দিয়েছে, অসাধু দেয়নি। কেবল মার খেয়ে মরবে। লেনিন তো মস্ত বড় সাধু ছিলেন, যেমনি টলস্টয় ছিলেন। কিন্তু ওরা লাঠির সঙ্গে পারবেন কি ? কখনও নয় !

বলতে ইচ্ছা হয়, চমৎকার ! এমন স্বকীয়তা, এমন নতুনত্ব আর কোথাও চোখে পড়েছে ? এমন করে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না, এটা জোর করে বলতে পারি। তিনি একবার যা বললেন তা ভুল হলেও তা থেকে এক চুল কেউ তাঁকে সরাবে, এমন বঙ্গসন্তান ভূ-ভারতে দেখিনে। এক হিটলারি দম্ভে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু একমাত্র আশার কথা এই যে, এসব ব্যাপারে তিনি মোটেই সীরিয়স্ নন, একবার যা বলেন দ্বিতীয়বার তা বলতে অনেক দেরি করেন। নইলে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। পৈত্রিক অধিকারে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার অপব্যবহার করতেন সন্দেহ নেই।

ওদিকে কর্মব্যস্ত মাকে দেখতে পাচ্ছি। গভীর মনোযোগে তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, কোথাও এতটুকু দৃষ্টিপাত করবার সময় নেই যেন। কাঁধের ওপর দুই গাছি খড়ের মতো চুল এলিয়ে পড়েছে, তার ওপর দিয়েই ঘন-ঘন ঘোমটা টেনে দিচ্ছেন, পরনে একখানা জীর্ণ মলিন কাপড়, ফর্সা পাদুটি জলের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত শীর্ণ হয়ে এসেছে। পেছনে-পেছনে নারু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ছেড়ে বাবা এবার ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিলেন। নারুকে ডেকে বললেন, নারু, বাবা তোমার কী চাই বলো ?

নারু তার ছোট-ছোট ভাঙা দাঁতগুলি বের করে অনায়াসে বলে ফেলল, একটা মোটর-বাইক। সার্জেন্টরা কেমন সুন্দর ভট্‌ভট্ করে ঘুরে বেড়ায়, না বাবা ?

কিন্তু মণ্টুর কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে। সে হঠাৎ পেছন ফিরে মুখটা নীচের দিকে নিয়ে কামানের মতো হয়ে বললে, বাবা, এই দ্যাখো ?

দেখতে পাওয়া গেল, তার পেছনটা ছিঁড়ে একেবারে ক্ষতবিক্ষতহয়ে গেছে। বাবা হো-হো করে

হেসে উঠলেন, বললেন, বাঃ বেশ তা হয়েছে, মণ্টুবাবুর যা গরম, এবার থেকে দুটি জানলা হয়ে গেল, বেশ তো হল। এবার থেকে হু-হু করে কেবল বাতাস আসবে আর যাবে, চমৎকার, না ?

মণ্টু সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে বুদ্ধিমানের মতো হেসে উঠল ; নারু তার ভাঙা দাঁত বের করে আরও বেশি করে হাসতে লাগল, বাবাও সে হাসিতে যোগ দিলেন। আমাদের সামান্য বাসা এক অসামান্য হাসিতে নেচে উঠল, গুম্‌গুম্‌ করতে লাগল।

হাসলুম না কেবল আমি। শুধু মনে-মনে উপভোগ করলুম। ভাবলুম, আনন্দের এই নির্মল মুহূর্তগুলি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে খুশির আর অন্ত থাকে না। মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে।

বাবার পরবর্তী অভিযান হল রান্নাঘরে। একখানা পিঁড়ি পেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হাসিমুখে বাবা বললেন, আজ কী রাঁধবে গো ?

মুখ ফিরিয়ে অজস্র হেসে মা বললেন, তুমি যা বলবে !

বাবাকে এবার ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসল। আমি যা বলব ঠিক তো ? বলি, রাঁধবে মাংস, পোলাও, দই সন্দেশ ? রাঁধবে চাটনি, চচ্চড়ি, রুই মাছের মুড়ো ? রাঁধবে ? রাঁধবে আরও আমি যা বলব ?

—ও মাগো ! থাক থাক, আর আর বলতে হবে না ! মা দুই হাত তুলে মাথা নাড়তে লাগলেন, খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলেন।

ব্যাপার দেখে নারু দৌড়ে গেল, দুজনের দিকে দুইবার চেয়ে তারপর মাকে মুচকে হাসতে দেখে বললে, মাগো কী হয়েছে ? অমন করে হাসছ কেন ? বাবা তোমায় কাতুকুতু দিয়েছে ?

—আরে, না রে না, অত পাকামি করতে হবে না। খেল গে যা—বাঁ হাত তুলে মা বাইরের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বাবা আবার বললেন, আচ্ছা, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখতে গিয়েছিলুম সেদিনের কথা মনে পড়ে ?

একটুও চিন্তা না করে মা বললেন, আমার ওসব মনে-টনে নেই।

—আহা, বিলের ধারে মাঠে যে গরু চরাচ্ছিলে ?

মার চোখ বড় হয়ে গেল : ওমা, আমি কি ভদ্দরলোক নই গো যে মেয়েমানুষ হয়েও মাঠে-মাঠে গরু চরাব ?

গরু চরানোটা কি অপরাধ ? দরকার হলে এখানে-সেখানে একটু নেড়েচেড়ে দিলে দোষ হয় ? আসল কথা তোমার সবই মনে আছে ইচ্ছে করেই কেবল যা-তা বলছ।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব মনে আছে, সব মনে আছে !

মৃদু মৃদু হেসে বাবা বললেন, নৌকো থেকেই দেখতে পেলুম বিলের ধারে কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার রাত্রে, একটিমাত্র দীপশিখার মতো। নৌকো থেকে নেমেও দেখলুম, সেই মেয়ে তার জায়গা থেকে এতটুকুও সরে দাঁড়াচ্ছে না বা পাখির মতো বাড়ির দিকে উড়ে চলে যাচ্ছে না, বরং আমাদের দিকে সোজাসুজি চেয়ে আছে, অপরিচিত বলে এতটুকু লজ্জা নেই, কাছে গিয়ে দেখলুম ঠিক যেন দেবী-প্রতিমা, খোলা মাঠে জলের ধারে মানিয়েছে বেশ, গভীর বর্ষায় আরও মানাবে। তারপর এক ভাঙ্গা চেয়ারে বসে ভাঙ্গা পাখার বাতাস খেয়ে যাকে দেখলুম সে-ও সেই একই মেয়ে, কিন্তু এবার বোবা, লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।—বাবা হা-হা করে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। কতক্ষণ পরে বললেন, তোমার কী চাই—বললে না?

—আমার জন্যে একখানা রান্নার কাপড় এনো।

—লাল রঙের ?

—হ্যাঁ।

তারপর কার জন্যে কী এনেছিলেন খবর রাখি নে, কিন্তু নিজের জন্যে ছ'আনা দামের এক জোড়া চটি এনেছিলেন দেখেছি। মাত্র ছ'আনা দাম। বাবা এ নিয়ে অনেক গর্ব করেছেন, কিন্তু একেবারে কাঁচা চামড়া বলে কুকুরের আশঙ্কাও করেছেন।

কুকুরের কথা জানি নে, তবে কয়েকদিনে পরেই জুতো-জোড়ার এক পাটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ বলতে পারে না। আশ্চর্য !

পরদিন দুপুরবেলা রেলওয়ে ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে যেতে কার ডাকে মুখ ফিরিয়ে তাকালুম। দেখি শশধর ড্রাইভার হাত তুলে আমায় ডাকছে। এখানে ইউনিয়ন করতে এসে আমার একেবারে প্রথম আলাপ হয়েছিল এই শশধর ড্রাইভারের সঙ্গে ? সেদিন সঙ্গে কমরেড বিশ্বনাথ ছিল। তখন গম্ভীরভাবে শশধর বলেছিল, দেখুন বিশ্ববাবু, সায়েব সেদিন আমায় ডেকেছিল।

—কেন ?

শালা বলে কি না, ড্রাইভার, ইউনিয়ন ছেড়ে দাও, নইলে মুস্কিল হবে বলছি। শুনে মেজাজটা জবর খারাপ হয়ে গেল। মুখের ওপর বলে এলুম, সায়েব আমার ইচ্ছে আমি ইউনিয়ন করব। তুমি যা করতে পারো, করো। এই বলে তখুনি ঠিক এইভাবে চলে এলুম। আসবার ভঙ্গিটা দেখাবার জন্যে শশধর হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত গেল, তারপর আবার যথাস্থানে ফিরে এল। আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেদিনের দৃশ্যটি আমার চমৎকার লেগেছিল। আমার সেই মধ্যাহ্নের ট্রাক্টর-স্বপ্নের ভিত পাকা করতে আরম্ভ করলুম সেই দিন থেকে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম। তাদেরও ধন্যবাদ, যারা আমাকে আমার এই অসহায়তার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ! সেবাব্রত নয়, মানবতা নয়, স্বার্থপরতা অথচ শ্রেষ্ঠ উদারতা নিয়ে এক ক্লান্তিহীন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন !

আমি শশধরের কাছে গেলুম। শশধর বললে, উঠুন। সে আমাকে তার এঞ্জিনে উঠিয়ে নিল। তারপর একটা বিড়ি হাতে দিয়ে বললে, খান সুকুমারবাবু।

বিকেলের দিকে একটা গ্যাঙের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করবার ছিল। ওরা আমার দিকে কেউ তাকাল, কেউ তাকাল না। অদূরে এঞ্জিনের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। পয়েণ্টস্‌ম্যান-গানারদের চিৎকার আর হুইসিল শোনা যাচ্ছে।

ইয়াসিন এতদিন পরে ছুটি থেকে ফিরেছে দেখলুম। আমাকে দেখে কাজ থামিয়ে বললে, ওরা কী বলছিল জানেন ?

হেসে বললুম, কী ?

বলছিল, আপনি একটা ব্যারিস্টার হলেন না কেন ?

সকলে হো-হো হেসে উঠল, আমিও হাসতে লাগলুম।

মেট সুরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বললে, তোমার কাছে আমাদের আর একটি নিবেদন আছে, ইয়াসিন মিএগ্রা ! আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে তোমায় স্কুলে পড়াতে চাই।

এবার হাসির পালা আরও জোরে। কাজ ফেলে সবাই বসে পড়ল।

ইয়াসিন রেগে গেল, বললে, বাঃ, বাঃ, বাঃ, খালি ঠাট্টা আর ঠাট্টা, ঠাট্টা, না ! চারটে পয়সা দিয়েই খালাস, না ? চারটে পয়সা দিলেই বিপ্লব হবে, না ? বিপ্লব আকাশ থেকে পড়বে, না ?—একটু শান্ত হয়ে ইয়াসিন শেষে একটা গল্প বললে। গল্পটি হচ্ছে এই : সে এবার বাড়ি গিয়ে তার গাঁয়ের চাষীদের একটা বৈঠকে যোগ দিয়েছিল। সেই বৈঠকে যে লোকটা বক্তৃতা করেছিল, সে হঠাৎ তার দিকে চেয়ে বললে, ভাই ইয়াসিন, তোমাদের ওখানে ইউনিয়ন নেই ? ইয়াসিন বুক ঠুকে বললে, আলবত আছে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে বুক পকেট থেকেএকখানা রসিদ বের করে দিল। লোকটা তখন ভয়ানক খুশি হয়ে বলেছিল, তুমি যে আমাদের কমরেড, ভাই ইয়াসিন ! তুমি যে আমাদেরই। ইয়াসিন তখন বিচক্ষণের মতো হেসেছিল।—দুনিয়ার সবাই এরকম একজোট হচ্ছে, আর আমরাই কেবল চুপ করে বসে থাকব, না ? চারটে পয়সা দিলেই খালাস, না ? বলতে বলতে ইয়াসিনের ঘর্মাক্ত মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে কাজে লেগে গেল, গভীর মনোযোগে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে কাজ করতে লাগল।

আমি ফিরে এলুম। সাম্যবাদের গর্ব, তার ইস্পাতের মতো আশা, তার সোনার মতো ফসল বুকে করে আমি ফিরে এলুম। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝির্‌ঝিরে বাতাসের সঙ্গে শেড-ঘর থেকে তেল আর কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ আসছে বেশ। আমি বাঁ দিকে শেড-ঘর রেখে পথ অতিক্রম করতে লাগলুম। একটু এগিয়ে দেখি লাইনের ওপর অনেকগুলি এঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় গভীর ধ্যানে বসেছে যেন। আমার কাছে ওদের মানুষের মতো প্রাণময় মনে হল। এখন বিশ্রাম করতে বসেছে। ওদের গায়ের মধ্যে কত রকমের হাড় কত কলকব্জা, মাথার ওপর ওই একটিমাত্র চোখ, কিন্তু কত উজ্জ্বল। মানুষ ওদের সৃষ্টিকর্তা। হাসি নেই, কান্না নেই, কেবল কর্মীর মতো রাগ। এমন বিরাট কর্মী পুরুষ আর আছে ! সত্য কথা বলতে কী, এত কলকব্জার মাঝে, এতগুলি এঞ্জিনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে আমার শরীরে কেমন একটা রোমাঞ্চ হল। আমি হতভম্ব হয়ে তাদের মাংসহীন শরীরের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বাসায় ফিরে এলুম।

কয়েকদিন পরে কোনও গভীর প্রত্যূষে একটি ইঁদুর-মারা কল হাতে করে আমার বাবা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসতে লাগলেন। দারুণ খুশিতে নারু আর মণ্টুও তাঁর দুই আঙুল ধরে বানরের মতো লাফাচ্ছিল। কয়েক মিনিট পরেই আরও অনেক ছেলেপুলে এসে জুটল। একটা কুকুর দাঁড়াল এসে পাশে। উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ লাঠি, কেউ বড়-বড় ইট নিয়ে বসল রাস্তার ধারে।

ব্যাপার আর কিছু নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরা পড়েছে।

পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪১

পলাশ সন্ধ্যা

ননী ভৌমিক

এক এক করে এসে গেল যা আসবার। লটবহর, দড়িদড়া, খোঁটাখুঁটি, শিক-পাটাতন। বড় বড় প্যাকিং বাক্স, বা আসবার এল পেট-ভর্তি মাল নিয়ে, তারপর হঠাৎ কী করে টিকিটঘর, ডায়াস, আর বাজনাদারদের মঞ্চ হয়ে গেল দেখে অবাক লাগারই কথা। তালে তালে বাড়ি মেরে শিকগুলো যখন পোঁতা হচ্ছিল তখনও কিছু বোঝা যায়নি। তারপর হৈ হৈ করে মাঝখানের মোটা কাঠের পিলারটা যখন খাড়া করা হল, আর সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে উঠল একটা মস্ত তাঁবুর চাঁদোয়া তখন অবাক হয়ে গেল সবাই !

তাঁবুটা নতুন নয়। পুরনো ছেঁড়া, কাটা। কিন্তু সে শুধু মাথার ওপরটায়। জায়গায় জায়গায় বড় বড় চৌকো ফালি খসে গেছে কেমন করে। খেলা আরম্ভ হবার আগের দিন তাঁবুর চারপাশ যা দিয়ে ঢাকা হল, সেটা পুরনো হতে পারে কিন্তু নিশ্ছিদ্র। বিনা টিকিটে, ভেতরে না ঢুকে, বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে কেউ দেখবে সে সুযোগ একটুও রাখা হল না।

আর তাঁবু আর বেঞ্চি আর গ্যালারি যখন আশ্চর্য দ্রুততায় সেজে উঠছে তখন এল দ্বিতীয় দফার ক্যারাভান—একটা ধুলিধূসর, চামড়াঝোলা, চোখে পিঁচুটি-পড়া বেঁটে হাতি। একটা বিবর্ণ বাঘের খাঁচা। একটা রামছাগল। দুটো বাদর, ঘোড়া। নাকে দড়ি বাঁধা একটা ভালুক। যতক্ষণ তারা এল ততক্ষণ দেখা গেল তাদের। তার পরেই তাঁবুর পেছন দিককার এক ঘেরা জায়গায় তারা আশ্রয় নিলে। উঁকি দিয়ে দেখতে গেলেই তাড়া খেতে হচ্ছিল। এবং সবশেষে এল খেলোয়াড়ের দল। কুলি-মিস্ত্রিদের সঙ্গে মিশে তারাও এমন পোশাকে এমনভাবে খাটাখাটনি করলে যে প্রথম দিন-দুইয়ের মধ্যে বোঝাই গেল না, এদের মধ্যে কারা খেলোয়াড়, কারা রাত্রে ঝকঝকে ফটফটে সাজ-পোশাক আদব-কায়দায় মুগ্ধ করে দেবে দর্শকদের।

কিন্তু প্রথম দিন থেকেই আশেপাশের গঞ্জ-শহরের সকলেই যাকে চিনে ফেলল, সে ব্যানার্জি,—দি গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাসের সেই হল ম্যানেজার। প্রথম দিন এসেই সে আলাপ জমিয়ে নিলে আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ সব ক'টি লোকের সঙ্গে, ইউনিয়ন বোর্ডর প্রেসিডেন্ট, মেলা কমিটির সেক্রেটারি, সার্কেল হাকিম, দু'মাইল দূরের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকের সস্ত্রীক আফিসার থেকে শুরু করে বাজারের একমাত্র মিষ্টির দোকানের মালিক এবং আশেপাশের ভাঙা জমিদার বাড়ির বেকার বখাটে জনাকয়েক যুবকের সঙ্গে। পকেট থেকে এমন সব সস্তা সিগারেট বার করে অফার করলে যা এসব এলাকায় এখনও কেউ দেখেনি, নিজে যেচেই খসখস করে কয়েকটা পাশ লিখে দিলে। তারপর হাসতে হাসতে জানালে, কী জানেন, ইয়ং ম্যানদের আমি কিছু কিছু পাশ এমনিতেই দিই। এটা আমার একটা ফ্যান্সি। দেখুন আপনারা, দেখবার মতো জিনিস যদি হয় তো দেখুন। ··তবে হ্যাঁ, এক একটা জায়গায় গেছি কত রকম লোক আছে বুঝলেন না। কেউ বলে তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেবে, বয়কট করবে। আবার আমি যদি বলি, কুছপরোয়া নেহি, দেখি কে কে করতে পারো, চলে এসো,—তাহলে কি সাধ্যি আছে ওদের। কিন্তু ঝামেলা আমি করতে চাই না। তাই বলছিলাম, এ জায়গাটা অবিশ্যি তেমন নয় ; সে সব আমি আগেই খোঁজ নিয়েছি। তবু আপনারা এখানকার স্থানীয় লোক। দেখবেন, যেন অকারণে কোনও হাঙ্গামা হুজ্জত কেউ না বাধায়। পাশ চান ? কাম অন্, কটা চাই ? আপনারা ইয়ং ম্যান ! আপনাদের তো দেবই।·····

তারপর কথা শেষ করে চলে যাবার সময় পকেট থেকে আবার সেই শস্তা আর অদ্ভুত অজানা সব সিগারেট বার করলে ব্যানার্জি। বললে, দেখুন আমিও ভদ্রলোকের ছেলে। লেখাপড়াও কিছু করেছি। তবু কী জানেন, এই দিকেই কেমন একটা ঝোঁক এসে গেছে। সেই যে শেকস্পিয়র বলেছিল না, দি ওয়ার্লড ইজ এ স্টেজ। তা আমি বলি, দি ওয়ার্লড ইজ এ সার্কাস। ঠিক কি না বলুন?

আশেপাশের গাঁয়ের ভাঙা জমিদার বাড়ির উঠতি বেকারের দল সবটা না বুঝেও সোৎসাহে সায় দিয়ে হাসল 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করে ; 'এ্যাই ! এ্যাই একটো খাঁটি কথা আপনি শোনাইলেন আমাদিগে।'

তারপর ছোঁক ছোঁক করে ঘুরতে লাগল জানোয়ার রাখার জায়গাটার বাঁ দিকে। অত ঢাকঢুক নেই, তবু কাঁটাতারে জায়গাটা ঘেরা। ছোট ছোট তাঁবু। তাঁবুর দড়িতে, কাঁটাতারের গায়ে টুকিটাকি রঙিন ব্লাউজ, কাঁচুলি, শালোয়ার শুকোতে দেওয়া। মেয়েরা থাকে এদিকটায়, বাঙালি মেয়ে।

দি গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাসের প্রধান আকর্ষণই হল এই মেয়েদের খেলা।

জোয়ান বেকারের দল খানিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে তারপর ধমক দেয় অন্যদের। 'এ্যাই ইদিকে কী? ইদিকে কী বটে ? লাজসরম নাই তুদের ?'

না লাজসরম নাই। কালোঝুলো গেঁয়ো একদল চাষি মান্দের গাড়োয়ান। গাঁয়ের ডাঙা ভদ্রলোকের পাড়া ছাড়িয়ে দূরে যারা থাকে, সারা সার্কাসটার চারপাশে উৎসুখ হয়ে উঁকি দিয়ে বেড়িয়েছে ওরা— ছোঁড়া, জোয়ান, মাঝবয়সী, বুড়ো—নানান বয়সের একপাল অত্যন্ত কৌতূহলী। তারপর হাঁ করে এসে তাকিয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েদের দিকে : সার্কাসের মেয়ে ! এই বাবা।

এই তাকিয়ে থাকাটা কিন্তু বেলার তেমন খারাপ লাগেনি প্রথমে। চৌকো, মোটা, কালোঝুলো নানান বয়সী গ্রাম্য মুখগুলোর মধ্যে একটা গেঁয়ো নির্বুদ্ধিতা, একটা সরল কৌতূহল ছাড়া আর কিছু সে দেখেনি। বেলা জানে, এরা এক জন্য জাতের, অন্য জগতের। যারা অন্য জাতের অন্য জগতের তাদের দৃষ্টির সামনে লজ্জা হয় না। লজ্জা হয় স্বজাতের স্বজগতের দৃষ্টিপাতে।

বরং কেমন এক ধরনের খুশিই লাগে বেলার। খুকি-টুকির সামনে দুবাটি মুড়ি এগিয়ে দিয়ে তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বেলা। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চুল আঁচড়াতে থাকে সে, চুলের ডগাটুকু মুঠো করে চেপে ধরে ঘাড় কাত করে চিরুনি চালায়। তারপর আচমকা লঘু গলায় অবাক হয়ে বলে, 'বাঃ ভারী সুন্দর ফুল তো। কি গাছ এটা জানো নাকি তোমরা ?'

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে ছোট বড় চৌকো চ্যাপ্টা একসার কৌতূহলী মুখ চঞ্চল হয়ে ওঠে একটু, কিন্তু জবাব আসে না কোনও। শুধু ফিস্‌ফিস্‌ একটু গুঞ্জন কানে আসে বেলার : হ্‌ দ্যাখ আমাদের পারাই কথা বলছে যে গো ! বাঙালি ঘরেরই ব্যোটে বাবু !

আর এতক্ষণে, কেমন একটু অস্বস্তি লাগে বেলার। কী ভাবছে ওরা, দেখছে অমন হাঁ করে। কিন্তু সে শুধু অল্পক্ষণের জন্য। আবার খুশি হয়েই বেলা জিজ্ঞাসা করে 'এই যে শুনছ ? কী গাছ এটা ?'

ঋজু হালকা একটা গাছ। চৈত্রের ছোঁয়ায় পাতলা হয়ে এসেছে তার পাতা ; গিঁটগিঁট হয়ে বেঁকেছে ডালপালা। যেন অনেক সহ্য করা, অনেক লড়াই চলা রূঢ় বাঁকা হাড়খোঁচা কোনও এক হতভাগার কাঠোমো। গিঁটগিঁট। আর গিঁটে গিঁটে লাল হয়ে উঠেছে একরাশ রক্তিম কামনার মতো টকটকে ফুল।

চারদিককার এই ফাঁকা ফাঁকা গ্রামাঞ্চলের এখানে সেখানে এই অদ্ভুত গাছগুলোকে দেখে সারা রাস্তা অবাক হয়েছে বেলা। পূর্ববঙ্গের মেয়ে সে। এরকম গাছ সে ছেলেবেলায় দেখেছে কিনা মনে নাই তার। তারপর কলকাতা, কলকাতার শহরতলি। এরকম গাছ আর এরকম ফুল সে দেখেনি। ফুল দেখারই কি কোনও অবকাশ ছিল তার ? জীবনযাত্রার অজানা এক একটা পথে পা ফেলে সে তখন বাঁচার চেষ্টা করছে। ক্যাম্প, ডোল, তারপর হাতের কাজ সমবায় : সেলাই-ফোঁড়াই। তারপর? তারপর পাপ কি পুণ্য সে জানে না, প্রেম কি প্রতারণা সে জানে না। দু'তিন বছর মাত্র। দু'তিনবছর পর যমজ মেয়ে খুকি-টুকিকে কোলে নিয়ে আবার জীবিকার সন্ধান : সোডা কারখানায় বোতল সাজাবার কাজ, কেমিক্যেল কারখানায় লেবেল আঁটা। তারপর এক পাঞ্জাবির রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্ট-গার্ল, তারপর ব্যানার্জির চোখে পড়ে এই সার্কাসে। শেষের কাজগুলোয় দক্ষতার চেয়েও বড় একটা কোয়লিফিকিশন তার ছিল : সে মেয়ে। পাঞ্জাবি চায়ের দোকনে ভিড় জমত, কী সার্ভ করা হল তার জন্যে নয়, কারা সার্ভ করছে। ব্যানার্জির ন্যাশনাল সার্কাসও নাম করতে শুরু করেছে কী খেলাদেখানোহচ্ছে তার জন্যে নয়, কারা খেলা দেখাচ্ছে।

নাম করতে শুরু করলেও ন্যাশনাল সার্কাস, ন্যাশনাল সার্কাস নাম নিয়ে কলকাতার আশেপাশে মেলামণ্ডপ ছেড়ে মফঃস্বলে বেরিয়েছে এই অল্পদিন। রাঢ়ের এই এলাকায় এসেছে এই প্রথম। আর ঘিঞ্জির মধ্যে আটক পড়া, ঘিঞ্জির মধ্যে বেড়ে ওঠা বেলা হঠাৎ এত ফাঁকায়, এত লালচে ঢেউ খেলানো মাটি, কষ্টি পাথরের মতো কালো কালো তালগাছ আর খেজুর গাছের বাঁকা সারি দেখে খুশি হয়ে উঠল ছেলে মানুষের মতো।

'এই শুনছ কী গাছ ওটা ?'

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে কালোঝুলো জোয়ানবুড়ো একসার মুখ শুধু নড়েচড়ে উঠল একটু। জবাব এল না এবারও।

আর অস্বস্তিটা আবার ঘন হয়ে আসে বেলার। মনে মনে সে বলে, 'মাগো! এ আচ্ছা জায়গায় এসেছি তো!' তারপর জোর করে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলে তৃতীয়বার জিগ্যেস করে সে, 'এ্যাই, এ্যাই লোকগুলো শুনছ..,'

নির্বিকার উৎসুক মুখগুলোর মাঝ থেকে কেউ বোধ হয় সাহস করে বললে, 'পলাশ বটে!'

কে বললে হঠাৎ ঠাহর হল না বেলার।

পলাশ! নামটা বেলার শোনা, কিন্তু দেখল এই প্রথম পলাশ! চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বেলা সরে আসে কাঁটাতারের পাশে। পায়চারি করে ও ছোট তাঁবুটার সামনে। তারপর অন্যমনস্কের মতো আবার একসময় তাকায় গাছটার দিকে। টকটকে লাল ফুলগুলো যদি কেউ পেড়ে দিত। তাহলে খোঁপায় গুঁজত বেলা। না, নিজের খোঁপায় গুঁজত না। খুকি-টুকির ঝুনু ঝুনু চুল গোছটির গোড়ায় লাল রিবন না বেঁধে, বেঁধে দিত ওই ফুলগুলো। কী সুন্দর লাল।

অস্বস্তিটা তবু গেল না কিছুতেই।

বেলা ভেবেছিল, এ বোধ হয় প্রথম দিন বলে। কিন্তু দেখা গেল, প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন—যত দিনই যাক এই নির্বোধ-নির্বিকার কৌতূহলের বিরাম নেই। ঘুম থেকে উঠতে, ঘাটে যেতে, খুকি-টুকিকে সাজিয়ে দিতে, রান্নার জোগাড় করতে, এর ওর সঙ্গে কথা বলতে, বেলা মাঝে মাঝে চমকে উঠত অস্বস্তিতে : ওরা দেখছে। কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশ থেকে ঘাটে যাবার পথের ঢিবিটার ওপর থেকে।

দিনের বেলা যখন টিকিট চাইবে না কেউ, যখন খেলোয়াড়েরা নিজেদের মধ্যে খেলা মকসো করে, তখন পুরনো তাঁবুটার একটা কোণ উঁচু করে তুলে উঁকি দিয়ে ওরা ঠিক তাকিয়ে আছে। ছোট বড় কালোকুলো, নির্বিকার নির্বোধ একসারমুখ। তাকিয়ে আছে আর মাঝে মাঝে অস্পষ্ট গুঞ্জন করে কি আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

অন্যের দৃষ্টি, বিশেষ করে পুরুষের দৃষ্টি বেলার কাছে নতুন নয়। চায়ের দোকানে রেস্টুরেন্ট গার্ল হবার পর থেকে পুরুষের দৃষ্টিপাত গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে বেলার। চায়ের দোকানে বাঙালি মেয়েরা সার্ভ করছে দেখেই অনেকে আসতে চাইত না। ফলে যারা আসত, তারা কেবল হাঁ করে চেয়ে দেখবার জন্যই আসত। সে চেয়ে থাকার মধ্যে তাদের না থাকত ভদ্রতা, না স্বাভাবিকতা। ছোট, বড়, তরুণ, প্রৌঢ়, ব্রোকার, ড্রাইভার, বাঙালি, পাঞ্জাবি—হরেক রকম লোকের হরেক রকম নির্লজ্জ দৃষ্টি সহ্য করতে কখন যেন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল বেলা—নির্লজ্জ প্রস্তাব শুনতে, নির্লজ্জ ব্যবহার মানতে। তারপর ব্যানার্জির চোখে পড়ে এই সার্কাসে। ব্যানার্জি ওর শুকনো রোগাটে চেহারাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলেছিল, খেলা না জানলেও চলবে। সে দু'একটা আমরা শিখিয়েও নিতে পারি। তোমার হবে। বয়স তো বেশি হয়নি। তাছাড়া গড়নটা তোমার মোটের ওপর হালকা। আমি বলছি হবে।··· তবে ঐ খুকি-টুকিকেও খেলা দেখাতে হবে কিন্তু। বিশেষ করে ওদের জন্যেই তোমায় নিচ্ছি। এই বয়সে ওদের হাড়ের জয়েন্টগুলো যদি একটু ফ্লেক্সিবিল করে নেওয়া যায়, তাহলে···

রেস্টুরেন্টের একঘর লোকের বদলে এখানে এক তাঁবু ভর্তি শুধু দৃষ্টি, শুধু হাঁ করে থাকবে চোখ। কিন্তু কোনও অস্বস্তি হয়নি বেলার। শাড়ি-ব্লাউজের শালীনতা ছেড়ে সে অনায়াসে গায়ে উঠিয়েছে আপাদ-কণ্ঠ আঁটো পোশাক। কালো মুখের উপর পাউডার লাগিয়েছে অজস্র, ঠোঁটে রঙ। আর তারপর, সব দিক দিয়ে ভূতপূর্ব ফিরিঙ্গি মেয়ে-খেলোয়াড়দের পোশাক নকল করলেও দুহাতে দুগাছা চুড়ি, গলায় খাটো একটু হার, আর মাথার পেছনে আঁট করে বাঁধা খোঁপার মায়াটুকু ছাড়তে পারেনি বেলা। আর পারেনি কপালে, সিঁথিতে জ্বলজ্বল করে সিঁদুর না দিয়ে। খুব বেশি খেলা সে

তার রোগাটে হালকা শরীর সত্ত্বেও এই বয়সে আর শিখে উঠতে পারেনি। খুব বেশি খেলা দেখাতেই হবে এটা ব্যানার্জি বা দর্শকেরা কেউই এখনও তেমন দাবি ওঠায়নি। বেলা এবং আর কয়েকটা মেয়ে অমনি আশ্চর্য পোশাকে ছুটতে ছুটতে এসে নমস্কার করবে, তারপর যে লোকটা মইয়ের খেলা দেখাচ্ছে তার মইয়ের ওপর উঠে যাবে তরতর করে, কিংবা তারের ওপর শুধু কোনরকমে একটু হেঁটে আসবে, আর দূর থেকেও তাদের গলার হার চিকচিক করবে, জ্বলজ্বল করবে কপালের সিঁদুর—এইটুকু হলেই সকলে এখনও পর্যন্ত খুশি। ব্যানার্জি অবশ্য এর ওপরেও আরও একটা আকর্ষণ বার করেছে মাথা খাটিয়ে। দু'একটা খেলা হয়ে যাবার পর পরই ধুলো ধুলো পুরনো কনসার্টের সঙ্গে দু একটা নাচ দেখিয়ে যেতে হবে বেলাদের। তাতে সুর, তাল, পদক্ষেপের ততটা দরকার পড়ত না, যতটা দরকার পড়ত নতুন পোশাক নতুন কাঁচুলির।

পুরুষেব দৃষ্টি কবে সহ্য হয়ে গিয়েছে বেলার। তবু, এতদিন পরে হঠাৎ তার অসহ্য লাগতে থাকে এই নির্বিকার নির্বোধ তাকিয়ে থাকা।

প্রথমদিকে তার মজা লেগেছে, তারপর উপেক্ষা করেছে, তারপর সমস্ত জিনিসটাই একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।

'কী ব্যাপার, কী ! কী পেয়েছ তোমরা ? সময় নেই, অসময় নেই, অনবরত কী অমন করে দেখছ তোমরা ?'

'এ্যাই লোকগুলো। কী দেখছো কী ?'

কাঁটাতারের ওপর ভেজা শায়া শুকুতে দিতে এসে বেলা শেষ পর্যন্ত চিৎকার করে ওঠে একদিন।

নির্বিকার মুখগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে একটু, কিন্তু কথা ফোটে না।

'একেবারে উত্যক্ত করে ছাড়লে রে বাবা ! যাবে না ? ম্যানেজারকে ডেকে আনব ! এ্যাই লোকগুলো, কী দ্যাখো কী অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে গুঞ্জন উঠল একটা। তারপর ছোটবড় কালো ঝুলো মুখগুলোর মধ্য থেকে কে যেন সাহস করে বললে, 'তুমাকে দেখি গো ! বাঙালি মেয়ে বটো তুমি, লয় ?'

কে বললে বেলা ঠাহর পায় না। হয়তো সেই লোকটা যে প্রথম দিন ওকে পলাশ গাছটা চিনিয়েছিল। একটু থতমত খায় বেলা। ওকে যারা দেখে, যারা দেখবে, তারা দেখে সামনে থেকে, দর্শকদের সিটে বসে। কিন্তু এ কেমন দেখা, পেছন থেকে, বেলাকে সাজবার অবকাশ না দিয়ে ?

একটু থতমত খেলেও বেলা বিদ্রূপ করে রূঢ়ভাবে, 'আমাকে দেখছ ? বাঃ ! কিন্তু সে তো এখন নয় ! সন্ধের সময় এসো—টিকিট কেটে ওই সামনের গেট দিয়ে ঢুকবে। যাও ভাগো এখন !'

কালোঝুলো একসার নির্বোধ মুখ দুলে উঠল একটু । তারপর একটা মুখ সাহস করে আরও খানিকটা এগিয়ে এল কাঁটাতারের দিকে। বোকার মতো সাদা সাদা দাঁত বার করে হাসল। বললে, 'টিকিট লিছে যে ছ'আনা করে। টুকচি কমিয়ে দাও ক্যানে। তাইলে দেখি একদিন ভিতরে ঢুকে।'

এরপর কী বলতে হবে বেলার জানা ছিল না। সে শুধু রিক্তকণ্ঠে ধমক দিলে 'আরে ! এই লোকটা একেবারে চলে আসছে দেখি ! এদিকে মেয়েরা থাকে দেখতে পাচ্ছ না ?

লোকটা কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল। খালি গা। চওড়া তেল মাখা ঘর্মাক্ত পিঠ। নিরীহ নির্বোধ মুখ। অসহ্য, অসহ্য রকমের গ্রাম্য। অসহ্য রকমের গ্রাম্য একটু হাসি হেসে কাঁধের গামছাটা খুললে। গামছা ভর্তি একরাশ টকটকে লাল ফুল। পলাশ !

'তুমার লেগে নিয়ে এলম পেড়ে। আমাদের এই দ্যাখে কেনে বনবাদাড়ের ফুল বটে। ··· ও দুটি তুমার মেয়া বটে, হাঁগো ? উদিকে দিও ক্যানে খেলবে ? বড়া মায়া লাগে বাপু উ দুটিকে দেখে। আহ্ হা, হা, !'

ফুল দিয়ে লোকটা পিছিয়ে যায় আবার। পলাশ, কিন্তু বেলার জন্যে নয়, খুকি-টুকির জন্যে। খুকি-টুকিকে দেখে নাকি মায়া লেগেছে লোকটার।

হয়তো একটু নরম হয়ে এসেছিল বেলার মনটা। কিন্তু দ্বিগুণ তিক্ত হয়ে ওঠে তার পরের দিন।

সন্ধ্যায় খেলা দেখাবার আগে সকালে একটু আধটু এক্সারসাইজ, একটু আধটু মহড়া দিয়ে নিতে হয় প্রায় প্রত্যেক দিন।

বিশেষ করে যাদের কসরৎ এখনও তেমন পাকা হয়ে ওঠেনি, মকসো করাবার চাপ তাদের ওপরেই বেশি। সেই হিসেবে নৈমিত্তিক ট্রেনিং -এর ধকল চলছিল খুকি-টুকির ওপর দিয়ে। সন্ধ্যায় ওদের ওপর ভার ছিল একসঙ্গে ছুটতে ছুটতে এসে লাল রিবন বাঁধা মাথা নুইয়ে দর্শকদের বাউ করা, তারপর বিলিতি নাচের ভঙ্গিতে পাক খেয়ে ছোট ছোট আনাড়ি হাত দুলিয়ে অভিবাদন জানানো। তারপর খেলা। নানারকম কঠিন কঠিন আর্ক করে, পিকক্ করে রুমাল তোলা। ব্যানার্জির ইচ্ছে ওদের আরও বেশি করে কাজে লাগানো। তাই, রোজ সকালে ট্রেনিং মাস্টারের কাছে ওদের ফেলে দেওয়া হয়। মাস্টার ওদের রোগাটে হার জিরজিরে শরীরের জয়েন্টগুলো দুমড়িয়ে বেঁকিয়ে, চাপ দিয়ে আশ্চর্য কিছু একটা করার চেষ্টা করে। আর তা সইতে না পেরে মেয়ে-দুটো কষ্টে যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে আর্তস্বরে। মাঝে মাঝে ভয়ে কাঁপে থরথর করে। তারপর একবার ম্যানেজার, এক একবার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আবার প্রাক্টিস শুরু করে চোখ মোছে।

সেদিন বারবার চড় খাচ্ছিল মেয়ে দুটো। শিরদাঁড়াটাকে যথেষ্ট নমনীয় করে তোলার জন্যে মোচড়া-মুচড়ির বিরাম ছিল না। থেকে থেকে তাই হাজার ধমক সত্ত্বেও আর্তকণ্ঠে কঁকিয়ে উঠছিল খুকি-টুকি। বেলা দাঁড়িয়েছিল নিঃশ্বাস বন্ধ করে।

হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করে গুঞ্জন ভেসে এল একটা : আহ্ হা, হা ! বড়া মায়া লাগে গো মেয়ে দুটিকে দেখে !

আর নির্জন নিস্তব্ধ তাঁবুটার মাঝখানে চমকে ফিরে তাকাল বেলা। ব্যানার্জি, ট্রেনিং মাস্টার— সবাই একসঙ্গে। কে ! কে ওখানে।

'উ মেয়া দুটি ! বড়া মায়া লাগছে গো। ছেড়ে দাও বাবু উদিকে।' দিনের বেলাকার অসর্তক নির্জন তাঁবুটার একটা প্রান্ত উঁচু করে তুলে উৎসুক হয়ে আছে সেই একসার ছোটবড় কালোঝুলো নির্বিকার গ্রাম্য মুখ। তার মধ্যে একটু এগিয়ে এসেছে সেই চওড়া পিঠ, কাঁধে গামছা কালো মানুষটা যে বুঝি বেলাকে ফুল এনে দিয়েছিল পলাশ।

দেখে ক্ষেপে উঠল ব্যানার্জি, 'হুজ দেয়ার? কোন হ্যায় তোমলোগ, ভাগো। ভাগো হিঁয়াসে। দেখবার কিছু নেই এদিকে। যা দেখবার সন্ধ্যায়। এইসব গেঁয়ো লোকগুলো—। লালধারী সিং, ভাগা দেও উসকো ······'

চোখের নীল গগল্স্টা খুলে ব্যানার্জি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে আবার। ট্রেনিং মাস্টারের দিকে চেয়ে বলে, 'নাউ স্টার্ট এগেইন।'

আবার আর্তকণ্ঠে ককিয়ে ওঠে মেয়ে দুটি।

আর অকারণে ব্যানার্জির গা ঘেঁসে একটু সরে আসে বেলা। অন্যদিকে চেয়ে তিক্ত অথচ কেমন অন্যমনস্ক স্বরে বলে, 'ওই লোকটা রোজ উঁকি-ঝুঁকি মারে আমার তাঁবুর পাশে ······'

'তাই নাকি ? একদিন ডাকো না ভেতরে। এসব গাঁয়ের লোক—দেখতে ওই রকম। কিন্তু ধান বিক্রির টাকা দেখো গে থলে ভর্তি করে গুঁজে রেখেছে কোমরে। তোমার ওই ডাঙা ভদ্রবাড়ির বেকার ছোঁড়াগুলোর চেয়ে খারাপ মক্কেল হবে না। ওগুলোকে কয়েকটা পাশ দিয়েছি—বাস তাতেই খুশি। ··· দাঁড়াও দাঁড়াও মাস্টার দাঁড়াও। দ্যাট্স ও. কে.। ঠিক আছে, ঠিক আছে মাস্টার, এই খেলাটা চালাও কাল ম্যাটিনিতে। ··· হাঁ, কি বলছিলুম বেলা ? ও, ওই বেকার ছোঁড়াগুলো ····'

লালধারী এসে সেলাম ঠুকে বলে, 'ভাগা দিয়া হুজুর !'

তাঁবুর বাইরে শোনা যায় একটু মৃদু কোলাহল। যারা পাশ পেয়েছে ডাণ্ডা জমিদারবাড়ির সেইসব গ্রাম্য বেকারের দল সার্কাস কোম্পানির পক্ষ হয়ে তর্জন শুরু করেছে লোকটার ওপর।

তারপর দু'দিন দেখা গেল না ওদের । আসতে, যেতে, কাপড় মেলতে, বেলার চোখ অন্যমনস্কের মতো গিয়ে পড়ছে কাঁটাতারের বেড়াটার দিকে। না কেউ নেই।

কিন্তু দুদিন পরে আবার চমকে উঠল বেলা : ওরা এসেছে। আগের মতো অমন ঝাঁক বেঁধে নয় মাত্র জন দুই তিন। কিন্তু তাকিয়ে আছে ঠিক সেই আগের মতো নির্বাক নির্বোধ দৃষ্টি মেলে।

খুব কড়া একটা ধমক দিতে চিয়েছিল বেলা। 'আবার এসেছ তোমরা ?'

দু'তিনজনের পাতলা ভিড়টা চঞ্চল হল একটু। তারপর কে বললে, 'এই খানিক দেখছি গো ডাঁড়িয়ে ডাঁড়িয়ে।'

বোধ হয় বললে সেই লোকটা, যে বেলাকে এনে দিয়েছিল পলাশ ফুল।

'দেখছ ? দেখতে চাও ? এসো !' হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে বেলা, . . . 'এসো দেখাচ্ছি, এ্যাই, এ্যাই লোকটা, এ্যাই গামছা কাঁধে লোকটা ? এসো তুমি, এসো ভেতরে, এসো দেখাই . . . '

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল বুঝি। তারপর সত্যি সত্যি বেড়া ডিঙিয়ে এগিয়ে এল লোকটা। শান্ত, গ্রাম্য কালো একটা মুখ, খালি গা, চওড়া মেহনতী মসৃণ পিঠ। কাঁধে গামছা। আর গামছার ওপর শক্ত পাকা একটি কুমড়ো।

বেলা লোকটার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে ঢোকাল তাঁবুর ভেতরে। দ্যাখো, ভাল করে দ্যাখো !'

লোকটা তার গ্রাম্য চোখ তুলে তাকায় বেলার দিকে। তারপর সত্যি সত্যিই মুগ্ধের মতো দেখতে শুরু করে তাঁবুর ভেতরটা। একটা টিনের ট্রাঙ্ক। কয়েকটা কলাই করা বাসন। দড়ির ওপর রঙচঙে সাটিনের পাশাক। একটা ময়লা শাড়ি। কয়েকটা ছোট ছোট ফ্রক। জুতো।

বেলার গায়ের চামড়ার সঙ্গে এঁটে বসে বেলার রোগাটে দেহের রেখা গুলোকে ফুটিয়ে তুলত যে লাল পোশাকটা, সেইটে ভয়ে ভয়ে নেড়েচেড়ে দেখে লোকটা। মুগ্ধের মতো বলে, 'এইটো তুমি পরো লয় ? এইটো পরে তারে খেলা করো ? এখুনো দেখা হয় নাই বাবু। দেখব একদিন। টিকিটের চড়া দাম চড়িয়ে দিয়েছে যে গো, ছ আনা।'

বেলা কথা বলে না। শূন্য দৃষ্টিতে সে শুধু চেয়ে থাকে লোকটার ঘর্মাক্ত পিঠটার দিকে।

এটা সেটা সব কটা পোশাক-আশাক নেড়েচেড়ে দেখে লোকটা। আন্দাজ করার চেষ্টা করে কোনটা কী রকম আশ্চর্য, কী রকম দামি। তারপর যেন বেলাও অমনি আর একটা আশ্চর্য কোনও জিনিস এমনিভাবে এসে স্থূল গ্রাম্য হাতে নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করে বেলাকে। মুগ্ধের মতো জিগ্যেস করে, 'বাঙলি মেয়ে বটে তুমি লয় ? না বিশ্বেস হচ্ছে না।'

হঠাৎ কোথা থেকে একরাশ আলস্য এসে ছেয়ে ফেলে বেলাকে, একরাশ ক্লান্তি। তাঁবুর মাঝখানকার খুঁটিটায় ঠেস দিয়ে অন্যমনস্কের মতো কোন একদিকে চেয়ে থাকে বেলা। কী বলছে লোকটা, কী করছে—কিছুতেই যেন এসে যায় না তার। কিছুতেই এসে যায় না বেলার, অনেক অনেক পথ পার হয়ে এসেছে সে, নিষ্ঠুর, নির্মম, ক্লান্তিহীন একটা প্রতিযোগিতা। নির্মম নিস্তরঙ্গ একটা যন্ত্রণা। সে প্রতিযোগিতা, সে যন্ত্রণার নাম জীবিকা। কেমন একটা বিবশ আলস্যে বেলার রোগাটে আনাড়ি শরীরটা নেতিয়ে পড়তে চাইছে আজ। অন্যমনস্কের মতো বেলা বলে, 'শোনো, ওই ফুল আরও এনে দেবে আমাকে ?

'পলাশ ? কত পলাশ লিবে তুমি ?'

লোকটা ছেলেমানুষের মতো নেড়ে চেড়ে দেখছে সবকিছু। আর আলস্যে চোখ উদাস হয়ে

আসে বেলার।

'শোনো, তোমাদের এ গ্রামটা বেশ ! ভারী নিরিবিলি ভারী শান্ত।'

লোকটা নেড়েচেড়ে দেখে সবকিছু। তারপর জিজ্ঞেস করে, উ মেয়া দুটি কার ? তুমাব ? না, বিশ্বেস হচ্ছে না। মায়ের প্রাণ কাঁদুনো অমন হয় হে ? আহা হা হা বড়া কাঁদে মেয়া দুটি। বড়া মায়া লাগে বাবু বড়া মায়া লাগে·····'

আর হঠাৎ চমক ভাঙে বেলার। মেয়ে দুটোর কান্না সেও সইতে পারে না। কিন্তু তবু হাসতে হয় তাকে, ব্যানার্জির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে থামাতে হয় তাদের কান্না। কিন্তু সেকথা এই লোকটা বলবে কেন ? কেন ?

চমক ভেঙে বেলা হঠাৎ নির্লজ্জ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। এক মুহূর্তে গলার স্বব তার পাল্‌টে যায়। চিৎকার করে বলে, 'বাস খুব হয়েছে ! এইবার পয়সা বার করো। পয়সা। আমার রেট কত জানো তো, পাঁচ টাকা। বার করো শিগ্‌গির·····'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় লোকটা ঃ পয়সা ?

ন্যাকা ! পয়সা না তো কি মাগনা ! নির্লজ্জ ডাইনির মতো বেলা ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার ওপর। ওর গামছার খুঁট কোমরের গিঁট হাতিয়ে দেখে কী আছে। তারপর কিছু না পেয়ে ওর কাঁধের কুমড়োটা নিয়ে টানাটানি শুরু করে আক্রোশে, 'মজা পেয়েছ না, মাগনা ?'

'পয়সা ফ্যালো শিগ্‌গির নইলে তোমার দেখাচ্ছি ······'

থতোমতো খেয়ে লোকটা কুমড়োটা ফেলে বেখে বোকার মতো পালিয়ে আসে তাঁবু থেকে ।

আর তারপর হঠাৎ হু হু করে কাঁদে বেলা। কেন কাঁদে সে জানে না। তার সারা জীবনের সমস্ত কান্না হঠাৎ এই রাঢ় প্রান্তের অসহ্য নির্বোধ এক শান্তির যন্ত্রণা স্পর্শে উদ্বেল হয়ে ওঠে ক্লান্তিতে।

যেমন এসেছিল এক এক করে, তেমনি এক এক করে চলে যায়, যা যাবার। লটবহর, দড়িদড়া, খোঁটাখুঁটি, শিক-পাটাতন। ধূলিধূসর, চামড়া ঝোলা, চোখে-পিচুটি-পড়া বেঁটে হাতিটা। বাঘের খাঁচা, রামছাগল, খোঁড়া ভালুক। তারপর খেলোয়াড়ের দল। এদিককার গ্রামাঞ্চলে যা পয়সা লোটবার তা লুটে সার্কাসটা চলেছে অন্য আর একটা গ্রাম্য গঞ্জের দিকে। একটা ট্রাক আছে, ট্রাকের সামনে বসেছে ব্যানার্জি। ট্রাকের পেছেনে মেয়েরা। গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাসের সবেচেয়ে বড় আকর্ষণের জন্যে ব্যানার্জি ব্যবস্থা করেছে এই ট্রাকের সুবিধা। অন্য খেলোয়াড়রা কেউ চলেছে হেঁটে, কেউ মালের ওপর চেপে।

কিন্তু সবাই তৈরি হয়ে গেলেও বেলা বসেই রইল চুপ করে। চুপ করে বুকে জড়িয়ে রইল খুকি-টুকিকে।

ট্রাকে সামনের সিট থেকে নীল গগ্‌ল্‌স্‌ পরা মুখটা ফিরিয়ে ব্যানার্জি বললে, 'কই বেলা উঠে পড়ো শিগ্‌গির—'

বেলা উঠল না। ফিসফিসিয়ে বললে, 'আমি যাব না।'

'যাবে না ?' ব্যানার্জি তিক্তকণ্ঠে গাল দিয়ে উঠল ইংরেজিতে, 'ওহ, ফেড্‌ আপ উইথ দেম। না যাবে, থাকো পড়ে, স্টার্ট ······'

গুরু গুরু করে ট্রাক দুলে উঠল। তারপর একরাশ ধুলো উড়িয়ে চলে গেল লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়ে।

অন্যমনস্কের মতো বসেই রইল বেলা। কাঁটা তার খোঁটাখুঁটি তাঁবু দড়ি সব শূন্য হয়ে গিয়ে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু সেই পলাশ গাছটা। চৈত্রের ছোঁয়ায় পাতলা হয়ে এসেছে তার পাতা। গিঁট গিঁট হয়ে বেঁকেছে ডালপালা। যেন অনেক সহ্য করা, অনেক লড়াই চলা রূঢ় বাঁকা হাড় খোঁচা

কোনও এক হতভাগার কাঠামো। গিঁট গিঁট। গিঁটে গিঁটে লাল হয়ে উঠেছে একরাশ রক্তিম যন্ত্রণার মতো টকটকে ফুল।

অন্যদিকে চোখ ফেরাল বেলা। নির্জন ছন্নছাড়া একটা গ্রাম। একটু দূরে একমাত্র মিষ্টির দোকানটা বন্ধ হচ্ছে। অসহ্য জীর্ণ লাগে সব কিছু। জীর্ণ আর অজ্ঞ আর ক্ষুদ্র। আর এই জীর্ণতার মাঝখান থেকে ওরা এখনও তাকিয়ে আছে। কাঁটাতারের বেড়াটা নেই—তবু নির্বোধ নির্বিকার কালোকুলো নানাবয়সী একসার মুখ অনেক দূর থেকে ওকে দেখছে।

আর কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হয়ে আসবে। বেলা তাড়াতাড়ি খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তোলে খুকি-টুকিকে : 'ছোট্ ছোট্ শিগ্‌গির। ট্রাকটা এখনও বেশি দূর যায়নি। দৌড়ে গিয়ে নাগাল ধরতে হবে ওদের।'

চোখ মুছে খুকি-টুকি ছুটতে থাকে সামনের দিকে। খুকি-টুকির পেছনে বেলা। লোকালবোর্ডের কাঁচা রাস্তায় টাল খেতে খেতে : ধুলো উড়োচ্ছে ট্রাকটা।

চৈত্রদিন

নি ষা দ

বিমল কর

"You begin by killing a cat and you end by killing a man."

ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়তো আজ...কিংবা কাল...।

নাম ওর জলকু। বছর বারো বুঝি বয়েস। এখানকার দেহাতী ছেলেদের মতনই দেখতে। গাঢ় কালো রঙ। নরম সিমেন্টে কালি মেশানো কালচে রঙের একটি ছাঁচ যেন। এখনও কাঁচা, হাত দিলেই দাগ পড়ে যাবে। এমনই নবম কাদাটে কোমল ভাব সারা গায়। মুখটা গোল, ফোলা ফোলা গাল, চিবুকের ডৌলটুকু এখনও ফোটেনি, কারিগরের হাত পড়েনি বোধ হয়। নাকটি মোটা, বসা। পুরু মোটা মোটা ঠোঁট। জোড়া ঘন ভুরুর তলায় বড় বড় দুই চোখ। কেমন একটা উথলে ওঠার ভাব, কালো শান্ত চোখের তারা আর সাদাটে জমিটা যেন জলে-জলে ভেসে উঠেছে। জলকুর কপাল আছে কি নেই বোঝা যায় না চট করে। মাথা ভর্তি একরাশ চুলে কপাল, ঘাড়, কানের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে থাকে।

ছেলেটা একেবারে জংলী। এখানে থেকে থেকে এদের মতনই হয়ে গেছে। গায়ে জামা দেয় না, পায়ে জুতো নেই। আদুল গায়ে নোংরা একটা ইজের পরে সারাদিন ওই রেললাইনের কাছ।

ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়তো আজ... কিংবা কাল।

এই এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে তার। আগে ছিল না।

কিছুদিন দেখতাম টিলার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে থাকত। চারপাশে তাকাত। শেষে রেললাইনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। কী যেন খোঁজবার চেষ্টা করত, দেখত।

ঠিক জানি না কেন, হয়তো টিলার ওপর খুঁজে না পেয়ে, কিংবা হয়তো খুঁজে পেয়েই টিলার ও-

পাশটায় নেমে যেতে লাগল। ও-পাশেই রেললাইন। লাইনের পর আবার টিলা। এখানটায় এইরকম। দু-পাশে, প্রায় বালিয়াড়ির মতন দুই টিলা, মাঝ দিয়ে পথ কেটে চলে গেছে রেললাইন। পুব এবং পশ্চিমে বেশিদূর ছড়িয়ে পড়েনি টিলার ঢল। শ'দেড়েক গজ বড় জোর। তাবপর মাঠ আর মাঠ, অস্পষ্ট জঙ্গল। পুবে একটা ছোটোখাটো নদীর পুল। পুলের এ-পার থেকে বেললাইনটা ধনুকেব মতন বেঁকে এসে টিলার কাছাকাছি সোজা হয়ে গেছে।

জলকু টিলা থেকে নেমে রেললাইনে চলে যেতে শুরু করেছিল আজকাল। আর নতুন যে-খেলা খেলতে শুরু করেছিল তা বাস্তবিক নতুন নয়, কিন্তু দিনে দিনে কেমন এক ভয়ংকর খেলা হয়ে উঠেছিল।

ছেলেবেলায় কে না এই খেলা খেলেছে। বেললাইন থেকে পাথর কুড়িয়ে আমরাও লাইন তাক করে পাথর ছুঁড়েছি। দেখেছি, টিপটা কী রকম, হাতের জোর কতটা, লাইনেব গায়ে পাথরেব চোট লেগে ফিন্‌কি জ্বলে কি না, শব্দটা কেমন হয়।

আমাদের এ-খেলা ছিল কদাচিতের, সামান্য সময়েব। কিন্তু জলকুব কাছে খেলাটা রোজকার হয়ে উঠল। আজকাল প্রতিদিন সে এই খেলা খেলছে, প্রতিদিনই। আর এই খেলায় তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা, বৈশাখের প্রচণ্ড রোদ্দুরে, তাপে, লু-যে—জলকু পাথর ছুঁড়েছে, রেললাইন তাক করে করে। আর প্রায় রোজই ওকে ধরে আনতে হয়। আমায়।

আমি ছাড়া জলকুকে ধরে আনার কেউ নেই। ওর বাবু পঙ্গু। ঘরে আছেন কি নেই বোঝা যায় না। এক এক সময় খেপে গিয়ে যখন চেঁচাতে শুরু করেন, গালিগালাজ ছোটান—তখন বোঝা যায় আমার পাশে ও-বাড়ির কোনও ঘরে একজন পুরুষ মানুষ আছে। নয়তো জলকুদের বাড়িতে শোনার মতন গলা আর নেই। জলকুর মাকে আমি কমই দেখেছি। চেহারা মুখ কিছুই ভাল করে দেখতে পাইনি, ধারণাও করতে পারি না সেই অবয়ব। অত্যন্ত ঝাপসাভাবে যে-টুকু আকার তৈরি করতে পেরেছি, তাতে মনে হয়—জলকুর মা রোগা, রুগ্ন, কালো, অত্যন্ত লাজুক বা গোঁড়া, গ্রাম্য। মুমূর্ষু পশুর মতন পড়ে পড়ে ধুঁকছে। রান্নাঘর আর উনুন, মশলা বাটা, ঘর ঝাঁট, কুয়াতলায় বসে বাসন মাজা—সংসারের এই শ'খানেক অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে জলকুর মা-র ভোর শুরু হয় এবং স্বামীর অসাড় দুর্গন্ধ শরীরে মালিশ মাখাতে মাখাতে মাঝ রাতেব বেঁহুশ ঘুমে ঢুলে পড়ে দিনটা তার ফুরিয়ে যায়।

জলকুর বাবা কী রোগে পঙ্গু হয়েছেন আমি জানি না। শুনেছি, বছর দুই ধরে ভদ্রলোকেব এই অবস্থা। ডান পাশটা পড়ে গেছে একেবারে শুকিয়ে চিমসে গেছে। অনাচাবে কি ? হতে পারে। অত্যাচারে কি ? অসম্ভব নয়। কোনও সাংঘাতিক আঘাতের পরিণাম যদি হয়—হবেও বা। আমি জানি না। জলকুর বাবার সঙ্গে আমার দু'একবার যা সাক্ষাৎ তাতে আমরা দু'জনেই স্বল্পভাষী হয়েছি। ভদ্রলোকের সেই দুর্লভ গুণ আছে, দুর্ভাগ্যের কথা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বলতে যারা চায় না। আমার সহানুভূতি পাবার আশা উনি করেননি, ইতিবৃত্তও শোনাননি পঙ্গুতার। শুধুমাত্র বর্তমানের অবস্থাটা দু'এক কথায় বলেছিলেন।

সমবেদনা জানাবার ভদ্রতা আমার জানা ছিল। আমি বেদনা পেয়েছিলাম নিশ্চয়। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারা, মুখ, বিছানা, ঘর, ঘরের আবহাওয়া আমায় এত বেশি অস্বস্তি দিচ্ছিল যে, আমি যতটুকু সম্ভব কম কথা বলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—ওই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম।

কাজেই আমরা কথা বলেছি অল্প। নিছক কাজের কথা ছাড়া অন্য কথায় যাইনি। কাজের কথাও অবশ্য সামান্য—ঘরের ভাগ-বাটরা, ভাড়া, ভাড়ার তারিখ—এমনি খুঁটিনাটি।

জলকুদের একতলা ছোট টালিছাওয়া বাড়ির পশ্চিমটা আমার, ভাড়া পাওয়া। পুবটা তাদের। আমার এলাকায় একটি মাঝারি, অন্যটি ছোট ঘর, সামনে পিছনে সামান্য বারান্দা, খাপরা-ছাওয়া

একফালি রান্নাঘর।

একই বাড়ির আধাআধি ভাগবাটরার মধ্যে দেওয়াল মাটি ছাদের সংযোগ ছাড়া বাকি যে-টুকু সংযোগ তা ছিল জলকুকে নিয়ে—এবং জলকুর পিসিকে যদি ধরা যায় তবে তাকে নিয়েও। তবে সে তো সামান্য, অতি সামান্য।

জলকুর পিসির পুরো নাম বোধহয় তরুলতা। তরু বলেই ডাকতে শুনতাম। ঢেঙা রোগাটে গড়ন। মুখের ছাঁদটি লম্বা ধরনের। গায়ের রঙ মাজা কালো। সাপের মতন লম্বা বেণীটি খোঁপা থেকে খসে পিঠের ওপর দুলত। মিলের শাড়ি, সস্তা কাপড়ের জামা। তরুর বয়েস কুড়ি ছাড়িয়েছিল অনেক দিন। বিয়ে হয়নি। একটি দু'টি বসন্তের না-মেলানো দাগের সঙ্গে হতাশা এবং কাতরতা মাখানো সেই মুখ কেমন যেন রিক্ত শূন্য অবোধ দেখাত।

আমার আর তরুর মধ্যে মেলামেশা গল্পগুজব ছিল না। দেখা হলে চোখাচোখি হত, জলকুর খোঁজ করতে এসে বড় জোর শুধোত, জলকুকে দেখেছেন নাকি ? বা আমি যখন রাত্রে গ্রামোফোন বাজাতাম—ওদের তরফের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও শুনত, পরের দিন দেখা হলে বলত, ঐ গানটা আজ আর-একবার দেবেন ? বড্ড ভাল গান। · · · কখনও কখনও আমার ডাকে-আসা বাংলা মাসিক পত্রিকা দুটো চেয়ে নিয়ে যেত, গল্প পড়তে।

গল্প করতে, গান শুনতে তরু এলে আমি বোধ হয় অখুশি হতাম না।

পরে সে-কথা বুঝেছি। আর যখন কথাটা স্পষ্ট করে বুঝেছি, তখন থেকে জলকু তার সর্বনেশে নতুন খেলা শুরু করল।

জলকু অনেকক্ষণ পর্যন্ত উধাও। বাড়িতে নেই, সামনের আগাছাভরা বাগানটায় নেই, কুয়াতলায়, মাঠে— কোথাও না। · · · তরু বাইরে এসে খুঁজছে, ডাকছে, জলকু-জলকু। বাড়ির মধ্যে বসে সে-ডাক আমি স্পষ্টই শুনতে পাই। প্রথমটায় গরজ দেখাতে ইচ্ছে করে না, ভালও লাগে না উঠতে।

ডাক যখন বাড়তে বাড়তে ঘুরেফিরে আমার বারান্দার কাছে এসে পৌঁছয়, উঠতে হয় আমায়। আমি জানি জলকু কোথায় আছে।

সমস্ত ব্যাপাবটাই যেন ছককাটা। জলকুর পিসি খুঁজবে ডাকবে, আমি প্রথমে গা করব না, পরে সরু ব্যাকুল গলার ডাক অনুনয়ের মতন আমার বারান্দায় এসে থামবে, আমি উঠব, বিরক্তিতে অপ্রসন্ন মনে, মাথার ওপর বৈশাখের খর রোদ, অসহ্য গরম, আগুনে হাওয়া, আস্তে আস্তে আমি হাঁটব, বাড়ির পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে টিলার কাছে এসে দাঁড়াব, উপরে উঠব, সতর্ক পায়ে, মুখে তপ্ত বাতাসের ঝাপটা লাগবে, কটকটে রোদের ঝাঁঝে তাকাতে পারব না ভাল করে, তবু টিলার ওপর উঠলেই দেখতে পাব, নীচেতে রেললাইনের স্লিপারের ওপর দাঁড়িয়ে জলকু পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ছে। আদুল গা, ঢলঢলে ইজের, একরাশ চুলে মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা এবং অব্যর্থ নিশানায় জলকু রেললাইনের লোহার ধারালো হিংস্র উজ্জ্বলতাকে বার বার আঘাত করছে। ধাতব, বেসুরো একটা আওয়াজ উঠছে, ঠং ঠং ঠং।

'জলকু। এই জলকু।' কাছে গিয়ে জোর এক ধমক দেব, জলকুর একটা হাত জোরে চেপে ধরে। ডান হাত। জলকু প্রথমে হাত ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করবে। শেষে চোখ তুলে তাকাবে। সে জানে আমায় দেখতে পাবে। মুখে কোথাও তার বিস্ময়ের এতটুকু ছায়া পড়বে না। আমি জানি, ঘোরভাঙা দুটি গভীর অবসন্ন লালচে চোখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাব না। তপ্ত, ঘর্মাক্ত, অথচ নরম পিচ্ছিল একটা হাত আমার মুঠোয় শক্তভাবে ধরা থাকবে।

'বাড়ি চলো।' গলাটা আমার রুক্ষ বিরক্ত কঠিন, 'তোমায় রোজ বলি এ-ভাবে একা লাইনে এসে দাঁড়িয়ো না—সব সময় গাড়ি আসছে যাচ্ছে—কোনদিন কাটা পড়বে লাইনে।

জলকু কথা বলে না। আরও ঘামে, মুখ মাথা আরও গোঁজ করে আমার হাতের টানে-টানে

টিলার ওপর উঠতে থাকে।

মাথার ওপর আকাশ জ্বলছে, পাথর আব কাঁকরে-বালি ঝকঝক করছে, গরম হাওয়া ঝাপ্টা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে, দূরের পুলের কাছ থেকে রেললাইনের ধনুকের মতন বাঁকটা বিরাট এক তলোয়ারের মতো জ্বলছে, শানানো, ক্ষুরদীপ্ত আভায়।

'তুমি এ-ভাবে আর এসো না জলকু। কখনও না!' টিলার ওপরে উঠে এসে আমি বলি। হাতটা ছেড়ে দি ওর। কয়েক পা দূরেই আমাদের বাড়ির পাঁচিল।

জলকু কথা বলে না। আমি জানি, জলকু আমার নিষেধ শুনবে না। ও আবার আসবে। হয়তো আজই দুপুরে, কোনও ফাঁকে ছাড়া পেয়ে।

কী সর্বনেশে খেলায় পেয়েছে ওকে। ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়তো আজ··· কিংবা কাল।···

সে-দিন একটা লোক জুটেছিল। আমার এলাকার বাগানটুকু নিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত খেটেছি। বাখারির ভাঙা বেড়াটা ভেঙেই ফেললাম একেবাবে। আর দবকাব নেই। কিছু আগাছা জমেছিল, বোদের তাতে পুড়ে পুড়ে খড় হচ্ছিল, সে-সব পরিষ্কার করা হল। বেলফুলের কেয়ারি, জুঁই গাছের তলা, টিপ-হলুদের ছোট ঝোপের মাটি খুঁড়তে আর বারান্দার টবের ফুল-গাছ ক-টাকে পরিচর্যা করতে করতে বেলা অনেক হল। স্নান করতে যাব, এমন সময় জলকুর পিসিব গলা, 'জলকু—জলকু।'

ডাকটা পাঁচিলের শেষ পর্যন্ত চলে গেল, ওপাশে কদম গাছের তলা দিয়ে বেড় খেয়ে পেয়ারা ঝোপ, বাতাবি লেবু, আমগাছের ছায়া ঘুরে আমার বারান্দার কাছে এসে থামল।

'পালিয়েছে?' আমি বললাম, বিরক্ত গলায়।

'ক—খন, আসুক আজ হাবামজাদা—গায়ের ছাল তুলব। দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেও নিস্তার নেই।' তরু রাগে কষ কষ করছিল।

'বেঁধে রাখাই উচিত। রোজ রোজ এ-ভাবে রেললাইনে পালিয়ে যায়। একটা বিপদ ঘটতে কতক্ষণ—ওইটুকু তো ছেলে।'

'মরবে; মরবে একদিন হতভাগা। মরুক, আমারও হাড় জুড়োয়।' তরু আজ অসম্ভব চটেছে। কথার ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল।

চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে আমি বললাম, 'আর কিছু না, এখান থেকে দেখাও যায় না, লোক নেই জন নেই, ফাঁকা রেললাইন··· ভয় হয়।'

আমার অগুছোলো কথা, তরুর তিক্তবিরক্ত ভাব, সব মিলে-মিশে জলকুর একটি ভবিষ্যৎ পরিণতি যেন দু'জনের চোখেই লহমার জন্যে ভেসে এল। অল্প একটু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা। তারপর আমি নেমে গেলাম বারন্দা দিয়ে।

বৈশাখের বুঝি শেষ সপ্তাহ চলছে। অসহ্য গরম। মাথার ওপর চোখ তোলা যায় না। গলা তামার মতন প্রতপ্ত আকাশ বেয়ে আগুন ঝরে পড়ছে। খাঁ খাঁ করছে চারপাশ। তেঁতুল কি কাঁঠালের ঝোপ-ঝাড়গুলো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। একটি কাক কি চড়ুইও ডাকছে না। টিলাটা যেন পুড়ছে, পাথরগুলো রোদ আর তাতকে দ্বিগুণ করে ছুঁড়ে দিচ্ছে চোখে, গায়।

আমার চোখ জ্বালা করছিল, নিশ্বাস অসহ্য গরম, কানের পাশ দিয়ে লু-য়ের হলকা বয়ে যাচ্ছে।

জলকু একটার পর একটা পাথর কুড়োচ্ছে রেললাইন থেকে আর ছুঁড়ছে, ছুঁড়ে মারছে রেললাইনে। ছেলেটা যেন পাগল হয়ে গেছে আজ। কিসের এক অদম্য আক্রোশে তাকে জ্ঞানহারা করেছে। আদুল গা, ছোট একটু ইজের, উদোম পা, স্লিপারের ওপর দাঁড়িয়ে ধারালো শক্ত পাথর তুলে নিচ্ছে মুঠোয় আর পলকের মধ্যে হাতটা অসম্ভব কঠিন, হিংস্র, উন্মত্ত ভঙ্গিতে ওপরে তুলতে না

তুলতেই পাশ কাটিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারছে। ইস্পাতের মসৃণ চকচকে একটা সাপ যেন এই অর্থহীন ছেলেখেলার আঘাত সয়ে যাচ্ছে, গ্রাহ্য নেই।

না, আমার হঠাৎ মনে হল আজ, জলকু অন্য কিছুকে তার ওই অন্ধ দানবীর আক্রোশে ক্ষতবিক্ষত করে মারতে চাইছে। কিন্তু কাকে ?

কাকে ?

কোন্ অদ্ভুত কৌতূহলে জানি না—আমি চারপাশে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত জায়গাটা নির্জন, ছায়াহীন। ঘা খাওয়া লোহার বেসুরা ভাঙা ভারী শব্দ শুধু। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বয়ে আসা লু-য়ের ঝড় বইছে, থেকে থেকে, অতি দ্রুত বাতাস কেটে এগিয়ে যাওয়ার সেই সোঁ সোঁ গর্জন, এই আছে, এই নেই। পুলের কাছে রেললাইনের পুরো বাঁকটা চোখে পড়ে না। বাঁক যেখানে শেষ হয়ে সোজা হয়ে মিশে যাচ্ছে সে-টুকু চোখে পড়ে। ধারালো ফলার মতন দেখাচ্ছে অংশটা।

অতি কষ্টে একবার মাথার ওপর চোখ তোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। সমস্ত আকাশটাই যেন জ্বলন্ত সূর্য, আগুনের ঝলসানিতে গনগনে আঁচের মতন রঙ ধরেছে শূন্যে। টিলার পাথুরে শরীরটা পুড়ছে, কাঁকরের স্তূপ ধক-ধক করে জ্বলছে, রেললাইনের পাথর দূর দুরান্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল, অসহ্য উজ্জ্বল। আমার গাল মুখ পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ জ্বালা করছিল ভীষণভাবে, গলার কাছে বুকের তলায় দরদর করে ঘাম ঝরছিল। আর চোখে মুখে নাকে ঠিকরে এসে লাগছিল সেই জ্বলন্ত দুঃসহ তাপ। অনুভব করতে পারছিলাম—টিলা, পাথর, লাইন, মাঠ, লোহা, স্লিপার সমস্ত জায়গাটা এক ভয়ঙ্কর দহনের ঝলসানিতে জ্বলছে—জ্বলছে। অবোধ্য আকারহীন এবং নির্মম কোনও হিংস্রতা তার বিরাট করতল আস্তে আস্তে মুঠো করে নিচ্ছে।

আচমকা মনে হল, জলকু এই সর্বগ্রাসী বীভৎস অবয়বহীন হিংস্রতাকে তার অতি পরিমিত অর্থহীন সামর্থ্য দিয়ে আঘাত করছে, নিষ্ফল আক্রোশে।

আমার মাথার শিরায় রক্তের প্রবাহ হঠাৎ যেন জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত ভীত এক অনুভূতি হল আমার। মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস-প্রশ্বাস হারালাম, চোখ অন্ধকারে ঠিকরে পড়ল, অসহ্য এক ব্যথা ঘাড়ের কাছে ছুরির ফলার মতন বিঁধে গেল।

'জলকু—এই জলকু।' জ্ঞান ফিরে পেয়ে জলকুর হাত চেপে ধরলাম।

টিলার ওপর দিয়ে যখন উঠে আসছি, জলকুর হাত আমার হাতে, মনে হল, নীচের ইস্পাতের দু'টি উজ্জ্বল হিংস্র অজগর যেন তার অফুরন্ত ওষ্ঠে হাসির আভা খেলিয়ে ঝকঝক করছে। বিদ্রূপে।

একটা গাড়ি আসছিল। পুলের কাছ থেকে ইঞ্জিনের সিটি বাজছে, বিরতিহীন কর্কশ তীক্ষ্ণ ধ্বনি—বাতাস থেকে বাতাসে ছড়িয়ে তরঙ্গের একটি ক্ষীণ স্পন্দন আমার কানে এসে লাগছে।

আর একটু হলেই জলকু আজ লাইনে কাটা পড়ে মরত। যা বেহুঁশ বেঘোর পাগল হয়েছিল আজ।

ছেলেটাকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে আমি বাঁচিয়েছি, আমি ভাবছিলাম৷ আর মনের তলায় তৃপ্তি এবং মমতার স্বাদমাখানো এক সুখ পাচ্ছিলাম।

'জলকু, আমি না এলে আজ তুমি একটু কেলেঙ্কারি কাণ্ড করতে। আর কখনও এ-ভাবে এসো না। বুঝলে ······ ?'

জলকু তাকাল না, কথা বলল না, মাথাও নাড়ল না। ··· কেন জানি না, হঠাৎ ভীষণ একটা বিরক্তি এল ছেলেটার ওপর। হাত ছেড়ে দিলাম।

ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়তো আজ ··· কিংবা কাল।

মাঝে জলকুর অসুখের মতন হল। একদিন বিকেলে জ্বর এল। দেখতে দেখতে হু হু করে জ্বর

বাড়ল। পাঁচ পর্যন্ত উঠে থামল তখনকার মতন। ছেলেটা জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান, চোখ চাইতে পারছে না। সারাটা মুখ ঝলসে যাচ্ছে। এখানে কাছাকাছি কোথাও ডাক্তার বদ্যি নেই। আমার মনে হল, তাত-জ্বর। জলপটি দিতে বললাম তরুকে, সেই সঙ্গে আমার হঠাৎ প্রয়োজনের হোমিওপ্যাথী বাক্স থেকে তখনকার মতন একটু ওষুধ।

পরের দিনও জ্বর থাকল। ডাক্তার এল বাড়িতে। জলকুর বাবা জলকুর মাকে গালাগাল দিচ্ছিল, শুনেছি। ডাক্তার না-ডাকার জন্যে নয়, অন্য কোন প্রাসঙ্গিক কারণে বোধ হয়। জলকুর মা যথারীতি উনুন আর বাসন আর কাপড়কাচা নিয়ে ব্যস্ত থাকল; তরুই যা বার দুই আমার কাছে এল ওষুধ চাইতে—এটা ওটা বলতে। রাত্রে যেন জলকুর মাকে কাঁদতে শুনেছিলাম। সম্ভবত বারান্দায় এসে অন্ধকারে বেচারি একটু আড়াল দিয়ে কাঁদছিল ?

জলকুর জ্বর ছাড়ল পরের দিন ভোরে। একেবারে ছেড়ে গেল। গা ঠাণ্ডা।

তরু এসে খবর দিল আমায়। নিজের ওষুধের মহিমায় নিজেই মুগ্ধ এবং অভিভূত হচ্ছিলাম। গর্ব বোধ হচ্ছিল। খুশি মনে তৃপ্ত মুখে তরুর দিকে চেয়ে থাকলাম।

তরু আঁচলের আগা দিয়ে আঙুলে পাক দিচ্ছিল আর খুলছিল। হঠাৎ বলল, 'জ্বরের ঘোরে বার বারই জলকু তার মানিককে খুঁজছে। বৌদি বালিশ এগিয়ে দিয়েছে, জলকু তাই বুকের কাছে জাপটে ধরে.....'

অসহ্য একটা রাগ মাথার মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল। তরুকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বিশ্রী ইতর গলায় ধমকে উঠলাম, 'তবে আর কী — তোমার বৌদির কাছে যাও। ছেলের জ্বর তিনিই সারিয়েছেন।'

তরু চুপ। তার মুখে চোখে গলার স্বরে কী রকম অপরাধী ভাব ছিল, আমি যা সহ্য করতে পারছিলাম না।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তরু চলে গেল ধীরে ধীরে।

যাক। মনের ঝাঁঝ তখনও আমার পুরো মাত্রায় রয়েছে প্রায় স্বগতোক্তির মতন বললাম, বৌদি বালিশ এগিয়ে দিয়েছে— ? তবে আর কী, বালিশ বুকে জড়িয়েই তোমাদের ছেলে ভাই-পো সারুক।' বিদ্রূপটা আমারই কানে মধু বর্ষণ করল।

জলকুর মানিক ? সে তো জলকুর সোহাগের একটা ছাগলছানা। সেটা মরেছে। পাপ চুকেছে। বড্ড জ্বালাতন করত। আমার বহু পরিশ্রমের ফল, টবে দু'টি ডালিয়াও একেবারে গোড়া পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছিল। অকালের ফুল, বহু সাধ্যসাধনা করে পেয়েছিলাম।

গিয়েছিলাম সাত-সকালে সাইকেল ঠেলে, পাঁচ মাইলটাক পথ, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। জ্যৈষ্ঠের রোদে আর ফেরা গেল না সকালে। ফিরলাম বিকেলে। তখনও মাথার ওপর রোদ ছিল।

খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে কুয়াতলায় স্নান করতে লাগলাম। ঠাণ্ডা গা-জুড়োনো জল। সমস্ত শরীর থেকে তাপ ধুয়ে যাচ্ছে, মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে শীতলতায়, ঘর্মাক্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহের অতৃপ্তি ধুয়ে মুছে স্নিগ্ধতা জড়িয়ে ধরছে। আরাম অনুভব করতে পারছি। সাবানের ফেনায় গন্ধ উঠেছে খসের, মৃদু সুঘ্রাণ।

'জলকু—জলকু—।' তরুর গলা কানে গেল।

আমি স্নান করছি, কুয়ায় গা-মাথা জুড়োনো ঠাণ্ডা মিষ্টি জল, সাবানের ফেনায় চমৎকার গন্ধ, সামনে ছায়া নেমেছে, হাল্কা ম্লান একটু রোদ, শালিক বসেছে কুয়াতলার পাড়ে।

'জলকু—জলকু।' ডাকটা বাড়ির সামনে পাঁচিলে পাঁচিলে ঘুরে বেড়াল। কদমগাছের তলা দিয়ে করবী ঝোপের কাছে গিয়ে থামল। ঘুরে ফিরে বাতাবি লেবুর গাছের তলায় থমকে দাঁড়াল।

আশপাশ ঘুরে কুয়াতলার কাছাকাছি কোথাও।

ছেলেটা আবার পালিয়েছে। স্নান শেষ হয়ে গেছে আমার। আমি জলকুর কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। এই সে-দিন তাত-জ্বরে মরতে মরতে বেঁচেছে। এখনও ও অসুস্থ। দুর্বল, রুগ্ন। এই অবস্থায় আবার পালিয়েছে। শয়তান ছেলে একটা।

ঘরে এসে কাপড়চোপড় ছাড়লাম। কী খেয়াল হল, ধোপ ভেঙে একটা পাজামা পরলাম। প্রায় আধ-কৌটো পাউডার ছড়ালাম গায়। কে জানে কেন, অত্যন্ত আরাম লাগছিল, ভাল লাগছিল। নেটের গেঞ্জিটা গায়ে দিলাম। চুল আঁচড়াচ্ছি—আয়নায় মুখ দেখে দেখে, বারান্দার কাছে তরুর গলা শোনা গেল, ভাইপোকে ডাকছে। আসলে ভাইপোর নাম ধরে আমাকেই ডাকা, আমাকেই অনুনয় করা।

মুখ মুছে, চটিটা পায়ে গলিয়ে বাইরে এলাম।

'পালিয়েছে ?'

'হ্যাঁ, খানিকটা আগেও কাঁঠাল গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল। . আমি ভাবলাম ·· ' তরু ব্যাকুল উদ্বিগ্ন চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল, 'বিকেল শেষ হয়ে গেল ··· রোগা ছেলে ··· ।'

'দেখছি।' বারান্দা থেকে নামলাম। কদমগাছের তলায় আসতেই কেমন এক লালচে আভা দেখলাম পাঁচিলের মাথায় চুপ করে পড়ে আছে। যেন ফিসফিস করে আমায় কিছু বলতে এসেছে। পশ্চিমের আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকালাম। সূর্যাস্তের লগ্ন শুরু হয়েছে। আকাশটা সিঁদুরের রঙে ধুয়ে গেছে, সূর্যটা লাল, টকটকে ··· সূর্যটা ঘন লাল, টকটকে ···

হঠাৎ কিসের আকুলকরা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের একটা দমকা এসে ঠিক আমার হৃৎপিণ্ডে ঝাপটা দিল। ঝাপটা নয়, ছোবল। বুক থেকে পলকে সাপের কিলবিলকরা এক অনুভূতি মাথার স্নায়ুতে উঠে এল। আমার হৃদপিণ্ড সম্ভবত জীবনের ধ্বনিটুকু সময়মত বাজাতে ভুলে গেছে। মাথা বুক হাত পা—সব অসাড়। আমি সর্বপ্রকার অনভূতি থেকে চ্যুত হলাম কয়েক মুহূর্তের মতন।

অল্পক্ষণ। হৃদপিণ্ড এবার ভয়ঙ্কর জোরে শব্দ করতে শুরু করেছে। বরফের বিরাট একটা দেওয়ালে কে যেন আমার পিঠ ঘাড় ঠেসে ধরেছে। ঝিমঝিম করছিল মাথা। দৃষ্টিটা টিলার ওপর থেকে আর নড়ছে না।

জলকু মারা গেছে, লাইনে কাটা পড়ে মারা গেছে আজ। অল্পক্ষণ আগেই। কানের পরদায় ইঞ্জিনের তীব্র সিটি। মালগাড়ি চলে যাবার শব্দটুকু ভেসে এল। আমি যখন স্নান করছিলাম একটা মালগাড়ি চলে গেছে। চাকার বিশ্রী, জঘন্য সেই শব্দটা এখন আবার কানের পরদায় শুনছিলাম। চাকা চলছে .. চলছে, ইস্পাতের হিংস্রতা হাসছে। ছেলেটা মারা গেছে। কেন যেন আমার হঠাৎ আজ মনে হল। আকাশে টকটকে রক্তগোলা রঙ, সূর্যটা লাল, অসহ্য লাল আজ। ভয়ংকর উজ্জ্বল।

আর আমার পা বাড়াবার মতন সাহস হচ্ছিল না। কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেছে, সাড়া নেই, আগ্রহ নেই। শুধুমাত্র এক ভয়ংকর আতঙ্কের পীড়ন আমায় পিছুদিকে টেনে নিচ্ছে।

বিহ্বলতার এই উগ্রতা আমি দমন করবার চেষ্টা করলাম। কার্যকারণের স্বাভাবিক যুক্তি তৈরি করবার আপ্রাণ পরিশ্রম করছিলাম। জলকু কাটা পড়েছে এ-কথা আমি কেন ভাবছি ? কেন ? ··· সূর্য এইরকমই লাল থাকে, মেঘে এমনই ঘন রক্তাম্বর ছড়িয়ে পড়ে সূর্যাস্তবেলায়। হয়তো প্রত্যহই। আমি চোখ তুলে দেখি না, বা দেখলেও তেমন করে দেখি না।

আমায় যেতে হবে। জলকুকে ধরে আনতে হবে। সে মারাত্মক খেলায় মেতে আছে। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধে পা বাড়িয়েছে। জলকুর মা রুটি সেঁকছে জলকুর জন্যে। তরু কুয়াতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গামছা হাতে— অপেক্ষা করছে। জলকু ফিরে এলে হাত মুখ ধুইয়ে দেবে।

বুঝতে পারলাম আমি হাঁটছি আস্তে আস্তে, ভীত ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে। টিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি

ক্রমশই। কাঁকরের স্তূপ, ছোট ছোট আগাছার ঝোপের ওপর থেকে শেষ আলোটুকু মুছে গিয়ে ছায়া নেমেছে, মাথার ওপর দিয়ে পাখিরা ফিরে যাচ্ছে। কোথা থেকে একটু হাওয়া বইতে শুরু করেছে এতক্ষণে।

টিলায় ঠিক মতন পা দিতে পারছি না—পিছলে যাচ্ছে। আমার যেন একবিন্দু শক্তি নেই, হয় ঘুমে না হয় কতকাল অসুখে ভুগে আজ দুর্বল পায়ে পথ হাঁটতে নেমেছি।

বার বার বাধা, মন পিছু টানছে। জলকু সামনে টানছে। কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে, যেয়ো না—, পরমুহূর্তে চোখের ঝাপসায় জলকুর মা যেন রুটির থালা হাতে এগিয়ে আসছে, তরু ডাকছে·······

জানি না কখন কেমন করে টিলার ওপর এসে দাঁড়িয়েছি। সূর্য সেই লহমায় কোন্ দূর-দূরান্তে ডুব দিতে যাচ্ছে। যাবার আগে শেষ নিশ্বাসের মতন প্রাণের কোনও অদৃশ্য শক্তি সূর্যপিণ্ড থেকে আলোটুকু ঢেলে দিল। এই আলো অসহ্য গাঢ়, আশ্চর্যরকম লাল। আমি জীবনে কখনও এই রঙ দেখিনি, কখনও নয়। এত ঘন, জীবন্ত, ভাষাময় হতে পারে রঙ আমি জানতাম না। এখন জানলাম। দেখলাম।

দেখলাম—টিলার তলায় অসাড় রেললাইন। এক ঝলক সেই আলো। হিংস্র ধারালো ইস্পাতের ওপর মুঠো-মাপের জায়গাটুকুতে আলোটা ছিল। আমার চোখের সাড়া পেয়ে আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাল তাবপর উড়ে গেল।

ছায়ার মধ্যে তালগোল পাকানো কালো জামাপরা জলকুর একটু চিহ্ন। পাথরের গায়ে গায়ে আর সব নিশ্চিহ্ন। স—ব।

কত রাত জানি না। চাবিধারে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। অন্ধকার। পাশের বাড়িতে একটি মুমূর্ষু গলার প্রায় শব্দহীন কান্নাটা শেষবারের মতন শুনেছি অনেকক্ষণ। এখন হয়তো মানুষটির গলা বুজে গেছে। আর শব্দ বেরুচ্ছে না। জলকুর পিসি হয়তো বিছানা জাপটে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জলকুর বাবা—? জানি না।

আমি জেগে আছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার আমার ভরে রেখেছে। মনে হচ্ছে এই লুকিয়ে থাকার খেলা আমি শুরু করেছি কতকাল আগে—আজ আর তার হিসেব পাওয়া অসম্ভব, এই খেলা কতকাল খেলব তারও কোনও সীমা পাচ্ছি না। এই অন্ধকারের মতনই সব। আদি হারিয়ে গেছে, অন্ত আছে বলে মনে হয় না।

এত অস্থির চঞ্চল কাতর বিহ্বল আগে কখনও হইনি। কেন ? আজই বা আমার কী হল ? জলকুর কাটা পড়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায় ?

বুকের মধ্যে কী যে যন্ত্রণা আর কান্না ! কেমন এক মাথা-খোঁড়ার মতো হাহাকার। কিন্তু সব জমে শক্ত হয়ে রয়েছে। পাথরের মতন। একটুও গলবে না, একটুও না।

অন্ধকার কখন একটু ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। বাইরে হয়তো মাঝরাতে চাঁদ উঠল। কোন্ তিথি আজ··· ?

বাইরে থেকে আমায় নিঃশব্দে কে যেন ডাকছে। আমি জানি কে। অনেকক্ষণ থেকেই ডাকছে। এ এক ভীষণ আকর্ষণ। প্রাণপণে বাধা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু চাঁদ উঠছে বলে, আকর্ষণ আরও তীব্র হয়ে এসেছে। এমন কি হয় ! হয়তো।

কদমগাছের পাতা সরসর করে কাঁপছে, বাতাবিলেবুর তলায় কাঠবেড়ালি ছুটছে··· জলকুর দড়ির দোলনা ছিঁড়ে গেছে কবে··· তার মানিকের কাঁঠাল পাতা জমে জমে রোদে শুকিয়ে খসখসে হয়ে উঠেছে। এখন বুঝি হাওয়া ছিল একটু, শুকনো কাঁঠাল পাতা খস্ খস্ করে উড়ে গেল।

আমায় ধরে রাখতে পারল না ঘরের অন্ধকার। আমার বুক, মন, পা—প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেন একবার শেষ চেষ্টা করে সেই অদ্ভুত জাদুকরী তীব্রতম আকর্ষণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল।

বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চাঁদ ওঠেনি—উঠবে। পা বাড়াতে গিয়ে ফুলের টবে পা আটকাল। হাত বাড়িয়ে পথ ঠাওর করতে গিয়ে মনে হল, এটা সেই ফুল ছেঁড়া ডাল চিবোনো ডালিয়ার। জলকুর মানিকের একটা বিরাট অপরাধের স্মৃতি।

দু' পা এগিয়ে বারান্দার নীচে মাঠে নামলাম। পাশের বাড়ি অসাড়। মনে হল শূন্য। হয় সবাই মরে গেছে, না হয় ছেড়ে চলে গেছে। পোড়ো বাড়ির ভ্যাপসা গন্ধ যেন নাকে এসে লাগল। শ্যাওলা জমে জমে কালো দেওয়ালের অত্যন্ত আবছা একটু আভাস।

তরু কি চলে গেছে ? তরু জানত আমি ফুল ভালবাসি, তরু জানত আমি গান ভালবাসি, তরু জানত আমি তাকেও ভালবাসতে শুরু করেছিলাম—সবই জানত তরু। তার অজানা ছিল না কিছু। সেই যে একদিন এক ঘন-মেঘলার আঁধার-হয়ে-আসা দুপুরে তরু অসাড় পায়ে আমাব ঘরে এসেছিল, আমি ছিলাম ··· সে ছিল, ঝোড়ো ধুলোর ভয়ে জানলা বন্ধ ছিল ··· পাশাপাশি বসে · ঘর ভরা মেঘলার ঘনতা ···। জলকু ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তক চমকে উঠল, আমি চমকে উঠলাম। জলকু তার মানিককে খুঁজছে। ঝড় উঠেছে কি না তাই। মানিকের সেই দ্বিতীয় অপরাধ।

চাঁদ উঠল। আমি টিলার ওপর উঠছি। চরাচর নিস্তব্ধ, বাতাস বইছে। তাল তাল এবড়োখেবড়ো ছায়া ছড়ানো এ-দিক ও-দিক। কোথাও হাল্কা, কোথাও নরম। চাঁদের অতি মিহি ঝাপসা আলো আমাকে ছায়াহীন করেছে।

জোনাকি জ্বলে না এখানে, ঝিল্লিরব হয়তো আছে ··· আমার কোনও হুঁশ নেই, মতিভ্রম হয়েছে হয়তো ··· বা কোনও কুহকের ডাকে চলে এসেছি।

টিলার উপর উঠে এসে দাঁড়ালাম। নীচে রেললাইন। কত যেন নিচু। চাঁদের মিহি, জলের মতন সাদা একটু আলো, রেললাইনের সাড় নেই, পাথরের কুচিগুলো চুপ।

হঠাৎ মনে হল, আমি যেন কিছু একটা ধরে রেখেছিলাম এতক্ষণ। তার ভার ছিল হাতে। আচমকা মনে হল, সে-ভার আর নেই। ফেলে দিয়েছি, ছুঁড়েই দিয়েছি। টিলার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, গড়িয়ে গড়িয়ে ··· পড়ল। শব্দ কি শুনলাম ? না, না। শব্দ নয়। তারপর চাঁদ একটু উজ্জ্বল হল, মুহূর্তের জন্যে ···। এক মুঠো করুণ বিষণ্ণ আলো দুলে দুলে রেললাইনের একটু জমিতে কাঁপল। যেমন কাঁপা জলে আলো কাঁপে। জলকুর রক্ত বুঝি ওখানেই ছিল। কিংবা ··· মানিকের রক্ত বুঝি পাশেই ছিল, শুকিয়ে গিয়েছিল কবে। কবেই।

ক্ষীণ চাঁদ প্রকাণ্ড এক ভাসন্ত মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

কখন কদমতলার কাছে আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়েছি। জলকুদের ঘর থেকে পোড়ো বাড়ির গন্ধ ভেসে আসছে।

এখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজের মন এবং সত্তাকে ভাঙলাম। দু'ভাগে। এক ভাগ আমি, অন্যটি জলকু। মানুষ যখন তার নাগালের কাছে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু হাতড়ে পায় না, অথচ তার কথা থাকে, তখন বোধ হয় এইভাবে নিজেকে ভাঙে। জলকুর আদুল গা, কালো তুলতুলে চেহারাটি আমার চোখের সামনে ভাসছিল। আস্তে আস্তে তার মুখ স্পষ্ট হল। বড় বড় চোখ, বসা নাক, ঝুল জমে কালো হয়ে থাকার মতন চুলের গুচ্ছগুলি কপালে কানে চোখে ঝুলে ঝুলে পড়ছে।

মনে হল, জলকু পাথর ছুঁড়ছে। পরিচ্ছন্ন অথচ হৃদয়হীন এক ষড়যন্ত্র এবং অনেক সবল কঠিন নির্মমতার বিরুদ্ধে সে বোকার মতন তার ছোট পলকা হাতে শুধু পাথরই ছুঁড়ছে ব্যর্থ আক্রোশে।

কত কথা বলার ছিল, বলা হল না। বলতে পাবলাম না। শুধু বললুম, 'জলকু, কে জানত গ্রামোফোনের দম দেওয়া অতটুকু হ্যাণ্ডেল ছুড়ে মাবলে তোমার মানিক মরে যাবে।···· এতটুতেই কত কী যে মরে যায়। আশ্চর্য।'

জলকু হয়তো আমার কথা শুনতে পেল না। নিজের কথা নিজের কানেই ফিরে এসে লাগল। আমি শুনলাম। তারপর স্বপ্নের মতন দেখছিলাম, সারা দুপুর বিকেল সন্ধে এবং প্রায় সারারাত পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা মানিককে আমি কেমন করে লুকিয়ে ছেঁড়া এক টুকরো চটে জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি টিলার ওপর।·····

ছেলাটা মরেছে। লাইনে কাটা পড়েই মবেছে। আজ······ ।

দেশ ঃ শ্রাবণ ১৩৬৫

দুই বন্ধু

সত্যজিৎ রায়

মহিম বাঁ হাতের কবজি ঘুবিয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিল। বারোটা বাজতে সাত। কোয়ার্টজ ঘাড়—সময় ভুল হবে না। সে কিছুক্ষণ থেকেই তার বুকের মধ্যে একটা স্পন্দন অনুভব করছে যেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশ বছর ! আজ হল ১৯৮৯-এর সাতই অক্টোবর। আর সেটা ছিল ১৯৬৯-এর সাতই অক্টোবর। পঁচিশ বছরে এক পুরুষ হয়। তার থেকে মাত্র পাঁচ বছব কম। কথা হচ্ছে—মহিম তো মনে রেখেছে, কিন্তু প্রতুলের মনে আছে কি ? আর দশ মিনিটের মধ্যেই জানা যাবে।

মহিমের দৃষ্টি সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। সে দাঁড়িয়েছে লাইটহাউস বুকিং কাউন্টারের সামনের জায়গাটায়। যাকে বলে লবি। এখানেই প্রতুলের আসার কথা। মহিমের সামনের দরজার কাঠের ভিতর দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ওপারে গলির মুখে একটা বইয়ের দোকানের সামনে জটলা। রাস্তায় চারটে বিভিন্ন রঙ-এর অ্যাম্বাসাডর দাঁড়ানো। আর একটা রিকশা। এবার দরজার ওপরে দৃষ্টি গেল মহিমের। হাতে আঁকা চালু হিন্দি ছবির বিজ্ঞাপন। তাতে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে বার জোরে ছবি হিট করেছে সেই চাড়া-দেওয়া গোঁফওয়ালা ভিলেন কিশোরীলালকে। মহিম অবিশ্যি হিন্দি ছবি দেখে না। আজকাল ভিডিও হওয়াতে সিনেমা দেখাটা একটা ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে গেছে। আর সিনেমা হাউসগুলোর যা অবস্থা ! মহিম তার বাবার কাছে শুনেছে যে এককালে লাইটহাউস ছিল কলকাতার গর্ব। আর আজ ? ভাবলে কান্না পায়।

বুকিং কাউন্টারের সামনে লোকের রাস্তায় আসা যাওয়া দেখতে দেখতে মহিমের মন চলে গেল অতীতে।

তখন মহিমের বয়স পনেরো, আর প্রতুল তার চেয়ে এক বছরের বড়। সেই বিশেষ দিনটার কথা মহিমের স্পষ্ট মনে আছে। স্কুলে টিফিন-টাইম। দুই বন্ধুতে ঘাটের একপাশে জামরুল গাছটার নীচে বসে আলুকাবলি খাচ্ছে। দুজনের ছিল গলায় গলায় ভাব। আর দুজনে ছিল তাদের ক্লাসের সবচেয়ে বড় দুই বিচ্ছু। কোনও মাস্টারকে তারা তোয়াক্কা করত না। এমন কী অঙ্কের মাস্টার

করালিবাবু—যাঁর ভয়ে সারা স্কুলের ছাত্ররা তটস্থ—তার ক্লাসেও মহিম প্রতুলের শয়তানির কোনও কমতি ছিল না। অবিশ্যি করালিবাবুর মতো মাস্টার তা সহ্য করবেন কেন ? এমন অনেকদিন হয়েছে যে ক্লাসের সব ছেলে বসে আছে। কেবল মহিম আর প্রতুল বেঞ্চির উপর দাঁড়ানো। কিন্তু হলে কী হবে ?—পরের ক্লাসেই আবার যেই কে সেই।

তবে বিচ্ছু হলেও দুজনেই ছিল বুদ্ধিমান। ফেল করবে এমন ছেলে নয় তারা। সারা বছর ফাঁকি দিয়েও পরীক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে মহিমের স্থান থাকত মাঝামাঝি। আর প্রতুলের নীচের দিকে।

প্রতুলের বাবার রেলওয়েতে বদলির চাকরি। ১৯৬৯-এ তাঁর হুকুম এল ধানবাদ যাবার। প্রতুলকেও অবিশ্যি বাবার সঙ্গে যেতে হবে, ফলে তার বন্ধুর সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেই নিয়েই দুজনের কথা হচ্ছিল।

'আবার কবে দেখা হবে কে জানে,' বলল প্রতুল। 'কলকাতার পাট একবার তুলে দিলে ছুটি ছাটাতেও এখানে আসার চান্স খুব কম। বরং তুই যদি ধানবাদে আসিস তাহলে দেখা হতে পারে।'

'ধানবাদ আর কে যায় বল ?' বলল মহিম। 'বাবা তো ছুটি হলেই হয় পুরী না হয় দার্জিলিং। আজ অবধিও এ নিয়ম পালটায়নি।'

প্রতুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর কিছুক্ষণ ঘাসের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুই বড় হয়ে কী করবি ঠিক করেছিস ?'

মহিম মাথা নাড়ল। 'সে সব এখন ভাবতে যাব কেন ? ঢের সময় আছে।বাবা তো ডাক্তার, উনি অবিশ্যি খুশি হবেন যদি আমিও ডাক্তার হই। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই। তুই কিছু ঠিক করেছিস ?'

'না।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপর প্রতুলই কথাটা পাড়ল—'শোন, একটা ব্যাপার করলে কেমন হয়?'

'কী ব্যাপার ?'

'আমরা তো বন্ধু— সেই বন্ধুত্বের একটা পরীক্ষার কথা বলেছিলাম।'

মহিম ভুরু কুঁচকে বলল, 'পরীক্ষা মানে ? কী অবোল তাবোল বকছিস ?'

'আবোল তাবোল নয়,' বলল প্রতুল। 'আমি গল্পে পড়েছি। এরকম হয়।'

'কী হয় ?'

'ছাড়াছাড়ির মুখে দুজন দুজনকে কথা দেয় যে এক বছর পরে অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক জায়গায় আবার মিট করবে।'

মহিম ব্যাপারটা বুঝল। একটু ভেবে বলল, 'ঠিক হ্যায়, আমার আপত্তি নেই। তবে কদিন পরে মিট করব সেই হচ্ছে কথা।'

'ধর, কুড়ি বছর। আজ হল সাতই অক্টোবর ১৯৬৯। আমরা মিট করব সাতই অক্টোবর ১৯৮৯।'

'কখন ?'

'যদি দুপুর বারোটা হয় ?'

'বেশ, কিন্তু কোথায় ?'

'এমন জায়গা হওয়া চাই যেটা আমরা দুজনেই খুব ভাল করে চিনি।'

'সিনেমা হাউস হলে কেমন হয় ? আমরা দুজনেই একসঙ্গে এত ছবি দেখেছি।'

'ভেরি গুড। লাইটহাউস। যেখানে টিকিট বিক্রি করে তার সামনে।'

'তাই কথা রইল।'

দুজনের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেল। এই বিশ বছরে কত কী ঘটবে তার ঠিক নেই, কিন্তু যাই ঘটুক না

কেন, মহিম আর প্রতুল মিট করবে যে বছর যে তারিখ যে সময়ে ঠিক হয়েছে, সেই বছর সেই তারিখ সেই সময়ে।

মহিমের সন্দেহ হয়েছিল সে ব্যাপারটা এতদিন মনে রাখতে পারবে কিনা ; কিন্তু আশ্চর্য—এই বিশ বছরে একদিনের জন্যেও সে চুক্তির কথাটা ভোলেনি। প্রতুল চলে যাবার পর—হয়তো বন্ধুর অভাবেই—মহিম ক্রমে বদলে যায়। ভালর দিকে। ক্লাসে তার আচরণ বদলে যায়, পরীক্ষায় ফল বদলে যায়। সে ক্রমে ভাল ছেলেদের দলে এসে পড়ে। কলেজে থাকতেই সে লিখতে আরম্ভ করেছিল—বাংলায় পদ্য, গল্প, প্রবন্ধ। সে সব ক্রমে পত্রিকায় ছেপে বেরোতে আরম্ভ করে। তার যখন তেইশ বছর বয়স—অর্থাৎ ১৯৭৭-এ—সে তার প্রথম উপন্যাস লেখে। একটি নামকরা প্রকাশক সেটা ছাপে। সমালোচকরা বইটার প্রশংসা কবে, সেটা ভাল বিক্রিও হয়। এমন কী শেষ পর্যন্ত একটা সাহিত্য পুরস্কারও পায়। আজ সাহিত্যিক মহলে মহিমের অবাধ গতি, সকলে বলে একালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মহিম চট্টোপাধ্যায়ের স্থান খুবই উঁচুতে।

এই বিশ বছরে প্রথম দিকে কয়েকটা চিঠি ছাড়া প্রতুলের কোনও খববই পাযনি মহিম। প্রতুল লিখেছিল ধানবাদ গিয়ে তার নতুন বন্ধু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মহিমেব জায়গা কেউ নিতে পারেনি। ছ'মাসে গোটা চাবেক চিঠি—ব্যস্। তারপরেই বন্ধ। মহিম এতে আশ্চর্য হয়নি। কারণ এইসব ব্যাপারে প্রতুলের মতো কুঁড়ে বড় একটা দেখা যায় না। চিঠি লিখতে হবে ?—ওরেব্বাবা ! মহিমের অবিশ্যি চিঠি লেখায় আপত্তি ছিল না। কিন্তু এক তরফা তো হয় না ব্যাপারটা।

বারোটা বেজে দু মিনিট। নাঃ—প্রতুল নির্ঘাত ভুলে গেছে। আর যদি নাও ভুলে থাকে, সে যদি ভারতবর্ষের অন্য কোনও শহরে থেকে থাকে, তাহলে সেখান থেকে কী করে কলকাতায় ছুটে আসবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে ? তবে এটাও ভাবতে হবে যে কলকাতার ট্রাফিকের যা অবস্থা, তাতে প্রতুল কলকাতায় থাকলেও, এবং চুক্তির কথা মনে থাকলেও, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এখানে পৌছে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

মহিম ঠিক করল যে আরও দশ মিনিট দেখবে, তারপব বাড়ি ফিরে যাবে। ভাগ্যে আজকে ববিবার পড়ে গেছে। নাহলে তাকে আপিস থেকে কেটে পড়তে হত লাঞ্চের এক ঘন্টা আগে। উপন্যাস থেকে তার ভাল রোজগার হলেও মহিম সওদাগরি আপিসে তার চাকরিটা ছাড়েনি। তার বন্ধুও যে নতুন-নতুন হয়নি তা নয়। কিন্তু স্কুলের সেই দুষ্টুমি-ভরা দিনগুলোর কথা সে ভুলতে পারেনি।

'শুনছেন ?'

মহিমের চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল। সে পাশ ফিরে দেখে একটি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে তার দিকে চেয়ে আছে, তার হাতে একটি খাম।

'আপনার নাম কি মহিম চ্যাটার্জি ?'

'হ্যাঁ। কেন বলো তো ?'

'এই চিঠিটা আপনার।'

ছেলেটি খামটা মহিমের হাতে দিল। তারপর 'উত্তর লাগবে' বলে অপেক্ষা করতে লাগল।

মহিম একটু অবাক হয়ে চিঠিটা বার করে পড়ল। সেটা হচ্ছে এই—

'প্রিয় মহিম,

তুমি যদি আমাদের চুক্তির কথা ভুলে না গিয়ে থাকো, তাহলে এ চিঠি তুমি পাবে। কলকাতায় থেকেও আমার পক্ষে লাইটহাউসে যাওয়া কোনও মতেই সম্ভব হল না। সেটা জানানো এবং তার জন্যে মার্জনা চাওয়াই এর উদ্দেশ্য। তবে তোমাকে আমি ভুলিনি। আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের

কথাও ভুলিনি—এতে আশা করি তুমি খুশি হবে। ইচ্ছা আছে একবার তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি। তুমি এই চিঠিরই পিছনে যদি তোমার ঠিকানা, এবং কোন সময়ে গেলে তোমার দেখা হবে, সেটা লিখে দাও। তাহলে খুব খুশি হব। শুভেচ্ছা নিও।

ইতি—

তোমার বন্ধু প্রতুল

মহিমের পকেটে কলম ছিল। সে চিঠিটার পিছনে তার ঠিকানা এবং আগামী রবিবার সকাল ন'টা থেকে বারোটা সময় দিয়ে চিঠিটা ছেলেটাকে ফেরত দিল। ছেলেটা দরজা দিয়ে বাইরে বেবিয়ে গেল।

মহিমের আর এখানে থাকার দরকার নেই, তাই সে বাইরে বেরিয়ে এসে হুমায়ুন কোর্টে রাখা তার সদ্য-কেনা নীল অ্যাম্বাসাডারটার দিকে এগিয়ে গেল। প্রতুল ভোলেনি এটাই বড় কথা। কিন্তু রবিবার, তাও সে কলকাতায় থেকে কেন লাইটহাউসে আসতে পারল না সেটা মহিমের কাছে ভারী রহস্যজনক বলে মনে হল। তার সঙ্গে যে মহিম যোগাযোগ করবে সে উপায়ও নেই, কারণ চিঠিতে কোনও ঠিকানা ছিল না। ছেলেটিকে জিগ্যেস করলে হয়তো জানা যেত, কিন্তু সেটা তখন মহিম খেয়াল করেনি। চিঠিটা খাতাব পাতা থেকে ছেঁড়া কাগজে। তাহলে কি প্রতুলের এখন দৈন্যদশা ? তার অবস্থাটা সে তার বন্ধুকে জানতে দিতে চায় না ? কিন্তু সে তো মহিমের বাড়িতে আসতে চেয়েছে। এলে পরে সব কিছু জানা যাবে।

বাড়ি ফিরতে স্ত্রী শুভ্রা জিগ্যেস করল, 'কী, দেখা হল বন্ধুর সঙ্গে ?'

'উঁহু। তবে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল একটি ছেলের হাতে। সে যে মনে রেখেছে এটাই বড় কথা। এ জিনিস যে সম্ভব সেটা এ ঘটনা না ঘটলে বিশ্বাস করতাম না। যখন চুক্তিটা করেছিলাম তখনও বিশ্বাস করিনি যে দুজনেই এটার কথা মনে রাখতে পাবব।'

পরের রবিবার, সকাল দশটা নাগাদ মহিম বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে। এমন সময় দরজায় রিং হল। চাকর পশুপতি গিয়ে দরজা খুলল। 'বাবু আছেন ?' প্রশ্ন এল মহিমের কানে। চাকর হ্যাঁ বলতে দরজা দিয়ে একটি ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে এলেন। তাঁর মুখে হাসি। ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়ানো। মহিমও তার ডান হাতটা বাড়িয়ে ভদ্রলোকের হাতটা শক্ত করে ধরে অবাক হাসি হেসে বলল, 'কী ব্যাপার প্রতুল ? তুই দেখছি শুধু গতরে বেড়েছিস—চেহারা একটুও পালটায়নি। বোস, বোস,।'

প্রতুলের মুখ থেকে হাসি যায়নি, সে পাশের সোফায় বসে বলল, 'বন্ধুত্বের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে ?'

'এগজ্যাক্টলি,' বলল মহিম, 'আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছি।'

'তুই তো লিখিস, তাই না ?'

'হ্যাঁ—তা লিখি।'

'একটা পুরস্কারও তো পেলি। কাগজে দেখলাম।

'কিন্তু তোর কী খবর ? আমার ব্যাপার তো দেখছি তুই মোটামুটি জানিস।'

প্রতুল একটুক্ষণ মহিমের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আমারও চলে যাচ্ছে।'

'কলকাতাতেই থাকিস নাকি ?'

'সব সময় না। একটু ঘোরাঘুরি করতে হয়।'

'ট্র্যাভেলিং সেলসম্যান ?'

প্রতুল শুধু মৃদু হাসল, কিছু বলল না।

'কিন্তু একটা কথা তো জানাই হয়নি,' বলল মহিম।

'কী ?'

'সেদিন তুই ব্যাটাচ্ছেলে এলি না কেন ? কারণটা কী ? অন্য লোকের হাতে চিঠি পাঠালি কেন?

'আমার একটু অসুবিধা ছিল।'

'কী অসুবিধা ? খুলে বল না বাবা !'

কথাটা বলতে বলতেই মহিমের দৃষ্টি জানালার দিকে চলে গেল। বাইরে গোলমাল। অনেক ছেলে ছোকরা কেন জানি এক সঙ্গে হল্লা করছে।

মহিম একটু বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে জানলার পর্দা ফাঁক কবে অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'ওই গাড়ি কি তোর ?'

এতবড় গাড়ি মহিম কলকাতায় দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

'আর এইসব ছেলেরা হল্লা করছে কেন ?' মহিমের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

এবার বন্ধুর দিকে ফিরে মহিমের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

প্রতুল নাকের নীচে এক জোড়া চাড়া দেওয়া পুরু গোঁফ লাগিযে তাব দিকে চেয়ে মিটমিট হাসছে।

'কিশোরীলাল !' মহিম প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

প্রতুল গোঁফ খুলে পকেটে রেখে বলল, 'এখন বুঝতে পারছিস তো কেন লাইটহাউসে যেতে পারিনি ? খ্যাতির বিড়ম্বনা। বাস্তাঘাটে বেরুনো অসম্ভব।'

'মাই গড।'

প্রতুল উঠে পড়ল।

'বেশিক্ষণ থাকলে আর ভিড় সামলানো যাবে না। আমি কাটি। আমাব ছবি একটাও দেখিসনি তো?'

'তা দেখিনি।'

'একটা অন্তত দেখিস। লাইটহাউসের দুটো টিকিট পাঠিয়ে দেব।'

প্রতুল বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল—মহিম তার পিছনে।

দরজা খুলতে একটা বিরাট হর্ষধ্বনির সঙ্গে 'কিশোরীলাল ! কিশোরীলাল !' চিৎকার শুরু হয়ে গেল। প্রতুল কোনরকমে জনস্রোতের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল, আব সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও রওনা দিয়ে দিল। মহিম দেখল প্রতুল তার দিকে হাত নাড়ছে। মহিমের হাতটা ওপবে উঠে গেল।

ভিড থেকে একটা ছেলে মহিমের দিকে এগিয়ে এসে চোখ বড় বড় করে বলল, 'কিশোরীলাল আপনার বন্ধু।'

'হ্যাঁ ভাই, আমার বন্ধু।'

মহিম বুঝল এবার থেকে পাড়ায় তার আসল নাম মুছে গিয়ে তার জায়গায় নতুন নাম হবে—কিশোরীলালের বন্ধু।'

আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া
রমাপদ চৌধুরী

আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। বড়-জা জোর করে ঠেলে পাঠাল। বললে, 'নতুন, অত লজ্জা দেখাসনি। ঐ লজ্জা করে করেই আমরা সব হারিয়েছি, এখন তোদের দেখলে শুধু হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরি। ' বড়-জা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই বিয়ের পর যেদিন প্রথম আলাপ হল, আমি বয়েসের এবং সম্পর্কের মান রাখবার জন্য প্রণাম করলাম, সেদিন থেকেই বড়-জা আমাকে 'তুই' বলতে শুরু করেছিল। আর যে-হেতু আমি ওর ছোট দেওরের বউ, অর্থাৎ বাড়ির একেবারে আনকোরা নতুন বউ, সেই হেতু আমার নাম হল, 'নতুন'। তা বড়-জা বললে, 'দেখ্ নতুন, যা কিছু ফুর্তিটুর্তি এখন করে নে, এরপর তো সারাটা জীবন আমাদের মতো হাঁড়ি ঠেলতে হবে।' আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, অনভ্যাসের ঘোমটা টানতেও কেমন হাসি-হাসি পায়। তাই বড়-জার খোলাখুলি কথাগুলো শুনে কেমন লজ্জা-লজ্জা করত। কিন্তু বড়-জা দমবার পাত্র নয়। তার দেওরটিকে বললে, 'ছোট্‌ঠাকুরপো, নতুনকে নিয়ে পুরী কী দার্জিলিঙ কোথাও বেড়িয়ে এসো দিনকয়েকের জন্যে। ওই যে হনিমুন না কি বলে, আমরা কী ছাই জানি আজকালকার রীতিনীতি। তা শুনে এমনভাবে হাসল গৌতম, তাকাল আমার দিকে যে বেশ বুঝতে পারলাম অমন একটা ইচ্ছে ওরও যে না হচ্ছে তা নয়। গৌতমের গোপন ইচ্ছেটা বুঝতে পেরে—না, আজকালকার মেয়েদের মতো ওকে নাম ধরে ডাকতে আমি পারি না, পুরনো দিনের বউদের মতোই আড়েঠারে বুঝিয়ে দিই, তবু সত্যি কথা বলতে কী, মনে মনে ওর নাম ধরে ডাকতে, নামটা মুখের মধ্যে লোফালুফি করতে বেশ লাগত। কিন্তু বড়-জার সামনে তো আর না বলতে পারি না। তাই বললাম, 'ওর ইচ্ছে হয় যাক, আমি যাব না।' বড়-জা রাগ দেখিয়ে বললে, 'ওরে আমার লজ্জাবতী লতা, যাবার ইচ্ছে নেই! যা বলছি, শোন নতুন, দুটিতে দিন-কয়েক কোথাও গিয়ে —

ঠেলেঠুলেই এক রকম পাঠিয়ে দিলে। আমি আর গৌতম এসে উঠলাম পুরীর একটা হোটেলে। একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে। সমুদ্র আমি আগে তো কখনও দেখিনি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল! মনে হল, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন! এমন একটা রূপের পৃথিবী আছে আমি জানতামই না? আমার বুকের মধ্যেও যেন খুশির ঢেউগুলো গুরুগুরু করতে করতে ফুর্তিতে ফেটে পড়তে লাগল। ছেলেমানুষের মতো আমার নাচতে, গাইতে, ছুটে যেতে ইচ্ছে হল ঢেউগুলোর কাছে। কিন্তু তা না করে আমি গৌতমের ওপর খুশি হয়ে উঠলাম, ঠায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলাম। আর ওর সুন্দর চোখজোড়ার দিকে, চোখের তারা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেমন ভাবতে ভাল লাগল, ওর চোখ দুটো যেন সমুদ্রের মতো নীল, সমুদ্রের মতো গভীর, সমুদ্রের মতো বিশাল। আনন্দে আহ্লাদে ওর চোখের দুটি সমুদ্রে ডুবে যেতে ইচ্ছে হল, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হল।

ও বললে, 'কী দেখছ অমন করে?' ওর বোধহয় একটু অস্বস্তি লাগছিল। লাগবারই কথা। কেউ একজন হাতে চিবুক রেখে ঠায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগবে না?'

কিন্তু আমি কী করব। আমাকে তখন দুষ্টুমিতে পেয়েছে। বললাম, 'সমুদ্দুর দেখছি।'

ও কেমন অপ্রতিভ হল, হাসল। বললে, 'আমি কি সমুদ্র নাকি?'

আমি আরও দুষ্টুমি করে সুর দিয়ে গেয়ে উঠলাম, 'তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি!'

ও তিনটে আঙুলের হালকা থাপ্পড় দিলে আমার গালে। আমি খিলখিল করে হেসে উঠেই ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে সমুদ্রের ধারে,

বালির ওপর যেখানটাতে ঢেউগুলো ফেটে ফেটে ফেনা হয়ে পড়ছে, সেখানে।

না, ঠিক অতদূর নয়। ঢেউয়ের অত কাছে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করল। আমি তো তার আগে সমুদ্র দেখিনি, তাই অমন সুন্দর ঢেউগুলোকে যেমন ভালও লাগল তেমনি কাছে যেতেও কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলাম। অচেনা মানুষের কাছে যেতে হলে যেমন ভয়-ভয় করে, তেমনি। ঠিক কেমন, বলব ? ফুলসজ্জার রাতটার মতো। ভালও লাগছে, মনের মধ্যে বেশ একটা খুশির গুনগুন, আবার অচেনা মানুষ গৌতমের এত কাছে যেতে হবে ভেবে কেমন এক ভয়-ভয় ভাব।

হঠাৎ চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি কী গৌতম এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে আমার পাশটিতে, গা ঘেঁষে। আর আমারই মতো তাকিয়ে আছে সমুদ্রে দিকে।

ছোট ছোট এক একটা দল পাড় ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিল। মেয়ে পুরুষ ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে। যেই ঢেউ এসে পড়ছে, দু'একজন ছুটে যাচ্ছে সাদা ফেনায় পা ডোবাতে। ওদিকে জেলেদের ডিঙির সারি পড়ে আছে বালিব ওপর, আর বালির ওপর বসে বসে বড় বড় জালগুলো মেরামত করছে জেলেরা।

—এই, ওরা কুড়োচ্ছে কী ? আমি জিগ্যেস করলাম।

ও বললে, ঝিনুক।

ওমা, তাই নাকি ! আমিও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোট বড় নানা রকমের, সাদা আর বঙিন ঝিনুকের রাশি এসে পড়ছে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ সরে গেলেই সেগুলো চিকচিক করছে বালির ওপর। আমি দাঁড়িযে দাঁড়িয়েই দেখলাম। কুড়োতে কেমন লজ্জা হল। আমার বয়েসী অনেক মেয়েই ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি কেমন লজ্জা পাচ্ছিলাম। কারণ, যারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তারা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। মেয়েরাও। আমি দেখতে খুব সুন্দর, আমার চোখদুটো টানাটানা, আমার ঘাড়টা কী চমৎকার, আমার ফরসা সুডোল হাত দেখলে নাকি হাত বোলাতে ইচ্ছে করে, এমনি সব কথা বলে স্কুলের বন্ধুরাও আমাকে খ্যাপাত, কলেজের মেয়েরা প্রশংসা করত। কিন্তু সমুদ্রের পাড় দিয়ে যেতে যেতে ওরা যখন বার বার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল তখন বেশ বুঝতে পারছিলাম রূপ দেখছিল না ওরা। বয়স-হওয়া দুটি মহিলার হাসি দেখেই বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে ওরা বুঝতে পারছিল আমাদের সবে বিয়ে হয়েছে। ও ঠিক বোঝা যায়, আমি নিজেও তো কত মেয়েকে দেখেই ধরে ফেলতাম। বিয়ের পর চেহারাটাই কেমন অন্যরকম অন্যরকম লাগে। তাছাড়া সিঁথিতে সিঁদুরও বোধহয় একটু বেশি দিয়ে ফেলতাম তখন । একটু বেশি দূর অবধি।

ওরা তাকাচ্ছিল বলে লজ্জা নয়, সবে বিয়ে হয়েছে বলে লজ্জা নয়, বরং মজাই লাগছিল। তবে লজ্জা হচ্ছিল ঝিনুক কুড়োতে, ওদের সমানে ওদের মতো ঝিনুক কুড়োতে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। এক সময় দেখলাম, নিজেরই অজান্তে কখন হাসতে হাসতে আমিও ঝিনুক কুড়োতে শুরু করেছি, ঢেউয়ের ফেনায় পা ডুবিয়ে হাঁটছি। আর ঢেউ লেগে কাপড় ভিজে যাবে বলে কাপড়টা এক বিঘত তুলে ধরেছি। লজ্জা দূর হয়ে গেছে, ভয় ভেঙে গেছে তখন।

হাঁটতে হাঁটতে একটু অনুভবেই বুঝতে পারছিলাম যে গৌতম পিছন পিছন আসতে আসতে আমার ফরসা পা—পায়ের উন্মুক্ত অংশটুকুর দিকে তাকাচ্ছে।

এক বিঘত পা উন্মুক্ত করে হাঁটা এক জিনিস, আর সমুদ্রে স্নান করা অন্য। স্বামী বলেই তো বেশি অস্বস্তি। তা ছাড়া অত লোকের সামনে ! না বাবা, আমি সুমুদ্রে স্নান করব না।

পরের দিন সকাল থেকেই নুলিয়াটা পিছনে লাগল।—সমুন্দর নাহাবে না দিদি।

ও বলে উঠল, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি কি নতুন নাকি এখানে ! আরও কতবার এসেছি।

সত্যি, গৌতমের ওপর এত হিংসে হচ্ছিল। ও কতবার এসেছে, অথচ আমি কিনা এই প্রথম ! এমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে কোথায় ছিলাম এতদিন ? যাক, এসেছি যখন চোখ ভরে দেখে নিই, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই।

যেখানটায় সকলে স্নান করছিল সেইখানটায় এসে বালির ওপর বসলাম দু'জনে। স্নান করতে করতে সবাই হেসে ল্যুটোপুটি খাচ্ছে। ঢেউ লেগে বালিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মেয়েরা, দু-একজন পুরুষ ঢেউয়ের মাথায় লাফাতে লাফাতে অনেক অনেক দূর অবধি চলে যাচ্ছে। আর তারও ওদিকে, অনেক দূরের অথৈ জলে কালো-কালো খুদে খুদে কয়েকটা ডিঙিতে করে মাছ ধরছে নুলিয়ারা। পাড় থেকে কেউ বা ডিঙি ভাসাবার চেষ্টা করছে, বার বার ফিরে আসছে ঢেউ লেগে।

ও বললে, কী, সমুদ্রে স্নান করবে না ?

আমি আতঙ্কে হাত নেড়ে বলে উঠলাম, না বাবা, অত শখ নেই আমার।

—আরে দূর, ভয়ের কিছু নেই। আমি নিয়ে যাব তোমাকে, দেখো। গৌতম বললে—এমনভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, যেন উনিও একজন নুলিয়া, সমুদ্রের সঙ্গে এত চেনাশোনা।

আমি মনে মনে বললাম, তোমাকেও আমি নুলিয়া না নিয়ে একা নামতে দেব কিনা। বিয়ের পর বউয়ের কাছে সবাই অমন শিভালরি দেখাতে চায় গৌতমবাবু, আমি তা জানি।

মনে মনে এ-কথা ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ ঠাট্টার সুরে ডাকলাম, ও গৌতমবাবু !

ও ফিরে তাকাল।

বললাম, কী দেখছেন স্যার ?

—সমুদ্র।

বললাম, উঁহু, আমি জানি।

—কী ?

হেসে উঠে বললাম, বলব না।

সত্যি, মেয়েরা যে কী করে স্নান করছিল আমার নিজেরই অবাক লাগছিল। কখনও বালিতে গড়িয়ে পড়ছে, কাউকে স্রোতের টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারও কাপড়চোপড়—

একজনের অবস্থা দেখে তো আমি আর গৌতম হেসে লুটিয়ে পড়লাম। বেচারা শাড়িখানা হাতে নিয়েই টুপ করে বসে পড়ল গলা অবধি জলে ডুবিয়ে। কী করবে, জলের তোড়ে লাজলজ্জা রাখা দায়। আর কাপড়-জামা নামেই আছে, জলে ভিজে এমন অবস্থা, শরীরের কিছুই চাপা ঢাকা থাকে না। পুরুষগুলোও কেমন ক্যাটক্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখো।

আমি ইয়ার্কির ছলে গৌতমের চোখের দিকে তাকালাম।—এই । কী দেখছ মশাই অমন ড্যাবড্যাব করে?

ও হাসল। আর আমি ভাবলাম, ওদের মতো ও-ভাবে সমুদ্রের জলে নামতে পারব না আমি এত লোকের সামনে। গৌতমের সামনে।

কিন্তু ইচ্ছেও যে না-হচ্ছিল না তা নয়। এক একবার ভাবছিলাম, মন্দ হয় না। বেশ তো জলে লুটোপুটি খাওয়া যায়। বিয়ের আগে এই তো সেদিনও ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, আমরা দু'বোন ছাদে গিয়ে ভিজলাম। তবে হ্যাঁ, নুলিয়া না নিয়ে নামতে পারব না। ওদের মতো নুলিয়াটাকে হাত ধরতে দেব না অবশ্য। মেয়েগুলো অমনভাবে নুলিয়াদের হাত ধরেই বা যাচ্ছে কেন ঢেউ কেটে কেটে ! টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে, ভেসে যাবে, এই ভয়ে ? তা একটু দূরেই নয় থাকবে নুলিয়াটা। না, এতদূর এসে সমুদ্রে স্নান না করে গেলে মনে খুঁতখুঁতুনি থেকে যাবে. বড়-জা হয়তো জিগ্যেস করবে, হ্যাঁ রে নতুন, সমুদ্রে নেয়েছিস তো রোজ ? তারপরও অবশ্য ইয়ার্কি ঠাট্টা করবে তা জানি। বড়-জা বলেছিল, আগে নাকি এসেছিল একবার রথের সময়। ননদরাও। এবার ওরা যদি সবাই

আসত, ভাল হত। সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান করা যেত। বড়-জা বেশ ভাল মানুষ। সত্যি, আমি কত সুখী, কত সুখী। কারও জীবনে যে এত সুখ থাকে বিয়ের আগে, কল্পনাও করতে পারিনি।

গৌতম হঠাৎ হেসে উঠল হো-হো করে। তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনে তাকাতেই আমি হেসে উঠলাম। ভীষণ মোটা একটা লোক সমুদ্রে নামছিল, প্রথম ঢেউ লেগেই কাত। ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে ফিরে এল বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে।

আরে, এর মধ্যে এত চড়া রোদ উঠে গেছে ? বালি তেতে উঠেছে।

—কি, নামবে না ? গৌতম জিগ্যেস করল।

আমি সায়ও দিলাম না, অমতও করলাম না। ভেতরে ভেতরে যে একটু ইচ্ছে না হচ্ছিল তা নয়। গৌতম বললে, চলো তা হলে তেল তোয়ালে নিয়ে আসি কাপড়টা বদলে আসি।

উঠে পড়লাম। হোটেলের নুলিয়াটা সেলাম করলে।—নাহাতে যাবে না দিদি ?

বললাম, যাব দাঁড়াও।

গৌতম বলে উঠল, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি একাই পারব তোমাকে সামলাতে।

আমার অবশ্য নিজের জন্য তত ভয় হচ্ছিল না, ভয় হচ্ছিল ওর জন্যেই। বললাম, থাক্ না একজন সঙ্গে । সবাই তো নুলিযা নিয়েই নামছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল গৌতম, আমার কথাটাকে কোনও আমলই দিল না। হেসে বললে. তুমি দেখছি সাজুন্তির চেয়ে ভীতু !

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম। কারণ আমদের দোতলার ঘরটির পাশের সিঁড়ি বেয়ে তেতলার সেই বউটি, যার সাজগোজের ঘটা দেখে আমরা 'সাজুন্তি' নাম দিয়েছিলাম, তাকে নেমে আসতে দেখলাম। পিছনে তার স্বামী।

চোখোচোখি হতেই বউটি হেসে বললে, যাবেন না সমুদ্রে স্নান করতে ?

কী আশ্চর্য, ওই বউটা—কাপড় ভিজে যাবে এই ভয়ে ঝিনুক কুড়োবার সময়েও যে ঢেউয়ের কাছে যেত না. সেও চলেছে সমুদ্রে স্নান করতে ? একটা সাদাসিধে, শাড়ি পবেছে, গোলাপী রঙের টার্কিশ তোয়ালেটা বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধ অবধি ছড়িয়ে দিয়েছে সুছন্দ বুকের ওপর দিয়ে, একরাশ ফাঁপানো চুলে ঢেকে গেছে সারা পিঠ।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি গৌতমের দিকে তাকালাম। চোখ সরিয়ে নিলে ও, আর বউটির প্রশ্নের জবাবে, হেসে বললে, তখন থেকে তো ভয় ভাঙাবার চেষ্টা কবছি।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে চটে গেলাম গৌতমের ওপর। আমি সমুদ্রকে ভায় পাই ও-কথাটা বউটিকে না শোনালেই কি চলত না ? আর গৌতম বউটির দিকে অমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলই বা কেন ? না হয় আমার চেয়ে একটু সাজগোজ বেশিই করে, দেখতে কি আমার চেয়ে সুন্দর?

বউটি এবং তার স্বামী হাসতে হাসতে নেমে গেল। আমি চুল খুলে কাপড় বদলে নেমে পড়লাম একটাও কথা না বলে। গৌতম পিছনে পিছনে।

নুলিয়াটা আবার ধরল বেরুবার মুখে।

গৌতম বললে. না, না, লাগবে না।

আসলে ওর মনে প্রথম থেকেই একটা বাহাদুরি দেখাবার নেশা ঢুকেছিল বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। ও যেন সব জানে, সব বোঝে, সব পারে। প্রথম প্রথম ওর এই ভাবটা আমার বেশ ভালই লাগছিল। বেশ একটা নির্ভর করবার মতো মানুষ যেন। কিন্তু যেখানে সত্যিই ভয় আছে সেখানে এই বাহাদুরির কী দরকার। দু'আনা পয়সা তো, তার বেশি আশাও করে না নুলিয়াটা। কিন্তু পয়সার জন্যে তো নয়, বরং পসয়া খরচ করতে পেলেই যেন খুশি হয় গৌতম। আসলে ওই অকারণ টাকা খরচ করার মধ্যেও যেন কী একটা বাহাদুরি লুকিয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারতাম, ও যেন আমার চোখে—তার

নবপরিণীতা স্ত্রীর চোখে নিজেকে বড় করে তোলবার ফিকির খুঁজছে। কখনও অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করে, কখনও সমুদ্রকে তুচ্ছ করে, কখনও বা হোটেলের ঠাকুর-চাকরকে ধমক দিয়ে ও বোধ হয় আমার কাছে ওর মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করছিল।

নুলিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে এসে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

গৌতম যখন ওকে তুচ্ছ করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে গেল, নুলিয়াটা তখন শুধু বললে, কারিন্ট আছে বাবু।

কিন্তু কে শোনে তার কথা। গৌতম টানতে টানতে আমাকে তখন জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে। ওর হাত ধরে ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুটা গিয়ে আর সাহস হল না। ও যত এগিয়ে যেতে চায় আমি তত বাধা দিই। শেষে হাল ছেড়ে দিলে ও, বললে বেশ, তবে তুমি উঠে যাও, আমি একটু পরে উঠব।

তখন ওর কথা আর কে ভাবে, নিজে পালিয়ে বাঁচতে পারলে হয়।

পাড়ে উঠে এসে চিৎকার করে বললাম এই ! বেশি দূর যেয়ো না।

কিন্তু বললেই কী আর শোনে। ঐ যে বললাম, ওর মনে তখন বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছে। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটেনি, এ সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন স্বামীর না হয়। ও তাই আমার কথায় কান দিল না।

আমার অবশ্য যেমন ভয়ও করছিল, তেমনি ভালও লাগছিল। সাজুন্তি ইতিমধ্যে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে, আর তার স্বামীটি স্নান করছে তখনও, কিন্তু নুলিয়ার হাত ধরে। তাকে দেখে আমি হেসেই ফেললাম। মেয়েমানুষেরও অধম, কী ভীতু রে বাবা ভদ্রলোকটা। মনে মনে ভয় পেলে কী হবে, গর্বও হচ্ছিল গৌতমের জন্যে। ও একা একাই কতদূর এগিয়ে যাচ্ছে দেখো !

একটার পর একটা ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিয়ে, কখনও ঢেউ ভেঙে পড়ার মুহূর্তে টুপ করে ডুব দিয়ে ও তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম একবার, বোধহয় শুনতে পেল না।

এ কি, এত দূরে চলে যাচ্ছে কেন ও ? এতদূর চলে গেছে তখন গৌতম, যেখানে আশেপাশে আর একটিও লোক নেই।

সাজুন্তির স্বামী ততক্ষণে উঠে এসেছেন, আর বউটি গৌতমের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার স্বামীকে বলল, দেখো, দেখো, উনি কতদূর গেছেন।

বউটির চোখের দৃষ্টিতে গলার সুরে সপ্রশংস ভাবটুকু দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠল আমার। সত্যি, গৌতম যেন মুহূর্তের জন্যে নেপোলিয়ানের মতো বীর হয়ে উঠল আমার চোখে।

কিন্তু সাজুন্তি আর তার স্বামী হোটেলের দিকে চলে যেতেই আমার বুকের ওপর একটা আতঙ্কের পাথর চেপে বসল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনে হল, গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝি বা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই। হাত তুলে বার বার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যেন হাত তুলে চিৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচাও।

অতদূর থেকে তার চিৎকার এসে পৌছনোর কথা নয়। কিন্তু সমস্ত শরীর যেন মুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠল আতঙ্কে, ভয়ে। মনে হল, গৌতম ভেসে যাচ্ছে, স্থির মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তের মত আমি এদিক-ওদিক তাকালাম, কী করব ঠিক করে উঠতে পারলাম না, নুলিয়াটাকে খুঁজলাম।

লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তখনও। অন্যমনস্কভাবে কী যেন দেখছে।

সমস্ত শরীর শিউরে উঠল আমার, চোখ ঠেলে কান্না এল। পাগলের মতো হয়ে গেলাম আমি। ছুটে গেলাম নুলিয়াটার কাছে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আমার দু'হাতের দুটো বালা খুলে তার হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুরোধ করলাম, ওকে বাঁচাও তুমি, বাঁচাও। ঐ দেখ ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে···

ঠিক কী বলেছিলাম, কী ভাবে বলেছিলাম, নিজেও জানি না। সেই মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক ছিল না।

কিন্তু নুলিয়াটার মাথার ঠিক ছিল। সে বালা দুটো আমার হাতেই গুঁজে দিয়ে একবার তাকাল গৌতমের দিকে। বিড়বিড় করে কী যেন বললে, তারপর সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

উঃ, সে যে কী উৎকণ্ঠায় এক ঘন্টা কেটেছে, আজ ভাবলেও সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়, ঘুম আসে না কোনও কোনও দিন।

নুলিয়াটা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে, একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে, আর আমার মনে হচ্ছে যেন কত সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বালির ওপর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি ছোটাছুটি, নিজেরই অজ্ঞাতে কখন আমিও জলের কাছে এগিয়ে এসেছি·····

একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে নুলিয়াটা, আর আমার মন বলছে, পারবে না, পৌঁছতে পারবে না নুলিয়াটা, গৌতমকে বাঁচানো যাবে না।

এক নিমেষের জন্যে গৌতমের শরীরের কালো বিন্দুটুকু একটা মাতাল ঢেউয়ের মাথায় উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমার পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হল, চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল, সমুদ্রের গর্জন আর স্নানার্থীদের চিৎকার কোলাহল একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে গেল··· আমি কী অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি কী কানে শুনতে পাব না আর ?···· বীভৎস একটা আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চেষ্টা করলাম আমি, তারপর বোধ হয় বসে পড়লাম বালির ওপর, কিংবা পড়ে গেলাম, কিংবা·····

কী যে হয়েছিল আমি জানি না।

একটু একটু করে যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলাম একরাশ লোক আমাকে ঘিরে আছে। মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে অচেনা এক ভদ্রমহিলা বাতাস করেছেন আমাকে, আর নুলিয়াটা চোখের পাতা খুলতে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে বলছে, বাবুকে জান বাঁচায় দিয়েছি, দিদি, বাবু বাঁচে গেছে।

ধীরে ধীরে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম, পাশে বসে ক্লান্তিতে অবসন্নতায় গৌতম তখনও ধুঁকছে।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীর টানতে টানতে নুলিয়াটার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরে এলাম। ফিরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঘুম, ঘুম, পরম তৃপ্তির ঘুম।

বিকেলের দিকে যখন হোটেলের সামনের বারান্দাটায় দু'খানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আমরা বসলাম, তখন আমার শরীরের ক্লান্তি দূর হয়েছে, কিন্তু গৌতমের সারা দেহে তখনও ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যের মতো শক্তিশালী অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পরাজিত সৈনিকের মতো ক্লান্ত আর লজ্জিত সে। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

ইতিমধ্যে গুজবটা রটে গিয়েছিল সারা হোটেলে। সকলেই একবার করে এসে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছিল, খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিল গৌতম কেমন আছে, আর লজ্জায় অস্বস্তিতে আমি মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই সমুদ্র ছেড়ে, এই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলে

যেন বাঁচি।

এক সময় সাজুন্তি আর তার স্বামী এসে দাঁড়াল পিছনে।—কেমন আছেন ?

গৌতম অপ্রতিভ হাসি হেসে তাকাল, বললে, ভাল। তারপর মাথা নিচু করলে।

আর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল তাঁকে নুলিয়ার হাত ধরে স্নান করতে দেখে আমি হেসেছিলাম। পাশাপাশি দু'জনকে তুলনা করে গৌতমের দুঃসাহসের জন্যে গর্ববোধ করেছিলাম।

ওরা চলে গেল। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল।

আর তখনই চোখাচোখি হল নুলিয়াটার সঙ্গে। সামনের রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে সে ফিরে তাকাল আমার দিকে, হাসল, সেলাম করল। তারপর চলে গেল নিজের কাজে। আর আমার সমস্ত মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ল। ও না থাকলে আজ কী যে হত। গৌতম বাঁচত না, আমি বাঁচতাম না। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো বলব তাকে। বিয়ের পর একটা মাসও যেতে না যেতে যদি আমার বাইশ বছরের যৌবন থমকে থেমে যেত তা হলে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কী বলব !

নিজেরই অজান্তে কখন যে হাতের তিন ভরি সোনার বালা দুটোয় হাত দিয়েছি টের পাইনি।

সচেতন হতেই একটা খুশির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ভাবলাম, লোকটাকে এখনই ডেকে বালা দুটো দিয়ে দিলে হত। ও আমার জন্যে যা করেছে, যা দিয়েছে, তার কাছে এটুকু দান কত তুচ্ছ !

কিন্তু লোকটা তখন অনেক দূর চলে গেছে। তাই ভাবলাম, থাক্, এত তাড়া কিসের, লোকটা তো আর চলে যাচ্ছে না, কাল সকালে যখন আবার আসবে তখনই দিয়ে দেব।

পরে দিন সকালে গৌতম চাঙ্গা হয়ে উঠল। গতকালের সেই লজ্জা আর অস্বস্তি যেন ঝেড়ে ফেলেছে।

বললে, চলো, বেড়াতে যাবে না ?

বললাম চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্রের পাড়ে, যেখানে অবিশ্রান্ত ঢেউ ফেটে পড়ছে তীরের ওপর, তা থেকে একটু দূরে। আগেকার মতো কাছে যেতে ইচ্ছে হল না। না, ভয় নয়, কেমন একটা বিতৃষ্ণা।

হঠাৎ দেখলাম নুলিয়াটা আর একজনের সঙ্গে কাঁধে একটা লাঠিতে বিরাট জালটা ঝুলিয়ে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। চোখাচোখি হল। ও হাসল। আমিও।

ভাবলাম, এখনই দিয়ে দেব বালা দুটো ? কিন্তু এই বালা দুটো নিয়ে কিই বা করবে ও ? ওর কাছে এ বালা দুটোও যা, দু'গাছি চুড়িও তাই। নিয়ে ওর বউকে পরতে দেবে হয়তো, বিক্রি তো করবে না। আর চুড়ি দুটোর দামই বা কম কী ? দুটোয় এক ভরি সোনা তো আছেই। তা ছাড়া, কৃতজ্ঞতার দাম তো সোনা দিয়ে যাচাই হয় না। আর বালা দুটো ওকে দিয়ে দিলে মা বকবে না তো ! বড়-জা ? বলবে হয়তো, 'দু'দিনের জন্যে গেলি নতুন, গিয়েই বালাজোড়া খুইয়ে এলি ?' বলবে নিশ্চয়ই, কারণ বালার প্যাটার্নটা বড়-জার খুব পছন্দ হয়েছিল। তার চেয়ে এক জোড়া চুড়িই বরং দেয়া যাবে নুলিয়াটাকে, ওর বউকে পরাতে বলব।

কিন্তু এ-জায়গাটা ছেড়ে পালাতে না পারলে যেন শান্তি নেই। আমরা দু'জনে এই সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, অন্য সকলের মতো সমুদ্র দেখছি, কিংবা কিছুই দেখছি না। অথচ ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে যারাই যাচ্ছে, ফিরে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, আমার দিকে। আর তাদের সেই তীব্র দৃষ্টিতে আমি যেন উপহাস দেখতে পেলাম। যেন সকলেই হাসছে আমাদের দেখে। যেন বলাবলি করছে, যেমন বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিল, উচিত শাস্তি হয়েছে।

সাজুন্তির চোখেও যেন এমনই এক উপহাস লুকিয়ে ছিল। সেই দুটি টানাটানা কৌতুকে চঞ্চল

চোখ, যে-চোখ প্রশংসায় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে বলে উঠেছিল, 'দেখ, দেখ, উনি কতদূর গেছেন ! সেই চোখজোড়া এখন যেন উপহাসে তীক্ষ্ণ।

আমি গৌতমকে বললাম, চলো, কাল সকালেই চলে যাই। আমার আর ভাল লাগছে না।

গৌতম সায় দিলো, তাই চলো।

কিন্তু যাওয়া হল না। স্টেশন থেকে ফিরে এসে গৌতম বললে, বার্থ পাওয়া গেল না। তিন দিন পরে একটা ব্যবস্থা হবে।

পরের দিন সকালে নিত্যদিনের মতই সাজুন্তি আর তার স্বামী নেমে গেল আমার চোখে সামনে দিয়ে। তেমনি বুকের ওপর গোলাপী তোয়ালেটা বিছিয়ে, এক-পিঠ এলো চুলে একটা অকারণ ঝাঁকুনি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমাদের ঘরের সামনে বউটি থমকে দাঁড়াল, কিন্তু স্নান কবতে যাব কিনা সে-প্রশ্ন না করেই নেমে গেল। অর্থাৎ ওবা লক্ষ করেছে যে আমরা ঐ দুর্ঘটনার পর আব সমুদ্রে স্নান করতে যাইনি। শুধু কি লক্ষ করেছে ? হয়তো বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসিও।

বউটির ওপর অকারণেই চটে গেলাম আমি। থামলই যদি আমার চোখের সামনে তা হলে একটাও কথা বলল না কেন ? ভাবলাম, আমিও আব কথা বলব না ওর সঙ্গে, উত্তর দেব না কোনও প্রশ্নের।

কিন্তু ওরা যখন স্নান সেরে ফিরছে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। আর হঠাৎ কথার ফোয়ারা হয়ে উঠল বউটি—। শুনেছেন ? আজ আবার একজন ডুবে যাচ্ছিল, একটা বুড়ো। নুলিয়ারা গিয়ে বাঁচাল তাঁকে। · · · কেউ ডুবে গেলে বাঁচানো কাজ ওদের, নুলিয়াদের। শুনলাম গবমেন্ট নাকি টাকা দেয় সেইজন্যে। সত্যি ? নুলিয়ারা না থাকলে কী যে হত। · · · আর আজ কী সাংঘাতিক জোয়ার ছিল, দেখলেন না তো !

অনর্গল কথা, অনেক কথা বলে গেল বউটি। আমি শুধু ম্লান হাসলাম একটু। আর বউটি চলে যেতেই আমি গৌতমকে বললাম, এই ! নুলিয়ারা নাকি টাকা পায় গরমেন্টের কাছে, কেউ ডুবে গেলে বাঁচাবে বলে ?

—কই শুনিনি তো ! গৌতম বললে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ওপরতলার বউটি যে বললে। ঐ সাজুন্তি।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি ঐ কথাই ভাবছিলাম, আর আনমনে চুড়ি দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া কবছিলাম। চুড়ির প্যাটার্নটা দিদি পছন্দ করেছিল। দিদি ! দিদির কথা মনে পড়লেই আমার এত ভাল লাগে। দিদির মতো আমাকে বোধ হয় আর কেউই ভালবাসে না। গৌতমও নয়। বিয়ের যত ঝামেলা তো দিদিই মাথায় করে নিয়েছিল। বাজার করা, ডেকরেটার ডাকা, শ্বশুরবাড়ির লোকদের আদর আপ্যায়ন।—বাবা বুড়ো মানুষ কত দিক আর সামলাবেন ? দাদাটা তো আড্ডা মেরে হকি-ক্রিকেট নিয়েই আছে।

দিদি বিয়ের পর একটা উপদেশ শুধু দিয়েছিল। বলেছিল, দ্যাখ নমি, গায়ের গয়নাগুলো—বাবা যা দিয়েছেন তোকে-আমাকে, এগুলো লোক দেখাবার জন্যে নয়, সাজগোজের জন্যেও নয়। এগুলোই আমাদের ব্যাঙ্ক, আমাদের ভবিষ্যৎ। খেয়ালের বশে যেন এগুলো বিক্রি করিস না, হাজার অভাব-অনটন হলেও না।

আচ্ছা, অভাব-অনটন হলেও যা বিক্রি করতে নিষেধ করেছিল দিদি, তা যদি নুলিয়াটাকে দিয়ে দিই তা হলে কি দিদি রাগ করবে ? দিয়ে অবশ্য দেব না। দিতে আমার নিজেরই তেমন ইচ্ছে এখন আর হচ্ছে না। কেন দেব, সাজুন্তি যে বললে, ওরা গরমেন্টের কাছ থেকে টাকা পায়। ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ। তা ছাড়া ডিঙি করে কত মাছ ধরে আনে ওরা, বিক্রি করে।

নেহাত গরিবও ওরা নয়। এক একজনকে স্নান করিয়ে দিতে দু'আনা করে নেয়, তাতে কম টাকা রোজগার হয় নাকি ওদের ! আমি অবশ্য অকৃতজ্ঞ নই। নুলিয়াটা সত্যিই তো গৌতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ও না থাকলে, আজ কী দশা হত আমার ? কোন মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম ? তাছাড়া, সারা জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যেত, এই বাইশ বছর বয়সে—। না, নুলিয়াটাকে কিছু একটা দিতেই হবে। আংটিটা দিলে কেমন হয়। আমার তো অনেকগুলো আংটি। চেনা-অচেনা অনেকেই তো আংটি দিয়েছে। মুক্তো-বসানো যেটা, সেটা অবশ্য দেব না। আর জামাইবাবু যেটা দিয়েছে সেটা খুব সুন্দর দেখতে। ওটা রেখে দেব। না রাখলে জামাইবাবু কী ভাববে ? যদি কোনদিন পরতে বলে। ওটা দিয়েছি শুনলে জামাইবাবু খুব দুঃখ পাবে। জামাইবাবু সত্যি খুব ভালবাসে আমাকে, খুব। এক এক সময় মনে হয় দিদিকেও যেন অত ভালবাসে না। তা অবশ্য সত্যি নয়। বউয়ের চেয়ে কেউ কি শালীকে বেশি ভালবাসতে পারে ? মোটেই না। জামাইবাবুটা ভারী ফাজিল, আর ভারী দুষ্টু। ও ইচ্ছে করেই অমন ভাব করে। আমি কী আর বুঝি না ! দিদিকে রাগাবার জন্যেই অমনি করে। রাগলে দিদিকে খুব সুন্দর দেখায় কিনা।

রাগলে দিদিকে যে খুব সুন্দর দেখায় —আমি কিন্তু কোনদিন লক্ষ করিনি। গৌতমই প্রথম বলেছিল। সেই যে দিদির বাড়ি গিয়ে সব মিষ্টিগুলো খেতে পারেনি গৌতম, আর দিদি তাই রেগে গিয়েছিল—তারপরই বলেছিল ও, বলেছিল, তোমার দিদি রেগে গেলে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু ওঁকে।

গৌতম রেগে গেলে আমার মোটেই ভাল লাগে না। তাই দু'দিন পরে, যাবার আগের দিন বিকেলে ও যখন রুক্ষ গলায় বললে, জিনিসপত্তর গোছগাছ করছি না কেন, তখন আমার খারাপ লেগেছিল। কই, বিয়ের পর থেকে একটা দিনও তো অমনভাবে কথা বলেনি ও। হঠাৎ এমন রাগ-রাগ ভাব কেন ? আসলে ও বোধ হয় ভেবেছিল আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই। আর ও তখন পালাবার জন্যে অধীর ! প্রতি মুহূর্তে বেচারার মনে অদ্ভুত এক লজ্জা। কী, না, সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল লোকটা ! ভাবলে, আমার নিজের হাসি পায়। সত্যি, কী কাণ্ডটাই না করল গৌতম। বড়-জা বলেছিল হনিমুন করে আসতে। ভাল হনিমুনই হল বটে।

কিন্তু সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধে কেমন গম্ভীর-গম্ভীর ভাব, সারা মুখ যেন থমথম করছে গৌতমের। অপ্রয়োজনে একটা কথাও যেন বলতে নারাজ। ওর এই মুখের ভাব দেখে কথাটা বলতে সাহস হল না, অথচ ওকে না বলে তো আংটিটা দেয়া যায় না।

ভাবলাম, থাক, কাল সকালে নিশ্চয় মনটা ভাল থাকবে ওর, তখনই বলব। আর নুলিয়াটাও তো কাল সকালেই আসবে, তখনই দেয়া যাবে গৌতমকে জিগ্যেস করে।

গৌতমকে জিগ্যেস করে আংটিটা দিতাম ঠিকই। আর গৌতম নিশ্চয়ই আপত্তি করত না, কিন্তু পরের দিন সকালে যে এত তাড়াহুড়া হবে আমি কী ছাই জানতাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম টাইমপিসে, কিন্তু এলার্মের দম দিয়ে রাখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই সেটাও বাজেনি, ঘুমও ভাঙেনি। যখন ঘুম ভাঙল তখন আর এক ঘন্টাও সময় নেই।

গৌতম চা খেয়ে চলে গেল হোটেলের হিসেব মেটাতে। ফিরে এসে বিছানাপত্তর গোছগাছ করতে লেগে গেলাম দু'জনে। সংসার ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম এ-ক'দিন। টুকিটাকি জিনিসপত্তর গুলি তো নেহাত কম ছিল না। আগের দিন কিছু কিছু বাঁধাছাঁদা হয়েই ছিল, কিন্তু চিরুনি, টুথব্রাশ, পাউডার, ওর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিতে সময় লাগল।

আর এ-সব করতে গিয়ে নুলিয়াটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বাক্স-বেডিং সব রিক্শায় তুলে সবে রিক্শাওয়ালা প্যাডেলে পা দিয়েছে অমনি দেখি কী

নুলিয়াটা আসছে সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ।

রিক্‌শা চলতে শুরু করেছে তখন। আমাদের দেখতে পেয়ে এক-মুখ খুশির হাসি হাসল নুলিয়াটা, সেলাম করলে। সেলাম করল বোধ হয় বকশিশের লোভেই।

ছি ছি, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম ওর কথা। এত খারাপ লাগল আমার। রিক্‌শাওয়ালাকে থামতে বললাম।

গৌতমকে বললাম, এই দেখো তো তোমার ব্যাগটা, ওর বকশিশটা দেওয়া হয়নি। গৌতম বললে, টাকা তো তোমার বটুয়াতে।

তাই তো। খেয়ালই ছিল না। আমার হাতেই তো বটুয়াটা। লাল ভেলভেটের ওপর সুন্দর নকশা-করা বটুয়াটা এখানেই কিনেছি—মন্দিরে যেদিন গিয়েছিলাম সেই পাণ্ডাব ছড়িদারটাব সঙ্গে, সেদিন।

বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ টাকার নোটই চার-পাঁচখানা, খুচরো মাত্র দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা।

কী করি, স্টেশনে পৌঁছেই তো রিক্‌শার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পয়সা দিতে হবে। সব খুচরোগুলো তো দিয়ে দেওয়া যায় না।

তাই একটা এক টাকার নোটই বের সরে নুলিয়াটার হাতে তুলে দিলাম। ও খুশি হয়ে সেলাম করলে। হাসল। বললে, ফির আসবেন বাবু, সেলাম দিদি, সেলাম।

সেলাম জানিয়ে চলে গেল লোকটা। আর আমার এত ভাল লাগল তাকে । এত ভাল।

ফিরে এসেই বড়-জাকে বললাম, জানেন দিদি, নুলিয়াগুলো এত ভাল মানুষ, এমন চমৎকার।

বড়-জা হাসল। বললে, দেখিস নতুন, এত ভাল ভাল বলিস না, ঠাকুরপোর আবার হিংসে হবে।

আমি হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, ওমা—আসল কাণ্ডটার কথাই তো বলিনি, রীতিমত একটা কাণ্ড।

—কী কাণ্ড ? চোখ কপালে তুলল বড়-জা।

আমি বলাম, আপনার ঠাকুরপো আর একটু হলেই তো ডুবে যেত। একটা নুলিয়া দেখতে পেয়েই সাঁতরে গিয়ে বাঁচাল। লোকটা নিজেই দেখতে পেয়েছিল। ওরা তো সমুদ্রে চান করাতে দু'আনা করে নেয়, আমি আসবার সময় একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে হঠাৎ কেন জানি না একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, সেদিনের সেই আতঙ্কের দৃশ্যটুকু চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। বড়-জা কী যেন বললে, আর আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। ভাবলাম, সত্যিই কি বালা দেব বলেছিলাম নুলিয়াটাকে ? বোধহয় না। সে-সময় আমার কী মাথার ঠিক ছিল ? কী বলেছি, কী করেছি তা কী আর আমিই জানি ! না, বালা-টালার কথা নিশ্চয়ই বলিনি। তা ছাড়া আমার বলা-কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা করেছিল নাকি নুলিয়াটা ? কখনও না। আমি বলার আগেই হয়তো নুলিয়াটা দেখতে পেয়েছিল। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ ।

শারদীয় জলসা ১৩৬৬

অন্ধকূপ

গৌরকিশোর ঘোষ

এত রোদ পৃথিবীতে আছে, সত্যি, এ কথা যেন জানত না গৌরী। যেন আজ হঠাৎ জানল। জানলার ধার ঘেঁষে বসে সেই যে চোখ দুটোকে বাইরে মেলে ধরেছে গৌরী, আর তাদের গুটিয়ে আনেনি। আনতে ইচ্ছেও করেনি তার।

এর মধ্যে কত মাইল যে দৌড়ে পার হল মেল ট্রেনখানা, কত স্টেশন ছিটকে ছটকে পেরিয়ে গেল, কত গাছপালা, পাহাড় বন গ্রামবসতি নদী যে বেরিয়ে গেল আশপাশ দিয়ে, তার হিসেব আর রাখতে পারেনি সে। সে শুধু লক্ষ রেখেছিল রোদের দিকে। ভাবছিল, কখন এই ট্রেনখানা রোদের সীমানা পেরিয়ে ঝাঁপ দেবে অন্ধকারের কোলে।

এ কথাটা ভাবতে আদৌ ভাল লাগছিল না গৌরীর। তবুও ঘুরেফিরে সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল আর কেমন ভয় ভয় করছিল তার।

ভয়, আবার অন্ধকারে ফেরার ভয়।

গৌরী জানে, এই রোদ, এই আলো, এর আয়ু বেশি নয়। এই বেলাটুকু শুধু। বেলা ফুরলেই সন্ধে। বাস, তারপর আর রাতকে ঠেকায় কে ? অন্ধকারকে রোখে কে ?

রাত ফুরলে আবার যে দিনটা আসবে, তার রোদ এমন ঝিলিক ছড়াবার আগেই হয়তো ট্রেনখানা হাওড়ার গিয়ে ভিড়বে। আর তারপর গৌরীদের কতক্ষণই বা লাগবে জেলেপাড়ার সেই রোদকানা বাই লেনে গিয়ে ঢুকবে ! বড় জোর পনেরো মিনিট।

কাজেই, মনে মনে হিসেবটা কষে নিয়ে গৌরী স্থির করল, যতটা সময় পারা যায় এই জানলার ধারেই বসে থাকি। অন্ধগুহায় ঢোকার আগে আশ মিটিয়ে নিই রোদ দেখে দেখে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গৌরী। কলকাতার মানুষ যে কী সুখে থাকে !

অথচ সেই কলকাতাতেই সাতাশ বছর কাটাল গৌরী। বাই লেনে বাই লেনে ঘুরেই বড় হল। না ছিল বাবার সঙ্গতি, না আছে স্বামীর। তাই বাই লেন ছেড়ে সদরে বাসা বাঁধার আশা করেনি গৌরী। কখনও করত কিনা সন্দেহ, যদি না বড় জামাইবাবু দিল্লি যাবার নেমন্তন্ন করত তাঁর বড় মেয়ের বিয়েতে।

শুধু পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ নয়, দিল্লি যাবার প্রথম শ্রেণীর রেলভাড়া, তার উপর পথে খাওয়াদাওয়া, পথখরচের জন্য আরও এক শো টাকা পাঠিয়ে বড় জামাইবাবু বিশেষ করে লিখেছেন যেতে। কোনক্রমেই যেন অন্যথা না হয়।

দিদি দশ বছর যাবৎ শয্যাশায়ী। পক্ষাঘাত। মেয়ের বিয়ের উপলক্ষে সবাইকে একবার দেখতে চান। তাই এই ব্যবস্থা।

গৌরী জীবনে কলকাতার বাইরে যায়নি। যতীনও প্রায় তাই। বিয়ের পরে একবার বুঝি দিল্লি গিয়েছিল কী এক ইণ্টারভিউ দিতে। বাস্।

কাজেই বাইরেটা যে কী বস্তু, সে সম্পর্কে গৌরীর কোনও ধারণাই ছিল না। আর যতীনের ছিল ভীতি। ওরা জন্ম থেকে কুনো ব্যাঙ। অন্ধকূপের বাসিন্দা।

ছেলেমেয়ে দুটিরও ভবিতব্য তাই। বাই লেনের একতলার অন্ধ কুঠুরিতেই নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটাবে ওরা। যেমন গৌরী কাটিয়ে এসেছে এতকাল। আবছায়া অন্ধকার আর ধোঁয়ার নিত্য সঙ্গী হয়ে কোনদিন ওরা এমন ডাকাতে রোদের সাহচর্য পাবে না, যেমন পায়নি গৌরী। কোনদিন ওরা বিনা বাধায় এমন আস্ত আকাশ দেখতে পাবে না, যেমন গৌরী কখনও পায়নি।

ছাতে না গেলে কলকাতার আকাশ বড়-একটা দেখা যায় না। আর ছাতটা তেতলার ভাড়াটেদের এক্তিয়ারে। একবার চন্দ্রগ্রহণ দেখবার শখ চাপায় দোতলার গিন্নির সঙ্গে ছাতে উঠেছিল। কিন্তু তেতলার গিন্নির চোপার ঠ্যালায় নেমে এসেছিল তক্ষুনি, আর কখনও ছাতে ওঠার ইচ্ছে গৌরীর হয়নি। ছাতে যাব, তার জন্যে আবার অনুমতি নিতে হবে ! মন কত ছোট হয়ে যায় মানুষের ! ছি-ছি !

আবার ছি-ছি কেন গৌরী, ফিরছ তো সেখানেই। থাকবেও সেখানে। আচ্ছা, তুমি যদি তেতলার ভাড়াটে হতে, তুমি কি দিতে একতলার গিন্নিকে হুট করে ছাতে উঠতে ? দিতে তুমি ? গৌরী যেন নিজেকে দু ভাগ করে স্যাকরার নিক্তিতে তুলেছে। বাঁ দিকের পাল্লাটা ঝুলে পড়ল একটু এই প্রশ্নে। আমি ? গৌরী ডান দিকের পাল্লায় তোড়জোড় করে ওজন চাপাতে গেল। না, আমিও হয়তো খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে উঠতাম ওই তেতলার গিন্নির মতোই। গৌরী যেন আর্তনাদ করে উঠল। সবাই আমরা অন্ধাকারের বাসিন্দা। রোদ পাইনে মোটে। মনে আলো ঢুকবে কোথা দিয়ে !

মা, ওমা, ওই দেখো—উট উট।

কল্যাণ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জানলার উপর। গৌরীর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। টপ করে ধরে ফেলল ছেলেকে। যদি বাইরে পড়ে যেত এক্ষুনি ! তখনও গৌরী থর থর করে কাঁপতে লেগেছে ভয়ে।

সামলে নিয়ে ধমক দিল গৌরী : দস্যি ছেলে, এখুনি যে পড়ে মরতিস ! মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

কেয়া ওদিক থেকে ফোড়ন কাটল, দাদা দুত্তু, না মা ?

গৌরী কেয়াকে দেখতে পেল না। বলল, দাদা তো দুষ্টু বুঝলাম। কিন্তু তুমি কোথায়, কী করছ ? দেখি, এস তো এদিকে।

খুকু আসতেই তাকে দেখে গৌরীর তো চোখ কপালে উঠল।

করেছিস কী রাক্ষুসী ? অ্যাঁ, জামা ভিজোলি কী করে ? ওগো, দেখছ দেখ তোমার মেয়ের কাণ্ড!

যতীন একটা বেঞ্চিতে বসে আরাম করে বই পড়ছিল। মুখ থেকে বই না সরিয়েই হাঁক দিল, রাক্ষুসী !

খুকু বলল, লাখকুশি না, আমি ঝি। আমি ঘর ধুই।

যতীন আর গৌরী জবাব শুনে হেসে ফেলল।

যতীন বলল, তুমি ঝি ? বাঃ, বেশ। আবার হাসল।

গৌরী চটে গেল। ওর মনে হল, এরা সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে ওকে রোদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। ইচ্ছে হল খুকুকে দুটো থাপ্পড় দিয়ে দেয়। ডাকল, এদিকে আয়।

খুকু বলল, না, ঝি, ঘর ধুই।

আর ঘর ধুতে হবে না। আয় এদিকে।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মা, উটেরা কী খায় ?

জানি নে। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো।

ট্রেনের গতি কমে আসছে।

যতীন জিজ্ঞাসা করল, কী গো, কিছু খাবে নাকি ? চা-টা দিতে বলি, কী বলো ? ট্রেনে ক্ষিধেটা দেখছি বেশ পায়।

গৌরী বলল, তাই নাকি ! তা হলে এসো, একটা মাস টিকিট কিনে ট্রেনেই থেকে যাই। বাড়িতে তো কিছু খাওয়াতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

যতীন হাসে। স্টেশনের হৈ-হট্টগোলে গৌরী তখন মেতে গেছে। কতরকম লোক এই কদিনে সে দেখে ফেলল। কত বিচিত্র পোশাক, কত বিচিত্র ধরনের কথাবার্তা ! গৌরী মাঝে মাঝে যেন খেই

হারিয়ে ফেলে।

দিল্লি ওরা গিয়েছিল গাড়ি রিজার্ভ করে। একখানা গোটা কামরা, হোক না ছোট্ট, ওরা পেয়েছিল। বাইরে কার্ড ঝোলানো ছিল ; প্রোফেসার জে চৌধুরী অ্যাণ্ড ফ্যামিলি। সারাপথ কেউ ওদের গাড়িতে ওঠেনি। সে ভালই লেগেছিল গৌরীর। ওদিকের কামরাগুলোয় যা ভিড়, অমনভাবে এলে সে বোধ হয় মরেই যেত। তখন ট্রেনে চড়তেই ভয় পেয়েছিল। কী জানি, ট্রেন উল্টে-টুল্টে যায় নাকি ! ছেলেমেয়ে দুটো যা দস্যি, পড়ে-ফড়ে না যায় ! এমন কত ভয় যে ওর ঘাড়ে চেপেছিল, তার হিসেব নেই। প্রথম রাতটা তো ঠায় জেগে কাটিয়েছিল।

তারপর আস্তে আস্তে ভয় কেটেছে। মজা লেগেছে। ট্রেনজার্নির মজা। স্টেশন আর লোক দেখতে দেখতেই তারা পৌছে গেছে দিল্লি।

কত কী যে দেখবার বাকি ছিল, এখন টের পাচ্ছে গৌরী। এখন, এই ফিরতি পথে, আর যখন সময় নেই হাতে।

এ যেন এক নতুন জন্ম গৌরীর।

চুপচাপ বসে চলন্ত যান থেকে জগৎ দেখায় যে এত সুখ, স্বপ্নেও সে কখনও ভাবেনি।

দিল্লি পৌছে, বিয়ে-বাড়ির হৈচৈ নিয়ে কদিন মেতেছিল গৌরী। বড়লোকের বাড়ি দূর থেকেই তার দেখা। থাকেনি কখনও। দিদির বাড়ির ঐশ্বর্যে তাই সে হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমটায়। প্রথম দু-চারদিন তার আড়ষ্ট মন লাগাম টেনে টেনে চলেছিল। কিন্তু দিদি-জামাইবাবুর ব্যবহারে সহজ হতেও সময় লাগেনি তার। আর যে মুহূর্ত থেকে সে মনের রাশে ঢিল দিল, সেই তখন থেকেই গৌরী এক নতুন সুখের পাথারে ডুবে গেল। ডুবে রইল কদিন।

দিদি তার চেয়ে অনেক বড়। সে যখন নিতান্ত ছোট, তখন দিদির বিয়ে হয়েছে। জামাইবাবুর অবস্থা কেমন তা বোঝার বয়েস গৌরীর ছিল না। গৌরীর সে বয়েস যখন হল তখন দিদি জামাইবাবু কলকাতায় আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। মাঝে মাঝে খবর পেয়েছে দিল্লি-সিমলা ছুটছেন তাঁরা। সেটা যুদ্ধের শেষ সময়। জামাইবাবু সস্তাদরে ডিসপোজালের মাল ধরে রাখছেন। সে সময় একবার কলকাতাতেও এসেছিলেন। বড় হোটেলে উঠেছিলেন দিদিকে নিয়ে। একদিন সময় করে খেতে এসেছিলেন তাঁরা, গৌরীর সে কথা মনে আছে। ওদের গলিতে ট্যাক্সি ঢোকেনি বলে জামাইয়ের কাছে মার কী আফসোস ! গৌরীকে দেখে জামাইবাবু কিন্তু খুব খুশি হয়েছিলেন। একদিন সিনেমা দেখিয়েছিলেন। শাড়ি-ব্লাউজ আর গয়নাও কিনে দিয়েছিলেন জামাইবাবু।

গৌরীর বিয়ের সময় জামাইবাবু বিলাত গিয়েছিলেন দিদির চিকিৎসা করাতে। আগের বছরই দিদির পক্ষাঘাত হয়। বাঁ অঙ্গ একেবারে অবশ।

বাবা আর মা দু বছরের ব্যবধানে যখন মরলেন, তখন তো দিদি শয্যাশায়ী। জামাইবাবু ব্যবসায় ব্যস্ত। আসতে পারেননি ওঁরা, তবে শ্রাদ্ধের খরচ ঠিকমতোই পাঠিয়েছিলেন।

কল্যাণ কেয়া জন্মাবার পর, প্রত্যেকবার দিদি ওদের জামা, পুজোয় টাকা পাঠিয়েছে। অনেকবার যেতেও লিখেছিল। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

এইবার গৌরী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তার দিদির সংসার। কী বিরাট ব্যাপার ! সিনেমাতে বড়লোকের বাড়ি যেমন দেখায়, তার চেয়েও সুন্দর। তার চেয়ে অনেক ভাল।

না, বাঁচার হলে এমনিভাবে বাঁচো। সে সব কথা কতবার যে গৌরীর মনে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গরমে ঠাণ্ডায় ওম করা জলের মসৃণ টবে গলা ডুবিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে সুগন্ধি সাবানে গা ঘষতে ঘষতে ও-কথা বহুবার মনে হয়েছে। বাথরুমের বড় আয়নার মুখ দেখতে দেখতে গৌরীর বার বার মনে হয়েছে, হ্যাঁ, এই তো বাঁচা।

এ কদিনেই গৌরী অনেক উদ্ভট শখ মিটিয়ে নিয়েছে। এ-রকম সুন্দর আর নির্জন বাথরুম পেলে

মেয়েদের যে-সব শখ মাথায় চাপে, তা মিটিয়ে নিয়েছে গৌরী। আদুড় গায়ে বাথটবে গলা ডুবিয়ে সাবান মেখেছে ঠাণ্ডা-গরম জলে। জলসিক্ত চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একদিন টুপ করে দেখেও নিয়েছে আয়নায়। আর বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছে। এই কি গৌরী নাকি ! এত সুন্দর সে !

গৌরীর চেহারা সত্যিই খুব সুন্দর। জামাইবাবু বলেন, দিদিরও নাকি ওই রকম চেহারা ছিল। দিদি সাজতে ভালবাসত। সে শখ গৌরীকে পেয়ে মেটাল। নিজের সে-আমলের শাড়ি-গয়না দিয়ে রোজ সাজাত। লজ্জা পেত গৌরী। যতীন ঠাট্টা করত, আরে বাপ, এ যে দেখছি রাজরানী ! কিন্তু যতীনের চোখ দেখে গৌরী বুঝত, তার ভাল লেগেছে। নিজেও খুশি হত।

কল্যাণ কেয়াও যখন হাঁ করে চেয়ে থাকত তার দিকে, তখন গৌরী ছুট দিত দিদির ঘরে।

কল্যাণ বলত, তোমার বিয়ে হবে, না মা ?

হো-হো করে হেসে উঠত সবাই । জামাইবাবু বলতেন, যতীন ভায়া, সামলে। আমার গিন্নির পোশাকে ওকে দেখলে নকলে আসল বলে ভ্রম হচ্ছে। কিছু ঘটে যেতে পারে।

গৌরী চটে গিয়ে সব খুলে ফেলত। কিন্তু সাধ্যসাধনা করে আবার সবাই তাকে সাজাত।

মঞ্জুই একমাত্র মেয়ে দিদি-জামাইবাবুর। কিন্তু দেখতে তত ভাল নয়। তাই সে মোটেই সাজগোজ করতে চায় না।

সবাই এখন গৌরীর উপর দিয়ে নিজের শখ মিটিয়ে নিচ্ছে।

সত্যি বলতে কী, প্রথম প্রথম গৌরী খুব বিব্রত বোধ করত। সাজ-পোশাক সে বড়-একটা করত না। সঙ্গতিও ছিল না তার।

তাই দিদির প্রস্তাব শুনে সে লাল হয়ে উঠেছিল লজ্জায়। রাজি হয়নি। কিন্তু অসুস্থ পঙ্গু লোকের ইচ্ছেটা পূরণ করবার জন্য সবাই যখন তাকে ধরে বসল, বিশেষ করে মঞ্জু, তখন সে আর 'না' বলতে পারল না। রাত্রে যতীন যখন তার প্রশংসা করল তখন খুব খুশি হয়েছিল গৌরী। তারপর তার যেন কেমন নেশা ধরে গিয়েছিল। কী এক সুখের আবেশে শরীর ভরে যেতে লাগল তার। কেমন মনে হতে লাগল, এ স্বপ্ন, এ স্বপ্ন।

দিদি সব তাকে দিয়ে দিয়েছে। এক বাক্স গয়না। বহু শাড়ি। দামি দামি। গৌরী কিছুতেই নিতে চায় নি। দিদি কেঁদে-কেটে জোর করে এগুলো নিতে তাকে বাধ্য করেছে।

ফিরতি পথে এই এক অস্বস্তি গৌরীর। ট্রেনে উঠে অবধি গয়নার ভাবনায় সে শঙ্কিত হয়ে রয়েছে। চুরি যায় কি ডাকাতি হয়, কে জানে ? তার উপর এক দুশ্চিন্তা, এবারে আর রিজার্ভেশন পাওয়া গেল না। ফার্স্ট ক্লাসেরই টিকিট। ওদের কামরাটাও দুটো স্টপ পরে ফাঁকা হয়ে গেল। তবু ভয় গেল না গৌরীর। এত টাকার জিনিস নিয়ে ভালয় ভালয় পৌঁছলে বাঁচি।

রাত কেটেছে অস্বস্তিতে । যতীন নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দিয়েছে। ছেলেমেয়েরাও ঘুমতে কিছু কসুর করেনি। শুধু ঘুম আসেনি গৌরীর চোখে। নানা দুশ্চিন্তা, নানা অস্বস্তি লক্ষ সূচের হুল ফুটিয়েছে সারা রাত। এমনিভাবে রাত কেটেছে তার। তারপর যেই আলো ফুটতে লাগল বাইরে, শূন্য বেয়ে আলোর কণা পাখা মেলে মাটিতে নামতে লাগল, গৌরীর মনের ভয়ও ঝরে পড়ল শীতের পাতার মতো।

আলো—আলো—আলো। দিনের আলো। আঃ ! গৌরী যেন সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারছে এখন।

জীবনে এই প্রথম গৌরী ভয়হর দিনকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখল।

ট্রেনখানা তখন এক বিরাট প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে। দিনের আবির্ভাবে রাত্রির ষড়যন্ত্র বানচাল হতে আরম্ভ করেছে। মাঠের উপরকার থোকা থোকা কুয়াশার মধ্যে মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছে। আর—

ওই যে, আরে বাঃ ! গৌরীর চোখে পলক পড়ল না কয়েক মুহূর্ত।

ওই যে, একটা ন্যাড়া পাহাড়ের কাঁধের উপর হঠাৎ কোত্থেকে আবির্ভাব হল শিশু সূর্যের !

গৌরীর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সূর্যস্তোত্রটা। ওর ছোটবেলায় বহুবার শুনেছে বাবার মুখে। সেই মুহূর্তেই গৌরীকে কে যেন হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়ে দিল কুড়ি-একুশ বছর আগেকার জীবনে। ভিজে-ভিজে শীতের ভোরে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সে। বাবা সেই ভোরেই স্নান সেরে কাঁপা কাঁপা হেঁড়ে গলায় আবৃত্তি করে চলেছেন—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ . . ." জবাকুসুমই বটে। গৌরী পলকহীন চোখে দেখল, জবাকুসুম। হ্যাঁ, জবাকুসুম।

কলকাতার জেলেপাড়া বাই লেনের একতলার সেই শীত-সকালের কুঠুরিতে তার বাবা সারাজীবন 'জবাকুসুম' মন্ত্র উচ্চারণ করে গেছেন। কিন্তু তাঁর চোখেও সূর্যের এ চেহারা কখনই ধরা পড়েনি।

গৌরীর কী সুকৃতির ফল ছিল, কে জানে ? নিজ চোখে আজ সেই রূপ দেখল সূর্যের।

দেখল, রোদ কত বড় হয়।

ওদিকের যে-দিগন্তের কোল ঘেঁষে রোদ নেমেছে, সেখান পর্যন্ত ভাল নজর যায় না গৌরীর। আবার তেমনি এক দিগন্তে গিয়ে চোখ ঠেকে তার—ওই আর-এক দিকে, সেখানেও লুটোপুটি খাচ্ছে অজস্র রোদ। গৌরীর নজরে জগৎটাকে যত বড় লাগে, রোদও ঠিক ততটাই বড়।

একটু একটু করে বেলা বাড়ে, আর গৌরীর মনে নানা রঙ ধরে। অপূর্ব পুলকে তার শরীর ভরে ওঠে। এ সুখ পরিচিত নয় তার।

তার দৈনন্দিন জীবনে ছায়া যেন বেশি। অন্তত তাই তার মনে হচ্ছে এখন। কলকাতার ঘরে দুপুর গড়িয়ে যাবার মুখে উত্তর দিকের গলিটা থেকে তার ঘরে একটুক্ষণের জন্য পাণ্ডুর রোদ উঁকি মেরে যায়। সে রোদ পুরো একটা ঘরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে না। দক্ষিণের দেওয়ালে যতীনের বইয়ের তাকটা যেখানে, সেখানে একটা ছোট্ট টিক মেরেই সাত তাড়াতাড়ি পালায়। গৌরীর আজ মনে হল, তার রোজকার জীবনেও আলো আসে কম। তাই রোদের এই বেহিসেবি প্রাচুর্য দেখতে দেখতে তার প্রাণে নেমে এল অজানা আনন্দের ঢল।

গত রাত্রের জেগে থাকার অস্বস্তি, গহনার জন্য উদ্বেগ, এমন কী দিদির বাড়ির অনাস্বাদিতপূর্ব সুখও ভেসে গেল। এখনকার এই নতুন আনন্দের জোয়ারে।

মাঝে মাঝে স্টেশনে স্টেশনে থামতে লাগল গাড়ি। বেলা বাড়তে লাগল। মুখ-হাত ধুয়ে গৌরী প্রাতঃকৃত্য সারল, ছেলেমেয়ে, যতীনকে খাওয়াল বারকয়েক, নিজেও খেল। তারপর জানলায় এসে বসল। কিন্তু সবই সে করল যেন নেশার মধ্যে।

যতীন বলল, কী গো, চানটান করবে নাকি ? সামনের স্টেশনে কিন্তু খেতে দেবে। বলা আছে।

চান করতে কল্যাণ কেয়ার দুজনেরই সমান আপত্তি। ওদের চান করাতে গৌরীর প্রায় অর্ধেক আয়ুই ক্ষয় হয়ে যায়। তবু সে ছাড়ে না কোনদিন।

স্নানের নাম শুনেই মুখ শুকিয়ে এল ওদের : না মা, চান করব না। কল্যাণের সঙ্গে কেয়াও গোঁ ধরল। আজ আর গৌরী জোর করল না।

একটু হেসে বলল, থাক্ তবে, আজ আর চান করতে হবে না। চল্, তোদের হাত-মুখ ধুইয়ে দিই ভাল করে।

যতীনকে বলল, ওগো, এদের নিয়ে বেরুলে তুমি ঢুকো।

তারপর, তিনজনে গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। এ বাথরুমটা বেশ বড়-সড়। পরিষ্কারও । আয়নাটা বেশ চকচকে। গাড়িটা বোধ হয় নতুন। গামছায় সাবান মাখিয়ে গৌরী ওদের মুখ-হাত আর গা রগড়ে দিল। তাতেই যা কাঁইবাই শুরু হল, গৌরী অস্থির।

ভয়ানক দুরন্ত হয়েছে দুটো। ফিরে গিয়ে কল্যাণকে স্কুলে পাঠাতে হবে। না হলে গৌরী আর সামলাতে পারে না।

ট্রেনের গতি কমে আসছে। খটাখট শব্দ হচ্ছে চাকায়। এদিকে ওদিকে টাল খাচ্ছে গাড়ি। তার মানেই একটা বড় স্টেশন আসছে। ছেলেমেয়েকে কাচা জামাকাপড় পরাতে-না-পরাতেই প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেল গাড়ি। ওরা বেরিয়েই এসে গদিতে বসেছে কী, উর্দিপরা বেয়ারা এসে প্লেট-ঢাকা খাবার দিয়ে গেল। সঙ্গে গ্লাস প্লেট কাঁটা চামচ। যাবার পথেও ওদের এমনি করে খাবার দিয়ে গিয়েছিল। সেদিন গাড়ির খাবার দেখে খুঁতখুঁত করেছিল গৌরী। কাঁটা-চামচ দেখে ঘেন্না লেগেছিল তার। খাবার সময় একটু বমি-বমি ভাবও না লেগেছিল এমন নয়। এবারে কিন্তু তেমন কিছু মনে হল না। বরং চকচকে ঝকঝকে বাসনপত্র দেখে খুশিই হল গৌরী। মনে মনে ওদের পরিচ্ছন্নতার তারিফও করল।

তারপর হঠাৎ সেই উদ্ভট ইচ্ছেটা মাথা-নাড়া দিয়ে উঠল , দেখব নাকি আজ কাঁটা-চামচে খেয়ে! কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল গৌরী। চনমন করে চাইল চারদিকে। না, যতীন নেই। বাথরুমে ঢুকেছে। কেউ টের পায়নি তার মনের ইচ্ছেটা। পাগল নাকি গৌরী ?

কেয়াকে ধাক্কা মেরেছে কল্যাণ। কল্যাণের হাত কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে কেয়া। দুজনের চেঁচানিতে কানে তালা লাগবার উপক্রম।

গৌরী মুহূর্তের মধ্যে জেলেপাড়া বাই লেনের গৌরী হয়ে গেল।

হাড় জ্বালিয়ে খেল শত্তুর।

গুম গুম কিল পড়ল ওদের পিঠে। অভ্যস্ত নিয়মে। দুজনে একটু কাঁদল। গৌরী ওদের চোখ-মুখ মুছিয়ে আদর করল একটু। তারপর দুজনকে সাবধানে খাইয়ে দিতে লাগল।

যতীন স্নান সেরে বেরিয়ে দেখে, কল্যাণ কেয়ার খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে। ওরা বেঞ্চে বসে পাখি দেখছে টেলিগ্রাফের তারে।

যতীন আর গৌরী একসঙ্গে খেতে বসল।

যতীন বলল, ভায়রার পয়সায় দিব্যি নবাবি করা গেল।

গৌরী বলল, যা বলেছ। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এমন আরামে ফার্স্ট ক্লাসে রেল চড়ব কোনদিন। কিন্তু কী মন দেখো, টাকা পাঠালেন জামাইবাবু, টিকিট কাটলে তুমি। আর আমি এদিকে মরি বেহিসেবি টাকা খরচের শোকে। কতবার যে ভেবেছি, থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনতে বলি তোমায়। কম টাকা বাঁচত !

যতীন বলল, ছি, তাই কি হয় নাকি ? টাকা দিলেন তাঁরা আরামে যেতে, আর আমরা ভিড়ের গুঁতোয় চেপ্টা হয়ে যাব, ওরা কী ভাবতেন ?

তাই তো বলছি গো—গৌরী প্লেট সাজাতে সাজাতে বলল, সে তো তুমি ঠিকই করছ, ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটেছ। আমি বলছি, আমার মনের কথা। যদি বা চড়লাম একলাফে ফার্স্ট ক্লাসে। তাও পরের পয়সায়। কোথায় খুশিতে ফেটে পড়ব, তা নয় , অপব্যয় হচ্ছে ভেবে মনটা খচখচ করেই মলো।

গৌরীর কথা শুনে যতীন ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটু বোধ হয় অবাকই হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই হেসে ফেলল।

জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে তোমার বলো তো ? বড্ড যে ভাবুক ভাবুক লাগছে !

কিছু হয়নি যাও। গৌরী চটে গেল যেন : তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।

খাবার সাজিয়ে দিয়ে গৌরী কাঁটা চামচ নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলল, হ্যাঁ গো, কাঁটা চামচ দিয়ে খাবে ?

যতীন এবার বেশ জোরেই হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, ওরে বাপরে, তোমার জামাইবাবু তো দো-দিনকা সুলতান বানিয়ে দিয়েছেন। তোমার শখ তাতেও মিটল না। এবার সাহেব

বনতে হবে !

ওর কথার ধরনে গৌরীও হেসে ফেলল। যতীন বলল, তাহলে তুমিও কাঁটা চামচ ধরো। এক সঙ্গেই সাহেব মেম বনে যাই।

চমকে উঠল গৌরী। যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

ধ্যাৎ ! আমি তাই বলেছি নাকি ! সব তাতেই তোমার ঠাট্টা !

কাঁটা চামচ ঠক ঠক করে প্লেটের উপর গৌরী রেখে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বুকের ধুকপুকানি গেল না। কী পাগলামিই না মাঝে মাঝে চাপছে তার মাথায় ! কী ছেলেমানুষি !

কেয়া শুয়ে ছিল। চট কবে উঠে বসল। বলল, বাবা, তুমি মেম ছাহেব ?

যতীন হেসে বলল, না মা, আমাব কি মেমসাহেব হবার ভাগ্যি ! মেম সাহেব হচ্ছেন তোমাব মা।

কল্যাণও তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়ল : আর আমি ?

যতীন বলল, তুমি হলে মেম সাহেবের ছা।

গৌরীও হেসে ফেলল ছেলেমানুষের মতো : এই, কী হচ্ছে ?

কেয়া থপ-থপ করে এগিয়ে এল যতীনের কাছে। কোল ঘেঁষে।

আল আমি ? বাবা, আমি ?

তুমিও মা, মেম সাহবের শাশুড়ি।

কথাটা কেয়ার পছন্দ নয়। না, আমি মেম না। আমি ঝি।

যতীন বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি ঝি।

যতীন বলল, যাই বলো বেশ কাটল কিন্তু কদিন। তোমার জামাইবাবু লোকটি সত্যিই ভাল কিন্তু। ওখানে যাবার আগে, বড়লোক ভেবে আমার মনে কিন্তু দ্বিধা ছিল। বেশ লেগেছে আমার।

জামাইবাবুর প্রশংসা শুনে গৌরী খুশিই হল। যতীন এমনিতে চাপা। কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞানটা টনটনে।

যতীনের প্লেটে আরও কিছু মাংস চাপিয়ে গৌরী বলল, তা সত্যি। মেলামেশা তো নেই-ই বলতে গেলে। সেই কবে দেখেছি ! ভয় তাই আমারও ছিল।

একটু থেমে আবার বলল, তোমারও খুব প্রশংসা করছিলেন জামাইবাবু।

যতীন বলল, সেটা বোধ হয় ফিস্ হিসেবে।

গৌরী বুঝতে পারল না। যতীনের মুখের দিকে চেয়ে রইল তাই।

যতীন বলল, ব্যবসাদার লোক তো। শ্যালিকাটিকে যে-আন্দাজ প্রশংসা করে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হয়তো মনে পড়ল, শ্যালিকার স্বামীটি হয়তো ঈর্ষান্বিত হতে পারে, তাই ফিস্ দিয়ে তার মুখটি বন্ধ করে দিলেন।

গৌরীর মুখ ঝপ করে লাল হয়ে উঠল : ও মা, তুমি তাই ভেবেছ, আচ্ছা তুমি ..... আমি বলি ..... সব কথা তালগোল পাকিয়ে গেল গৌরীর। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে বিষম খেল। সামলে নিয়ে বলল, অসভ্য কোথাকার ! মুখে কিছু আটকায় না !

বলতে বলতে হেসে ফেলল। যতীনের মুখে হঠাৎ সাধু ভাষায় 'ঈর্ষান্বিত' কথাটা শুনে তখন চটেছিল, এখন আবার সেই কথাটাই তার মুখে হাসি ধরিয়ে দিল।

বলল, ঈর্ষান্বিত হবার আর লোক জুটল না ! আবার বলে ঈর্ষান্বিত ! হি-হি-হি।

পরের স্টপেই বাসনপত্র গুছিয়ে নামিয়ে নিলে বয়গুলো। বিলের পয়সা নিল। যতীন ওদের বকশিশও দিল। ওরা সেলাম জানিয়ে চলে যাবার আগে কোন স্টেশনে রাত্রের খাবার দেবে তাও বলে গেল।

গৌরী বেশ লক্ষ কবে দেখল ওদেব। কালো চেহারায় ধপধপে সাদা উর্দি পরেছে। মাথায় সাদা

পাগড়ি। কোমরে সবুজ রঙের বেল্ট। বেল্টের উপর আর পাগড়িতে ঝকঝকে তকমা।

গৌরীর এখন শুধু মনে হচ্ছে, সে যেন এমনি করেই এতটা জীবন কাটিয়ে এসেছে। এমনি নিশ্চিন্ত আরামে। এমনি দিন-জাগানো প্রকাণ্ড রোদের নির্ভয় আশ্রয়ে।

এমনও তার মনে হতে লাগল, আবার যখন সে এসে বসল জানলার ধারে মাঠের দিকে চেয়ে, সে কখনও থাকেইনি জেলেপাড়ার কানাগলির এক অন্ধকূপে। সকাল-সন্ধেয় কয়লার ধোঁয়ায় কখনও আচ্ছন্ন হয়নি তার চোখ। কয়লা ভেঙে আর বাসন মেজে (মাঝে মাঝে ঠিকা ঝিটা কামাই করলে) তার হাতে ফোস্কা পড়েনি কখনও। মাসের শেষে সংসার চলবে কী করে তা ভেবে রাত্রের ঘুম পাতলা হয়ে যায়নি। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মন-কষাকষি হয়নি প্রতিবেশীর সঙ্গে।

সে যেন এইভাবে চলে এসেছে চিরকাল। বয় এসে খাবার দিয়ে গেছে সময়মতো। প্রথম শ্রেণীর ট্রেনের কামরায় গদি-মোড়া বেঞ্চে বসে চলমান পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করে বেড়িয়েছে শুধু। কোনও ছোট আড়াল তার চোখকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কোনও তুচ্ছ পাঁচিল তাব মনকে আটকে রাখতে পারেনি।

গৌবীর হঠাৎ মনে পড়ল, তাই তো কারও সম্পর্কে সে তো মন্দ কিছু ভাবেনি, কারও অমঙ্গল চিন্তা করেনি এ কয়দিন। যেই সে কথা মনে পড়ল, আর গৌরীর গোটা অস্তিত্বকে কে যেন তুলে নিয়ে চলল উপরে—উপরে আরও উপরে। সুখানুভূতিময় অপূর্ব আনন্দের এক স্বর্গে। গৌরীব কেমন যেন কাঁদতে ইচ্ছে করল। হারিয়ে-যাওয়া শিশু মার কোলে ফিরে এলে পাওয়ার আনন্দে যেমন কাঁদে, তেমন কান্না তার পরিশুদ্ধ মনোলোকের গভীর থেকে পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগল।

জানলার ধারিতে মাথা রেখে এক সময় সুখেব ঘুমে তলিয়ে গেল গৌরী।

ঠেলা খেয়ে জেগে দেখে যতীন ডাকছে। স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। বয় এসে চায়ের ট্রে রাখছে। আব কল্যাণ কেয়া একটি বয়ের হাত ধরে ঝুলছে আর বলছে, তুমি কাবলিওয়ালা, তুমি কাবলিওয়ালা।

গৌরী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

বাথরুমে ঢুকে মুখে চোখে জল দিতে দিতে টের পেল সে, ট্রেন চলতে শুরু করল। আর অমনি কামরার ভিতর হুটোপুটি, চিৎকার, যতীনের ধমক, শুনে চমকে বেরিয়ে পড়ল।

দেখে, কমবয়সী একটা দেহাতি ছেলে আর মেয়ে উঠে পড়েছে তাদের কামরায়। ছেলেটা দরজা ধবে অবোধ্য ভাষায় প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে চেঁচাচ্ছে। মেয়েটা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। তার সারা মুখে লজ্জা লেপা। পোশাক-টোশাক দেখে গৌরীর মনে হল নতুন বর কনে।

ওদের দেখে কল্যাণ কেয়ার ভারী ফুর্তি। যতীন হয়তো কিছুটা বিরক্ত। ছেলেটাকে লক্ষ করে সমানে বলে চলেছে, বন্ধ করো দরজা। এই ছোকরা। বন্ধ করো। পড়ে গেলে মব জায়েগা।

কিন্তু ছেলেটার কোনদিকে লক্ষ নেই। গাড়িটা যতক্ষণ না প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেল, ততক্ষণ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সমানে চেঁচিয়ে গেল। ভাবনায়, বোধ হল, ছেলেটা বিচলিত হয়ে পড়েছে। মেয়েটাকে দেখে গৌরীর মনে হল, ও যেন একটু মজাই পেয়েছে।

গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে গেলে দরজা এঁটে দিয়ে মেয়েটির কাছে সরে এল। তারপর দুজনে ফিসফিস করে কী যেন বলল। একটু পরেই দেখা গেল দুজনে একটু ধাতস্থ হয়েছে। মেঝেয় জড়সড় হয়ে বসেও পড়ল ওরা।

যতীন ডাক দিল তাকে, এসো গো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। গৌরী রুটিতে মাখন মাখিয়ে কল্যাণ কেয়াকে খেতে দিল। দিল যতীনকেও।

কল্যাণ রুটি কামড়াতে কামড়াতে জিজ্ঞাসা করল, বাবা, ওদের বুঝি বিয়ে হয়েছে ?

যতীনের বিরক্তির ভাবটা, গৌরী দেখল, কেটে যাচ্ছে।

বলল, তাই তো মনে হচ্ছে বাবা।

মঞ্জুদির মতো বিয়ে ?

হবে হয়তো।

নেমন্তু' খেয়েছে ওরা ?

তা তো বলতে পারব না। সে বরং তুমি ওদের জিজ্ঞেস করো।

কল্যাণ সটান গিয়ে ওদের কাছে বসে পড়ল। তারপর মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করল, এই মেয়ে, তোমার বিয়ে হয়েছে, মঞ্জুদির মতন ? নেমন্তু' খেয়েছ ?

দেখাদেখি কেয়াও গেল। ছেলেটার পিঠে চড়ে বলল, আমি ঝি।

ছেলেটা আর মেয়েটা ওদের পেয়ে খুশি। চারজনে জমে গেল খুব। কল্যাণ মঞ্জুদির বিয়ের বর্ণনা দিতে লাগল। কেমন বাজনা হল। মঞ্জুদির বরটা খুব পাজি। মঞ্জুদিকে নিয়ে পাতালে চলে গেছে। কল্যাণ একটু বড় হলে তীর ধনুক বানিয়ে পাতালে যাবে। তারপর এক বাণ মেরে মঞ্জুদির বরটাকে মেরে ফেলে মঞ্জুদিকে উদ্ধার করবে। ছেলেটাকেও সঙ্গে নেবে তখন। ওরা অবাক বিস্ময়ে কল্যাণের কথা শোনে, নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করে আর খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে !

যতীন চা খেতে খেতে বলল, ছেলেটা একটু বোকা মনে হয়। মেয়েটা কিন্তু বেশ চতুর।

দেখে গৌরীরও তাই মনে হল। সে হাসল।

পরের স্টপে গাড়ি থামতেই ওরা দুজনে হুড়মুড় করে নেমে গেল।

বেলাও পড়ে আসছে। গৌরীর কেমন খারাপ লাগতে শুরু করল। কলকাতার বাংলা কাগজ পাওয়া গেল দেখে একখানা কিনল যতীন।

গৌরী কাগজখানা হাতে নিয়ে উল্টাতে লাগল।

"উদ্বাস্তুদের আর পশ্চিমবঙ্গে লওয়া হইবে না।" "আমেরিকা আগামী দশ বৎসরে [illegible] চন্দ্রে রকেট পাঠাইবে।" "নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে রাশিয়ার প্রস্তাবে রাষ্ট্রপুঞ্জে অচল অবস্থা [illegible] বিদেশি সাহায্য না পাইলেও পরিকল্পনার কার্য আগাইয়া লইতে পারিবে।" যত বাড়ে খ[illegible] রোজ রোজ এক কথা। গৌরীর কাছে কোনও খবরটা পড়ার যোগ্য বলে মনে হল না।

হঠাৎ একটা খবর পড়ে তার গা ছমছম করে উঠল। "জনৈক দুর্বৃত্ত কর্তৃক চলন্ত ট্রেন হইতে মহিলা যাত্রীর অলঙ্কার অপহরণ। দুর্বৃত্তের সহিত ধস্তাধস্তির সময় ছুরিকাঘাতে মহিলা গুরুতররূপে আহত।"

মনে মনে ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল গৌরী। তার মনে পড়ল, তার সঙ্গে গয়না আছে অনেক টাকার। সে-কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

কাগজটা নিয়ে যতীনের কাছে গেল গৌরী। জিজ্ঞাসা করল শঙ্কিত গলায়, এই খবরটা দেখেছ ?

যতীন পুরো মন দিয়েছে পড়ায়। মুখ না তুলেই বলল, কোন্ খবরটা ?

কাল নাকি সোদপুরের কাছে চলন্ত ট্রেনে এক হেডমিস্ট্রেসকে জখম করে [illegible] না কেড়ে নিয়েছে।

ও, বলে যতীন আবার পড়ায় মন দিল।

যতীন খবরটা গ্রাহ্যই করল না। যদি হেডমিস্ট্রেসকে খুন করে রেখে যেত ?

আবার বলল গৌরী, ভাগ্যিস প্রাণে মারেনি।

যতীন নিরুত্তর।

মারতেও তো পারত ?

এবার অবিশ্যি যতীন জবাব দিল, পারত বৈকি। তবে এবারও সে মুখ তুলল না বই থেকে।

বলো কী ! শিউরে উঠল গৌরী : ট্রেনের মধ্যে মেরে ফেলবে মানুষকে ?

তা কখনও-সখনও ট্রেনের মধ্যেও মারে।

মারে ! সর্বনাশ !

যে সংশয় ভয় খোঁয়াড়ে ভরে রেখেছিল গৌরী সারাদিন, ঘেঁষতে দেযনি মনের ধারে কাছে, এবার তারা পিল পিল করে এগিয়ে আসতে লাগল। বাইরে তখন শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে গেছে। ট্রেনের কামরায় বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছে।

উৎসাহ উদ্দীপনা প্রাণের তেজ যা কিছু তার ছিল সব খুইয়ে বসেছে গৌরী।

রাত বেড়েছে। খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে দিয়েছে আগের স্টপে। দু দিকে জানলার ধারে দুটো বিছানা পেতেছে। এক দিকে যতীন, আর-এক দিকে গৌরী। ওদের মাঝখানে মাথার দিকে যে আড়াআড়ি বেঞ্চি তাতে শুইয়ে দিয়েছে কল্যাণ আর কেয়াকে। পায়ের দিকে বেঞ্চিটা, দুটো দরজার মাঝে, খালি। জানলা সব বন্ধ করেছে গৌরী। কল্যাণ কেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। চাদর দিয়ে তাদের ঢেকে দিয়েছে বেশ করে। যতক্ষণ পেরেছে কাজ করেছে। থামলেই মুশকিল। শিনশিনে একটা ভয় কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে গৌরীকে।

একটু ভরসা, আলোটা এখনও পর্যন্ত জ্বালা আছে। তবে যতীনের ঘুম পেলে সেটাও নিবে যাবে। আলো থাকলে ঘুমোতে পারে না যতীন।

গৌরীও পারে না। কিন্তু নাই বা ঘুমোল ওরা একটা রাত। কথা বলুক না যতীন। দুটো গল্প করুক না ওর সঙ্গে।

কী গল্প করবে ? তাই তো, কী গল্প করবে ! গৌরীর মনে পড়ল বিয়ের পর কী বকবকই না করত দুজনে ! রাতের পর রাত কেমন হুস করে পার হয়ে যেত। কোনও খেই থাকত না, কিছু মানেও খুঁজে পাওয়া যেত না সে সব কথার। শুধু বলার আনন্দে বলত। তারপর ধীরে ধীরে সে স্রোতে ভাঁটা পড়ে এল কেমন করে ! এল কাজের কথা বলার যুগ। হ্যাঁ, যুগই বটে। ইতিহাসেরই শুধু যুগ পরিবর্তন হয় না, মানুষের জীবনেরও হয়। গৌরীর জীবনেও হয়েছে।

এমন এক যুগ গেছে যখন যতীন আর গৌরী শুধু কাজের কথা, দরকারি কথা ছাড়া আর-কিছু বলারই সময় পায়নি। তারপরের যুগে, অর্থাৎ এখন, তো তাও কমেছে। সংসারে কী দরকার না-দরকার তা জানা হয়ে গেছে দুজনেরই। এখন অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে আর প্রায় কথাই হয় না দুজনের।

বহুদিন পরে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল ওরা জামাইবাবুর চিঠি আর টাকা পেয়ে। যাওয়া হবে কি হবে না, জামাইবাবুর টাকায় যাওয়া হবে, না, তা ফেরত দেওয়া হবে, কদিনের ছুটি নেওয়া উচিত যতীনের, কোন্ ক্লাসে যাওয়া উচিত, জামা কাপড় কী কেনা হবে, বিছানাপত্র নেওয়া হবে কি না ইত্যাদি বহুতর আনকোরা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং তার সমাধান নিয়ে বহু আলোচনা কয়েকদিন ধরে তাদের মধ্যে হয়েছিল।

বর্তে গিয়েছিল গৌরী। এখন আবার যে-কে সেই।

যতীন আবার চুপ করে গেছে। সত্যি কী এমন কথা আছে। যাকে অবলম্বন করে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায় ?

তার চেয়ে যতীন বরং ঘুমিয়েই পড়ুক।

ভাবতে-না-ভাবতেই যতীন উঠে বসল। হাই তুলল দুবার। খুট করে আলো নেবাল। শুয়ে পড়ল বিছানায়।

অন্ধকারের একটা জমাট ভারী পাত গৌরীকে যেন ঠেসে ধরল বিছনায়। চোখ বুজল গৌরী। সেখানেও অতল অন্ধকার। তার চেয়ে চোখ খুলে থাকলেই ভাল। এত অন্ধকারে থাকতে পারছে না সে। গৌরীর মনে হল, অতলস্পর্শী এক অন্ধকূপের গভীরে পড়ে যাচ্ছে পা পিছলে ! যেন দম আটকে মরে যাবে।

তাই এক ফাঁকে উঠে পায়ের দিকের একটা জানলা খুলে দিল। অন্ধকার একটু পাতলা হল সেখানে। এক ঝলক বাতাস ঢুকে তাকে একটু স্বস্তি দিল।

তারপর ভাবনা আর তন্দ্রা মিলিতভাবে তাকে এক আধো-ঘুম আধো-জাগরণের রাজ্যে নিয়ে ফেলল।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দ হতেই গৌরী দেখল, যতীনের দিকের দরজাটা খুলে গেল। হুড়হুড় করে অনেকটা ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল কামরায়। আর প্রায় তারই সঙ্গে একটা লোক। বিরাট চেহারা।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল গৌরী। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু কী আশ্চর্য, গলাব স্বর বেরুল না। দৌড়ে গিয়ে যতীনকে উঠিয়ে দিতে চাইল। পারল না।

লোকটা দরজা ধরে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল জমাট রাত্রির বুক চিরে উর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন ছুটেছে। তার গন্তব্য বুঝি গৌরীর সর্বনাশে।

গৌরীর সারা অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে ভয়ে। ঠিক আছে চোখ দুটো। আর চেতনা।

লোকটির চেহারা এখন বেশ দেখতে পাচ্ছে গৌরী। বুঝতে পারছে না ওর মতলব। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কেন ? ওখানে তো দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয় ! ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে এগিয়ে আসবে। তারপর এক এক করে শেষ করবে ওদের।

আগে যতীনকে। ওর শক্ত হাত দুটো দিয়ে যতীনের টুঁটি টিপে ধরবে। দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে। টুঁ শব্দটি করতে পারবে না সে। বেরিয়ে আসবে জিভটা, ঠেলে উঠবে চোখ। ওঃ ! চোখ বুজে ফেলল গৌরী। ওর নাভিকুণ্ড থেকে ভয়াবহ এক শীতল স্রোত বেরিয়ে আসতে চাইছে গলার ভিতর দিয়ে। সমস্ত অন্তরাত্মা যেন জমে গেছে তার স্পর্শে।

যতীন গেছে। এবার কার পালা ? গৌরীর মনে হল, লোকটা এবার কল্যাণ কেয়ার দিকে চাইছে। ওগো, না না না। ওদের ছেড়ে দাও, দয়া করো, ওদের ছেড়ে দাও। এই নাও, আমার যা আছে সব নাও।

লোকটা এতক্ষণ ওকে দেখতে পায়নি। ওর চিৎকারে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা মোটা আঙুল গৌরীর ঠোঁটে চেপে ধরে বলছে, চুপ। সে চুপ করে গেল। লোকটা ইশারা করল, যা আছে দাও। গৌবী যেন সম্মোহিত। সব বের করে দিল। নিজের গায়ের যা ছিল, খুলে দিল।

তাতেও হল না, খুশি হল না লোকটা, ইশারা করতে লাগল, আরও দাও। আর কী দেবে গৌরী ? আর কানাকড়ি সম্পদও তো নেই তার।

আরও কী চায় লোকটা ? কী, তাকে চায় ! হা ঈশ্বর ! না না, তোমার পায়ে পড়ি, আমার সর্বনাশ আর তুমি কোরো না।

লোকটা ইশাবা করল, হয় তুমি, না হয় ওই বাচ্চা দুটো।

না না, তার চেয়ে মেরে ফেল। আমাদের একসঙ্গে মেরে ফেল।

লোকটা গৌরীকে ভাবতে সময় দিয়ে বসল পায়ের দিকের বেঞ্চিটায়। সিগারেট ধরাল একটা। অন্ধকারে বসে বসে সিগারেট টানতে লাগল।

রাক্ষস। পিশাচ। ধৈর্য ধরে বসে আছে, কতক্ষণে গৌরীর তেজ ভাঙে, কতক্ষণে সে স্বেচ্ছায় সম্মতি দেয় !

গৌরীর দেহটাকে টুকরো টুকরো করবে শকুনটা। সেই সুন্দর দেহটা। দিদির বাড়ির বাথরুমের নির্জন আয়নায় জীবনে সে প্রথম তার নিরাবরণ রূপটা দেখেছিল। তা ফুটে উঠল তার চোখে। মুগ্ধ হবার মতো রূপই তার। গৌরীকে যে দেখেছে সে-ই মুগ্ধ হয়েছে। জামাইবাবুও মুগ্ধ হয়ে গেছেন এই বুড়ো বয়সেও। গৌরী তা জানে। যতীন 'ঈর্ষান্বিত' কথাটা বোধ হয় একেবারে বানিয়ে বলেনি।

এখন এসেছে এই দস্যুটা। অমন সুষমা তচনচ করে দেবে। ওই যে বসে বসে সিগারেট টানছে। অপেক্ষা করে আছে গৌরীর স্বেচ্ছাসম্মতির।

না, অপেক্ষা বোধ হয় আর করল না। নিজেই উঠে পড়েছে। হ্যাঁ, আসছে গৌরীর পায়ের দিকে। গৌরীর দেহের সমস্ত কটা স্নায়ু ধনুকের ছিলার মতো টান-টান হয়ে গেল উত্তেজনায়।

দরজা খুলল লোকটা। পালাবার পথটা করে রাখল। ট্রেনের গতি কি কমে আসছে ? চাকায় রেলে কি দোল খাচ্ছে ? এ কী, স্টেশন এল নাকি ? গাড়ি কেন থামল ?

দরজা সম্পূর্ণ খুলে নামতে গিয়েও লোকটি থমকে দাঁড়াল। তারপর জোর গলায় হাঁক দিলে বাবুজী ! বাবুজী !

যতীন ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

লোকটি বলে গেল, এধারকার রাস্তা খারাপ। এখনও সামান্য রাত বাকি আছে। বাবুজী যেন দরজা ভেতর থেকে লক করে দেন।

যতীন ঘুম চোখে উঠে এসে লোকটিকে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ দিল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জায়গায় শুয়ে পড়ল।

গৌরী যেন মরে গেছে। অবসাদে শিথিল হয়ে তেমনিভাবে পড়ে রইল। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারল লোকটি নেমে গেছে। দেখল, যতীন বেঁচেই আছে।

স্বস্তির নিশ্বাসটা ভারী হয়ে পড়ল। যেন সব ভয়, সব আতঙ্ক বের করে দিয়ে বুকটাকে হাল্কা করে দিল।

মনে হল, একটু পরিষ্কার বাতাস টানতে পারলে বাঁচত। যেই মনে হওয়া অমনি উঠে মাথার কাছের জানলাটা খুলে দিল।

দেখল, আলোয় আলোয় স্টেশনটা ছেয়ে গেছে। আর তাদের কামরার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা, ওদের গাড়ি থেকে যে এইমাত্র নেমে গেল।

গৌরী দেখল, লোকটার বেশ বয়েস হয়েছে। সুন্দর সৌম্য চেহারা। লোকটির গলা জড়িয়ে ধরে পনেরো-ষোল বছরের অবাঙালি একটা মেয়ে ঝুলছে আর পিতাজী পিতাজী করে আনন্দে চেঁচাচ্ছে। লোকটি আদর করে তার পিঠ থাবড়াচ্ছে। তার সারা মুখ দিয়ে স্নেহ ঝরে পড়ছে।

দৃশ্যটা যেন সপাৎ করে চাবুক মারল গৌরীকে।

শেষ রাত্রের সেই ভারী ভিজে অন্ধকার পরিবেশ, আলোকিত স্টেশন আর সব ছাপিয়ে বাপ-বেটীর সেই স্নেহক্ষরা পুনর্মিলন গৌরীর চেতনা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।

লোকটা আদৌ দুর্বৃত্ত নয়, বদমাশ নয়। সে যতীনকে গলা টিপে হত্যা করেনি। ওই তো যতীন ঘুম-চোখে দরজা বন্ধ করে গেল, গিয়ে আবার ঘুমুচ্ছে। কল্যাণ কেয়ারও অমঙ্গল কিছু ঘটেনি। গৌরী যেন জমা-খরচের খাতায় নিস্পৃহ খাজাঞ্চীর মত হিসেব তুলে রাখছে। না, কল্যাণ কেয়ার একগাছি চুলও নষ্ট হয়নি। ক্ষতি হয়নি গৌরীর। যদিও ট্রাঙ্কের দিকে সে চাইল না, তবু সে নিশ্চিন্তভাবে বুঝল, গহনার কেসটা তার মধ্যে আটুটই রয়েছে।

সব ঠিক আছে। তবে ?

তবে ওই লোকটিকে দেখে গৌরী অত ভয় পেল কেন ? অত যন্ত্রণা বোধ করল কেন ?

ট্রেন ছাড়ল। ধীরে ধীরে স্টেশনটা সরে যেতে লাগল গৌরীর অবসন্ন চোখের উপর দিয়ে।

ওই যে ওরা। গৌরীর চোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গেটের সামনে ওই যে দাঁড়িয়ে আছে বাবা আর মেয়ে। মেয়ে বাবার হাত থেকে টিকিটটা কেড়ে নিয়ে কালেক্টরকে দিল, তারপর হাসতে হাসতে দুজনেই বেরিয়ে গেল। আর দেখা গেল না ওদের। ট্রেনখানা ততক্ষণে গৌরীকে নিয়ে

অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছে।

কেন এত ভয় পেল গৌরী ? লোকটার স্নেহময় মুখে তো তার বাবার ছবিই দেখতে পেল। দেখল যতীনের। কল্যাণ কেয়াকে যতীন যখন আদর করে তখন তার মুখেও তো ওই একই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে।

এই গাড়িতে উঠেছিল কেন ? কেন উঠবে না ! গাড়ি তো তাদের রিজার্ভ করা ছিল না। আলো কেন জ্বালল না তবে ? ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চায়নি, তাই।

এমনই খুঁটিয়ে বিচার করতে বসল গৌরী। লোকটি যে দুর্বৃত্ত নয়, সে সম্পর্কে একটার পর একটা যুক্তি খাড়া করতে লাগল। লোকটির প্রত্যেকটি আচরণ বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করল, লোকটি সত্যিই ভদ্রলোক ছিল। অনর্থক ভয় পেয়েছে গৌরী।

যে মুহূর্তে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল, সেই মুহূর্তেই এক অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন কামড় মারল তার আত্মার মর্মমূলে। গৌরী নতুন এক তীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, লোকটি যে ভাল সে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গৌরীকে অনেক প্রমাণের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে হয়েছে। কিন্তু লোকটাকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে তাকে দুর্বৃত্ত বলে ধরে নিয়েছিল। তখন তো কোনও প্রমাণের জন্য সে ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করেনি।

ছি ছি ছি ! গৌরী কী, গৌরী কী ? ট্রেনখানা যেন চাকায় চাকায় মৃদু ধিক্কার তুলতে লাগল।

গৌরীর মনে পড়ল মানুষ এককালে গুহাবাসী ছিল। দেহে মনে অন্ধকার নিয়ে ঘুরে বেড়াত। শুধু ভয়, শুধু সংশয় আর আতঙ্ক, এই ছিল সে-সব মানুষের প্রধানতম অনুভূতি। দৈবাৎ কাউকে দেখত যদি, ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করত তাকে।

তারপর সে যুগকে অনেক পিছনে ফেলে গৌরীরা চলে এসেছে আজকের জগতে, অনেক আলোয় স্নান করে অনেক সূর্যের প্রসাদ পেয়ে।

কিন্তু কই, সেই আদিম অন্ধকূপকে গৌরী তো আলোকিত করতে পারেনি। সে যে এখনও তার মধ্যে বাস করছে। কী তফাত তাতে আর তার স্যাঁতসেতে কলকাতার বাসাটাতে ?

সেই লোকটি তাদের কামরায় ওঠার পর গৌরী আর তার মাঝে একটা বিশ্বাস, মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস, জন্ম নিচ্ছিল। কোথায় তাকে লালন করবে গৌরী, না তাকে খুন করে বসল ! হ্যাঁ হ্যাঁ খুন করেছে।

কল্পনায় যতীনের খুন যখন দেখেছে গৌরী তখনই খুন করেছে নিষ্পাপ শিশুর মতো নবজাত সেই বিশ্বাসকে। তেমনি করে গলা টিপে টিপে।

পূবের আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। তখনও রোদ ওঠেনি। গৌরী হাত দুটো তুলে ধরল সেই আবছা আলো-ছায়ায়। কী বীভৎস দেখাতে লাগল সে দুটো। যেন মৃত কোনও মানুষের হাত।

এক অসহ্য যন্ত্রণায় গৌরীর মর্মস্থল কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

নিজের মনের দিকে চাইল গৌরী। কী গভীর খাদ, আর কত জমাট অন্ধকার ! ভয় আর সংশয় সন্দেহ আর আতঙ্ক, এই দিয়ে ঠাসা।

গৌরীর যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আলো—আলো না হলে বাঁচবে না গৌরী।

সবশেষে পূর্ব-দিগন্তের সীমানায় যে রক্তিম আলোর সঙ্কেত দেখতে পেল সে, তারই উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে লাগল।

হে জবাকুসুমকান্তি, আমার অন্ধকার দূর করে, পাপ ক্ষমা করো। আমাকে শুচি করো। আর একবার আমায় সুযোগ দাও, বিশ্বাসকে লালন করবার। অবিশ্বাসের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে আমাকে আলোর রাজ্যে নিয়ে যাও।

দেশ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

পা ড়ি

সমরেশ বসু

কাজ নেই তাই বসে ছিল দুটিতে। সেই সময় পুবের উঁচু থেকে জানোয়ারগুলি নেমে এল হুড়মুড় করে। ধুলো উড়িয়ে, বনজঙ্গল মাড়িয়ে, একরাশ কালো মেঘের মতো নেমে এল জানোয়ারের পাল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

বসে ছিল দুটিতে। বেঁটে ঝাড়ালো এক বটের তলায় একজন গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ছিল। শুয়ে ছিল আর একজন। একজন পুরুষ আর একজন মেয়ে।

আসশেওড়া আর কালকাসুন্দের অবাধ বিস্তার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বট অশ্বত্থ-পিটুলি-সজনে, সব আপনি-গজানো গাছ দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। যেন নীচের কচি-কাঁচা ঝোপ-ঝাড়গুলিকে খবরদারি করছে উঁচু মাথায়।

বন-ঝোপ নিয়ে, হামা দিয়ে দিয়ে জমি উঁচুতে উঠেছে পুবে। একটু উত্তরে, উঁচুতে দেখা যায় একটি কারখানাবাড়ি। বাদবাকি হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে। আর পশ্চিমে মাটি নেমেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। নামতে নামতে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে।

আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচীর পর রক্ত ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারী হযেছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে বাখতে পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরও বাড়বে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে । বেঁকেছে হঠাৎ। তারপর লাটিমাটির মতো বোঁ করে পাক খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের গায়ে ওগুলি ছোট ছোট ঘূর্ণি। মানুষের ভয় নেই, মরণ নেই ওতে পশুর। শুকনো পাতা পড়ে, কুটো পড়ে। অমনি গিলে নেয় টপাস্ করে ! বড় ঘূর্ণি হলে মানুষ গিলত। এই ঘূর্ণি-ঘূর্ণি খেলা। যেন তীব্রস্রোত ছুটে এসে একবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে তর্‌তর্ করে।

দুটিতে দেখছিল। মেঘ জমেছে মেঘের পরে। বড় বড় মেঘের চাংড়া নেমে এসেছে স্রোতের ঠোঁটে, ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে। নেমে এসেছে গাছের মাথায় হাত বাড়িয়ে ছুঁতে আসছে আসশেওড়া কালকাসুন্দের লকলকে ডগা। বাতাসের গায়ে মেঘ দোমড়াচ্ছে, দলা পাকাচ্ছে। আবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছে নেমে।

কাজ নেই, তাই দুটিতে বসে ছিল। বেকার বসে বসে দেখছিল। সেই সময়ে জানোয়াবগুলি আসতে চমকে উঠল।

এদিকে গঙ্গার ধারটা ফাঁকা ফাঁকা। লোকজনের যাতায়াত তেমন নেই। বাইরে থেকে মনে হয়, উত্তরের কারখানাটা ঝিমুচ্ছে এই মেঘলা দুপুরে। গঙ্গা এখানে বেশ চওড়া। ওপারে ধূ-ধূ করছে ইট পোড়াবার কারখানা। আষাঢ় এসেছে, ইট পোড়াবার মরশুম শেষ। ওখানেও ফাঁকা। জেলে নৌকারও তেমন ভিড় হয়নি এখনও। তার মাঝে এ দুজন বসেছিল। এই আষাঢ় ঢলকানো গৈরিক গঙ্গা, এই জনশুন্য বন ঝোপ, ওই মেঘভরা আকাশ, তার তলায় ওই দুটি। সহসা মনে হয়, পৃথিবীর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেয়ে আর পুরুষ বসে আছে ঝোপ-জঙ্গলের অসহায় আশ্রয়ে।

কালো কুচকুচে পুরুষ। গামছাটি পাতা শিয়রে। আঁটসাট করে কাপড় পরা। গোঁফ জোড়া বড় হয়েছে। কিন্তু এখনও নরম ধোঁয়াটে ভাব যায়নি। মুখটি এর মধ্যেই চোয়াড়ে, খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। শুয়ে পড়েছে। পা চালিয়ে দিয়েছে মেয়েটির উরুতের ওপর দিয়ে।

মেয়েও কালো। চুলে পড়েছে জট। কপালে কয়েকদিন আগের গোলা মেটে সিঁদুরের টিপের আবাস মাত্র। ছোট একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে বাকিটুকু টেনে দিয়েছে বুকে। তাতে মন মেনেছে,

শরীর মানেনি। নতুন বয়সের বাড়। বন-কালকাসুন্দের মতো পুষ্ট বেআব্রু হয়ে পড়েছে, হা হা করছে কান আর নাকের ফুটোগুলি। উকুন মারছিল মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে পুরুষটির গায়ে বুক চেপে এলিয়ে পড়ছিল।

সেই সকাল থেকে দুটিতে এমনি গায়ে গায়ে বসে ছিল। কাজ নেই, খাওয়াও নেই, তাই এইখানে বসে ছিল।

এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে হাত পা। কালি পড়েছে চোখের কোলে। মুখে চেপে বসেছে ক্ষুধা-ক্লিন্নতা।

পরশু রাতে শেষবার খেয়েছে। কাজ করেছে আগের সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপর 'মিসিপালটীর' দরজা বন্ধ করে দিয়েছে । কাজ নেই ।

গাঁয়ের মানুষ ননকু। এখানে এখন ঝাড়ুদারদের সর্দার। দু'মাস আগে তাকে কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল। বাবুসাহেব নাগিন প্রসাদের শুয়োর আর ভেড়া চরিয়ে পেট ভাতায় ছিল দুটিতে গাঁয়ে। নন্‌কু গোঁফ মুচড়ে, বুক ফুলিয়ে বলেছিল, সঙ্গে চল্। মাস গেলে দুটিতে রোজগার করবি ষাট টাকা।

আরে বাপ্‌রে বাপ। ষাট টাকা। সবে তখন বিয়ে হয়েছে ছমাস। একলা মানুষ নয় যে, মনের রাশ নেই, শরীরে উপর বিশ্বাস নেই। ওদের গাঁয়ের মানুষ কথায় বলে, নট জাতের মাগী-মদ্দা এক হলে, হেন কর্ম নেই যে করতে পারে না। তা ঠিক। তখন ওদের মনে নেমেছে ঢল। ওরা নটের ঘরেব দুই জোয়ান মাগী-মদ্দা। ওরা একত্র হলেই যে-কোনও অভিযানে নামতে পারে। নাগিন প্রসাদকে কিছু না বলে চলে এসেছিল দুটিতে ননকুর সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় ষাট টাকা ! দুজনে মিলে বত্রিশ টাকা রোজগার করেছে মাসে।

দেড় মাস পর বাড়তি হয়ে গেছে দুটিতে। কাজ নেই। কেবল থাকতে পাওয়া যাবে ধাঙ্গড় বস্তিতে।

কিন্তু কাজ নেই তো খাওয়া নেই। নন্‌কুকে বলল, কেন কাজ নেই ?

নন্‌কু বলল ওট হয়ে গেল তাই। ওটের আগে কাজ দেখাতে হয়, তাই বাড়তি নেওয়া হয়। মিটে গেল, বসিয়ে দিল।

ওরা বলল, তবে কী হবে ?

কী হবে ! নন্‌কু বোধ হয় প্রথমে ভেবেছিল চেঁচিয়ে ধমকে উঠবে। কিন্তু সে চেঁচিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠেছিল, হায় রাম রাম রাম। আমি পাপ করেছি। আমি শুয়োরের বাচ্চা, গীদ্‌ধড়ের বাচ্চা, আমি পাপী।

সবাই এসে সান্ত্বনা দিতে লাগল ননকুর কান্নায়, রোহ, রোহ, তু তু তু, রহো সর্দার, ন রো তুমি ভাল মানুষ। ওদের একটা কিছু হয়ে যাবে।

একা দুটিতে ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে গেছল ? ননকু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছিল, হবে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে।

সাতদিন কোনরকমে খাইয়েছিল কেউ কেউ দুটিকে। পরশু রাতে শেষবার খাওয়া পাওয়া গেছে। আর নয়।

গতকাল সারাদিন কেটেছে এখানে। আজও এসে দুটিতে এলিয়ে পড়েছিল । শহরের মধ্যে থাকা যায় না। পুবের উঁচু পাড়ের খানিকটা গেলেই ধাঙ্গড় বস্তি সেখানেও থাকা যায় না। ক্ষুধার্ত, জিভ-বেরিয়ে-পড়া কুকুরের মতো হাঁপাতে হয় সেখানে। খিদে পায় কাউকে খেতে দেখলে। এখানে এই নির্জনে এসে তবু পড়ে থাকা যায়।

যায়, কিন্তু যাচ্ছিল না আর। দুজনের হৃৎপিণ্ড দুটি পেটে নেমে এসে দম নিচ্ছিল। আর গায়ে গা রেখে দুটিতে জীইয়ে রাখছিল রক্তপ্রবাহ। গায়ে গা ঠেকিয়ে যেন রক্তে রক্তে সাহস সঞ্চয় করছিল। গা শুঁকে, চটকে, চেটে, বিকট ভয়কে মুখে থাবড়ি দিয়ে রাখছিল সরিয়ে। যে-ভয়টা গা বেয়ে বেয়ে উঠে

ওদের একেবারে শেষ করে দিতে চাইছিল। যেন এদের ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই আকাশ কালো হয়ে নেমে আসছিল। জল আরও লাল হয়ে উঠছিল, পাক দিয়ে দিয়ে খলখলিয়ে উঠছিল। দক্ষিণের বাতাস একটু পুবে বাঁক নিয়ে খ্যাপা হ্যাঁচকা দিচ্ছিল ! ভেজা মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠছিল দলা দলা কেঁচো। ওদের চারপাশ ঘিরে, বটতলায় পিঁপড়েরা আসছিল তেড়ে।

এসেছিল একটা জোয়ারের শুরুতে। একটা পুরো জোয়ারের উজান গেছে। তারপরে নেমেছে দীর্ঘ সময় ধরে একটা ভাটার ঢল। আবার লেগেছে জোয়ার।

এমন সময়ে এল সেই জানোয়ারগুলি পুবের উঁচু থেকে। মেঘের বুকে আর এক পোঁচ গাঢ় কালিমার মতো নেমে এল কালো কুঁত্‌কুঁতে চোখো, ছুঁচলো মুখো, মাদী-মদ্দা পশুর দল !

ওরাও মাদী-মদ্দা দুটিতে উঠে বসল গায়ে গায়ে।

শুয়োরের দল একবার থমকে দাঁড়াল জঙ্গলে একজোড়া মানুষ দেখে। তারপর আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে।

পেছনে দেখা গেল দুটি লোক। একজন বেশ নাদুসনুদুস, সোনার মাকড়ি কানে। দুটি সামনের দাঁত পুরো সোনার। শুয়োরগুলি কিনেছে এ অঞ্চলের যাবত ধাঙ্গড়-তল্লাট ঘুরে ঘুরে। নিয়ে যাবে ওপারে। সঙ্গে আর একটি লোক। সামনের বস্তির ময়লা টানা গাড়ির গাড়োয়ান।

এই দুটিকে দেখে সোনার মাকড়িকে বলল, মহাশয়জী, এ দুটোকে দিয়ে আপনার কাজ হতে পাবে ?

সোনার মাকড়ি এগিয়ে এল। দেখল দুটিকে একবার। মেয়েটি টানতে লাগল বুকের কাপড়। পুরুষটি সংশয়ে দেখতে লাগল দুজনকে।

গাড়োয়ান বলল সোনার মাকড়িকে, সে এদেব চেনে। বেকার বসে আছে। রাজি হয়ে যেতে পারে।

সোনার মাকড়ি কাছে এসে দুটিকে দেখল আরও খানিকক্ষণ। আর শুয়োরের দল, বনপালা উপড়ে, কচি শিকড়ের শাঁসের সন্ধানে তছনছ করতে লাগল ঢালু জমি।

সোনার মাকড়ি দেখতে দেখতে একবার হু দিল আপন মনে। আর ওরা দুটিতে এখান থেকে সরে যাবে কি না ভাবছে।

তারপব বলল, সোনার মাকড়ি, কাজ করবি ?

কাজ। কাজ মানে খাওয়া ! ওদের এলানো শরীর একটু শক্ত হল, পুরুষটি বলল, কী কাজ ?

সোনার মাকড়ি বলল, শুয়োরগুলি নিয়ে যেতে হবে দরিয়ার ওপারে।

আরে বাপ্। ভরা দরিয়া, আরও বাড়ছে। ফুলছে, নাচছে আর ঠেলে ঠেলে উঠছে উজানে ! ওরা মেয়ে-মরদ চোখাচোখি করল দুজনে । দুজনেরই ক্ষুধিত চোখে আশা ফুটল।

পুরুষটি বলল, একটা খবরদারি লাও চাই যে ?

অর্থাৎ একটি খালি নৌকা চাই শুয়োরগুলির পাশে পাশে। ওটিই নিয়ম। কিন্তু সোনার মাকড়ি সেদিকে ঢু-ঢু। নৌকার পয়সা খরচ করতে পারবে না।

ওরা দুটিতে দমে গেল খানিকটা। ফিরে তকাল দরিয়ার জলে। তারপর শুয়োরগুলির দিকে। কালো কিম্ভূত দলা দলা ছড়ানো। মাদীই বেশি চোখগুলি ট্যারা। চাউনি বোঝা যায় না। কিন্তু লক্ষ আছে ঠিক মানুষের দিকে।

ওরা পরস্পর চোখাচোখি করল আবার। আর সেই মুহূর্তেই মনে মনে রাজি হয়ে গেল দুজনে। সেই মুহূর্তে ওদের নটরক্ত উঠল তোলপাড় করে। আঁকুপাঁকু করে উঠল অভুক্ত পেটের মধ্যে। পড়ে থাকাটা মনে হল মরে থাকার মতো। দুটিতে কাপড়ে কসুনি দিল।

তবু মেয়েটি মেয়েমানুষ। বলল, কিন্তু বিনা লাও, পারব তো ?

পুরুষটি বলল, সামলাতে হবে।

সোনার মাকড়ি বলল, উই যে ওপারে উত্তরে দেখা যায় শিউমন্দির, তুলতে হবে ওখানে। উনত্রিশ জানোয়ারের জন্য উনত্রিশ আনা দুজনের মজুরি। আর উপরি পাওয়া যাবে কিছু কেড়ুয়া তেল, দরিয়ার থেকে উঠে গায়ে মাখার জন্যে। একটি খোয়া গেলে ছমাস হাজত।

বলে তার হাতের লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দিল পুরুষটির দিকে। মেয়েটি পাতা ছাড়িয়ে ভেঙে নিল কালকাসুন্দের ছপটি।

সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ান, দুজনেই চোখাচোখি করল হতবাক হয়ে। রাজি হয়ে গেল দুটোতেই ? শেষে জানোয়ারগুলি মেরে দুটোতে মরবে না তো। কিন্তু ওদের দুজনকে শুয়োরগুলিকে ঘিরে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে সে তরর্ হয়ে গেল।

ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে গেল দুদিকে। মেয়েটি তার সরু মিষ্টি গলায় টান দিল একটানা, উ-র্-র্-র্-র্ আ····

আর পুরুষটি ডাক দিল দোআঁশলা গলায়, আ···· হুঃ ! আ··· হুঃ ! যেন মেয়েটির টানা সুরে পুরুষ দিল তাল। শব্দগুলি বেরুচ্ছিল ওদের ক্ষুধিত পেটের ভেতর থেকে। কেমন ক্লান্ত আর গম্ভীর সেই সুর। হঠাৎ যেন এক বিচিত্র গানের মায়া ছড়িয়ে দিল এই ঢালু বনভূমিতে। ঘোলা লাল জলের তরঙ্গে তরঙ্গে লাগল সেই সুর। বাতাসে বাতাসে সে সুর লাগল গিয়ে মেঘে মেঘে।

জানোয়ারগুলি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সোহাগী সংশয়ের সুরে। মাথা তুলল একে একে ঝুপসি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। ছুঁচলো মুখ তুলে যেন গন্ধ শুঁকে দেখল ডাকের ভাব। চক্চক্ করে উঠল কুঁতকুঁতে গোল চোখগুলি। ঘেঁষাঘেঁষি করে এল সবাই গায়ে গায়ে । গায়ে গায়ে সবাই ঠিক জড়ো হতে লাগল ওদের মাঝখানে।

উ-র্-র্-র-র্-অ-উ-র্-র্-র্-আ···

আ···হুঃ ! আ··· হুঃ !

সোনার মাকড়ির সোনার দাঁত উঠল চক্চকিয়ে। গাড়োয়ানটা ঠিক জানোয়ারগুলির মতো গোল গোল চোখে তারিফ করতে লাগল মনে মনে, হ্যাঁ, ঠিক যেন শুয়োরের আদত বাপ-মা দুটি।

আর ওদের উপোসে মরণের ভয়টা যেন হারিয়ে গেল ওই সুরের মধ্যে। অভর পেটের ক্ষুধার যন্ত্রণাটা এক নতুন সংযমী ক্ষুধার রসে উঠল ভরে। খেতে পাওয়া যাবে, সেই আশায় শক্ত হল হৃৎপিণ্ড। কাজ পাওয়া গেছে, কাজ করতে হবে আগে। কঠিন কাজ।

কাজ কঠিন, কিন্তু পশুগুলি চেনা। সেই থেকে পড়ে থেকেছে ওদের সঙ্গে। পেলেছে ওদের চিরদিন গাঁয়ে। ওদের চেনে, জানে তাগ্ বাগ্। চেনে না শুধু দরিয়াটাকে। লাল দরিয়া চলেছে খরবেগে তর্তর্ করে। জোয়ার লেগেছে, ঢেউ নেই। কিন্তু টান খুব। দরিয়াও গহিন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাড়ছে। কালো মেঘ নামছে পুঞ্জ পুঞ্জ।

জানোয়ারগুলি জড়ো হচ্ছে গায়ে গায়ে। দূর থেকে মনে হয়, একজায়গায় থুকথুকিয়ে উঠেছে কালো কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। আর শোনা যাচ্ছে সোহাগী শুয়োর-গলার চাপা ডাক।

ওরা যত জড়ো হয়, ওরা দুটিতে তত ঘনিয়ে এল কাছাকাছি। মেয়েটি আড়চোখে ফিরে তাকাল একবার সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ানের দিকে। তারপরে গঙ্গার দিকে। চাপা গলায় বলল, লাও নেই, কিছু নেই। বহুৎ বড় দরিয়া ।·····

মেয়েটা মেয়েমানুষ। এটুকু ওর ভয়ে পেছন টানা নয়। সাহস আর ক্ষমতার মাপ বুঝে হাত দিতে চায় কাজে !

পুরুষটা পুরুষমানুষ । গোঁফ মুচড়ে তীক্ষ্ণ চোখে মাপে দরিয়া। তারপর বলে খালি, হাঁ, বহুৎ বড় !

কথাটার মানে হল, বড় কিন্তু পার হতে হবে।

মেয়েটি আবার বলল, উনতিশ আনা কত ? পুরা রূপয়ার বেশি না কম ?

বউটা ছোট, তবে মেয়েমানুষ হিসাব না খতালে মন সাফ হয় না।

মরদটা পুরুষ। সব মেনে গেলে বেহিসাবী হয়ে পড়ে। বলে, তিন আনা কম পুরা দু রূপয়া।

আচ্ছা। নতুন ক্ষুধার একটা অদ্ভুত মিষ্টি স্বাদ লাগছে যেন। কাজেরও তাড়া লাগছে মনে মনে, আর শরীরে। জোয়ারে জোয়ারে যেতে হবে। ওপারের উত্তরের দূর শিবমন্দিরের কাছে যেতে হবে।

মেয়েটা আবার বলল, দরিয়ায় এখন জল বেশি। এরা এখন পার করছে কেন ?

পুরুষটি বলল, ওরা কারবাবী। জানোযারের তখ্‌লিফ পরোয়া করে না। ওরা ডাকছে সুরে সুর মিলিয়ে আর কথা বলছে। কথা বলতে বলতে শুনছে। দুটো মদ্দা, বাকি সব মাদী। হ্যাঁ, কিন্তু একটা গাভিন যে ! গাভিন শুয়োরী। পেটে ওদের সোনা ফলে। কোনটা পাঁচটা দেয়, কোনটা ছটা। তেমন ফলবতী হলে সাতটাও। দরিয়া পার পাবে তো !

পাবে। নয়া গাভিন। এখনও হালকা আছে।

ডাকের সুরটা কিছু রকম ফেরে। তাড়া দেওয়ার সুর। তাড়া দিতে গিয়ে থমকে গেল পুরুষটি। ব্যস্ত হয়ে ফিরল সোনার মাকড়ির দিকে। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, হুজুর এদের খানাপিনা ভরপেট আছে তো ?

সোনার মাকড়ি বলল, হাঁ, হাঁ।

হাঁ বাবা ! এতবড় দরিয়া, যুঝবে কী করে নইলে পশুগুলি। ওদের দুটির পেটে না থাক খানা। খানার জন্যই ওরা যুঝতে যাচ্ছে। জানোয়ারগুলি কেন যুঝবে তা ওরা জানে না।

পরমুহূর্তেই পুরুষটি লাঠি তুলে ওর শূন্য নাভিস্থল থেকে একটা তীক্ষ্ণ বিলম্বিত হাঁক দিল, হাঁ-ই—হা—হাঁ · · ·

মেয়েটা টান দিল, উ-র্-র্-র্—আ,—র্-র্-র্-আ · · ·

জানোয়ারগুলি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল এই রূঢ় অথচ নতুন ইঙ্গিতের সুরে। গোল গোল ট্যারা পাকানো চোখে সংশয় দেখা দিল। হাঁক শুনে সব সামনের দিকে একবার ঠেলে আসতে গেল। কিন্তু দোলায়মান লাটি আর ছপটি দেখে, থমকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। ভাবখানা এ সবের মানে কী ? গায়ে গায়ে ঘষার একটা খস্‌খস্ শব্দ উঠল। গায়ের শুকনো কাদা উড়তে লাগল ধুলোর মতো।

তারপর লাঠি-ছপটির নিশানা আর হাঁকের ইশারায়, এক জায়গাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে ফিরল নদীর দিকে। পরমুহূর্তেই কোনও খবরদারি না দিয়ে পুরুষটির হাতের লাঠি আল্‌তোভাবে গিয়ে পড়ল জানোয়ারের ভিড়ে। আচমকা ভয় পেয়ে মাটিতে অদ্ভুত শব্দ করে দলটা নামতে লাগল ঢালুতে। দুজনের লাঠি-ছপটি হাতের ঘেরাওয়ে উনত্রিশটি জানোয়ার। বড় জাতের জানোয়ার।

ততক্ষণে আষাঢ়ের জোয়ারের গঙ্গা এগিয়ে এসেছে কল্ কল্ করে। বাড়ছে। আরও বাড়বে।

কালো-কালো খোঁচা-খোঁচা লোমওয়ালা পিঠের ঢেউ থমকে থমকে পড়ছে। শুয়োর জল চায়। টানের দরিয়ায় পড়তে চায় না সহজে। চোখে তাদের টানা ঘোলা স্রোতের শঙ্কা। গলায় অদ্ভুত সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধ শব্দ। যেন জিজ্ঞেস করছে, কী হবে ? কোথায় যেতে হবে ?

পুরুষটি রূঢ় হাঁকের ফাঁকে ফাঁকে তোয়াজের সুর দিচ্ছে, আহ্ আহ্ আহ্, উতারো, উতারো। তোদের দরিয়া পার করি তারপর। হোই · · · হা হা · · · উ-র্-র্-র্—আ · · · উ-র্-র্-র্-আ · · ·

মেয়েটি কেবল দেখছে, দরিয়া বাড়ছে। যত কাছে আসছে, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে, ততই ফুলছে, স্রোতের টান বেঁকে বেঁকে হিল্ হিল্ করে যাচ্ছে। দেখছে আর ফিরছে পুরুষের দিকে। পুরুষটিও দেখছে আর শক্ত হচ্ছে মুখটা। এসে গেছে, এসে গেছে জলের কিনারায়। ল্যাজ গুটিয়ে এগুচ্ছে জানোয়ারেরা। এ ওকে গুঁতিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে পেছিয়ে আসছে নিজে। এমনি করে অনিচ্ছায়

এগুচ্ছে।

হঠাৎ একটি জানোয়ার তীব্র চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেই গাভিন শুয়োরীটি। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ছুটেছে। যেন তীব্র প্রতিবাদ করে বলছে, যাব না, কখ্‌খনো যাব না !

যাবে না। ভয় পেয়েছে। হারামজাদীর পেটে বাচ্ছা আছে কিনা !

কিন্তু মেয়েটি হতাশে পেছন তাড়া করতে গিয়ে, জলের ধারের কাদায় হমড়ি খেয়ে আবার উঠে ছুটতে যাবে পুরুষটি হাঁক দিল, ছুট মত্‌।

কাদা মেখে প্রায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। শক্ত নিটোল বুকে কাদা লেপে গেছে। কাদা লেগেছে চুলে। অনেকখানি যেন মিশে গেল শুয়োরের দলের সঙ্গে । পুরুষটি বলল, ডাক, ডাক দে, এগুলিকে নিয়ে আগে বাড়তে হবে।

জলে নামাল না শুয়োরের দলকে। ডাঙার উপর দিয়ে চলল নরম সুর ছাড়তে ছাড়তে। উররর-আ, আ-হুই ! আ-হুই !

শুয়োরীটা অনেক দূর গেছে চলে। থেমেছে, কিন্তু বিকট গলায় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে আবার মুখ নামিয়ে কী সব খাচ্ছে খুঁটে-খুঁটে।

এরা দুটিতে জলের ধার দিয়ে দলটাকে নিয়ে চলেছে এগিয়ে। শুয়োরীটা দেখছে,খাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ তেমনি চেঁচাতে চেঁচাতেই পিল্‌পিল্‌ করে ছুটে এল দলের মধ্যে। কিন্তু চেঁচাতে লাগল তেমনি। ঘাড় গোঁজ করে আড়চোখে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল, জেনে-শুনে মারতে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে ! শয়তান মানুষ !

মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটি চোখাচোখি করল একবার। সময় হয়েছে। এইবার, এইবার। পায়ের পাতায় জল ঠেকছে। ঠেকছে আবার সরে যাচ্ছে। আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেকখানি।

শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি। আর পুরুষটি যেন তার সব কথাই বুঝতে পারছে, এমনিভাবে বলছে, হঁ হঁ ! কোনও ডর নাই। হঁ হঁ । আ-হুই ! বলতে বলতে সে আবার গঙ্গার দিকে তাকাল। গঙ্গা। গঙ্গামায়ী ! যেন খিলখিল করে হাসছে, কল্‌কল্‌ করে কী সব বলছে। আর যেন ঠিক চেয়ে আছে ওদের দিকে। কী যে বলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না ওরা দুটিতে। খালি মনে হচ্ছে, যেন জিজ্ঞেস করছে ভগবতী দরিয়া, আসছিস ? আসবি ? তোরা ভুখা রয়েছিস আর আমি কত বড় হয়েছি।... এই বলছে আর হাসছে। হাসছে আর মাতাল রহস্যময়ী চোখে দুলে দুলে চলছে। লাল হয়ে গেছে খুশিতে।

পুরুষ আর মেয়ে ওদের দুজনের চোখেই অপার অনুসন্ধিৎসা। দুজনেই যেন দরিয়ার তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। কী রহস্য আছে সেখানে। কী ভয় আছে, কত ফাঁদ পাতা আছে মরণের।

এইবার বোঝা যাচ্ছে, ওরা দুটি যেন শিশুর মতো সরল। শিশুর মতো নির্ভীক ও সাহসী। মেয়েটা আঁচল আঁটছে কোমরে। গা-টা একেবারেই খোলা। ঝড়, জল ও বজ্রপাতেও দুর্জয় গিরিশৃঙ্গের মতো নির্ভীক বলিষ্ঠ বুক।

পুরুষটি গোঁফ পাকাচ্ছে। রোঁয়াটে গোঁফ আর এবড়োখেবড়ো পাথরের চাংড়া শরীর।

ওরা দুজনেই যেন মনে মনে বলছে ভগবতী দরিয়াকে, হাঁ, আমরা ভুখা। সেইজন্যে আমাদের পার হতে দাও। সোনার মাকড়িটা কারবারী। ও আষাঢ় মাসে জানোয়ার পার করাচ্ছে বিনা নৌকায়। উনত্রিশটা জানোয়ার, আরে বাপ ! দুটো মানুষ ! হাই বাপ্‌ ! জানোয়ারগুলোর কোনও দোষ নেই। হেই মায়ী ! দুদিন ধরে দেখছ, আমাদেরও কোনও দোষ নেই।

ওরা বলছে আর দরিয়া যেন যোগেড়ী নাচওয়ালীর মতো কল্‌কল্‌ ঝুম্‌ঝুম্‌ করে এগিয়ে আসছে দুর্জয় কটাক্ষ করে। জল বাড়ছে, ওরা কেবলি সরে সরে উঠে আসছে। তৈরি হচ্ছে।

জানোয়ারগুলি সংশয়োদ্দীপ্ত চোখে তাকাচ্ছে মানুষদুটোর দিকে। কান পাতছে বাতাসে আর জলে।

বাতাস আর জলের কথা বুঝতে চাইছে যেন ওরা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে সবাই। শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি কোনও কিছু গ্রাহ্য না করে।

এইবার। এইবার। পুরুষটি জানোয়ার পটানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বলল মেয়েটিকে, থোড়া উপরে ওঠ।

হাঁ, ঠিক আছে। একটু এগিয়ে যা, হাঁ, ঠিক খাড়া হয়ে যা।

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। জানোয়ারগুলিকে মুখ ফেরাতে হল জলের দিকে। এইবার তাড়া দিতে হবে। একবার জলে পড়লেই স্রোতের টান। তখন আর কিছু ভাববার অবসর থাকবে না।

শেষবার দুজনে তাকাল জলের দিকে, ওপারে মাটির সীমানায়। জানোয়ারগুলির জিজ্ঞাসু গোঙানি বাড়ছে।

একমুহূর্ত পরেই ওদের দুজনের গলাতেই শোনা গেল তীব্র চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ছপটি মুহুর্মুহু এসে পড়তে লাগল জানোয়ারগুলির গায়ে।

পরমুহূর্তেই দেখা গেল জানোয়ারগুলিকে দরিয়া খানিকটা টেনে নিয়ে গেছে। ওরা দুটিতেও ঝাঁপ দিল জলে।

কিন্তু ওদের দুটিকে পেছনে রেখে, জানোয়ারগুলি দ্রুত উত্তর দিকে চলল ভেসে। এখন থেকেই এরকম উত্তর দিকে গেলে, এ জন্মে আর পার হওয়া যাবে না। শুয়োরগুলিকে ওপারের দিকে মুখ করাতে হবে। নৌকা থাকলে এ অসুবিধে হত না।

পুরুষটি চিৎকার করে উঠল, ডাঙায় ওঠ্, জলদি।

তখনও বুকজল। দুজনে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাঙায় উঠল।

জানোয়ারগুলিও ডাঙায় ওঠবার তালে আছে। জলে একটা অদ্ভুত খলবল শব্দ তুলছে শুয়োরেরা আর চাপা গলায়, ছুঁচলো মুখে মুখ ঠেকিয়ে কী সব বলাবলি করছে। গাভীন শুয়োরীর গলাটাও চেপে গেছে অনেকখানি।

ওরা দুজনে উঠেই ডাঙার উপর দিয়ে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির সামনে। উনত্রিশটা জানোয়ার যেন একটি বিকটাকার জানোয়ারের মতো ভাসছে। পুরুষটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঠিক সামনের মুখে। মেয়েটি পড়ল মাঝামাঝি।

পুরুষটি জলে পড়েই লাঠি তুলে দলটার মুখ ফিরিয়ে দিল পশ্চিমে, গঙ্গার ওপারের দিকে। মেয়েটি পেছন থেকে ছপটি মারল ছপছপ করে। শুধু দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা রইল। জোয়ারের ধাক্কা আসছে ওদিক থেকে। শুয়োরগুলি ওদিকে ফিরতে পারবে না কোনমতে। আর খোলা আছে পশ্চিম দিক। ওদিকেই তাড়াতে হবে।

পুরুষটি লাঠি তুলে চিৎকার করতে লাগল, হা—ই ! হা—ই ! পেছন থেকে মেয়েটি হুম্‌হুম্ শব্দ করছে আর বলছে, খবরদার, এদিকে মুখ করবিনে।

শুয়োরগুলি তখনও ঠেলাঠেলি করছে পরস্পরের মধ্যে আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। এখনও বোধ হয় পেছন ফেরার আশা করছে। এর পরে ঠেলাঠেলি করে নিজেরাই এগিয়ে যেতে চাইবে। এখন ভয়ে ও শঙ্কায় ঠেলে বেরুচ্ছে চোখগুলি। সামনে ওই বিশাল জলরাশি আর তার তীব্র টান। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অ্যাঁ। মরতে হবে ? কী চায় এরা !

ওপারে নিয়ে যেতে চায়।

পুরুষটি কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারছে না শুয়োরগুলির উত্তর মুখে। ভয়ংকর টান। টানটাও একরোখা নয়। থেকে থেকে বেঁকে যাচ্ছে।

মেয়েটি তো কিছুতেই জানোয়ারগুলির পেছনে থাকতে পারছে না। তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আরও উত্তরে, পুরুষটির দিকে।

পুরুষটি চিৎকার করে বলল, ঠেলে থাক্। জোরে ঠেলে থাক্। খবরদার ইধারে আসিস্‌নে।

ঠেলে থাকছে মেয়েটা। কিন্তু তীব্র স্রোতে হাত-পাগুলিকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধাক্কা মারছে এসে বুকে।

এখন আর মানুষ দেখা যায় না। সব শুয়োর হয়ে গেছে। সাতাশের জায়গায় আটাশটা মাদী, আর দুটোর জায়গায় তিনটে মদ্দা হয়েছে।

ডাঙা সরে গেছে বেশ খানিকটা। দক্ষিণে বাতাস ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে। যেখানে পড়ছে, সেখানে এক অদ্ভুত উল্লাসের কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে। জোয়ার না হলে, এই বাতাসে ধাক্কা লেগে গঙ্গা উত্তাল হয়ে উঠত। ঢেউ উঠত বড় বড়। তাহলে জানোয়ারগুলি মরত নির্ঘাত।

পুবের হ্যাঁচকা থেকে থেকে ঢেউয়ের আভাস দিচ্ছে, সেইটাই ভয়ের ! মেঘগুলি দলা পাকিয়ে পাকিয়ে কোথাও কোথাও নেমে আসছে হু-হু করে। কোথাও উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দুপাশে। সেই ফাঁকের মাঝে দেখা দিচ্ছে অদ্ভুত আলোর রেখা। যেন কী এক রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এখুনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঢেকে যাচ্ছে গভীর কালিমায়। ভাব-ভঙ্গি ভাল নয়। মেঘ তাতে আরও জমাট হচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে।

ওরা দুটিতে দেখছে আকাশের দিকে আর প্রচণ্ডভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে জলের মধ্যে। মাঝে মাঝে উঠছে লাঠি আর ছপটি। জলের ধাক্কায় কাবু হচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু এখনও সেটুকু ভাববার, অনুভব করার অবসর পাচ্ছে না। মুখে শব্দ করছে হা—হা ! মেয়েটি নীরব হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তীব্র চিৎকার করে উঠছে এক একটা জানোয়ার। আর ওরা দুজনে চমকে জলের দিকে তাকাচ্ছে। কী হয়েছে ! কে তোকে কী করেছে। ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে কি কেউ জলের তলায়।

ভাবতেই, জলের তলায় ভয়াবহ আতঙ্কটাকে ওরা ওদের দেহের প্রচণ্ড আলোড়নে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাইছে। কিছু নয়। কিছু নেই। কোনও ভয় নেই।

হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। পুরুষটা শুশুকের মতো লাফিয়ে উঠল জলে। কী হল?

তিনটে শুয়োরী বেমালুম পিছন ফিরে পোঁ পোঁ করে পালাচ্ছে উত্তর-পুবে। যাবে না, কিছুতেই আর যাবে না। স্রোত বাড়ছে, জল ফুলছে। মারবার ফন্দি খালি।

পুরুষটি একমুহূর্ত আড়ষ্ট রইল। তারপর লাঠি নামিয়ে তিন শুয়োরীর পেছন ধাওয়া করল। কাছাকাছি গিয়ে, মুখোমুখি হল। লাঠি তুলে জলে মারল ছপাস্ করে। ছুঁচলো মুখ আবার ফিরল। সেই গাভিনটা। আর দুটো উঠতি বয়েসের। সময় হয়েছে গাভিন হওয়ার। এখনও মানুষ চিনতে শেখেনি, বিশ্বাস আসেনি মনে।

পুরুষটার রাগ হল, আবার মায়াও হল। খালি বলল, জানোয়ার। একদম জানোয়ার। হাই—হাই।

হলদে দাঁত বের করে চেঁচাতে চেঁচাতে দলের দিকে ছুটল তিনটিতে। লাঠিটা উঠে রইল আকাশে।

ইতিমধ্যে বাকি জানোয়ারগুলিকে নিয়ে মেয়েটা চলে গেছে অনেকখানি।

পুরুষটা তাড়া দিল। জলে ডুবে ডুবে তারও চোখগুলি দেখাচ্ছে শুয়োরের মতো। বলছে, আমি আছি না, হ্যাঁ ? হারামজাদী !·····

নিদারুণ সব খিস্তি করতে লাগল রাগে ও সোহাগে।

কাছাকাছি এসে মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। দুজনের চোখই শুয়োরের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

দুজনেই বুঝল, স্রোত বাড়ছে। ভয়ংকর বাড়ছে। দরিয়া আকুল। আরও বাড়ছে। ফুলছে। এক-একটা জায়গায় জল যেন নীচের থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। উঠছে আর ছুটছে তীব্র বেগে। আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে এক এক জায়গায়। ওখানে রাগ আছে বুঝতে হবে। কপট রাগ। ঢালাও স্রোতের কৃত্রিম ঘূর্ণি।

শুয়োরগুলি চাক বেঁধেছে। মুখের পাশ দিয়ে ফ্যাসফ্যাস্ করছে জলের মধ্যে। গোঁ গোঁ করে কী সব বলাবলি করছে। জলের গভীরতা, তার ভয়ংকরী রূপটা যেন ওরাও চিনতে পেরেছে, তাই একজোট হয়ে, নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে চলেছে। মিছিল করে নিয়েছে, লড়াই জলের সঙ্গে। তবু দেখছে লাঠি আর ছপটি। তবু ওরই মধ্যে যত ময়লা ভেসে যাচ্ছে মুখের সামনে দিয়ে, সব মুখে পুরে নিচ্ছে।

আর ওরা দেখছে, দরিয়াটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। গহিন দরিয়া। এখনও মাঝামাঝিও আসা যায়নি। জলের ধাক্কায় ধাক্কায় ওদের হাতে, পায়ে, মাথায় শিরাগুলি টানটান হয়ে উঠেছে। জল ঠাণ্ডা কিন্তু ওদের পা থেকে গরম বেরুচ্ছে। ঘাম ঝরছে। মেশামেশি হয়ে যাচ্ছে ঘামে জলে।

জল হাসছে কল্‌কল্ করে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে সোজা স্রোত। বেঁকে ফুলে উঠে এক-একটা করে চুবানি দিচ্ছে ওদের আর বলছে, এসেছিস ? আয়, আরও আয়।

বলছে আর সমুদ্র উজাড় করে খল্‌খল্ করে আসছে।

হ্যাঁ, যেতে হবে। হেই মায়ী ! মায়ী দরিয়া, যেতে হবে। অনেক লাঠি আর ঘা পড়ছে তোর গায়ে। জানোয়ারগুলিকে ভয় দেখাবার জন্যে। তোর কত সহ্য মায়ী। আমাদের কোনও দোষ নেই, কোনও স্পর্ধা নেই। দরিয়ার উপব চিরকাল মানুষকে পার হতে হয়।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জোয়ারের দরিয়া কেবলি বাড়ছে আর ওর চোখে বাড়ছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। ঠেলছে, কিন্তু পারছে না দূরে সরে যাচ্ছে কেবলি। হাতের ছপটি আর উত্তোলিত নেই। নেমে গেছে।

পুরুষটা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে পারছে না। যদি বলে, নাই সক্‌তি ! আর পারছিনে। বিদায় দাও।··· বাবুসাহাব নাগিন প্রসাদ ওদের বিয়েতে দুটো শুয়োর মেরেছিল, এক মণ চাল দিয়েছিল। আর দিয়েছিল চার জালা তাড়ি।

আকাশ আরও নামছে। নামছে। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটা বিদ্যুৎঝলক ওদের মাথার উপর এসে, হারিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই কড়কড় ব্যুম করে শব্দ হল।

অমনি জানোয়ারগুলি মিছিল ভেঙে ফেলল। এলোমেলো হয়ে গেল।

আঁ আঁ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা।

মেয়েটাও লাফ দিল মস্তবড় কাতলা মাছের মতো। ছপটি উঠেছে আবার হাতে। পুরুষটা লাঠি তুলে হাঁক দিল, খবরদার। কিছু ডর নেই, চল। যত জল্‌দি পারিস চল্।

যা দু-একটা জেলে নৌকা ছিল আশেপাশে, তার সব পার ঘেঁষছে।

যত পশ্চিম ততই স্রোত। পশ্চিমে বাঁকা। জল ওখানে তলে তলে লুপলুপ করে মাটি খাচ্ছে। মন্দির কোথায় ? শিউমন্দির ? ওই, ওই যে। অনেক দূরে। এখনও অর্ধেক। ওই বাঁকের মুখে, স্রোত যেখানে পাগলের মতো ছটফটিয়ে উঠছে।

ওরা সরে যাচ্ছে ক্রমে শুয়োরগুলির কাছ থেকে। শুয়োরগুলি চাক বাঁধা। সেজন্যে ওদের গতির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, সংযম আছে। ওবা দুটিতে ছিটকে যাচ্ছে কুটোর মতো।

জানোয়ারগুলির বিশ্বাস ফিরে এসেছে মানুষদুটোর উপর। ওদের সরে যেতে দেখে ভয় পাচ্ছে। তাই ভীত সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকছে বারবার।

আর ওরা স্রোত ঠেলে কাছে থাকতে চাইছে, পারছে না। ওরা যতই ঠেলছে, ততই অবশ হয়ে পড়ছে। কাঁধে আর হাঁটুতে টান পড়েছে।

ওরা দুজনে কাছে কাছে। মেয়েটি মুখ তুলল। জলে ভেজা মুখ। চোখ লাল ! বলল, আচ্ছা, আমরা ফিরে আসব কী করে ? খেয়া পারের পয়সা দেবে তো ?

মেয়েটা মেয়েমানুষ। ও এখন ফিরে আসার ভাবনায় পড়েছে। পুরুষটা বলল, জানিনে।

হঠাৎ আবার নতুন স্রোত। এখানে জলটা ইস্পাতের মতো রেখাহীন অথচ ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ। টানে না, যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এক লহমায় মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ভাসল। সারা মুখ ঢেকে গেছে খোলা চুলে।

কোথায় গেলি ?

এই যে !

না, ডোবেনি।পুরুষটি গোঁফের ফাঁকে হাসবার চেষ্টা করল এতক্ষণে। এতক্ষণে মেয়েটাকে হারাবার ভয় হয়েছে। বলল, কী, তখলিফ হচ্ছে ?

তখলিফ ! এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়। কিন্তু মেয়েটি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, না।

মনে হচ্ছে, রাত্রি নামছে। অন্ধকার হচ্ছে। আবার সর্পিল বিদ্যুৎ চিক্‌চিক্ করে উঠল ! একদিক থেকে নয়, চারদিক থেকে। যেন ছপটি মেরে যাচ্ছে জানোয়ারগুলির জলে ভেজা চকচকে পিঠে, ওদের মাথায়। সোজা ওদেরই মাথায় উপর যেন বজ্রপাত হচ্ছে। আকাশের শব্দ যেমনি থামছে জলের শব্দ সেই মুহূর্তেই দ্বিগুণ হচ্ছে। চিৎকার করছে ভীত পশুর দল।

এবার পুরুষটির লাঠিও নেমে গেছে। ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে দুজনেই। অনেকক্ষণ ভুলে গেছে। পার হতে হবে শুয়োরগুলিকে নিয়ে, সেইটেই একমাত্র কথা, একমাত্র ভাবনা।

আবার গতি বাড়ল জানোয়ারগুলির। অর্থাৎ স্রোত আরও বাড়ছে। জল ছুঁতে চাইছে আকাশকে, আকাশ জলকে। জল ঝাপটা দিচ্ছে তলে। তলে তলে, ঠ্যাঙ্গে, পেটে, বুকে। স্রোতের চরিত্র আবার বদলেছে।

ওরা দুটিতে আবার কাছাকাছি হয়েছে। কাছাকাছি হয়েছে জানোয়ারগুলিও।

মেয়েটা কী যেন টেনে টেনে তুলছে কাপড় তুলছে। খুলে যাচ্ছে কাপড়, তাই। দুজনেরই হাতের চেটোগুলি নতুন চালের আস্‌কে পিঠের মতো ফুলো ফুলো হয়ে কুঁকড়ে গেছে। মেয়েটার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারছে না পুরুষটা। মেয়েটা ডুবছে বারবার, আর এই ঘোলা জলের মতো ঘোলা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ওদের বিয়েতে কী বাঁশিটাই বাজিয়েছিল রামুয়া। আর আজকে এই সর্বনাশী দরিয়ায়—

চিক্‌চিক্ দ্যুম ! চিৎকারের চোটে জানোয়ারগুলির বীভৎস হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

পুরুষটি ঢোকে ঢোকে জল খেল কয়েকবার। ডাকল, আছিস ?

হাঁ। আছি।

আবার বলল মেয়েটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থেমে থেমে, উনত্রিশ আনাতে ঠকা হয়ে গেছে, না?

হ্যাঁ।

গঙ্গা বুক বাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে, দুলে দুলে যেন হেসে উঠেছে ওদের কথায়।

আবার ঃ আচ্ছা, রাত হয়ে গেলে আমরা থাকব কোথায় ?

পুরুষটি নীরব। সভয়ে তাকিয়ে দেখল উত্তরগামী স্রোত অদূরেই বাঁক ফিরে হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়েছে। ভাটা পড়ে গেল নাকি। সর্বনাশ ! মন্দিরের কাছাকছি এসে আবার উল্টোদিকে ভাসতে হবে ! একটা নৌকা নেই। আর দুটো মানুষের হাতে উনত্রিশটা জানোয়ার।

পরমুহূর্তেই সে চিৎকার করে উঠল, ঘূর্ণি। ঘূর্ণি।

জানোয়ারগুলিও সে চিৎকারের মধ্যে আসন্ন বিপদের সঙ্কেত পেল। ওরা পুরুষটির দিকেই এগুতে লাগল।

পশ্চিমপাড়টা মাটি খাচ্ছে অদৃশ্যে। দ' পড়ে গেছে। আওড় হয়েছে তাই।

উত্তরগামী জল তাই হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়ে বড় ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে।

বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার, সব খেয়ে ফেলবে। আরে বাপ ! হেই মায়ী।

আবার জোর ফিরে এল দুজনেরই গায়ে। পুরুষটি লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির দক্ষিণে। খবরদার। খবরদার।

সে ঘূর্ণির কাছাকাছি চলে গেল জানোয়ারগুলিকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটা পুরুষের জীবন-সংশয় দেখে কাছে আসতে চাইছে। পারছে না। পরমুহূর্তেই মনে হল, কী একটা ভার নেমে গেল তার শরীর থেকে। কী গেল। কাপড় ! দরিয়া কাপড় ছিনিয়ে নিল।

পুরুষটা প্রাণপণ চিৎকার করছে জানোয়ারগুলির দক্ষিণ ঘেঁষে। যাতে ভয় পেয়ে সবাই হুড়মুড় করে উত্তরে ছোটে।

কিন্তু একটা জানোয়ার পড়ে গেল দক্ষিণের টানে। পুরুষটা চিৎকার করে উঠল, গেল, গেল হারামজাদী। সেই গাভিন শুয়োরীটাই। যার সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেশি, সে এমনি যায়। এখন উপায়।

শুয়োরীটা দলছাড়া হয়ে চিৎকার করছে। কয়েক হাত মাত্র দূরে। কয়েকটি রেখার বাইরে। কিন্তু সেটুকু ঠেলে আসতে পারছে না। পুরুষটিও যেতে পারছে না কাছে। তাকেও ওইরকম ঠেলাঠেলি করতে হবে। তারপর মরতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু উপায়।

মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, চলে এসো। ওকে মরতে দাও।

মরতে দেব। মরবে শুয়োরীটা। এতগুলি বাচ্চা পেটে নিয়ে মরবে।

বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি এল খাপছাড়া বড় বড় ফোঁটায়। এল শেষ পর্যন্ত। হেই আশমান, তোর দরদ নেই।

হঠাৎ পুরুষটি ঝাপটা দিয়ে মাথা তুলল। তার চেহারা শুয়োরের চেয়েও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। একটু একটু করে এগুতে লাগল ঘূর্ণিরেখার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে মেপে নিল শুয়োরীটার দূরত্ব। তারপর হাতের লাঠি বাড়িয়ে ধরল শুয়োরীটার মুখের কাছে, নে, পারিস্ তো ধর কামড়ে।

কিন্তু শুয়োরীটা ক্রমে পেছিয়ে যাচ্ছে। পুরুষটি আর একটু বাড়ল। শেষ বাড়া। শুয়োরীটা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে চকিতে কামড়ে ধরল লাঠি। ধরেছে। যেন বাঁচবার জন্যে শুয়োরীর মগজেও ঘটেছে বুদ্ধির বিকাশ। নীচের পাটিতে কয়েকটা হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে নাসারন্ধ্র, আর ছুঁচলো ঠোঁট। খাড়া হয়ে উঠছে ঘাড়ের শক্ত লোম। পুরুষটি প্রাণপণে টান দিল। বলল, ধর, ভাল করে ধর। না পারলে ছেড়ে দেব।

পুরুষটি টানতে লাগল, শুয়োরীটা চাড় দিতে লাগল। তারপর হঠাৎ লাঠিটা গেল ফস্‌কে। দেখা গেল শুয়োরীটা পুরুষটির মাথার কাছে। দুজনেই ভাসছে উত্তর দিকে। লাঠিটা উত্তরে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে দক্ষিণের দহে চলে গেল।

মেয়েটা ততক্ষণে বাকি পশুগুলির সঙ্গে ভেসে গেছে অনেকদূর। দাঁড়াবার উপায় নেই জোয়ারের ধাক্কায়।

শুয়োরীটা আরও জোরে চেঁচাচ্ছে তখন। জলের জন্য টানা চেঁচাতে পারছে না। কিন্তু চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। যেন বলছে, বলেছিলাম, আমাকে তোরা একটা বিপদে ফেলবি। আমি এখুনি মরতাম, এখুনি।

আর পুরুষটি ভীষণ খিস্তি করে বলছে, চুপ, চুপ, কমিনে জানোয়ার। তুই আমার পোষ্য হলে, ডাঙায় উঠে আজ তোকে ঠেঙিয়ে আধমরা করতাম।

দূর থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এল, কী হ—ল ?

পুরুষটি জবাব দিল, বেঁচে গেছে।

বৃষ্টিটা চেপে আসছে না। গর্জন বাড়ছে মেঘের, ঝলকাচ্ছে ঘনঘন। গঙ্গা পর্যন্ত বেড়েছে, টাবুটুবু হয়ে গেছে তবু টানছে ভয়ংকর, এই একই রকম।

মন্দিরটার সামনেই নীচের ভিত অনেকখানি ডুবে গেছে জোয়ারের ভরায়। কিন্তু মেয়েটা

শুয়োরগুলো নিয়ে ভেসে যাচ্ছে মন্দিরটা ছাড়িয়ে। শুয়োরীটাকে ছেড়ে পুরুষটা ভেসে গেল সেইদিকে।

কাছে এসে দেখল মেয়েটা বারবার ডুবছে। আর শুয়োরগুলি ভেসেই যাচ্ছে ওর পাশ কাটিয়ে। ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছে সোনার মাকড়ি, এখানে এই জায়গায় তুলতে হবে।

কিন্তু মেয়েটা তখন ডুবছে। পুরুষটা কাছে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, টান দিল। কিন্তু আশ্চর্য। পায়ে যে মাটি ঠেকছে। তবে মেয়েটা ডুবছে কেন।

মেয়েটার তখন শীত ধরেছে আর ভেজা মুখখানিতে ভরে উঠেছে ব্যথার লজ্জা ও নিদারুণ ক্লান্তি। ফিসফিস্ করে বলল, ডুবে থাকতে হবে আমাকে। একদম নাঙ্গা হয়ে গেছি।

ও, কাপড়টা দরিয়া টেনে নিয়ে গেছে। পুরুষটা বলল, তবে এইখানে দাঁড়া। আমি জানোয়ারগুলোকে তুলি আগে।

তুলে দিল জানোয়ারগুলি। তারপর কোমরের গামছা খুলে সেটা পরল। নিজের ছোট কাপড়টা ছুঁড়ে দিল জলে।

সোনার মাকড়ি দুটি লোক নিয়ে এসেছিল। তারা হাসতে লাগল সবাই। সোনার মাকড়িও। বলল, দরিয়ায় দিল্লেগি।

এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিও এল জোরে। কাছেই সোনার মাকড়ির বস্তি। শুয়োরগুলিকে ঘিরে নিয়ে সবাই এল সেখানে।

অনেক রাত হয়েছে। গঙ্গার ধারেই সোনার মাকড়ির বস্তির শুয়োর খাঁচার পাশে একটা চালায় রাত কাটাচ্ছে ওরা দুটিতে। মজুরি দিয়ে আটা আর ভাজি কিনে এনেছে। রুটি করেছে। এখন খাচ্ছে। দুটিতে বসে বসে। উনুনে একটি কাঠ জ্বলছে আপন শিখা তুলে। সেই আলোয় খাচ্ছে।

দরিয়াটা তখন ভীষণ ঢেউয়ে নাচানাচি করছে। অন্ধকারে মেশামেশি হয়ে গেছে সব। বর্ষণ হচ্ছে অবিরত। আর পুবে হ্যাঁচকা বাতাস যেন চাপা গলায় শাসাচ্ছে। জানোয়ারগুলি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে আশেপাশে।

পরশু রাতের পর এই খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখ ফেটে জল এসে পড়ছে। ছোট কাপড়টা কোমর পেরিয়ে বুকটা ঢাকতে পারেনি। খাচ্ছে আর চোখের জল মুছছে। পুরুষটা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ন রো ! কাঁদিস্ নে।

খাওয়ার পরে মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরশুদিনের রাত্রের মতো ওদের দুজনের রক্তেই ভাটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।

শুধু কাছে ও দূরে কয়েকটি বিজলীবাতি বিচিত্র ঠেকতে লাগল এই প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ায়।

তারও অনেকক্ষণ পর পুরুষটা গুনগুন্ করতে লাগল।

যুগ যুগ পর আয়ীলবনি পবন-সুত মহাবীর—হই রামো !

আর তার রামা সুখে ঘুমোচ্ছে। নিকষ অন্ধকারে ঝরছে বাতাস ও বৃষ্টি।

পরিচয়, বৈশাখ ১৩৬৩

দ্রৌ প দী

মহাশ্বেতা দেবী

নাম দোপ্‌দি মেঝেন্, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন্ মাঝি (নিহত), নিবাস চেরাখান্, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপ্‌দি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা....

দুই তকমাধারী য়ুনিফর্মের মধ্যে সংলাপ।

এক তকমাধারী : সাঁওতালির নাম দোপ্‌দি, ক্যান্ ? আমি যে নামের লিস্টি লইয়া আসছি তাতে তো এমুন নাম নাই ? লিস্টিতে নাই এমুন নাম কেউ থুইতে পাবে ?

দুই তকমাধারী : দ্রৌপদী মেঝেন্। ওর মা যে বছর বাকলির সূর্য সাহুর (নিহত) বাড়িতে ধানভানাবি ছিল, সে বছর ওর জন্ম। সূর্য সাহুর বউ ওর নাম দিয়েছিল।

এক তকমাধারী : অহনকার অপিচাররা জানে ক্যাবল ফশফশাইয়া ইংরাজি লিখতে। হেয়াব নামে এত লিখছে কী ?

দুই তকমাধারী : মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওআন্‌টেড ইন মেনি. ...

ড্যাসিয়ের : দুলন্ ও দোপ্‌দি দাওয়ালি কাজ করত, বিটুইন বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত। ১৯৭১ সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা দুজনও নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। বস্তুত এরাই মেইন ক্রিমিনাল। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এরা মেইন, সেই ছেলে তিনটেকে পুলিসের হাতে সারেণ্ডার না করাতেও। এবং অপারেশন বাকুলির আর্কিটেক্ট ক্যাপটেন অর্জন সিং প্রভাতে লাশ গণনা করতে গিয়ে স্বামী স্ত্রীকে না পেয়ে তাৎক্ষণিক ব্লাডসুগারে আক্রান্ত হয়ে পুনর্বার প্রমাণ করে বহুমূত্র সত্যই দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ব্যাধিও বটে। বহুমূত্র বারোভাতারি। তার এক ভাতার অ্যাংজাইটি।

দুলন্ ও দোপ্‌দি দীর্ঘদিন নিয়ান্‌ডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে এবং বিশেষ বাহিনী সে অন্ধকারে সশস্ত্র সন্ধানে বিদ্ধ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু দাওয়ালি সাঁওতাল সাঁওতালনিকে তাদের অনিচ্ছায় সিংবোঙার কাছে যেতে বাধ্য করে। ভারতের সংবিধানে জাত-ধম্মো নির্বিশেষে সকল মানুষই পবিত্র, তা সত্ত্বেও এহেন অঘটন ঘটে যায়। কারণ দ্বিবিধ : এক—নিখোঁজ দম্পতির আত্মগুপ্তিতে অসামান্য দক্ষতা। দুই—বিশেষ বাহিনীর চোখে সাঁওতাল কেন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুণ্ডা গোষ্ঠীর সকল সন্তানকেই এক চেহারা মনে হওয়া।

বস্তুত, বাঁকড়াঝাড় থানার আণ্ডারে (এ ভারতে কেস্রোটিও কোনও না কোনও থানার আণ্ডারে) অবস্থিত কুখ্যাত ঝাড়খানি জঙ্গলের চতুষ্পার্শে, এমন কী অগ্নি ও নৈর্ঋত কোণেও, থানা—আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ (যেহেতু ছেন্‌তাইপার্টি নির্বিশেষে সশিক্ষিত নয় সেহেতু বন্দুকের বদলে তারা "চেম্‌বারটা দিয়ে দিন" ও বলে)—গোলদার-জোতদার-মহাজন-শান্তিরক্ষক-কাণ্ডজে বাবু ও খোঁচোড় ইত্যাদিতে অপরাধী বলে যাদের সন্দেহ করা হয়, তাদের সম্পর্কে সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীয় বিবরণীতে জানা যায় বহু পিলে চমকানো কথা। দুই কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর ঘটনার আগে সাইরেন চিৎকার "কুলকুলি" দিয়েছে। কতকগুলি অসভ্য, সাঁওতালিদের কাছেও দর্বোধ্য ভাষায় তারা নিহতদের ঘিরে উল্লাস সংগীত গেয়েছে। যথাঃ—

"সামারে হিজুলেনাকো মার্ গোয়েকোপে"

এবং

"হেন্‌দে রামব্রা কেচে কেচে

পুনডি রামত্রা কেচে কেচে।”

এতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় এরাই ক্যাপটেন অর্জন সিংয়ের বহুমূত্রের কারণ। প্রশাসনিক কার্যরীতি সাংখ্যের পুরুষ, বা মাকড়া দর্শকের চোখে আন্তোনিওনির আগেকার ফিলিমের মতোই দুর্বোধ্য বলে প্রশাসন পুনর্বার অর্জন সিংকেই অপারেশন ফরেস্ট ঝাড়খানিতে পাঠায় এবং বুদ্ধিবৃত্তি দপ্তরের কাছে উক্ত কুলকুলে ও নৃত্যশীল দম্পতিই যে পলাতক লাশদ্বয় তা জেনে অর্জন সিং কিছুক্ষণ “জোম্‌বি” অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষে তার এমন অহেতুক ভীতি জন্মায়, যে নেংটিপরা কালো মানুষ দেখলেই সে “জান্ লে লি” বলে অবসন্ন হয়ে ঘন ঘন জল ফেরায় ও জল খায়। কী য়ুনিফর্ম কী গ্রন্থসাহেব, কেউই তাকে এ অবসাদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। তারপর প্রিম্যাচিওর ফোর্সড রিটায়ারমেন্টের জুজু দেখিয়ে তবে তাকে বাঙালি প্রৌঢ়, সমর ও বামপন্থী উগ্র রাজনীতি স্পেশালিস্ট সেনানায়কের টেবিলে হাজির করা যায়। সেনানায়ক প্রতিপক্ষের কাণ্ডবাণ্ড ও এলেমের দৌড় প্রতিপক্ষের চেয়েও ভাল জানেন। তাই তিনি অর্জন সিংকে প্রথমে শিখ জাতির সমরপ্রতিভা সম্পর্কে স্তুতি জানান। পরে বুঝিয়ে দেন, শুধু কি প্রতিপক্ষের বেলাই বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস ? অর্জন সিংয়ের ক্ষমতাও তো বন্দুকের মেল অর্গান থেকে বেরোয়। হাতে বন্দুক না থাকলে এ যুগে “পঞ্চ ক” অব্দি বিকল ও ব্যর্থ। এ সকল বক্তিমে তিনি অন্যদের কাছেও করেন, ফলে যুধ্যমান বাহিনীর মনে পুনর্বার “আর্মি হ্যান্ড বুক” কেতাবে আস্থা ফেরে। কেতাবটি সাধারণের জন্য লয়কো। তাতে লেখা আছে, আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ সব চেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দার্হ। উক্ত পদ্ধতির যোদ্ধাদের দর্শন মাত্রে নিধন হল সেনামাত্রের পবিত্র কর্তব্য। দোপ্‌দি ও দুল্‌না উক্ত যোদ্ধাদের ক্যাটেগরিতেই পড়ে, কেন না তারাও টাঙি-হেঁসো-তীর-ধনুক ইত্যাদি নিয়ে নিধনকার্য চালায়। বস্তুত তাদের আক্রেটি-ক্ষমতা বাবুদের চেয়ে বেশি। সকল বাবু চেম্বার স্ফোটনে বিশারদ হয় না, তারা ভাবে বন্দুক ধরলেই ক্ষমতা আপ্‌সে বেরোবে। কিন্তু দুল্‌না ও দোপ্‌দি নিরক্ষর বলে অস্ত্র অভ্যাস করেছে জন্ম পরম্পরায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই সেনানায়ককে প্রতিপক্ষ তুচ্ছ মনে করে বটে, কিন্তু এ সামান্যি মানুষ নয়। ইনি প্র্যাকটিসে যাই করুন, থিওরিতে প্রতিপক্ষের আদর্শকে শ্রদ্ধা করেন। এই জন্য শ্রদ্ধা করেন, যে “ও কিঁস্‌সু নয়, চেংড়োরা বন্দুক লইয়া খেলে” মনোভাব নিয়ে এগোলে ওদের বোঝা যাবে না ও বিনাশ করা যাবে না। ইন্ অর্ডার টু ডেস্ট্রয় এনিমি, বিকাম ওয়ান। তাই তিনি ওদের একজন (থিওরিতে) হয়ে ওদের বোঝেন। এবং ভবিষ্যতে এ নিয়ে লেখালিখির বাসনা রাখেন। তখন (সেই লেখায়) বাবুদের ডিমোলিশ করে দাওয়ালিদের বক্তব্যটিকে হাইলাইট করবেন, এও তিনি ঠিক করে রেখেছেন। তাঁর মনের এ সকল প্রসেসকে আপাতজটিল মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তিনি খুবই সরল এবং কাউঠার মাংস খেয়ে তাঁর সেজ ঠাকুরদার মতোই তিনিও আনন্দ পান। আসলে তিনি জানেন, প্রাচীন গণনাট্যগীতির মতো করভটে বদল হোগা জমানা। এবং সকল জমানাতেই তাঁর সসম্মানে টেঁকার মতো টিকিটপত্তর চাই। দরকার হলে ভবিষ্যৎকে তিনি দেখিয়ে দেবেন তিনিই ব্যাপারটি কত ঠিক পারস্পেকটিতে বুঝেছিলেন। আজ যা যা করছেন তা ভবিষ্যতের মানুষ ভুলে যাবে তাতে তাঁর তিলেক সন্দেহ নেই এবং জমানা হতে জমানায় সবার রঙে রং মেশাতে পারলে তিনি সংশ্লিষ্ট জমানার প্রতিনিধি হতে পারবেন এও তিনি জানেন। আজকে “অ্যাপ্রিহেন্‌শন অ্যাণ্ড এলিমিনেশন” করে তিনি তরুণদের নিকেশ করছেন বটে কিন্তু মানুষ রক্তের স্মৃতি ও শিক্ষা অচিরে ভুলবে এ তিনি জানেন। এবং একই সঙ্গে তিনিও শেক্‌স্পিয়ারের মতো তরুণের হাতে পৃথিবীর লিগেসি তুলে দেওয়াতে বিশ্বাসী। তিনিও প্রস্‌পেরো।

যা হোক, এরূপর জানা যায় বহু যুবক-যুবতী ব্যাচ বাই ব্যাচ জীপগাড়ি আরোহণে থানার পর থানা হানা দিয়ে অঞ্চলটিকে যুগপৎ সন্ত্রস্ত ও উল্লসিত করে ঝাড়খানির জঙ্গলে বিলীন হয়। যেহেতু বাকুলি থেকে নিখোঁজ হবার পর থেকে দোপ্‌দি ও দুল্‌না প্রায় সকল জোতদার ঘরে কাজ করেছে,

সেহেতু তারা হুন্তব্যদের বিষয়ে হুন্তাদেরকে টপাটপ খবর দেয় এবং সগর্বে ঘোষণা করে তারাও সেনানী, র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল। অবশেষে দুর্ভেদ্য ঝাড়খানি জঙ্গল সেনানী দিয়ে চক্রব্যূহে বেড়ে ফেলা হয়, আর্ম ভেতরে ঢোকে ও রণভূমি চিরে চিরে পলাতকদের খোঁজে। একই সঙ্গে কার্টোগ্রাফার বনের ম্যাপ আঁকতে থাকেন ও সেনারা জলপানের অবলম্বন ঝরনা ও কুণ্ডীগুলি পাহারা দেয় আড়ালে থেকে, আজও দিচ্ছে আজও খুঁজছে। তেমনি এক তল্লাসকালে সেনাদের খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারি দেখতে পায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও ৩০৩-র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে দু হাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে 'মা—হো" বলে সফেন রক্ত উদ্গিরণ করে নিশ্চল হয়। পরে বোঝা যায় সেই কুখ্যাত দুলন্ মাঝি।

এই "মা—হো" শব্দটির মানে কী ? এটি কি আদিবাসী ভাষায় উগ্রপন্থী স্লোগান ? এর মানে কী তা ভেবে শান্তিরক্ষক-দপ্তর বহু চিন্তা করেও হালে পানি পান না। আদিবাসী-বিশেষজ্ঞ দুই মক্কেলকে কলকাতা থেকে উড়িয়ে আনা হয় এবং তাঁরা হফম্যান জেফার—গোল্ডেন পামার প্রমুখ মহাশয়দের রচিত অভিধান নিয়ে গলদঘর্ম হতে থাকেন। অবশেষে সর্বজ্ঞ সেনানায়ক চমরুকে ডাকেন। ক্যাম্পের জলবাহী সাঁওতাল চমরু দুই বিশেষজ্ঞকে দেখে ফুচফুচিয়ে হাসে, বিড়ি দিয়ে কান চুলকোয় ও বলে, উটি মালদ'র সাঁওতালরা সেই গাঁধীরাজার সময়ে লড়তে নেমে বলেছিল বেটে । উটি লড়াইয়ের ডাক । তা হেথা কোন্ বেটা "মা—হো" বলল বেটে ? মালদ' হতে কেউ এল ?

সমস্যা ফরসা হয়। তারপর দুলনের শবদেহ উক্ত পাথরে ফেলে রেখে সেনারা সবুজ উর্দির কামোফ্লাজে গাছে গাছে চড়ে দেবতা প্যানের মতো গাছেব সপত্র ডাল আলিঙ্গনে বেঁধে অসভ্য জায়গায় কাঠপিঁপড়ের সন্ধানী কামড় খেতে খেতে অপেক্ষা করে। দেখে মৃতদেহ নিতে কেউ আসে কি না। এটি শিকার পদ্ধতি যেমন, যুদ্ধের পদ্ধতি তেমন নয়। কিন্তু সেনানায়ক জানেন, কোনও চেনা-জানা পদ্ধতিতেই এ খচড়াদের নিকেশ করা যাবে না। তাই তিনি মড়ির টোপ দেখিয়ে শিকারকে টেনে আনতে বলেন। তিনি বলেন সব ফরসা হয়ে যাবে। যে সব গান গেয়েছে দোপ্‌দি তার মানেও বের করে ফেললাম বলে।

তাঁর কথা শিরোধার্য করে সেনারা তৎপর হয়। কিন্তু দুলনের মৃতদেহ নিতে কেউ আসে না। উপরন্তু রাতের আঁধারে খচরমচর শুনে সেনারা গুলি ছুঁড়ে নেমে এসে দেখে তারা শুকনো পাতার বিছানায় সঙ্গমরত শজারু দম্পতিকে মেরেছে। জঙ্গলে সেনাদের পথ চেনাবার খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারী অসংসারীর মতো দুলন্-সংশ্লিষ্ট বকশিশ না নিয়েই কার যেন হেঁসোতে গলা দেয়। দুলনের লাশ বয়ে আনতে সেনারা লাশভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত কাঠপিঁপড়েদের কামড়ে আশীবিষের যন্ত্রণা পায়। লাশ নিতে "কোই ন আয়া" শুনে সেনানায়ক পেপারব্যাকের আন্টিফাসিস্ত্ "ডেপুটি" কেতাবটি চাপড়ে "হোআট" বলে চেঁচিয়ে ওঠেন এবং তখনই একজন আদিবাসী বিশেষজ্ঞ আর্কিমিডিসের মতো ন্যাংটো ও শুভ্র আনন্দে ছুটে এসে বলে ওঠেন, সার ! ওই হেন্দে রাম্‌ব্রা কথাগুলোর মানে বের করে ফেলেছি। ওগুলো মুণ্ডারি ল্যাংগোয়েজ।

অতএব দোপদির খোঁজ চলতে থাকে। ঝাড়খানি জঙ্গল বেল্টে অপারেশন চলেছে—চলছে—চলবে। ওটি প্রশাসনের নিতম্বে দুষ্ট ফোড়া। সিদ্ধ মলমে সারবার নয়, তোকমারিতে ফাটবার নয়। প্রথম ফেজে পলাতকরা জঙ্গলের টোপোগ্রাফি না জানায় পটাপট ধরা পড়ে ও সম্মুখ সংঘর্ষের নিয়মে তাদের শরীরে করদাতার খরচের শ্রাদ্ধ করে গুলি বেঁধানো হয়। সম্মুখ সংঘর্ষের নিয়মে তাদর শরীরের চক্ষুগোলক-পৌষ্টিকনালী-পাকস্থলী-হৃৎপিণ্ড-জনন স্থান প্রভৃতি নিয়ে ডোমরা সানন্দে বেচতে যায়।

পরবর্তী ফেজে তারা সম্মুখ সংঘর্ষে ধরা দেয় না। তাতে এখন মনে হচ্ছে তারা কোনও একজন বিশ্বস্ত ক্যুরিয়ারকে পেয়েছে। সে যে দোপ্‌দি, সে সম্ভাবনা টাকায় নব্বই পয়সা। দোপ্‌দি দুলন্‌কে

রক্তাধিক ভালবাসত। এখন সেই ওদের বাঁচাচ্ছে নিশ্চয়।

"ওদের" কথাটিও হাইপোথেসিস্।

কেন ?

ওরিজিনালি কতজন গিয়েছিল ?

উত্তর নীরবতা। সে বিষয়ে বহু গল্প উড্ডীয়মান, বহু কেতাব যন্ত্রস্থ। সব কথা বিশ্বাস না করাই ভাল।

ছয় বছরে কতজন সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত ?

উত্তর নীরবতা।

সম্মুখ সংঘর্ষের পর কঙ্কালসমূহের হাত ভাঙা বা কাটা কেন ? নুলোরা কি সম্মুখ সংঘর্ষ করতে পারে ? কণ্ঠাস্থি লটরপটর পা ও পাঁজরের অস্থি চূর্ণিত কেন ?

উত্তর দু'রকম। নীরবতা। চোখে অভিমানী তিরস্কার, ছিঃ ! এসব কথা কি কইতে আছে ? যা হবার তা তো....

এখন কতজন জঙ্গলে আছে ?

উত্তর নীরবতা।

তারা কি এক লিজিয়ন ? তাদের কারণে করদাতাদের খরচে একটি বড় বাহিনী হামেহাল ওই জঙ্গলের বন্য পরিবেশে মোতায়েন রাখা কি জাস্‌টিফায়েড ?

উত্তর : অবজেকশন। "বন্য পরিবেশ" কথাটি ঠিক নয়। মোতায়েন বাহিনী সুষম খাদ্য, চিকিৎসা ব্যবস্থা-যথাধর্ম মতে অনুষ্ঠানের সুবিধা, বিবিধ ভারতী শোনা ও "ইয়ে হ্যায় জিন্দ্‌গি" ফিল্‌মে সঞ্জীব কুমার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মুখোমুখি দেখার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। না। পরিবেশ 'বন্য" নয়।

কতজন আছে ?

উত্তর নীরবতা।

কতজন আছে ? অ্যাট অল কেউ আছে কি ?

উত্তর দীর্ঘ।

যথা : ওয়েল, অ্যাকশন হচ্ছে। মহাজন-জোতদার গোলদার শুঁড়ি-কেশ্যালয়ের বেনামি মালিক-অতীতের খোঁচোড়, এরা আজও সন্ত্রস্ত। নিরন্ন নেংটেরা আজও উদ্ধত ও অনমনীয়। দাওয়ালরা কোনও কোনও পকেটে বেটার ওয়েজ পাচ্ছে। পলাতকদের প্রতি সহানুভূতিশীল গ্রামগুলি আজও নীরব ও বিদ্বেষী। এইসব ঘটনাবলী থেকে মনে করার কারণ আছে.....

এ ছবিতে দোপ্‌দি মেঝেন্ কোথায় বসে ?

সে নিশ্চয় পলাতকদের সঙ্গে শামিল আছে। ভয়ের কথা অন্যত্র। যারা আছে, তারা দীর্ঘদিন জঙ্গলের আদিম জগতে আছে। সাহচর্য করছে দরিদ্র দাওয়াল ও আদিবাসীদের সঙ্গে। এই সাহচর্যের ফলে তারা নিশ্চয়ই কেতাবি শিক্ষা ভুলে মেরে দিয়েছে। যে মাটিতে থাকছে, তার সঙ্গে হয়তো কেতাবি শিক্ষা ওরিয়েন্টশন করে নতুন করে সংগ্রাম পদ্ধতি ও বাঁচবার নিয়ম শিখছে। বাইরের কেতাবি শিক্ষা ও অন্তরের উদ্যম এইমাত্র যাদের সম্বল, তাদের গুলি করে নিকেশ করা চলে। হাতেকলমে কাজ করছে যারা, তারা অত সহজে নিকেশ হবার কথা নয়।

অতএব অপারেশন ঝাড়খানি ফরেস্ট থামতে পারে না। কারণ আর্মি হ্যান্ড বুকের সাবধান বাণী।

দোপ্‌দি মেঝেনকে ধর। সে ওদের ধরিয়ে দেবে।

দোপ্‌দি পেটকাপড়ে ভাত বেঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে চলছিল। মুসাই টুডুর বউ ভাত রেঁধে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে দেয়। ভাত জুড়োলে দোপ্‌দি পেটকাপড়ে ভাত বাঁধে ও ধীরে ধীরে চলে। চলতে চলতে ও মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে ডাগুর বের করে মারছিল। একটু কেরোসিন পেলে মাথায় ঘষে দিল উকুন নিকেশ হয়। তারপর সোডা দিয়ে মাথা ঘষে ফেলা যায়। কিন্তু হারামিরা ঝরনার বাঁকে বাঁকে খেপ মারে। জলে কেরোসিনের বাস পেলে ওরা গন্ধে গন্ধে চলে আসবে।

দোপ্‌দি !

দোপ্‌দি সাড়া দিল না। স্বনামে ডাকলে কখনই সাড়া দেয় না ও। ওর নামে বখশিশ ঘোষণার কাগজটা আজই পঞ্চায়েত আপিসে দেখে এসেছে। মুসাই টুডুর বউ বলছিল, উ কী দেখিস ? কুথাকার কে দোপ্‌দি মেঝান ! তারে ধরা করালে টাকা !

কত টাকা ?

দু—শো !

হাই গ !

বেরিয়ে এসে মুসায়ের বউ বলল। ইবার সাজসাজন্‌ খুব। স—ব লতুন পুলুস !

হাঁ।

তু আসিস না আর।

কেনে ?

মুসাইয়ের বউ চোখ নামিয়ে বলল। টুডু বলে সি সাহেবটো আবার এসেছে। তোরে ধরলে গাঁ-বসত ....

আবার জ্বালাই দিবে।

হঁ। আর দুখীরামের কথাটো....

সাহেব জেনেছে ?

সোমাই আর বধুনা হারামি করল।

তারা কুথা ?

টেন চেপে পলাল।

দোপ্‌দি কী ভেবে নিল। তারপর বলল, ঘর যা। কী হবে জানি না, মোরে ধরলে তুরা মোরে চিনবি না।

তু পলাতে পারিস না ?

নাঃ। কতবার পালাব বল ? ধরলে বা কী করবে বল ? কাঁউটার করে দিবে, দিক।

মুসাইয়ের বউ বলল, মোদের আর কুথা যাবার নাই।

দোপ্‌দি আস্তে বলল, কারও নাম বলব না।

দোপ্‌দি জানে, এতদিনে শুনে শুনে শিখেছে, কেমন করে নির্যাতনের সঙ্গে মুকাবিলা করা যায়। যদি নির্যাতনে নির্যাতনে শরীর ও মন ভেঙে পড়ে তখন দোপ্‌দি নিজের জিভ দাঁতে কেটে ফেলবে। সেই ছেলেটা কেটে ফেলেছিল নিজের জিভ। তাকে কাঁউটার করে দিল। কাঁউটার করে দিলে তোমার হাত থাকে পেছনে বাঁধা। শরীরের প্রতিটি হাড় থাকে চূর্ণ, যৌনাঙ্গে ভীষণ ক্ষত।—কিল্‌ড বাই পোলিস ইন অ্যান এনকাউন্টার...আননোন্‌ মেল.., এজ টুয়েন্টি টু...

এইসব ভাবতে ভাবতে পথ চলতে চলতে দোপ্‌দি শুনল কে তাকে ডাকছে, দোপ্‌দি !

সাড়া দিল না ও। স্বনামে ডাকলে ও সাড়া দেয় না। এখানে ওর নাম উপী মেঝেন। কিন্তু কে ডাকে ?

ওর মনে নিরন্তর সন্দেহের কাঁটা গুটিয়ে থাকে। "দোপ্‌দি" শুনে সন্দেহের ধারাল কাঁটা শজারুর কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে ও মনে মনে চেনা মুখের ফিল্‌ম রোল খুলে চলল, কে ?

সোমরা নয়, সোমরা পলাতক। সোমাই আর বুধনা পলাতক, অন্য কারণে। গোলক নয়, সে বাকুলিতে আছে। এ বাকুলির কেউ ? বাকুলি ছেড়ে বেরোবার পর থেকে তার ও দুলনার নাম হয়েছিল উপী মেঝেন, মাতং মাঝি। এখানে এক মুসাই আর তার বউ ছাড়া আসল নাম কেউ জানে না। বাবু ছেলেদের মধ্যে আগেকার ব্যাচের সবাই জানত না।

সে সময়টা বড় গোলমেলে। দোপ্‌দির ভাবতে গেলে গোলমাল লাগে। বাকুলিতে অপারেশন বাকুলি। সূর্য সাউ বিড্ডিবাবুর সঙ্গে ষড় করে দু বছরে বাড়ির চৌহদ্দিতে দুটো টিউবয়েল বসাল, কুয়ো খুঁড়ল তিনটে। কোথাও জল নেই, বীরভূমে খরা। সূর্য সাউয়ের বাড়িতে অথই জল, কাকের চোখের মতো নির্মল।

কানাল টেক্সো দিয়ে জল লাও, জ্বলে গেল সব।

টেক্সোর জলে চাষ বাড়িয়ে আমার কী লাভ ?

জ্বলে গেল সব।

যাও, যাও। তোমাদের পঞ্চায়েতি বদমাসি আমি মানি না। জল নিয়ে চাষ বাড়বে। আধা ধান আধিয়ার লিবে। উনো ধানে সবাই বশ। তখন ধান বাড়ি দাও, টাকা দাও, যাঃ তোদের তরে ভাল কাজ করে আমার শিক্ষা হয়েছে।

কী ভাল কাজ করলা তুমি ?

জল দিই নাই গ্রামকে ?

ভগুনাল বিয়াইকে দিয়েছ।

তোরা জল পাস না ?

নাঃ। ডোম চাঁড়াল জল পায় না।

এই কথা থেকে ঝগড়া। খরায় মানুষের ধৈর্য্যসহ্য সহজে জ্বলে। গ্রামের সতীশ-যুগল-সেই বাবু ছেলেটা, বুঝি রানা তার নাম, তারা বলল, জোতদার মহাজন কিছু দিবে না, খতম কর।

সূর্য সাউয়ের বাড়ি রাতে ঘেরাও। সূর্য সাউ বন্দুক বের করেছিল। গরুর দড়িতে পাছমোড়া বাঁধা সূর্য। চোখের ডিম সাদাটে, ঘুরছে, কাপড় নষ্ট হচ্ছিল। দুল্‌না বলেছিল, আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারি দেই।

দোপ্‌দি বলেছিল, মোর পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, ওর চোখ আমি উপড়াব।

সূর্য সাউ। তারপর সিউড়ি থেকে টেলিগ্রাফিক মেসেজ। স্পেশাল ট্রেন। আর্মি। জীপ বাকুলি অব্দি আসেনি। মার্চ-মার্চ-মার্চ। নালপরা বুটের নীচে কাঁকরের ক্রাঁচ-ক্রাঁচ-ক্রাঁচ। কর্ডন আপ। মাইকে আদেশ। যুগল মণ্ডল-সতীশ মণ্ডল-রানা অ্যালায়াস-প্রবীর অ্যালায়াস-দীপক-দুল্‌না মাঝি-দোপ্‌দি মেঝেন সারেণ্ডার, সারেণ্ডার। নো সারেণ্ডার সারেণ্ডার। মো—মো—মো ডাউন দি ভিলেজ। খটাখট—খটাখট— বাতাসে কর্ডাইট—খটখট— রাউণ্ড দি ক্লক—খটখট। ফ্রেম থ্রোআর। বাকুলি জ্বলছে। মোর মেন আনড্ উইমেন, চিল্‌ডেরেন...ফায়ার—ফায়ার। ক্লোজ কানাল অ্যাপ্রোচ। ওভার-ওভার-ওভার বাই নাইটফল। দোপ্‌দি আর দুল্‌না বুকে হেঁটে পালিয়েছিল।

বাকুলির পর পল্‌তাকুড়িতে ওরা পৌঁছতে পারত না। ভূপতি আর তপা নিয়ে যায়। তারপর ঠিক হয় দোপ্‌দি ও দুলনা ঝাড়খানি বেল্টের আশে পাশে কাজ করবে। দুল্‌না দোপ্‌দি বুঝিয়েছিল, এই ভাল রে ! এতে আমাদের ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে হবে না ! কে বলতে পারে একদিন জোতদার মহাজন পুলিস সব নিশ্চিহ্ন হবে না ?

কিন্তু আজকে ওকে পিছন থেকে কে ডাকল ?

দোপ্‌দি হাঁটতে থাকল। গ্রাম-প্রান্তর-ঝোপঝাড় ও খোয়াই-পি. ডব্ল্যু. ডির খাম্‌বা—পেছনে ছুটে আসার শব্দ। একজনই আসছে। ঝাড়খানির জঙ্গল এখনও ক্রোশখানেক। এখন ওর মনে হল জঙ্গলে

ঢুকে পড়তে পারলে বাঁচে। ওদের বলতে হবে পুলিশ আবার তার নামে লুটিস দিয়েছে। বলতে হবে সেই হারামি সাহেব আবার এসেছে। হাইড-আউট পালটাতে হবে। তা ছাড়া, সান্দারাতে খেতমজুরদের টাকা দেওয়া নিয়ে যে গণ্ডগোল হয়, তারপর সেখানে লক্ষ্মী বেরা, নারাণ বেরাকে সূর্য সাউ করে দেবার প্ল্যানও নাকচ করতে হবে। সোমাই ও বুধনা সবই জানত। দোপ্‌দির বুকের নীচে ভীষণ বিপদের আর্জেন্সি। ওর এখন মনে হল সোমাই ও বুধনা যে হারামি করবে তাতে সাঁওতাল হয়ে ওর লজ্জার কিছু নেই। দোপ্‌দির রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কালো রক্ত, নির্ভেজাল। চম্পা থেকে বাকুলি, লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ। রক্তে ভেজাল মিশতে পারত, দোপ্‌দির পূর্বপুরুষদের জন্য কত গর্ব হল। তারা কালো কুঁচের কুচিলায় মেয়েদের রক্ত পাহারা দিত। সোমাই ও বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়নডাঙার মার্কিন সৈন্যদের উপহার টুওআর্ডস্‌ রাঢ়ভূমি। নইলে কাক যদি বা কাকের মাংস খায়, সাঁওতাল সাঁওতালকে ধরাতে হারামি করে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। শব্দ ও দোপ্‌দির মাঝে ব্যবধান এক থাকছে। কোঁচড়ে ভাত, কসিতে গোঁজা তামাক পাতা। অরিজিত, মালিনী, শামু, মন্টু কেউ বিড়ি সিগারেট চা খায় না। তামাক পাতা ও চুন। কসিতে কাগজের মোড়ক গোঁজা আলকুলির বীজ থেঁতো। বিছে কামড়ালে অব্যর্থ ওষুধ। কিছুই দেওয়া যাবে না।

দোপ্‌দি বাঁ দিকে ঘুরল। এদিকে ক্যাম্প। দু মাইল দূরে। বনের পথ নয় এটা। কিন্তু পেছনে খোঁচোড় নিয়ে দোপ্‌দি বনে যাবে না।

জান কমস। জা—হান্‌ কসম দুল্‌না, জান ক—সম। কিছুই বলা হবে না।

পায়ের শব্দ বাঁ দিকে ঘুরল। দোপ্‌দি কোমরে হাত দিল। হাতের তেলোয় বাঁকা চাঁদের আশ্বাস। হেঁসোর বাচ্চা। ঝাড়খানির কামাররা গড়ে ভাল। এমন শা—হান দিয়ে দিব উপী, যে শত দুখীরামরে—। দোপ্‌দি ভাগ্যে বাবু হতে যায়নি। বরঞ্চ ওরাই বুঝেছে সব চেয়ে ভাল কাস্তে-হেঁসো-টাঙি-ছুরি। নীরবে কাজ সারে। দূরে ক্যামপের আলো। দোপ্‌দি সেদিকে বা যাচ্ছে কেন ? দাঁড়া তুই, ফিন বাঁক ঘুর্‌য়ে যায়। আঃ—হা ! রাতভোর আমি চক্ষু মুদে ঘুর্‌য়ে বুলতে পারি। জঙ্গলে যাব না, পথ হারাব না। দম ছুটবে না। তুই শালো খোঁচোড়, জাহানের মায়ায় মরিস, তু ঘুরবি ? দম ছুট্যোয়ে তোরে গাঁড়ায় ফেলে নিকাশ করে দিব।

কিছুই বলা হবে না। নতুন ক্যাম্প দেখে এসেছে দোপ্‌দি। বাস স্টেশনে বসে গল্প করে বিড়ি টেনে জেনে এসেছে কত কনভয় পুলিস এল, কটা ওয়্যারলেস ভ্যান। ডিংলো চার, পিঁয়াজ সাত, লঙ্কা পঞ্চাশ সিধা হিসাব। কিছুই জানানো যাবে না। ওরা নিশ্চয় বুঝে নেবে দোপ্‌দি মেঝান কাঁউটার হয়েছে। তখন পলাবে। অরিজিতের গলা, যদি কেউ ধরা পড়ে, টাইম বুঝে অন্যরা হাইড-আউট চেনজ করবে। কমরেড দোপ্‌দি যদি দেরি করে আসে, আমরা এখানে থাকছি না। কোথায় যাচ্ছি, নিশানী থাকছে। কোনও কমরেড নিজের জন্যে অন্যদের ডেসট্রয়েড হতে দেবে না।

অরিজিতের গলা। জলের কুলকুল শব্দ। পাথর তুলে নীচে রাখা কাঠের টুকরোর তীর ফলা-মুখ যেদিকে, সেদিকের হাইড আউটে যাওয়া হয়েছে।

এটা দোপ্‌দির পছন্দ, বোধায়ত্ত। দুল্‌না মরে গেল, কারুকে মেরে মরেনি বাবা। প্রথম থেকে এ সব মাথায় জারায়নি বলে এ-ওর জন্যে হামলাতে গিয়ে কাঁউটার হতিস। এখন অনেক নির্মম নিয়ম, সহজ ও বোধ্য। দোপ্‌দি ফিরল, ভাল, ফিরল না, ব্যাড। চেইনজ হাইড-আউট। নিশানী এমন হবে, অপোজিশন দেখতে পাবে না, দেখলে বুঝবে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। দোপ্‌দি আবার ঘুরল। এই সাড়ে তিন মাইল বিস্তীর্ণ ডাঙা ও খোয়াই জঙ্গলে ঢোকার প্রকৃষ্ট পথ। দোপ্‌দি সে পথ পেছনে রেখে এসেছে। সামনে খানিকটা সমতল। তারপর আবার খোয়াই। এত উঁচুনিচুতে কখনও আর্মি ক্যাম্প ফেলেনি। এদিকটা নির্জন। ভুলভুলাইয়া।

বাঘাগুগগুলি ইটা বেটে, সকল টিবা সকল টিবার মতো দেখতে। ঠিক আছে দোপ্দি ফেউটাকে শোঁসানে নিয়ে তুলবে। সারান্দার পতিতপাবনকে তো শ্মশানকালীর নামে বলি দেওয়া হয়েছিল।

অ্যাপ্রিহেন্ড !

টিবাগুলির একটা উঠে দাঁড়াল। অরেকটা। আরেকটা। প্রৌঢ় সেনানায়ক যুগপৎ আনন্দিত ও নিরাশ। ইফ ইউ ওয়ানট টু ডেস্ট্রয় এনিমি, বিকাম ওয়ান। তিনি তা হয়েছিলেন। ছ বছর আগেও উনি ওদের প্রতিটি মুভ অ্যানটিসিপেট করতে পারতেন, এখনও পারছেন, আনন্দ। সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখার ফলে "ফার্স্ট ব্লাড" পড়ে তিনি তাঁর চিন্তা ও কাজের সমর্থন দেখেছেন।

দোপ্দি তাঁকে ধাপ্পা দিতে পারল না, দুঃখ ও নিরাশা। কারণ দ্বিবিধ। ছ বছর আগে মস্তিষ্ক-কোষে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে লেখা তাঁর প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তিনি প্রমাণ রেখেছেন, তিনি এ সংগ্রামের সমর্থক, দাওয়ালিদের পরিপ্রেক্ষিতে। দোপ্দি দাওয়ালি। ভেটেরান ফাইটার। সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয়। দোপ্দি মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্ডেড হতে চলেছে। ডেস্ট্রয়েড হবে। দুঃখ।

হল্ট !

দোপ্দি থমকে দাঁড়াল। পেছনের পদশব্দ ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল। দোপ্দির বুকের নীচে কানালের বাঁধ ভাঙল। সবনাশ। সূর্য সাহুর ভাই রোতোনী সাহু। সামনের টিবা দুটি এগোল। সোমাই ও বুধনা। ওরা ট্রেনে পালায়নি।

অরিজিতের গলা, যখন জিতছ, তা যেমন জানবে, যখন হারবে, তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।

দোপ্দি এখন দু হাত ছড়িয়ে আকাশপানে মুখ তুলে জঙ্গলের দিকে ঘুরে গিয়ে সর্ব সত্তার শক্তি দিয়ে কুলকুলি দিল। একবার, দু বার, তিনবার। তৃতীয় কুলকুলিতে ঝাড়খানি জঙ্গলের আঁচলের গাছে পাখিগুলো রাতের ঘুম ভেঙে ডানা ঝাপটে ডেকে উঠল। কুলকুলির প্রতিধ্বনি বহুদূর যায়।

সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্ডেড হয়। ওকে নিয়ে ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছতে লাগে একঘন্টা। ঠিক একঘন্টা জেরা চলে। কেউই তার গায়ে হাত দেয় না এবং তাকে ক্যাম্বিসের টুলে বসতে দেওয়া হয়। আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং "ওকে বানিয়ে নিয়ে এসো। ডু দি নিড ফুল" বলে তিনি অন্তর্ধান করেন।

তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কী বিস্ময়ে, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে, ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে সরে যায়। নড়াতে গিয়ে ও বোঝে এখনও ওর দু হাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নীচে চটচটে কী যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে "জল" বলে ওঠে, সেই ভয়ে ও দাঁতে নীচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল ?

ওকে লজ্জা দিয়ে চোখের কোল থেকে জল গড়ায়। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নীচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন ? চার-পাঁচ-ছয়-সাত— তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিল না।

পাশে চোখ ফিরিয়ে ও সাদা কী যেন দেখে। ওরই কাপড়। আর কিছু দেখে না। সহসা দৈবকৃপা আশা করে ও। সম্ভবত ওকে ফেলে গেছে ওরা। শেয়াল ছিঁড়ে খাবে বলে। কিন্তু ওর কানে আসে পায়ের ঘষটানি। ঘাড় ঘোরায় ও। বেয়নেটে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সান্ত্রী ওকে দেখে ও হাসে। চোখ বোজে দ্রৌপদী। অপেক্ষা করতে হয় না বেশিক্ষণ। আবার বানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। চলতে

থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তার ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে ও নামে।

তারপব সকাল হয়।

তারপব দ্রৌপদী মেঝেনকে তাঁবুতে আনা হয় ও খড়ের ওপর ফেলা হয়। গায়ের ওপর কাপড়টা ফেলে দেওয়া হয়।

তারপর ব্রেকফাস্ট, কাগজ পাঠ, রেডিও মেসেজ "দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্‌ডেড' খবর পাঠানো ইত্যাদি হয়ে গেলে দ্রৌপদী মেঝেনকে নিয়ে আসার হুকুম যায়।

কিন্তু এখন হঠাৎ গণ্ডগোল শুরু হয়।

"চল্‌" বলতেই উঠে বসে দ্রৌপদী ও জিজ্ঞাসা করে, কুথাক্‌ যেতে বলছিস ?

বড় সাহেবের তাঁবুতে।

তাঁবু কুথাক্‌ ?

হুই।

দ্রৌপদী লাল চোখ ঘোঁচ করে অদূরে তাঁবু দেখে। বলে, চল্‌, যেছি আমি।

সান্ত্রী জলের ঘটি এগিয়ে দেয়।

দ্রৌপদী উঠে দাঁড়ায়। জলের ঘটি মাটিতে ঢালে উপুড় করে। কাপড়টি দাঁতে ধরে টেনে টেনে ছেঁড়ে। সান্ত্রী একম্বিধ আচরণ দেখে বাউরা হো গিয়া—বলে ছুটে হুকুম আনতে যায়। সে নিয়ে যেতে পারে কয়েদিকে, কিন্তু কয়েদি দুর্বোধ্য আচরণ করলে কী করবে তা সে জানে না। তাই ওপরওলাকে শুধোতে যায়।

জেলে পাগলাঘন্টি পড়লে যেমন হয়, ছুটোছুটি লেগে যায় এবং সেনানায়ক বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা মাথায় হেঁটে তাঁর দিকে আসছে। সন্ত্রস্ত সান্ত্রীরা তার কিছু তফাতে।

এ কী ? বলতে গিয়ে তিনি থেমে যান।

দ্রৌপদী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। উলঙ্গ। উরু ও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত। স্তন দুটি ক্ষতবিক্ষত।

এ কী ? তিনি ধমকাতে যান।

দ্রৌপদী আরও কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে, তুর সাঁধানের মানুষ, দোপ্‌দি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না ?

কাপড় কই ওর, কাপড় ?—

পরছে না সার। ছিঁড়ে ফেলেছে।—

দ্রৌপদীর কালো শরীর আরও কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মতো ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কী হবে, কাপড় ? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে ? মরদ তু ?

চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করবি ? লেঃ কাঁউটার কর্‌ লেঃ কাঁউটার কর্‌— ?

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।

তেওট তালে কনসার্ট

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

এ বছর বর্ষা বড় মনোহর রূপ নিয়ে এসেছে। ইংরাজি মতে স্মার্ট শাওয়ারের দাপটে শহর কলকাতার সামান্য কিছু গাছ ডালে পাতায় শিকড়ে জল শুষে শুষে এখন এই সিমেন্ট নগরীতে রীতিমত ঝলমল করে জেগে উঠেছে। ভাঙা রাস্তা, বিকল বাস, রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর, রেশনে তেল নেই শুনলেও আমাদের এই এলাকায় বৃষ্টি-ভেজা গাছপালার ভেতর মেট্রো স্টেশন স্বপ্নপুরীর মতো আলো জ্বেলে জেগে থাকে সারারাত। মনে হয় জীবনে আশার এখনও কিছু আছে। হয়তো বা সামনেই ভাল কিছু ঘটবে। আরেকটু এগলেই।

এরকম একটা জায়গা থেকে রোজ চাকরি করতে যাই। ফিরে এসে ঘরগেরস্থালি করি। আলো নিভে গেলে পাড়ার ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকি। বৃহস্পতিবার সকালে একজন লোক মাটির সরায় করে নারকেল নাড়ু, মাছের ছাঁচে বসানো খোয়া ক্ষীরের সন্দেশ আর ঘরে তৈরি মিহিদানা বেচতে আসে। কিনি। খাই।

মেট্রো স্টেশন, ট্রাম লাইন থেকে ফার্লং মতো হাঁটলে আমাদের বসতি। সবাই পায়ে হেঁটে গিয়ে অফিস কাছারির গাড়ি ধরে। এখানে পুব দিকে সূর্য ওঠে। পশ্চিমে সূর্যাস্ত হয়। দু-তিনটি সরু রাস্তায় দুধার দিয়ে দোতলা তেতলা সব বাড়ি। দোতলায় রিটায়ার্ড বাড়িওয়ালা। একতলায় ভাড়াটে।

এরকম জায়গায় এবারের বর্ষা বড় মনোহর রূপ নিয়ে এসেছে। কলকাতার বাইরে মাঠে ঘাটে না জানি বর্ষা আরও কত সুন্দর। রাতে সবাই শুয়ে পড়লে বিছানায় বসেই বাইরে অবিরাম বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যায়। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। পড়েই চলেছে। তার ভেতর কখন ঘুম এসে সব ভুলিয়ে দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকালিটির একমাত্র দীঘিতে উৎফুল্ল পাতিহাঁসদের গা মেজে মেজে চান করতে দেখা যায়।

দীঘির ওপারেই শক্তিগড়। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে ওপারের মানুষ এখানে এসে জবরদখল করে। এখন তাদের পাকাবাড়ি। সিমেন্ট করা গোহালে কারও কারও বিলাতি গাই। না হলে ছাদে ব্রয়লার মুরগির পোলট্রি। উঠোনে পাতিহাঁস। তারা চরে বেড়ায় এই সাবেক দীঘিতে। ষাট-সত্তর বছর আগে এই দীঘি কেটেই তার মাটিতে এ জায়গায় এই বসতির পত্তন। দীঘির ওপারে ওসব বাড়ির ছেলেরাও আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে মশমশ করে চাকরি করতে যায়। শক্তিগড় একটা দেওয়া নাম। ওদের আমাদের ডাকঘর একই। সর্বজনীন দুর্গাপুজোও এক। থিয়েটার, পুজোর ভোগ রান্না, ভোগ বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ায় ওসব বাড়ির ছেলেরাই সবার আগে।

আকাশে মেঘ করে এলে মেঘের নীচে ওদের বাড়িগুলো দেখতে পাই। করপোরেশনের আইনের বাইরে বলে ওরা দিব্যি দোতলা, তেতলা, চারতলা হাঁকাচ্ছে। এখানে তেতলা করতেও কালঘাম ছোটে প্ল্যান পাস করাতে।

এক্কেক সময় মনে হয় আমি যেন পাখি হয়ে এই শক্তিগড়, আমাদের বসতি, মেট্রো স্টেশন—সবই আকাশ থেকে ভাসতে ভাসতে দেখতে পাচ্ছি। সারা রাত স্বপ্নময়ী মেট্রো স্টেশনে আলো জ্বলে। গাছগুলো ভিজে ভিজে সজল। জমির কাঠা এক লক্ষ টাকা। ট্রামডিপোর মাঠে বাতিল লাইনের গায়ে কেয়াফুল ফুটে আছে।

জীবনে সেই কবে থেকে পরিশ্রম করা শুরু করেছি। এবার শুয়ে থাকব। বিশ্রাম করব। কত চোখের সামনে দুপুর হয়ে গেল। দুপুর হলো নিশুতি রাত। লাল পাগড়ি দেখলে আমরা বাড়ির ভেতরে চলে আসতাম। কুইট ইণ্ডিয়া। আজাদ হিন্দ। স্বাধীনতা। উদ্বাস্তু-স্রোত। দুর্গন্ধ ঢাকতে শিয়ালদহ

স্টেশনে ব্লিচিং পাউডার। ফাঁকা জায়গা, ডোবা, ভূতের বাড়ি, আমবাগান, বাঁশ বাগান—কিছুই থাকল না। লোক বসে গেল। জবরদখল করে। প্রফুল্ল কলোনি। প্রশান্ত কলোনি। যে যেমন পারে ঢুকে পড়ল। যুক্তফ্রন্ট। ওই তো কারা কেড্‌স্ পায়ে ফিরছে। অ্যাকশন করে ফিরল। এবার দীঘিতে হাত, পা, ভোজালি ধোবে। আরেকটু এগিয়েই কার্তিক মজুমদারের মড়া ফেলার নালা। এই পথটা যেন রামায়ণ মহাভারতে চলে গেছে। জবরদখল বাড়িগুলোর গায়ে গায়ে সব মোটাগুড়ির গাছ। তাদের পাতা ঝিলমিল ছায়ায় সে-রাস্তার প্রায় সবটাই ঢাকা। এককে দিন ওদিকটায় আমি হাঁটতে যাই।

ওই তো সেই পথ দিয়েই হেঁটে আসছেন গণেন মুখোপাধ্যায়। আমি আমার জানলায় বসে দেখতে পাই। দীঘির ওপারে শক্তিগড়ের ভেতর দিয়ে গণেনবাবু হেঁটে আসছেন। মাথায় গাছপালার ছায়া। হাতে কাপড়ের থলে। থলেটা ঝলে পড়েছে। গণেনবাবুর সঙ্গে আমার পবিচিয় কিছকালের। একদিন—শাদা দাড়ি, শাদা চুল এক বৃদ্ধের অতি উৎসাহী মুখ আমার খোলা দরজায় উঁকি দিল। আপনি অমুক ?

হঁ। কেন বলুন তো ?

অনেক রাত পর্যন্ত আপনার টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প জ্বলিয়া তারপর নিভিয়া যায়—

বইপত্র নাড়াচাড়া করি। একটু-আধটু লিখি।

দীঘির ওপারে আমাদের ওইখানে বসিয়া দেখা যায়।

কী ব্যাপারে এসেছেন ?

আমার নাম গণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বেশ তো।

গণেনবাবু কাপড়ের থলেটি খুলে একটি মোটা খাতা বের করতে করতে বললেন, আমি আমাদের গৌরনদী থানার একখানা ইতিহাস লিখিয়াছি। যদি একটু দেখিয়া দেন—

গৌরনদী ? সে তো বরিশালে—

হ্যাঁ। আপনি জানলেন কী করিয়া ? দ্যাশ ছিল ?

আমাদের বাড়ি বানারিপাড়ায় ছিল। কিন্তু কোনদিন যাওয়া হয়নি। মায়ের মুখে জায়গাটার নাম শোনা। সম্ভবত আমার ঠাকুর্দা ওখানে যাত্রা গান গাইতে গিয়েছিলেন।

কী নাম ছিল তাঁর ?

বললাম।

ওরে বাবা ! ও নাম তো সবাই এক ডাকে চিনত। বড়ো গাইয়ে ছিলেন। নট্ট কোম্পানির।

আপনি শুনেছেন তাঁর গান ?

হঁ। বালক বয়সে। তরনীসেন বধ পালায়। আপনি শোনেন নাই ?

নাঃ ! আমার জন্মের আগের বছর তিনি মারা যান। আপনার বয়স কত ?

তিন কম আশি।

মনে মনে হিসেব কবি। আমার চেয়ে একুশ বছরের বড়।

এই ইতিহাস লেখার জন্য আমি পাসপোর্ট করিয়া আটবার গৌরনদী গেছি।

গৌরনদী আপনার খুব প্রিয় জায়গা ?

আমার দেশ। জন্মভূমি। বড় সুন্দর জায়গা।

ভাবি—কী বিপুল বাতুল কাণ্ড। গৌরনদী এখন আর থানা নেই। সম্ভবত উপজিলা। জেলার নাম বাকেরগঞ্জ। যাকে আমরা বলি বরিশাল। গণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলে যাচ্ছিলেন তার স্কুলবাড়ি, দুর্গামণ্ডপ, নদীর ঘাটের কথা। যেসব জায়গা তিনি চল্লিশ বছর আগে ফেলে এসেছেন।

আমাদেরই মূল হল খড়দহ। তার মানে আমার পূর্বপুরুষরা দুশো-আড়াইশো বছর আগে কোনও

রাষ্ট্রবিপ্লব কিংবা কাজের খোঁজে—নয়তো জায়গা জমি পেয়ে খড়দহ থেকে ওপারে চলে যান। আবার চল্লিশ বছর আগে তাঁদের বংশধররা দেশভাগের মতো রাষ্ট্রবিপ্লবে এপারে চলে আসেন। এই আসা-যাওয়াই মানুষের ইতিহাস।

গণেনবাবুর কথা হল : আমরাই গৌরনদীর সাবেক বাসিন্দা। ওরা আসে পরে।

কবে এসেছিল ওরা ?

সাজাহান তখন দিল্লিতে মোগল বাদশা—তখন ওরা প্রথম আসে বরিশালে। আসিয়া ওরা ধীরে ধীরে হইয়া গেল সংখ্যাগুরু। মেজরিটি। সেই সুবাদে আমরা এক লাথি খাইয়া অপমানে লাঞ্ছনায় এপারে চলিয়া আসলাম। এই তো আমাদের ইতিহাস। এ এক অন্যায় ইতিহাস।

ইতিহাসের এই অন্যায় তো চিরকালের। ইতিহাস তো এই রকমই গণেনবাবু। যারা মিলেমিশে থাকে তাদের কিছু হয় না।

অরা তো ইরান তুরানের মানুষ। গৌরনদী ওদের হয় কী করিয়া ?

বুঝলাম, গণেন্দ্রনাথের কাছে ইতিহাস অতি সরল বস্তু। কারও কাছে শোনা কথার ওপর নির্ভর করে ওর সব সিদ্ধান্ত তৈরি হয়েছে। জানতে চাইলাম, কতদূর পড়াশুনা করেছেন ?

ম্যাট্রিক ফেল করিয়া কলিকাতায় বীমার কাজ করতে আসি। শেষে বরিশাল অফিসে পোস্টিং পাই।

বললাম, ওরা ইরান তুরানের মানুষ নয়। আমাদের সমাজপতিদের অত্যাচারে অপমানে জেরবার হয়ে আমাদের অনেকই ওই ধর্ম নেয়। তারাই শেষে গত একশো বছরে মেজরিটি হয়ে উঠেছে।

সেদিন আর গণেন্দ্রনাথের গৌরনদী থানার ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি দেখা হল না। তিনি মাঝে-মধ্যে আসেন। খবরের কাগজে পড়ি—সব রাজনৈতিক নেতা—ধর্মের আচার্যরা—যে যার যুক্তি দিয়ে নিজের কথা বলে যাচ্ছেন। যে যার মঠ, মন্দির, আখড়া, মসজিদ, দরগা, মিশন, গির্জায় এক্তিয়ার অটুট রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পড়ে মনে হয় কেউই ভুল নয়।

অথচ আমি—বা আমরা তার ভেতর পথ পাই না কেন ? একজনও ত্যাগীকে দেখি না—যার পায়ের খড়ম সামনে রেখে অন্ধকার ডাকা যায়। বর্ষণ না হলে পটলের কেজি দশ টাকা। আবার বেশি বর্ষণ হলেও পটলের কেজি সেই দশ টাকা। এ পৃথিবীতে যাব কোথায় ? এই তো আমাদের জীবন।

খুব ছোট বয়সে দুধে ডুবিয়ে পাউরুটি খাওয়ার ইচ্ছে হয়। যৌবনে একজন নারীকে বউ হিসেবে পেয়ে ভালই লাগছিল। কিন্তু এখন কী অবস্থা। সব জিনিস খাওয়া শরীরের পক্ষে নিরাপদ নয়। বেশির ভাগ মানুষ বা জায়গার কোনও বিস্ময় নেই। মানুষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের নীচে আমরা চাপা পড়ে যাচ্ছি। এই সাবেক দীঘি—তার পাতালের পাঁক ও শীত-চান করতে মশগুল কিছু পাতিহাঁসের ইতিহাসও সেই ইতিহাসের নীচে পড়ে চেপ্টে যাচ্ছে।

বাজারের পথে গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হয় সকালে বেড়াতে বেরিয়ে। কিংবা ডাকঘরের লাইনে। অথবা রেশনের দোকানে রেপসিডের টিন হাতে। সব জায়গাতেই তার সঙ্গে আমার কথা হয়।

একদিন বললেন, জমিদারি প্রথা অনেক ভাল ছিল।

বলেন কী ? কত কষ্ট করে—বিরাট ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব্যাপারটা শেকড় সুদ্ধ তোলা গেছে।

ক্ষতিপূরণ আর কী দেওয়া হয়েছে। জমিদারি প্রথা ছিল বলে জমিদার সব দেখতেন। নদীর বাঁধ বাঁধতেন। বড় গাইয়ে পুষতেন। রাস্তা বানাতেন। এখন পি. ডবলু. ডি. কী সব করে। জমিদারের বসানো স্কুলের মতো স্কুল আজকাল হয় ?

এইভাবে কথা বলতে বলতে গণেন্দ্রনাথ আমার কাছে বাল্যবিবাহ সমর্থন করলেন। সমর্থন করলেন, বহুবিবাহ। কুলীনপ্রথা, পণপ্রথা, এমন কী বর্ণাশ্রমও।

বলে কী লোকটা ? বাঙালি দেড়শো বছর ধবে চেষ্টা করে যা কিছু ফেলে আসতে চাইছে—তা সবই যে গণেন্দ্রনাথ আঁকড়ে ধরতে চায।

ভীমরতি আর কাকে বলে ! এড়িয়ে চলি লোকটাকে। বর্ষার পর একেক দিন তীব্র রোদ ওঠে। আমাদের সাবেক দীঘিতে সুধীরবাবু নৌকা ভাসিয়ে মাছ ধবেন। তার ওপরেই দেখাশোনার ভার। কথায় কথায় তার কাছে গণেন্দ্রনাথের কথাটা পাড়ি।

সুধীরবাবু মাছ ধরা ছাড়াও মোষ পোষে। উপরন্তু নিজের বাড়ির উঠোনে বসে হাত পা বুক খুলে ফেলে ফ্রিজ সারায়। শুনে বলল, গণেনবাবু তো ছিটিয়াল। নিজের ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করে নিজ বাড়িতেই পৃথগন্ন। আবার ইতিহাস লেখার জন্য—উপন্যাস লেখার জন্য পকেটের পয়সা খবচা করিয়া প্রায়ই ল্যাগুরুটে বরিশাল যায়। ডেসটিনেশন—গৌবনদী। যাইতে পারেন পাগলার বাড়ি। সময় কাটিয়া যাইবে—

সময় এখনও আমার কাছে দরকারি। পাকে প্রকারে তাকে নানাভাবে আমি ব্যবহার করি। পাড়ায় যারা মড়া পোড়ায়—তাদেব একজন শুনে বলল, ওরে বাবা ! গণেন ? ভয়ঙ্কর লোক। নিজের ছেলের বিরুদ্ধে পুলিশ ডেকেছিল।

একাধারে ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক—আবার ঝগড়াটেও। আমি আকর্ষণ বোধ করতে থাকি। ভাবি—যাই না ঘুরে আসি। মানুষটার সঙ্গে এতবার দেখা হয়। ক' বার নিজের থেকে এসেছে। ইদানীং সুস্বাদু লোকই পাওয়া যায় না। এ তো কটু, কষায়—নানারকমে মেশানো।

আমাদের বসতির সাবেক দীঘির বাঁকটা পেরিয়ে রাস্তাটা যে একদম রামায়ণ মহাভারতের তা আগেই বলেছি। নির্জন। মোটা মোটা গুঁড়ির সব গাছ। সব সময় বাতাসে তাদের ঝাঁকড়া মাথা ঝিলিমিল করে চলেছে। এ রাস্তার লবকুশ বা বালক অভিমন্যুকে খেলাধুলো করতে দেখলেও অবাক হতাম না। তার গা দিয়ে বেরুনো সি. এম. ডি. এ.-র বাঁধানো গলির গায়ে অত নম্বর শক্তিগড় মানে গণেন্দ্রনাথের বাড়িটাকে পেলাম।

লম্বা টেরচা একফালি জমির ওপর বাড়িটা। আধখেঁচড়া তেতলা। ভাঙা রেলিং। শ্যাওলা। গণেন্দ্রনাথ বুকের কাছে লুঙি বেঁধে নিয়ে আমায় দোতলায় নিয়ে বসালেন। অতি অগোছালো একখানা ভাঙা ঘর। খাটের ওপর অগ্নিকন্যা—প্রথম ভাগু—দ্বিতীয় ভাগু লেখা একখানি উপন্যাসের দুখানি মোটা খাতা। একটি দেওয়াল-ঘড়ি চিৎ হয়ে শুয়ে। কিন্তু ঠিক চলছে। পচে যাওয়া দুটি হ্যাণ্ডব্যাগ। বুঝলাম ও-দুটি গণেন্দ্রনাথের বীমা জীবনের। খাতাপত্র। চিঠি। থাক থাক খাতার মলাটে লেখা—গৌরনদী থানার ইতিহাস।

গণেন্দ্রনাথ নিজেই চা নিয়ে এল।

আপনার স্ত্রী কোথায় ?

আজ দশ বৎসর বেড রিডন্। এই চিঠিগুলো পড়ুন।

কাদের চিঠি ?

আমি গৌরনদী গিয়া লোকাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করি। তাদের চিঠি।

তারা লেখে ?

প্রায়ই আমি জবাবও দিয়া থাকি। বিস্কুট খাইবেন ? লইয়া আসি—

আশির কাছাকাছি একজন আগন্তুক ভারতবাসীকে লেখা কয়েকজন মুসলমান কিশোরীর চিঠি। ভাবতেই অবাক লাগে। তাদের জন্মের পনেরো-বিশ বছর আগে যে-দেশ ছেড়ে চলে এসেছে গণেন্দ্রনাথ—যে-দেশে নতুন জম্মানো কয়েকটি কিশোরী যতখানি আবেগ দিয়ে গণেন্দ্রনাথকে জবাব দিয়েছে—আবদার করেছে চিঠিতে—অভিমান—ভালবাসা। আশ্চর্য। হৃদয়ের এ কোন খনির সামনে এসে পড়লাম আমি। গণেন্দ্রনাথ যে জবাব দিয়েছে—তার মুসাবিদাও রয়েছে।

পড়তে পড়তে বুঝতে পারি—এইসব মেয়ের নতুন নতুন নামও দিয়েছে গণেন্দ্রনাথ। একদা গৌরনদী তার দেশ ছিল। সেখানে চল্লিশ বছর পরে প্রায় আশি বছর বয়সে গিয়ে কয়েকটি কিশোরীর মনে তার ভাব পড়েছে।

এর ভেতর একখানা চিঠি গৌরনদী স্কুলের হেডমাস্টারের। তিনি সার্টিফাই করছেন—

প্রধানশিক্ষক ও সম্পাদকের কার্যালয়
গৌরনদী ঈশ্বরচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বহুমুখী)
স্থাপিত — ১৯১৫
ডাকঘর — গৌরনদী, জেলা — বরিশাল

This is to certify that Shree Ganendranath Mukhopadhyaya S/o Late Parbaticharan Mukhopadyaya vill+P. O. Gournadi, P.S/upa–Zila Gournadi in the District of Barisal at present he is residing at 79, Saktigarh colony, Calcutta.

He is collecting data of the Muslim families to write a novel and history of Barisal. He was related with the Muslim families of the district of Barisal. I wish him success in life.

এক টুকরো কাগজে গণেন্দ্রনাথ নিজের পরিচয় পয়ারে লিখেছেন—

গণেন আমার নাম
বরিশাল গৌরনদী ধাম
অতিবলশালী সুন্দর সুঠাম দেহ
দু-চার গ্রামের লোক মল্লযুদ্ধে পারিত না কেহ
পিতা পার্বতী মাতা সুরধনী
পেশা ছিল তালুকদারী

এই নেন—বিস্কুট খান।

বললাম, কী দরকার ছিল। আপনার স্ত্রী শয্যাশায়ী।

সেরিব্রালের পর পক্ষাঘাত। অ্যাতোটুকু হইয়া গেছেন। ছেলেরা দুধের জোগান করিয়া দিচ্ছে।

কখনও ভাবি নাই অ্যাতোটুকু বাড়িতে থাকব। শ্রীহট্ট দেবে না বলিয়া সেখানে গণভোট করল। কিন্তু ভারত ভাগের সময় আমাগো কাউরে জিজ্ঞাসা করে নাই। দার্জিলিঙে থাকতে থাকতে ওরা মেজরিটি বলিয়া জায়গাটা ওদের যদি হয়—তাহলে ইংলণ্ডে যে জেলায় বাঙালিরা সাহেবদের চেয়ে বেশি—সে জেলার নাম ইউক বাঙালিল্যাণ্ড ! কী বলেন ? একদিন দেখবেন দার্জিলিং নেপালের জেলা হইয়া যাইবে। কেউ আটকাইতে পারবে না। আমি প্রতিবাদ করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে একখানা চিঠি দিয়া আসছি। রসিদ দিছে চিঠির। আনন্দবাজার, যুগান্তরেও চিঠি দিছি। আসলে বাঙালিরে মাথা তুইল্যা উঠতে দিবে না। নেহেরু চাইরবার আই. সি. এস. ফেইল করিয়া শেষমেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। নেতাজি একবারে আই. সি. এস. পাশ করিয়া হারাইয়া গেলেন। বাঙালি প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক কুসুমকুমারী দাসী আমাগো গৌরনদীর জমিদার অমিয়বাবুর ভগ্নী। তিনি প্রেমলতা আর উদ্যানলতা নামে দুখানা উপন্যাস লিখিয়া রাখিয়া দেন। ছাপান নাই। আর রবীন্দ্রনাথ নিজের দিদি স্বর্ণকুমারীর নামে চাইরখানা উপন্যাস লিখিয়া ছাপাইয়া দিলেন। অমনি তিনি হইলেন প্রথম ঔপন্যাসিকা ! ভাগ্য ! সবই ভাগ্য !

বললাম, এসব কাগজপত্র দিন। বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়ব।

বেশ তো। পড়েন। উপন্যাস দুই ভাগু দিই ? পরিষ্কার হাতের লেখা—

না। উপন্যাস থাক। এই চিঠিপত্র পড়ি আগে। পড়ি গৌরনদী থানার ইতিহাস।

পড়েন। একটু সংশোধন করিয়া দিবেন। পড়িয়া তো বোঝতেই পারবেন—কালের বিচারে টিকিয়া থাকতে পারব কি না। ভবিষ্যতের মানুষ আমার এইসব লেখা পড়বে কি না—

দেখি।

দয়া করিয়া এই একসারসাইজ বুকখানাও পড়বেন। অসবর্ণ বিবাহ—কুলীনপ্রথা নিয়াও প্রবন্ধ লিখছি।

দিন।

এরপর আনানো অনেক ধরনের মেঘ এল। নানা ধরনের বৃষ্টিও যেন হল। সামনে পুজো। পুজোর সময় আমাদের কোনও দেশ নাই যে যেখানে যাব। সবই সর্বজনীন। পাড়ার পেশাদার সর্বজনীনের দল যেমন পুজো দেবে—তেমন পুজোই আমাদের নিতে হবে। দেশের পুজো বলে আর কিছু নেই আমাদের।

জমা নেওয়া পুকুরে নৌকো ভাসিয়ে সুধীর মাছ ধরে সকাল থেকে। নৌকোয় বসে আমিও সকাল থেকে গণেন্দ্রনাথের কাগজপত্র পড়তে থাকি।

পূজনীয় দাদুমহাশয়,

···· আমাদের চিঠি না পেয়ে এতদিন কেমন লাগল ? হয়তো বা ভেবেছেন বকুল নামের মেয়েটি আপনাকে ভুলেই গেছে। আপনার দেওয়া দুখানি পোস্টকার্ডের একখানাও আমারা পাইনি ! আপনি নাকি মাঘ মাসে আসিবেন। আসিতে ভুল করিবেন না ! আপনার জামাই হয়তো এমাসের শেষের দিকে জাহাজ ভ্রমণে বিভিন্ন দেশে যাবে। তাই এখনও পর্যন্ত আমার তাদের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। তবে ভ্রমণে যাওয়া হলে সেখান থেকে ফিরা হলে পরে আমাকে তাদের বাড়িতে নিবে। তবে না যাওয়া হলে এই জানুয়ারিতেই একটা সিদ্ধান্ত নিবে। জাহাজ কিন্তু ভারতে যাবে। খুঁজে বের করতে পারবেন কি ?

চিঠি পাওয়া মাত্র উত্তর দিয়ে সুখী করবেন। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

স্নেহের বকুল

[বকুলের স্বামী জাহাজে করে বোম্বাই যাচ্ছে। এখনও সে বকুলকে নিজেদের বাড়িতে নেয়নি।]

Village : Ramjankathi

শ্রদ্ধেয় দাদুভাই,

আপনার পত্রখানা কয়েদিন আগে পেয়েছি। কয়েকদিন আগে খুব জ্বর হওয়ায় উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি আমাকে বাংলায় অনার্স পড়তে বলেছেন কিন্তু বাংলায় আমার নম্বর কম।

আপনার দেওয়া নামগুলোই সবগুলো ভাল। তাই আপনি যে-নামেই ডাকেন সে-নামেই আমি খুশি হব। আপনি জানতে চেয়েছেন আমার গায়ের কী রং। আমি কালো। তবে আমার মনের রং কালো নয়! আপনি দেশে আসার সময় আমার জন্য একটা লাল টুকটুকে শাড়ি নিয়ে আসবেন। অনেকদিন ধরে শাড়ি পরার খুব শখ। আমি বর্তমানে পাজামা পরি। ইতি—রীনা।

পূজনীয় দাদুমহাশয়,

আমি H. Sc. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আমি B. A. ক্লাশে ভর্তি হতে চাই। আপনি আমাকে ওখানে বসে পড়তে বলেছেন। কিন্তু তা কি সম্ভব ? আমি যে নারী। তাছাড়া এখন পিতৃগৃহ হতে অপর গৃহে পদার্পণ করেছি। আপনি জানতে চেয়েছেন—আমার স্বামী আমাকে কোনও তহবিল করে দিয়েছেন কি ? দাদু সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু পারেন ততটুকু দিতে চেষ্টা করেন বা দেন। তবে আপনি তাকে বললে আরও ভাল হবে। ঈদের সময় আপনার আসার কথা ছিল। এবং তাহারও

আসার কথা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কেহই এলেন না। আমাকে ফাঁকি দিয়াছেন। যাক আপনার জামাইবাবু ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে একমাসের ছুটিতে দেশের বাড়িতে আসবে। ওই সময় আপনিও আসবেন। আপনার নিমন্ত্রণ রইল। ওই সময় আমি আপনাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাব।

স্মৃতির দুয়ারে দাঁড়িয়ে যদি মনে পড়ে মোর নাম
ক্ষণিকের তরে—দিবেন দাদুগো মোর লেখাটুকুর দাম।

আমাদের জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করিবেন।

তসীবা রশীদ
(বকুল)

দাদুভাই,

কলকাতা আপনার কিরূপ লাগে ? আমাকে কলকাতা নিবেন কি না জানাবেন। দেশে কবে আসিবেন তাহা জানাবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আমার ডাক নাম রীনা। খাতায় লিখি—আসফিয়া সুলতানা। আমি এ বছর H. Sc. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছি।

আপনারই অপরিচিতা দাদী
REENA

পূজনীয় দাদু,

আপনি খুব ভালবাসেন এবং আমরাও বাসি। তাই ফুলপাতা এঁকে এই কাগজটুকুতে আপনাকে লিখছি।

যখন আবার ফিরে আসবেন এই সবুজ শ্যামল বাংলায় তখন আমার জন্য একটা সুন্দর শাড়ি এবং সেন্ট ও গলায় পরার জন্য একটা চেইন আনিবেন। মনে থাকবে তো দাদু ? সুদূর ভারতে বসে আমাদের কথা স্মরণ করেছেন। এজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আবার বলি আমার জিনিসগুলো অবশ্যই আনিবেন।

বকুল

মোসাম্মৎ আফ্রোজা সুলতানা—কল্পনা
রমজানকাঠি, ভরসাকাঠি,
বরিশাল।

শ্রদ্ধেয় দাদুভাই,

শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম ও কদমবুসি নিবেন। পরম করুণাময় আল্লাহপালের অশেষ রহমতে ভাল আছেন। নিজের দাদুকে দেখি নাই। আপনাকে দেখিয়া মনে হল বৃষ্টি যেমন মৃত জমিনকে সতেজ ও সরস করে—আপনিও সেইমতো আমাকে করিয়াছেন।

আপনার সঙ্গে পরিচয়ের পর ভাবতাম—কেনই বা দেখা হল ? আপনার মতো মানুষের সঙ্গে কখনও পরিচয় হবে ভাবিনি।

আপনি জানতে চেয়েছেন আমার জন্য কী কী জিনিস আনিলে আমি খুব খুশি হব। তাই নয় কি ? তাহলে এবার শুনুন—

(১) আমার মায়ের জন্যে একটি শাদা শাড়ি। (২) ভাল দেখে তিনটা সেন্ট (৩) আমার জন্য একটা ভ্যানিটি ব্যাগ—এবং একটি শাড়ি—যা পরলে আমায় খুব মানাবে—আমি এই প্রথম শাড়ি পরব (৪) বিউটি বক্স হবে ২টা (৫) রাইটিং প্যাড (৬) বিভিন্ন রংয়ের ঝর্না লাচি সূতা দুই ডজন (৭) গলার মালা, কানের বালা হাতের চুড়ি (৮) লিপস্টিক গোলাপি ও লাল রঙের—দুইটা কারণ, আমার ছোট বোন আছে। শীতের জন্য স্নো, ক্রীম যেটা ভাল মনে করেন—ইতি

শেফালি

এই শেফালিই তার দাদুকে লিখেছে

আপনার ওখানে কি মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবার আছে ? যাদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা হতে পারে। যে পরিবেশে আমাকে মানাবে। তাহলে হয়তো আমার জীবন আপনার সহায়তায় প্রস্ফুটিত হতে পারে। বুঝলেন তো ? তাছাড়া আত্মীয় না হলে তো আর ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার রাগ করবেন না আপনিও কিন্তু আত্মীয়। সবাই চায় আমার বিবাহ হউক। কিন্তু আমি চাই আমার বিবাহ যখন অতি নিকটে হবেই না—তখন বাংলাদেশের বাহিরে হউক যেখানে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। এবং যেখানে বসে বিবাহের পরেও পড়াশুনা করতে পারি। আমার মনটা এখন দুঃখে ব্যথায় ভেঙে চুরমার হতে চলেছে। তাই দিশেহারা। কারণ, আজ আমার সকল আশা মিছে হল—যেহেতু আমার পড়াশুনা বন্ধ।

কদিন বাদেই শেফালির চিঠি—

দাদু, আপনাকে আগের চিঠিতে যাহা লিখেছি তাহা যেন এরা কেহ না বুঝতে পারে যে আমি আপনাকে বলেছি। আমার ঠিকানা—পিতা মৃত আবদুর রহিম হাওলাদার, প্রযত্নে, করিম আমেদ, বমজান কাঠি, ভরসাকাঠি, গৌরনদী, বরিশাল, বাংলাদেশ। করিম আমেদ আমার মেজোভাই।

বলতেও লজ্জা লাগে, তবু মায়ের আদেশ—যদি সম্ভব মনে করেন—তবে মায়ের জন্য ১টা লোহার কড়াই নিয়ে আসবেন।

আমার জন্য দোয়া করবেন। আর ওই ব্যাপারে আপনি নিজে বুঝবেন এবং আমাকে ইঙ্গিতস্বরূপ হ্যাঁ বা না জানাতে ভুল করবেন না।

[তার মানে আপনাদের ওখানে কি মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবার আছে ? . . . . যে পরিবেশে আমাকে মানাবে।]

আবার শেফালির চিঠি—

. . . . না জানি দাদুর অসুখ হলো কি ? ভাল থাকুন—সুস্থ থাকুন—এই দোয়া করি খোদার কাছে। প্রত্যহ দিন ভাবতে থাকি—আগামী দিন অবশ্যই দাদুর দেখা পাব। কিন্তু কই ? দাদু কি আসবেনই না ? এভাবে ভাবতে ভাবতে আমি কি একটা ভাবুক হয়ে যাব ? জবাব দিন। চুপ করে আছেন কেন ?

আবার শেফালি—

আপনি যে উপদেশগুলো দিয়েছেন—ওটা আমিও বুঝি বা ওভাবে আমিও চিন্তা করি। কিন্তু কী যে করব তাই ভেবে দিশেহারা, ভেবেছিলাম ওকে এড়ায়ে চলা যায় কি না—যে কারণে প্রথম পত্রে আপনাকে ওভাবে লিখেছিলাম। ভাবছিলাম অনেক দূরে চলে যাব। কিন্তু দেখা যায় কোনও মতেই উনি আমাকে ছাড়ছেন না। এমতাবস্থায় আমি এখন সব দিকের চাপের মধ্যে কোনরকমে বেঁচে আছি। আমি এখন কোন্ পথ ধরব, কী নিয়ে বাঁচব কিছুই বুঝি না। তবে সবচেয়ে দুঃখ লাগে পড়াশুনার জন্য। আবার একথাও সত্য, ওকে ছাড়লে আমি অন্যত্র গিয়ে সুখী হতে পারব কি না সন্দেহ। এখন সবচেয়ে ভাল হত যদি আমার মৃত্যু হত বা হয়। তবে ওই লোক চায় B.Sc. পাশ করিবে, ভাল একটা চাকরি নিবে, তারপর বিবাহের ব্যবস্থা। কিন্তু আমার এরা আমাকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত। যে কারণে এমন ঘোলাটে অবস্থা। এখন আমি কী যে করিতে পারি কিছুই বুঝি না।

ওই লোকটির ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমা কত বয়সে মারা গেছেন তাহা আমার অজানা।

এবং ওনারা প্রকৃত ভূখণ্ডের লোক। লোকটি স্বাস্থ্যবান নয়। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। আমার অভিভাবকগণ অমত প্রকাশ করেন। শুধু পাশাপাশি গ্রাম বা খুবই নিকটে, তাই বুঝলেন ? দাদু

আপনার উপর স্থির বিশ্বাস আছে এবং শেষ আত্মবিশ্বাস রেখে বা করে আপনার উপর রেখে দিলাম। অত্র জগতের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন না অনুরোধ গোটা বিশ্বের। খোদা হাফেজ।

আপনার স্নেহের রানী
শেফালি

আবার—

আপনাকে আমি অনুরোধ করে বলি—আপনাকে যে আমার গোপন কথাগুলো বলেছি তাহা যেন আমার এরা কোনদিন না বুঝতে পারে। সেইভাবে আমাকে লিখবেন। কারণ, অনেকসময় আপনার পত্র এলে সবাই দেখতে চায়—তখন আমার বিপদ ছাড়া আর কী ? অথবা গোপন কথা ভিন্ন একটা কাগজে লিখবেন যেটা আমি গোপন রাখতে পারি। বুঝলেন তো ?

আর, ভাল কথা—ওই লোকের লেখা আপনাকে লেখা একটা পত্র পাঠালাম।

ফের শুনলাম—আমার জন্য একটা শাড়ি (লাল) কিনেছেন। কী রঙের পাড় ?

নাতনী শেফালি

আবারও—

আমি এখন আর পিত্রালয়ে নেই। সুতরাং সেখানে আর কোনদিন আমাকে পত্র লিখবেন না। দাদু, মন মানুষিকতা খুব একটা ভাল না। পত্র পাওয়া মাত্র এই ঠিকানায় লিখিবেন—সময় হলে ২/৩টা সুন্দর শাড়ি আনবেন।

ঠিকানা—

পোঃ বাবুল
এম হক রোব্যু
৭/৩ কমলাপুর, ঢাকা

বাবুলের চিঠি—

প্রণামান্তে আমি এক অভাগা পাপী আপনার দ্বারে হাজির। জানি না কে আপনি। অনেক গল্প শুনেছি আপনার—মনে হয় আপনি একজন জ্ঞানী—অন্যদিকে একজন কবি বা সাহিত্যিকও বটে। . . . . আপনি যাকে এত আদর স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মানুষ হওয়ার বাণী শুনাচ্ছেন—আপনার সেই ফুলের রানী শেফালিকে আমি ভালবাসি। পরীক্ষা আগস্ট মাসে। দোয়া করবেন। এক সম্ভাবনাময় জীবন নিয়ে খোদা প্রদত্ত পথে ধাবমান।

আবার শেফালি—

পড়া বন্ধ থাকার কারণ হল এই—আমি একজনকে ভালবাসি বা তার প্রেমে পড়েছি। দাদু, কথাগুলো লিখতে বড্ড লজ্জা লাগছে। তবুও লজ্জা করে বসে থাকলে চলবে না। দাদুর সহায় চাই।

প্রথম যখন প্রেম শুরু তখনই আমার মেজো ভাইকে নদীর পাড়ে নিয়ে সব কথা খুলে বলেছি। দাদা আশ্বাস দিয়ে বলেছে—হবে—তবে সময় সাপেক্ষ। তার কথার উপর নির্ভর করে আমি ওই লোকের সঙ্গে কঠিন শপথ করি। সে শপথের জ্বালা ভোগ করিতে হইবে কেয়ামত পর্যন্ত—যদি তাকে বিয়ে না করি। ওই লোকটির পিতা ব্রাহ্মণদিয়া স্কুলের বর্তমান হেডমাস্টার মৌলভী ছাদাম হাওলাদার। সে সংসারের বড় ছেলে। নাম—আবদুল লাতিম (বাবুল) আগামীতে B.Sc. পরীক্ষা দিবে। ওই লোককে না পেলে আমার পড়াশুনা আর হবে না।

দাদু—আমার একটা পাউডারের প্রয়োজন। কড়াইটি বলিয়া দিলাম—মায়ের তরকারি রান্নার জন্য।

চিঠিগুলো পড়ে অবাক হই। গৌরনদীর কয়েকজন কিশোরীর কাছে গণেন্দ্রনাথ নামে এই ৭৭

বছর বৃদ্ধ সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। কলকাতার কলোনির বাসিন্দা—যে কিনা পাসপোর্ট ভিসা করে বছরে বছরে, নিজ ব্যয়ে গৌরনদী যায়—দরিদ্র—তার কাছেই গৌরনদীর এই কিশোরীদের সব বায়না।

বাবুলকে গণেন্দ্রনাথের লেখা চিঠির নকল থেকে খানিকটা—

আমার শেফালি রানীকে আমি স্বয়ং যেমন ভালবাসি তুমিও ভালবাস। তাহলে শেফালিরানী ডবল ভাগ্যবতী। রানী তো এখন দোটানায় পড়ে গেল। একদিকে আমি—অন্য দিকে তুমি।

. . . তাই বলি বাবুল—দেবীকে কোনসময় মনঃকষ্ট এবং মনঃব্যথা দিবে না। দেখেন ভাই, আমি উপন্যাস ও কবিতা লিখি। তাই নাতি ও নাতঘরণীকে নিযে একটু রসিকতা করিলাম। যত্নে রাখিও—অতি যত্নে রাখিতে পারিলে ওর কাছ হতে সম্ভবত ফল লাভ করিবে।

রামজানকাঠির এইসব গ্রামের মালিক আমার পিতা ̊পার্বতীচরণ ছিলেন। শেফালি রানীর দাদু মরহুম আপ্তাজদ্দি হাওলাদার আমাদের প্রজা ও কর্মচারী ছিলেন। আমার ৯/১০ বৎসর বয়স হইতে ঘটনাচক্রে আমরা দুইজনে বন্ধুতে পরিণত হইয়াছিলাম। আপ্তাজদ্দি খুব সৎ ও দয়াময় বিশিষ্ট লোক ছিলেন।

শেফালিকে কবি গণেন্দ্রনাথ লিখছেন—

এখানে থাকিলে তোমাকে সাজাতাম কিরূপ, শুনো ! একখানি মানানসই আড়ং ধোলাই নীলবসন শাড়ি পবায়ে ঝলমলে তোমার মেলায়েম চুলগুলি দুটি বেনুনি বেঁধে তাহার অগ্রভাগে দুটি লাল জবাফুল বেঁধে দিয়ে স্কন্ধের দুপাশ দিয়ে বক্ষোপরি ঝুলিয়ে দিতাম। ভ্রূলতা দুটি অঙ্কন করে নেত্রকোণে সুরমারেখা, ওষ্ঠদ্বয়ে বিম্বফলের রং—কর্ণে স্বর্গের ঝুমকালতা দুলিবে।

. . . .যাই হোক উপরোক্তভাবে তোমাকে সাজিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে নয়ন ভরিয়া দেখি এই তো আমার বাসনা। এমন দিন কি হবে ?

তোমাকে এত ভাল লেগেছে কাবণ, মনের গভীর তলদেশের ভালবাসার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম অনুভূতি তুমি অনুভব করিতে সক্ষম।—যাহা বহু বহু জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মেয়েদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তোমার অন্তরের সৌন্দর্য, মাধুর্য, লাবণ্যে আমি মুগ্ধ, মোহিত।

তাই মনে দুঃখ আমার যৌবনকালে তোমার সান্নিধ্য লাভ করতে পারিলাম না।

[গণেন্দ্রনাথের যৌবনে তো শেফালি এই পৃথিবীতে আসেনি। তার মানে শেফালিও যদি সেই যৌবনে আসত। গণেন্দ্রনাথের স্ত্রী আজ বহুদিন বেড্ রিডন।]

তোমার কাছে পত্র লিখে বেশ আনন্দ উপভোগ করি—যে আনন্দ অপরের কাছ হতে পাওয়া যায় না।

আরেকটি আমার কথা বা উপদেশ রক্ষা করিতে হইবে। যাহাতে ২/১ বৎসরের মধ্যে মা না হও। এত অল্প বয়সে বুড়ো হতে যেও না। সাবধান। সতর্ক মতো চলিবে। আমার যখন ২০ বৎসর বয়স—আমার স্ত্রীর ১৩ বৎসর বয়স, তখন বিবাহ হইয়াছে। আমার স্ত্রী ২০/২১ বৎসর বয়সে প্রথম সন্তান লাভ করেছে। আমরাও সাবধান সতর্কমতো চলিতাম। আমি তোমার সহিত দেখা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

গণেন্দ্রনাথকে বাড়ি আর জানলা দিয়ে তাকিয়ে দীঘির ওপারেই বৃষ্টি-ভেজা শক্তিগড় দেখতে পাই। আধখেঁচড়া কয়েকটা বাড়ি। চল্লিশ বছরে কিছুটা চেহারা পেয়েছে। ওখানে গণেন্দ্রনাথ থাকে। প্রায় আশির কিনারায় পৌঁছে তার প্রাণে এখনও এত আনন্দ। মৃত্যুচিন্তার ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। শেফালিকে চিঠি লেখার সময় যেন-বা তরুণ যুবক । অথচ সে শেফালিরই মরহুম ঠাকুর্দা আপ্তাজদ্দি হাওলাদারের বাল্যবন্ধু।

চিঠিগুলো গণেন্দ্রনাথের বড় যত্নের। ফেরত দিতে গেলাম। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ যেন গণেন্দ্রনাথ কিছু উদ্‌ভ্রান্ত। চোখের নীচেটা ফোলা। বেশ ক' দিন দাড়ি কামাননি। সুঠাম কাঠামো থেকে মাংস ভীষণভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। বললাম, ঘুম হয়নি নাকি ?

ঘুম কোথার থিকা হবে। ছেলেদের বললাম—লোহা, বালি, ইট, স্টোন-চিপ সব কিনিয়া রাখছি। তোমরা শুধু সিমেন্টটা কিনে তেতলাটা করো। তা বড়জন বলে—পারবে না।

চাকরি করে তো বড়জন।

হ। ১৫/১৬ বছর চাকরি। দুই হাজার টাকার বেশি মাহিনা পায়। আবার বলে—তুমি বিদায় হও।

কে ?

মানে আমাকে বিদায় হতে বলে। তেতলা করলে ভাড়া দিলে টাকা আসত। আমার কিসে চলে বলেন ?

কিসে চলে ?

এক তলায় একখানা ঘর ভাড়া দিয়ে তিনশো টাকা আসে মাসে। তার দেড়শো টাকাই যায় ইলেকট্রিক বিলে। দেড়শো টাকায় আমার চলে ? শেষ বয়সে অন্নকষ্টে পড়ব ভাবি নাই।

ছেলেরা তো দেখে।

মেজোবউমা ভাল। তাদের সঙ্গে খাই।

মেজোবউমাটি ভাল তাহলে ?

হ। বরিশালিয়া গার্ল। স্বঘরে বিবাহ হইছে। বড়টি তো অসবর্ণ বিবাহ। অসবর্ণ বিবাহে কখনও সুখশান্তি আসে না।

অবাক হই। যে লোক মুসলমান কিশোরীকে দাদু হিসাবে মনে মনে নায়িকা ভাবে সে কী করে কুলিন, অসবর্ণ এসব নিয়ে মাথা ঘামায়।

রামায়ণ-মহাভারতের রাস্তা দিয়েই বাড়ি ফিরি। সাবেক দীঘিটা জলে টইটুম্বুর। পাড়ের পাতিঘাস বর্ষা খেয়ে খেয়ে সতেজ, নধর। একটা বাতিল জার্সি গাই তিনরাস্তার মোড়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে বসে। চোখে তার স্বদেশকে মনে পড়ার বৃথা আয়োজন। রিক্সা সাইকেল-ওয়ালাদের ঘাঁটিতে কী এক বারের পুজোর মাইক বসেছে। তাতে বিদেশি সুরে দিশি গান। আমি কিছুই মেলাতে পারি না। বাড়ি ফিরে এসে বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে ওর খাতাখানা খুলি।

অসবর্ণ বিবাহ এবং পরবর্তী ফলাফল

নিম্নবর্ণের ছেলেগণ মনে করে যে উচ্চবর্ণের মেয়ে বিবাহ করিলে ঐ স্ত্রীর গর্ভের সন্তানদের মেধা উচ্চবর্ণের ছেলেমেয়েদের ন্যায় হইবে। তাই যদি হয় তবে বাখরগঞ্জের অতি উর্বর জমিতে আই আর ধান্যের বীজ বপন করিলে কি বালাম উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপন্ন হইবে ?

নিম্নবর্ণের মেয়ে যদি উচ্চবর্ণের ছেলে বিবাহ করে তাহা হইলে অপুষ্ট বিকৃত মেধার সন্তান লাভ করিবে। যেমন অনুর্বর জমিতে যদি উৎকৃষ্ট ধান্যের বীজ বপন করা হয় তবে পরিশেষে দেখা যায় অপুষ্ট অসারমুক্ত জমিতে নিম্নমানের নিকৃষ্ট ধরনের চিটা ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত ধান ঢেঁকিতে ভানিলে চাউল গুঁড়া গুঁড়া হইয়া খুদে পরিণত হয়।

বহুলোক আছেন তাহারা কৌলীন্যপ্রথাকে নিন্দা করেন। আবার জমিদারি প্রথাকেও নিন্দা করিয়া থাকেন। যাহারা নিন্দা করেন তাহাদের বংশের সন্তান এবং জমিদার ও কুলীনদের বংশের সন্তানদের মেধা তুলনা করিয়া দেখিবেন।

এই পর্যন্ত পড়ে বুঝলাম, এই গণেন্দ্রনাথকে সংশোধন করা দুঃসাধ্য। আমাদের দেশে বড় বড় সংস্কারের সামনে ছিলেন বহু বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়।

তাঁরাই গণেন্দ্রনাথের এই বাতিকগ্রস্ত চিন্তাভাবনা নস্যাৎ করে গেছেন।

গণেন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবার সময় তার অনুরোধ ছিল—আমি যেন লেখাগুলি ঘষে মেজে দিই। তিনি বলেছিলেন—আজকাল এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার লোকও কমিয়া গিয়াছে।

তার মানে এই দুনিয়ায় গণেন্দ্রনাথ-জাতীয় মানুষ আর বিশেষ, অবশিষ্ট নেই। যাও বা দু-চারজন ছিল—তারা মরে হেজে গিয়েছে।

আরেক জায়গায় গণেন্দ্রনাথ লিখেছে—বঙ্গদেশ হইতে ইংরেজকে বিতাড়নের প্রথম বীজ বপন করেন মহারাজ নন্দকুমার নিজে ফাঁসিকাষ্ঠে শহিদ হইয়া।

সনাতন ধর্ম শিরোনাম দিয়ে গণেন্দ্রনাথ লিখেছে—

মেয়েদের পুষ্পবতী হওয়ার পূর্বে বিবাহ হওয়ার রীতি, কারণ, প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণের সময় সন্তানের জননীর মৃত্যুর ভয় থাকে না। এবং মেয়েদেরও অসৎ পথে পা দেবার সুযোগ হয় না। স্ব-সম্প্রদায়ের ও সম-পর্যায়ের সহিত বিবাহাদি কর্ম সুসম্পন্ন হওয়ার রীতি। লাইফ ইনসিওরেন্স-এর নিয়ম বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণের সময় সন্তানের মাতার মৃত্যু হইলে দাবিকৃত সমুদয় টাকা পাইবেন। ইহাও বিজ্ঞানসম্মত। আজকালের জমানায় বালিকা থাকাকালীন অবস্থায় বিবাহ হয় না। মহিলা হইলে বিবাহ হয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির শুরু এইভাবে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম বাং ১২৬৮।

আরেক জায়গায় লেখা—ধনাৎ বিদ্যা গরীয়সী।

'হিন্দি ভাষার প্রভাব ও জৌলাস' প্রবন্ধের শুরুতে লেখা—হিন্দি কোনও ভাষা নহে। কারণ, জাতি হইতে ভাষার উৎপত্তি। বাঙালি, তামিল, গুজরাটি ইত্যাদি সবাইকে লইয়াই যে হিন্দুস্থান। হিন্দি নামক বর্ণমালা নাই। মাতৃভূমির নাম নাই।

নারীজাতি প্রবন্ধেব এক জায়গায় গণেন্দ্রনাথ লিখছেন—

এই সংসার কাননের বৃক্ষ পুরুষ। নারীগণ পুষ্প। সৌন্দর্যের প্রকাশক।

পড়তে পড়তে মনে হয় বুঝি বা গম্ভীর কোনও সত্য জানলাম। কিন্তু তারপরই দেখি—দেশবিভাগ, দারিদ্র, অজ্ঞতাজনিত কারণে একজন মানুষের লেখায় যৎসামান্য যা ঝিলিক থাকতে পারে—শুধু তাই আছে গণেন্দ্রনাথের লেখায়। বাকি সবটাই কু-যুক্তি। অযৌক্তিক কলোনি মার্কা বাঙালিয়ানা—যার কোনও ভিত্তি নেই—তাতে লেখাগুলি ভরা। যেমন : হিন্দিতে নাকি তেমন সাহিত্য নেই। গণেন্দ্রনাথের খবর রাখার কথাও নয়। নেহরু নাকি এক ভোটের গরিষ্ঠতায় হিন্দিভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন—ইত্যাদি। কথায় কথায় গণেন্দ্রনাথ বলেন, যার পয়সা আছে—সে একাধিক বিয়ে করুক। আমাদের সমাজে মেয়েরা এভাবে উদ্ধার হবে। যার অঢেল পয়সা তার পক্ষে বিবাহ কোনও দোষের নয়। বাল্যবিবাহ অতি উপাদেয়। জমিদার আর কুলীনরা ছিল বলেই মহা-মহাপুরুষ এদেশে জন্মেছে। আর পণপ্রথা তো খুবই ভাল। প্রথাটা আছে বলেই তো কুরূপারাও বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারছে।

বললাম, যাদের পণ দেবার টাকা নেই তাদের কী হবে ?

গণেন্দ্রনাথ বলল, যাদের আছে—তাঁরা তো বিয়ে হয়ে তরে যাচ্ছে।

তাহলে নারীর কোনও সম্মান নেই।

নারীর বড় সম্মান বিয়ে এবং তারপর সন্তান ধারণে।

গণেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণের শরীরে বিশেষ কাঠামো দেখতে পান। তার রক্ত এবং মেধাও নাকি আলাদা। আর এই রক্ত ও মেধাকে অসবর্ণ বিয়ের আঁচ থেকে বাঁচিয়ে পবিত্র রাখতে হবে। এটাই তাঁর সনাতন ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের বাবা তার কাছে পিং দেবেন্দ্রনাথ।

অথচ এই মানুষই আবার গৌরনদীর স্কুলের কয়েকটি কিশোরীর কাছে বড় আপনার দাদু।

ব্রাহ্মণ, অ্যাংলো স্যাকসন আর হিটলারের ভাবনা একটা ব্যাপারে একই খাতে চলেছে। তা হল: আমাদের খাঁটি রক্ত। এ রক্ত অন্য রক্তের চেয়ে আলাদা। এ রক্তকে আলাদা করে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বাইরের রক্তের সঙ্গে বিয়ে-শাদি চলবে না। আমাদের অস্থি মজ্জা চেহারা সুরৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যের চেয়ে ভিন্ন।

এদের ইংরেজিতে বলা হয় শুয়োরের বাচ্চা। বাংলায় বলা হয় জাতবিরোধী। শুদ্ধাচারী। বর্ণাশ্রমী। গণেন্দ্রনাথ এদেরই একজন।

তার কাছে সারাটা উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন সর্বৈব মিথ্যা। জাতিগর্বে টইটুম্বুর গণেন্দ্রনাথ সেই দেশের স্বপ্ন দেখে—যা কিনা চল্লিশ বছর হল আর নেই। আমাদের বসতি আর শক্তিগড়ের মাঝামাঝি সাবেক দীঘি বর্ষার জলে কানায় কানায়। নানারকম পাখি এসে বসে পাড়ের ডুমুর গাছে। জল ওঠায় সাপও উঠে আসে। গৃহস্থ বাড়ি থেকে ডিমভাজা আর খিচুড়ির গন্ধ।

ভিজে রাস্তার পাড়ে গণেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে। দীঘির জলে চোখ। চওড়া কাঁধ। গায়ের পাঞ্জাবি-ধুতি বেশ ময়লা। গালে-মাথায় শাদা দাড়ি আর চুল ভুল ভুল করছে। পায়ে রবারের কাটা চটি। টিকোলো নাক। চোখ পুষ্টির অভাবে কোটরে।

কী অত দ্যাখেন মুখুজ্যামশায় ?

একটা শৌল মাছ।

এতদূর থেকে দেখতে পান ? জলের ভেতর ?

নবান্নের সময় দেশে শৌল ধরতাম। অরা পিঠের পাখনা উজাইয়া জল কাটে। জলের ঢেউ দেখিয়া বোঝতে পারি। আমাগো বরিশাল জিলা বড় সুন্দর জায়গা। শিকারপুরে তারাপীঠ ! সেখানে তৈলঙ্গ স্বামী গেছিলেন। জেলার একদিকে মেঘনা—আরেকদিকে ধলেশ্বর নদী। অন্য বর্ডার ফরিদপুর আর বঙ্গোপসাগর। কীর্তনখোলার তীরে বরিশাল।

আপনার গৌরনদী কতদূর ?

আর বিশ-বাইশ মাইল আগে। এখন যশোর থিকা রাত আটটায় বাসে ওঠেন—আর ভোররাতে গিয়া গৌরনদী পৌঁছাইবেন। মাঝে দুইটি খেয়া পড়বে—

বাস থেকে নেমে যেতে হয় ?

নাঃ ! বাস সমেত বড় স্টিমার নদী পারাপার করে। তা সে গৌরনদী বন্দর তো আর নাই। নদী মজিয়া গেছে।

আপনি গৌরনদী স্কুলের শেফালি, রীনা ওদের শাড়ি পাঠাবেন লিখেছিলেন—

আপনি জানলেন কী করিয়া ?

আপনারই দেওয়া চিঠি-খাতাপত্র পড়ে।

পাঠাইছিলাম। দেশের একটি জাতি ছেলের হাত দিয়া। ওখানেই থাকে। সে এত দুষ্টু—কিছুই দেয়নি মেয়েগুলোনরে। আমার এত মনোকষ্ট হইল। সারা জিলায় অত দুষ্টু আর নাই।

ছেলেটি তো ব্রাহ্মণ।

আমার জাতি ভাইপো।

তাহলে দেখুন—আপনি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ করেছেন সারা খাতায়—অথচ আপনারই পরিচিত ব্রাহ্মণ কেমন দেখুন।

দেবতাদের মধ্যেও খারাপ হয়।

আপনি সময়ের পিছনের দিকে হাঁটছেন গণেন্দ্রবাবু। ব্রাহ্মণের রক্ত, মেধা, বুদ্ধি নিয়ে কথা বলেছেন।

বলছি তো।

আজকের পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ বলে আলাদা কিছু থাকতে পারে না। থাকতে পারে গুণী আর অপদার্থের প্রভেদ।

তবে বলতে চান সব মানুষ সমান ?

বললাম, সব মানুষ সমান হতে পারে না। মানুষে মানুষে ভিন্ন। কিন্তু আলাদা করে কিছু লোককে শ্রেষ্ঠ বলে দেগে দেওয়া যায় না। স্রেফ জন্মসূত্রে—

গণেন্দ্রনাথ বলল, ভিন্নতা তো স্বীকার করেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবেন না কেন ? ব্রাহ্মণের রক্তই আলাদা।

এটা আপনার পাগলামি। ব্লাড ব্যাঙ্ক যখন রক্ত নেয়—তখন কী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র বলে বাছবিচার করে ? করে না। আবার ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত এনে যখন কোনও ব্রাহ্মণ রোগীকে দেওয়া হয়—তখন কি ব্রাহ্মণের রক্ত কিনা দেখে দেওয়া হয় ?

ব্লাড ব্যাঙ্ক গ্রুপ দেখে রক্ত নেয়। আপনার অ্যানালজি ঠিক হল না।

আপনি ভ্রান্ত গণেন্দ্রবাবু। আপনি সময়ের উল্টোদিকে হাঁটছেন। আপনি সাম্প্রদায়িক। আপনি ব্রাহ্মণ্য হামবড়াইতেই গেলেন।

প্রায় আশি গণেন্দ্রনাথ। দীঘির পাড়ে দু-পা শূন্যে তুলে প্রায় একটা লাফ দিয়ে বললেন, আপনি ভ্রান্ত। আমি মানুষের বিরুদ্ধে নই। আমি শ্রেষ্ঠত্বের সপক্ষে। আমি গৌরনদীর মানুষ। আমি আমার গ্রামরে ভালবাসি। ভালবাসি জিলাকে। পলাশির যুদ্ধের পর ১৮৬৫-তে আমার জিলা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে। ১৮৯০ সনে বরিশালে সদর হয়। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট বসে। চণ্ডদ্বীপ বা মাধবপাশার রাজা কন্দর্পনারায়ণের আমল থিকা আমরা হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করি। আমাদের অল্প বয়সে দেখছি শায়েস্তাবাদের মতুল্লিসাহেব পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া লাইব্রেরি করলেন গাঁয়ে। দেখাশোনার ভার পড়ল তাঁর বাছাই পাঁচজন ব্রাহ্মণের উপর। তারা ব্রাহ্মণ বলিয়া নয়—পণ্ডিত বলিয়া—

আপনি ব্রাহ্মণ ছাড়া পণ্ডিত দেখতে পান না ? তাই না ?

তখন ব্রাহ্মণরাই বেশি পড়াশুনো করত। অন্যরাও করত। এই যে ঘোষ-চক্রবর্তীর টেস্ট পেপার দ্যাখছেন ম্যাট্রিকুলেশনে—তার ঘোষ আমাগো বিনয়কাঠির মাখন ঘোষ। কায়স্থ বৈদ্যরাও পড়াশুনা করতে শুরু করে তখন। কোনও কোনও মুসলমান পরিবারে পড়াশুনার চল বহুদিনের। ফজলুল হকের মতো বিদ্বান বরিশালের গর্ব। সুফিয়া কামালের মতো কবি আমাদের গর্ব।

ভাবি, এ তো ভারী অদ্ভুত মানুষ। কলকাতায় বসে চল্লিশ বছর আগে ফেলে আসা বরিশালের গর্ব করে। যে বরিশাল তাকে ডাকেও না—সেখানকার গৌরনদীর ইতিহাস লিখে যায়। আবার ব্রাহ্মণের রক্ত নিয়ে বড়াই করে বিশেষ করে যে পৃথিবীতে প্রধান প্রতিযোগিতা গুণের—সেখানে।

বললাম, থাকেন তো শক্তিগড় কলোনিতে—জবরদখল জায়গায়। গর্ব যে করেন জেলার জন্যে—বুঝে-সুঝে করেন ?

গর্ব করব না মানে ! আপনাদের জহরলালের বাবায় ১৯২৮ সনে পার্ক সার্কাস কংগ্রেসে আমাগো জিলার ক্ষীরোদ নট্টের ঢোল শুনিয়া নিজের গায়ের চাদর খুলিয়া দেন তারে। দুর্গাপূজার দিন সকালে বন্ধু মুসলমানরা পান, কাচি হলুদ, কই মাছ দেখাইত—এ কথা কি জানেন !

মাথা নাড়ি। না জানা ছিল না।

তা জানবেন কেন ? আধুনিক হইছেন যে ! মহব্বত আলি ফোঁটা কাটিয়া কীর্তন গাইতেন। তখন মুসলমানদের ছিল ভালবাসা, গোঁড়ামি ছিল না। রমেশ দত্ত ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া বরিশালে পোস্টিং পান। গ্রাম দেখিয়া বলেন—এক-একটি গ্রাম যেন অমরাপুরী। আমরা আর মুসলমানরা মিলিয়া নবান্ন করছি। পাষাণময়ী অপেরার গান ভোলতে পারি না। বৈকুণ্ঠ নট্ট কোম্পানির অধিকারী ছিলেন শশী

বাইন। জারিগান গাইত আকবর, মহব্বতআলি, খোরসেদ আলি, মোনাসেখ। ছিল কবিগান, ত্রিনাথের গান। উকিল শিক্ষকরা থিয়েটার করবেন কর্ণ, চাণক্য, আলমগীর, ভাস্কর পণ্ডিত, শিবাজী, প্রফুল্ল। প্রফুল্ল চ্যাটার্জি, প্রথম বৈদিক অভিনয়ে নাম করেন। কে যেন প্রফুল্লবাবুকে বলে—আপনি শিশির ভাদুড়ির চেয়েও ভাল। জবাবে প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন—নাট্য জগতে শিশিরবাবু ঈশ্বর। ঈশ্বরের কোনও উপাধি নাই। কত আর বলব। হাডুডুতে এক নম্বর ছিলেন গৈলার দন্তা সেন। তারপর নাম করে আপ্তাজদ্দি মোস্তাজদ্দি। জানেন—নবান্নর উদ্বৃত্ত দিয়া পিঠা হইত। তারে আমরা কইতাম—চন্দ্রকাই। যাত্রার কথা মনে পড়ল। বলি শোনেন—স্ত্রী ভূমিকায় রাখালদাস আর রেবতী দে সবাইরে মাতাইয়া রাখছিল। ১৯২৯-এর কার্তিক। বিশ্বনাথ সাহার বাড়ি। ছবির মতো দেখতে পাইতেছি—ধ্রুব পালায় দ্বিতীয়া মহিষী রাখালদাস। প্রথমা মহিষী রেবতী। দ্বিতীয়া মহিষীর নিষ্ঠুরতায় চটিয়া গিয়া দর্শক আবদুল, রহিম হাওলাদার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বললেন—ওই মাগীটারে পিটাও। এই হইল আমার জিলার—গৌরনদীর অভিনয়। প্রেমের অভিনয় করত রাখালদাস নায়িকা সাজিয়া। ফিসফাস কথাবার্তা। অমনি শোনা যাইত—সাইলেন্ট প্লিজ। পরে কাননদেবীর যোগাযোগ দেখছি কলিকাতায়। সেখানে পায়ে আলতা পরানোর দৃশ্য ভোলা কঠিন। চর গুমরিয়ার পাঠের অফিসে নারী চরিত্রে রাখালের অভিনয় দেখিয়া পাট কোম্পানির ইংরেজ সাহেব সাজঘরে আসেন। পরীক্ষা করিয়া দ্যাখেন—রাখাল সত্য সত্যই নারী কি না। এই হইল আভিনয়ের স্ট্যান্ডার্ড। আর একটা কথা বলি। গর্ব করিবার মতো বলিয়াই গর্ব করি। নট্ট কোম্পানির কনসার্টে তেওট তাল একবার শুনিলে সারা জীবন বুকের মধ্যে বাজে। আপনি শুনলে আপনারও বাজিত। আমি শুনছিলাম। আমার আজও বাজে।

এমনভাবে বুকে হাত দিয়ে গণেন্দ্রনাথ দাঁড়াল—যেন এখনই ওর বুকের ভেতর ক্ল্যারিওনেট, কণ্ডাল, কর্নেট সব বাজিয়ে নট্ট কোম্পানি তেওট তালে তার কনসার্ট শুরু করেছে। এ তো শিবের অসাধ্য রুগী। যেমনি টান ব্রাহ্মণে—তেমনি টান জেলায়—গৌরনদীতে।

টেরিকটের ময়লা পাঞ্জাবির বুকের বোতাম নেই। খোলা জামার ভেতর দিয়ে গণেন্দ্রনাথের সাতাশুর বছর বয়সের ক্ষীণ বুক উঁকি দেয়। আমাদের সামনেই শক্তিগড় থেকে শুরু হয়ে বিশাল সাবেক দীঘি বর্ষায় গম্ভীর-কানায় কানায়। গণেন্দ্রনাথের বুকের মতোই এই দীঘির বুক দেখেও কিছুই বোঝার উপায় নেই।

অথচ সারা জেলার ইতিহাস—গৌরনদীর ইতিহাসে ওই বুকে জমাট ঘন করে জমানো আছে। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে গণেন্দ্রনাথের মুখে ফেনা ওঠার জোগাড়। একটি সুখী গার্হস্থ্য সভ্যতার ভান করে পাতিহাঁসগুলো দীঘি থেকে পাড়ে উঠছিল। সুধীরবাবুর মোষের খাটালে দুধপ্রার্থীদের লাইন। সূর্যাস্তের আলোয় তার গোছানো দোতলা বাড়িটি ঝকঝক করছিল।

বললাম, চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

এত বুঢ়া হই নাই যে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। এখনও সইর্ষার তেল মাখিয়া রোজ এই দীঘিতে সাঁতার কাটি।

তবু এগিয়ে দিতে গেলাম। গণেন্দ্রনাথ যেতে যেতে বলল, আপনি আমার 'অসবর্ণ' লেখাটি পড়িয়া চটছেন। মতপার্থক্য হইতেই পারে। এইবার আপনি আমার উপন্যাস পড়েন—মিলন মন্দির—অগ্নিকন্যা—দুই ভাগ। দ্যাখবেন সেখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র চরিত্ররা মিলিয়া মিশিয়া ঘোরতেছে। সেটা যে কথাসাহিত্য কিনা ! বোঝলেননি—

যাবার বেলায়

শংকর

যাবার বেলাতেই এই কাহিনী অপ্রত্যাশিত অথবা প্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করেছিল। যাবার সময়ে সাধারণত এমন ঘটে না, ওই সময়ে সবাই শান্তি প্রার্থনা করে পরম শত্রুরও। কিন্তু তাঁর শেষ সময়ে বিস্ফোরণ ঘটেছিল যা চোখে দেখার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য হয়েছিল মাত্র একজনের। যাবার বেলায় যা ঘটে, তা শুরু হয় কিন্তু অনেক অনেক আগে।

শুরুতেই যে পোঁতা হয়ে যায় শেষেব বীজ, তা আমাদেব স্মরণে থাকে না। আর কোনওবকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই সোজাসুজি এবার গল্পেব মধ্যে প্রবেশ করা যাক। ডোবা চ্যাটার্জি ও তার শ্বশুর জগন্ময় মজুমদারের গল্প। অথবা বলতে পারেন সুশীলা মজুমদার ও তাঁর স্বামী জগন্ময় মজুমদারের বহুকথিত কিন্তু এযাবৎ অলিখিত কাহিনী।

গল্পটা 'কিসসু' নয়—কোনওরকম উদ্বেগের কারণ নেই। বাঙালি লেখকের কলমে পুত্রবধূ ও শ্বশুরের সম্পর্ক নিয়ে মাধুর্যরস ছাড়া আর কিই বা সৃষ্টি হতে পারে ! আজকাল বিদেশ থেকে আমদানি করা পচা মাছের গন্ধ মাঝে-মাঝে এখানকার গল্পে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পাঠকের উৎসাহ নেই। পচা মাছের পূতিগন্ধ শরীর, মন ও পরিবেশ সবই দূষিত করে তোলে ; বাঙালি পাঠক অত বোকা নয়।

ডোরা চ্যাটার্জি বাঙালি হয়েও প্রথম জীবনে মন দিয়ে বাংলা শেখেনি—কলকাতা শহরে জীবনধারণের জন্যে যতটুকু বাংলা প্রয়োজন হয়, ততটুকু শেখা। এই শ'দুই-আড়াই বাংলা শব্দ, খেলিযে খেলিযে প্রয়োগ কবতে পাবলেই ভালভাবে চলে যায সেই শৈশব থেকে গয়ায় পিণ্ডদান পর্যন্ত। অথচ ডোরা এখন জানে, বাংলা ভাষায় আড়াই হাজার পাতাব অভিধান আছে, সেই অভিধানের প্রতি পাতায় অন্তত চল্লিশটি শব্দের উল্লেখ আছে। এই অভিধানের সংকলক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডোরার শ্বশুরমশায়ের পরিচিত ছিলেন। "বহু কষ্ট পেয়ে হরিবাবু বইটা লিখলেন, জানো বউমা," বলেছিলেন জগন্ময় মজুমদার।

ডোবা অনভ্যস্ত ঘোমটা টানতে টানতে বলেছিল, "এইখানেই তো এক লাখ শব্দ পাওয়া গেল।"

বৃদ্ধ জগন্ময় মজুমদার তাঁর সাদা দাড়িতে হাত দিয়ে বলেছিলনে, "এ তো তুচ্ছ ব্যাপার—পিছনে রয়েছে সংস্কৃতের শব্দসাগর। মন যখন কিছু প্রকাশ করতে চাইছে অথচ অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছে না, তখন ডুব দাও সংস্কৃতের অমিয় সাগরে। ওই যে গুরুদেব ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কখনও শব্দসংকটে পড়েননি, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ং ঃ ঁ দিয়ে সংস্কৃতকে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছেন। ধন্যি ধন্যি পড়ে গিয়েছে বিশ্বসংসারে।"

ঘড়িতে বাঁধা জগন্ময়ের জীবন। সকালবেলায় একটু চিরতার জল সেবন। তারপর দুধবিহীন চা পান। "একসময় আমাদের আনন্দধামে জাপানি চা আসত অঢেল। জাপানি ভক্তরা নিয়ে আসত আশ্রমপ্রধানের জন্যে ; তিনি আর ক' কাপ চা সেবন করতেন ! শ্রীস্বরূপদা উদারহস্তে সেই চা বিতরণ করতেন প্রিয়জনদের মধ্যে। তোমার শাশুড়ি সুশীলা সেই চাযে সিংহ ভাগ বসাত। স্বরূপদা রসিকতা করতেন, 'তোদের মধ্যে বিলাসিতা ঢুকেছে !' তোমার শাশুড়ি চিবকালই একটু আদুরে প্রকৃতির। সে বলেছিল, সৎসঙ্গে জীবনধারণের জন্যে আমার বর অনেক কিছুই ত্যাগ করেছেন—খ্যাতির মোহ, পদের মোহ, অর্থের মোহ। কিন্তু মানুষ তো, একটা কিছু খুঁত থাকবে না ! ওর ওই জাপানি চায়ের মোহ।"

জাপানি চা কোথায় পাওয়া যায় ডোরা জানেই না। শ্বশুরমশাইকে তাক লাগাবার জন্যে একদিন খোঁজ করতে বেরিয়েছিল। কোথাও খবর পেল না, পাওয়া গেল চিনের চা, সঙ্গে জুঁইফুলের পাপড়ি।

শ্বশুরমশাই আনন্দ করে চাইনিজ চা পান করলেন। তারপর বললেন, "কিছু মনে কোরো না, বউমা, জাপানিদের সঙ্গে চিনাদের যতটুকু তফাত, ঠিক ততটা তফাত চিনা চায়ের সঙ্গে জাপানি চায়ের।"

জগন্ময় তারিয়ে তারিয়ে চা পান করলেন চাতকের মতন, প্রশংসা করলেন বউমায়ের, তারপর বললেন, "তোমাকে আসল কথাটাই বলা হয়নি বউমা। বহুবছর আগে ঠিক করলাম, জাপানি চা আর গ্রহণ করব না। এই চা নিয়েই বোধহয় সমস্যার শুরু।"

"জানো বউমা, সেদিন ছিল শ্রাবণ মাস। বিকেলবেলায়, আনন্দধামের পাঠকেন্দ্র থেকে ফিরে, হঠাৎ কী হলো, তোমার শাশুড়িকে বললাম, এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায় ...।"

সুশীলা জিজ্ঞেস করল, "গান শুনতে ইচ্ছে করছে ? কলকাতা থেকে এইচ এম ভি-র রেকর্ড আনিয়েছি।"

জগন্ময় বলেছিলেন, "গানের সঙ্গে ধন নয় মান নয় একটু জাপানি চা।"

একটু থামলেন জগন্ময়। "বাড়িতে জাপানি চা ছিল না। কিন্তু সুশীলা ছাড়বার পাত্রী নয়। সে জানে, কোথায় গেলে এই মুহূর্তে স্বামীর তৃষ্ণা নিবারণের সামগ্রী পাওয়া যাবে। বাইসাইকেল বার করে সে ছুটল এই আনন্দধামের প্রাণপুরুষ স্বরূপদার কুটিরের দিকে।"

তারপরেই এল প্রবল বর্ষণ। এক ঘণ্টা ধরে প্রকৃতির সে কী আকুলি বিকুলি। "সে কী দুশ্চিন্তা - আমার।"

"আপনি মাকে বাধা দিলেন না কেন, বাবা ?" সরল মনে জিজ্ঞেস করল ডোরা।

চুপ করে রইলেন জগন্ময়। "ঠিক সময়ে বাধা দিলে পৃথিবীর অনেক অঘটনই স্রেফ একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে যেত, বসুন্ধরা।"

আরও কী ভাবলেন বৃদ্ধ জগন্ময় মজুমদার। "প্রকৃতিকে যত ভয় এই বড় বড় শহরে। সর্দি কাশি নিমোনিয়ার প্রসারের জন্যেই যেন বর্ষা নামে এই পৃথিবীতে, অন্তত কলকাতার লোকদের ধারণা। আনন্দধামে আমরা আশ্রমবাসীরা ছিলাম অন্যরকম। বৃষ্টিতে, অশনি সংকেতে, এমন কী বজ্রপাতে আমাদের ভয় ছিল না। আমার আরও একটা বাড়তি ভূমিকা ছিল—তোমার শাশুড়ির মতন আশ্রমপালিতা ছিলাম না আমি। ছোটকালটা কেটেছে হিমালয়ের বুকে, কুমায়ুন পাহাড়ে। সেখানে বৃষ্টি নামলে মাথায় টুপি চড়িয়ে আমি ছুটতাম রানীক্ষেতের চৌবাটিয়ার দিকে। ঈশ্বর বলো, প্রকৃতি বলো সব একাকার হয়ে যেত আমার চোখের সামনে। মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হত, ফিরে এসে বাক্ বিঠোফেনের সঙ্গীতের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা করতাম। তারও অনেকদিন পরে তোমার শাশুড়ির সঙ্গে পরিচয়ের পর বুঝলাম, মানুষ তার অনুভূতির অনুরণন খুঁজে পেয়েছে গুরুদেবের গানে। সেই গান তার শরীরী রূপ লাভ করেছে, শান্তিনিকেতনে এবং বিহারের আনন্দধামে, যেখানে তোমার শাশুড়ি প্রতিপালিতা।"

ডোরা চ্যাটার্জি অবাক হয়ে শুনে চলেছে পুরনো দিনে কথা। সানি পার্কে পূর্বাশা ফ্ল্যাটের পূর্ব অলিন্দে অন্ধকার নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। দূরে জ্বলে উঠেছে অসংখ্য বিজলিত বাতির মালা— চির দীপান্বিতার মিলনমন্দির একালের এই মহানগরীগুলো। অন্ধকারের আধিপত্য বিনম্রভাবে স্বীকার করে নিয়েও, মানুষ কেমন শুরু করেছে আলোর মহোৎসব।

দুর্যোগের সেই সন্ধ্যায় সুশীলার বেরিয়ে যাওয়া, তারপর প্রবল বর্ষণের মাতামাতি, এর পরে কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটল ? আনন্দধামের পথে কোথাও যে বিজলি বাতির প্রবেশ ঘটেনি, তা তো ডোরার অজানা নয়। এই পথে যে সাপ আছে, বিষাক্ত কীট আছে, তাও বিস্মরণ হওয়ার কথা নয়।

এর পরের ঘটনা ডোরার অজানা নয়। এর আগের ঘটনা ডোরার অজানা নয়। এর আগেও বর্ষার সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে সানি পার্কে পূর্বাশার ব্যালকনি থেকে বৃষ্টি দেখতে দেখতে জগন্ময়

মজুমদার সে-কাহিনী বর্ণনা করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে। মোটামুটি ব্যাপারটা এইরকম : সুশীলা মজুমদার ফিরে এসেছেন বাইসাইকেল নিয়েই। মেয়েদের আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ এই বাইসাইকেল— যা কলকাতার পুরুষরা আজও নগরনন্দিনীদের দিতে পারছেন না। সুশীলা সেদিন স্বামীর কুটিরে ফিরেছেন আশ্চর্য রূপে। আধ ভেজা শাড়ির ওপরে একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরেছে সুশীলা। পথে প্রচণ্ড ভিজেছে সুশীলা। তারপর কড়া নেড়েছে স্বরূপের নির্জন আবাসনে। এই সন্ধ্যায় এমন দুর্যোগে নির্জন আবাসনে। এই সন্ধ্যায় এমন দুর্যোগে এইভাবে সুশীলাকে দেখে অবাক হয়েছেন স্বরূপ। জাপানি চায়ের অনুসন্ধান সমস্ত নাটককে আরও সরস করে তুলল।

ভিজে কাপড়ের বিপদ থেকে স্বরূপ মুক্তি দিতে পারেননি আশ্রমবালাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে ফিরে যেতে চেয়েছে দ্রুত— স্বামী অপেক্ষা করছেন চায়ের জন্য। তাই এই অসাধারণ বেশবাস। ছাতা দেননি—কারণ হাওয়া বইলে, ঝড় উঠলে আনন্দধামে এই ছাতা আরও বিপজ্জনক, আশ্রয় প্রার্থিনিকে কোথায় উড়িয়ে ফেলবে তার ঠিকঠিকানা নেই। "ছাতা মানেই প্যারাসুট, জানোই তো," বলতেন এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ। তিনি তাঁর সাধনার সমস্ত অনুপ্রেরণা জুটিয়েছিলনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসুধারস থেকে। কবিগুরুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য তাঁরই আশীর্বাদধন্য এই আনন্দধাম। শান্তির আরেকটি নিবিড় নিকেতন হয়ে ওঠার স্বপ্ন যার বুকের মধ্যে।

আনন্দআশ্রমকে কবির প্রেরণা ও আশীর্বাদ দিয়েছিলেন গুরুদেব। চেয়েছিলেন, তাঁরই কিছু স্বপ্ন এখানেও বাস্তবায়িত হোক মানুষের কল্যাণে—ঘুচে যাক ভেদাভেদ, সংকীর্ণতা। দূরত্ব দূর হোক, মানুষ ও প্রকৃতি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোক সৃষ্টির নতুন স্বর্গরাজ্যে।

"আশ্রম শব্দের মধ্যে যেমন 'আশ্রয় আছে তেমন 'শ্রম'ও আছে বউমা," বললেন জগন্ময় মজুমদার। "আশ্রমের মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে, বউমা। ওখানে বৈরাগ্য নেই, কিন্তু বন্ধনহীন উপভোগও নেই। ওখানে ত্যাগ আছে, আর আছে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা বললেই চোখের সামনে লোহার শৃঙ্খল দেখতে পাই আমরা, কিন্তু যে নিয়মানুবর্তিতা অদৃশ্য হয়েও শৃঙ্খলা রক্ষা করে, নৈরাজ্যকে দূরে ঠেকিয়ে রাখে তাই হল প্রকৃত শৃঙ্খলা।"

ডোরা শুনে যায়। বাংলা ভাষাটা ভালভাবে রপ্ত করবার বাসনা ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠেছে। এ-ছাড়া পথ নেই শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে সময় কাটাবার। স্বামীকে কয়েকবার অনুরোধ করেছে ডোরা। তার তো উচিত বাবার এই সব ভাবনাচিন্তার নিত্য অংশীদার হওয়ার। কিন্তু মনসিজ মজুমদারের মধ্যে ঐতিহ্য সম্পর্কে কোনও কৌতূহল দেখতে পায় না ডোরা। মনসিজ রিপোর্ট নেয় স্ত্রীর কাছ থেকে। দু' চারটে হালকা মন্তব্য করে, কিন্তু তার মনটাকে ডোরা ঠিক ধরতে দেয় না। মনসিজ শুধু বলে, "ডোরা, সময়ের গতিবেগ যে সুপারফাস্ট তা বাঙালিরা এখনও বুঝতে শেখেনি। শান্তিনিকেতন, আনন্দধাম এটসেটরা করে, মায়াবতী, আলমোড়া এটসেটরার পিছনে ছুটে, পণ্ডিচেরিতে পদচারণা করে অনেক লোক তাদের অমূল্য জীবন অপব্যয় করেছে, উইদাউট এনি রিটার্ন। রিটার্ন না পেলে আজকাল জীবন তো দূরের কথা, গাঁটের কড়ি বিনিয়োগেরও কোনও মানে হয় না, ডোরা।"

এত লোক ওইসব জায়গায় ছুটে গিয়েছেন। তাঁরা সবাই বোকা, এমন কথা ভাবতে মন চায় না ডোরার। অফিসের অনেক শব্দ মনসিজের মতনই জানে ডোরা—সে বলেছে, "এঁরা চেনা পথের যাত্রী নন—এঁরা হয়তো নতুন কিছুর স্বপ্ন দেখেছিল। তোমরাও তো বলো, ভেঞ্চার ক্যাপিটালের প্রয়োজন আছে এই পৃথিবীতে।"

"ভেঞ্চার ও অ্যাডভেঞ্চার-এর মধ্যে অনেক পার্থক্য, ডোরা। মধ্যবিত্ত বাঙালি একশ বছর ধরে এসব বুঝতে চেষ্টা করেনি। অর্থ ম্যানেজ করতে না পেরে পরমার্থর পিছনে ছুটেছে কেউ-কেউ, গড়ে উঠেছে সঙ্ঘ, মঠ, মিশন, আশ্রম এবং আরও কত কী।"

ডোরার পক্ষে এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। তার পিতৃকুল অনেকটা শিকড়বিহীন, কৃষ্ণনগর

থেকে ভাসতে ভাসতে লাহোরে হাজির হয়েছে, তারপর ঈশ্বরের এক অদ্ভুত রসিকতায় ব্যাক টু ক্যালকাটা। চ্যাটার্জি, বোস, ঘোষ, সেন এইসব টাইটেল থাকলে শেষপর্যন্ত একটা ঠিকানাই নির্ভরযোগ্য থেকে যায়। তার নাম কলকাতা। তাই শীলু চ্যাটার্জি একসময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে পৈতৃক শরীর রক্ষা করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। সে প্রায় একশ বছর পরে উৎপত্তিস্থলে ফিরে আসা। চাটুজ্যে নামটুকু ছাড়া আর কোথাও বাঙালিত্বর কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। চলনে বলনে আচরণে নির্ভেজাল পাঞ্জাবিকে ভাগ্যদেবতার খামখেয়ালিপনায় আবার বাঙালি হবার প্রচেষ্টায় নামতে হল।

নিজের কথায় ফিরে যাবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। ডোরা এই মুহূর্তে বহুদিন আগের আনন্দধামের সেই বর্ষামুখর সন্ধ্যায় ফিরে যাবার চেষ্টা করছে যেদিন সিক্ত শরীরের ওপর আশ্রমপ্রধানের দেওয়া পাঞ্জাবি চড়িয়ে সাইকেল থেকে নামলেন সুশীলা মজুমদার, তারপর স্টোভে জল চড়ালেন স্বামীর জাপানি চায়ের তৃষ্ণা মেটাতে।

জাপানি চা অবশ্যই তৃপ্তিদায়ক হয়েছিল। কিন্তু জগন্ময় মজুমদার বললেন, "স্বরূপ কী ভাবলেন বলো তো ! ভাল চায়ের লোভে বউকে বর্ষার মধ্যে বাড়ি থেকে ঠেলে বার করে দেওয়া।"

"সে সুযোগই দিইনি। পতিনিন্দা শুরু হওয়ার আগেই বলে দিয়েছি, স্বরূপদা, স্বামীর বারণ সত্ত্বেও আমি এসেছি। উনি শুনে বললেন, এক শ্রেণীর মেয়ে স্বামীর কথা শোনে না, কিন্তু স্বামীনিন্দাও সহ্য করতে পারে না। এদের কী একটা সংস্কৃত নাম বললেন, ভুলে গেলাম। গুরুদেব বোধহয় এদের নিয়ে গল্প লেখার কথা ভেবেছিলেন !"

সেই ঘন বর্ষার মধ্যে ফেরার তাগিদ ছিল। কিন্তু সাহস ছিল না। ব্যাপারটা সহজ করার জন্যে স্বরূপ বলেছিলেন, "এই চা তো রোজ খাই, কিছু বুঝতে পারি না। মাহাত্ম্যটা নিশ্চয় তোমার হাতেব গুণের, সুশীলা। একটু নমুনা দিয়ে যাও।"

সময় কাটাবার জন্যে ওখানেও স্টোভ জ্বলেছিল। সেদিন ভারতবর্ষের কোথাও সিলিন্ডারের গ্যাস ছিল না—এল পি জি এসে মেয়েদের জীবনধারাই পাল্টে দিল। নিঃশব্দ বিপ্লব বলাটা অত্যুক্তি নয়।

শ্বশুরমশাই বললেন, "জানো মা, তখনকার দিনে আশ্রমের চা তৈরির পিছনে নানারকম কেরামতি ছিল—খুটখাট শব্দ থেকে আরম্ভ করে শোঁ শোঁ পর্যন্ত ঝঙ্কারের একটা ধরাবাহিকতা ছিল। আসলে চা তৈরির পিছনে ওই প্রতীক্ষাটার প্রয়োজন ছিল মনের পাতাগুলোকে ভিজোবার জন্যে। এখন এ সবের বালাই নেই—কোনও শব্দসিম্ফনি নেই, বড় জোর একটা হাল্কা টুং করে শব্দ—শেষ পর্যায়ে যখন লিকারের সঙ্গে চিনি মেশানো হচ্ছে।"

"অফিসে তাও উঠে গিয়েছে বাবা। টুংটাং কোনও শব্দ নেই—স্রেফ এক কাপ গরম জল সামনে এগিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে লম্বা ল্যাজওয়ালা একটা টি ব্যাগ এবং দুটো স্যাচেট।"

স্যাচেটের বাংলা খুঁজে বার করতে গিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছে বেচারা ডোরা। শ্বশুরমশাই সস্নেহে শব্দটা জুগিয়ে দিলেন 'পুরিয়া'। এবার ভরসা পেল ডোরা। "হ্যাঁ বাবা, একটু দুধের, একটা চিনির। অথচ দুধও নয়, চিনিও নয়। একটার নাম 'হোয়াইটনার', আর একটা 'অ্যামপার্টেস—চিনির মতন মিষ্টি, অথচ চিনির মতন দুষ্টু নয়।"

"চিনি আবার দুষ্টু হল কবে থেকে ?"

"হ্যাঁ বাবা, চিনির দুষ্টুমি দুনিয়ার সবার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে—ছোটবেলায় দাঁত নষ্ট করে, বড়বেলায় ওজন বাড়িয়ে ফিগার নষ্ট করে।"

বাবা মন্তব্য করলেন না। আশ্রমে আমরা ক্যালরি নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। কারণ সামনেই আদিগন্ত পথ—বেঁচে থাকা মানেই হাঁটা, চরৈবেতি। গুরুদেব বলতেন, "এই মহাব্রহ্মে সবাই টো টো করে ঘুরছে—চন্দ্র সূর্য পৃথিবী থেকে যাকে স্থির স্থবির মনে হচ্ছে তার মধ্যেও অনন্ত প্রদক্ষিণ চলেছে

অন্তুতকাল ধরে। মানুষই বলো, ঘোড়াই বলো, সবকিছুই ঘোরাঘুরির জন্যে সৃষ্টি হয়েছে।"

"বড় রসিক মানুষ ছিলেন তো।"

"আসাধরণ তো বটেই। তাই না যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এলেন, তাঁর নিজেদের সুখের কথা না ভেবে তাঁর আসঙ্গলিপ্সু হয়ে উঠলেন। আমবা তো নিতান্ত শেষের পর্বের।"

কিন্তু নিতান্ত শেষের কথা যে নয় তা আন্দাজ করতে পারে ডোরা। কোথায়, কতদূরে সেই আনন্দধাম মহামানবের আশীর্বাদপূত হয়ে জন্ম নিয়েছিল, তারপর কত সময় অতিবাহিত হয়েছে, জগন্ময় মজুমদার সেখান থেকে কতদূরে সানি পার্কের পূর্বাশায় চলে এসেছেন। তবু ছাপ পড়ে রয়েছে। জগন্ময় মজুমদারেব পড়ার ঘরে গুরুদেবের আঁকা পেন অ্যান্ড ইঙ্কের ছবি আছে। গুরুদেবের ম্যানাসক্রিপ্ট আছে, আছে তাঁব ব্যবহার করা পাঞ্জাবির বোতাম। এসব তাঁর পাবাব কথা নয়, কিন্তু এইসব অ্যান্টিকের ভান্ডারিই উপহার দিযেছেন এই পরিবারকে।

ছবিটা যখন পেযেছিলেন, তখন গুরুদেব নেই। বর্ষাসন্ধ্যার পরের দিন জগন্ময় আবাব পাঠিয়েছিলেন সুশীলাকে তাব স্বরূপদাব কাছে। পাঞ্জাবির প্যাকেটটা ফেরত পেযে স্বরূপ হাসাহাসি করলেন, "ওটা তোমাকে দান করিনি সত্য, কিন্তু বড় বড় চিত্রসংগ্রহশালায় বড়বড় লোকবা ছবি দেয় পার্মানেন্ট লোনে। চিরকালেব জন্যে ধার ! বড় মজার ব্যাপারটা।"

"আমাব স্বামীটি ধারকে ভীষণ ভয় করে—ধার দেওয়া, ধার নেওয়া দুইই বারণ, স্বরূপদা।"

সেই দিনই পাঞ্জাবির বদলে, মহামূল্যবান একটা ছবি উপহার দিয়েছিলেন স্বরূপ। "তুমি ভেবো না, সুশীলা—টাকা বোজগারেব জন্যে ছবি আঁকেননি গুরুদেব—পাঁচ বছরে কয়েক হাজার ছবি এঁকে গেলেন শেষ জীবনে। তাব কটাই বা পাবে এখানে ? বেশ কিছু আছে শান্তিনিকেতনে। বাকি সব বিলিযে দিয়েছেন প্রিয়জনদের মধ্যে। তখন কাছে থাকলে তুমিও পেতে।"

একে একে আরও কযেকটি ছবি এবং পান্ডুলিপি উপহার পেয়েছেন আশ্রমকন্যা সুশীলা ও তার স্বামী জগন্ময। আশ্রমপ্রধানের আরও কাছে চলে গিয়েছেন দুজনে। অথচ যখন জগন্ময় মজুমদার প্রথম এই আশ্রমে পদার্পণ করলেন তখন স্বপ্নেও ভাবেননি, কোনদিন তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের এত কাছের মানুষ হয়ে উঠবেন।

প্রথম যখন আশ্রমকন্যাকে দেখলেন প্রবাসের নাট্যশালায় তখনও কবিগুরু বেঁচে আছেন। প্রতিষ্ঠানের অর্থসাহায্যের জন্যে আশ্রমবাসীদের নাট্যার্ঘ্য এই চন্ডালিকা। স্বয়ং কবিগুরু উপস্থিত থাকলেও অসস্থতাবশত তিনি নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না, দর্শকদের আসনে বসে দেখলেন নিজের সৃষ্টিকে।

চন্ডালিকাকে ভীষণ ভাল লেগে গেল ইংরিজির প্রতিভাবান ছাত্র জগন্ময় মজুমদারের। শিল্পীদের দেখাশোনার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে জগন্ময়ও ছিলেন। সুশীলা তখন বালিকা বললেই চলে—বাংলা মতে বড় জোর ষোড়শী। এই ষোড়শীকে নিয়ে আধুনিককালে কুমারী পূজা চলে, কিন্তু রোমন্স নৈব নৈব চ। বি.এ. অনার্সের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম জগন্ময় নতুন এক স্বপ্নের জালে স্বেচ্ছাবন্দী হলেন আশ্রমের এক স্কুল ছাত্রীর আকর্ষণে—যে ইংরিজিতে তেমন পারদর্শিনী নয়, কিন্তু কবিতা জানে, গান জানে, ছবি আঁকতে জানে, আর আছে নৃত্যে পারদর্শিতা। জগন্ময় বললেন, "ভাগ্যবান আপনারা, স্বয়ং বিশ্বকবি আপনাকে দেখে সঙ্গীত-নাটক রচনা করেন !"

"এ আর এমন কী কথা ! আশ্রমের বালিকাদের কথা না ভেবে, অন্য কোন্ কল্পনায় কবিকণ্ঠে সুর আসবে ? ছন্দ আসবে ? " বুঝতে পারে না আশ্রমবালিকা।

তারপর কবিগুরুর জীবিতকালেই একবার আশ্রম ঘুরে গিয়েছেন জগন্ময়। দূর থেকে একটি পর্ণকুটিরের সামনে রৌদ্রচ্ছায়ায় নিয়ত সেই অনন্য শরীরকে দেখেছেন জগন্ময়। আরও কাছে নিয়ে যাবার লোভ দেখিয়েছিলেন কেউ কেউ, কিন্তু জগন্ময়ের সাহস হয়নি।

বিদায়ের দিনে সুশীলার কাছে দুঃখপ্রকাশ করলেন জগন্ময়, "দেখা হল, কিন্তু পরিচয় হল না। দর্শন হল, কিন্তু পুজো হল না।"

"আমার তো রোজ যাই, আপনিও এলেন না কেন ?"

"তফাত অনেক, সুশীলা। তোমাদের উনি ডেকে পাঠান, আর আমরা রবাহূত—শুধু দেখার জন্যেই আসা।"

পরেরবার যখন এখানে পদার্পণ তখন তিনি নেই। জগন্ময় জিজ্ঞেস করেছেন, "আই এ বি এ তো শেষ হতে চলল। এর পর কুয়ো ভাদিস ? কোথায় যেতে চাও, কী হতে চাও ?"

আশ্রমকন্যা সুশীলা সহজ উত্তর দিয়েছিল বিরাট একটা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে। গাছটা ছিল ওদের বাড়ির সামনেই। "গাছ হওয়ার অনেক সুবিধে ! কোথায় যেতে চাই বলতে হয় না।"

"ওই যে তিনি বলে গিয়েছেন, ছটফটে হওয়া, তুষ্টির অভাব।"

"গাছ এক জায়গায় একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে বেশি ছটফটে হতে কাউকে দেখেছেন, আপনি ?"

জগন্ময় আর প্রশ্ন করেননি, বুঝেছেন, "সুশীলার শরীর ও মন এই গাছের মতোই আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে, চিরতরে।"

চিরতরে ! শেষ কথাটি জগন্ময়কে আজও একটু ব্যঙ্গ করে। বধূমাতা ডোরার স্নেহময়ী মুখটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "চিরতরে বলে কোনও কথা মানুষের অভিধানে নেই বউমা। আমাদের জীবনে চিরসত্য একটাই—তা হল মৃত্যু। জীবিতকালের সব সত্যই সীমিতকালের খাঁচায় বন্দি। এই যে তোমার শ্বশুরমশাই, কুমায়ুম ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে পড়াশোনা করে, দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স থেকে ইংরিজি অনার্স নিয়ে যে অক্সফোর্ড কিংবা আই সি এস-এর কথা ভাবছিল সে যে শান্তিনিকেতনে সুযোগ পেয়ে বিহারের গণ্ডগ্রামে আশ্রমবাসী হবার জন্যেই জন্মেছে তা মনে হয়েছিল কি ? অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, আই সি এস ভুলে যাও, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারশিপ তখনও ঝুলছিল চোখের সামনে দু খানা গোল্ড মেডেলের জোরে। কিন্তু মনে হল আনন্দধামে গুরুকুল পাঠশালার পণ্ডিতমহাশয় হয়ে গাছের তলায় বসে ক্লাস নেওয়াতেই আনন্দ। মন যা চায় তা করতে পারাতেই তো স্বাধীনতা, সুখ। আনন্দের মধ্যেই মুক্তি, মুক্তির মধ্যে আনন্দ বলতে পারো, বউমা।

"ওঃ যা বলছিলাম, বউমা। যাকে গাছ ভেবেছিলাম, কোনদিন উৎপাটিত করা সম্ভব হবে না, যার জন্যে কুমায়ুন পাহাড় ছেড়ে আমি চলে এলাম অরণ্যাবাসে , সে কেমন সহজে প্রয়োজনের খাতিরে রানীখেতের পর্বতবাসিনী হল সমতলের সমস্ত আকর্ষণ ডোন্ট কেয়ার করে।"

ব্যাপারটা বধূমাতা হিসেবে পুরোটাই জানা উচিত ডোরার। কিছুটা সে জানে এমন নয়, কিন্তু সবটা সেও কি জানে ? জগন্ময় মজুমদার এবং সুশীলা মজুমদারের প্রথম দর্শন, প্রেম, পরিণতি, পরিণয় সবই যেন এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ নির্দেশে এগিয়ে চলেছিল পূর্বাহ্নেই লিখে ফেলা এক নাটকের মতন। ওই যে বলে, পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি। পথের প্রান্তে এসে আর এক নাটকীয়তা, তাকে কি বলা যায় গ্রন্থিহীন বন্ধন ? আচার-বিচার আইন-কানুনের গ্রন্থি শিথিল হওয়ার পরেও কখনও কখনও বন্ধন থেকে যায়।

"জানো বউমা, অনেক বন্ধন ছিঁড়ে যাওয়ার পরও দেখা যায় মুক্তি হয়নি। হিন্দুরা সেই জন্যে পরজন্মের অবতারণা করেছিলেন, বন্ধন মুক্তির ব্যাপারে যাতে ছটফটানি না আসে, না আসে কোনও অকারণ ব্যস্ততা। ইংরিজিতেও বলে, মিস্টার বিজি বডি খুব কাজের লোক হয় না।"

চুপ করে থাকে ডোরা—সানি পার্কের পূর্বাশায় সাততলা ফ্ল্যাটের বারান্দায় এককালের লেডি সেক্রেটারি ডোরা চ্যাটার্জি সংসারজীবনে এক অজানা অধ্যায়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তার শ্বশুরমশায়ের সান্নিধ্যে।

অপিস থেকে ফিরে এসে ডোরা সোজা শ্বশুরের ঘরে ঢুকে পড়ে। "বাবা, আপনি কেমন আছেন ?"

"ভাল আছি বউমা। পৃথিবীতে ভাল থাকা যে কত শক্ত তা যখন ভাবি তখন নিজেই অবাক হয়ে যাই।"

"বাবা, আজ রাত্রে আপনি কী খাবেন ? আমাদের আজ বাইরে ইনভিটেশন। ওর বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভারসারি।"

আজ যে বাবারও ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি তা ডোরার জানা নেই। খেয়াল থাকার কথাও নয়। বাবা ধীরে ধীরে বললেন, "তোমরা দুজনে মন দিয়ে আনন্দ করো। আজ আমি কিছু খাব না।"

"বাবা, আপনার জন্যে আজ এ-এ-ই-আই থেকে ফিশ তন্দুরি আনিয়েছি।"

ফেভারিট ডিশ বাবার, তবু উৎসাহ দেখালেন না। বললেন, "মাঝে মাঝে স্বেচ্ছা উপবাস এই বয়সে ভাল, বউমা। সময় থাকতে উপবাস করলে অনাহারের আশঙ্কা কমে যায়, শ্রীস্বরূপ কোথায় রসিকতা করেছিলেন।'

"উপবাস মানেই তো দুঃখকে ডেকে আনা, বাবা।"

"না বউমা, আনন্দের প্রস্তুতিতেও রয়েছে হিন্দুদের উপবাস। মুসলমানদের তো কথাই নেই, উপবাসে উপবাসে শরীরটাকে শাসন করতে ওদের কোনও তুলনা নেই। আমাদেরও ওই সব ছিল একদিন। এখন পালন করা হয় না। কেন্দ্রীয় কোনও বিধান নেই বলে। বিকেন্দ্রীকরণটাই যেমন আমাদের চরম শক্তির আধার, তেমনি আমাদের সাম্প্রতিক সমস্ত দুর্বলতার মূলেও রয়েছে ওই বিকেন্দ্রীকরণ।"

"আসলে, আচারে-বিচারে-বন্ধনে শত শত বছর বন্দি থেকে আমরা কিছুদিন মুক্তির স্বাদ অনুভব করছি বাবা। তাই নীতি, নির্দেশ, বন্ধন আমাদের এখন ভাল লাগে না।"

"বোধ হয় তাই।" হাসলেন জগন্ময় মজুমদার। "অনাদি অনন্তকে নিয়ে আমাদের অধ্যাত্মচিন্তা এতই দুর্বহ যে সমসাময়িক সমস্যা আমাদের তত উদ্বিগ্ন করে না, বউমা।

পরে মনসিজ ক্যালকাটা ক্লাবের পার্টিতে এসে বলেছিল, "বাবা খেলেন না, কেন ? নিশ্চয় শরীর খারাপ।" শরীর খারাপ হলে বাবা তো মুখ খুলে বলেন না, দেহটাকে যথেষ্ট পরিমাণে শাসনে রাখার শিক্ষা আনন্দধামের আশ্রমবাসীরা সকলেই নিয়ে থাকেন। ওখানে তো উডল্যান্ডস্ নেই, কোঠারি নেই, বি এম বিড়লা নেই—হুট করলেই হাসপাতালে যাওয়া যায় না। ডাক্তার পাওয়াই দায়। এইটা মনে রেখেই তো মানুষ আনন্দধামে গিয়েছে এতদিন, সাহেব মেম, রাজকুমার, ধনকুবের কারও মুখে অভিযোগ শোনা যায়নি।

"কিন্তু খেলেন না কেন ?" মনসিজ বলল, "এবার মনে পড়েছে। বোধ হয় বাবাব বিবাহ বার্ষিকী।"

"আর তুমি জানো না, দিনটা ?" ডোরার অভিযোগ।

"বাবা-মায়ের বিবাহ বার্ষিকীটা ছেলেমেয়েদের আলোচনার যোগ্য বিষয়, নয়, ডোরা। তোমাকে মনে রাখতে হবে তোমার স্বামী অন্য এক পরিবেশে মানুষ। সেখানে নিয়মকানুন সব আলাদা। এই যে আমি মদের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে আছি, পরনারীর সঙ্গে রসরসিকতায় মগ্ন আছি, আশ্রমের আইন অনুযায়ী তা অচল। পরব্রহ্মের সন্ধানে এসে পরস্ত্রীতে বিপন্ন হওয়া আশ্রম নিয়মে অচল। এও এক টাইট রোপ ওয়াকিং—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, আবার ইন্দ্রিয়ের সব দ্বার উন্মুক্ত করে উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য, তাও আকাঙ্খিত নয়। ত্যাগ ও ভোগ, সংযম ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মধ্যপথে ক্ষুরস্যধারা পথে মানুষের বিপদসঙ্কুল যাত্রাকে অভিনন্দিত করাটাই আশ্রমজীবনের ধারা।"

ডান্সিং-এর ব্যবস্থা ছিল। ডোরাও একদা ছিল নৃত্যনিপুণা। এই নৃত্যের মধ্যে কোনও অন্যায় দেখে না ডোরা। শরীরটা হাল্কা হয়ে যায়, মনটা চাঙ্গা হয়, মনে পড়ে যায় মানুষ সামাজিক জীব, একাকিত্বে তার চরম সার্থকতা নয়, সান্নিধ্যেই তার প্রস্ফুটন। আজও নিমন্ত্রণ এল। কিন্তু ডোরা নাচের

আসরে নামল না, বারবার শ্বশুরমশায়ের কথা মনে পড়তে লাগল। বিবাহের স্মৃতিতে কোথাও ভোজ ও উৎসব, কোথাও উপবাস ও প্রার্থনা।

বাবাকে জিজ্ঞেস করবে ডোরা, কোনটা সত্য ? কোনটা সমীচীন ? ডোরা জানে, বাবা কোনও উত্তর দেবেন না। উপনিষদ গ্রন্থাবলি থেকে মুখ বার করে হাসবেন, বলবেন, "ওঁর কোনও লেখায় নিশ্চয় উত্তর দেওয়া আছে, বউমা। খুঁজে দেখতে হবে। তবে মনই এর উত্তর দিতে পারে, মনের কাছে যা সঙ্গত, যা সম্যক তাই সমীচীন।"

মনসিজ এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়। অফিসের কাজের মধ্যে এবং ক্লাবে টেনিস খেলার মধ্যেই সে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায়। তার বাংলা ভাষাও সীমিত, কে বলবে বাংলা ভাষার আভিধানিক হরিচরণবাবুর তার বাবার বন্ধু ছিলেন, কে বলবে তার মায়ের চোখের সামনে কবিগুরুর শেষ বয়সের অনেক সেরা লেখা শেষ হয়েছে ? মনসিজ বানান ভুল করে, ও শব্দের অপপ্রয়োগ তো লেগেই আছে, ইংরিজিটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। ওইটাই এসে যায় সহজে, মাতৃভাষার আগে। দোষ দেওয়া যায় না, ওইভাবেই তো কুমায়ুন স্কুলে ইংরিজি শেখানো হয়েছে। কুমায়ুনের আগেও একটা পর্ব ছিল। খোদ আনন্দধামে তার শিক্ষার শুরু হয়েছে, শিক্ষকের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং স্বরূপ। আশীর্বাদ নিয়ে তিনিই তো এই প্রতিষ্ঠানের সব। অসামান্য প্রতিভা নিয়ে এলেও তিনি এই আনন্দধামের দায়িত্ব নিয়েছেন এই ছোট্ট আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে, যার সঙ্গে ওঁদের বংশগত সান্নিধ্যও লুকিয়ে আছে।

বিরল প্রতিভা তাঁকেও বলা চলে। ইংলন্ডে উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চা সাফল্যের সঙ্গে সেরে এসে বিহারের এক প্রান্তে এই আনন্দধামের সামান্য দায়দায়িত্ব গ্রহণ। আজকের ভারতকে অতীতের শ্রেষ্ঠত্বে সমুজ্জ্বল করে গৌরবের ভারত গড়ে তোলার সে কী অদম্য আগ্রহ স্বরূপের মধ্যে।

এই একই নেশায় পরবর্তীকালে উদ্বেল হয়েছিলেন জগন্ময় মজুমদার। অবশ্য তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস ছিল এক আশ্রমবালিকা। রাজকন্যার পাণিগ্রহণের সঙ্গে যেমন অর্ধেক রাজত্ব পাওয়া যায়, তেমন আশ্রমকন্যা বিবাহের সঙ্গে অর্ধ-বৈরাগ্য প্রাপ্তির ঝুঁকি থাকে। জগন্ময়ের ইউ পি-র আত্মীয়রা নিন্দায় মুখর হয়েছেন, সহপাঠীরা দুঃখ করেছেন, শিক্ষকেরা উপদেশ দিয়েছেন—ইংরেজির ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ারটা এইভাবে অপচয় কোরো না, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। জগন্ময় মজুমদার তাঁর কনট সার্কাসে তৈরি করা সুটে ন্যাপথলিন বল ঢুকিয়ে একটা ব্ল্যাক জাপান বক্স সমেত একদা এই আনন্দধামে উপস্থিত হয়েছেন পাঠশালার পণ্ডিত হিসেবে।

এসেই কিনে ফেলেছেন একগাদা বাংলা বই সেই সঙ্গে সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ। সুশীলা ইঙ্গিত দিয়েছে তার দুর্বলতার, "তুমি পড়াবে স্কুলে, আর আমি পড়াব তোমাকে বাড়িতে। বাংলা বানান ও বাংলা প্রয়োগ ব্যাপারে এখানকার আশ্রমিকরা নির্মম।" কে যেন বলেছিল, এখানকার পরিচারিকারাও কলকাতার গ্র্যাজুয়েটদের থেকে ভাষানিপুণা। হলেও হতে পারে। সুর এদের টানে, এদের চলনেও কবিতার ছন্দ, এখানে ঘর ঝাঁটা দেওয়ার ভঙ্গিতেও নৃত্য—সত্যি এখানকার আকাশে-বাতাসে কে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

ডোরা দূর থেকে বন্ধুপরিবৃত মনসিজকে দেখল। একটা জিনের গ্লাস হাতে তারিয়ে তারিয়ে কোম্পানি ল ব্যাখ্যা করছে, কোম্পানির ডেপুটি সেক্রেটারি মনসিজ মজুমদার। শুধু ডেপুটি সেক্রেটারির ততটা খাতির নেই যতটা আছে পরিচ্ছন্ন ইংরিজির ব্যুৎপত্তি। কে একজন বলল, "ভারতবর্ষের ধনীরা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আরও বড়লোক হতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্যে যারা নিজেদের প্রাণমন নিবেদন করেছেন তাঁদেরই সামাজিক নাম কোম্পানি সেক্রেটারি।"

খুব হাসছে মনসিজ, কিন্তু বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারছে না। আর ডোরা ভাবছে, সে ছিল কোম্পানি সেক্রেটারির সেক্রেটারি। অর্থাৎ সব সেক্রেটারিই সেক্রেটারি, কেউ প্রাইভেট, কেউ

কোম্পানির !

পার্টিতে এসেও শ্বশুরের কথা মনে পড়ছে ডোরার। স্বামীকে আবার বলল, "বাবা আজ খেলেন না।"

বিয়ের দিনে মানুষ উপবাস করে। কিন্তু বিয়ের বার্ষিকীতে উপবাস করার কোনও মানে হয় না। "মানুষ যদি খেয়ালি হয় তা হলে কী করা যাবে, ডোরা ?" মনসিজের উত্তর।

ডোরা চুপ করে রইল। আর মনে পড়ল, সেবার ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিস থেকে ফেরার পথে মনসিজ প্রথম বাবার প্রসঙ্গ তুলেছিল। বলেছিল, "বাবা বড্ড একলা, নিজের তৈরি এক জগতে তিনি নিজের খেয়ালে বসবাস করেন। বাবাকে একটু দেখতে হবে তোমাকে। যদিও দেখবে, বাবা ভীষণ সেলফরিলায়েন্ট।" আত্মনির্ভর কথাটা মনসিজ ঠিক সময়ে স্মরণ করতে পারেনি।

পরে ডোরা আবিষ্কার করেছে, বাবা শুধু আত্মনির্ভর নন, অনেকটা আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ—নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন নিজের সাজানো জগতে, কারও কাছেই তাঁর তেমন প্রত্যাশা নেই, কোনও দাবি নেই। অথচ এই মানুষ একদিন প্রেম করেছিলেন, প্রেমে পাগল হয়েছিলেন এক চণ্ডালিকার জন্যে। সেই প্রেমের টানে কুমায়ুন পাহাড় থেকে সরে এসেছিলেন বিহারের গণ্ডগ্রামে।

হাতের মুঠোয় যে-সোনার কেরিয়ার ছিল তা নির্দ্বিধায় ত্যাগ করে তিনি গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমশাই হয়েছিলেন কেন—এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। আদর্শের জন্যে ? একেবারে শুরু থেকে শুরু না করলে নতনভাবে গড়া যাবে না এই দেশকে, যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদেরই একজন এই জগন্ময় মজমদার। না, এও প্রেমের বেদীতে আরও একজন ভক্তের নিজেকে নিঃশব্দে নিবেদন। আশ্রম-পরিবেশে সুশীলাকে পাওয়াই যদি জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত হয়, তাহলে সামান্য একটা কেরিয়ার সেখানে কী ?

এতদিন পর তৈলাধারে পাত্র না পাত্রাধারে তৈল তা বিশ্লেষণ করে লাভ কী ? জগন্ময়ের কেরিয়ার তো একটা মৌসুমী ফসলের মতন—প্রস্ফুটিত হয়ে সেই কবে শুকিয়ে গিয়েছিল। জগন্ময় মজুমদারের সহপাঠীরা যারা কেরিয়ারকে বরণ করেছিল তারাও কেরিয়ারের শেষে অবসর নিয়েছেন—বড় জোর তাঁরা সরকারের সেক্রেটারি, কিংবা রাজ্যপাল হয়েছেন। তাঁদের অনেকে দিল্লির ভাল ঠিকানায় বাড়ি করেছেন, একজন বিলেতপ্রবাসী হয়ে বিদগ্ধমহলে বিখ্যাত হয়েছেন। সে তুলনায় কেউ জানে না, কেরিয়ার বিসর্জন দিয়ে জগন্ময় মজুমদার কী করলেন। পাঠশালার মাস্টারমশাই হয়ে নিজের 'এগো' কে সুড়সুড়ি দেওয়া যায়, নিজের অহঙ্কারকেও কিছুটা নিপীড়নের তৃপ্তি দেওয়া যায়, কিন্তু তার থেকে বড় কী আর সম্ভব হতে পারে ? পাঠশালা, সে যত বড় পাঠশালাই হোক, এখন আর মহামানবের শৈশব লীলাক্ষেত্র হবে না। আসলে, ডাইনোসেরাসের যুগের যেমন অবসান হয়েছে, তেমন মহামানবের যুগরেও অবসান হয়েছে। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এসব আর পৃথিবীতে জন্মাবেন না, জন্মালেও তাঁরা আকারে বড় হতে পারবেন না, বড় সাইজের মানুষকে ঠাঁই দেবার মতন ঘর থাকছে না আজকের পৃথিবীতে।

ডোরা অতশত বোঝে না। পৃথিবীতে এত কিছু বোঝবার, ভাববার আছে তাই সে জানত না স্বামীর সংসারে আসবার আগে। তখন ছোট্ট জগতে ছোটখাট সুখ, ছোটখাট দুঃখ নিয়ে সে ব্যস্ত থাকত—শুধু জানত ছোট সুখটুকুও আয়ত্তে থাকবে না যদি না নিজের নৈপুণ্য বাড়ানো যায়। নিপুণা প্রাইভেট সেক্রেটারির টাইপরাইটারের কাছেই পৃথিবী বশ্যতা স্বীকার করবে।

আর এখন, মনে কতরকম প্রশ্ন, মনসিজের বাবাকে নিয়ে। মানুষটা সেই ভোরবেলায় শয্যা ত্যাগ করে নিজের সাধনার জগতে নিজেকে বন্দি করে রাখে। বন্দি কথাটা বোধ হয় ভাল নয়, ব্যস্ততার মধ্যে বন্দি হয়ে থাকা—যাতে পৃথিবীর কারও কোনও ক্ষতি না হয়, কারও কোনও বিরক্তি না হয়। যে-যেখানে আছ তাকে সেখানে থাকতে দাও, প্রভু।

আর ডোরা এখন শ্বশুরের অতীত নিয়ে তেমন চিন্তা করে না। এমন ব্রিলিয়ান্ট মানুষ নিজের

কেরিয়ার নষ্ট করলেন প্রেমের তাগিদে ? না আদর্শের তাগিদে ? মাঝে মাঝে লোভ হয় শ্বশুরকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করবে। আবার কখনও মনে হয়, দুটো তাগিদই হয়তো একত্রিত হয়েছিল সময়ের খেয়ালে, পরিবেশের প্রয়োজনে, কিংবা ভবিতব্যের বিধানে।

এখনও রাত কাটেনি। পূর্বাশার সাততলা থেকে আকাশের তারাদের স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। রাতটা '*হেকটিক*' কেটেছে—এই হেকটিক কথাটার বাংলা মনসিজও জানে না, ডোরাও জানে না। আসলে পার্টি থেকে বাড়ি ফিরতে রাত একটা, চুপি চুপি এসে চুপি চুপি ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি ঘোরানো, কোনরকম আওয়াজ না করে, যাতে বাবা না জেগে ওঠেন। মনসিজের গাড়ি নেই, পূর্বব্যবস্থামতো বন্ধুই পৌঁছে দিয়েছে। পার্টির শেষে ভাড়াটে গাড়ি একটা থাকলে উপভোগটা বাড়ে। "এই শালা ঘর। দিল্লিকা লাড্ডুর মতন—ফেরার তাগিদ থাকলেও খারাপ, না থাকলেও খারাপ," মনসিজ বলেছিল।

"দুনিয়াটা আশ্চর্য, ডোরা," আরও বলেছিল মনসিজ, "দুনিয়ার পাঁচশ কোটি লোক— প্রত্যেকের আলাদ ঠিকানা আছে ভাবলে মাথা ঘুরে যায়—দুনিয়ার পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের ভূমিকাটা মানুষ ঠিকমতন বুঝল না।" মদের নেশাতেই বকবক করছিল মনসিজ।

তারপর মনসিজ বলেছিল, "অনেক সময় নিয়ে কোর্টশিপ না করে দুম করে বিয়ে করে ফেলে তোমার ওপর অন্যায় করে ফেলেছি, ডোরা।"

"কী যা তা বকছ !"

"আসলে তোমাকে দেখে এত ভাল লেগে গেল। তারপর ভীষণ ভয় হয়ে গেল, যদি তুমি সব বুঝেশুনে আমার নাগালের বাইরে চলে যাও, ডোরা। ইউ আর সাচ এ সুইট গার্ল—ইউ আর সাচ এ ফাইন পার্সন।"

"আঃ, কী হচ্ছে মনসিজ !"

"তুমি জানো না আমার নামের অর্থ, ডোরা। তুমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া লোরেটো গার্ল—বেঙ্গলি সামাজিকতার গোলকধাঁধার সব কিছু বুঝতে তোমার সারা জীবন কেটে যাবে। জেনে রেখো, আমার নমকরণ করেছিলেন, স্বয়ং শ্রীস্বরূপ—আনন্দধামের প্রাণপুরুষ। মস্ত বড় মানুষ—মস্ত বড় ত্যাগের একটা বিরাট শিলাখণ্ড চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর ওপর। সাপ্রেস্‌ড হলে বাঙালিরা ভীষণ প্রস্ফুটিত হয়—যত বোঝা চাপিয়ে চেপে রাখবে তত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে বাঙালিরা। ওই দেখো আমার বাবাকে—জগন্ময় মজুমদারকে। বুকের ওপর একটা মস্ত পাথর চাপিয়ে, হোল লাইফের টুয়েলভ-ও-ক্লক বাজিয়ে কেমন বোম্‌ভোলা হয়ে বসে আছেন চন্দ্রসূর্যতারায় ভরা আকাশের দিকে চেয়ে।"

"আঃ কী হচ্ছে, মনসিজ।"

"শোনো ডোরা, আমার নামের মানেটা গোলমেলে। মন হইতে যার উৎপত্তি সে মনসিজ। আমার অপর নাম কামদেব। দুনিয়ার সেরা তপস্যাগুলো গুবলেট করার জন্যে আমার সৃষ্টি—আমি মনসিজ।"

আরও কিছুক্ষণ বকুনি চলত। মনসিজকে আর কখনও ডোরা এত ড্রিঙ্ক করতে দেবে না। ভুল হয়ে গিয়েছে।

এবার সানি পার্কের পূর্বাশা এসে গিয়েছে। যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ভাড়ার প্রাইভেট গাড়ি আবার অন্ধকারে লীন হয়ে গেল।

মাঝরাতের ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে মাত্র একশ মিনিটের ঘুম—প্রকৃত অর্থে 'হানড্রেড উইংক্‌স'। পৌনে তিনটেয় আবার অফিসের গাড়ি এসেছে, ডোরা তুলে দিয়েছে স্বামীকে, তাকে ভোরের ফ্লাইট ধরতে হবে অফিসের কাজে। যাদের কর্মজীবন এবং সামাজিক জীবন দুই-ই আছে তাদের জন্যে ঘুমের

ব্যবস্থা না-রাখলেই ভাল করতেন ভগবান।

ডোরাকে একটা লম্বা চুম্বন দিয়ে দাড়ি না কামিয়েই মনসিজ তার অফিসের কাগজপত্তর নিয়ে ছুটেছে এয়ারপোর্টের দিকে। পথে আর একজনকে তুলতে হবে। এদের সবাইকে চেনে ডোরা। স্বামী.' অফিসে কিছুদিন কাজ করার এই এক সুবিধে।

পূর্বাশার বারান্দা দিয়ে ডোরা গাড়িটাকে চলে যেতে দেখল। এত রাত্রে কলকাতায় কত গাড়ি চলে ? কলকাতার চোখে কখনই কি ঘুম আসে না ? "আসে, যখন বন্‌ধ্ ডেকে ট্যাবলেট খেয়ে কলকাতা ঘুমিয়ে পড়ে !" মনসিজ একবার বলেছিল।

"তখন তো কুম্ভকর্ণের নিদ্রা !" বলেছিল ডোরা।

"ঠিক বলেছ ! কলকাতার কাঁচা ঘম ভাঙালেই যত বিপত্তি ! সাধে কী আর কবিগুরু পালিয়েছিলেন এই শহর থেকে। সাধে কী আর গড়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতন এবং আমার বাবা-মায়ের প্রিয় আনন্দধাম !"

নিজের ঘরে যাবার আগে একবার মনসিজের বাবার ঘরে উঁকি মারল ডোরা। ভোরবেলায় উঠে পড়ার মানুষ—কিন্তু এখনও সময় হয়নি।

ডোরার চোখেও ঘুম নেই। জীবনটা যেন একঝলক স্বপ্নের মতন চোখের সামনে হাজির হয়। ছোট জগতে ছোট মানুষ ডোরা—কখনও কোনও বড় চিন্তা বড় ভাবনা তাকে ভারাক্রান্ত করেনি। তাতে দুঃখ ছিল, কিছুটা অপমান। ব্যাপারটা বাবা শীলু চ্যাটার্জিকে নিয়ে। ডোরার মাকে ত্যাগ করে তিনি আবার বিবাহ করে উধাও হয়েছিলেন হরিয়ানায়। ভালই হয়েছে, লাহোরের লোকের পক্ষে হরিয়ানাই ভাল—শুধু কলকাতায় রয়ে গেল কিছু স্মৃতি। শীলু চ্যাটার্জি বিয়ে করেছিলেন মণিকা দত্তকে। পরেরবার কোন্ এক তার পার্শ্বচরীকে। মণিকা চ্যাটার্জি ভেঙে পড়েননি। সেন্ট জুডস থেকে শর্ট হ্যান্ড শিখেছিলেন। তারপর ঢুকেছিলেন ডাকসাইটে টায়ার কোম্পানিতে। ধাপে ধাপে বড়সায়েবের সেক্রেটারি হয়েছিলেন। মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন লোরেটো ধর্মতলায়, পরে লোরেটো মিডিলটনে। মিথ্যাচার হবে যদি না স্বীকার করেন, মেয়ের খরচটা তার বাবা জুগিয়েছে হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে। প্রতি মাসে স্টেট ব্যাঙ্কের পার্কস্ট্রিট ব্রাঞ্চে নিয়মিত টাকা এসে গিয়েছে পয়লা তারিখে। কিন্তু ওই পর্যন্ত—টাকা ছাড়া কোনও সম্পর্ক ছিল না।

মণিকা চ্যাটার্জি মেয়েদের আত্মনির্ভরতায় বিশ্বাস করতেন। বেশি পথ খোলা নেই মেয়েদের সামনে তাও জানতেন। মেয়েদের আত্মরক্ষার তিনটি অস্ত্র—সেলাই, নার্সিং এবং টাইপিং। সেলাইয়ে শ্রম আছে কিন্তু অর্থ নেই, খেটে মরাই সার হয়—পাওয়া যায় না কিছুই। নার্সিং-এ মনের শান্তি আছে, কিন্তু দেহের স্বস্তি নেই—আর আছে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের টেনসন। জয় হোক পিটম্যানের এবং রেমিংটনের—অর্থ আছে কিন্তু নাইট ডিউটি নেই, দায়িত্ব আছে কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেটের দাঁত খিঁচুনি নেই। মেয়েকেও বলেছেন, "শিখে নাও। মেয়েদের কখন কী কাজে লেগে যায় তার ঠিকানা নেই। ভাল সেক্রেটারি সাহারা মরুভূমিতে বসে থাকলেও কাজ পাবে।" কথাটা মিথ্যে নয়—মায়ের জীবনেই সত্য হতে দেখেছে ডোরা—বিপর্যয় এসেছে কিন্তু ভেসে যেতে হয়নি। বি এ পাশ করবার আগেই শর্ট হ্যান্ডে সুদক্ষা হয়ে উঠেছে ডোরা চ্যাটার্জি।

প্রথমে কাজ পেয়েছিল—বিলিতি ব্যাঙ্কে। টাকা পেয়েই শীলু চ্যাটার্জিকে লিখেছিল খোরপোষ বন্ধ করতে। মা আপত্তি করেননি। আশ্চর্য, বাবাও আপত্তি করলেন না, বন্ধ করে দিলেন স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে সতেরো বছরের সম্পর্ক। এরপর কেরিয়ারে অ্যাম্বিশন এসেছে ডোরার—মেয়েরা এই পিটম্যান পাঠ করেই হাজার হাজার টাকা উপার্জনের স্বপ্ন দেখছে। বাজার দর বাড়ছে সেক্রেটারির—তবে চাকরি ধরতে হবে, ছাড়তে হবে।

অবশেষে এই মনসিজের অফিসে। ভবিতব্যে এমনই লেখা ছিল নিশ্চয়। না হলে ডোরা চ্যাটার্জি

ও মনসিজ মজুমদারের এইভাবে দেখা হবে কেন ?

এই অফিসে মহিলা কর্মী ও পুরুষ অফিসারের প্রশ্রয় নিষিদ্ধ—তবু প্রজাপতির ষড়যন্ত্র অব্যাহত। পরস্পরকে দেখা এবং ভাল লাগা দুর্জয় বেগে এগিয়ে গিয়েছে—যদিও অফিসের আইনকানুন মেনে প্রতি পদক্ষেপে দুজনকেই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে। পরিচয়ের পরেই শুরু হয় আবিষ্কারের পালা যা একসময় পৌঁছে দেয় প্রেমে—সময়ের এই ব্যবধানটুকু মনকে রাসায়নিক 'স্টেবিলিটি' দেয় যা পরবর্তী জীবনে কাজে লেগে যায়। কিন্তু হৃদয় যখন কাউকে ডবল প্রমোশন দিতে প্রস্তুত তখন কে বাধা দেবে !

অথচ বলার তো আছে দুজনেরই। মণিকা চ্যাটার্জি ও শীলু চ্যাটার্জির ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে জেনে রাখা ভাল। দু পক্ষের কে কী কেন এবং কোথায় তারও তো একটা হিসেব দাখিল প্রয়োজন। কিন্তু বন্যার স্রোত যখন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তখন হিসেবখাতার কথা মনে পড়ে না।

"বিয়েটা হচ্ছে প্যারাসুট জাম্পিং-এর মতন। দুম করে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়লেই হল, তারপর সব কিছু ঘটে যাবে তার নিজস্ব গতিতে।"

ডোরার মা একটু অস্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু জানতেন এমনই হবে—কারণ এমনি দুম করেই তিনি বিবাহ করেছিলেন লাহোরের শীলু চ্যাটার্জিকে।

ডোরা বলেছিল, "ভাল ছাত্র নিশ্চয়। পরীক্ষায় কৃতিত্ব না দেখাতে পারলে এই কোম্পানিতে অফিসার হওয়া যায় না।"

মা মনে মনে বলেছিলেন, ভাল ম্যানেজার মানেই যদি ভাল স্বামী হত তা হলে তো এই পৃথিবীতে অনেক মেয়েরই কোনও দুঃখ থাকত না।

প্রেম যখন হাইস্পিডে এগোতে চায় তখন দুনিয়ার সবাই পরামর্শ দেয় গতিবেগ কমাও—ভেবেচিন্তে দেখো। ঝপ করে কিছু করে বসো না। রেজিস্ট্রি অফিসের কর্তারাও চান 'কুলিং পিরিয়ড'— সময় নাও, নোটিশ দাও। আরে বাপু যা টগবগ করে ফুটছে তাকে অযথা ঠাণ্ডা করে এ সংসারে কী লাভ হবে ? হৃদয়ের উত্তাপ থেকেই তো প্রেম—উত্তাপ কমিয়ে দিয়ে ওপরে ঠাণ্ডা হাওয়া করলে দুধে সর পড়ে, তাতে ভাল রাবড়ি হয়, কিন্তু প্রেম দীর্ঘজীবী হয় না।

মনসিজ সব জেনেই ঝপ করে সব ম্যানেজ করে ফেলেছে একদিন। পথ জানা থাকলে ট্যাক্সি থেকে নেমে পনেরো মিনিটের নোটিশে বিয়ে রেজিস্ট্রি করে আবার ওয়েটিং ট্যাক্সিতে ওঠা যায়। অনেক জিনিস আছে যা দুম করে, করে ফেলতে হয়, মনসিজের ধারণা। তার লেখাপড়াটা রানীক্ষেত ও আলমোড়ায়।

বিয়ে তো হল। ট্যাক্সি তো দাঁড়িয়ে। অতঃকিম্ ? ডোরা জানে একটা বেআইনি কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে—কোম্পানির শৃঙ্খলাভঙ্গ। রেজিগনেশন না দিয়ে হনিমুনে যাবার কথাই ওঠে না !

মনসিজের কাণ্ড ! ট্যাক্সি সোজা উঠল সানি পার্কের পূর্বাশায়। বলল, "কোনও চিন্তা নেই বাড়িতে কেবল বাবা আছেন।"

মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে সাহসই হল না ডোরার। বুঝল, মা আছেন, কিন্তু আপাতত এখানে নেই।

রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার ! রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সোজাসুজি শ্বশুরের সামনে। রেজিস্ট্রির কথা শুনে বাবা আশ্চর্য হলেন না। বললেন, "বসো বউমা, আমি এবং তোমার শাশুড়িও পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও বিয়ে করেছিলাম। হিয়ার উই আর। জীবন তো কাটানো। আমাদের বিয়েতে সাক্ষী ছিলনে স্বরূপ—আনন্দ ধামের প্রাণপুরুষ, তোমার শাশুড়ির স্বরূপদা।"

ফ্রিজ থেকে মিষ্টি বের করে এনে বউমাকে দিলেন। খবর নিতে গিয়ে শুনলেন, মা আছেন, বাবা থেকেও নেই। মোটেই উদ্বিগ্ন হলেন না জগন্ময়। বললেন, "দাঁড়াও তোমার মাকে খবরটা দিই।"

বললেন, "মিসেস চ্যাটার্জি, আপনার মেয়ে এবং আমার ছেলে ধন্যবাদের পাত্র—কোনও রকম পরিশ্রম না করেই আমরা প্রমোশন পেয়ে গেলাম!"

শেষে বললেন, "আজ ওকে ছাড়ছি না, ও থেকে যাক এখানে। এইটা তো আপনার মেয়েরই সংসার। আমি এক গেঁয়ো পাঠশালার বুড়ো মাস্টারমশাই—সব ছেড়েছুড়ে এই ছেলের আশ্রয় নিয়েছি। আমার কোনও কাজ নেই—এ বাড়িতে এক জন কেয়ারটেকার দরকার।"

এরপর নিজের ট্রাংক খুলে একখানা ছবি বার করলেন। বললেন, নন্দলাল বসুর আঁকা—আমাদের বিয়ের দিনে শান্তিনিকেতন থেকে ট্রেনে চড়ে এসে উপহার দিয়েছিলেন, এইটাই নাও। আমাদের সামনেই আধ ঘন্টা ধরে দু'জনকে আঁকলেন, তারপর ফ্রেস করে পাঠিয়ে দিলেন।"

দারুণ অস্বস্তি থেকে শ্বশুরমশাই সেদিন ডোরাকে মুক্তি দিয়েছিলেন, যে জন্য তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

জামাকাপড় পাল্টে এসে মনসিজ বলল, "বিয়ে করে তোমার ছেলের চাকরিটা আজ যেতে বসেছিল, বাবা।"

"সাধের বউ পাবার জন্যে সাধের চাকরি ছাড়াটা নতুন নয়, খোকা।"

খুব হাসল উত্তরটা শুনে। তারপর মনসিজ বলল, "বাবা, লাইক এ বিযাল সতীসাধ্বী ডোরাই রেজিগনেশন দিচ্ছে, আমার চাকরিটা যাতে থেকে যায়।"

বাবা সেই রাত্রে নিজেই রাঁধলেন, বউমাকে কিছু করতে দিলেন না। গড়িয়াহাট থেকে বউমার জন্যে রেডিমেড ব্লাউজ-শাড়ি কিনে আনলেন। খাওয়ার পরে বললেন, "তোমার নামটা বড্ড বিলিতি—অ্যাডিশন অলটারেশন করে নতুন নাম দিলাম বসুন্ধরা, দেখতে পাচ্ছ ওর মধ্যে ডোরা লুকিয়ে রয়েছে। স্বামীর জন্যে তুমি নিজের চাকরি বিসর্জন দিলে—বসুন্ধরা মানে ধরিত্রী—অনেক ভার বইতে হয় তাকে।"

ঘড়িতে এখন রাত চারটে। দূরে বড় রাস্তায় ট্রাক চলার আওয়াজ ভেসে আসছে এই সাততলায়। ডোরা অর্থাৎ বসুন্ধরার চোখে ঘুম নেই। শ্বশুরমশায়ের কাছে তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই ; সংসারযাত্রার প্রথম পর্বটা তিনি সস্নেহে সহজ করে দিয়েছিলেন।

মা পরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোর বাবার কথা ওঠেনি ?"

"ওটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি মা। আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা ওই বাংলা নিয়ে। শ্বশুরমশাই এখন আমাকে বাংলা শেখানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, "ছেলেটা তো শিখল না, তুমি শেখো মা। তিলে তিলে এই যে বিরাট লাইব্রেরি গড়েছি তার কী হবে, মা ?"

শাশুড়ির খবর নিয়েছেন মা। ডোরা বলেছে, "তিনি তো সেই রানীক্ষেতে—কুমায়ুন পাহাড়ের গায়ে মস্ত মজুমদার ভিলা—আমার শ্বশুরের পৈতৃক ভিটে। ওইখানেই তো আনন্দধামের আদিপুরুষ শ্রীস্বরূপের দেখাশোনা করেন আমার শাশুড়ি সুশীলা মজুমদার।"

ব্যাপারটা ঠিক ঢুকছিল না মায়ের মাথায়। ডোরা বলেছে, "তুমি বুঝবে না এই পরিবারকে। এঁদের সমস্ত সত্তা ডুবে আছে আনন্দধামে। সেই আনন্দধাম শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা করেছেন শ্বশুর—কায়ক্লেশে জীবন কাটিয়েছেন। সমস্ত জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়ে শেষজীবনে আবার একটু সুখের মুখ দেখেছেন দিদির পারিবারিক ভিটে বিক্রি করে। অর্ধেক টাকায় কিনেছেন পূর্বাশার ফ্ল্যাট। আর বাকি টাকায় চলেছে সংসারযাত্রা।" আনন্দধাম দেখা হয়নি ডোরার। ওখানকার সব খবরও সে রাখে না। শুধু জানে এর পিছনে রয়েছে একজন মানুষের নিঃশব্দ ত্যাগ, স্বরূপদা। নিজের প্রতিভার গুণেই নিজের অধিকারেই মস্ত লোক হতে পারতেন তিনি। কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার সেবার জন্য সর্বস্ব দান করলেন তিনি। দান মানে অর্থ নয়—নিজের বর্তমান, নিজের ভবিষ্যৎ। আপনজন হয়েও আত্মীয়তার

অধিকার গ্রহণ করতে চাইলেন না ; চাইলেন শুধু আনন্দধামের সাফল্য। মহাজনের স্বপ্ন সফল হোক, গড়ে উঠুক এই আনন্দধাম প্রয়াতজনের স্বপ্নসৌধ রূপে।

"এত দিয়েছেন এরা।" বলেছিলেন জগন্ময়। নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিলেন মানুষের কল্যাণে। প্রতিদানে কিছুই প্রত্যাশা ছিল না। স্বরূপকে শ্রদ্ধা না-করে পথ নেই। "যেখানে শ্রদ্ধা নেই সেখানে সাফল্য নেই। এই যে সারা দেশটা আজ অবক্ষয়ের পথে চলেছে তার কারণ শ্রদ্ধার অভাব, বিশ্বাসের অভাব", বলেছিলেন জগন্ময় মজুমদার।

জগন্ময় মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী কিছুটা গুরুঋণ শোধ করতে চেষ্টা করেছেন। এত করেও আশ্রমবাসীদের কোপানলে পড়েছেন স্বরূপ। এত ঋণ যে পরিবারের কাছে তার বিস্মৃতি বড়ই বেদনাদায়ক। ইচ্ছে করলেই পল্লীসমাজের কুৎসা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে চালাতে পারতেন নিজের প্রভুত্ব। কিন্তু বড় সরল মানুষ এই স্বরূপ। জীবনের শেষ প্রান্তে সর্বস্ব নিবেদন করেও নিজেকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে পারলেন না। স্থির করলেন, আনন্দধাম থেকে বিদায় নেবেন তিনি, অন্তত কিছুদিনের জন্যে। একদিন রাতে, স্বরূপ এলেন জগন্ময়ের কুটিরে অনাহূতের মতন। যিনি এই ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তিনি সন্ধান করছেন কোনও আশ্রয়ের—আনন্দধাম থেকে অনেক দূরে। যে বড় কাজ বহু বছর আগে এখানে শুরু হয়েছে তা যেন স্তব্ধ না হয় কোনও বিতর্কিত জনের উপস্থিতিতে—এই মাত্র প্রার্থনা স্বরূপের।

সে কাহিনীর সবটুকু বিস্তারিত শোনা হয়নি ডোরার। শুনেও সে সবটুকু বুঝতে পারবে না—বড় জটিল এই আশ্রমজীবন। পরব্রহ্মের সন্ধানে এসে মানুষ কত সহজে এখানে পরনিন্দায় জড়িয়ে পড়ে অসহায়ভাবে—লজ্জাবোধ পর্যন্ত থাকে না। কে জানে আদিকালের অচার্যগৃহেও হয়তো একই পরিবেশ ছিল, সেসব দিনের বিস্তারিত বিবরণ কালের শাসন পেরিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে সক্ষম হয়নি।

ডোরা বোঝে, এই পরিবারের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে আনন্দধাম আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের প্রতি। আশ্রমজীবন যাপন করেই সেই দায়িত্ববোধ সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয়নি। তাঁদের জন্য প্রয়োজনে আরও অনেক কিছু করার জন্যে শুধু জগন্ময় নন, আজন্ম আশ্রমে লালিতা সুশীলাও সদাপ্রস্তুত। অবশেষে সেই দুর্লভ সুযোগ এসেছে—ক্লান্ত, বিব্রত স্বরূপ যখন আশ্রমপ্রতিষ্ঠাতার ভাবমূর্তি অম্লান রাখার ব্যাকুলতায় স্বেচ্ছানির্বাসনে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ।

ডোরা তার দিনলিপিতে লিখেছে, "আদর্শবন্দী আমার শ্বশুর-শাশুড়ি। বিপদের সময় তাঁরা পিছিয়ে গেলেন না, এগিয়ে এলেন দুর্জয় সাহসে। রানীক্ষেতের মজুমদার নিকেতনের কথাই প্রথমে মনে পড়ল। সুশীলা চললেন স্বরূপকে নিয়ে তাঁর সেন্ট হেলেনায়। সঙ্গে বালক পুত্র, যার নাম মনসিজ। শ্বশুর রয়ে গেলেন আনন্দধামে নিজের শিক্ষকতার কাজে। শুধু বিসর্জন দিতে হল শাশুড়িকে তাঁর কাজে। শ্বশুর এ-বিষয়ে তেমন কিছু বলেন না, কিন্তু বুঝতে পারি আশ্রমপ্রধানের জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁরা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, না হলে বড় বিপর্যয় ঘটত। যে-পরিবার যুগ যুগ ধরে শুধু দিয়েই গিয়েছেন, তাঁদেরই একজন মাত্র একবারই শীতের বিষণ্ণ সন্ধ্যায় আনন্দধামের কুটিরে এসে কড়া নাড়লেন। জগন্ময় মজুমদার লেখাপড়ার জগতেই ডুবে থাকেন, বাইরের খবরাখবর তেমন রাখেন না। কিন্তু সুশীলার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি বললেন, বিনা অপরাধেই নির্বাসন চাইছেন। কিন্তু একটা কিছু না-করাটা অন্যায় হবে। আমার শ্বশুর ভরসা দিলেন, শক্তি দিলেন, বললেন, আমরা কেন আছি ? 'ইনভার্টেড' জীবনপর্ব শুরু হল। শ্বশুরমশাই ভাবলেন, রানীক্ষেত থেকে ভবিতব্যের টানে তিনি এসেছিলেন এই আনন্দধামের আশ্রমবাসী হতে, আর ভবিতব্যের রসিকতায় এখন আশ্রমপ্রধান যাচ্ছেন রানীক্ষেতে আশ্রয়সন্ধানে। ভাগ্যে সুশীলা সঙ্গে থাকছে, মনসিজেরও না গিয়ে উপায় নেই। তবে তার তেমন অসুবিধে নেই, রানীক্ষেতে ভাল স্কুল আছে।"

পাশের ঘরে সামান্য একটু আওয়াজ হল। এবার আলো জ্বলে উঠল—কারণ সেই আলোর সামান্য অংশ অস্বচ্ছ কাঁচের নিষেধ অমান্য করেই পূর্ব দিকের বারান্দায় এসে পৌঁছল।

জীবনকে অবিশ্বাস্য এক শৃঙ্খলার ছকে বেঁধে নিয়েছেন শ্বশুরমশাই। এই ভোররাতে তিনি কিছুক্ষণ যোগব্যায়াম করবেন। যোগব্যায়াম শেষে সেবন করবেন কিছু আয়ুর্বেদীয় ভেষজ। মানবশরীরে রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ না করেও প্রাকৃতিক উপায়ে দেহ পরিচর্যার যেসব গোপন রহস্য শত সহস্র বৎসর আগে এ দেশের গবেষকগণ আবিষ্কার করেছিলেন তা আজও মানবসমাজের বিস্ময়। সেইসব ভেষজের সাহায্য দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত গ্রহণ করেছেন জগন্ময়, নির্দেশনা পেয়েছেন স্বরূপের। কখনও দুঃখ করতে হয়নি। ফলও পেয়েছেন যথেষ্ট—ম্যালেরিয়া এবং বিভিন্ন বঙ্গীয় রোগের পীঠস্থানে জীবন অতিবাহিত করেও কখনও তেমন রোগাক্রান্ত হননি। এইসব ভেষজের জন্য যেসব প্রস্তুতি অথবা অনুপানের প্রয়োজন হয় তার জন্য জগন্ময় কখনও পরনির্ভর হন না, নিজেই সব ব্যবস্থা করেন। বরং ডোরাকে তিনি সাহায্য করেন, তাকেও এক-আধটা ওষুধ দেন। বলেন, বিষাক্ত কেমিক্যালস-এর বিরুদ্ধে আমার কোনও বিরাগ নেই বউমা, তবে ওদের সাহায্য নেবার আগে প্রকৃতিকে একটু সুযোগ দেওয়া উচিত।

জগন্ময় এসব গাছগাছড়া চেনেন। অনেক কিছু রোপন করেছিলেন আনন্দধামের বাগানে। ঐসব ছেড়ে যে চলে আসতে হবে ভাবেননি কখনও। এক এক সময় ডোরার মনে হয়, শ্বশুরমশাই রানীক্ষেত চেনেন, আনন্দধাম চেনেন, কিন্তু চেনেন না এই কলকাতাকে। একবার রসিকতা করে আশ্রমজীবনের বন্ধু কানু গাঙ্গুলিকে বলেছিলেন, এই শহরটা আমার জীবনে 'মধ্যপদলোভী কর্মধারয়'। খুব হেসেছিলেন বাবার বন্ধু—কেন তা বুঝতে পারেনি ডোরা। এসব বুঝতে গেলে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় যে ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন তা ডোরার নেই।

পাশের ঘরে এবার ঠুক করে আওয়াজ হল। ডোরা বোঝে, শ্বশুরমশাই এবার স্নানঘরে প্রবেশ করছেন। এও এক পুরুষের অভ্যাস। সূর্যোদয়ের পূর্বে নিজেকে নির্মল করে নেবার জন্যে সেকালের হিন্দুরা কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন কে জানে ! উষাকালকে উপভোগের জন্যেই যেন সমস্ত ভারত প্রস্তুত হয়ে থাকত।

স্নান সারতে বেশি সময় লাগে না শ্বশুরের ; কিন্তু এই সময়েই পরিচ্ছন্ন হবার আর এক সাধনা। তিনি নিজের কাপড়জামা কেচে নেন। ডোরা বারণ করেছে। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। "সামান্য একটু কাজ। নিজে করে নেওয়ার কথাই বলেছেন গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ সবাই।" জল নিংড়ে, বাথরুমের পাইপে কাপড় পরিপাটি করে মেলে না দেওয়া পর্যন্ত কর্মব্যস্ততা।

তারপর শ্বশুরমশাই এসে বসবেন পূর্বাশার পূর্বের বারান্দায়। প্রতিদিন একমনে সূর্যোদয় দেখবেন প্রাণভরে। মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করবেন উষাকালের স্তোত্র, বার-বার প্রণাম করবেন সর্বপাপঘ্ন দিবাকরকে। "বউমা, গ্র্যান্ডেস্ট স্পেক্ট্যাক্‌ল অন আর্থ—এই সূর্যোদয়। গুরুদেব এই সব দেখে কত যে লিখেছেন ! এক একটা সূর্যোদয় তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। জানো বউমা, জীবনের হিসেবনিকেশে যত ভুল থেকে যায় তা এই সময়ে মিটিয়ে নেওয়ার সুযোগ। একবার কে যেন আনন্দধামেও সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শোয়ের প্রস্তাব তুলেছিল, তখন অমর্ত্য বলেছিল, ঈশ্বর নিজেই তো সনএটলুমিয়েরের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা রেখেছেন প্রতিদিন ভোরে। আর কেন ?"

উষা অবসানে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে জগন্ময় ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে পান করেন। এই পানপাত্রটি আশ্রমপ্রধানের প্রীতিস্পর্শে ধন্য। তাঁরই দেওয়া বহুদিন আগেকার উপহার। বড় সাবধানী মানুষ জগন্ময়—সব কিছুই পরিপাটি করে সাজানো, কিছুই ভাঙে না, হারায় না, এমন কী মলিন হবার সুযোগও পায় না। ঘরের মধ্যে এই যে শত শত বই তাও অদৃশ্য এক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। প্রয়োজনে

মুহূর্তে খুঁজে পান জগন্ময়।

চায়ের পর আরও অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে থাকেন জগন্ময়। তারপর টেনে নেন নিত্যসঙ্গী পাঁচটি বইয়ের একটি। এরপরেও সবকিছু সময়ের শৃঙ্খলে বাঁধা। সকাল সাড়ে-সাতটায় বউমার সঙ্গে জলযোগ করেন জগন্ময়। ছেলে তখন বাথরুমে। তার সব কাজ শেষ মুহূর্তে। "ভূমিষ্ঠও হয়েছিল শেষ মুহূর্তে ! ডাক্তাররা যখন আশা ছেড়ে দিয়ে সিজারিয়ানের জন্যে ছুরি শানাচ্ছে তখন অবতীর্ণ হলেন। সে কী দুশ্চিন্তা, বউমা। ওর মায়ের জীবনাশঙ্কা হয়েছিল। সেই সময় শক্তি জুগিয়েছিলেন শ্রীস্বরূপ । আনন্দধামের ছোট্ট হাসপাতালে আমার সঙ্গে পায়চারি করেছেন।"

ব্রেকফাস্ট শেষ করেই জগন্ময় আবার ঘরে ফিরে লেখালিখি অথবা পড়াশোনা শুরু করবেন। আর ডোরা সামলাবে মনসিজকে। দুজনের জন্যেই অফিসের পিক্ আপ আসবে, তবে দু'জায়গা থেকে। ডোরা আর একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে।

যাবার আগেই ডোরা লাঞ্চের ব্যবস্থা করে ফেলবে শ্বশুরমশায়ের। জগন্ময় বারণ করেছেন। "বহু বছর আমি নিজেই এসব করেছি, বউমা। ওরা তো থেকেছে রানীক্ষেতে। এই যে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে হইচই তার কোনও মানে হয় না। আমার ছিল ইকমিক কুকার—যারা একলা তাদের জন্য ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিকের দান। প্রেসার কুকারের চাপে লোকে ইকমিকের নামই ভুলে গেল। তারপর এসেছে এই এল-পি-জি, ভগবানের আর এক দান। মেয়েদের পরমায়ু দশ বছর বাড়িয়ে দেবে, দেখো।'

শ্বশুরের বারণ শোনে না ডোরা। মায়ের পরামর্শে সে মাছের ঝোল-ভাত রান্নায় পারদর্শিনী হয়ে উঠেছে। একটা হট চেম্বারের মধ্যে খাবার পুরে ডাইনিং টেবিলের ওপর রেখে যায় ডোরা। নামেই মধ্যাহ্নভোজন। জগন্ময় খেতে বসেন এগারোটায়। এগারোটা পনেরোয় খাওয়া শেষ। তারপর কাজের লোকের আসবার কথা। কিন্তু জগন্ময় কারও জন্যে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন। নিজেই প্লেট, বাসন, বাটি ভিম দিয়ে ঘষে মেজে, তোয়ালে দিয়ে পরিপাটি করে মুছে যথাস্থানে রেখে দেন। তিনি বলেন "বউমা, তোমার কাজে সায়েববাড়ির নিপুণতা। বাসন এবং বাথরুম যে সারাক্ষণ শুকনো রাখতে হয় তা ইন্ডিয়ানরা আজও শিখল না। আমাদের আনন্দধামে কিন্তু ছিল এসব বিষয়ে বিলিতি হাওয়া। যে স্নান করবে সে-ই স্নানঘর শুকনো করবে। আর শান্তিনিকেতনে তো গান্ধীজি একবার ছেলেদের নিয়ে পায়খানা সাফায়ের কাজে লেগে পড়েছিলেন। জানো বউমা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, দুটো মস্ত লোককে আমরা ভারতীয়রা একসঙ্গে পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু অমন সুযোগটা আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না। একজনকে ডাক্তাররা খোঁচাখুঁচি করে মারল, আর একজনকে রিভলবার দিয়ে শেষ করা হল। ভাবা যায় না।'

শান্তিনিকেতনে, সবরমতি আশ্রমে যা হয়ে থাকে হোক, কিন্তু এই আনন্দধামেও অঘটন ঘটত। ' তোমার শাশুড়ি সাহস করে মানুষটাকে সরিয়ে নিয়ে না গেলে দুঃখজনক কিছু ঘটত। এদেশের মানুষ পিছনে বড় বেশি কথা বলে, মনের নর্দমাটা একেবারে খোলা অবস্থায় থাকে, আশ্রমে বসবাস করলেও সেই অভ্যাসের পরিবর্তন হয় না।"

জগন্ময় হিসেব করে আধঘন্টা বিশ্রাম নেন দুপুরে। তারপর তিনটের সময় চা। ফ্লাস্কে গরম জল থাকে। জগন্ময় নিজেই চা করে নেন—দার্জিলিং চা। চিনের চা, জাপানের চা এসব ত্যাগ করেছেন জগন্ময়। 'পরনির্ভরতা ভাল নয়, বউমা। আমাদের আনন্দধামে একটা মন্ত্র ছিল—স্বয়ম্ভরতা। এটা শুধু অর্থনীতির তাগিদ নয়, আত্মারও তাগিদ বটে। অযথা কেন অপরের ওপর নিজের বোঝা চাপাবে ? স্বয়ম্ভরতাকে স্বীকার করে নিলে সামাজিক শোষণেরও কোনও ভূমিকা থাকবে না।"

অবাক হয়ে শুনেছে ডোরা তার শ্বশুরমশায়ের কথা। তার বাপের বাড়িতে কেবল রেডিও শোনা, সিনেমা দেখা অথবা ম্যাগাজিন পড়া। বাকি সময় কুকিং নিয়ে পড়াশোনা—কিংবা নিটিং। ডোরা

ইতিমধ্যেই জগন্ময়কে একটা ফতুয়া স্টাইলের সোয়েটার বুনে দিয়েছে, খুব খুশি হয়েছেন জগন্ময়। বলেছেন, "তোমার শাশুড়িও একসময় সেলাইয়ের কাজ এবং বাটিকের কাজে তুখোড় ছিলেন। শিখিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীস্বরূপ। তুলনাহীন সে শিল্পকর্ম।"

এরই মধ্যে অফিস থেকে ডোরা দুটো ফোন সেরে নেয়। একটা ডানলপ অফিসে মাকে। "মা সব ঠিক আছে তো ? ওষুধটা খাচ্ছ তো ?" তারপর জগন্ময়কে। "বাবা, দুপুরের ভাত কম হয়নি তো ? ঢেঁড়শগুলো কচি ছিল তো ? আমার মনে হল, ঝোলে ঠিক নুন দেওয়া হয়নি।"

"সব ঠিক ছিল, বউমা। আমি ভাবলাম, ইচ্ছে করেই তুমি নুন কম দিচ্ছ। এই বয়সে বেশি নুন মানেই তো হাই ব্লাডপ্রেসার। কিন্তু ওই যে ভেষজগুলো খাই—ওইগুলোই শরীরে ইঞ্জিন অয়েলের কাজ করে। কিছু খারাপ হতে দেবে না।"

অফিস থেকে ফেরার সময়ে বাড়িতে বেল বাজাতে হয় না। জগন্ময় দরজাটা একটু আগেই খুলে রাখেন, ঘড়ির কাঁটা ধরেই ডোবা ফিবে আসে। কিন্তু মনসিজ নয়। ওর কিছুই ঠিক নেই। "ওর ওই অস্থিরতা পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। একসময় সুশীলাকে জোনাকি বলে ডাকতাম। কেন জানো তো ? ওরা অকারণে চঞ্চল, স্বয়ং কবিগুরু লিখে গিয়েছেন। তুমি গানটা শোনোনি ? ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো . . . ."

"বাবা আপনার কাছে কত কী জানা যায় । কত কী জানেন আপনি।"

"এসব আর কতটুকু বউমা ? জানো, যারা শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সময়ে মানুষ হয়েছে, কিংবা আমাদের আনন্দধামে স্বয়ং আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার জীবৎকালে, এমন কী যখন শ্রীস্বরূপ আনন্দধামের প্রধান ছিলেন। জানো বউমা, আনন্দধামের আত্মাকে ওঁরা রানীক্ষেতের মজুমদার হাউসে নিয়ে গিয়েছে। তুমি যদি শ্রীস্বরূপের প্রার্থনাসঙ্গীত শুনতে। ভদ্রলোক নিজেকে প্রকাশ করলেন না। আর তোমার শাশুড়ি । ওর কণ্ঠেও জাদু ছিল। কিন্তু এখন গান গায় না। ও লিখেছে, মধ্যদিনেই পাখি গান বন্ধ করে। আমি ওকে লিখেছি, মানুষ ও পাখি এক নয়। পাখি গান গায় স্বভাবে, মানুষ গান গায় সাধনায়।"

দূরত্ব রয়েছে দুজনের মধ্যে । কিন্তু পত্রালাপ বন্ধ হয়নি। দূর পাহাড়ে চিঠি পৌঁছতে সময় লাগে, উত্তর আসতেও সময় লেগে যায়। পৌনঃপুনিকতা কমে যায় কিন্তু ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে না। "এই তো ভাল", গুন গুন করে গান ধরেছেন জগন্ময় মজুমদার ।

এসব বিষয়ে মনসিজের সঙ্গে আলোচনার সাহস হয়নি ডোরার। মনসিজ নিজেও কখনও ডোরাকে জিজ্ঞেস করেনি তার বাবা শীলু চ্যাটার্জির কথা—কিসের আকর্ষণে সংসার ভেঙে তিনি ফরিদাবাদে চলে গিয়েছিলেন ? মানুষ তার খেয়ালখুশি প্রয়োজন ও প্রত্যাশামতো কাজ করে বসে, তার কৈফিয়ত এবং হিসেব শুনতে হয় অন্যদের। যারা ভুগল, ক্ষতিগ্রস্ত হল তাদেরই উত্তর দিতে হয় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। বড় বিচিত্র এই মানবসংসার। নিয়মভাঙা সহজ, কিন্তু তার কৈফিয়ত দেওয়াটা অনেক কঠিন। অনেক অপরাধের ওই কৈফিয়ত দেওয়াটাই শাস্তি। সমাজের অলিখিত শাসন অদ্ভুত সব উপায়ে কাজ করে।

মনসিজ নিজের কাজ, নিজের টেনিস এবং নিজের খেয়াল নিয়েই বিভোর হয়ে থাকে। বয়স কম, এখন কর্মপথের সাধনায় বিভোর হয়ে থাকতে হবে। ডোরাও তাই চায়। কম বয়সে ভাল জায়গায় ঢুকেছে। রানীক্ষেতে এবং আলমোড়ায় পড়া চুকিয়ে সে সামান্য কিছুদিনের জন্যে দিল্লিতে ছাত্র হয়েছে। শ্রীস্বরূপ স্বয়ং তাকে পড়িয়েছেন, ভাগ্যবান সে। নির্বাসনে তাঁর অন্য কোনও কাজ নেই। বসে বসে শুধু নেপোলিয়নের জীবনী পড়তেন। রানীক্ষেতের মিলিটারি লাইব্রেরিতে নেপোলিয়ন সংক্রান্ত ইংরাজি ও ফরাসি বই ঠাসা।

যা আশ্চর্য, মনসিজ সংস্কৃত শেখেনি। শ্রীস্বরূপ তাকে ফরাসি ও ইংরাজি শিখতে এবং ক্রিকেট খেলা শিখতে উৎসাহ দিয়েছেন। তারপর চাকরিটা জুটে গিয়েছে রানীক্ষেতের এক বিখ্যাত প্রতিবেশীর

ইন্ট্রোডাকশনে। আই-সি-এস এই ভদ্রলোক হয়ে উঠেছিলেন শ্রীস্বরূপের বন্ধু। বুড়ো বয়সে উপনিষদ শিখবার বাসনা এই প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের। স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন নিউইয়র্কে, কেন তা কেউ জানে না। একমাত্র এর সঙ্গেই শ্রীস্বরূপ আলোচনা করেছিলেন মনসিজের ভবিষ্যৎ। বলেছিলেন, ওকে কিছুতেই এম-এ পড়তে দেব না, তাহলে ওর আচার্য হবার লোভ হবে। কোম্পানি চেয়ারম্যানের চিঠিতে ফল হয়েছে, মনসিজ কাজ পেয়েছে, সুশীলার সমস্যার সমাধান হয়েছে। তারপর মনসিজ সুযোগ বুঝে রেকর্ড সময়ে কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ পড়া শেষ করেছে। জীবনের মধ্যপথে কেরিয়ারকে দ্রুতগতিশীল করার নানা পন্থা আছে, বহু লোক যার খবরাখবর রাখে না।

"আজ যে কোম্পানি-সেক্রেটারি কাল সে কোম্পানি-ডিরেক্টর। কিন্তু ওয়ান্স এ লেডি সেক্রেটারি অলওয়েজ এ লেডি সেক্রেটারি", বলেছিল ডোরা। মনসিজ একমত হয়নি। সে বলেছে, "ডিরেক্টর না হোক, ডিক্টেটর হতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে নেই যেমন তুমি হয়েছ, এই জগন্ময় মজুমদার অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের।"

পূর্বাশার বারান্দায় সন-এট-ল্যুমিয়ের পর্ব শেষ হয়েছে। এখন আর পুব আকাশে মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ খেলার তাড়া নেই। এ পাড়ায় এখনও কয়েকটা পাখি আছে, তারাও তাদের গান শেষ করতে চলেছে। রোদ এসে পড়েছে পূর্বাশায় সাততলার বারান্দায়।

বউমাকে আর এক কাপ চা তৈরি করে ঘরে ঢুকতে দেখে খুশি হলেন জগন্ময়। খবরের কাগজ পড়েন তিনি। কিন্তু কোনও নেশা নেই। আজকের কাগজটা বউমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "তোমার তো অফিস আছে, আগে দেখে নাও।' তারপর বললেন, "কাগজের যত দাপট এই শহরে। আনন্দ আশ্রমে কাগজ নিয়ে একটুও মাথা ঘামাতাম না।"

"বাবা আজ দুপুরে কী খাবেন ?" জিজ্ঞেস করে ডোরা।

"যা রাঁধবে বউমা।" খাওয়ার মেনুটা মোটেই বড় ব্যাপার নয় তাঁর কাছে, শুধু সময়টা দরকারি। ঘড়ি ধরে খাওয়া।

বাবা আবার উপনিষদ খুলে বসলেন। খবরের কাগজে কোনও আগ্রহ দেখালেন না।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গিয়েছে। এই পূর্বাশা, সাততলার ফ্ল্যাট, তার বাসিন্দা সব আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছে ডোরা ওরফে বসুন্ধরা মজুমদারের। আজকাল জগন্ময় প্রায়ই বসুন্ধরা নামটি ব্যবহার করেন। "বউমা এই সংসারের রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে বসে আছেন।"

চায়ের কাপ তুলে জগন্ময় বলেন, "যে-বাড়িতে মেয়েদের আধিপত্য নেই সেখানে কিছু ঘাটতি আছে।"

নিজের রুটিনে বাঁধা জীবনের সামান্যমাত্র পরিবর্তন করেননি জগন্ময়। ডিসিপ্লিন তাঁর শরীরে মনে। শরীরটাকে ঈশ্বর যে ঘড়ির মতন তৈরি করেছেন তা জগন্ময় ম ঝে মাঝে মনে করিয়ে দেন। নিয়মানুবর্তিতা ও ধারাবাহিকতা—এই দুটোই বিশ্ব প্রকৃতির গভীর ইচ্ছার প্রকাশ।

ধারাবাহিকতা আবশ্যই আছে এই বৃদ্ধ মানষটির। স্বভাবে, আচরণে, ব্যবহারে, কোথাও স্ববিরোধিতা খুঁজে পাওয়া যায় না মানুষটার। এমন মানুষকে আশ্রমেই মানায়, আশ্রমবাসী হবার মানসিকতা নিয়েই ঈশ্বর এঁদের ধরায় পাঠিয়েছেন।

নিযমে বাঁধা জীবনে কোথাও বিচ্যুতি নেই শ্বশুরমশায়ের। 'অতি' কথাটাই ওঁর জীবনে স্থান পায়নি। পরিমিতি বলে একটা কথা তিনি ব্যবহার করেন। ডোরা ঠিক অর্থ বুঝতে পারে না। "যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটা—এক চুল বেশি নয় এক চুল কমও নয়, তাকে বলে পরিমিতিবোধ।"

মন দিয়ে শোনে ডোরা। 'রেসট্রেন্ট' বলে একটা কথা সে শুনেছে মায়ের মুখে। "ওটা নঙর্থক—একটু নেগেটিভ ভাব আছে বউমা। সংযম। যেন তুমি চেষ্টা করে গাড়িতে ব্রেক কষছ। আর পরিমিতি

হল, সব আগে থেকে মাপা। অ্যাক্সিলেটর, ক্লাচ, ব্রেক সব আগে থেকে জানে কোথায় কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে হবে।"

শ্বশুরমশাই মানুষটিকে ভীষণ ভাল লাগে ডোরার। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ দাবি নেই, ভালবাসা আছে, নিজেকে চাপিয়ে দেওয়া নেই। এই মানুষ একদিন প্রেম করেছিলেন ভাবতে অবাক লাগে। শুধু প্রেম নয়, প্রেমে পাগল হয়ে সংঘ সম্পদ ছেড়ে আশ্রমবাসী হয়েছেন। আনন্দ আশ্রমেব শিশু ও বালকদের নিয়েই জীবন কেটে গিয়েছে। রক্ষা করেছে সুশীলার সান্নিধ্য আর কবিগুরুর গান। একদিন তিনি স্ত্রীকে লেখা চিঠির একটা অংশ পড়ে শুনিয়েছিলেন। "লোকে এক সপ্তাহ এক পক্ষের জন্যে হনিমুনে যায়। আমার এক এক সময় মনে হয়, আনন্দধামের অতগুলো বছরই একটানা এক হনিমুন। মন্দ কাটেনি। সঙ্গে ছিল গুরুদেবের গান, গুরুদেবের কবিতা—অসুবিধা হয়নি।"

শাশুড়ির সঙ্গে সম্পর্কটাও ক্রমে ডোরার চোখে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মনসিজ এ-বিষয়ে কথা বলেনি কখনও, এ-বিষয়ে সে যে মাথা ঘামায় তাও মনে হয়নি। তার জীবনে যেন দুটি পর্ব। এক পর্বে আশ্রমবালক হিসেবে আনন্দধামে পালিত হয়েছে, তারপর পর্বত পর্ব। মা একদিন বাক্সপত্তর গুছিয়ে নিলেন। বললেন, যেতে হবে অনেক দূরে, জ্যেঠুকে নিয়ে। মানে শ্রীস্বরূপ। বাবা বললেন, সাবধানে থাকবে, মায়ের কথা শুনবে। জ্যেঠুর ওপর হামলা করবে না। কোনও হামলা করেনি মনসিজ। কুমায়ুন পাহাড়ের দেওদার গাছের মতন ঝটপট বড় হয়ে উঠেছে, বয়সে এবং আকারে। জ্যেঠু কেন আনন্দধাম ছাড়লেন এ নিয়েও মাথা ঘামায়নি, জ্যেঠু কখনও তার সামনে কোনও দুঃখ, কোনও হতাশা প্রকাশ করেননি। বরং অরণ্যের পরিবেশে, আশ্রম থেকে বহু দূরে জ্যেঠুকে সুখী মনে হয়েছে। এ-বাড়িতে আর আশ্রম বসবে না, এখানে একা একা নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যই যেন জ্যেঠু এসেছেন। নির্বাসনের নিত্যসঙ্গিনী তার মা এবং খেলার সঙ্গী মনসিজ। খুব ভাল ইংরিজি জানতেন জ্যেঠু, মন ঢেলে পড়াতেন মনসিজকে, ফলে ইংরিজিতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে মনসিজ। দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে সে পড়াশোনায়, বাপকে চিঠি লিখেছে আনন্দধামে, বাবা উত্তর দিয়েছেন।

এ-এক অদ্ভুত ত্যাগ, বুঝতে অসুবিধে হয় না ডোরার। এক প্রজন্মের বাঙালি এই আশ্রমিক জীবন থেকে নিয়েছে অনেক, কিন্তু দেওয়ার সময় কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুশীলা ঋণশোধ করতে চেয়েছে সবার হয়ে, জগন্ময় অবশ্যই আপত্তি করেনি।

তারপর মনসিজ ফিরে এসেছে কলকাতায় কর্মসন্ধানে। চাকরি মিলেছে তার। জগন্ময়ের আর্থিক অবস্থার অপ্রত্যাশিত উন্নতি হয়েছে দিল্লির পারিবাবিক বাড়ি বিক্রির লাভে। তারই একটা অংশে কিনেছেন এই পূর্বাশার ফ্ল্যাট। এত দিন উপার্জন ছিল সামান্য। তার থেকেও অতি সামান্য নিজের পিছনে খরচ করে বাকিটা পাঠিয়েছেন রানীক্ষেতে সুশীলার কাছে। কেউ কেউ বলেছে, নেই নেই করেও তো শ্রীস্বরূপের অনেক আছে। সেখানে স্কুলমাস্টারের এই ক'টা টাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জগন্ময় যা করবার তা করে গিয়েছেন। টাকা এবং সেই সঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছেন। সুশীলা উত্তর পাঠিয়েছেন নিয়মিত। পাঠিয়েছেন শ্রীস্বরূপের ছবি। অবশেষে দূরে চলে গিয়ে অনেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। শেষে, জীবনের এই শান্তিটুকু তাঁর প্রাপ্য ছিল। সুখী জগন্ময়। সুশীলা তার কর্তব্য করতে পেরেছে, সুশীলার ইচ্ছার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে হয়নি জগন্ময়কে।

নিজের অফিসে বসে ডোরা ভেবেছে, বড় ভাল মানুষ এই শ্বশুরমশাইটি। কারও ঘাড়ে ভর করে সুখভোগের ইচ্ছা নেই, কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। বেশি কথা বলেন না। এক ফালি প্রকৃতি আর কয়েকখানা বই আঁকড়ে জীবন চালিয়ে দিচ্ছেন নিঃশব্দে। বিলাসিতার মধ্যে ওই গানের রেকর্ড প্লেয়ারটুকু। তাও কয়েকটা প্রিয়সঙ্গীত, সেইগুলোই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শোনেন। বলেন, "এই সব গান কখনও পুরনো হবে না। আরও দু' হাজার বছর পরে মানুষ গুরুদেবের এইসব গান শুনবে, আনন্দ পাবে, শক্তি পাবে।"

মিথ্যে বলবে না ডোরা। অন্য কথাও কখনও কানে এসে গিয়েছে। আনন্দধাম দেখতে গিয়ে এক বান্ধবী অস্বস্তিকর খবর শুনে এসেছে। সেইসব আদ্যিকালের আদিম প্রশ্ন। আশ্রমপ্রধান কেন আশ্রম থেকে বিতাড়িত হলেন ? ডোরা বলেছে, বিতাড়ন নয়, স্বেচ্ছা নির্বাসন। কেন নির্বাসন ? পরস্ত্রীর সঙ্গে কী সম্পর্ক গড়ে উঠল বর্ষীয়ান আশ্রমপ্রধানের যে তাঁকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরে যেতে হল। হ্যাঁ, প্রশংসার কথাও আছে। তা হল, পদস্খলনের পর আশ্রমের পবিত্রতা কলুষিত করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেননি স্বরূপ। এই আশ্রমের মহান প্রতিষ্ঠাতার সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতে দেননি, নীরবে সরে গিয়েছেন তিনি, যদিও বিতর্কিত হয়ে আরও অনেকদিন চালিয়ে যেতে পারতেন। আশ্রমপ্রধানের এই ত্যাগ যে সামান্য নয়, তা কেউ কেউ স্বীকার করে, কিন্তু তারাও ক্ষমা করে না সুশীলা নাম্নী এক আশ্রম বালিকাকে। অন্যভাবে নিন্দা করে জগন্ময়ের। লোকটা স্ত্রীর ক্রীতদাসত্ব করেও নিজের সংসার রক্ষা করতে পারল না।

তারপর আরও নোংরা ইঙ্গিত। এমনসব গল্প পণ্ডিচেরিতে, সবরমতিতে, শান্তিনিকেতনে, কিংবা বিহার সীমান্তের এই আনন্দধামের যোগ্য নয়।

ডোরা মৃদু প্রতিবাদ করেছে। এইভাবেই প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে যায়, তৈরি হয় শস্তা গুজবের।

ডোরা তো দেখছে ব্যাপারটা। তারা জানে না, সুশীলা এই রবিবারই ফিরে আসছেন কলকাতায়। তাঁর ঠিকানা সানিপার্কের পূর্বাশা। রানীক্ষেতের স্বেচ্ছানির্বাসনে আনন্দধামের আশ্রমপ্রধানের আকস্মিক তিরোধান সংবাদ খবরের কাগজের এক কোণে প্রকাশিত হয়েছে। তারপরেই খবর এসেছে সুশীলা নিজেও সুস্থ নয়। মনসিজ লিখেছে, "মা তুমি চলে এসো।" জগন্ময় বলেছেন, "বউমা, ঘরের তো অভাব নেই। একটা ঘর গুছিয়ে দাও সুশীলার জন্যে।" ঘরটা নিজেও দেখেছেন জগন্ময়। নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছেন, "ভোরবেলায় এই ঘরে সূর্যের আলো আসে। সূর্যমুখী ও। পূর্ব আকাশ ওকে পাগল করে দেয়, বউমা।"

বসুন্ধরা কিছুদিন বেশ আশঙ্কায় ছিল। শ্বশুর ও শাশুড়ির যুগলজীবনে নতুন কী ঘটনা ঘটবে কে জানে ! কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি। সুশীলা বেশ অসুস্থ। উচ্চচাপ ও হার্টের এই অবস্থা নিয়ে এত দিন কীভাবে পাহাড়ে কাটালেন তাই আশ্চর্য। কিন্তু উপায় ছিল না। নির্বাসিত মানুষটির দায়িত্ব নেবার মতন আর কেউ ছিল না—বড় নিঃসঙ্গ এবং অসহায় তিনি। জীবিতকালে অনেক কষ্ট পেয়েছেন—নির্বাসনের বেদনা অনেক সময় কারাবাস থেকেও বেশি। সুশীলার গর্ব, স্বামীর অনুমতি নিয়েই তিনিই দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন, তারই ত্যাগের মাধ্যমে আনন্দধামের আশ্রমবাসীরা তাদের ঋণের কিছুটা শোধ করতে পেরেছেন।

ডোরা অনেক ইংরাজি উপন্যাস পড়েছে। এমন একটা সিচুয়েশন ভাবা সেখানে কঠিন নয়। কিন্তু এখানে পরিবেশ আলাদা। এত দিন পরে সুশীলা যে স্বামীগৃহে ফিরে এলেন এবং স্বামী যে তাকে গ্রহণ করলেন এইটাই আশ্চর্য। এক সময় ডোরা তার শ্বশুরকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে. না, ওর শরীরে সন্দেহ নেই, রাগ নেই। অবিশ্বাস্য এক শান্তির মানসিক পরিবেশে তিনি বসবাস করছেন, বুঁদ হয়ে আছেন উপনিষদে। প্রতিদিন তিনি আবিষ্কারকের আনন্দ অনুভব করেন—উপনিষদের পদে পদে বিস্ময়।

একদিকে শ্রদ্ধা, একদিকে বিস্ময়। কোথাও কোনও মনোভাবের প্রকাশ নেই। নিয়মের শৃঙ্খলায় বাঁধা জীবনেও পরিবর্তন নেই—সেই সাড়ে পাঁচটায় চা। সাড়ে সাতটায় সামান্য প্রাতরাশ, ঘড়িতে এগারোটা বাজামাত্র মধ্যাহ্নভোজন, তিনটের সময় চা, ডোরা ফিরলে আরও এক কাপ চা। তারপর সন্ধ্যা সাতটায় ডিনার। ডোরা সেই সময় জলখাবার খাচ্ছে। কিন্তু সে জানে বহু বছর ধরে জগন্ময় এই নিয়মে চলছেন, তিনি তাঁর পরিবর্তন ঘটাবেন না। ডোরা এও জানে, শ্বশুরমশাই পরমুখাপেক্ষী নন, সব কাজ করে নিতে পারেন। অসুবিধা একটু হত ডিনারে। কিন্তু সান্ধ্যআহারে জগন্ময় একটু দুধ ও

খই খান। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে নিয়েছেন জগন্ময়।

সুশীলা প্রণোচ্ছলা। কিন্তু তার পূর্ণ পরিচয় পাচ্ছে না ডোরা। শরীরে একের পর এক রোগের আক্রমণ। সুশীলার দাপট ছিল শুনেছে ডোরা। কিন্তু এখানে যেন একটু লজ্জায়-লজ্জায় রয়েছেন তিনি। পূর্বাশার এই সংসারে এখনও যেন অতিথি রূপে বিরাজ করছেন।

বুড়ো বুড়ি দুই আলাদা ঘরে বসবাস করছেন। মাঝে মাঝে চাকা লাগানো চেয়ারে সুশীলা এসে বসেন পুবের বারান্দায়। দুজনে অনেকক্ষণ মুখোমুখি বসে থাকেন। ডোরা ভেবেছে, ওদের মধ্যে নিঃশব্দ বোঝাবুঝি চলেছে।

কিন্তু যে সব কথা ও বন্ধুর মুখে শুনেছে, তাতে বোঝাবুঝি সম্ভব ? নিশ্চয় সম্ভব, ডোরা ভেবেছে। প্রকৃত সত্যটা তো এঁরা দু'জন ছাড়া কেউ জানে না। হয়তো স্বামীর নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করতেই সুশীলাও স্বেচ্ছা নির্বাসনে গিয়েছিলেন। আরও একজন আলোকপাত করতে পারতেন, তিনি আনন্দধামের একদা আশ্রমপ্রধান। তিনিও তো নেই। আর শাশুড়ির শরীরের যা অবস্থা, একদিন মৃত্যু এসে সমস্ত ঘটনাকে ঢেকে দেবে। কোথাও কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ এমন কী প্রকৃত ঘটনার ইঙ্গিত থাকবে না।

ডোরা একটি জিনিস বুঝেছে। শ্বশুরমশায়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল—এই ভালবাসাই তো প্রয়োজনে প্রিয়াকে কাছে না টেনে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। এই ভালবাসাই তো এত অপবাদের ঢেউ পেরিয়ে সুশীলাকে আবার কাছে টেনে এনেছে—ওঁরা দু'জনে কপোতকপোতীর মতন মুখোমুখি বসে রয়েছে সানিপার্কের সাততলার পূর্বাশা ভবনে। কিন্তু এঁরা কী কথা বলেন ? কোনও শব্দ তো ডোরার ঘরে এসে পৌঁছয় না। হয়তো ওঁরা নিঃশব্দে ভাববিনিময় করেন। সত্তর পেরিয়েছে জগন্ময়ের। সুশীলাও স্বামীর চেয়ে খুব ছোট নয়। এই বয়সে যে এইভাবে আবার দেখা হল তার সমস্ত কৃতিত্বটুকুই ডোরা তার শ্বশুরকে দেবে। লোকটা ভালবাসতে জানে। শরীরে কোনও বিরক্তি নেই, শাস্তি দেওয়ার স্পৃহা নেই। ডোরার অফিসের বান্ধবী সব শুনে বলেছে, "তোর শ্বশুর মানুষ, নয়, দেবতা। পুরুষমানুষ এইভাবে মেনে নিতে পারে না। একে বলে মহানুভবতা। সব জেনেশুনেও কোনও কিছুতে নজর না দেওয়া। ক্ষমা করে দেওয়া, মেনে নেওয়া। ওই যে বলে, তোমার পরে নাই ভুবনের ভার, হালের পরে মাঝি আছে করবে তরী পার।"

আর সুশীলা রোগযন্ত্রণায় কাতর—বর্তমান নিয়ে এত ব্যস্ততা যে অতীতের হিসেবনিকেশের সুযোগই পাচ্ছেন না। ভাল করে কথা বলতে পারেন না। চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে। বউমার হাত চেপে ধরেন। আস্তে আস্তে বলেন, "অনেক কথা ছিল বউ মা। বুকের ব্যথাটুকু একটু কমলে।"

আগে ভাল হয়ে উঠুন, মা। কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু সময় পাওয়া যাবে কি ? মায়ের মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। আর জগন্ময়। স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করেন, ওষুধের প্রেসক্রিপশন দেখেন, জিজ্ঞেস করেন কেমন আছেন, তারপর বারান্দায় গিয়ে অর্ধসমাধিস্থ হয়ে বসে থাকেন। সুশীলা বলেন, "ওই ওর স্বভাব। প্রিয়জনের কষ্ট ও দেখতে পারে না। কিন্তু মুখে কিছু বলবে না। দূরে সরে যাবে। ভগবান যে ওকে কোথাকার মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল ! উত্তাপ নেই, ভাবের প্রকাশ নেই। ওর মনে যে কী হচ্ছে তা মাপবার উপায় নেই। সব অনুভূতি ও জয় করে বসে আছে। সুখে দুঃখে সত্যি বিগতস্পৃহ।"

"ওকে কোনও দিন রাগতে দেখলাম না", এক সময় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন সুশীলা।

কত ভালবাসলে, মানুষ এমন স্তরে পৌঁছয়। সুশীলা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। "ওকে চাইতে দেখলাম না কখনও। একবার মাত্র চেয়েছিল। বোলপুর শান্তিনিকেতন বেড়িয়ে আমরা আনন্দধামে আসছি ট্রেনে। সমস্ত আকাশ মেঘে ছেয়ে গিয়েছে, ঘন কাল মেঘে। সেই দিনে ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।" চাইতে হয়, নারীর কাছে প্রণয় ভিক্ষা করতে হয়, না হলে বিয়েই হয় না। কিন্তু

ওই শেষ, আর চাওয়া নেই।

ডোরা অবাক হয়ে ভাবে স্ত্রী-পুরুষের যুগযুগান্তের সম্পর্কের এই ধারাবাহিকতা নিয়ে। না চাইলে দেওয়া যায় না, দেওয়ার রীতি নেই মানবসমাজে, মেয়েদের বড় কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে রেখেছেন ঈশ্বর।

"মা, আপনি অত ভাববেন না", উপদেশ দেয় ডোরা।

কী প্রয়োজন ভাবনার ? প্রতিকূল পরিবেশের অন্ধকার কাটিয়ে এত দূর তো এগনো গেল—সুশীলা তো শুয়ে আছেন স্বামীগৃহে। তিনি তো অদূরেই অবস্থান করছেন, জিজ্ঞেস করছেন, কেমন আছ ? সুশীলা তো ডোরার গর্ভধারিণী মা মণিকা চ্যাটার্জির মতন দুর্ভাগিনী নন। ও ক্ষেত্রে স্বামীই তো অন্যায় করেছেন, অবিচার করেছেন, মা সবকিছু নীরবে সহ্য করেছেন সারাজীবন ধরে, কিন্তু কোনও ঘৃণার জ্বালা ধরিয়ে দেননি পরবর্তী প্রজন্মের শরীরে অথবা মনে।

তার মা যদি পেতেন জগন্ময়ের মতন স্বামী, ছেলেমানুষের মতন স্বপ্ন দেখেছে ডোরা। মানে হয় এসব ভাবনার ! আর সুশীলা প্রেমে পড়ে গিয়েছেন পুত্রবধূর। "বউমা, আমার নাম হয়েছিল জোনাকি—সেই ছোটবেলা থেকেই আমি অকারণে চঞ্চল। কেউ আমাকে শান্ত হতে বলেনি, আনন্দধামের প্রতিষ্ঠাতা নয়. আমার বাবা নয়, আমার স্বামী নয়। আমি যদি শান্ত হতাম তাহলে বোধ হয় ভাল হত, বউমা। বারণ জিনিসটা জীবনে খারাপ নয় বউমা, ওটা ভাল।"

শরীর যতই খারাপ হচ্ছে, অস্থিরতায় ভুগছেন সুশীলা। শারীরিক নয় মানসিক অস্থিরতা। নিরাপদ বোধ করছেন না যেন, সুশীলা। অথচ এর কোনও মানে হয় না। স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ নিয়ে তো সুখের সংসার—এমন সংসারকেই তো লোকে সোনার সংসার বলে।

একদিন সুশীলা একটু ভাল ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ও আমার সম্বন্ধে কী বলেছে ?

"কিছুই বলেন না। উনি কখনও কারও সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করেন না।" ডোরা বলেছে।

একটু হতাশ হচ্ছিলেন সুশীলা। ডোরা বলল, "আপনিই তো ছড়িয়ে আছেন ওঁর জীবনে। আপনার জন্যই তো আশ্রমবাসী হয়েছিলেন।"

"ওর পিসিমা লিখেছিল, আমি ওর কেরিয়ার নষ্ট করেছি। সেই চিঠিটা ও ছিঁড়ে ফেলেছিল। সেই পিসিমার মেয়ে অনেকদিন পরে আবার লিখেছিল, আমি ওর জীবনটা নষ্ট করেছি. কিছু কি নষ্ট হয়েছে বউমা ?

নষ্টর তো কিছু দেখতে পায়নি ডোরা। সবই তো চোখের সামনে রয়েছে। আর ওই যে লোকে বলে, সব ভাল যার শেষ ভাল। শেষ পর্বে কোথাও তো উত্তেজনা নেই, কোনও বঞ্চনার বেদনা নেই।

তবু যেন সুশীলার কৌতূহলের অবসান নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বামীর মনের গহনে প্রবেশ করার সে কী প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু ভায়া মিডিয়া কেন ? প্রশ্ন করলেই হয় সোজাসুজি। এই মানুষটিকেই তো তুমি কত বছর ধরে চেনো। তোমাকে চিনেই তো সে এসেছে, তাকে চিনেই তো জোনাকি চঞ্চলতা ত্যাগ করতে রাজি হয়েছে।

বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে ডোরা। বাবা সেই সকাল থেকেই উপনিষদের তিনটে শ্লোক নিয়ে বসে আছেন, মাঝে মাঝে আবৃত্তি করছেন নিচু স্বরে—ওঁ ভদ্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবা। বহুক্ষণ পর ডোরা যখন শুনতে পাবে—ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদুচ্যত—তখন বুঝবে এবার কিছুক্ষণের জন্য বিরতি। এসবের গভীর তত্ত্ব ডোরা বুঝতে পারে না। জগন্ময় বলেছিলেন, "একটা শ্লোকই যথেষ্ট বউমা। মনে রেখো এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে পূর্ণ থেকেই পূর্ণ উদ্গত হন—এবং পূর্ণ থেকে পূর্ণ বিয়োগ করলে পূর্ণ অবশিষ্ট থেকে যায়। বিশ্বস্রষ্টার মস্ত বড় গ্যারান্টি, মা।" অবাক হয়ে যায় ডোরা, মানুষটার ভিতরে প্রবেশ করার কোনও পথ নেই। সব হিসেব নিকেশ নিজের সঙ্গে করবার বিরল শক্তি মানুষটি আয়ত্ত করেছে।

তারপর সেই দিন এল। সেই দিনেই যে ডোরা তার শ্বশুরমশাইকে আবিষ্কার করবে তা কল্পনাতেও ছিল না।

এই দিনের আশঙ্কায় দিন গুনছিল ডোরা। তার আগে দু'দিন ছুটি নিয়েছে ডোরা। মনসিজ সেই ভোরবেলায় অফিসের গাড়িতে ব্যাণ্ডেল রওনা হয়ে গিয়েছে—কারখানায় বোর্ড মিটিং। ন'টা নাগাদ সুশীলার অসুখ হঠাৎ বেড়ে গেল। ডাক্তার এলেন, ওষুধ দিলেন, আবার আসবেন বললেন এক ঘন্টা পরে। কিন্তু শরীরের যন্ত্রণা বাড়ছে সুশীলার। সুশীলা যেন বুঝতে পারছেন সময় হল। যাবার আগে কিছু বলবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন সুশীলা। যাবার আগে শেষবারের মতন কত কিছু বলার থেকে যায়। সুশীলা জানতে চাইছেন, ও কোথায়? তিনি তো পূর্ব আকাশের দিকে মুখ করে স্থির হয়ে বসে আছেন পূর্বাশার বারান্দায়। শাশুড়ি বললেন, "ও আসবে না, বউমা। ওকে ডাকো। ওকে আমি সব বলে যাই। ওর ক্ষমা চেয়ে যাই।"

"মা, আপনি শান্ত হোন। পবে সব বলবেন।"

মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তারপর বললেন, "ও যে আমাকে বুঝেছে তাও আমাকে বুঝতে দেয়নি। ওকে আমি ভালবেসেছি, কিন্তু ওকে আমি ঠকিয়েছি। ওই যে আমি আনন্দধাম থেকে চলে গেলাম আর একজনেব সঙ্গে, ও কিছু বলল না।"

ডোরা ভয় পেয়ে গিয়েছে। শ্বশুরমশায়কে ধরে নিয়ে এসেছে সেই ঘরে যেখানে সুশীলা মৃত্যুব সঙ্গে শেষ পর্বের খেলায় মেতেছেন। "শোনো, শোনো, কাছে এসো, দূরে যেও না," কাতর আবেদন করলেন সুশীলা। ডোরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ওঁদের দু'জনের মধ্যে কারও থাকার অর্থ হয় না।

একটু পরেই সুশীলার কাতর কণ্ঠ শোনা গেল, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, বউমা। শরীরটা আমার পুড়ছে।" ওষুধ এগিয়ে দিল ডোরা। কোনও ফল হল না।

ডাক্তার যখন এলেন তখন সব শেষ। কান্নায় ভেঙে পড়ল ডোরা। শ্বশুরমশাই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "দশটা পনেরো।"

এই ঘড়িটা যে সুশীলাই বহু বছর আগে বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন তা ডোরার অজানা নয়। মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর মুখে ভাবের কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না। হঠাৎ মণিবন্ধ থেকে ঘড়িটা খুলে সুশীলার শরীরের পাশে রেখে দিলেন। সময়ের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তা যেন শেষ হয়ে গিয়েছে।

জগন্ময় মজুমদাব কাঁদছেন না। এইখানেই কাহিনী শেষ হলে ভাল হত। কিন্তু ডোরা লক্ষ করল, শ্বশুবমশাই কোনও ভূমিকা পালন করছেন না। ডোরা দ্রুত ফোন করল ব্যান্ডেলে। মনসিজ ফিরে আসছে, কিন্তু অন্তত দু'ঘন্টা সময় লাগবে। নিজের মাকেও খবর দিয়েছে ডোরা। তিনিও আসবেন একটু পরে। ডাক্তারবাবু পথ সহজ করে দিয়েছেন। বিদায় নেবার আগেই ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে গিয়েছেন।

অঝোরে কাঁদছে ডোরা। মৃত্যুকে আগে সে কখনও এমনভাবে দেখেনি। কিন্তু শ্বশুরমশাই তো কাঁদছেন না। মৃত্যু দেখলে পাথরের চোখেও তো জল আসে, ডোরা শুনেছে।

মৃত মানুষকে সারাক্ষণ স্পর্শ করে থাকতে হয়, ডোরা শুনেছে। মাকে ছুঁয়ে সে বসে আছে। বাবা কিন্তু বারান্দায় বসে অন্য দিনের মতনই বই পড়ছেন।

এরপর যা হল তার মধ্যেই যেন আর এক জগন্ময় আচমকা ফেটে বেরিয়ে পড়লেন। ভাবা যায় না। এমন ঘটনা ডোরা কোনওদিন শোনেনি। মানুষ এমন বলতে পারে তা পৃথিবীর কেউ হয়তো বিশ্বাস করবে না।

"বউমা, বউমা", ডাকছেন জগন্ময় পূর্বাশার পূর্ব বারান্দা থেকে।

ডোরা ভাবল বাবার চোখে এইবার জল দেখবে। তিনিই হয়তো মুহূর্তের জন্য একা থাকতে

চাইবেন সুশীলার সঙ্গে।

কিন্তু কী আশ্চর্য ! জগন্ময়ের সমস্ত শরীরটা যেন বহু যুগের পুরনো কোনও আগুনে জ্বলছে। জগন্ময় বললেন, "এগারোটা বাজল, আমার খাবার কোথায় বউমা ?"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না ডোরা। বাবা আর কথা বাড়ালেন না। নিজেই এগিয়ে গেলেন ডাইনিং টেবিলের দিকে, সাজিয়ে নিলেন নিজের মধ্যাহ্নভোজন, তারপর তাঁর জীবনে কিছুক্ষণ আগে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে, মাছ ভাজা ও মাছের ঝোল, ভাতের সঙ্গে মেখে মনের আনন্দে খেতে লাগলেন।

একবার ডোরা ভেবেছিল বাবাকে বোঝাবে। বাবা, এমন করতে নেই। পাশের ঘরে মায়ের দেহ এখনও রয়েছে। কিন্তু বলে কোনও লাভ নেই মনে হল। কারণ, এই প্রথম বউমাকে অবাক করে দিয়ে জগন্ময় বললেন, "আরও দুটো ভাত আর এক পিস মাছ দাও বউমা। খেতে ইচ্ছে করছে, খিদেটা আমার বেড়েছে।"

কোনওরকমে বাড়তি ভাত ও মাছ বিদ্রোহী শ্বশুরের পাতে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল ডোরা। জগন্ময় বললেন, "ওই রানীক্ষেতের বাড়িতে কোনওদিন ঢুকো না বউমা, আমার নির্দেশ।"

ডোরার ভয় হচ্ছে, আজ শ্বশুরমশাই আবার ভাত চাইবেন। কেউ এ-সময়ে এসে পড়লে কী অবস্থা হবে।

তারপর হঠাৎ মনে হল, মানুষ কতরকমেই প্রতিবাদ করে। সব জেনে বাখা এই পৃথিবীতে কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

জানলার কোণ থেকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে শ্বশুরমশাইয়ের মুখে। সেই আলোয় তাঁকে এই মুহূর্তে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে, মানুষটার মুখটা ভিতর থেকে জ্বালানো কোনও আগুনে জ্বলছে।

বুড়ো এবং ফুচা

মতি নন্দী

ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করার প্রথম কয়েকটা দিন শব্দটা সে টের পায়নি। বাবান, তনু আর কাজের মেয়ে শম্পা ঘুমিয়ে পড়ার পব বিশ্বনাথ লিখতে বসে। শোবার ঘরটা আজকালকার সাধারণ ঘরের প্রায় আড়াইগুণ। এককোণে কাঠের ছোট টেবলে দুটো অভিধান, কলম রাখার জন্য একটা নক্সাকাটা পিতলের গ্লাস, লেখার প্যাড, লেখা পাতাগুলো জমার একটা ফাইল, কয়েকটা দরকারি বই, সবই গুছিয়ে রাখা। অনাবশ্যক একটি জিনিসও সে টেবলে রাখে না।

ঝরা পাতার উপর দিয়ে সাপ চললে যেমন, শুনলেই সিরসির করে ওঠে গায়ের চামড়া, শব্দটা সেই রকমই। বিশ্বনাথ অবশ্য ঝরাপাতার উপর দিয়ে সাপ কেন কোনও সরীসৃপকেই চলতে দেখেনি বা চলার শব্দও শোনেনি। ছোটবেলায় একটা অ্যাডভেঞ্চার বইয়ে পড়েছিল, খরখর, সরসর শব্দ করে 'সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন এগিয়ে আসছে গোপনে।' এটা এখনও তার মাথার মধ্যে গেঁথে আছে।

মুখটা তুলে সে কড়িকাঠের দিকে তাকায়। গত শতাব্দীর বাড়ি। ছাদটা এখনকার ঘরের প্রায়

দ্বিগুণ উঁচুতে। পাখা ঝোলাবার জন্য পাঁচফুট লম্বা রড কিনে দুধারে প্যাঁচ কাটিয়ে আনতে হয়েছে। মোটা মোটা পাঁচটা কাঠের কড়ি আর গোটা ষাটেক বরগায় ভর দিয়ে রয়েছে দোতলার ঘরের মেঝেটা। সেটা বরফির মতো সাদা আর কালো পাথরে ঢাকা। অনেকগুলো পাথর ফেটে গেছে। ফাটলে ময়লার দাগটানা। তাদের নীচের ঘরটার মেঝেও হুবহু একই দশায়। ফাটা পাথরের ফাঁকে নোংরা জমে আছে। উপর-নীচের ঘর দুটো আয়তনে উচ্চতায় একই রকমের।

বিশ্বনাথ সরসর শব্দটা শুনেছিল রাত বারোটা নাগাদ। ঠিক মাথার উপর ঘরের একধার থেকে অন্যধার তারপর দরজা দিয়ে পৌঁছল লম্বা বারান্দাটায়। কয়েক সেকেণ্ড থেমে বারান্দার অন্যপ্রান্তে সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত গিয়ে অবশেষে আবার ঘরে ফিরে আসা। সাপ চলার শব্দের সঙ্গে ছিল ছপ্‌ছপ্ বাড়তি একটা অস্পষ্ট শব্দও। নৌকোর দাঁড় জলে পড়ার মতো এই শব্দটা। বিশ্বনাথ নৌকোয় গঙ্গা পারাপার করেছে বলেই সেই রকম মনে হল শব্দটাকে। সর্ব অর্থেই প্রায় তখন নিশুতি। পার্টিশান করা পাশের শরিকি বাড়িতে রোজ রাতে কেউ একজন মোটরে ফেরে। বন্ধ করার আগে দু-তিনবার এঞ্জিনটাকে গোঁ-গোঁ করিয়ে নেয়। সেটা করা হয়ে গেছে। আশেপাশে টিভি সেটগুলো বন্ধ। যদি কোনও রিক্সার চাকা রাস্তার গর্তে পড়ে খটাং খট্ করে ওঠে সেটা বরং এই সময় সজীব লাগে। কিন্তু মাথার উপরের এই শব্দটা সিলিং থেকে হিমের মতো নেমে এসে শিরদাঁড়ায় যে অনুভূতি দিচ্ছে, এটা তার ভাল লাগছে না। হঠাৎই 'খরখর সরসর করে সাক্ষাৎ মৃত্যু' শব্দ কটা মনের মধ্যে কেন যে ঝিলিক দিল তার কোনও কারণ সে নিজের কাছে দর্শাতে পারল না। সে মুখ তুলে, শব্দটা কে করছে সেটাই বুঝতে চেষ্টা করল।

উপরে থাকে একটা বুড়ো। এই বাড়ির মালিক। মাঝারি উচ্চতার শীর্ণ ছোটখাট দেহ। পাতাকাটা কাঁচাপাকা হালকা চুল। টানা সরু চোখ এবং একটু বেমানান লম্বা নাক। গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে ট্রেসিং কাগজের মতো পাতলা। বিশ্বনাথ একবারই মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ওকে খালি গায়ে দেখেছে যখন অ্যাডভান্সের টাকা দিতে আসে। লম্বা বারান্দার শেষে একটা ভারী পায়াওলা চেয়ারে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে বুড়ো বসেছিল সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখেই দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে। বুড়োর পায়ে ছিল পাতাঢাকা ক্যানভাসের সাদা চটি।পাঞ্জাবির মতো চটিটাও সবসময় পরে থাকে। চলার সময় শব্দ হয় না।

তাহলে এত রাতে শব্দ কেন ? উপরে বুড়ো ছাড়া আর তো কোন মানুষ বাস করে না। বিশ্বনাথ ভুলে গেছিল বুড়োর সঙ্গে একটা কুকুরও উপরে থাকে। সেটা মনে পড়তেই কুকুরের চেহারাটা তার চোখে ভেসে উঠল। ঘুমন্ত বৌ আর ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে সন্তর্পণে দরজার ছিটকিনি খুলে সে দালানে বেরিয়ে আলো জ্বালল। দোতলার বারান্দার নীচেই তাদের এই দালান যেটাকে ভাড়াটের জন্য দেওয়াল তুলে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে দোতলায় যাবার সিঁড়ির সঙ্গে। এই দেওয়াল ঘেরা দালানেই রান্নাঘর ইত্যাদি এবং শম্পা রাতে ঘুমোয়। ঘুমন্ত মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে সে বাইরে বেরোবার দরজাটা খুলল।

বাড়িটার তিনদিক ঘিরে সরু জমি। আরও জমি ছিল কিন্তু বিক্রি হতে হতে এবং সম্পত্তি ভাগ হয়ে বুড়োর এই বাড়িটা বড় শরিকের পিছনের অংশে পড়ে গেছে। সামনের বাড়ির, যাকে বলা হয় 'ও বাড়ি', তাদের ভাগে লোহার ফটক কিন্তু বুড়োর অংশে আসতে হলে পাশের সরু গলিটায় ঢুকে কোমর সমান লোহার পাতের দরজাটা ব্যবহার করতে হয়। সেখান থেকে হাত দশেক চওড়া জমি বাড়িটাকে ঘুরে বিশ্বনাথের দরজার সামনে দিয়ে এগিয়ে একটা দেওয়ালে শেষ হয়েছে। সেখানে এক কালোয়ারের টিনের চালা যাতে জমা করা আছে বাতিল বা নীলামে কেনা মেসিনপত্তর। মাঝে মাঝে কুলিরা লোহা লক্কর রাখতে বা তুলে নিয়ে যেতে আসে। রাতে একজন পাহারাদার চালার নীচে

ঘুমোয়।

কালোয়ারের লাগানো একটা ষাট পাওয়ারের বাল্ব চালার বাইরে জ্বলছে। তাইতে অন্ধকার ঘোচে না তবে চেনা জায়গাটা চেনা যায়। সামনের দেওয়ালে দুটো হুকে কাপড় মেলতে দেওয়ার নাইলন দড়িটা যেখানে ঝুলে পড়েছে সেখানে আলকাতরায় লেখা, ঝাপসা হয়ে যাওয়া "খতম" শব্দটাকে বিশ্বনাথ এখন চিনতে পেরেছে, এই জন্যই, ওটা ওখানে যে রয়েছে তা জানে বলেই। নয়তো সে দূর থেকে আসা ষাট পাওয়ারের আলোয় "খতম"-কে বুঝে উঠতে পারত না। কলকাতার বহু দেওয়ালে এই শব্দটা একসময় সে দেখেছে, এখন আর দেখতে পায় না।

দরজা থেকে বেরিয়ে "খতম"-এর কাছাকাছি এসে ঘুরে উপর দিকে সে তাকাল। শব্দ কীভাবে এবং কে তৈরি করছে এটাই সে জানতে চায়। ঢালাই লোহার ধূসর নক্সাদার রেলিং, দু-তিন জায়গায় লোহা অদৃশ্য। বিশ্বনাথ বারান্দার দুই প্রান্তে রেলিং-এর উপর দিয়ে কয়েকবার দৃষ্টি টানল। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে কিছুই গোচর হল না। কান পেতেও কোনও শব্দ পেল না। পাহারাদারটা খাটিয়ায় ঘুমোচ্ছে দেখে সে বাড়ির মধ্যে ঢোকার জন্য চার-পাঁচ পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। কেন জানি, তার মনে হল বারান্দায় কেউ রয়েছে। আর একবার বারান্দার দিকে তাকাবার ইচ্ছাটা সামলাতে না পেরে সে মুখ তুলল।

একটা সাদা ছুঁচলো মুখ বাবান্দার ভাঙা রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে, ঠিক তার মাথার উপর। কলিজাটাকে একবার কে যেন কচলে দিয়েই ছেড়ে দিল। বিশ্বনাথের প্রায় এক মিনিট সময় লাগল ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে। সে ভূতপ্রেত, দৈত্যদানো প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্বাসী নয়। মাথার কয়েক হাত উপরে, নিশুত আধা অন্ধকারে অপ্রত্যাশিত একটা সাদা জন্তুর মাথা দেখতে পেয়ে সে ভয় পেল। নীচের দিকে মাথাটা নামিয়ে জন্তুটা তার দিকেই যেন তাকিয়ে। মুখটা কয়েক সেকেণ্ড রেলিংয়ের বাইরে থাকার পর অদৃশ্য হল। বিশ্বনাথ ছুটে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে চেয়ারে বসার পর মুখ তুলে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে সে নিজের মনে বলল, 'কুকুরটার চোখ দুটো কী ভীষণ জ্বলজ্বল করছিল !'

সেই প্রথম দিন অ্যাডভান্সের টাকা দিতে এসে বুড়োর চেয়ারের পিছনে সে কুকুরটাকে দেওয়াল ঘেঁষে ঘুমোতে দেখেছিল। তাদের কথাবার্তার শব্দে ওর ঘুম ভাঙেনি। বড় সাদা লোম কিন্তু নোংরা। একনজরেই বোঝা যায় ওকে কখনও স্নান করানো হয় না, কোনও কালে চিরুনিও পড়েনি। লেজের ডগায় চটা পড়ে একটা ডেলা হয়ে রয়েছে। কোমরের দিকে পিঠের উপর লোমগুলো চর্মরোগের চুলকুনিতে কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলা। জায়গাটা কাঁচা দগদগে ঘা। পাঁজরের লোম উঠে যাওয়ায় গোলাপি রঙের চামড়া দেখা যাচ্ছে। ওর চার পায়ের নখ কিন্তু বিশ্বনাথকে অবাক করেছিল। সেগুলো প্রায় ইঞ্চি দুয়েক লম্বা। তখন একবার মনে হয়েছিল এত বড় নখ নিয়ে চলাফেরা করে কী করে ? সে আরও দেখেছিল কুকুরটার বকলসের বদলে একটা কাপড়ের ফালি গলায় বাঁধা আর তাতে লাগানো রয়েছে একটা লোহার চেইন। চেইনটা মেঝেয় পড়ে আছে। কুকুরটি পুরুষ, বৃদ্ধ। আর তার প্রভুর মতোই রুগ্ন।

পরদিন সকালে তনু স্কুলে যাবার জন্য যখন সায়ার উপর শাড়িটাকে পাক দিয়ে আঁচলটা পিঠে ঝোলাতে ব্যস্ত, বিশ্বনাথ তখন ব্রাশে পেস্ট লাগাতে লাগাতে বলল, "রাতে একটা সরসর শব্দ হয় ওপরের মেঝেয়, শুনেছ কি ?

"রাতে ! কখন ?"

"এই বারোটা নাগাদ।"

"তখন তো ঘুমে কাদা, শুনব কী করে !" এই বলে নাভির উপরে পাটকরা শাড়ির গুছি গুঁজতে গুঁজতে তনু কৌতূহলী চোখে তাকাল। বিশ্বনাথ খুবই পছন্দ করে তনুর ক্ষীণকটি। মা হবার পর

মেয়েরা দেহের ছন্দ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে, তনু পড়েনি। ওর চরিত্রের কাঠিন্য দেহতেও বিস্তৃত।

"অত রাতে মাথার উপর গা সিরসির করা একটা শব্দ তার সঙ্গে আর একটা ছপছপ শব্দ রীতিমত ভয় লাগিয়ে দেয়।"

"কীসের শব্দ, বুড়োটা পায়চারি করছিল ?"

"তাই জানতেই তো কাল রাতে বাইরে বেরিয়ে ছিলুম। বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখি রেলিং থেকে মুখ বার করে কুকুরটা আমাকে দেখছে।"

তনুর উদ্বিগ্ন চোখ হাতঘড়ি হয়ে শম্পার কোলে বাবানের মুখের উপর পড়ল। "ঠিক তিনটের সময় ওকে মুসুম্বির রস করে খাওয়াবি · · · দাদা না ফেরা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে যাবি না। · · · হ্যাঁ৷ তারপর ! কুকুরটা দেখছে বললে—"

"মনে হল চোখ দুটো জ্বলছে।"

"অন্ধকারে জন্তুজানোয়ারের চোখ অমন দেখায়।"

"বৌদি, দাদাকে সেই কথাটা বলেছ।" শম্পা মনে করিয়ে দিল।

"কোন কথা ?"

"ওপর থেকে বাড়িওলা আমাদের জানলার পাশে কুকুরের গু ফেলে।"

"হ্যাঁ, এই এক বিশ্রি ব্যাপার করে বুড়োটা, এটা নিয়ে ওকে বলা দরকার। হাগাতে মোতাতে রাস্তায় নিয়ে যেতে পারে তো ! জানলার ধারে এইসব নোংরা জমলে রোগভোগ হতে কতক্ষণ। তুমি একবার ওকে বলো।" হাত ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে, রামকৃষ্ণের ছবির সামনে চোখ বন্ধ করে সেকেণ্ড পনেরো মাথা নামিয়ে তনু দাঁড়িয়ে থাকল। হাত ঘড়িটা আর একবার দেখেই সে চটি পরে নিয়ে, "যাচ্ছি" বলে বেরিয়ে গেল। শম্পা পিছু নিল। বাবানকে কোলে নিয়ে, সদর দরজা থেকে বাবান তার মাকে টা-টা করবে।

তনিমা এখন বাস ধরে শেয়ালদা স্টেশন যাবে। নটা আঠাশের কৃষ্ণনগর লোকাল ধরে যাবে চাকদা। দেড়ঘণ্টা ট্রেনের পর কুড়ি মিনিট ভ্যান রিক্সায় সহজপুর সীতানাথ আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তার প্রথম ক্লাস সাড়ে এগারোটায়। স্কুল ছুটির পর ছ'টি ছেলেমেয়েকে সে অঙ্ক আর ফিজিক্যাল সায়ান্স পড়ায় একঘণ্টা। এটা সে করে যাতায়াতের আর যৎসামান্য খাওয়ার জন্য খরচটা তুলে নিতে। সাতটা-এগারোর কৃষ্ণনগর ধরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায়শই রাত সাড়ে ন'টা হয়। ক্ষুৎকাতর, অবসন্নতায় বসে যাওয়া মুখ নিয়ে সে মোটামুটি বারো ঘণ্টা বসবাসের জন্য বাড়ি ফেরে। বিয়ের আগে থেকেই সে জীবন যাপনের এই প্রণালীর সঙ্গে সড়গড়। বিশ্বনাথ ওর জন্য কষ্টবোধ করে, ওকে সমীহ করে, ভয়ও পায়।

স্নান করতে যাবার আগে সে বাইরে গিয়ে ঘরের পিছন দিকটা দেখতে গেল। বুড়োকে বলার আগে ব্যাপারটা দেখে রাখা উচিত। যা দেখল তাতে বিরক্ত হতে হতে মাথা গরম হয়ে উঠল। সরু জমিটা এত রকম জঞ্জাল, আগাছা, ভাঙা ইট-রাবিশে ভরা যে পরিষ্কার করতে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার অন্তত তিনটে হাতগাড়ির দরকার হবে। তনু মিথ্যা বলেনি, জানলার গায়েই রোগের ডিপো। বিশ্বনাথের মনে হল, এটা তারও ত্রুটি। যতক্ষণ সে ঘরে থাকে শুধু লেখার চিন্তা নিয়ে সংসারকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াতেই ব্যস্ত থাকে। জানালার বাইরে কী জমা রয়েছে সেটা তারও তো লক্ষ করা উচিত ছিল। বাবানের স্বাস্থ্যের কথাটাই আগে ভাবা দরকার। বুড়োকে আজ সন্ধ্যাবেলায়ই সে বলবে, দুদিনের মধ্যে যেন সে পরিষ্কারের ব্যবস্থা করে। শুধু ঘর ভাড়া নিয়েই বাড়িওয়ালার কর্তব্য যে শেষ হয় না, এটা ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

বাড়ি ফিরতে বিশ্বনাথের একটু বেশিই দেরি হল, এক বিদেশি ওষুধ কোম্পানিতে সে মার্কেটিং ম্যানেজারের স্টেনো। তাছাড়া সে চিত্রনাট্য লেখে টিভি সিরিয়ালের জন্য। অফিস ছুটির পর ভবানীপুরে

স্নেহময়ের বাড়িতে গেছিল চিত্রনাট্যের কিছু অংশ দেখাবার জন্য। স্নেহর সঙ্গে কলেজে পড়ার সময় তার পরিচয়। কলেজের বড় ঘরটায় ইউনিয়নের কালচারাল কমিটির উদ্যোগে বছরে তিন-চারবার যে সব অনষ্ঠান হত তাতে দুবার বিশ্বনাথের লেখা একাঙ্ক হাসির নাটক অভিনীত হয় স্নেহর পরিচালনায়। সবাই খুব হেসেছিল। বি কম পাশ করার পর বিশ্বনাথ নাট্যকার হবার সখটা আর লালন করেনি ভেঙে পড়া সংসারটাকে মেরামত করার জরুরি তাগিদে। এর বছর দশেক পর পাড়ার এক বন্ধুর বাড়িতে সে ওয়ান-ডে ক্রিকেট ম্যাচ টিভি-তে দেখতে যায়। ম্যাচ শেষ হবার পর একটা ডকুমেন্টারি হচ্ছিল প্রতিবন্দীদের সম্পর্কে। সেটা শেষ হতেই বিশ্বনাথ পাঁচ-ছ সেকেণ্ডের জন্য একটা নাম দেখেছিল: 'পরিচালক স্নেহময় মান্না।' তার মনে হল এই লোকটি তার সহপাঠী স্নেহ ছাড়া আর কেউ নয়। অতঃপর সে খুঁজে বার করে স্নেহকে এবং তার স্ক্রিপ্ট লেখক হয়ে যায়। কয়েকটা ডকুমেন্টারির পর ছোট গল্পের একটি তেরো পর্বের সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লিখে বিশ্বনাথ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। এখন সে স্নেহর সঙ্গে আলোচনা করে অস্ট্রেলিয় একটি সিরিয়ালকে তেরো পর্বে বঙ্গীকরণের কাজে ব্যস্ত। এ জন্য প্রায়ই তাকে ভবানীপুর স্নেহ-র বাড়ি যেতে হচ্ছে সিরিয়ালটির ভিডিও ক্যাসেট দেখার জন্য।

ভবানীপুর থেকে তার এবং চাকদা থেকে তনুর ফেরা একই সময়ে ঘটল। বারান্দায় রেলিংয়ের ধারে বুড়োটা চেয়ারে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে কিছু একটা পড়ছে, বাড়ি ঢোকার সময় এটা দুজনেই দেখেছে। বিশ্বনাথই শুরু করল :

"রাত হয়ে গেছে, আজ থাক। বুড়োকে কাল কি পরশু বলব।"

"বলার সময় একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলো। ঝগড়া করে বসো না।" খাটে পা ঝুলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে তনু বলল।

চেয়ারে বসা বিশ্বনাথ মুখ ঘুরিয়ে তনুর দেহের মাঝামাঝি অংশটায় চোখ রেখে বলল, "পাগল নাকি। এমন নিরিবিলি পরিবেশ, ভিড় ভাট্টা চ্যাঁ ভ্যাঁ নেই, ঝুটঝামেলা নেই, এই রকম জায়গায় ঝগড়া করে অশান্তি টেনে আনতে যাব কেন ? এই একটা ঘর মানে তো দুটো ঘর, সঙ্গে অত বড় দালান, এই ভাড়ায় কলকাতায় এখন কোথায় পাব ! বুড়ো মানুষ, একা, ওর সঙ্গে মানিয়ে আমাদেরই চলতে হবে।"

"বুড়োকে কখনও দোতলা থেকে নামতে দেখেছ ?" তনু মুখ ফিরিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল এবং খোলা পেটের উপর শাড়িটা টেনে দিল। বিশ্বনাথের চোয়াল শক্ত হয়েই আবার শিথিল হল। চোখ দেখেই ও বোধহয় বুঝতে পারে স্বামী কী চায়। তার মনে হচ্ছে রাতে তনু বলবে, 'আজ থাক, বড্ড ক্লান্ত।' তারপর পাশ ফিরে বাবানকে জড়িয়ে ধরে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে। তনু অবশ্য সত্যিই ক্লান্ত থাকে।

"লক্ষ করিনি। কাজের লোকজন নেই যখন নিশ্চয় বেরোয়। তুমি দেখেছ ?"

"বেরোয়। শম্পা দেখেছে, বেলা দশটায় থলি হাতে বেরোয়। কালোয়ারের দরোয়ানটা কেরোসিন এনে দেয়। বুড়ো নিজের হাতে রান্না, কাচা, ঘর মোছা সব কাজ করে।··· খুব কিপ্টে।" তনু স্বামীর দিকে তাকাল কিছু একটা মন্তব্য আশা করে।

"কুকুর পোষার সখ আছে।" বিশ্বনাথ মন্তব্য না করে উঠে পড়ল। এখন স্নান করে, কিছু খেয়ে বিছানায় চিৎ হয়ে সকালে চোখ বুলোনো খবরের কাগজটা সে খুঁটিয়ে পড়বে।

"টিভি সেট-এর কী হল, খোঁজ নিলে ?" তনু উঠে বসে আলগা স্বরে জানতে চাইল। "প্রোগ্রামগুলো তো তোমার দেখা দরকার।"

"দেখার আর কী আছে। আমার কাজ গল্প তৈরি করা আর সাজানো। আসল কাজটা তো করবে স্নেহ।"

"তবু—খোঁজ নাও।"

"নিয়েছি। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট দু হাজারের মধ্যে, কালার চোদ্দ হাজার।"

"চোদ্দো ! অত টাকা দিয়ে তো নেওয়া সম্ভব নয়।"

বিশ্বনাথ কথা না বাড়িয়ে স্নানে চলে গেল। সে জানেই তনু চোদ্দ হাজার টাকা খরচে আপত্তি জানাবে। আপত্তি তার নিজের নেই বটে কিন্তু টাকার অঙ্কটার সঙ্গে সখ-এর বনিবনা যে সম্ভব নয় অসহায়ভাবে সেটা তাকে মেনে নিতে হয়েছে। তারা দুজনেই টাকা জমাচ্ছে একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্য। কলকাতার আশেপাশে ছোট দুঘরের ফ্ল্যাট তিন লাখের কমে পাওয়া যাবে না এটা তারা জানে। আজ পর্যন্ত দুজনে যা জমিয়েছে আর নানান জায়গা থেকে ধার বা আগাম হিসাবে যা সংগ্রহ করতে পারবে, সব মিলিয়ে যোগ করে দেখেছে আধখানা ফ্ল্যাটের মালিক হবার মতো অবস্থায় তারা এখন রয়েছে। সুতরাং দু রকমের টিভি সেট-এর মধ্যে বারো হাজারের ব্যবধানটা তাদের কাছে মাটির মেঝের সঙ্গে মোজাইক টালির মতো। টিভি সেট কেনার বাসনাটা এতদিন তারা দমন করেই রেখেছিল। কিন্তু স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ থেকে বাড়তি আয়ের পথ খুলে যাওয়ায় তারা পরিজনে ঠাসা পৈতৃক বাড়ির ছোট একটা ঘর, অবিরাম চেঁচামেচি এবং নিত্য বিবাদের কবল থেকে রেহাই পেতে বেরিয়ে এসেছে। এ জন্য প্রতি মাসে আটশো টাকা বেশি খরচ হবে। বিশ্বনাথ তখন সেটা তনুকে বলেছিল।

"হোক্, তবু এখানে আমি বাবানকে মানুষ হতে দেব না। এত ইতরোমি আর নোংরা কথাবার্তার মধ্যে ও একটা অমানুষ হয়ে উঠবে। ওকে আমি ভালভাবে মানুষ করব, ওকে ভাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াব।" কঠিন গলায় তনু জানিয়ে দিয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে সংসাব পেতে সে ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে না। বাপ-ঠাকুর্দার বাড়ি ছেড়ে আসতে বিশ্বনাথের কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তনুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার কষ্টটাকে ঘাড় ধরে নুইয়ে দিয়েছিল। এখন আর ব্যথা করে না।

রাত্রে লিখতে বসে বিশ্বনাথ অনেকক্ষণ পর আবিষ্কার করল সে একলাইনও লেখেনি, উৎকর্ণ হয়ে দোতলা থেকে সরসর আর ছপছপ শব্দ দুটো কখন নেমে আসবে তার জন্যই সে অপেক্ষা করছে। বারবার সে সিলিংয়ের দিকে তাকাল। কোনও শব্দ নেই। অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে হতাশ হয়ে পড়ল। আজ আর লেখা হবে না, এমন এক ধারণায় পৌঁছে সে আলো নিবিয়ে শুয়ে, বাঁ হাতটা অঘোরে ঘুমনো তনুর কোমরের উপর আলতো রাখল। বিশ্বনাথ আশা করল তনু নড়চড়ে উঠবে। কিছুই হল না। আঙুলগুলো কোমরে চেপে বসাতে যাচ্ছে আর তখনই দোতলায় সরসর শব্দটা চলতে শুরু করল। আঙুলগুলো প্রথমে অসাড় হল তারপর নেতিয়ে পড়ল। সরসর শব্দের সঙ্গে ছপছপটাও যথারীতি দালানের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো তারপর ঘরের মধ্যে থেমে থেমে যাতায়াত শুরু করল। বিশ্বনাথের মনে হল, বাসি ভাতের মতো তার শরীর কড়কড়ে ঠাণ্ডা লাগছে। তনুর কোমর থেকে হাতটা তুলে নিয়ে সে স্থির করল, বুড়োর সঙ্গে কাল অবশ্যই কথা বলবে।

পরদিন সকালে সে সময় করে উঠতে পারল না। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে নিজের দরজায় না থেমে সে সোজা দোতলার সিঁড়ি ধরল। বাঁকটা নিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতেই সে দেখল বারান্দার মাঝখানে কুকুরটা উবু হয়ে সামনের পায়ের থাবা দুটো পাশাপাশি রেখে বসে। সিঁড়ির দিকে মুখ করে সোজা এমনভাবে তাকিয়ে যেন তার জন্যই প্রতীক্ষা করছে। বারান্দাব অল্প পাওয়ারের বালবটা কুকুরটার পিছনে তাই মুখটা বিশ্বনাথের কাছে স্পষ্ট লাগল না। চেয়ারে বসে চশমাপরা বুড়ো মাথা ঝুঁকিয়ে একটা বই পড়ছে। সে থমকে গেল।

আর দুটো ধাপ উঠলেই দালান। কুকুরটার স্বভাব তার জানা নেই, পাশ দিয়ে যেতে গেলে যদি কামড়ে দেয় ? বিশ্বনাথ গলা খাঁকারি দিল বুড়োর মুখ ফেরাবার জন্য। মুখ ফিরল। বুড়ো যখন বোঝার চেষ্টা করছে লোকটি কে, তখন বিশ্বনাথ বলল, "আমি আপনার ভাড়াটে, নীচে থাকি।"

চশমাটা খুলে ঠাণ্ডা মৃদুস্বরে বুড়ো বলল, "দাঁড়িয়ে কেন, আসুন।"

"আপনার কুকুরটা।"

"ও কিছু বলবে না, পাশ দিয়ে চলে আসুন।" চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বুড়ো বলল। "কিছু কি দবকার আছে ?"

"হ্যাঁ, একটা কথা বলার জন্য এসেছি।" বাকি দুটো ধাপ বিশ্বনাথ এখনও ওঠেনি। এখনও সে পুরো ভরসায় পৌঁছতে পারেনি। কুকুরটা একটা পাথরের মূর্তির মতো বসে, একইভাবে সিঁড়ির দিকে সোজা তাকিয়ে। ভয়ে ভয়ে বিশ্বনাথ ওর চোখ দুটোকে লক্ষ করল। ছায়া ঢাকা মুখের মধ্যিখানে দুটো অনুজ্জ্বল মার্বেলের গুলি যেন বসানো রয়েছে। মনে মনে সে বলল, 'তবে কি ভুল দেখেছিলাম সেদিন !'

ঘর থেকে একটা মোড়া এনে দালানে রেখে বুড়ো বলল "আসুন আসুন, ভয়ের কিছু নেই। জীবনে ও কখনও কাউকে কামড়ায়নি।" বিশ্বনাথ যখন আড়ষ্টভাবে পা টিপে কুকুরটাকে অতিক্রম করছে বুড়ো তখন বলল, "ফুচা দেখতে পায় না, ও অন্ধ।"

বিশ্বনাথ ধাক্কা খেল কথাটা শুনে। ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক হয়ে সে ফুচার দিকে তাকিয়ে রইল। একইভাবে ও বসে রয়েছে সিঁড়িব দিকে মুখ করে। বসার ভঙ্গিতে রয়েছে যেন কারুর জন্য অপেক্ষা। নিশ্চয় তার জন্য নয়। সে যে আজ দোতলায় উঠে আসবে ফুচার সেটা জানার কথা নয়।

মোড়ায় বসে বিশ্বনাথ বলল, "রোজ রাতে ওপবে একটা সরসর, ছপছপ শব্দ শুনতে পাই।"

বুড়োর ভ্রূ কুঁচকে উঠল। চোখ দুটো সরু করে একটু রুক্ষস্বরে বলল, "তাতে কী হয়েছে ? কোন অসুবিধে হচ্ছে নাকি ?"

বিশ্বনাথ সাবধান হয়ে গেল। চটাচটির মধ্যে কোনক্রমেই সে যাবে না। "তেমন কিছু নয়, তবে কৌতূহলও হয়।"

বুড়ো চাপা গলায় নরম সুরে ডাকল, "ফুচা ফুচা।.. এখানে আয়।"

ফুচা মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ পিছনে তাকিয়ে থেকে মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল বুড়োর দিকে। গলার চেইনটা মেঝেয় ঘষড়ানোর দরুন যে শব্দটা হচ্ছে বিশ্বনাথ সেটা চিনতে পারল। বড় বড় নখগুলো ওর প্রত্যেকটা পা ফেলতে যে শব্দ তৈরি করল সেটা বুঝে নিতেও তার অসুবিধা হল না।

"ফুচা কি সারারাতই ঘুরে বেড়ায় ?"

'হ্যাঁ। এটা ওর অনেকদিনের অভ্যেস। আজীবন একা একাই ওর কেটেছে। জীবনের শেষ সীমায় এখন ও।"

বুড়োর থেকে তিন হাত দূরত্বে উবু হয়ে বসে মুখ তুলে ফুচা কথাগুলো শুনছে। বিশ্বনাথ কয়েকটা কালো পোকা ওর চোখের কোণে, কানের পাশে, হাঁটুর কাছে দেখতে পেল।

"পোকা হয়েছে, খুব কষ্ট পায় নিশ্চয়।"

"হয়তো পায়।"

"পোকা মারার জন্য তো পাউডার পাওয়া যায়।"

বুড়ো তীব্র চোখে তাকিয়ে বলল, "তা যায়। আপনি কি পোকা নিয়ে কথা বলার জন্য এসেছেন ?"

বিশ্বনাথ আর একবার সাবধান হল।

"ওপর থেকে আমার জানলার ধারে যে সব জিনিস পড়ে তাতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। কী পরিমাণ জঞ্জাল, কী ধরনের ময়লা জমে উঠেছে সেটা যদি দয়া করে একবার দেখে আসেন।" যথাসম্ভব বিনীত স্বরে সে বলল।

সচকিত বুড়ো সোজা হয়ে বসল। "জঞ্জাল ? আপনার জানলার ধারে ! ছি ছি ছি, এটা আমারই দোষ। বহুদিনের অভ্যেস তো, নীচে কেউ থাকত না বলে তাই · · · " বুড়ো দুই তালু চেপে বলল,

"আমারই অন্যায়।"

বিশ্বনাথ আশা করেছিল তিরিক্ষে বা মেজাজি স্বরে দায় এড়িয়ে যাওয়ার মতো জবাব পাবে। তার বদলে ওকে এমন অনুতপ্ত হতে দেখে সে অপ্রতিভ বোধ করল।

"কালকেই আমি রামবিলাসকে বলে জঞ্জাল সরাবার ব্যবস্থা করব।"

"এত ব্যস্ত হবার কী আছে। যে কোনও একদিন পরিষ্কার করে দিলেই হবে।"

বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়াল। ফুচা একইভাবে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। চোখ দুটো ফুলে উঠে কোটর থেকে অল্প বেরিয়ে, পুরোটাই ঘোলাটে সাদা। বোধহয় ছানি পড়েছে। কুকুরেরও তো ছানি অপারেশন হয়। বলতে গিয়েও বিশ্বনাথ নিজেকে সামলে নিল। হয়তো চটে গিয়ে বলবে "হ্যাঁ হয়। আপনি কি ছানি নিয়ে কথা বলাব জন্য এসেছেন ?"

ফুচার পাশ দিয়ে এগোতে গিয়ে সে চেইনটা মাড়িয়ে অল্প একটু হড়কে যেতেই পাথরের সঙ্গে লোহা ঘষার শব্দ হল। কর্কশ শব্দটায় তার দুই বাহুর রোমের গোড়া সিরসির করে উঠল। তার মনে হল একটা সাপ যেন সে মাড়িয়ে ফেলেছে।

"মাঝে মাঝে একটু মেজাজ খারাপ করে তখন বেঁধে রাখতে হয় তাই চেইনটা গলায় লাগিয়েই বেখে দিয়েছি। কে আর খোলে-পরায়।" বুড়ো নিচু গলায় বলল।

প্রসঙ্গটা বদলাতে বিশ্বনাথ বলল, "আপনার তো ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি নেই, টিভি অ্যান্টেনা লাগাই কী করে সেটাই ভাবছি।"

"কেন, ও-বাড়ি দিয়ে ছাদে আসবেন ! আমার ভাইপো রবিকে বলবেন ও আপনাকে ছাদে নিয়ে যাবে। বাড়ি পার্টিশানে সিঁড়িটা ও... ভাগে পড়ল। আমার দিকে নতুন সিঁড়ি করে নেওয়ার কথা। কিন্তু করা আর—"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিশ্বনাথ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ফুচা বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে একইভাবে বসে রয়েছে আর বুড়ো তাকিয়ে সিঁড়ির দিকে।

"জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেবে বলল," তনু ফেরামাত্রই বিশ্বনাথ জানিয়ে দিল।

"ভাল।"

"কুকুরটাকে ভাল করে দেখলুম ··· একদম অন্ধ, শুধুই বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে ! গায়ে পোকা অজস্র।··· রাতে যে শব্দ শুনি সেটা যে ওরই কাজ আজ বুঝলুম। গলায় একটা চেইন বাঁধা, সেটা মেঝের উপর দিয়ে টানতে টানতে যায়, আর পায়ের বড় বড় নখ, তাই থেকেই শব্দটা হয়।··· বাবা বাঁচা গেল, যা টেনশন হয় ! আমি ভাবতুম না জানি অন্য কিছু —"

"অন্য কিছু মানে ভূতটুত ?"

স্কুলের শাড়িটা খাটের উপর বিছিয়ে তনু আলনা থেকে শাড়িটা নিতে এগোল। শায়াটা ধবধবে, বিশ্বনাথ চোখ বুলিয়ে একটা কোনও দাগও দেখতে পেল না। এই বয়সে তনুর শরীর একটু ভারী হওয়ার কথা কিন্তু সেই রোগাই রয়ে গেল।

"প্রায় তাইই। সিনেমায় দেখো না, পোড়ো বাড়িতে কুয়াশা আর ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে কতরকম শব্দ আর গান হয়, অনেকটাই সেই রকম লাগত।" কথাটা বলার সঙ্গেই বিশ্বনাথের দৃষ্টি থেকে তনুর নিতম্বের বক্র ভাঁজ অদৃশ্য হয়ে গেল শাড়ি জড়িয়ে নেওয়ায়। আধময়লা ছাপা শাড়ি। সাশ্রয়ের জন্য হপ্তায় একদিন, রবিবার, তনু সারা পরিবারের কাচাকাচির কাজ সারে, ইস্ত্রি করে স্কুলের জন্য মাড় দেওয়া শাড়ি। ছুটির দিনেও নিজেকে ও ক্লান্ত করতে হন্যে হয়ে ওঠে।

শম্পা চা দিয়ে গেল দুজনকে। খাট থেকে শাড়িটা তুলে পাট করতে করতে তনু বলল, "তুমি আগে গা ধুয়ে এসো।"

"টিভি শনিবার আনব। রোববার সকালে প্রোগ্রাম চলার সময় ওদের লোক এসে অ্যান্টেনা

লাগাবে। বুড়ো বলল ও-বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ছাদে যাওয়া যাবে।'

"ভাল। তার আগে জঞ্জালগুলো পরিষ্কার হোক্ তো।"

বিশ্বনাথ রাতে সিলিংয়ের দিকে মুখ করে শুয়ে অপেক্ষা করছিল। সরসর শব্দটা শুরু হতে সে আজ এর মধ্যে কোনও রহস্য অনুভব করল না। ওপাশ ফিরে শোওয়া তনুকে কাঁধ ধরে হ্যাঁচকা টানে সোজা করে দিতেই সে "কে, কে," বলে উঠে বসতে গেল।

"কে আবার, আমি।"

বিশ্বনাথ বুকে ছোট্ট ঠেলা দিয়ে ওকে শুইয়ে দিল। মিনিট পাঁচেক পর শাড়িটা উরু থেকে নামিয়ে বিড়বিড় করতে করতে তনু আবার পাশ ফিরে শুল।

রবিবার অ্যান্টেনা লাগাবার লোকটিকে নিয়ে বিশ্বনাথ হাজির হল ও-বাড়িতে। বরফিকাটা তকতকে পাথরের মেঝে, দরজা জানলায় উজ্জ্বল রঙ, আসবাবে ধুলো নেই অথচ সবই প্রাচীন। বুড়োর ভাইপো রবির কথাবার্তা মার্জিত ও নম্র। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। শাদা পাজামা আর গেঞ্জিটা তনুর শায়ার মতোই ধবধবে, নিদাগ। বিশ্বনাথের অস্বস্তি ছিল হয়তো ছাদে যেতে দেবে না। জ্যাঠার সঙ্গে শরিকি সম্পর্কটা কেমন রয়েছে সেটা তার জানা নেই। সাধারণত ভাল থাকে না।

"নিশ্চয় যাবেন, এতে আপত্তি করার কী আছে, ওদিকের ছাদটা তো জ্যাঠামশায়েরই।"

জলছাদের সুরকির আস্তরণ উঠে গিয়ে খোয়া বেরিয়ে পড়েছে। বৃষ্টির জল বেরোবার নলের মুখে আবর্জনা। পাঁপড়ের মতো মড়মড়ে হয়ে রয়েছে শুকিয়ে যাওয়া শ্যাওলা। গাছের পাতা, কাগজ, কাঠকুটোয় ঝাঁঝরির মুখ বন্ধ। পলেস্তরা-খসা ইট বহু জায়গায় বেরিয়ে হাঁটু সমান একটা পাঁচিল দিয়ে ছাদটা ভাগ করা।

"আমরা মাঝে মাঝে নর্দমার মুখ পরিষ্কার করে দিই। বৃষ্টির জল বসে বসে জ্যাঠামশায়ের পোর্শনটার যা অবস্থা হয়েছে!"

চোখে জ্বালাধরানো রোদে দাঁড়িয়ে তারা। লোকটি অ্যান্টেনা লাগাবার কাজে ব্যস্ত। ঘণ্টাখানেক সময় তো লাগবেই। বিশ্বনাথের মনে হল, এখানে তার দাঁড়িয়ে কাজ দেখার কোনও দরকার নেই। রবি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল বিশ্বনাথের মনোভাব।

"এই রোদে দাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ, আপনি নীচে গিয়ে বসতে পারেন, ততক্ষণ ও কাজ করুক।"

বিশ্বনাথ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। একতলায় বসার ঘরে গেল। একটা মেহগনির টেবল ঘিরে চারটে কাঠের চেয়ার। সবই পুরনো আমলের। একটা লোক সামনের চেয়ারে বসে, কিছু একটা বিষয় পেড়ে কথা তো বলতে হবে, তাই বিশ্বনাথ শুরু করল, "আমার ঘরের বাইরে বহুদিনের জঞ্জাল জমে ছিল। ওনাকে বলেছিলুম তাই আজ সাফ হচ্ছে।"

"এসব ব্যাপারে উনি খুব পার্টিকুলার ছিলেন, আপনাকে সাফ করার কথা বলতেই হত না। এখন অবশ্য—।"

"আপনার জ্যাঠামশাই বোধহয় একা থাকতে ভালবাসেন।"

"বছর কুড়ি-বাইশ হল উনি এইরকম হয়ে গেছেন।" স্বরটাকে গাঢ় করে রবি কিঞ্চিৎ বিষাদ মাখিয়ে বলল। "ওর একমাত্র ছেলে ভাস্ত, আমার থেকে বছর পাঁচেকের ছোট, নকশাল আমলে খুন হল। তারপর থেকেই উনি এমন হয়ে গেলেন।"

বিশ্বনাথ নড়েচড়ে বসল। "বলেন কী! ওনার ছেলে খুন হয়েছে? কোথায়, কারা করল?"

"যে দরজা দিয়ে আপনি ঢোকেন ঠিক তার সামনে, সন্ধেবেলায়। আমরা শুধু একটা চিৎকার শুনেছিলুম। আটবার স্ট্যাব করে। ছুটে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন ওরা পালিয়ে গেছে। জ্যাঠামশাই দোতলার বারান্দা থেকে ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছিলেন।"

নিজের অজান্তে বিশ্বনাথ মুখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল। মোটামোটা কাঠের কড়ি আর বরগা

এ বাড়িতেও।

"ভাস্তুকে আমরাই মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাই, তখন আর বেঁচে নেই।"

"দেওয়ালে এখনও আলকাতরার অস্পষ্ট একটা কথা পড়া যায়।"

"সেকি ! এখনও আছে ?" রবি খুবই অবাক হল। "বহু বছর ওদিকে আর যাওয়া হয়নি। আশ্চর্য, এখনও আছে ?" বিস্ময়ের ধাক্কাটা সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়ে উঠে রবি বলল, "সেদিন রাতেই লিখে দিয়ে গেছিল, 'খুন নয় খতম'। কথাটার মানে আজও বুঝি না। শুনেছি জ্যাঠামশাই দোতলায় বসে থাকেন ওই দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে।"

" হ্যাঁ আমিও দেখেছি, কারণটা এতদিন জানতাম না। ভাস্তু পলিটিক্স করত কি ?"

"বলতে পারব না। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স নিয়ে পড়ত, মুখচোরা, বাবার মতোই রুগ্ন ছিল। জ্যেঠিমা তো পাগলের মতো হয়ে গেলেন। ওদের মেয়ে টরন্টোয় কম্পুটার সায়ান্স পড়তে গিয়ে ওখানেই বিয়ে করে সেট্‌ল করেছে। সে এসে মাকে নিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে বাবাকে টাকা পাঠাত। জ্যেঠিমা ওখানেই মারা গেছেন, এখন বোধহয় আর টাকা আসে না।" রবি নিশ্চিত ভঙ্গিতে ছোট্ট করে মাথা নাড়ল। ওর কথা বলার ধরন থেকে বিশ্বনাথের মনে হল, লোকটি গপ্পে। শোনানর মতো কাউকে পেলে অনর্গল বকে যেতে পারে।

"আপনার জ্যাঠামশায়ের একটা কুকুর আছে।"

"জানি, স্পিৎজ্। খুব বুড়ো, মরার টাইম হয়ে গেছে।"

"ও অন্ধ।"

রবি কথাটা কানে নিল না বরং নম্রস্বরে জানতে চাইল, "আপনার স্ত্রী কোথাও বোধহয় পড়াতে যান ?"

প্রশ্নটা শুনে বিশ্বনাথের ভ্রূ উঠে গেল। রবি তাহলে তাদের সম্পর্কে খবর রাখে। "চাকদায় একটা স্কুলে।"

অতদূরে ! তাই ফিরতে অ্যাতো রাত হয়। আপনি তো সিরিয়াল লেখেন, আমার মেয়ের কাছে শুনেছি।"

এইসময় চাকর এসে রবিকে জানাল, তাকে ভিতরে ডাকছে। রবি উঠে যাবার পরও বিশ্বনাথ কিছুক্ষণ বসে বুড়োর কথা ভাবল। ছাদে অ্যান্টেনা লাগানোর কাজ আর সে দেখতে গেল না, নিজের ঘরে ফিরে এল।

টিভি সেটটা রাখা আছে তার টেবলে। ওটাকে অন্য কোথাও রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

"টেবলেই থাক না।" তনু বলল, "লেখার জন্য তো অনেকটা জায়গা থাকবে।"

"না থাকবে না।" হঠাৎই রেগে উঠল বিশ্বনাথ। নিজেকে তার মনে হচ্ছে চারদিক থেকে চাপ খাওয়া কুঁকড়ে যাওয়া একটা মানুষ। "অত অল্প জায়গায় আমি লিখতে পারব না।"

একই রকম তিক্ত স্বরে তনু বলল, "না পারো তো সেট্‌টাকে রান্নাঘরে রেখে এসো, শম্পা বসে বসে দেখবে।"

"সেই ভাল।"

"ওটা তোমার জন্যই আনা, আমার বা বাবানের জন্য নয়।" শান্ত ধীর গলায় তনু বলল।

"এত বড় ঘর অথচ এইটুকু একটা জিনিস রাখার জন্য আমার টেবল ছাড়া কি আর জায়গা নেই ?"

"নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ, কী আছে কী নেই।"

জানলা ঘেঁষে কালো ফিতের মতো অ্যান্টেনার তার ঝুলছে। গোল করে পাকান তারের বাকিটা জানলা গলিয়ে ঘরের মধ্যে বাড়িয়ে এই সময় লোকটি বলল, "ধরুন।"

বিশ্বনাথ ধরল। লোকটা এবার ঘরে আসবে। নরম গলায় সে বলল, "টেবলেই এখন থাকুক, পরে দেখা যাবে।"

সারাদিনে দেখা আর হল না। টেবলে যতটুকু জায়গা বিশ্বনাথ সেইটুকুতেই কাজ চালিয়ে নিতে রাতে লেখায় বসল। বিকেল থেকে টিভি চালানো হয়েছে। সবাই বাংলা সিনেমা দেখেছে, তিন ভাষায় খবব শুনেছে, ওরা সবাই খুশি। ভোরে উঠতে হবে বলে রোজকার মতো দশটাতেই তনু শুয়ে পড়েছে বাবানকে নিয়ে।

মাথার মধ্যে ছুঁচ ফোটানোর মতো একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। দুহাতের চেটোয় রগ চেপে বিশ্বনাথ মাথা নামিয়ে বসে আধঘন্টারও বেশি। একটা লাইনও লেখা হয়নি। বাড়ির সুইমিংপুলে পূর্ণিমার রাতে জলবিহার করতে নামবে বিশাল শিল্পসাম্রাজ্যের মালিক আর তার স্ত্রী। শিল্পপতিব মৃত্যু ঘটিয়ে সাম্রাজ্য দখল করার জন্য চক্রান্ত করেছে শিল্পপতির মধ্যবয়সী স্ত্রী এবং তাব তরুণ প্রেমিক। বিশ্বনাথ আপত্তি করে বলেছিল, 'এই ধরনের অবৈধ প্রেম আমাদের ভিউয়াররা পছন্দ করবে না।' স্নেহ বলেছে, 'পছন্দ করাতে হবে। আমরা তো এই ধরনের প্রেমের বিরুদ্ধেই বলতে চাই। ওদের বিরুদ্ধে ঘৃণা আনতে চাই বলেই—।'

সুইমিং পুলের জলে গলায় চেইন বাঁধা একটা কুমির গোপনে রেখে দেওয়া হবে। খিলখিল হেসে মজা করার জন্য স্ত্রী ধাক্কা মেরে স্বামীকে জলে ফেলে দেবে। তারপর একটা বীভৎস কাণ্ড। কুমিরে ধরা একটা লোকের চিৎকার, জলের তোলপাড় চোখের পাতা না ফেলে স্ত্রী কঠিন মুখে তাকিয়ে থাকবে এবং ধীরে ধীরে জল শান্ত হয়ে যাবে, জলের রঙ বদলে যেতে থাকবে। এই দেখিয়ে ঘৃণার সঞ্চার করাবে। স্নেহ পাগল নয়, খুব ঠাণ্ডা মাথাতেই সে ঘটনাটা ছকেছে।

দৃশ্যটা কল্পনা করে বিশ্বনাথ নিজের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা বুঝে নিতে গিয়ে দেখল কোনও প্রকারের ঘৃণা তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে না। বরং মাথার মধ্যে একটা ছুঁচ অবিরত ফুটে চলেছে। ঘৃণাটাকে ঠিকমতো কব্জা করতে না পারলে দৃশ্যটা সে লিখবে কী করে ? অসহায়ভাবে বিশ্বনাথ মুখ তুলে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবাক হয়ে পড়ল। এ কী ! কোনও শব্দ তো সে এখনও পেল না। টেবলে রাখা রিস্টওয়াচে দেখল সওয়া বারোটা।

ফুচার চলাফেরা কি শেষ হয়ে গেছে ? কুমিরের মানুষ খাওয়া দেখতে দেখতে সে খুবই কি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ? কিন্তু সরসর শব্দটা এমনই যে সেটা তার শরীরের যে কোনও জায়গা স্পর্শ করবেই, বীভৎস সুখে তার সর্বাঙ্গ মোড়া থাকলেও ! ফুচা আজ সময় রাখতে পারেনি। আলো নিবিয়ে বিশ্বনাথ চিৎ হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। ফুচার চলাফেরা হল কি না সে জানল না।

পরের রাতেও একই ব্যাপার, ফুচার চলাফেরার আভাসটুকুও নেই। কৌতূহলী হয়ে বিশ্বনাথ দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। সামনের দেয়ালে 'খতম'-এ পিঠ লাগিয়ে দোতলার বারান্দার রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে যতদূর দেখা যায় দেখার জন্য গোড়ালিও তুলল। কিছুই নেই। খাটিয়ায় রামবিলাস ঘুমোচ্ছে। ফিরে আসার জন্য দরজার কাছে এসে থমকে সে মুখ তুলল। চোখ বন্ধ করে একবার শিউরে উঠে চোখ খুলল।

ফুচার মাথাটা বেরিয়ে নেই, সেই জ্বলজ্বলে চোখদুটোও নেই। জন্তু জানোয়ারের চোখ, তনু বলেছে অন্ধকারে জ্বলে। কিন্তু ফুচার চোখে কোনও আলো থাকার কথা নয়, ও দুটো তো ছানি পড়ে সাদা হয়ে আছে ! ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে বিশ্বনাথের একটাই চিন্তা, আমি ভুল দেখলাম কেন ? কূলকিনারা না পেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে সে তনুকে বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার, ফুচার নখ আর চেইনের শব্দ দুদিন হল পেলুম না !"

শাড়ি পাট করে নাভির উপর গুঁজে দিতে দিতে তনু আড়চোখে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "বুড়ো হয়তো কোথাও চেইনটা বেঁধে রেখেছে তাই ও চলছে না···· শম্পা ঠিক তিনটের সময় মনে করে কিন্তু রসটা খাওয়াবি।" রামকৃষ্ণের ছবির সামনে সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়াল।

বোধহয় তাই, ফুচাকে বেঁধেই রাখা হয়েছে কেন না আরও চারদিন বিশ্বনাথ শব্দ পেল না। এখন তাব শব্দ না পাওয়ার অস্বস্তিটা আর হয় না। কিন্তু শম্পার একটা কথায় সে বিচলিত বোধ করল।

"আজ সকালে বৌদি বলল, জানলা দিয়ে কী রকম যেন একটা গন্ধ আসছে। তুমি কি পাচ্ছ ?"

বিশ্বনাথ জানলার কাছে এসে কয়েকবার শ্বাস টানল। একটা গন্ধ সে পেল। কথা না বলে সে বেরিয়ে এসে জানলার বাইরে দাঁড়াল। ইঁদুর কি বেড়াল কিছু একটা মরেছে, সকালে দেখা যাবে এইভেবে সে ফিরে এল।

তনু ফিরে এসে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "আবার ওপর থেকে ফেলা শুরু করেছে। কাল সকালেই গিয়ে বলো।"

বিশ্বনাথ সকালে বলতে যাবার আগে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য জানলাব বাইরে একবার খোঁজাখুজি করল। উপর থেকে কোনও কিছু পড়ার চিহ্ন নেই। তবে সে মাংসপচার একটা গন্ধ পেল। কিছুই যখন পাওয়া গেল না তাহলে কী বলতে সে উপরে যাবে ? বিশ্বনাথ ফাঁপরে পড়ল।

"বলো একটা উৎকট গন্ধ পাচ্ছি। এ ব্যাপারে বাড়িওলা হিসেবে ওনারও তো কিছু কর্তব্য আছে, নাকি নেই ?" তনু স্নান করে ভিজে শাড়ি জড়িয়ে ঘরে এসেছে। মাথা দিয়ে গলিয়ে এবার শুকনো শাযাটা পরবে, যাতে একটা দাগও নেই। তারপর শায়াটাকে বগলের আর নীচে না নামিয়ে দড়ি বাঁধবে এবং ভিজে শাড়িটা প্রতিদিনের মতো ঝরে পড়বে পায়ের কাছে। হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা শায়ার তলায় সরু দুটো পা দেখলে বিশ্বনাথের হাসি পায় কিন্তু সে কখনও হাসে না।

"শম্পা মেলে দিয়ায়।" তনু চেঁচিয়ে কথাটা বলে বিশ্বনাথের দিকে ফিরে বলল, "দাঁড়িযে থেকো না।"

বিশ্বনাথ আর দাঁড়াল না। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই গন্ধটা তার নাকে ধাক্কা দিল। বাবান্দার শেষ প্রান্তে বুড়ো মাথা ঝুঁকিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। তার পিছনেই পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে ফুচা। চেইনটা গলায় বাঁধা।

ওটা যে ফুচার মৃতদেহ এটা বুঝতে বিশ্বনাথকে অর্ধসমাপ্ত একটি মাত্র বাক্য খরচ করতে হল।

"একটা বিশ্রি পচা গন্ধ আজ দুদিন ধরে আমরা—"

বুড়ো মুখ ফিরিয়ে বিশ্বনাথের দিকে শান্ত চোখে তাকাল এবং কয়েক সেকেন্ড পর আঙুল দিয়ে ফুচাকে দেখাল, "মরে গেছে।"

হতভম্ব বিশ্বনাথ ধাতস্থ হবার পর বলল, "এটা কী রকম ব্যাপার হল ? মরে গেছে তো ফেলে দেননি কেন ?"

"থাক্ না, যতদিন খুশি ও থাক্ না।" বুড়ো আবার খবরের কাগজে মাথা ঝোঁকাল।

বিশ্বনাথ স্তম্ভিত। একটা মরা কুকুর নিয়ে এটা কী ধরনের আদিখ্যেতা ? সে শুনেছে অনেকে ছেলেমেয়ের মতনই কুকুরকে ভালবাসে, মারা গেলে কান্নাকাটি করে, নাওয়াখাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। খবরের কাগজে ছবি দিয়ে শোকও প্রকাশ করে। কিন্তু এটা কী করছে বুড়ো ।

"আপনি এই মরা কুকুটাকে রেখে দেবেন ?" বিশ্বনাথ অবিশ্বাসভরে বলল।

"হ্যাঁ। কেন, তাতে আপনার আপত্তি আছে ?"

"অবশ্যই আছে। আপনি কি এখনও গন্ধটা পাচ্ছেন না ?"

"না তো।"বুড়ো মাথা ঘুরিয়ে ফুচার লাশটার দিকে তাকাল। "না পাচ্ছি না।" শক্ত গলায় আবার বলল।

"আমরা নীচের থেকে পাচ্ছি আর আপনি—" বিশ্বনাথ ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল।

"আমি কী করতে পারি ?"

"কর্পোরেশনের ধাঙড় ডেকে, কিছু টাকা দিয়ে এটাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।"

"না।" বুড়ো খবরের কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরল। বসার ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল আর সে কোনও কথা শুনতে চায় না।

বিশ্বনাথ প্রায় ছুটেই ফিরে এল। তনু তখন ভাত খেতে শুরু করেছে।

"ওপরে কুকুরটা মরেছে, তারই পচা গন্ধ। ওটাকে ওইভাবেই রেখে দেবে বলল।"

"য়্যা !" থালার উপর তনুর হাতটা স্থির হয়ে গেল। "মরাটাকে রেখে দেবে ? কী বলছ তুমি !"

"তাই তো বলল।"

ব্যস্ত হয়ে খাওয়া ফেলে উঠে, কোনক্রমে হাতটা ধুয়েই তনু সিঁড়ির দিকে ছুটল। বিশ্বনাথ ওকে অনুসরণ করে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আপনি নাকি এই মরা কুকুরটাকে রেখে দেবেন ?"

বুড়োর উত্তর বিশ্বনাথ শুনতে পেল না।

"আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে ? জানেন এর থেকে কত রকমের রোগ ছড়াতে পারে, মহামারিও হতে পারে। ঘরে বাচ্চা রয়েছে।"

বিশ্বনাথ দুধাপ উঠেও বুড়োর কথাগুলো বুঝতে পারল না। কেন জানি তার মনে হল, বুড়ো তার জেদ থেকে একইঞ্চিও সরবে না।

"এই পচা গন্ধ নাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে আর তর্ক করতে পারব না, বসে বসে প্রাণভরে আপনি শুঁকে যান কিন্তু দয়া করে এটাকে বিদেয় করুন। এটা সভ্য সমাজ, পাঁচজনের কথা ভেবে চলতে হয়। আপনি যদি আজকেই এটাকে—"

"গেট আউট, গেট আউট, গেট আউট।"

বুড়োর তীক্ষ্ণ চিৎকারের সঙ্গেই চেয়ার সরাবার শব্দ বিশ্বনাথ শুনতে পেল। তারপরই ভীতমুখে তনুকে নেমে আসতে দেখল।

"তেড়ে এল আমার দিকে। মনে হচ্ছে পাগল হয়ে গেছে।··· চোখ দুটো যেন কী রকম—" তনু থেমে গেল।

বিশ্বনাথ অস্ফুটে বলল, "জ্বলজ্বল করছিল।"

"জানলে কী করে ! তুমি তো নীচে ছিলে !"

তনুর ভাত খাওয়া আর হল না। নটা আঠাশের কৃষ্ণনগরটা এখনও ধরার সময় আছে। বেরোবার সময় সে বলে গেল, "একবার ও-বাড়িতে গিয়ে বরং রবিবাবুকে বলো যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কুকুরটা ফেলার ব্যবস্থা করতে পারে। আর এখুনি ফিনাইল এনে চারিদিকে ছড়িয়ে দাও ··· শম্পা মনে করে রসটা খাওয়াস।"

ফিনাইল কিনে ফেরার সময় বিশ্বনাথ ও-বাড়িতে ঢুকল। খবর পেয়ে নেমে এল রবি।

"কুকুরটা মরে গেছে··· আজ চারদিন।"

"বলেই ছিলাম টাইম হয়ে এসেছে।" রবির মুখ তৃপ্তিতে ভরে উঠল।

"আপনার জ্যাঠামশায়ের মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। উনি ওই মরা কুকুরটাকে রেখে দিয়েছেন।"

"বলেন কী !" রবি খাড়া হয়ে বসল। "মরা কুকুরটাকে ?"

"হ্যাঁ। এখন কী করি বলুন তো। আমি বললুম, আমার স্ত্রীও বলল, উনি তো তেড়ে প্রায় মারতেই এলেন। অথচ এই সেদিন জঞ্জাল সাফ করে দেবার কথা বলতেই উনি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সাফ

করিয়ে দিলেন।... আপনি কি একবার ওনাকে বলবেন ?"

"আমি কি বলব ?"

"যাতে কুকুরটার ব্যবস্থা করেন।"

"ও বাড়িতে আমরা কেউ যাই না। আপনি বরং কর্পোরেশনে কি পুলিশে খবর দিন। ওপরে আমি কাজ ফেলে এসেছি, কিছু মনে করবেন না।" রবি চেয়ার থেকে উঠল।

"মরা কুকুর পড়ে থাকলে আশপাশের বাড়িতে রোগভোগ তো হতে পারে !" বিশ্বনাথ শেষ চেষ্টা করল রবিকে সক্রিয় করে তুলতে।

"তাতো পারেই। আচ্ছা— ।"

বিশ্বনাথ দরজা, জানলার বাইরে ফিনাইল ছড়িয়ে তনুর মতো না খেয়েই অফিসে গেল। যাবার আগে শম্পাকে হুঁশিয়ার করল, বাবান যেন ঘরের বাইরে না যায়। অফিস থেকে আজ সে তাড়াতাড়ি ফিরল এবং তনুও ফিরল প্রাইভেট কোচিং না করেই। বিশ্বনাথ আব একবার ফিনাইল ছড়িয়ে এসে ঘরের জানলা বন্ধ করে দিল।

"এভাবে কতদিন চলা যাবে ? তনুর প্রশ্নে বিশ্বনাথ অসহায়ভাবে শুধু তাকিয়ে বইল।

"কাল সকালেই থানায় যাও। পুলিস দেখলে হয়তো বুড়ো ভয় পাবে।"

"কিন্তু পুলিস যে আসবেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ব্যাপারটা একদমই অবাস্তব। ওরা বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কেনই বা করবে, আমি নিজেকেই তো বিশ্বাস করাতে পারছি না।"

"তবু তুমি সকালে একবার থানায় যাও। লোক পাঠিয়ে অন্তত একবার ওরা দেখে যাক ব্যাপারটা সত্যি কি না। পুলিস ছাড়া তাড়াতাড়ি কিছু করার আর তো উপায় নেই !"

"পুলিস তো আর হাতে করে কুকুরটাকে ফেলতে আসবে না, কর্পোরেশনের ডোমকে দিয়ে ফেলাবে। গড়িমসি করবে, সময় নেবে। আমি তো কেষ্টবিষ্টু নই। তবে আমার মনে হয় সোজা যদি কাউন্সিলারের কাছে যাই তাহলে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা হতে পারে।"

"সেই ভাল।"

ওরা টিভি দেখল না। বিশ্বনাথ লিখতে বসল না। রাতে খেতে বসে তনু বমি করতে ছুটে গেল কলঘরে। বিশ্বনাথ বিষন্নমুখে চেয়ারে বসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এই রকম পাগলের বাড়িতে বাস করা যায় না, অন্য কোথাও ঘর দেখতে হবে। জায়গাটা কিন্তু আমার খুব পছন্দের ছিল।"

বালিশে মুখ চেপে তনু উপুড় হয়ে শুয়ে। মুখ ফিরিয়ে শুকনো গলায় বলল, "বাবানকে নিয়ে কালই আমি শ্যামপুকুরে চলে যাব।"

গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে আলো নিবিয়ে বিশ্বনাথ শুয়ে পড়ল। ভোর রাত্রের দিকে হঠাৎই তার ঘুম ভেঙে গেল। জানলার বাইরে কিসের যেন একটা শব্দ ! কিছু একটা দিয়ে মাটিতে আঘাত করার মতো ধস্ ধস্ ধস্ হয়ে চলেছে।

প্রথমেই তার মনে হল চোর ! ভয়ে সে কিছুক্ষণ সিঁটিয়ে রইল। মিনিট কয়েক পর, শব্দটা থেমে গেল। বিশ্বনাথ ভাবল, একবার উঠে জানলাটা খুলে দেখবে কি না। বিছানায় উঠে বসতেই শব্দটা আবার শুরু হল আর সেই সঙ্গে জোরে জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ। কোনও মানুষই হবে তবে চোর নয়।

অন্ধকারে পা টিপে জানলায় এসে সন্তর্পণে একটা পাল্লা সে ইঞ্চি চারেক ফাঁক করল। দূর থেকে রাস্তার আলোয় অন্ধকারটা ঈষৎ ফিকে। বিশ্বনাথ চোখ সইয়ে নিতে কিছুটা সময় নিল। জানলার পাশেই গেঞ্জি ঢাকা একটা পিঠ। কেউ উবু হয়ে বসে। হাতে শাবলের মতো একটা কিছু তাই দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে।

এত রাতে, এখানে, এমন কাজে ব্যস্ত হল কে ? তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিশ্বনাথ প্রায় বলে

ফেলছিল, "কী কচ্ছেন আপনি ?" তার বদলে সে বিস্ফারিত চোখে বুড়োর দিকে শুধু তাকিয়ে রইল।

হাঁটু গেড়ে বুড়ো এবার দু হাত দিতে গর্ত থেকে মাটি তুলছে। কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়া দেহ দেখে বিশ্বনাথের মনে হল, গর্তটা হাত খানেক গভীর। মাটি তোলার সঙ্গে রয়েছে হাঁফ ধরার শব্দ। কিছুক্ষণ ধরে গর্ত খোঁড়া ও মাটি তোলা চলল। বুড়ো তারপর শাবলটা মাটিতে রেখে ব্যস্তভাবে জানলার সামনে থেকে চলে গেল। বিশ্বনাথ ভাবল, বাইরে বেরিয়ে কি দেখে আসবে, বুড়ো এতরাতে গর্ত খুঁড়ছে কেন ?

ইতঃস্তত করে অবশেষে অন্ধকার ঘর থেকে সে দালানে বেরিয়ে আলো জ্বেলে শম্পাকে দেখে নিয়েই নিবিয়ে দিল। বাইরের দরজার খিল নিঃশব্দে নামিয়ে পাল্লাটা খুলতে যাবে তখনই নাকে লাগল একটা মাংসপচা গন্ধের এগিয়ে আসা। বিশ্বনাথ অপেক্ষা করল দরজার ফাঁকে চোখ রেখে। একটা পুঁটলি বুকের কাছে দুহাতে ধরে বুড়ো তার সামনে দিয়ে চলে গেল' পুঁটলিটা থেকে ঝুলছে একটা লোহার শিকল যেটাকে সে চেনে। বিশ্বনাথ পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে এসে খাটে শুয়ে পড়ল। জানলার বাইরে মাটি থাবড়ানোর শব্দ হচ্ছে এবং সেটাও একসময় থেমে গেল। তার আর ঘুম এল না।

সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। জানলার ফাঁক করা পাল্লা দুটোর মাঝে ধূসর রেখাটি একটু উজ্জ্বল হতেই বিশ্বনাথ বাইরে বেরিয়ে এল। বাড়িটা ঘুরে ঘরের জানলার কাছে এসে দেখল হাত দুয়েক লম্বা জায়গায় মাটির রঙ গাঢ়। ওখানে গর্ত খুঁড়ে আবার তা বুঁজিয়ে ফেলা হয়েছে। আলগা মাটির উপর পায়ের ছাপ। পা দিয়ে চেপে মাটি বসানো হয়েছে। জায়গাটা কচ্ছপের পিঠের মতো ঈষৎ উঁচু তবে চোখে পড়ার মতো নয়। বৃষ্টি আর রোদ একসময় এটাকে সমান করে দেবে।

বিশ্বনাথ একদৃষ্টে ফুচার কবরের দিকে তাকিয়ে। একটা স্বস্তি, ভোরের বাতাসের মতো তার চেতনার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। বুড়ো কেন যে এমন একটা কাণ্ড করল সেটা কোনদিনই জানা যাবে না। চিরকাল এটা রহস্য থেকে যাবে। ফুচা আর বুড়োর সম্পর্কটা এই মাটির নীচেই বরং রয়ে যাক। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে চমকে উঠল। ওটা কী ? কবরের মাটির মধ্য থেকে ওটা কী বেরিয়ে ? সে ঝুঁকে পড়ল।

ফুচার চেইনের একটা প্রান্ত সে দেখতে পেল। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় বুড়ো বোধহয় দেখতে পায়নি চেইনটা পুরোপুরি মাটির নীচে চাপা পড়েনি। আঙুলে করে তুলে নিয়ে চেইনটায় অল্প টান দিতেই বিশ্বনাথের মনে হল এটা এখনও ফুচার গলায় বাঁধা রয়েছে। অদ্ভুত একটা আতঙ্ক তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করল। চেইনটা হাত থেকে ফেলে দিতে গিয়ে তার মনে হল এটা তার আঙুলের সঙ্গে আটকে গেছে, হাজার চেষ্টা করলেও সে আঙুল থেকে ছাড়াতে পারবে না। সারাজীবন ফুচা তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে, কিন্তু কোথায় ?

বাবানের জন্য, তনুর জন্য তার চোখ জলে ভরে উঠল। চেইনটা নরম মাটির মধ্যে চেপে বসিয়ে সে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল। ওরা যেন কখনও জানতে না পারে এখানে ফুচা রয়েছে।

ঘরে ফিরে আসার সময় বিশ্বনাথ মুখ তুলল। বারান্দায় বুড়ো চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগে সামনের দেওয়ালটা দেখছে।

দেশ শারদীয় ১৪০০

চূড়ামণি উপাখ্যান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা আসে, শেষ রাত্তিরের দিকে। কোথা থেকে আসে আবার কোথায় চলে যায়, কেউ জানে না !

ঘোড়াগুলো ছোট হলেও দারুণ তেজী, চৈত্র মাসের ঝড়ের মতন হঠাৎ শোনা যায় তাদের আগমন-শব্দ। কিছুই সামাল দেবার সময় পাওয়া যায় না, আবার উধাও হয়ে যায় চোখের নিমেষে।

সংখ্যায় তারা জনা ছয়েকের বেশি নয়, যদিও বাড়ি ঘেরাও করার পর তারা এমনভাবে ছোটাছুটি করে যেন সবদিকেই কেউ না কেউ আছে, এক একজনকেই মনে হয় অনেকজন। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘোড়াগুলো গুনেছে।

এমন নয় যে তারা অমাবস্যার রাতে মিশমিশে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। গত কোজাগরী পূর্ণিমায় ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যে তারা এসেছিল। সেদিন পীতাম্বর গড়াই-এর বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো। সারাদিন তুমুল ধুমধাম, সন্ধেবেলা কীর্তন গানের আসর বসেছিল, রাত্তিরে আত্মীয় কুটুমরা পাত পেড়ে খেয়েছে, সবাই বাড়ি ফেরেনি, থেকেও গেছে কয়েকজন। সব কাজকর্ম মিটিয়ে হ্যাজাক নেবাতে নেবাতে রাত প্রায় একটা। ওরা এল তার প্রায় দু'ঘণ্টা পরে।

শেষ রাতের ঘুম বড্ড গাঢ় ঘুম। চোখ মেললেও সহজে চৈতন্য আসে না। কী হয়েছে বুঝতে না বুঝতেই সব শেষ। উঠোনে খাটিয়া পেতে শুয়েছিল মোংলা, সে নাকি প্রথম থেকে সব দেখেছে। এবারে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব এসে গেছে আগে আগেই, একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়েছিল মোংলা, কপা কপ্ কপা কপ্ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে তার ঘুম ভাঙলেও সে ভেবেছিল বুঝি ঘুটিয়ারি শরীফে ঘোড়দৌড়ের স্বপ্ন দেখছে। তারপর সেই আওয়াজ একেবারে তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়তেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল। কিন্তু খাটিয়া থেকে নামবারও সময় পেল না, একটা বিকট কালো মূর্তি দাঁড়াল তার বুকের ওপর এক পা চাপিয়ে। সেই পা জগদ্দল পাথরের মতন ভারী, তার ওপর মোংলার নাকের ডগার কাছে তরোয়াল।

মোংলার বর্ণনা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ তার কপালে রয়েছে তরোয়ালের খোঁচার ঘা. ডাকাতরা যাবার সময় তার এক চোখের ওপর চাবুক মেরে গিয়েছিল, তারপর থেকে সে আর বাঁ চোখটা খুলতে পারে না। তবু সেই অবস্থার মধ্যেই মোংলা অনেক কিছু দেখে ছিল। পীতাম্বর গড়াইয়ের বাড়ি মেটে বাড়ি হলেও দু'মহলা। ডাকাতরা সে বাড়ির অন্ধিসন্ধি সব আগে থেকেই জানে। তারা অন্য কোনও ঘরে খোঁজাখুঁজি করেনি, তাদের মধ্যে দু'জন সোজা পীতাম্বরের চুলের মুঠি ধরে খাট থেকে নামিয়ে তাকে শেষ করেছে এক কোপে, তারপর ঝটকায় বিছানা থেকে তোশকটা তুলে নিয়েছে। তারা জানত, পীতাম্বরের সব টাকা ঐ তোশকের মধ্যে সেলাই করা।

পীতাম্বরের ঘরে যখন এইসব কাণ্ড চলছিল, তার মধ্যেই মোংলা শুনতে পাচ্ছিল জল ছেটানোর শব্দ। কেউ যেন সারা বাড়িতে গোবর ছড়া দিচ্ছে। আসলে জলও নয়, গোবর ছড়াও নয়, ডাকাতদের একজন কেরোসিন ছিটিয়ে দিচ্ছিল। চটপট কাজ হাসিল হতেই আগুন লাগিয়ে দিল, গোটা বাড়ি জ্বলে উঠল একসঙ্গে।

এই রকমই করে ওরা, যাবার সময় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যায়,তাই কেউ আর ওদের পিছু ধাওয়া করতে পারে না। সবাই তখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত।

কেমন চেহারা ঐ ডাকাতদের ? মোংলার বর্ণনায় তাদের সকলেরই কুচকুচে কালো পোশাক, মুখও কালো কাপড়ে ঢাকা, তাই তাদের সকলকে একরকম দেখায়। তাদের বয়েস বোঝা যায় না।

মোংলার মতে তারা 'শয়তানের জীব'। অনেকে এটা বিশ্বাস করে। কারণ, খলসেখালির রতুবাবু এ ডাকাতদের দিকে বন্দুক চালিয়েছিলেন বলে শোনা যায়, রতুবাবুর বন্দুকের জোর আছে, তিনি একবার একটা বাঘ মেরেছিলেন, ধান লুটের সময় দুটি মানুষও মেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর গুলিতে ঐ ডাকাতদের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি, তাদের ঘোড়াগুলোও জখম হয়নি। এক পক্ষকাল পরে তারা ফিরে এসে রতুবাবুর বাড়ি জ্বালিয়ে তাঁর গলা কেটে দিয়ে গেছে।

ওরা যে শুধু ধনবান লোকদের বাড়িতেই টাকা লুট করতে আসে তাও নয়। হারুণ শেখ মানুষটা তেজী, কিন্তু তার ধন সম্পদ তো বিশেষ ছিল না। সেই হারুণ শেখের বাড়িতেও এক রাতে ডাকাত পড়ল। ঘোড় সওয়াররা হারুণ শেখকে শুধু খুন করেনি, তার হৃৎপিণ্ডটাই নাকি উপড়ে নিয়ে গেছে। এমন হৃৎপিণ্ড ওপড়াবার ঘটনা আরও শোনা যায়। আবার কোনও কোনও বাড়িতে আসে ওরা যুবতী মেয়ে লুঠ করার জন্য। জীবন নায়েকের বাড়িতে পাঁচ ভরি সোনা ছিল। সে খবর ডাকাতরা পায়নি, সে বাড়ি থেকে জীবন নায়েকের সোমখ সুন্দরী বউটাকে শুধু তুলে নিয়েছে, অবশ্য সে বাড়িতেও আগুন জ্বালিয়ে যেতে ভুল করেনি।

অশ্বারোহী ডাকাতদের তাণ্ডবে গোটা তল্লাটটার মানুষজনের রোম খাড়া হয়ে আছে। হাট-বাজারে, গঞ্জে এই ডাকাতদের কথা ছাড়া আর কোনও কথা নেই। গল্পও উড়ছে নানারকম। তবে আসল ঘটনাই এমন নৃশংস যে তার ওপর বেশি রং চড়াবার মতন কল্পনাশক্তি এদিককার মানুষদের নেই। রাত্তিরবেলা দূরে কোনও গ্রামে আগুন জ্বলে উঠলেই বোঝা যায়, এইমাত্র ডাকাতরা টগবগিয়ে চলে গেল। কোথায় যায় ওরা ? এই প্রশ্নের কোনও হদিশ নেই বলেই অলৌকিক কথা মনে আসে। 'শয়তানের জীব', ওরা ঘোড়া সুদ্ধু ডুব দেয় গাঙের জলে।

এই নদী-নালার দেশেও ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতি, ঘোড়া কোথায় এদেশে ? বড় বড় নৌকোয় যারা বিদেশ থেকে ব্যবসা করতে আসে তারা এই প্রশ্ন করে।

দিনেরবেলা ফনফন করে ওড়ে নোনা বাতাস, পাতলা রোদ্দুরে দুলে দুলে উড়ে যায় বগেরি পাখির ঝাঁক, মাছ ধরা ডিঙ্গিগুলো রুপোলি জলে ছায়ার মতন ভাসে। রাত্তিরের ঐ বিভীষিকা তখন মনে হয় অলীক।

হ্যাঁ, এই জল-কাদার দেশেও ঘোড়া আছে। এখানে জঙ্গলে আছে বাঘ, জলে আছে কামোঠ-কুমির। কিন্তু ঘোড়া এমনই তেজী প্রাণী সে সাঁতরে নদী পার হয়ে যায় কুমির কামোঠ তাকে ছুঁতে পারে না। জঙ্গলের বাঘ নাগাল পাবার আগেই ঘোড়া জঙ্গলের পথ কাবার করে দেয়। তাই বর্ধিষ্ণু লোকেরা কেউ কেউ ঘোড়া রাখে। বনমালি ডাক্তার ঘোড়ায় চেপে রুগী দেখতে যান। তা-ছাড়া ঘুটিয়ারি শরীফে ঘোড়দৌড় হয়। স্কুল ডাঙ্গার মাঠে সত্যিকারের ঘোড়দৌড়, প্রতি হাটবারে, দশ-টাকা বিশ-টাকার বাজি থাকে প্রতি দৌড়ে। সাত আটটা ঘোড়া দৌড়োয়, বেশ কিছু টাকার লেনদেন হয়।

প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, ঐ ঘোড়দৌড়ের ছেলেগুলিই বুঝি ডাকাতি শুরু করেছে। কিন্তু এই ছোঁড়াগুলো যে বড়ই বাচ্চা। এদিককার ঘোড়াও বেশ ছোট, প্রায় গাধার সঙ্গে উনিশ বিশ, বয়স্ক মানুষদেরও বহন করতে পারে বটে কিন্তু তাহলেও ছোটার গতি থাকে না। তাই ঘোড়দৌড়ের সওয়াররা সবাই পাতলা চেহারার কিশোর। যে ছোঁড়াটা প্রায় প্রতিবারই ফার্স্ট হয়, সেই কামরুল তো অন্যান্য দিন কাজ করে বাজারের মুদিখানায়। রোগা ডিগডিগে শরীর, মুণ্ডুটা বড়, মনে হয় এক চড় মারলে ঘুরে পড়ে যাবে। কিন্তু ঐ কামরুলই যখন ঘোড়া ছোটায়, কী তার তেজ, মাথার চুলগুলো সব খাড়া হয়ে যায়, বাতাসের বেগকেও যেন সে জয় করে নিতে পারে, ছপটি মারতে মারতে এক এক সময় সে যেন দাঁড়িয়ে পড়ে ঘোড়ার পিঠে। কামরুলের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম বলরাম, কালু মিস্তিরির ছেলে, তার সারা গায়ে পাঁচড়া হলে কী হয়, গলার জোরেই সে তার ঘোড়াকে ক্ষেপিয়ে ছোটায়।

এই কামরুল, বলরাম, আনিসুল এরা কী ডাকাত হতে পারে ?

অনেকে বলাবলি করতে লাগল, আজকাল গুঁড়ো-গাঁড়াদেরও বিশ্বাস নেই। দিনকাল পাল্টে গেছে। এখন মায়ের পেট থেকে পড়তে না পড়তেই এরা বুলি শেখে। দশ এগারো বছর বয়েস হতে না হতেই টাকা পয়সা চিনে যায় খুব, মুখে শোভা পায় জলন্ত বিড়ি। বগলে চুল গজাবার আগেই এরা মেয়েলোকদের দিকে নজর দিতে শুরু করে। চৌদ্দ বছর বয়েসেই এক একজন লায়েক।

এদের চেহারা ডাকাতসুলভ না হলেও এদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সন্দেহের কারণ এদের অশ্বশক্তি। এমন জোরে ঘোড়া ছোটাতে তো আর কেউ পারে না এ তল্লাটে। স্কুল মাস্টার মধু নস্কর জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে থানা পুলিশের কাছে আর্জি জানালেন এই ছোঁড়াগুলোর বিরুদ্ধে। ঘুটিয়ারি শরীফের ঘোড়দৌড়ে প্রতি হাটবারে অনেক চাষী তাদের রক্তজল করা পরিশ্রমের টাকা জলাঞ্জলি দেয়। লাভের টাকা যায় ঘোড়ার মালিকদের ঘরে। যে ছোঁড়াগুলো ঘোড়া ছোটায় তারা পায় মাত্র দশ টাকা করে, তবু ঐ ছোঁড়াগুলোর ওপরেই মধু নস্করের রাগ বেশি।

এক হাটবারে পুলিশ এসে ঘোড়দৌড় মাঝপথে থামিয়ে কামরুল, বলরাম, কাদের, এককড়ি, আনিসুল সবাইকে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে গেল। যারা ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলতে এসেছে, তারা অসন্তুষ্ট হল খুব, ডাকাতির কথা তাদের তখন মনে নেই।

যেন মধু নস্কর আর তার জনসাধারণকে উপহাস করার জন্য সেই রাত্রেই ডাকাত পড়ল মধু নস্করের কাকা যাদব নস্করের বাড়িতে। গভীর রাতে সেই রকমই ঘোড়া ছুটিয়ে এল ছ'জন ডাকাত, যাদব নস্করের ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে, দু'জনকে খুন করে একবারে সর্বনাশ করে দিয়ে গেল। যাদব নস্করের সদ্য বিধবা শাপ-শাপান্ত করতে লাগল মধু নস্করকে।

এই অঞ্চলে থানা পুলিশের ওপর মানুষেব ভরসা নেই। খুন-জখম, ডাকাতি লেগেই আছে। পুলিশকে খবর দিলেও গা করে না। যদি বা কখনও পুলিশ আসে, এসে আস্তানা গাড়ে গ্রামের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়িতে, পেট ভরে খাওয়া দাওয়ার পর দারোগা সাহেব হাই তুলতে থাকেন। লোকজনের অভিযোগ শুনতে শুনতে তাঁর চোখ টেনে আসে ঘুমে।

কেউ কেউ বলে, ঐ পুলিশও যা ডাকাতও তা। রূপকথার গল্পে যেমন থাকে, দিনের বেলা যে পাটরানী, রাত্তিরবেলা সে-ই রাক্ষসী। সেই রকম দিনের বেলায় যারা পুলিশ, রাত্তিরে তারাই ডাকাত। যে রক্ষক সেই ভক্ষক বলে কথা আছে না ?

তেতুঁলছড়ি গ্রামে এখনও ডাকাত পড়েনি। আশ-পাশের কোনও গ্রামই প্রায় বাদ যায়নি, সবাই ভাবে এবারে তেঁতুলছড়ির পালা। কবে আসবে, কবে আসবে এই ত্রাস। এই গ্রামের মানুষ রাতের পর রাত জেগে কাটায়, যদিও জানে, রাত জেগে পাহারা দিয়েও লাভ নেই, ঐ ডাকাতদের রোখার সাধ্য নেই তাদের। এক বাড়িতে ডাকাত পড়লে অন্য বাড়ির কেউ ছুটে আসবে না, সাধ করে কে নিজের প্রাণটা খোয়াতে চাইবে।

তেঁতুলছড়িতে অবশ্য সে-রকম ধনবান কেউ নেই, প্রায় সবই চাষাভুষো আর কয়েক ঘর জেলে-তাঁতী। রতনমণি ঘোষের বাবা গোয়ালা ছিল, এখন ওরা নিজেদের কায়স্থ বলে পরিচয় দেয়, ওদের জমি-জমা কিছু বেশি, আবার ও বাড়িতে পোষ্যও অনেক। কিছু জমা ধান-চাল থাকলেও টাকা-পয়সা সোনা-দানা বিশেষ নেই, ছ'জন ডাকাতের এক রাত্তিরের খরচা পোষাবে না।

কিন্তু টাকা পয়সা পাবার আশা না থাকলেও তো ওরা আসে। এমনি এমনি এসে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, মানুষ খুন করে। তাতে সন্দেহ হয়, ওরা বুঝি আসল ডাকাত নয়। ভাড়ায় ডাকাতি খাটে। এই কারুর ওপর কারুর রাগ আছে, অমনি কিছু টাকা খরচ করে লেলিয়ে দেওয়া হল ডাকাত। হারুণ শেখের বেলাতেই পাকা হয় সন্দেহটা। টাকার জোর ছিল না তার মোটেই কিন্তু হিম্মতের জোর ছিল, কারুকে সে ছেড়ে কথা কইত না, রামলাল ব্যাপারীকেও সে মুখের ওপর তুড়ে দিয়েছিল। ডাকাতরা

এসে তাকে কচুকাটা করে গেল নিশ্চয়ই অন্য কারুর প্ররোচনায়।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে অবশ্য সেরকম তেজী মানুষও কেউ নেই। তা বলে কী আর পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া হয় না কিংবা ভাই ভাইকে মারতে দা উঁচিয়ে তেড়ে যায় না ! কিন্তু ঐ বাপ-মা তুলে গালমন্দ কিংবা তেড়ে যাওয়া পর্যন্তই, তার চেয়ে বড় কোনও ঘটনা অনেকদিন এখানে ঘটেনি।

তবু ভয় যায় না। নিজের অজ্ঞাতেই কে, ভিন্ গাঁয়ের কার চক্ষুশূল হয়ে বসে আছে, তার ঠিক কী? তাছাড়া দু'পাঁচটি স্বাস্থ্যবতী কন্যা বা বউ রয়েছেই এ গ্রামে। সেও তো কম বিপদের কথা নয়। বাড়িতে অমন রমণী থাকা আর হরিণ পুষে রাখা তো একই কথা।

সন্ধে হলেই ভয়ে গা ছমছম করে। গরম ভাতের গ্রাস মুখে তুলতেও সুখ আসে না। কারুর সঙ্গে কারুর কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। ছোট কোনও বাচ্চা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলে বড়রা রেগে যায়, তারা বাচ্চাটাকে থাবড়া মারে।

ইদানীং আর এদিকে বাঘের উপদ্রব নেই। বুড়ো বুড়িদের মুখে শোনা বাঘের গল্প পান্‌সে লাগে। বাঘ তো ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যেত না।

কেউ কেউ ভাবে ডাকাতরা একবার এসে পড়লে বাঁচি। রোজ রোজ এই ঘাড় শক্ত করে থাকা সহ্য হয় না। ডাকাতরা এলে একখানা-দু'খানা বাড়ি পোড়াবে। দু'চারজনকে মারবে বড় জোর, তারপর তো অন্য সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে।

মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া একেবারে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মেয়েরা তা শোনে না। কাজে-কর্মে মাঠে যেতে হয়, দোকানে যেতে হয়। সন্ধের পর একবার নদীর ধারে না গেলে তো চলবেই না।

নদীর ওপরে একটা বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকো পার হয়ে ওপারের গ্রামে গেলে পাওয়া যায় মিষ্টি জলের পুকুর। ঐ পুকুরের জল ছাড়া ডাল রাঁধা যায় না ! ঐ গ্রামে আছে বড় মুদির দোকান, সেখানে পাওয়া যায় সর্ষের তেল। সেই গ্রাম পেরিয়ে তার পরের গ্রামে শুক্কুরবারের হাট।

সন্ধের পর নদীর ধারে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সার বেঁধে বসে। তখন পুরুষ মানুষদের এদিকে আসা নিষেধ।

তবু একদিন প্রথম প্রহরের জ্যোৎস্নায় ঐ সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়েছিল মল্ল পাইকারের ছেলে শ্রীধর। কেষ্ট ঠাকুরের মতন সে বাঁশী বাজায়। সেই শ্রীধর তেঁতুলছড়ি গ্রামের বাতাসীকে একলা পেয়ে কুপ্রস্তাব দিল। বাতাসী তো আর শ্রীরাধিকার মতন আলুথালু নয়, ঢলানীও নয়, বড তেজী মেয়ে সে, জঙ্গল থেকে সে মস্ত বড় কাঠের বোঝা মাথায় করে আনে, একবার সে জ্বলন্ত চ্যালা কাঠ দিয়ে একটা গোখরো সাপ পিটিয়ে মেরেছে। বংশীবাদক শ্রীধর যখন বাতাসীর হাত চেপে ধরতে গেল, তখন বাতাসী তাকে ঠেলে ফেলে দিল জলে। তারপর তার কী হি হি হি হাসি ! সেই হাসি যেন মাছরাঙা পাখির ডাক !

এই ঘটনায় তেঁতুলছড়ি গ্রামে আরও জাঁকিয়ে বসল ভয়। বাতাসী এ কাজটা বড় মন্দ করেছে। এখন শ্রীধর রাগের চোটে যদি ডাকাত লেলিয়ে দেয় ?

এতদিনে সবার খেয়াল হল যে কাঠকুড়ুনী বাতাসীর শরীরে একটা জেল্লা আছে। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে সে, তার নিজের সাধ আহ্লাদ না থাকতে পারে ! কিন্তু তাকে দেখে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সাধ আহ্লাদ তো জাগতেই পারে ! যারা বাতাসীর দিকে আগে ভাল করে তাকিয়ে দেখেনি, এখন দেখতে শুরু করল।

কেউ কেউ অবশ্য বলল, না, না, শ্রীধর অমন মানুষই নয়। সে একটু তরলমতি হতে পারে, কিন্তু চোর-ডাকাতদের সঙ্গে তার কোনও সংস্রব নেই। তবু ভয়ের কাঁটা খচখচ করে। শ্রীধর না বলুক অন্য

কেউ তো রটিয়ে দিতে পারে যে তেঁতুলছড়ি গ্রামে আছে বাতাসীর মতন এক আগুনের ঢেলা। আগুনের টানেই তো আগুন আসে।

তেঁতুলছড়ি গ্রামের প্রবীণরা শলাপরামর্শ করতে বসে অশত্থতলায়। কারুর কারুর হাতে হুঁকো, কয়েকজনের হাতে বিড়ি। অনেক তামাক পড়ে যায়, কোনও বুদ্ধি আসে না। কেউ কেউ বসে, বাতাসীকে এ গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলে কেমন হয় ? কাঠ কুড়োনোই যার জীবিকা, সে তো যে-কোনও গ্রামেই থাকতে পাবে ; সাঁকোর ওপারে শ্রীধরদের গ্রামেই গিয়ে থাকুক। তারপর বাতাসীকে শ্রীধর খাবে না ডাকাতরা খাবে, সে তারা বুঝবে, তেঁতুলছড়ি গ্রামের লোক তো বাঁচবে।

কথাটা অনেকের মনঃপূত হয়, কিন্তু কে যে বাতাসী বা তার মাকে এই কথাটা বলবে, তা ঠিক হয় না। সকলেরই বুকের মধ্যে থাকে একই সঙ্গে গরম আর ঠাণ্ডা। যার মনে হয় যে বাতাসীটাকে তাড়াতে পারলেই শান্তি, সে-ই আবার ভাবে, যতদিন আছে থাক না, তবু তো পাছা-ভারী মেয়েটিকে দু'চোখ ভরে দেখেও খানিকটা আরাম পাওয়া যায়।

বাতাসীর মায়ের নাম তুলসী হলেও লোকে তাকে আড়ালে বলে কাঁদুনি। কারণ তার গলার আওয়াজটা খোনা খোনা। মা আর মেয়ে এই দু'জনের সংসার। দু'জনেই বাল্যবিধবা। গ্রাম-প্রধানদের প্রস্তাবটা ক্রমে বাতাসীর মায়ের কানে আসে।

এক সন্ধেবেলা অশত্থতলায় গিয়ে কাঁদুনি এক দঙ্গল পুরুষ মানুষের সামনে কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, হায় রে, এ গ্রামে কি পুরুষ মানুষ নেই ? মেনিমুখোরা আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায়! আমরা কারুর সাতে পাঁচে নেই, দিন আনি দিন খাই, ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করবে আমাদের ? আজ যদি থাকত চূড়ামণি . . . আজ যদি থাকত চূড়ামণি . . .

চূড়ামণি নামটা শুনেই থেমে যায় সব গুঞ্জন। কেউ আর বিড়ি টানে না, যার হাতে হুঁকো, সে গুড়ুক টানতে ভুলে যায়। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। চূড়ামণি নামটায় যেন একটা জাদু আছে। অশত্থতলায় যারা জমায়েত হয়েছে তারা অনেকেই চূড়ামণিকে চোখে দেখেনি, কিংবা অল্প বয়েসে দেখলেও এখন আর স্মরণে নেই। কিন্তু সকলেই চূড়ামণির কথা শুনেছে। তার নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়।

শুধু এই তেঁতুলছড়ি গ্রাম নয়, আশপাশের পাঁচ দশখানা গ্রামের নয়নমণি ছিল ঐ চূড়ামণি। যেমন ছিল তার হাসিমাখা সুন্দর মুখ, তেমনই ছিল তার লোহার মতন বুকের পাটা। সংসারে আর কেউ ছিল না তার। যে-কোনও লোকের বিপদ আপদের কথা শুনলে সে দৌড়ে গিয়ে বুক পেতে দিত। একবার এ গ্রামের একটি শিশুকে কুমিরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, চূড়ামণি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে সেই শিশুটিকে উদ্ধার করে। কুমিরটাকে ছিঁড়ে দু'ভাগ করে দিয়েছিল সে।

এই কাহিনীর কতটা সত্য আর কতটা কল্পনায় রঙিন তা এখন জানার উপায় নেই। এখন নদীটিকে দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত যে কোনদিন ওখানে কুমির আসা সম্ভব ছিল, তবু লোকে চূড়ামণির ঐ বীরত্বের কথা বিশ্বাস করে। আর, অনেক কথা রটেছে তার নামে। সে নাকি একবার শুধু কয়েকটা ধমক দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দিয়েছিল। এক খুনে ডাকাতের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে চূড়ামণি তার চুল ধরে এমন টান দিয়েছিল যে সেই মুহূর্তে ডাকাতটি ন্যাড়া। সারা জীবনে তার মাথায় আর চুল গজায়নি। নিশ্চয়ই অনেক গুণ ছিল চূড়ামণির, নইলে তার নামেই বা এতসব কথা রটবে কেন ?

যখন পূর্ণ যৌবন বয়েস তখন হঠাৎ-ই একদিন চূড়ামণি এই গ্রাম ছেড়ে চলে যায় চিরতরে। কেন যে সে গেল, কোথায় গেল তা কেউ জানে না। তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে জনশ্রুতি আরও বাড়তে থাকে। যে-কেউ বিপদে পড়লেই কপাল চাপড়ে বলে, আজ যদি চূড়ামণি থাকত, তাহলে, আর দুঃখ ছিল না !

এসব বিশ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। অনেকদিন পর বাতাসীর মা কাঁদুনির মুখে শোনা গেল সেই খেদ বাক্য। অমনি সকলের মনে পড়ে গেল !

এরপর কয়েকদিন ঘোড়সওয়ার ডাকাতদের কথা উঠলেই কেউ কেউ বলে ওঠে, হায় রে, আজ যদি চূড়ামণি থাকত। দুর্দমনীয় ডাকাতদের একমাত্র প্রতিপক্ষ সেই অতীতের চূড়ামণি।

নতুন করে চূড়ামণির কীর্তি-কাহিনীর কথা মুখে মুখে ছড়ায়, অল্প বয়েসীরা রোমাঞ্চিত হয়ে শোনে। সবাই ভাবে, চূড়ামণি থাকলে সব মুশকিল আশান হয়ে যেত। সে নেই, তাই এত দুর্দশা। ডাকাতগুলো এসে কবে যে কার গলা কাটবে তার ঠিক নেই।

এর মধ্যেই একদিন অন্য গ্রামে আর একবার ডাকাতির খবর এল ! অর্থাৎ তারা থেমে নেই। তেঁতুলছড়ি গ্রামে তারা একদিন আসবেই ! পাশের গ্রামে শ্রীধরকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কি তবে ঐ ডাকাতদের সন্ধানেই গেছে ? শীতের রাতে বাতাসী তাকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, সেই অপমানের প্রতিশোধ সে নেবে।

বাতাসীর অবশ্য বিশেষ ভয় ডর নেই। সন্ধে গাঢ় হলে নদীর ধার থেকে অন্য স্ত্রীলোকেরা চলে এলেও সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে সাঁকোর ধারে।

জ্যোৎস্নায় ধু ধু করে ওপারের মাঠ। দূরের তালগাছগুলোকে মনে হয় সারি সারি ঠুঁটো জগন্নাথ। বাতাসে মিশে থাকে ভীতু মানুষদের নিঃশ্বাস। বাতাসী তাকিয়ে থাকে শূন্যের দিকে। সে যেন হঠাৎ কল্পনার চোখে দেখতে পায় চূড়ামণিকে। সেই এক রূপবান যুবক, পরের দুঃখে যার পাথরের মতন বুকখানা কাতর। সে মাঠ ঘাট জঙ্গল পেরিয়ে আসছে, সে বাতাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলবে, আমি তো আছি, তোমার ভয় কী !

যারা অল্প বয়েসে চলে যায়, তাদের বয়েস বাড়ে না।

কিছুদিন ধরে চূড়ামণির কাহিনী খুব চলবার পর ছিরু বৈরাগী একটা নতুন কথা শোনাল। চূড়ামণি ঠাকুর মারা যায়নি গো, নিরুদ্দেশেও যায়নি। কয়েক মাস আগেই ছিরু বৈরাগী তাকে দেখেছে পিয়ালী নদীর বাঁকে কানা ফকিরের আখড়ায়। অবশ্য এখন তাকে চেনাই যায় না, সে এখন বুড়ো, নেশাখোর, আত্মবিস্মৃত। সব সময় কাঁদে। চূড়ামণি ঠাকুর এখনও শুধু নিজের নামটা শুনলে জেগে ওঠে।

ছিরু বৈরাগীর কথা শুনে সকলের মনে আঘাত লাগে, আবার কেউ পুরোপুরি অবিশ্বাসও করতে পারে না। ভিক্ষে করতে করতে ছিরু বৈরাগী দেশ-বিদেশে চলে যায়। সে ক্যানিং, মোল্লাখালি, মুর্শিদাবাদ, যশোর এই সব দূর দেশের গল্প বলে। এককালের চূড়ামণি দাস এখন চূড়ামণি ঠাকুর হয়ে গেছে শুনেও কেউ আপত্তি জানায় না।

পিয়ালী নদী তো বেশি দূরে নয়। সে নদীর যতগুলো বাঁকই থাক, শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে এক বেলাও লাগবে না। গ্রামের কয়েকটি অল্প বয়েসী ছেলে কানা ফকিরের আখড়া খুঁজে বার করবার জন্য বেরিয়ে পড়তে চায়। তাই শুনে বাতাসী বলল, আমিও যাব, আমিও যাব !

কানা ফকিরের যে-চক্ষুটি ভাল সেই চক্ষুটি যেন বেশি জ্বলজ্বলে। মাথা ভর্তি চুলের জঙ্গলে উকুনের বাসা। মাঝে মাঝেই সে ঘ্যাস ঘ্যাস করে মাথা চুলকোয়। খিদে পেলে সে খায় কিন্তু আঁচায় না, অর্ধেক খাবার লেগে থাকে দাড়ি-গোঁফে।

চরস-গাঁজার নেশায় সে সারাদিনই প্রায় বোম্ হয়ে থাকে। যখন একটু মাথা পরিষ্কার হয় তখন সে উরুতে চাপড় মেরে গান ধরে।

যদি সুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কী হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে !

তার বেশিরভাগ গানই তার নিজের রচিত নয়, লালন ফকিরের। এক দঙ্গল চেলা জুটেছে তার, তাদের কে হিন্দু, কে মুসলমান বোঝার কোনও উপায় নেই। সকলের মুখেই ঐ এক গান, চরস-গাঁজার দিকে চেলাদের টান বেশি ছাড়া কম নয়। দিন-রাত তারা নেশার ঘোরে, গানের ঘোরে মহানন্দে আছে।

বাতসী আর তার দলবল সেই কানা ফকিরের আখড়ায় এসে পৌঁছল সন্ধের ঝোঁকে। তারা যে কয়েকজন নতুন মানুষ এসে দাঁড়াল, তাতে কারুরই কোনও হুঁস বোধ নেই। জায়গাটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, তার মধ্যেই চলছে চ্যাচামেচির সঙ্গীত।

একবার গান শেষ হবার পর কানা ফকির যখন আবার ছিলিম সাজতে বসল, চ্যালারা ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে, সেই সময় এক অপেক্ষাকৃত তরুণ সুপুরুষ চ্যালার পায়ে বাতাসী আর তার সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, চূড়ামণি ঠাকুর, আমাদের বাঁচাও !

যেন পায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে এইভাবে আঁতকে উঠে সেই চ্যালাটি বলল, আরে, আরে, এ কী উৎপাত ! আমি কে, তোমরা কে, চূড়ামণি ঠাকুর কে ? কেউই না ! তুমি ওই ! তুমি ওই !

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, তুমি ওই ! তুমি ওই !

বাতাসীরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কানা ফকির তার জ্বলজ্বলে একচক্ষু দিয়ে বাতাসীকে নেক নজরে লক্ষ করে গেয়ে উঠল,

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে উজলে
রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে
ফণী মণি সৌদামিনী
জিনি এ রূপ উছলে...

তুমি কে বাছা ? কার খোঁজে এয়েছ ?

বাতাসী হাত জোড় করে ভক্তিভরে বলল, বাবা, আমরা তেঁতুলছড়ি গ্রামের মানুষ। আমাদের বড় বিপদ। আমরা এসেছি চূড়ামণি ঠাকুরের খোঁজে ! শুনেছি তিনি আপনার ছিরি পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছেন।

তখন মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা প্রায় অচেতন একজন চ্যালা মাথা তুলে জড়ানো গলায় বলল, কে রে ? কে রে ? কে রে ? কে আমার নাম ধরে কথা বলে ? তুমি ঐ ! তুমি ঐ !

কানা ফকির বলল, তোমরা চূড়ামণির খোঁজে এয়েছ ? ঐ তো চূড়ামণি ! এখানে তোমাদের কোনও ডর নেই, যা প্রাণে চায় খুলে বলো !

কানা ফকির যার দিকে আঙুল দেখালেন, সেই লোকটির বয়েস ষাটের কাছাকাছি, মাথার অর্ধেক চুল পাকা, একদা বলবান শরীরটি এখন দড়ির মতন পাকানো, শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়, চোখ দুটি পাকা করমচার মতন লাল।

বাতাসীর সঙ্গে যারা এসেছে তাদের ভক্তি চটে গেছে এরই মধ্যে। তারা ভাবল, তারা ভুল জায়গায় এসেছে। কিংবা ঐ মরকুট্টে বুড়োটা যদি চূড়ামণি হয়, তবে তার খুরে খুরে দণ্ডবৎ, দরকার নেই ঐ ঝামেলাটিকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে। তাদের একজন আর সকলকে বলল, চল রে চল, এখনও হাঁটা শুরু করলে লোকালয়ে ফিরতে পারব।

কানা ফকিরের কিন্তু কৌতূহল জন্মেছে। তিনি বাসাতীর মুখ থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে বললেন, জয় রাধেশ্যাম, জয় সত্য পীর ! তুমি ঐ ! তুমি ! এবারে খুলে বলো তো বাছা, তোমার বৃত্তান্তখানি।

বাতাসী তখন সব কথা সাত কাহন করে সবিস্তারে শোনাল।

তাই শুনে কানা ফকির দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলল, ওরে চূড়ামণি, তুই অবোধমণি হয়ে আছিস। তোর গ্রামের মানুষের মাথায় বিপদের খাঁড়া, তুই গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়া। সাঁই-এর কৃপা হলে তুই আবার

ফিরে আসবি।

দড়ি-পাকানো চেহারার বুড়োটা এই আদেশ শুনে কাঁদতে শুরু করে দিল ভেউ ভেউ করে।

কানা ফকির তার দিকে ছিলিম এগিয়ে দিয়ে বললেন, লে বেটা ! দু'তিন টান দে ! তারপর সুস্থ হয়ে সব কথা বুঝে দ্যাখ। আহা রে, এরা এসেছে কত দূর থেকে তোর নিয়তি ধরে টান দিতে। এই নারীটির বদন যেন ছাই বর্ণ হয়ে গেছে। এদের সাথে না যাস যদি তবে তোর মুক্তি হবে না। তুমি ঐ! তুমি ঐ !

ছিলিমে কয়েক টান দিয়ে সেই দড়ি-পাকানো চেহারার লোকটি অনেকটা তাজা হয়ে বলল, বাবা, তুমি সব পারো ! এরা যা চায়, তুমিই সাধ মিটিয়ে দাও না ! এই বুড়োকে নিয়ে টানাটানি কেন?

আবও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটিব পর কানা ফকিরের চরম আদেশ হল এই যে, দড়ি-পাকানো চেহারার চূড়ামণিকে যেতেই হবে তেঁতুলছড়ি গ্রামে। বাতাসীকে তিনি বললেন, যাওয়ার পথে ওবা যেন চূড়ামণিকে কোনও পুকুরের পানিতে চুবিয়ে নিয়ে যায়। তাতে ওর জ্ঞান ফিরবে !

বাতাসী আর তার দলবল অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ে চলল চূড়ামণিকে। এ বুড়োকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কী উপকার হবে ? তাও সে নিজে চলতে পারে না, ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পড়ে। এক একবার চেঁচিয়ে ওঠে। বড় তৃষ্ণা ! জল দে, জল ! গুরু, তুমি কোথায় পাঠাচ্ছ আমাকে ? তুমি ঐ !

খানিক দূর যাওয়ার পর পথের পাশে দেখা গেল এক পুষ্করিণী। কানা ফকিরের কথা মতন বাতাসীরা বুড়োটাকে সেখানে ঠেলে ফেলে দেবার উদ্যোগ করছে, তার আগেই সে ছুটে গিয়ে পুকুবেব জলে উপুড় হয়ে পড়ল। শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগল এবং এক পুষ্করিনী ভর্তি জল কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পান করে নিল চেটে পুটে।

তারপর পাড়ে উঠে এসে সে কাঁদতে লাগল। অস্ফুটভাবে বলতে লাগল, যে-দেশে ভালবাসা নাই, সে দেশে বাসা নাই আমার ! এই একই কথা বারবার বলতে লাগল আর ঝরতে লাগল তাব চোখের জল। সে কী কান্না ! ক্রমে তার চোখের জলেই আবার প্রায় ভরে গেল সেই পুকুরটা।

এই কাণ্ড দেখে বাতাসী ও তার দলবলের বাক্যরহিত হয়ে গেছে। তারা আরও চমৎকৃত হল, যখন সেই বৃদ্ধ বাতাসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তুলসী না ? ডাক নাম কাঁদুনি ?

পাশের ছেলেটিকে বলল, তুমি ভূধর না ? তার পাশের ছেলেটিকে বলল, তুমি তো একলাস? আর তুমি মঈনুদ্দিন ?

একে একে প্রত্যেকের বাবা-মায়ের নাম নির্ভুল বলে গেল সে। তখন আর সন্দেহ রইল না যে, এই লোকটিই প্রকৃত চূড়ামণি। সে নতুনদের চেনে না। পুরনোদের চেনে।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে পৌছাবার আগেই আরও কিছু কাণ্ড হয়ে গেল চূড়ামণিকে নিয়ে। কয়েক পা করে হাঁটার পরই সে বসে পড়ে আর হাত-পা ছড়িয়ে কেঁদে বলে, ওগো, আমায় নিয়ে যাচ্ছ কেন ? ডাকাত তাড়াবার মতন শক্তি কি আমার আছে ? আমি যে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি !

কিন্তু বাতাসীরা তখন তাকে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এ বুড়োকে দিয়ে ডাকাত আটকানো যাবে না ঠিকই, কিন্তু এতকালের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ চূড়ামণিকে দেখে গ্রামের মানুষ আবার তো নতুন কবে গল্পের উপাদান পাবে ! একটা মানুষ হারিয়ে গিয়েছিল, সে আবার ফিরে এসেছে, এরকম ঘটনা গ্রামে তো সচরাচর ঘটে না। চূড়ামণির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তো তারা একটু আগে নিজের চোখেই দেখল।

তেঁতুলছড়ি গ্রামে পৌছাবার প্রায় এক ক্রোশ আগে চূড়ামণি হঠাৎ বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। নেশার ঘোর কেটে যাচ্ছে। অন্যদের হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, এ আমি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি ? তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে ?

বাতাসী বলল, ঠাকুর, তুমি ফিরে যাচ্ছ তোমার নিজের গ্রামে। তোমার গ্রামের নাম তেঁতুলছড়ি,

মনে নেই !

চূড়ামণি জিজ্ঞেস করল, সেখানে কী ভালবাসা আছে ?

বাতাসী চট করে উত্তর দিতে পারল না। অন্যরাও নিরুত্তর। ভালবাসার কথা কেউ জানে না।

চূড়ামণি গান গেয়ে উঠল, যে দেশে ভালবাসা নাই, সে দেশে বাসা নাই আমার ! আমি তেঁতুলছড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম কেন জানিস ? সেখানে কেউ কারুকে ভালবাসে না।

বাতাসী চূড়ামণির হাত ধরে সকাতরে বলল, চূড়ামণি ঠাকুর, আমাদের বিপদ, তুমি আমাদের বাঁচাও। তোমাকে সবাই ভালবাসবে।

চূড়ামণি আকাশের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল, তুমি ঐ ! তুমি ঐ ! কে কাকে বাঁচায় ? কে কাকে মারে ? মানুষ নিজেকেই নিজে মারে। নিজেকেই নিজে বাঁচায়।

বাতাসী এবার হাঁটু গেড়ে চূড়ামণির পা চেপে ধরল।

চূড়ামণি একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। আবার তার চোখ ছলছল করে আসছে। তার মুখে কথা নেই। সন্ধের আকাশ জুড়ে কালি কালি মেঘ। অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গাছপালা। বাঁশ বনে শোনা যাচ্ছে শেয়ালেব রা।

চূড়ামণি একটুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে কাতরভাবে বলল, আমার শরীরের তাগৎ কমে গেছে। তোরা একটু একটু ভালবাসা দিলে যদি শক্তি ফিরে পাই ! দিবি ? তোরা ভালবাসা দিবি ?

বাতাসী বলল, আমার বুকে যত ভালবাসা আছে সব তোমায় দেব।

গঙ্গাধর, কামাল, মাণিকচন্দ্র, সঈফুদ্দিনরাও বলল, হ্যাঁ দেব, হ্যাঁ দেব।

চূড়ামণি হাত বাড়িয়ে বলল, দে, ভালবাসা দে !

এমনভাবে কী ভালবাসা দেওয়া যায় ! মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল সকলে।

চূড়ামণি এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের সামনে দাঁড়াল। একটা বাঁশ ধরে টানাটানি করে বলল, দ্যাখ, বুড়ো হয়ে গেছি, হাড় ঝুনো হয়ে গেছে, শরীরে বল নাই। তোরা ভালবাসা দে, তবে যদি মনের বল ফিরে পাই ! তোরা আমার গায়ে হাত বুলা।

তখন সবাই চূড়ামণিকে ঘিরে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। বাতাসী তার মুখখানা ঘষতে লাগল চূড়ামণির পিঠে।

আস্তে আস্তে যেন চূড়ামণির শরীর সোজা হয়ে যেতে লাগল, খুলে গেল চুলের জট, চাপা পড়ে গেল হাতের শিরা-উপশিরা, চক্ষে ফুটে উঠল জ্যোতি।

চূড়ামণি হুংকার দিল, তুমি ঐ ! তুমি ঐ !

তারপর একটানে সে পট্‌ করে তুলে ফেলল একটা মস্ত বড় বাঁশ।

তাই দেখে বাতাসী আর গঙ্গাধর আর কামালরা কাঁদতে লাগল ঝরঝর করে। তাদের ভালবাসার যে এত জোর তা তারা নিজেরাই জানত না এতদিন !

চূড়ামণি বাঁশটাকে মাটিতে ফেলে উল্টো দিকে ফিরে দু'হাত জোড় করে বলল, আমার গুরু কানা ফকির, তিনি সব দেখতে পান, তিনিও কাঁদছেন তোদের জন্য। বাবা, তুমি আর কেঁদো না, এরাই এখন আমায় সামাল দেবে।

আবার খানিক দূরে যাবার পর চূড়ামণি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমার যে বড় ক্ষুধা পেয়েছে। কে আমাকে খেতে দেবে ?

বাতাসী বলল, ঠাকুর, আর মাত্র দু' ক্রোশ পথ। তুমি গ্রামে গেলে সবাই তোমকে খাবার দেবে।

চূড়ামণি বিহ্বলভাবে বলল, সবাই আমাকে খাবার দেবে ? বলিস কী ?

বাতাসী আর তার সঙ্গীরা একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ ঠাকুর দেবে।

চূড়ামণি বলল, আমি যে অনেক খাই !

—তুমি যত চাও সব দেবে। তুমি পেট ভরে খেও।

—সত্যি দেবে ? শেষে কথা ফিরাবি না তো ?

ওরা গ্রামে পৌঁছবার পর এমন হৈ চৈ পড়ে গেল যে, এদিক-ওদিকের গ্রামের লোক ভাবল ডাকাত এসেছে বুঝি !

ভিড় ঠেলেঠুলে একেবারে সামনে এসে ছিরু বৈরাগী বলল, হ্যাঁ, এই তো সেই মানুষ ! বাতাসী অতদূর থেকে ধরে এনেছে, অসাধ্য সাধন করেছে মেয়েটা।

কিন্তু অনেকে মানতে চায় না। অনেকের চোখেই সন্দেহ। এই কি সেই অজেয় বীর চূড়ামণি। এই মাথার চুল পাকা, খসখসে বুড়ো ? এরকম নেশাখোর চেহারার মানুষ তো যে-কোনও শ্মশানঘাটে দেখতে পাওয়া যায় !

তাদের চোখে চূড়ামণির চেহারা হবে নব কার্তিকের মতন। কোথায় সেই কপাট বুক, কোথায় সেই চোখের দীপ্তি ! পঁচিশ বছর আগে যে উধাও হয়ে গেছে, সে কি আর ফিরে আসতে পারে ?

তবু কেউ কেউ বলল, হ্যাঁ, এই-ই সেই ! অন্যরা প্রতিবাদ করে ওঠে। ঘর থেকে মেয়েরা ছুটে ছুটে এসে ঐ বুড়োকে দেখে থমকে যায়। হতাশায় তাদের মুখ ঝুলে পড়ে।

প্রতিবাদীর সংখ্যা বাড়তে থাকে ক্রমেই। বাতাসী আর তার সঙ্গীরা আসার পথে যা যা অদ্ভুত ঘটনা দেখেছে তা বলতে যেতেই হা হা করে হেসে উঠে অনেকে। এই অপদার্থটা এক পুকুর জল শুষে খেয়েছে, একটা আস্ত তলতা বাঁশ উপড়ে তুলেছে ? গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পাওনি ? এই লোকটা তো গাঁজাখোর বটেই, বাতাসীরাও কি গাঁজা টেনে এসেছে কানা ফকিরের আখড়া থেকে ?

চূড়ামণি কোনও কথা বলে না, কোনও সাড়া শব্দ করে না। ঠায় বসে থাকে অশত্থতলার চাতালে। ক্রমেই সে যেন বেশি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। হৈ হৈ চরমে উঠতে সে একপাশে ঢলে পড়ল। অজ্ঞান হল না মরেই গেল তা বোঝা গেল না।

চূড়ামণিকে গড়িয়ে পড়ে যেতে দেখে এক নিমেষে থেমে গেল গোলমাল। সবাই থমকে গেছে।

বাতাসীর মা কাঁদুনি ছুটে এসে চূড়ামণির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে বলে উঠল, ওগো, তোমরা ওকে মেরে ফেললে ? মানুষটা অ্যাদ্দিন বাদে ফিরে এল তাকে তোমরা কেউ কিছু দিলে না ?

বাতাসীর মনে পড়ল, মানুষটা বলেছিল খিদে পেয়েছে।

ছিরু বৈরাগী বলল, ওর নাম ধরে ডাকো। ওকে ডাকলে ও জেগে ওঠে।

বাতাসীরও সেই কথাই মনে হল। কানা ফকিরের আশ্রমে নাম শুনেই চূড়ামণি উঠে বসেছিল।

সে চূড়ামণির কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, চূড়ামণি ঠাকুর। চূড়ামণি ঠাকুর ! ফিরে এসো !

আরও অনেকে সেই নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল।

ছিরু বৈরাগী দু' হাত তুলে সকলকে উদ্দেশ করে বলল, সবাই ডাকো ! সবাই ডাকো ! জোরে, আরও জোরে।

দেখাই যাক না কী হয়, এই ভেবে যারা অবিশ্বাসী তারাও গলা মেলাল। যখন আর একজনও বাকি রইল না, সবাই সমস্বরে ডাকছে, তখন চোখ মেলল চূড়ামণি। আস্তে আস্তে উঠে বসে বলল, আমায় ডাকছিলে কেন গো ? আমি তো দিব্যি ফিরে যাচ্ছিলুম, কেন ডেকে আনলে ?

ছিরু বৈরাগী বলল, মানুষটা এতদিন বাদে গ্রামে ফিরল, তোমরা কেউ ওকে একটু খেতেটেতে দেবে না ? অন্তত একটু জল-মিষ্টি দাও !

বাতাসী বলল, চূড়ামণি ঠাকুর, তুমি আমাদের বাড়ি চলো, তোমাকে ভাত রেঁধে খাওয়াব।

চূড়ামণি বাতাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে তারপর মুখ ফিরিয়ে সমস্ত মানুষদের দেখল, একটা

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি খাওয়াবে ? তবে যে বলেছিলে, গ্রামের সব মানুষ আমায় খাওয়াবে ?

বাতাসীর মা কাঁদুনি বলল, আমরা কাঠকুড়ুনী, তবু তোমায় পেটভরা ভাত দিতে পারব। চলো ঠাকুর !

চূড়ামণি তবু বাতাসীকে জিজ্ঞেস করল, তুমি যে বলছিলে, গ্রামের সব মানুষ খাওয়াবে ? তুমি কথা রাখলে না।

তারপর অবুঝ শিশুর মতন মাথা নেড়ে নেড়ে সে বলতে লাগল, না, আমি খাব না। সবাই মিলে আমায় না খাওয়ালে আমি খাব না।

সবাই অবাক। একটা মানুষের জন্য সব বাড়িতে রান্না হবে নাকি ? এ কি মানুষ না রাক্কস ?

ছিরু বৈরাগী বলল, আরে না, না, চূড়ামণি ঠাকুর সে কথা বলেনি। তোমরা সব বাড়ি থেকে পাঁচ দানা করে চাল দাও। তারপর সেই চাল একত্র করে একজন কেউ ফুটিয়ে দিক। তাহলেই সবাই মিলে খাওয়ানো হবে।

একটা মাটির সরা নিয়ে বাতাসী আর অন্য ছেলেরা ঘুরল সব বাড়ি বাড়ি। গ্রাম শেষ করে ঘুরে আসার পরেও, সেই সরা অর্ধেক ভরল না।

বাতাসী সেই সরাটা এনে ছিরু বৈরাগীর সামনে এসে খুব দুঃখী গলায় বলল, এইটুকু চালে কি এত বড় মানুষটার পেট ভরবে ? তুমি কেন মাত্র পাঁচ দানা বললে ?

সেই কথা শুনে চূড়ামণি মিটিমিটি হেসে ছিরু বৈরাগীর দিকে তাকাল। ছিরু বৈরাগী কপাল চাপড়ে বলল, ওরে, ভিক্ষের তণ্ডুল আমি ভালই চিনি ! সবাই পাঁচ দানা দেয়নি। কেউ কেউ দিয়েছে তিন দানা, কেউ কেউ দিয়েছে দু' দানা, কেউ কেউ দিয়েছে ভুষি ! যে গ্রামের মানুষ এত তঞ্চক হয়, সে গ্রামের মানুষকে ডাকাতে মারবে না তো কি ?

তখন লজ্জা পেয়ে আরও অনেকে দু' দানা, তিন দানা করে চাল দিয়ে গেল। শুধু তিনজন এসে বলল, আমাদের ঘরে এক দানাও চাল নেই, ঠাকুর ! দোষ দিও না। ইচ্ছে থাকলেও দেওয়ার সাধ্য নেই। আর একদিন দেব।

বাতাসী ভাত ফুটিয়ে এনে কলাপাতায় বেড়ে দিল। সঙ্গে একটু নুন, দুটি লঙ্কা। সেই ভাতই অমৃতের মতন খেল চূড়ামণি। তৃপ্তির সঙ্গে বলল, আঃ !

ছিরু বৈরাগী বলল, ঠাকুর, এবার তুমি একটু শোও। আজকের রাতটা ঘুমিয়ে নাও। কত দূর থেকে এসেছ ? কাল সব কথা শুনো।

কিন্তু বিশ্রামের সময় পাওয়া গেল না। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে এসে আছড়ে পড়ে বলল, আসছে ! আসছে ! নদীর ওপারের মাঠে ধুলোর ঝড় এসেছে, ডাকাতরা আসছে।

সবাই একদৃষ্টে তাকাল চূড়ামণির দিকে। এইবার। আসল না নকল তার প্রমাণ দাও। দেখি তোমার কেমন মুরোদ !

বাতাসী ব্যাকুলভাবে বলল, ঠাকুর, ওঠো, ডাকাতরা আসছে।

চূড়ামণির মুখে ভয়ের ছায়া। শরীরটা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। সে মাটিতে মিশে যেতে চায়।

বাতাসী তার হাত ধরে টেনে বলল, ঠাকুর, ওঠো ! নদী পেরিয়ে ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

চূড়ামণি কাতরভাবে বলল, আমি ঠাকুর নই, আমি শুধু চূড়ামণি। আমি কী করে পারব অতগুলো ডাকাতের সঙ্গে ? আমার যে শরীরে আর সেই শক্তি নেই। আমাকে তোমরা ভালবাসা দাও !

বাতাসী অমনি উন্মাদিনীর মতন সকলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ওগো, তোমরা সবাই এসো। চূড়ামণি ঠাকুরকে ভালবেসে ছুঁয়ে দাও। হাত বুলিয়ে দাও।

ডাকাতরা এসে পড়ল বলে, আর দ্বিধা করার সময় নেই। সবাই ছুটে এসে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল চূড়ামণির গায়ে মাথায়।

চূড়ামণি বলতে লাগল, আরও দাও, আরও ভালবাসা। ভালবাসায় আমার মন ভরে না। আরও দাও!

বাতাসী চুমো দিতে লাগল চূড়ামণির সারা শরীরে। তার দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও। সে কী ব্যাকুলতা। যেন মাঝখানে চূড়ামণি নেই, সবাই সবাইকে চুমু দিচ্ছে।

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সবাইকে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল চূড়ামণি। দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে বলল, এবাবে আমি বল পেয়েছি। আর ভয় নেই।

সকলেই দেখল চোখের নিমেষে যেন রূপান্তর হয়েছে চূড়ামণির। তার শরীরে ঝকঝক করছে তেজ। তার ম্লান মুখে ফুটে উঠেছে হাসি, সেরকম হাসি আগে কেউ কখনও দেখেনি। তার বুক যেন লোহার কপাট আর দুই হাত যেন মুদ্গর। মাথার চুল তো পাকা নয়, ধুলোবালি মাখা।

চূড়ামণি বলল, আমার অস্ত্র কই?

ডাকাতদের কাছে কত মারাত্মক অস্ত্র থাকে, তাদের বিরুদ্ধে চূড়ামণি একা খালি হাতে দাঁড়াবে কী করে? একটা অস্ত্র তো নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু এ গ্রামে লাঠি-সোঁটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই। শুধু রতনমণির কাছে আছে একটা রাম দা। সে সেটাই এনে দিল।

চূড়ামণি বলল, শুধু ওতে তো হবে না। সকলের কাছ থেকে কিছু কিছু চাই। আর যদি কিছু দিতে না পারো তো প্রত্যেকে মাথা থেকে একগাছা চুল ছিঁড়ে দাও!

সবাই পট পট করে ছিঁড়তে লাগল মাথার চুল।

বাতাসী নিজের চুল ছিঁড়তে যেতেই কেঁপে উঠল তার সারা শরীর। একটা সাঙ্ঘাতিক ভয়েব তরঙ্গ। এই মানুষটা পারবে তো? ডাকাতরা এসে যদি এক কোপে মাথাটা কেটে ফেলে?

সে ফিসফিস করে বলল, ঠাকুর, তুমি পালাও, তুমি পালাও! তুমি ডাকাতদের সামনে যেও না।

ডাকাতরা নদী পেরিয়ে এসেছে, কপাকপ শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অন্য সবাই ভয়ে পালাচ্ছে ঘর বাড়ি ছেড়ে মাঠের দিকে।

চূড়ামণি বলল, এখন আর কোথায় পালাব? আর যে উপায় নেই!

বাতাসী বলল, তুমি কি পারবে ওদের সঙ্গে? একলা কি কেউ পারে? তোমায় ওরা ছাড়বে না।

চূড়ামণি বলল, পালালেই গ্রামের লোক কি আমায় ছাড়বে? আর যদি বা ডাকাতদের সঙ্গে পারি, কিন্তু তারপর আমার কী হবে? আমার ভয় করছে কিসের জানো। তরপর আর আমি মানুষ থাকব না। বাতাসী, আমার খুব মানুষ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

বাতাসী বলল, তুমি মানুষ থাকবে না তো কী হবে?

চূড়ামণি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মাটি! মাটি!

মূল রাস্তার ওপরে এসে গেছে ডাকাতেরা। চূড়ামণি দৌড়ে মাঝ রাস্তায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে হুংকার দিল, তুমি ঐ!

এই প্রথম দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল থমকে গেল।

পর পর ছ'জন ঘোড় সওয়ার, তাদের সারা শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা, তাদের মুখও দেখা যায় না। তাদের তিন জনের হাতে জ্বলন্ত মশাল।

চূড়ামণি নিজের মাথা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে হাতের চুলের ডেলাটার সঙ্গে মেশাল। তারপর সেই ডেলাটা মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, তোরা আগে এইটা কাট, তারপর আমার মাথা কাটবি।

একজন ঘোড় সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এল। তার হাতে খোলা তলোয়ার। সে চুলের গোছাটা কাটার জন্য তলোয়ার তুলতেই অট্টহাসি করে উঠল চূড়ামণি। সে হাসিতে যেন মেঘের গর্জন। সে হাসিতে সমুদ্রের ঢেউ।

তলোয়ারের প্রচণ্ড কোপে সেই চুলের গোছার একটাও কাটল না। ডাকাতের সর্দারটি পরপর

তিনটি কোপ লাগাল, চতুর্থ কোপে দু'টুকরো হয়ে গেল তার তলোয়ার।

চূড়ামণি আবার হেসে উঠে বলল, আর একটা অস্ত্র আন্। এবারে আমার মাথায় একটা কোপ মেরে দ্যাখ কী হয়!

ডাকাতদের সর্দার ভাঙা তলোয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চূড়ামণির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কম্পিত গলায় বলল, ঠাকুর, আমরা অনেক পাপ করেছি। তুমি আমাদের শাস্তি দেবে দাও। আমরা তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন।

চূড়ামণি তার ডান পাটা তুলে ডাকাত সর্দারের মাথার ওপরে রাখল।

অন্য ডাকাতরা ঘোড়া থেকে নেমে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল দূরে।

চূড়ামণি আর ডাকাত সর্দার সেই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রইল। আস্তে আস্তে তাদের দু'জনেরই শরীর থেকে খসে খসে যেতে লাগল মাংস, তাদের হাড়ের খাঁচাটা হয়ে গেল কঞ্চির, তার ওপর লাগাল মাটি আর রং।

যারা ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফিরে এল, কাছে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল। কেউ কেউ উচ্চারণ করতে লাগল দোয়া, কেউ কেউ নিয়ে এল ফুল আর বেল পাতা। শুধু বাতাসী ভাসল নয়ন জলে!

বোধন ও বিসর্জন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

এরেই কয় ভুষ্টিনাশ। বোঝলা না হরগোপাল ?

আইজ্ঞা বোঝলাম।

তোমারে কতবার কইলাম, হরগোপাল, একখান ছৈওলা নৌকা লইও। তা তুমি আনলা একখান চিতই পিঠা। আরে বাবা ভাদ্র মাস হইল গিয়া এ ট্রেচারাস মান্থ্। অখন দ্যাখলা তো, ভুষ্টিনাশ কারে কয়! গিলা করা পাঞ্জাবি গেল তেনাইয়া, ধুতিখান গামছার সমান, মোচে একটু আতর দিয়া দিছিল বড় বউ, ভুরভুরাইয়া গন্ধ ছাড়তে আছিল, হেই গন্ধখানও গেল ধুইয়া।

আইজ্ঞা মাত্র পাঁচ মিনিটের লিগা বৃষ্টিটা তো না হইলেও পারত মন্মথবাবু ? আমারই কপাল। ছাতিখানও যদি আনতেন। ওই দ্যাখেন মেঘখান অখন কেমন পাল তুইল্যা ভাইস্যা ভাইস্যা উইড়া গেল গিয়া। রৌদ্রও কেমন ফিকফিক করত্যাছে।

না করব ক্যান ? তাগো তো আর ভুষ্টিনাশ হয় নাই। শোনো হরগোপাল, এই অবস্থায় পাত্রী দেখতে যাওন যায় না। নৌকা ফিরাও।

কন কি মন্মথবাবু! তারা যে পালকি লইয়া ঘাটে বইস্যা আছে।

হরগোপাল, তুমি একখান ধোকড়। এই বেশে যদি ঘাটে লামি তারা কি আর আমাগো লগে কাম করব ? এমন আহাম্মক মাইনসের লগে কোন বলদে কাম করে ?

একটা কথা কমু মন্মথবাবু ?

কও।

কই কী, রৌদ্র যখন উঠছে আর বাতাসও যখন দিত্যাছে, তখন চাইপ্যা বইস্যা থাকেন, গায়ের কাপড় গায়েই শুকাইয়া যাইব অনে। অখনও এক ঘন্টার পাড়ি, চিন্তা নাই।

কিন্তু শুকাইলেই তো হইব না হে, গিলা পামু কই ? কোচার কুঁচি পামু কই ?

আগে তো শুকাইতে দ্যান, পরে দেখা যাইব। ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড।

কইলা ?

কইলাম।

তা হইলে থাকলাম বইস্যা। মাজার কাপড় কিন্তু শুকাইব না, এই কইয়া রাখলাম।

আইজ্ঞা সব কি আর এক লগে হয় ? ছৈওলা নৌকাও কী আর খুঁজি নাই ! গন্ধর্ব আর রহিম শেখ বড় গাঙে গেছে, ফটিকরে ধরছিলাম, কিন্তু তার আইজ ম্যালোরিয়া। ভাবলাম সোয়া ঘন্টার পথ, উদলা নৌকাতেই মাইরা দিমু। বিধি বাম।

বিধি বাম যখন বোঝলা তখন আর যাইয়া হইবোটা কী ? বিধি এই বিয়া চায় না, বোঝলা ? তাই এমন আতকা বৃষ্টি আইস্যা চুবাইয়া দিয়া গেল। কী হে বড় মাঝি, মুখে পিঠা দিয়া বইস্যা আছ নাকি? কথা কও না যে বড় !

বড় মাঝি ঝুমরু মিঞা একটু লাজুক হাসি হেসে বলল, কী আর কমু বড়বাবু। বইস্যা বইস্যা কাণ্ডটা দ্যাখলাম। খোদার মর্জি, মাইনসে কী করবে কন ! গামছা নিবেন ? আছে কিন্তু।

দোহাই মিঞা, আর গামছা দেখাইও না। অখন ভাল কইর‍্যা বইঠা বাও।

তামুক খাইবেন কর্তা ? নূতন হুক্কা আছে।

খাই না হে মাঝি। বিলাত যাওনের আগে খাইতাম। অখন সিগারেট খাই। তামুকের কথাটা মনে করাইয়া ভাল করলা না। পকেটে এক প্যাকেট সিগারেট আছিল, হেইগুলিরও বোধহয় ভুষ্টিনাশ হইল।

হরগোপাল শশব্যস্তে বলে ওঠে, ফালাইয়া দেন ! পকেটে থাকলে পাঞ্জাবিটার বারোটা বাজাইব।

বারোটার কী কিছু বাকি আছে নাকি মনে করো ?

মন্মথবাবু পকেট থেকে বার করলেন প্যাকেটটা।

ফালাইয়া দেন মন্মথবাবু।

আরে না। জোর বাইচ্যা গেছে।

কন কী ?

মন্মথবাবু দেশলাইটা নেড়ে বললেন, এইটা বাচে নাই। ভিজা অ্যাক্কেবারে শ্যাষ। বড় মাঝি, দেশলাই আছে নাকি হে ?

আইজ্ঞা আছে।

বলে শশব্যস্তে পাটাতনের কাঠ তুলে সে একটা দেশলাই বের করে দেয়।

মন্মথবাবু সিগারেট ধরিয়ে বলেন, হরগোপাল, খাইবা নাকি একটা ?

আইজ্ঞা না। ধুয়ার নেশাটা ধরি নাই।

ধরলে পারতা। গাও গরম করতে কামে দেয়।

হরগোপাল মৃদু মৃদু হেসে বলে, গাও বেশি গরম করন কি ভাল মন্মথবাবু ? আমার আর গাও গরম করনের কাম নাই।

বিয়াশাদি করলা না বইলাই তোমার পেসিমিস্টিক অ্যাটিচুড দেখতাছি। কোন বুদ্ধিতে যে সংসারধর্ম করলা না কে জানে !

কাইট্যা তো যাইতাছে।

কাটবো না হে কাটবো না। বয়স তো মোটে ত্রিশ-বত্রিশ। লম্বা আয়ু পইড়া আছে, বুঝবা ঠেলা। বউ কেমন জানো ? বাফার, থাফার বুঝলা। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট, বুদ্ধিবিনাশ, বলদামি সামাল দেয়। ব্যাচেলারগো তো সকলেই এক্সপ্লয়েট করে, বউ থাকলে পারে না।

বোঝলাম।

কই আর বোঝলা।

বেশি বুইঝ্যা কামটা কী কন দেখি মন্মথবাবু। হগল জিনিসই কি বোঝোনের ব্যাপার ? বিয়া না করলে যে বুড়া বয়সে কপালে কষ্ট আছে এইটা বোঝোনের লিগ্যা আপনার মতো বিলাত গিয়া ব্যারিস্টারি পাস করনের দরকার নাই।

কিন্তু নিজের বইনখানরে তো আমার কপালে গছাইতে ছাড়ো নাই হে হরগোপাল। তখন তো ঘ্যানঘ্যানাইয়া প্যানপ্যানাইয়া মাথাটাই খারাপ কইরা দিছিলা। যে নিজে বিয়া করে না হ্যায় অন্যের বিয়ার লিগ্যা উইঠ্যা-পইড়া লাগে ক্যান ?

হরগোপাল একটু হাসল। বলল, আমি তো অ্যান্টি ম্যারেজ না। ব্যাচেলরশিপ যে ভাল জিনিস হেই কথাও কইয়া বেড়াই না। বিয়া যে করি নাই এইটা আমার একটা পারসোনাল টেস্ট কইতে পারেন। সংসারে বড় ঝুটঝঞ্ঝাট।

হরগোপাল, তুমি কি মাইয়ালোকরে ভয় পাও ?

হরগোপাল মৃদু হেসে লজ্জার গলায় বলে, তা একটু পাই মন্মথবাবু। মিছা কথা কইয়া লাভ কী ?

মন্মথবাবু দূরের দিকে চেয়ে শরতের শেষ বেলার আলোর সঙ্গে নদীর জলের খেলাটা দেখছিলেন। সেই খেলায় আকাশের ঘন নীল ছায়াটিরও কিছু যোগ আছে। ব্যস্ত ব্যারিস্টার প্রকৃতি অবলোকন করার বিশেষ সময় পান না। আজ ভারী অন্যরকম লাগছে। একটা শ্বাস মোচন করে বললেন, তোমার দিদির কাছে একখান বৃত্তান্ত শুনছিলাম। কমু ?

হরগোপাল তটস্থ হল। শঙ্কিত গলায় বলল, কী শুনছেন ?

কইতে একটু বাধক হইতাছে। সেনসিটিভ ম্যাটার। শুনছি তুমি নাকি লাবণ্য নামে একটা মাইয়ারে পছন্দ করতা।

হরগোপাল আচমকা সাদা হয়ে গেল। মাথা নত করে মুখ লুকোলো সে। তারপর বলল, ছাইড়্যা দ্যান মন্মথবাবু। ওই কথায় আর কাম কী ?

মন্মথবাবু সমবেদনার গলায় বললেন, না হে, আমি বেশি গভীরে যাইতে চাই না। শুধু জানতে চাই, কথাটা সত্য নাকি ?

হরগোপাল খুব মৃদু স্বরে বলল, হ।

স্যাড কেস হে, স্যাড কেস। শুনছি, জাতে কাটে কোনও গণ্ডগোল নাই, বর্ণ গোত্র হগল ব্যাপারেই মিল আছিল। দোষের মইধ্যে মাইয়াডা গরিব ঘরের। কিন্তু বাদ সাধল তোমার বাবার দাবিদাওয়া— সত্য নাকি ?

হরগোপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, যাইতে দ্যান। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ পাস্ট।

আমার কী মনে হয় জানো হরগোপাল ? আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশাই ইজ নট এ গ্রিডি ম্যান। তিনি বিয়াটা ঘটাইতে দিতে চান নাই বইলাই দাবিদাওয়া তুইল্যা কাটাইয়া দিছেন। ঠিক কইছি ?

আমারে জিগাইয়েন না মন্মথবাবু। আমি কইতে পারুম না।

আরে বাপু, তোমার অত ভাইঙা পড়নের কী আছে ? লজ্জাই বা পাইতাছ ক্যান ? পাস্ট ইজ পাস্ট।

হরগোপাল ডানধারে চেয়েছিল। একটা ছাল ছাড়ানো গরুর লাশ ভেসে যাচ্ছে জলে। তার ওপর একটা শকুন বসা। সে দেখছিল, কিন্তু দৃশ্যটা তাকে স্পর্শ করল না। তখন লাবণ্যর বয়স ছিল

চোদ্দো। এখন বাইশ তেইশ, দুটো ছেলেমেয়ের মা। তার স্বামী ঢাকার উকিল। লাবণ্য নিশ্চয়ই আর তার কথা ভাবে না। ভাববেই বা কেন ?

হঠাৎ মন্মথবাবু প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, ফিরতে তো রাইত হইয়া যাইব হে হরগোপাল। অন্ধকারে নৌকায় ফিরতে তো বিপদের কথা।

না, বিপদ কিসের। যাইত্যাছি উজানে, ফিরুম ভাটিতে আধা ঘন্টার বেশি লাগব না। জ্যোৎস্না রাইত, আইজ চতুর্দশী, বিলাতে আর কইলকাতায় থাইক্যা তো তিথিনক্ষত্র ভুইল্যাই গেছেন।

মন্মথবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, ঠিকই কইছ। ওই সব আইজকাইল মনেই থাকে না।

মন্মথবাবু আরও একটা সিগারেট ধরালেন। এই সব অঞ্চল তিনি এক সময়ে ভালই চিনতেন। কিন্তু দীর্ঘ অনুপস্থিতি খানিকটা অচেনার পরদা টেনেছে। শরতের ভরা নদীর ওপর শেষবেলার আলোয় যে সৌন্দর্যটি রচিত হয়ে আছে তা উপভোগ করতে একটা বাধা হচ্ছে তাঁর। ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে যাচ্ছেন—সে উদ্বেগ তো আছেই। আর আছে কলকাতায় ফেলে আস নানা অসমাপ্ত কাজের জন্য, মামলা-মোকদ্দমার জন্য একটা তটস্থ ভাব। মন যে মানুষের কত বড় শত্রু ! ছেলে অমিতাভ তাঁরই জুনিয়র। এম এ এবং ল পাস করে বাপের কাছে কাজ শিখছে। ব্যারিস্টারি পড়তে সেও বিলেত যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছে। বিয়েটা তার আগেই দেওয়া দরকার। মন্মথবাবুর বাবা শচীন্দ্রনাথও মেমসাহেবদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ছেলেকে বিয়ের টীকা দিয়ে দিয়েছিলেন। কাজটা মন্দ করেননি। সেই ট্রাডিশন মন্মথবাবুও বজায় রাখতে চান। ব্যাচেলারদের পক্ষে বিলেত ভাল জায়গা নয়।

মাঝি ঝুমরু মিঞা হঠাৎ হাঁক মারল, ওই ঘাট দেখা যায় কর্তা।

মন্মথবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, আইয়া পড়লাম নাকি হে হরগোপাল ?

আইজ্ঞা।

মাজার কাপড় কিন্তু অখনও শুকায় নাই।

উপর উপর শুকাইলেই চলব।

যা কও। অখন সংক্ষেপে পাত্রীপক্ষের কথা একটু কইয়া লও তো হরগোপাল। একটু হোমওয়ার্ক থাকন ভাল।

আইজ্ঞা এইটা লইয়া তো চাইরটা পাত্রী দ্যাখলেন। ঘাবড়াইয়েন না। পাত্রীপক্ষ পুরানা জমিদারবংশ। তবে অখন পড়তি, যতদূর খবর পাইছি, বংশমর্যাদা আছে, পাত্রীর এক জ্যাঠা আই সি এস আছিল। অখন বাইচ্যা নাই। পাত্রীর বাপ ভাল সেতারি, গানবাজনার চল আছে পরিবারে।

পাত্রী কেমন ?

ঘটকমশায় তো কইছিল খুব সুন্দরী। তবে ঘটকগো কথা তো বুঝতেই পারেন। বাড়াইয়া কয়।

ঘাট সত্যিই দেখা যাচ্ছিল। কাঠের পাটাতনওয়ালা ঘাট, জলকাদা মাড়াবার সম্ভাবনা নেই। ঝুমরু বৈঠা ফেলে লগি তুলে নিয়ে দক্ষ হাতে সামান্য উজিয়ে গিয়ে ঘাটের দিকে নৌকা ফেরাল। পাটাতনের গায়ে মাখনের মতো নরম ঘষায় নৌকো লাগিয়ে দিল মাঝি।

একটু ওপরের দিকে কন্যাকর্তারা অপেক্ষা করছিলেন। নৌকা লাগতেই হুড়হুড় করে নেমে এলেন তাঁরা। দুজন বয়স্ক মানুষ আর দুজন সুশ্রী যুবক।

হরগোপাল চাপা স্বরে বলল, পাত্রীর খুড়া মধুসূদনবাবুরে চিন্যা রাখেন। ওই যে মাথায় টাক। মোহনবাগানে খেলত।

তুমি চিন নাকি ?

চিনি। মধু চৌধুরী ফেমাস লোক। হগলেই চিনে।

কন্যাকর্তারা হাতজোড় করে বললেন, আসেন ! আসেন ! কী সৌভাগ্য ! কী সৌভাগ্য !

তাঁরাই হাত বাড়িয়ে দুজনকে পাটাতনের ওপর তুললেন।

মধুসূদন বিনয়বচনে বললেন, আসেন ব্যারিস্টার সাহেব, কত বড় একজন মাইনসের পাও পড়ল আমাগো গ্রামে !

মন্মথ হাসলেন, বড় মানুষ আর কেমনে ? মক্কেলগো মাথায় কাঠাল ভাইঙ্গা খাই। আমারে কি আর বড়মানুষ কওন যায় ? আসো হে হরগোপাল।

দীর্ঘকায় ও সুপুরুষ হরগোপাল তার পোর্টম্যান্টো হাতে নিয়ে ভগিনীপতির পিছু পিছু এগোলো। তার মনটা আজ খারাপ। শরতের এই সুন্দর বিকেলে লাবণ্যর প্রসঙ্গটা তো না উঠলেই পারত।

পালকিতে উঠতে একটু ইতস্তত করছিলেন মন্মথবাবু। বললেন, জীবনে পালকিতে উঠি নাই। ইজ ইট সেফ ?

মধুসূদন শশব্যস্তে বললেন, খুব সেফ। ওঠেন।

আপনাগো বাড়ি কতদূর ?

আইজ্ঞা কাছেই। পোয়া মাইল।

তা হইলে পালকি থাউক। হাইট্যাই যাই চলেন। কথা কইতে কইতে যাওন যাইব অনে।

এই নিয়ে একটু ঠেলাঠেলি, উপরোধ হল। তবে পাত্রীপক্ষ মন্মথকে একটু বিশেষ সমীহের চোখে দেখছে, বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার বলে কথা। শেষ অবধি মন্মথনাথের কথাই থাকল।

রাস্তাটা অতি মনোরম। সুরকির পথ। দু ধারে নিবিড় গাছপালা। ফাঁকে ফাঁকে পল্লীচিত্র দেখা যাচ্ছে। অভিনব কিছু নয়। তবু মন্মথনাথের মনটা প্রসন্ন হল। তিনি হঠাৎ আসা বৃষ্টিতে ভেজার ঘটনাটা বললেন। বিলেতের কথাও একটু হল। অমিতাভর কথাও একটু।

হরগোপাল একটু চুপ মেরে গেছে। একটু পিছিয়ে হাঁটছে সে। তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না তেমন।

রাস্তা সামান্যই। একটু বাদেই মস্ত বাগান ঘেরা পুরনো বাড়িটা দেখা গেল। দু মহলা বাড়ি। এক সময়ে চাকচিক্য ছিল। এখন নেই। সারাইয়ের অভাবে বাইরের দেয়ালে নোনা ধরেছে, চাপড়া খসে পড়েছে, জানলা দরজাও কিছু ভগ্নদশায়।

বাইবের মস্ত সিঁড়িতে কন্যাপক্ষের বিস্তর মানুষ অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের দেখেই সকলে শশব্যস্ত নেমে এলেন।

মস্ত বৈঠকখানায় নিচু তক্তপোশে ফর্সা চাদর পাতা। ফুলদানিতে ফুল। গোলাপজলের গন্ধ। বসতে না-বসতেই চাকর রুপোর ট্রেতে রুপোর গ্লাসে সরবৎ নিয়ে এল।

আপ্যায়ন প্রায় ত্রুটিহীন।

পাশে বসা হরগোপালকে মন্মথ চাপা স্বরে বললেন, একটু তাড়াতাড়ি করতে কও। ফিরতে দেরি হইলে আবার কোন ভজঘট্ট বাধে তার ঠিক কী ?

ক্যান, জ্যোৎস্না রাত্রে নদীর দৃশ্য দেখবেন না ?

তাও তো কথা। তবু তাড়াতাড়ি করতে কও। তোমার দিদি বইয়া থাকব।

এলাহি মিষ্টিমুখের আয়োজন। মন্মথনাথ মিষ্টি ভালবাসেন। খেলেনও কয়েকটা। হরগোপাল খাইলা না ?

আইজ্ঞা না।

ক্যান খাইলা না ? ভাল জাতের মিষ্টি।

জানি। তবে ডাক্তারি মতে মিষ্টি নিকৃষ্ট খাদ্য।

ওঃ, আমি তো ভুইলাই যাই যে তুমি একজন এম বি ডাক্তার।

আমিই ভুইল্যা যাই তো আপনের আর দোষ কী ?

জলযোগের পর একটু বিরতি। পাত্রীর বাবা মহেন্দ্রনাথ ভারী ভালমানুষ গোছের লোক। মুখে একটা ভোলানাথ-ভোলানাথ ভাব আছে। সুরের জগতেই বাস, বাস্তব পৃথিবীর তেমন খোঁজখবর রাখেন না। ফরাসডাঙার ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরে আজ যথাকর্তব্য করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু অস্বস্তিটা তাঁর মুখে ফুটে আছে। হাতজোড় করে বললেন, আমার মেয়েকে আনি ?

আনুন। দেরি করা ঠিক হবে না।

দুজন ঘোমটা দেওয়া মহিলা দু দিক দিয়ে ধরে যাকে ঘরে অনল তাকে দেখে মন্মথনাথ প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এলো চুলের ঝাঁপি কোমর অবধি নেমেছে। বড় বড় দু খানা চোখ, ঢলঢলে মুখ আর নাতিদীর্ঘ শরীরের মেয়েটিকে পরমাসুন্দরীই বলা যেত যদি গায়ের রংটা আরও একটু ফর্সা হত। মেয়ে কালো নয়, তবে গৌরবর্ণাও বলা যাবে না। মেয়ে কী ভাবে দেখতে হয়, কী প্রশ্ন করতে হয় তা মন্মথনাথ জানেন না। তিনি মুগ্ধতার কয়েক মুহূর্ত পার করে হরগোপালকে চাপা গলায় বলেন, কেমন দেখো ?

আমি অখনও দেখি নাই।

কও কী ?

আপনে তো জানেন আমি মাইয়ালোকের দিকে চাই না।

হ, হ, জানি। কিন্তু তুমি একটা ইমপসিবল মানুষ। আমি অখন কী করুম কইবা তো !

আপনে ব্যারিস্টার মানুষ, আপনেরে কী শিখামু ? যা খুশি জিগান। এই দ্যাশে পাত্রীপক্ষ হইল অধমর্ণ, তারা অপমান গায়ে মাখে না। জিগান।

তোমারে লইয়া আর পারি না।

আপনের পছন্দ হইছে ?

মন্দ না হে।

তবে দু-চাইর কথা জিগাইয়া ছাইড়া দ্যান। মাইয়াটা বোধহয় ভয়ে ঘামতাছে।

মন্মথনাথ দণ্ডায়মানা মেয়েটির দিকে ফের চাইলেন। একটা বিশেষ জায়গায় মেয়েটিকে দাঁড় করানো হয়েছে। জানলা দিয়ে আসছে বিখ্যাত কনে-দেখা-আলো। রূপে যেন ভাসিয়ে দিচ্ছে ঘরখানা।

মন্মথনাথ গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, তোমার নাম কী মা ?

মিষ্টি গলায় জবাব এল, অলকা।

বাঃ, সুন্দর নাম। লেখাপড়া করো নাকি ?

ক্লাস সেভেনে পড়ি।

বাঃ বেশ। গান গাও নাকি ?

গাই।

মহেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, আমিই শিখাই অরে। গান শুনবেন ?

মন্মথনাথ ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলেন, আরে না। গানের আমি বুঝিটা কী ? অখন আসো গিয়া মা, আমার যা দ্যাখনের দেখছি।

দু দিকে দুই ঘোমটা টানা রহস্যময়ী মহিলার মাঝখানে—যেন বাহিত হয়ে—ধীর পায়ে মেয়েটি অন্দরমহলে চলে গেল। মন্মথনাথ হাঁফ ছাড়লেন। তিনি বিলেতফেরত মানুষ, এরকমভাবে মেয়ে দেখার অভ্যাস নেই। এর আগে তিনটে মেয়ে দেখা হয়েছে, তবে সে সব ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী। শরীর খারাপ বলে এযাত্রায় তিনি আসেননি। এলে মন্মথনাথের এত অস্বস্তি হত না।

হাঁফ ছাড়ল হরগোপালও। মুখ তুলে চারদিকে তাকাতে পারল এতক্ষণে।

চাপা গলায় মন্মথ বললেন, এদের কী কমু হে হরগোপাল ?

পছন্দ হইয়া থাকলে হেইটাই কইয়া দেন।

মন্মথনাথ মহেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন, মাইয়া তো পছন্দেরই। আমার আপত্তি নাই। তবে আমার স্ত্রী একবার দেখব। হেইটাই ফাইন্যাল।

প্রাক্তন খেলোয়াড় মধুসূদন আচমকাই বলে বসলেন, আইজ্ঞা। এই বার দাবিদাওয়ার কথাটা যদি কন। মাইয়া পছন্দ হইলে পাটিপত্র তো করতে হইব।

মন্মথনাথ অকূল পাথারে পড়লেন। কারণ তাঁর শ্যালক হরগোপাল ঘোরতর পণবিরোধী লোক। সে বলেই দিয়েছে যে, দেনা-পাওনার ব্যাপার থাকলে সে এই বিয়েতে উপস্থিত থাকবে না। ওদিকে মন্মথনাথের স্ত্রী সবিতা জেদ ধরেছেন, আর কিছু না হোক, ছেলের বিলেত যাওয়ার ভাড়াটা ওদের দিতেই হবে। মন্মথনাথের বিলেত যাওয়ার খরচ তাঁর শ্বশুরমশাই দিয়েছিলেন।

মন্মথনাথ চাপা গলায় বললেন, হরগোপাল, তোমার দিদি যে একখান কথা কইয়া যাইতে কইছে, কমু নাকি ?

কী কথা মন্মথনাথবাবু ?

পণটন না। পোলাটার বিলাত যাওনের তো একটা মোটা খরচা আছে। হেইটা যদি চাওন যায় ?

হরগোপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পোলা আপনের, বিয়া আপনি দিত্যাছেন, আমারে জিগান ক্যান ?

তুমি যে মরালিস্ট।

আমার কথা বাদ দেন। যা কওনের কইয়া লন। আর দেরি করা ঠিক না।

তোমার আপত্তি নাই তো !

আমার আপত্তি শুইন্যা তো জগৎসংসার চলে না।

মন্মথনাথ দ্বিধায় পড়লেন। সবিতা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, বিলেত যাওয়ার খরচ চাই-ই চাই। দানসামগ্রীর কথাও আছে। তবে সেটা সবিতাই বলবেন।

মন্মথনাথ একটু ব্যারিস্টারি বুদ্ধি প্রয়োগ করে বললেন, আপনারা কী দিবেন ?

মধুসূদন বললেন. আইজ্ঞা আমরা আর কী দিতে পারি কন ? তবে পাত্রীর ঠাকুমা আর দিদিমা কিছু সোনাদানা দিব। ষাইট সত্তর ভরি ধইরা রাখেন। খাটপালঙ্ক তো আছেই। নগদ যদি চান—

মন্মথনাথ চোখ বুজে বললেন, ভাল কথা। এর উপরে আর চাওনের মইধ্যে থাকে আমার পোলার বিলাত যাওনের খরচটা। হেইটা যদি—

মধুসূদন আর মহেন্দ্রনাথ পরস্পরের দিকে একটু তাকাতাকি করে নিলেন। মধুসূদন বললেন, আমাগো আপত্তি নাই। কথা কি একরমক পাকা বইলাই ধইরা লমু ?

মন্মথনাথ উদার হাস্যে বললেন, আমরা হইলাম ঢাকের বাঁয়া। হেড অফিস হইল পোলার মা। তবে মাইয়া যা দেইখ্যা গেলাম তাইনেরও অপছন্দ হইব না। পরশু তরশুর মইধ্যেই তাইন আইস্যা দেইখ্যা যাইবেন।

হরগোপাল নীরবে মাথা নিচু করে বসে ছিল। পরাজয়টা সে টের পাচ্ছে। গভীরভাবেই পাচ্ছে। কিন্তু ছেলে তার নয়। তার অধিকার নেই বাধা দেওয়ার। সে বড়জোর নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে।

মন্মথনাথ কিন্তু খুশি। মেয়ে পছন্দ হয়েছে, দাবিদাওয়ার ব্যাপারে বাধা হয়নি। শুধু হরগোপালের জন্য মনটা একটু খচখচ করছে বটে। এই মর‍্যালিস্ট শালাটি খুশি হল না। হয়তো বিয়েতেও উপস্থিত থাকবে না। কিন্তু সব দিক কী আর সব সময়ে রক্ষা করা চলে ?

মন্মথনাথ উঠবেন বলে চৌকি থেকে পাম্পশুর দিকে পা বাড়িয়েছেন, ঠিক এই সময়ে অন্দরমহল থেকে একটি দাসী গোছের মেয়েমানুষ ব্যস্তসমস্ত পায়ে এসে মধুবাবুর কানে কানে কিছু বলল। গোপনেই বলা। তবু কথাটা দুজনেই আবছা শুনতে পেলেন। ভিতরবাড়িতে কে যেন মূর্ছা গেছে।

মধুসূদন অবশ্য বুদ্ধিমান লোক। কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। মহেন্দ্রনাথও স্থির। শুধু ভাই

নয়, মধুসূদন এবং আরও কয়েকজন মিলে তাঁদের ঘাট অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

নৌকা যখন ছাড়ছে তখন সন্ধের মুখে দিগন্তে চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় নদী যেন রূপকথায় নিয়ে চলল।

ঘাটে তখনও পাত্রী পক্ষ দাঁড়িয়ে। নৌকো একটু তফাত হতেই মন্মথ উদ্বেগের গলায় বললেন, মাইয়ার কি মৃগী আছে নাকি হে ?

কইতে পারি না ?

কথাটা শুনছ ?

শুনছি।

টেনশনে ফালাইয়া দিল। মাইয়ালোকটা আইয়া কারকথা কইল কও তো ! মনে হয় মাইয়ার কথাই।

হইতে পারে।

মৃগী ` তো ডেনজারাস জিনিস। যখন তখন মুখ ভ্যাটকাইয়া পইড়া থাকব। না হে, ভাল কইরা খোঁজ না লইয়া এই সম্বন্ধ তো করন যায় না।

আইজ্ঞা।

তুমি বরং ঘটকরে পাঠাইয়া না কইরাই দাও। আমি ভাল বুঝত্যাছি না।

আইজ্ঞা।

হরগোপালের খুব নিরুত্তাপ লাগছিল। চারদিকে এমন জ্যোৎস্না, এত অপার্থিব সৌন্দর্য যে মনে হয়, মানুষের আর কী চাই ? ভগবানের এত ঐশ্বর্য চারদিকে ছড়ানো, মানুষ আর কীই বা চাইতে পারে ?

ফেরার সময়টায় কথাবার্তা প্রায় হলই না। মন্মথবাবু একটু গুম হয়ে আছেন। হরগোপাল বড়ই আনমনা। অলকার যে মৃগী নেই তা হরগোপাল জানে। কিন্তু সেই জানাটা মন্মথবাবুকে জানানো যায় না। অলকা কেন অজ্ঞান হয়ে গেছে তা হরগোপাল না জানলেও আন্দাজ করতে পারে। আজ এই অঝোরধারার জ্যোৎস্না, এই নদী, এই মুক্ত পৃথিবী তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলছে।

মাস দুয়েক আগেকার কথা। তাকে এক সকালবেলা মধুসূদন 'কল' দিতে এসেছিলেন। বললেন, আমার ভাস্তির বড় অসুখ। একবার চলেন।

হরগোপাল মিষ্টি হেসে বলল, অন্য ডাক্তার দেখান গিয়া।

মধুসূদন অবাক হয়ে বললেন, ক্যান, আপনে যাইবেন না ?

আইজ্ঞা না। আমি মাইয়ালোক রুগী দেখি না।

কন কী ডাক্তারবাবু ? এই রকম তো শুনি নাই।

আইজ্ঞা মাপ করবেন।

মশয়, রুগী ইজ রুগী। তার আবার মাইয়ালোক পুরুষ বাছবিচার কিসের ? আপনে তো আইচ্ছা লোক দেখত্যাছি। ব্রহ্মচারী নাকি মশয় ?

তাও কইতে পারেন।

মধুসূদন কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকলেন তার দিকে। তারপর নরম হয়ে বললেন, দেখেন হরগোপালবাবু, আমার ভাস্তিটার কঠিন অসুখ। মেলা ডাক্তার দেখাইছি, কাম হয় নাই। আপনে এই এলাকার বড় ডাক্তার। রুগী যদি চিকিৎসাবিভ্রাটে মরে তবে আপনের পাপ হইব।

বেশ কিছুক্ষণ কথার পিঠে কথা। আকচাআকচি। তারপর একটা শর্তে রাজি হল হরগোপাল রুগীর মুখ দেখবে না। রুগী ছোঁবে বটে তবে সার্জিক্যাল গ্লাভস হাতে পরে।

এই কিম্ভূত প্রস্তাবে মধুসূদনের বাড়ির লোক অবাক। তবে তারা হরগোপালের শর্ত মেনেছিল।

অলকার বিছানার এক পাশে পর্দা টেনে তাকে আড়াল করা হয়েছিল। হরগোপাল নাড়ি দেখল এবং স্টেথসকোপ লাগাল সার্জিকাল গ্লাভস পরা হাতে। জিবের রং কেমন তা মায়ের কাছে জেনে নিল। হরগোপাল বিচক্ষণ ডাক্তার। তার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করতে অলকার দেরি হয়নি। কিন্তু বিপদটা হয়েছিল তার ওই নারী বিষয়ক ছুঁৎমার্গ থেকেই। এমনিতে হয়তো কিছুই হত না, কিন্তু ওই যে তার ভয়ঙ্কর শুচিবায়ু এবং ব্রহ্মচর্য ওইটেই অলকাকে পেড়ে ফেলেছিল বোধহয়।

মাত্র ষোলো বছরের মেয়েদের পছন্দ অপছন্দ তৈরি হওয়ার কথা নয়। পছন্দের কথা প্রকাশ করা তো আরও সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। তবু অলকা তার সখীদের মারফত এবং খুড়তুতো জ্যেঠতুতো বোনেদের মাধ্যমে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল অভিভাবকদের কানে। কারও অমত হয়নি। কিন্তু যে-মানুষ নারীমুখ দর্শন করে না তাকে বিয়েতে রাজি করানো কি সোজা কথা ?

মধুসূদন কদিন পরেই আবার এক সকালে তার চেম্বারে হানা দিলেন। ধানাইপানাই নানা কথা। তারপর এক ফাঁকে তাঁর ভাইঝির কথাটা তুললেন। ভাইঝির জন্য একটি ভাল পাত্র চাই বলে কথাটা পাড়লেন। একখানা ফটোও ধরিয়ে দিলেন হাতে। নারীমুখ না দেখলেও হরগোপাল মেয়েদের ফটোর দিকে তাকাতে তেমন আপত্তি করে না। ফুটফুটে মুখখানা কিন্তু প্রথমেই একটা ধাক্কা দিয়েছিল হরগোপালকে । সচরাচর এত সুশ্রী কমনীয় মুখাবয়ব দেখা যায় না। এ মেয়ের যে সুপাত্রের অভাব হবে না তা সে একঝলক ফটোটা দেখেই বুঝেছিল। বলেছিল, ঠিক আছে, দেখুম। সুপাত্রের সন্ধান পাইলে জানামু।

আশ্বাস পেয়েও মধুসূদন বসে রইলেন। তারপর খুব সন্তর্পণে কথাটা তুললেন।

হরগোপাল অবাক হল না। কারণ সে অতীব সুপুরুষ, ধনীপুত্র এবং কৃতী ডাক্তার বলে মেয়েদের দিক থেকে এরকম আগ্রহ এর আগেও বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। সে শুধু সংক্ষেপে বলেছিল, ভাস্তিরে বুঝাইয়া কইয়েন যে এইটা সম্ভব না।

ফের কিছুক্ষণ অনুনয়বিনয়, বোঝানোর চেষ্টা। ব্যর্থমনোরথ হয়ে মধুসূদন ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু বিপদ দেখা দিল অন্য দিক দিয়ে। যে-ধাক্কাটা ফটো দেখে হরগোপালের বুকে লেগেছিল সেটাই নানা বিভঙ্গে বারবার তাঁর বুকের মধ্যে তরঙ্গ তুলতে লাগল। ফটোটা বারকয়েক গোপনে পাপকার্য করার মতো মনে নিয়ে দেখল সে। বুকে ধড়ধড়ানির মতো একটা ব্যাপার হতে লাগল।

সবচেয়ে বড় কথা, ব্যাপারটা প্রশমিত হল না। লাবণ্যকে নিয়ে চিন্তা করলে যেমনটা হত এটা তার চেয়েও খানিকটা বেশিই । এটা টের পাওয়ার পর থেকেই হরগোপাল এত ভয় পেয়ে গেল যে তার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।

ও দিকে মধুসূদনের আনাগোনার বিরাম নেই। তিনি নানাভাবে তাকে ভজানোর চেষ্টা করেন। আর কেবল বলেন, ভাইব্যা দ্যাখেন হরগোপালবাবু, ভাইব্যা দ্যাখেন। আমার ভাস্তিটার অবস্থা দেখলে আপনার চোখে জল আইব। বড় ভাল মাইয়া। আপনের ভিতরে যে কী দেখছে হে-ই জানে।

গত দু মাস হরগোপাল শান্তিতে নেই। মাত্র কয়েকদিন আগে দিদি আর ভগিনীপতিকে আনিয়েছে সে। তাঁরা ছেলের জন্য কলকাতা এবং অন্যত্র পাত্রী দেখছিলেন। হরগোপালের চিঠি পেয়ে এসেছেন। বিয়েটা একবার হয়ে গেলেই যে অশান্তিটা মন থেকে চলে যাবে এতে হরগোপালের সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু বোকা মেয়েটা বাধ সাধল। ভালয় ভালয় প্রথম দফাটা কাটিয়ে দেওয়া গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু মেয়েটা অজ্ঞান হওয়ায় আর দাসীটা এসে বৈঠকখানায় খবরটা দেওয়ায় সবই ভণ্ডুল হয়ে যায় বুঝি !

ওহে হরগোপাল।

কন।

মুখে যে পিঠালি দিয়া বইস্যা আছ ! কিছু কও।

কী কমু ?

কিছু একটা কও। আইজকার দিনটা হরিষে বিষাদে গেল।

ক্যান ?

মাইয়াটা দেইখ্যা বড় পছন্দ হইছিল হে। তোমার দিদিরও হইত। কিন্তু মৃগী রোগই পথ আটকাইল।

আইচ্ছা।

হরগোপাল ফের চুপ মারল। বিয়েটা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ায় তার মনটা কি খুব খারাপ ? হ্যাঁ, একটু খারাপ বৈকি ! আবার যেন বুকটা একটু হালকাও লাগে। কেন লাগে কে জানে ! হরগোপালও হরিষে বিষাদে চেয়ে জ্যোৎস্নায় বিধৌত চরাচরের দৃশ্য দেখছিল। পৃথিবীর রহস্য সে বোঝে না, নিজের ভিরতকার রহস্যকেও সে চেনে না।

হরগোপাল।

কন।

অখন হঠাৎ মনে পড়ল। তুমি মাইয়াটার দিকে চাও নাই ঠিকই, মাইয়াটা কিন্তু তোমার দিকে চাইয়া আছিল।

ঠিক এই সময় ঝুমক হাঁক দিল, ঘাট আইয়া পড়ছে কর্তা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টলটলায়মান নৌকোয় উঠে দাঁড়াল হরগোপাল। তারপর বলল, আইচ্ছা মন্মথবাবু, একটা প্রতিমার বিসর্জন না হইলে আব একখান প্রতিমার বোধন হয় নাকি ?

না হে হরগোপাল, তা ক্যামনে হয় ?

নৌকোয় বইস্যা হেই কথাটাই ভাবতাছিলাম।

মন্মথবাবুর নড়া ধরে ঘাটে তুলে আনল হরগোপাল। মন্মথবাবু একটু হাঁফ ধরা গলায় বললেন, তা হইলে কথাখান ভাবলা ?

ভাবলাম।

বুদ্ধিমান ব্যারিস্টার মৃদু হেসে বললেন, পুরানা প্রতিমা রাইখ্যা কাম কী ? বিসর্জন দিয়া ফালাও।

দিতে হইবে না। বিসর্জন হইয়াই গেছে।

বাইচ্যা গেলা হে হরগোপাল, বাইচ্যা গেলা।

বাঁচলাম না মরলাম হেইটা কইতে পারি না।

দুইজনে গাঁয়ের রাস্তায় জ্যোৎস্নার আলোয় হাঁটতে লাগলেন।

বে হা লা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

লাগদাই ফ্ল্যাট। তিনতলায়। পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, তিন দিক হাওদা খোলা। চিরকালই খোলা থাকবে। একদিকে রাস্তা, আর একদিকে খেলার মাঠ, আর একদিকে জলা। প্রচুর আলো বাতাস। মোজাইক করা ঝকঝকে মেঝে। শাটিনের মতে দেয়াল। দুটো ঝুল-বারান্দা। বিলিতি কায়দার

রান্নাঘর। দুটো বাথরুম, একটা বিলিতি, একটা দিশি। বিলিতিটা আমি চাইনি। জোর করে চাপানো। আজ আপনার হাঁটু মুড়ছে, উবু হয়ে ভিখিরির মতো বসতে পারছেন। আফটার ফিফটি বাতে ধরবে। অ্যাট সিকসটি ঘোড়া। তখন কমোডে বসতেই আক্কেল গুড়ুম। বাঙালি হয়ে জন্মেছেন, মুখের বাত আর হাঁটুর বাত যাবে কোথায় ! অম্বল আর ব্রংকাইটিস। হাই সোসাইটির ক্রিমি এলাইটরা কী করে জানেন ! ভারী ধরনের প্রবন্ধের বই নিয়ে আরামসে বসেন। এদিকে রিডিং আর ওদিকে রেডিং। সেই যুগ, সেই কালচার আর নেই। মাথায় ছাতা, হাতে গাড়ু, কোয়ার্টার মাইল হাঁটো। বাড়ির ত্রিসীমানায় ল্যাট্রিন থাকবে না। অস্বাস্থ্যকর। এখন অ্যাটচড। খাট থেকে পা বাড়ালেই কমোড। একদিকে এই, আর একদিকে ডাইনিং স্পেস। এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ।

জীবনে এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবে কে জানত ! ভবিষ্যৎকে আমরা বলি অন্ধকার, কিন্তু সেখানে আলোও থাকতে পারে, হাজির হলে তবেই দেখা যায়। এক জোতিষী বন্ধু ট্রেনে যেতে যেতে হাত দেখে বলেছিল, তোর জীবনে বড় বড় সব ব্যাপার ঘটবে, এখন বুঝতে পারবি না, বয়েসটা পঁয়ত্রিশ পেরোতে দে, ফাটাফাটি হয়ে যাবে। শূন্য থেকে পূর্ণ হবে। ভাল কতা বললে কার না ভাল লাগে, ঝালমুড়ি খাইয়ে দিয়েছিলুম।

পুরনো বাড়ির নির্বাচিত জিনিসপত্র নতুন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে। এক প্রস্থ গেছে, পরের প্রস্থ যাবে, তারই তোড়জোড় চলছে। আমার বউ শিখা এখন সেই কাজেই হুড়ুম-দুড়ুম করছে। আমাকে বিয়ে করে যত না আনন্দ হয়েছিল, নতুন ফ্ল্যাট হওয়ায় তার চেয়ে বেশি আনন্দিত। একটা মেয়ে যখন একটা ছেলেকে বিয়ে করে, তখন ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি। ছেলেটা ভাবে মালাটা বুঝি আমার গলাতেই দুলল ! আজ্ঞে না। ছেলের পেছনে, যে সম্ভাবনা রয়েছে সে-ই প্রকৃত স্বামী—চাকরি, প্রোমোশান, বাড়ি, গাড়ি, ইনসিওরেন্স, এন এস আই, ইউনিট ট্রাস্ট। মন্ত্রী হতে পারলে তো কথাই নেই। মন্ত্রীদের টাকা হাওয়ায় উড়ে আসে, যার নাম হাওলা। মন্ত্রীর স্ত্রী সমাজসেবিকা হতে বাধ্য—নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা। অতটা যেতে পারিনি। বক্তৃতা আমার আসে না। বার কয়েক বন্ধুগণ, বন্ধুগণ বলে ভিরমি খাব। যেটুকু হয়েছে সেইটুকুতেই শিখা উৎফুল্ল। লো প্রেশার, শরীর ঢ্যাস ঢ্যাস সব সেরে গেছে। যখন কপাল ঠুকে, জয় মা বলে ঝুলেছিল, তখন আমি প্রায় বেকার, গোটাকতক টিউশানি সম্বল। অনেকটা জমি কেনার মতো। পোড়ো জায়গা, কাঠা পাঁচ হাজার যাচ্ছিল। কাঠা চারেক কিনে রাখো। হঠাৎ ডেভোলাপমেণ্ট স্কিমে রমরমা, দাম চড়ল দেড় লাখে। জীবন স্রেফ জুয়া খেলা। কোই জিতা, কোই হারা, বড়ে মজা আ গিয়া, শুনো চম্প ! শিখার বাবা যখন আমাকে কিনেছিলেন তখন আমার দর ছিল পাঁচ হাজার, এখন আমি লাখ ছাড়িয়ে গেছি।

পুরনো বাড়ির জাম্বো খাটের তলা থেকে একে একে টুকরোটাকরা সব জিনিস টেনে টেনে বের করা হচ্ছে। কিছু ফেলা হবে, কিছু নিয়ে যাওয়া হবে। খাটের তলা এমন এক ডার্কেস্ট আফ্রিকা যেখানে লিভিংস্টোনকে ছেড়ে দিলেও আর বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাবেন না।

খাটের তলা থেকে অদ্ভুত চেহারার লম্বাটে একটা বাক্স বেরিয়ে এল। রেকসিনের আবরণ ঘষা লেগে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। এক পুরু ধুলো জমে আছে। আরে ! এই তো সেই বেহালাটা। এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলুম।

দাও দাও, ওটা আমাকে দাও। বাবার সেই বেহালাটা। এটা খাটের তলায় পড়ে আছে !

শিখা বললে, তাই তো দেখছি। কে ঢোকালে এখানে ?

হয় তুমি, না হয় আমি।

তুমিই রেখেছিলে, এখন ভুলে গেছ।

বাক্সটাকে নিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে এলুম। ধুলো ঝেড়ে ডালাটা খুলতেই বেহালার সঙ্গে

বেরিয়ে এল জীবনের দূর অতীত। বিলিতি পালিশ এখনো ঠিক আছে। ছড়িটাও অক্ষত। রবিবারের সকাল, বাইরে জমকাল রোদ। নীচের কলে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। পাশের বাড়ির প্রভাতবাবু তারস্বরে মন্ত্র পড়ছেন।

এই সেই বেহালা। একটা শীর্ণ হাত দেখতে পাচ্ছি। ছড় টেনে কান্নার স্বর তুলছেন। মা শুয়ে আছেন মৃত্যুশয্যায়। মাথার কাছের টেবিলে একটা প্রেসক্রিপশান। ওষুধ কেনার পয়সা নেই। প্রেসক্রিপশানের জোরেই মা ভাল হবেন। আমার বেহালাবাদক পিতার সেই রকমই ধারণা। কলকাতায় তিনি রবিন মাস্টার নামেই খ্যাত ছিলেন। মাঝরাতে বারান্দায় বসে যখন দরবারি কানাড়ায় আলাপ ধরতেন আমার চোখে জল এসে যেত। কানায় কানায় চাঁদের আলো, গাছে গাছে জরির পাতা, দু-একটা পাখির ভুল করে ডেকে উঠে লজ্জায় নীরব হওয়া। আমি তখন ছাত্র। ক্লাস টেনে পড়ছি শ্যামানন্দ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে। বাড়ি থেকে এক মাইলের পথ। রোজ দু মাইলের পথ। সব দিন পেটে তেমন দানা-পানি থাকত না, দুর্বল দুর্বল লাগত। আবার কষ্ট করতে পারছি বলে আনন্দও হত। ধনীদের প্রাচুর্যে আনন্দ থাকতে পারে, গরিবের কষ্টে ঈশ্বর আছেন এই বোধ হত। আমার সঙ্গে কেউ তেমন বন্ধুত্ব করত না। আমার বন্ধু ছিল গাছ, পাখি, ঘাস, আকাশ। আমাদের সংসারটা ছিল প্রেমের। আমার মা খুব ভাল নাচতে পারতেন। বাবার সঙ্গে থিয়েটারে আলাপ হয়েছিল। বাবা তখন পড়তি জমিদার-বংশের ছেলে। সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, আঙুলে হীরের আংটি। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা লম্বা চুল। খাড়া নাক, ফর্সা রঙ। বুকের কাছে বেহালা ধরে নাটকের গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন। বিয়োগান্ত দৃশ্যে বেহালায় বেহাগে কান্না ঝরাতেন। মাঝে মাঝে দিন কয়েকের জন্যে উধাও হয়ে যেতেন মাইহারে গুরুর কাছে। এসবই আমার জন্মের আগে।

আমি যেই এলুম, দিন ফুরল ফর্সা হল সাঙ্গ হল পালা। শুরু হল অভাবের দিন, সাধনার রাত। দুঃখে থাকলে দুঃখটা স্বভাবে চলে আসে। আমার খুব মজা লাগত। খিদে পাচ্ছে, খাবার কিছু নেই। ভোঁভাঁ রান্নাঘর। হতাশ বেড়াল শুয়ে আছে একপাশে। মা টেবিলে বসে চেষ্টা করছেন কবিতা লিখতে। আর্টিস্টদের তো উপোস করতেই হবে। গন্ধর্বের অভিশাপ। বাবা বেরিয়েছেন বেহালা হাতে সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে বাজিয়ে যদি কিছু কামাই হয়।

বাবা খুব মাংস খেতে ভালবাসতেন। হাতে পয়সা এলেই মাংস আসত, মা খুব কষে রাঁধতেন। গন্ধে বাড়ি মাত। বাবা সব সময় সেজেগুজে খেতে বসতেন, যেন উৎসব হচ্ছে, ফুলদানিতে ফুল। আমার মাকেও সাজতে হত। মা খুব সুন্দরী ছিলেন। আলিবাবায় মর্জিনা সাজতেন। মা স্টেজে, বাবা উইংসে। রাত গড়াচ্ছে, পালা জমছে। শেষ দৃশ্যের, শেষ অঙ্ক, তারপর ড্রপসিন, হল খালি। পরিচালক, বাঘা অভিনেতা, অভিনেত্রীরা গাড়িতে উঠে গেল। দরজা বন্ধের শব্দ। স্টার্ট নেওয়ার শব্দ। কালো আকাশ, কালো রাস্তা, দোকানের শাটার বন্ধ, গোটা কতক কসমস ফুল, ময়রার দোকানে রসের ভিয়েন। মাতালের টালমাটাল। টানা রিকশার ঠুনঠান। বেহালা কোলে বাবা, পাশে মর্জিনা। মেকআপের কিছুটা উঠেছে, কিছুটা ওঠেনি, পলস্তারা খসা ডল পুতুলটি। পেরিয়ে গেল হাতিবাগান, পড়ে রইল শ্যামপুকুর। এসে গেল কাঠচেরাই কল। কী খাওয়া হবে। মা বললেন, রাতে আমার আর কিছু দরকার হবে না, সেই একটা ভেজিটেবল চপ খেয়েছিলুম, পেটে গিয়ে ফুলছে। একেবারে টাই হয়ে আছে। বাবা বললেন, আমারও সেই একই অবস্থা, সন্ধে থেকে সাত ভাঁড় চা ছলাত ছলাত করছে, ঠিক যেন বর্ষাকালের ডোবা।

না খাওয়ার সঙ্গে দুজনের কী সমঝোতা। যত না খাওয়া যায়। সব সঞ্চয় করে ছেলেটাকে মানুষ করো। আমরা ভুল পথে চলে এসেছি। ও যেন ঠিক পথে যেতে পারে। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। ওর জীবনেই বেঁচে থাকবে আমাদের নাম।

পুরনো জমিদারি আমলের একটা ড্রেসিং টেবল ছিল। আয়নার মাথায় এক জোড়া পরী উড়ছে।

রাত বারোটার সময় মা সেই আয়নার সামনে বসে চুল খুলছেন, কাঁটা, ক্লিপ, ফিতে, রিবন। কপালের টিপ। ঘুম ঘুম চোখে শুয়ে শুয়ে দেখছি। যেন রূপকথার কোনও রাজকুমারী সাজঘরে বসেছেন। একটু পরেই রাজদরবারে নাচ শুরু হবে। আমার পিতা রাজবেশ পরে রাজসিংহাসনে বসবেন। রাজদণ্ড হাতে পাশে তটস্থ থাকবেন মহামন্ত্রী। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে কোটাল, মুখে ঝুলকালি, হাতে ঝকঝকে খাঁড়া।

এইসব ভাবতে ভাবতে আমি একটু একটু করে ডুবে যেতুম গভীর ঘুমের নীল সরোবরে। আধো ঘুম, আধো জাগরণে কানে ভেসে আসত নানারকম টুকরোটাকরা শব্দ। চিং করে মায়ের গোল গোল হাতের চুড়ির শব্দ। বাথরুমের কাছে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে বাবার আপন মনে গান, 'মন চল নিজ নিকেতনে'। এই গানটা বাবা প্রায়ই গুনগুন করতেন। এই গানের দুটো লাইন আমার ভীষণ ভাল লাগত— সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম/শ্রান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম/পথভ্রান্ত হলে শুধাইবে পথ সে পান্থনিবাসিগণে/যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার/প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার/সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে। আমি মনে মনে ভাবতুম, রাজা হলেন আমার বাবা, রানী আমার মা।

ভোরবেলা একটা মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বইত। বাবার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসতুম বাগবাজারের বিচিলিঘাটে। এরই আশেপাশে কোথাও ছিল ভোলা ময়রার বাড়ি— আমি সে ভোলানাথ নই রে, আমি সে ভোলানাথ নই/আমি ময়রা ভোলা হরুর চেলা, বাগবাজারে রই।। এরই কিছু দূরে ছিলেন বাঙলার বিখ্যাত নট ও নাট্যকার ভক্ত গিরিশ। বাবা এঁদের কথা রোজই বলতেন ঘাটে দাঁড়িয়ে। বলতেন অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির কথা, নিধুবাবুর কথা। বলতেন রূপচাঁদ পক্ষীর কথা। বাবা বর্তমানে অল্পক্ষণই থাকতেন। বেশির ভাগ সময়েই থাকতেন অতীত ইতিহাসে অথবা সুরের সুরলোকে, গন্ধর্ব, কিন্নরদের দেশে।

বাবার কাপড়, গেঞ্জি পাঞ্জাবি ধরে আমি ঘাটের শেষ পইঠাতে দাঁড়িয়ে আছি, বাবা হুস হুস করে স্নান করছেন। গৈরিক গঙ্গা নৌকো বোঝাই হলুদ বিচিলি, নীল পাল, জেলেদের জালে রুপোলি মাছ মাজা ঝকঝকে আকাশ। বাবার টলটলে মুখ, জলসিক্ত, বিষয়বুদ্ধির ছিটোফোঁটাও সে মুখে নেই। তারপর হাত জোড় করে গম্ভীর গলায় ওঁকার স্তোত্র পাঠ করতেন—

> সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বনিচ যদ বদন্তি।
> যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।।

ঘাটে যাঁরা বেড়াতেন, জলে যাঁরা স্নান করতেন, এমন কী নৌকোর মাঝিরাও আমার বাবার এই স্তোত্রপাঠ শুনে মুগ্ধ হতেন। বাবা মানুষকে শোনাতেন না, শোনাতেন আকাশকে, উদিত সূর্যকে, নদীর তরঙ্গকে। বাড়িতে গুনগুন করে যে গানটা মাঝে মাঝেই গাইতেন সেইটাই ছিল তাঁর মনের কথা—

> যতই কেন হোক না মধুর এ গান তো কেউ শুনবে না,
> যতই গানে করুক ব্যথা কারো হৃদয় গলবে না।
> গান শোনাবি তাঁকে যিনি দিন দুনিয়ার কাণ্ডারী,
> তিনিই যে তোর সকল গানের, সকল সুরের ভাণ্ডারী।।

এই গানটি আমার বাবা তাঁর কালের এমন এক শিল্পীর কাছে শিখেছিলেন, যাঁর কোনও তুলনা ছিল না। তিনি ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। গিরিজাশঙ্করের এক নম্বরের ছাত্র, দিলীপচাঁদ বেদীর প্রিয় শিষ্য। আমি তাঁকে দেখেছি। ঘন্টার পর ঘন্টা গান শুনেছি। অমন খেয়াল, ঠুংরি, রাগপ্রধান, ভক্তিমূলক গান আমি দ্বিতীয় আর কারও কণ্ঠে শুনিনি। তিনি ছিলেন গীতিকার, সুরকার। ফর্সা টকটকে রঙ, এতখানি নাক, বড় বড় চোখ, বড় বড় চুল। কিন্তু আমার বাবার মতোই সত্যবাদী, আদর্শবাদী হওয়ার

জন্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাননি। সেই ভয়ঙ্কর অভিমানে তিনি গান লিখতেন, সেই গানে জুড়তেন হৃদয় নিঙড়ান সুর।

শিল্পীমনের বেদনা নিঙাড়ি
যে গান রচিনু হায়।
সে গান আমার ধনীর সভায়
আসন নাহি যে পায়।।

দরবারিতে বেঁধেছিলেন। বাবা সঙ্গে বেহালা বাজাতেন। আজকের কজন মানুষ এই শিল্পীর নাম জানেন ! জহর মুখোপাধ্যায়ের নাম কেউ মনে রেখেছেন ! আমার বাবা রবিন মাস্টারের নাম কেউ শুনেছেন !

বাগবাজারের ঘাট থেকে ফেরার সময় আমরা বাজারে ঢুকতুম, বাজার করতে নয় দর্শন করতে। সে খুব মজার ছিল। সবাই কিনছে, আমরা দেখছি। বাবা বলছেন, বেগুন দেখ, বেগুন দেখ, এর নাম এলোকেশী, তেল চুকচুকে। পুড়িয়ে খেতে পারিস, সেঁকে খেতে পারিস, আর ফুলকো লুচির সঙ্গে ভেজে। লকলকে সজনে ডাঁটার শোভা দেখেছিস ! সরষে বাটা দিয়ে গা-মাখা ঝাল যা জমবে ! মাছেব বাজারে ঢুকে অবাক হয়ে দুজনে দেখছি—ফলুই মাছ জলভরা ডাব্বায় তুড়ি-লাফ মারছে। রুপোব থোলো তবক দিয়ে মোড়া। বিশাল রুই মাছের আরক্ত চোখ। লাল মাগুর কিলবিল করছে। ফলেব বাজারে থোলো আঙুর ঝুলছে। খরমুজা যেন ডোরাকাটা জামা পরেছে। সব দেখাদেখি হওয়ার পব বাবা কিনলেন বেগুন, কাঁচালঙ্কা, নিমপাতা আর আলু। ফেরার পথে সেদিনের মেনু ঠিক হয়ে গেল, নিম-বেগুন ভাজা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাখা আলুভাতে, আর মুগের ডাল, ফার্স্ট ক্লাস, তোফা। বাত্তিবে রুটি, বেগুন ভাজা। বাগবাজারের বিখ্যাত তেলে-ভাজার দোকান থেকে প্রায়ই ফুরুলি কেনা হত। এক জোড়া বহুক্ষণ পেটে থাকত।

আমাদের ভাল চান, এমন এক ভদ্রলোক বাবাকে একটা চাকরি ঠিক করে দিয়েছিলেন। দিন তিনেক করার পর, একদিন সকালে মাকে ছলছলে চোখে বলছেন, 'বুঝলে, সে কী দাসত্ব ! বাইরের শরীরটা ঠিকই রইল, ভেতরটা কুঁকড়ে-মুঁকড়ে দলাপাকানো কাগজের মতো হয়ে যায়। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি না, চোখ তুলে তাকাতে পারি না। আমি আর চাকরি করব না সুধা।'

মা বলেছিলেন, 'যাক বাবা, ভালই হয়েছে। আমি ভাবলুম, তোমার বুঝি টাকার লোভ হয়েছে। মাথা হেঁট করে বিরিয়ানি খাওয়ার চেয়ে মাথা উঁচু করে উপোস করাও ভাল।'

বাবা আনন্দ-ঝলসানো মুখে বলেছিলেন, 'যাক বাবা, আমার খুব ভয় ছিল। ভেবেছিলুম, তুমি বলবে, বাঁধা মাস মাইনের চাকরি তোমার ওই বেহালার চেয়ে অনেক অনেক ভাল।'

মা বলেছিলেন, 'তা কেন ? আমার ইষ্ট যে জননী সারদা। ঠাকুর যখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে সংসারের পথে টেনে লয়ে যেতে এসেছ ? মা বলেছিলেন, তা কেন, আমি তোমার ধর্মপথেব সহায় হতে এসেছি।'

বাবা আর চাকরি করবেন না জেনে আমারও খুব আনন্দ হয়েছিল। না হয় কম খাব, সাজ-পোশাকের বিলাসিতা নাই বা রইল, আমার বাবা প্রকৃত শিল্পী, শিল্পীর স্বাধীন জীবনই ভাল। সে দাস হবে কেন ?

বাবা তখন সবে আমাকে বেহালা শেখাবার চেষ্টা করছেন। যেই ছড়ি টানি, বিকট বেসুরো শব্দে নিজেই ঘাবড়ে যাই, 'আমার দ্বারা হবে না বাবা, অসম্ভব।'

'আলবাৎ হবে। হতে বাধ্য। আমাদের বংশের সকলের রক্তেই সুর আছে। বেসুরে সুর আনাটাই সাধনা। জীবন আর বেহালা দুটোই এক জিনিস। দাঁড়া আমি একটা রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজাই !'

গানটা আমার চেনা, আমার খুব প্রিয়—

সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে।।
উধাও আকাশ উদার ধরা সুনীল-শ্যামল-সুধায়-ভরা
মিলায় দূরে, পরশ তাদের মেলে না যে—
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে।।
বিশ্ব যে সেই সুরের পথের হাওয়ায় হাওয়ায়
চিত্ত আমার ব্যাকুল করে আসা-যাওয়ায়।
তোমার বসাই এ-হেন ঠাঁই ভুবনে মোর আর কোথা নাই
মিলন হবার আসন হারাই আপন-মাঝে—
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে।।

বাবা বাজাচ্ছেন। দু চোখ বেয়ে জল ঝরছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই গাইতে শুরু করলেন। তাঁর গলায় গানও আসত খুব ভাল। বিখ্যাত অভিনেতা জহর গাঙ্গুলি মশাই আমাদের সেই সাবেক বাড়িতে মাঝে মধ্যে আসতেন, বলতেন রবিন মাস্টার, তুমি গানটাও ধরো। গোটা কতক রেকর্ড বেরোক না ! তোমার আর একটা পরিচয় জানুক না সবাই।

জহরবাবু এলে বাড়িতে উৎসব লেগে যেত। কখনও কখনও দুই জহরে মুখোমুখি। দুজনেই পোস্ত খেতে ভালবাসতেন। আমার মা চুটিয়ে রাঁধতেন, যত বাঙালি খাবার। আর দেনাও একটু বেড়ে যেত। পরের দুদিন প্রায় উপবাস।

অনেক কসরতে বেহালাটা আমার যৎসামান্য আয়ত্তে এসেছিল। জীবিকার চাপে বাজাবার সময় পাই না, হাত নষ্ট হয়ে গেছে, ভালও লাগে না আর। চারপাশে আজকাল যে গান শুনি, তা গান নয়, গানের ভর্ৎসনা।

বুকের কাছে যন্ত্রটাকে ধরে ছড় টানলুম, বেসুরো আর্তনাদের মতো অদ্ভুত একটা শব্দ বেরলো। বহুদিন কেউ বাজায়নি। তার বাঁধা নেই। ছড়ির ছিলা শুকিয়ে গেছে। মানুষের মতো যন্ত্রেরও মৃত্যু হয়। বেহালার ডালাটা যেন একটা কফিন। বেহালাটা সুরের মৃতদেহ। হঠাৎ সেই ছড়াটা মনে পড়ল—

ক্যাঁকোর ক্যাঁকোর বেহালা
ওস্তাদজি মরে গেছে, বাজিবে তার কোন শালা !

গৃহপ্রবেশের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ হল। দরজার দুধারে পূর্ণঘট ও কলাগাছ। শোলার মালা। প্ল্যাস্টিক ইমালসান লাগানো দেওয়াল ঝকঝক করছে। নিমন্ত্রিত, অভ্যাগতরা আহারে বসেছেন। বসার ঘরে একটা নতুন ফার্নিচারের ওপর বাবার বেহালাটা। ফুল আর মালাটা পড়ার ফলে, পুরনো রঙচটা খাপটার জীর্ণদশা তেমন চোখে পড়ছে না। বাবার একটা ভাল ছবি কোথাও পাইনি। দোষটা আমার। আমি আমার জীবন নিয়ে এতটাই মশগুল ছিলাম, একটা সময়ে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, কে আমার বাবা, কে আমার মা ! জীবনের সাফল্য খুঁজেছি অর্থে, ক্ষমতায়। শৈশব আর যৌবনের দুর্ভোগ মেটাতে চেয়েছি, ভোগ, আরও আরও ভোগের পথে। আমার সংগ্রামী, আদর্শবান পিতা-মাতার কথা কদাচিৎ মনে পড়েছে।

আজ এই উৎসবের দিনে ওই জীর্ণ বেহালাটাই তাঁর কণ্ঠস্বর। কেউ শুনতে পাচ্ছে না, আমি শুনতে পাচ্ছি, অতীত, দূর অতীত থেকে মলয় বাতাসের মতো ভেসে আসা আমার পিতার কণ্ঠস্বর, 'কী রে খোকা ! সেই ভোগের পথই ধরলি। যে-পথে সবাই চলেছে, কোলা ব্যাং, সোনা ব্যাং, মুতো ব্যাঙের মতো থপথপ করে লাফাতে লাফাতে। কেউ কি জানে, পথের শেষে কে বসে আছে ! মৃত্যুরূপী অজগর মুখব্যাদন করে। সেই শ্বাসে গুটিগুটি এগোচ্ছে সবাই। ভাবছে বুঝি যাচ্ছে মহালোকে,

যাচ্ছে কিন্তু মহামরণের দিকে।

'যখন তুমি কলেজে পড়ছ, আর আমি বেহালা হাতে কলকাতার পথে পথে সুরের ফেরিঅলা হয়ে ঘুরছি তোমর শিক্ষার খরচ চালাবার জন্যে, যাত্রার আসরে, থিয়েটারের উইংসের পাশে অন্ধকারে, বড়লোকের বৈঠকখানায় কিয়ামৎ আলির বিশাল বপুর পিছনে, যখন তোমাকে বারে বারে বলতুম, এগিয়ে যা ব্যাটা জ্ঞানের পথ ধরে, অভাবের অন্ধকারের সঙ্গে একা আমি লড়ছি, বেহালার ছড়িটা আমার তরোয়াল, তখন তোমাকে আমি মুখস্থ করিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা, মনে কী পড়ে খোকা ?'

'কোন কবিতাটা ?

'ভুলে গেছ। আজ এই মহোৎসবের দিনে স্মরণ করো সেই কবিতা, যে কবিতাটি আমাব সমাধি থাকলে, ফলকে উৎকীর্ণ হত।'

কোন কবিতা ! সময়ের পথ ধরে হাঁটছি পেছনে। মৃত ঘটনার স্তূপ চারিপার্শ্বে। কিছু দগ্ধ, কিছু ভস্ম, কোথাও কিছু শুকনো ফুল, বিবর্ণ ঘাস, মুখের মুখোশ ! যাচ্ছি, যাচ্ছি, অতীতের অরণ্যে চলেছে ভীত বর্তমান। স্মৃতির আলো হাতে। বেশিটাই অন্ধকার, সামান্যই রোশনি। পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে খুঁজে পেলুম সেই কবিতা ! ঘোর দুর্দিনে সংসার টালমাটাল। চারিদিকে পাওনাদার। দিবারাত্র তাগাদা। বাবার বেহালায় সব সময় ভীমপলশ্রী বাজছে। সেই সময় বাবা এক রাতে আমাকে কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিয়ে গেছে। ঘরে একটা লণ্ঠন। মৃদু আলো। বাবা বলছেন। মেঝেতে মাদুর। পাশে বেহালা।

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা—
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।।

বাবা চারপাশে তাকাচ্ছেন। ফিসফিস করে বলছেন আমাকে, 'এই সময়ে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে।'

চা, চিনি, দুধ তিনটেই ঘরে নেই। আগামীকালের বাসভাড়াটা পকেটে ছিল। মনে মনে স্থির করলুম, হেঁটেই যাব। ওই পয়সায় তৈরি চা কিনে আনি। নিঃশব্দে উঠে গেলুম। মা সেই সময় বাড়িতে নেই। শখের থিয়েটারে অভিনয় করতে গেছেন। কেটলি হাতে সোজা দোকানে।

চায়ের কাপটা হাতে তুলে দিতেই বাবা অভিভূত। হাত কাঁপছে আবেগে। কাপ-ডিশের শব্দ হচ্ছে। আরামের একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'পৃথিবীতে সন্তানের মতো আপন কেউ নেই। বৃক্ষ থেকে ফল, ফল থেকে বীজ, বীজ থেকে আবার গাছ। আম থেকে আম, জাম থেকে জাম। এই হল চক্র।'

এরপরেই বাবা বললেন, 'অন্ধকারেই ভেসে চলেছি আমরা, অন্ধকারের দিকেই, কিন্তু ভেসে যেতে হবে জ্বলন্ত একটি প্রদীপের মতো। শোনো তাহলে আর একটি রবীন্দ্রনাথ—

বেহালা

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে-ধৌত অন্তরে অন্তরে
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

বাবার কণ্ঠস্বর কী দৃপ্ত। আপন আলোকে ধৌত। যুদ্ধক্ষেত্রে এক মহাযোদ্ধা।

অতীত থেকে বেরিয়ে এসেই দেখলাম, আমার ম্লান বর্তমান। শরীর আছে, আত্মা নেই।

মহিমবাবু রুমালে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকছেন। প্রবীণ মানুষ। আমার বাবার বন্ধু। অভিনেতা। শেষের দিকে তেমন যোগাযোগ ছিল না। বাবাই এড়িয়ে চলতেন। অস্বস্তি বোধ করতেন। এঁদের একটা ধারণা হয়েছিল, শত পাপ করেও গিরিশবাবু যদি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য হয়ে ভক্ত গিরিশ হতে পারেন, তাহলে আমরাও পারব না কেন ! অতএব যত পারো পাপ করো। মদ, মেয়েছেলে, জুয়া, রেস। পাঁচশো টাকায় পাঁচ থেকে এগারো সব সাইজের জুতোই পাওয়া যায়, তাহলে এগারোটাই কিনি, হলহল করুক ক্ষতি নেই। এঁরা সব পাঁচের পায়ে এগারো চড়িয়ে ঘুরতেন। কথায় কথায় গিরিশের উপমা টানতেন।

বললে, আমি মাছ, মাংস ছেড়ে নিরামিষ ধরেছি। সাত্ত্বিক হয়েছি। ঠাকুর বলছেন, আরে না, দাঁতে আর সেই জোর নেই। বয়েস হয়েছে, হাড়-মাস আর তেমন চিবোতে পারে না। দাঁতের ফাঁকে ঢুকে যায়, কাঠি দিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে হয়। হজমও তেমন হয় না, অনেকক্ষণ ঢেঁকুর মারে।

মহিমবাবুও এখন অনুরূপ সাত্ত্বিক। অভিনয় করতে পারেন না, অবস্থা পড়ে গেছে। বেশি বয়সে, থিয়েটারের এক কমবয়সী পার্শ্ব অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর যৌবন ভাঙিয়েই বেশ কিছুকাল চালিয়েছিলেন। দুটি সন্তানও হয়েছিল। তারা এখন পয়লা নম্বর মাস্তান। বাপকে কেয়ার করে না।

বাড়িতেও থাকে না। থাকে রাজনীতির আশ্রয়ে। একজন শখেববাজারে পেলা তোলে, আর একজন সোনারপুরে। মহিমবাবু লোকের বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ যেচে বের করেন। অতীতের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সেই গল্প শুনিয়ে বেড়ান। চেহাবার একমাত্র সম্পদ বাবরি চুল। ঘাড়ে লটপট। ব্যাগের মতো ঢাউস শরীর। মেদের ঠাস নরম হওয়ায় বাইরের চামড়ার খোল লতরপতর। তবু মানুষটাকে ভাল লাগে, আমার বাবার কথা বলেন বলে। বাবাকে ভালবাসতেন। তাঁর চরিত্র, আদর্শ ও সংগ্রামের জন্যে এখনও শ্রদ্ধা করেন। এই মানুষটিকে জীবন কী দিয়েছে ! কিছুই না। কিছু ক্ষত ছাড়া জীবনযুদ্ধে কিছুই পাননি।

আমার পাশে বসে মহিমবাবু বললেন, 'বহুকাল পরে খব ভাল খাওয়া হল। পোলাওটা যা বানিয়েছে, লা জবাব। জানো আমার অনেক পরিকল্পনা ছিল, কোনটাই কাজে করা গেল না। গেল না আমাব জন্যেই। জীবনের খেলাটা আমি ঠিক বুঝিনি। এটা ফুটবল, না দাবা, না ক্রিকেট ! এই শেষ মাথায় এসে মনে হচ্ছে, খেলাটা হল ক্রিকেট। হয়, ভাল ব্যাটসম্যান হও, ক্রিজে দাঁড়িয়ে নিজের স্টাম্প সামলাও, নয় ভাল স্পিনার হয়ে অন্যের স্টাম্প ছিটকে দাও। আমি কোনটাই হতে পারিনি। বিপক্ষকে কাঁচা বলে রান দিয়েছি গাদা গাদা, নিজে যতবারই ব্যাট ধরেছি, পয়লা বলেই শূন্য। তবে, কথাটা হল এই, মৃত্যুতে সবাই শূন্য, অবশিষ্ট দেড় কেজি ছাই।'

হঠাৎ গান ধরলেন, গলায় এখনও বেশ সুর আছে।

তবে কে বলে কদর্য শ্মশান
পরম পবিত্র পরম যোগের স্থান
পাপী পুণ্যবান মূর্খ কি বিদ্বান
সমানভাবে হেথায় সকলে শয়ান।
অন্ধ খঞ্জ বধির গলিত কুষ্ঠধারী
কন্দর্পসমান রূপের দর্পহাবী
সজ্জন তস্কর গৃহী বনচারী
রাজা আর ভিখারি সকলে সমান।

মহিমবাবু প্রকৃত আর্টিস্ট। গাইতে গাইতে একেবারে গানের ভেতরে ঢুকে গেছেন। অন্য সবাই ঘরে এসে, যে যেখানে পেরেছে বসে পড়েছে। হারমোনিয়াম ছাড়াই জমে গেছে গান। বাবা থাকলে বেহালাটা নিয়ে বসে পড়তেন। মহিমবাবু চোখ বুজিয়ে গাইছিলেন। চোখ খুলে ঘরে এত লোক দেখে অবাক।

সকলেরই এক কথা, বাঃ, ভারী সুন্দর গান ! এখনও আপনার গলা বেশ ভালই আছে। মহিমবাবু সলজ্জ হেসে বললেন, 'ওইটুকুই আছে। এক সময় আলিবাবায় আমি আবদাল্লার রোলটা করতুম। এখন তো আমার যাওয়ার সময় হল। গানের কথাগুলো একবার দেখো, শ্মশানচিতায় রাজা আব ভিখারি সকলে সমান, দেড় কেজি ছাই। আর একটা গান শোনো, আমাদের জীবনের গান, কী অদ্ভুত বাণী !'

সকলে একবাক্যে বললে, 'হোক হোক।'

মহিমবাবু সমঝদার শ্রোতা পেয়ে খুব খুশি। রাতের পর রাত মানুষকে হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন। সেই সব কথাই মনে পড়ছে হয়তো। মহিমবাবু গাইছেন—

এ মায়া-সংসারে ঘিরেছে আমায় সপ্তরথীতে,
আমি পড়েছি এই মায়াচক্রে চক্রব্যূহতে।।
আমার মন কুমতি দুর্যোধন, তার সঙ্গে রথী ছয়জন,
আমার বধিতে আইল প্রাণ অন্যায় যুদ্ধেতে।।

কাম কর্ণমহাবীর, তার শরে প্রাণ জর-জর,
মলাম ক্রোধ দুঃশাসনের দুষ্ট শাসনেতে।।
ঘিরেছে লোভ-শকুনি, মোহ কৃপ, মদ অশ্বত্থমাতে
মাৎসর্য সে দ্রোণাচার্য দুর্জয় জগতে।।
শুনিয়াছি আগমমন্ত্র, নাহি জানি নিগমতন্ত্র
এ সময়েতে কোথায় পার্থ, অনুরাগ পিতে।।
ভজন-সাধন পাণ্ডবসৈন্য, সঙ্গেতে মোর কেউ নাই অন্য
এখন আমার পূর্ণ তূণ শূন্য হলো এ পাপ রণেতে।।
অভিমন্যু নিধনকালে ডেকেছিল কৃষ্ণ বলে
অনন্তের ভাগ্যে তাই ঘটিল, ভয় কি ভবেতে।।

মহিমবাবু স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। আমার এক বন্ধু, কলেজের অধ্যাপক, মনোজ, সে বলল, 'গানটা আমি লিখে নি, অপূর্ব বাণী। এমন গান আর একালে লেখা হয় কই। মনের কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ।'

মহিমবাবু গানটা লিখিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'তোমার বাবার স্টকে অনেক গান ছিল। তিন-চারখানা খাতাও ছিল আমি জানি, দেখেছি, সব রেয়ার গান। কোথায় আছে সেই খাতাগুলো !'

'পুরনো বাড়িতে ছিল, মায়ের অসুখের সময় সব উইপোকায় শেষ করে দিয়েছে।'

'তোমার ওপর দিয়ে একটা সময় গেছে বটে। আজ তুমি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছ, সে তোমার পিতামাতার আশীর্বাদে। তোমার বাবা দুটো জিনিসকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন এক সুর, দুই পুত্র। তোমার শিক্ষা, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে কি না করেছেন ! অমন বাবা পাওয়াও ভাগ্য। আমিও বাবা, কিন্তু আমার কোনও আদর্শ ছিল না। চরিত্রহীন, লম্পট, মদ্যপ, কাম কর্ণমহাবীর, তার শরে প্রাণ জরজর, ঘিরেছে লোভ-শকুনি, মোহ কৃপ, মদ অশ্বত্থামাতে, মাৎসর্য সে দ্রোণাচার্য দুর্জয় জগতে। আমি যেমন গাছ, আমার ফলও সেইরকম হয়েছে—কর্মফল। বিয়ে করেছিলুম ভোগের জন্যে, শকুনির মতো অর্থের লালসায়, বউকে অন্যের বিছানায় শুতে পাঠিয়েছি ····।'

তাড়াতাড়ি মহিমবাবুর হাত দুটো চেপে ধরে বললুম, 'মহিমকাকা, পুরনো কথা থাক, যা হয়ে যায় তা হয়ে যায়, সব সময়েই নতুনভাবে শুরু করা যায়। জীবন তো বাতাস, উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম সব দিকেই বইতে পারে।'

'কিন্তু আমার দুটি ছেলে, একটা খুনী, আর একটা জোচ্চর। অতীত বর্তমান হয়ে চোখের সামনে ঘুরছে। লোকে বলছে, মহিমের ব্যাটা। আমার খেয়ে সুখ নেই, ঘুমিয়ে সুখ নেই। রাত বারোটার আগে বাড়িতে ঢোকার অনুমতি নেই ; কারণ আমার স্ত্রী ম্যাডাম হয়েছেন। তিনি কলেজের মেয়েদের নিয়ে মধুচক্র খুলেছেন। বড় বড় লোকের আনাগোনা। এই বর্তমান আমারই তৈরি। আমিই আর্কিটেক্ট। নাঃ, এইবার আমি উঠি।'

'এখন কোথায় যাবেন ?'

'অফিস ক্লাবের থিয়েটার হবে। আমাকে ডিরেকশান দিতে বলেছে। যাই রিহার্সালে বসি, যা দু পয়সা পাওয়া যায়। পকেট মানি। ছানি আর প্রসট্রেট দুটোই কাটাতে হবে। অনেক টাকার ধাক্কা।'

মহিমবাবু দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলছেন, 'ফ্ল্যাটটা বেশ জবরদস্ত হয়েছে। তোমার বাবা জীবিত থাকলে খুব অনন্দ পেতেন। চিরটাকাল ভাঙা বাড়িতে কাটিয়ে গেলেন। যাক, ওপর থেকে সব দেখছেন। তুমি তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছ।'

আমি এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললুম, 'আপরেশানের খরচটা আমি দিতে পারি, যদি কিছু মনে না করেন।'

'কী জন্যে অপারেশন করাব ! আরও কিছুদিন বাঁচার জন্যে ! আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি মরতে চাই। জগৎটাকে ঝাপসা দেখছি, সেই তো ভাল।'

মহিমবাবু চলে গেলেন। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। জীবন যতটা এসেছে তাইতে সার বুঝেছি, যার যার দুঃখ তার তার দুঃখ। সহানুভূতি জানানো যায়, অংশীদার হওয়া যায় না। আনন্দ ভাগ করা যায়। দুঃখ এমন ফল, যা খোসা আর বিচি সমেত যে খাবে, সে একাই খাবে।

সন্ধের আগেই বাড়ি ফাঁকা। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। দুঃখ-সুখের পৃথিবী বাইরে পড়ে রইল। আমরা দুজন। আপাতত সুখের দেয়ালে ঘেরা হয়ে আছি। নতুন দেয়ালে নতুন রঙ রাতের আলোয় খোলতাই। বাহারী আলোর শেড। ঝকঝকে সব ফারনিচার। পা পেছলানো মেঝে। সব, সব নতুন। জীবনটাই পুরনো। এই সময় আবার কবীর দাসজির দোঁহাটা মনে আসছে—

কঙ্কর চুন চুন মহল বানায়া,
লোভ বলে, ঘর মেরা,
না ঘর মেরা, না ঘর তেরা
দুনিয়া সবসে বসেরা।।

বেহালাটা যত দিন খাটের তলায় চোখের আড়ালে ছিল, বেশ ছিল, এখন সদাদৃশ্যমান হয়ে বড় কষ্ট দিচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে, আমার বাবা আর মাকে ফিরিয়ে আনি। চিরকালের জন্যে না হলেও, এক বছরের জন্যে। আমার স্ত্রী আবার আদুরে মেয়ের মতো আমার মায়ের গায়ে গা লাগিয়ে গল্প শুনুক। অতীত জীবনের গল্প। দুজনে একসঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকে রান্না করুক। একজন লুচি বেলুক, একজন ফুলো ফুলো করে ভাজুক।

সুখ হলো লুচি, একজন বেলে, একজন ভাজে, ভেতরে শুধু হাওয়া। ফুটো করলেই চুপসে যায়। আমার বউ আমার মায়ের কাছে নাচ শিখত। খুব সুখের জীবন ছিল না। পিতার দুই বিবাহ। মেয়েটি প্রথম পক্ষের। বাপটি মিনমিনে স্বভাবের। প্রবল দ্বিতীয় পক্ষটির কেনা গোলাম। আমার স্ত্রী মায়ের বুকঢালা স্নেহ পেয়েছে আমার মায়ের কাছে। দিনের বেশির ভাগ সময় আমার মায়ের কাছেই কাটাত। লেখা-পড়া-নাচ-গান। সে যখন নাচ শিখত, আমি তখন তাল বাজাতুম। আমাকে দাদা বলত।

ক্রমে ক্রমে আমার চোখে ঘোর লাগল। কোমর দুলছে, নিতম্ব ঘুরছে, নিটোল পা প্রকাশিত হচ্ছে শাড়ির তলা দিয়ে। দুটো চোখ নানা ভঙ্গি করছে। শাপলার ডাঁটার মতো দুটো লীলায়িত হাতে নানা মুদ্রা। কাম কর্ণমহাবীর, তার শরে প্রাণ জরজর। মনের ভাব মনেই মিলিয়ে যেত। নির্জনে মাঝে মাঝে প্রবল হত। জ্বরের মতো আসত। সারা শরীর যেন পুড়ে যেত। শীত শীত করত। গরম নিঃশ্বাস। তখন লুকিয়ে লুকিয়ে শরীর দেখতে শিখলুম। অপরাধী মনকে যতই শাসন করি, আমার শাসন মানে না।

একদিন মায়ের আড়ালে ' 'মকা পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরলুম। মেয়ে ভয়ে আড়ষ্ট না হয়ে সুখে শিথিল হলো। বললে, তুমি কী গরম !

সেই দিন বুঝেছিলুম, উদ্গত যৌবনে এই অসুখ সকলেরই হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, যৌবন জলতরঙ্গ রধিবে কে ! সব ভুলে, শাসন, অনুশাসন, শিক্ষা, দীক্ষা, অবস্থা, পরিবেশ, আমরা দুজনে জড়াজড়ি করে বিছানা লণ্ডভণ্ড করলুম। এমন আনন্দ আগে কখনও পাইনি। ধমনীতে ধাবমান রক্তের দাদরা, চোখে যত নরম দেহ-প্রত্যঙ্গের নগ্ন দৃশ্য, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কপাট খুলে শীতোষ্ণ অনুভূতির প্রবহমান স্রোত। আমরা খড়কুটোর মতো ভেসে গেলুম। আমার মন কুমতি দুর্যোধন, তার সঙ্গে রথী ছয়জন। সেই দিন সেই মুহূর্তেই আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেলুম।

আমার মা জানতেন এমনটি হবে। যেমন হয়েছিল আমার বাবার সঙ্গে আমার মায়ের। এরই নাম হিন্দোল। মা ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন। আমার চাকরি পাওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। সবাই

বলতে লাগল, কাজটা কী ভাল হল।

ভাল নয়, ভীষণ ভাল হল। প্রেমের মতো জীবনমরুতে অন্য সেচব্যবস্থা আর কী আছে।

Love's own hand the nectar pours
Which never fails nor ever sours.

আমার মা-বাবার জীবনেও তো তাই হয়েছিল। প্রেম অভাব, নির্যাতন, যন্ত্রণা সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। সামনের দেয়ালে তিনখানা ছবি। মাঝখানে মা, একপাশে আমি, আর একপাশে আমার বউ। বাবার ছবি নেই। তার জায়গায় বেহালা। ছবি তিনটের ঠিক নীচে শুয়ে আছে।

রাত হয়ে গেল। দিনের পাট শেষ। অন্ধকারে সময়ের মাঝি দিনের খেয়া বেয়ে চলেছে। আমার ক্লান্ত বউ, আমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার ডান হাতখানা পড়ে আছ আমার বুকে। ভারী। হাত দিয়ে অনুভব করছি, মসৃণ আঙুল, আঙটি, শাঁখা, চুড়ি।

ঘুম আসছে না আজ। ক্লান্ত, আচ্ছন্ন, কিন্তু নিদ নাহি আঁখিপাতে।

খাঁচা খুলে পাখি যেন হঠাৎ উড়ে গেল অতীতে। বাবার জীবনের শেষ কটা দিনে। স্টার থিয়েটার। বাবার চোখে গ্লুকোমা। ভাল দেখতে পান না। আমি ধরে ধরে, সাবধানে গ্রিনরুম থেকে উইংসের ধারে এনে যন্ত্রীদের সঙ্গে বসিয়ে দিলুম। আমাকে বললেন, তুই চলে যাস না, পাশে থাক।

নাটক শুরু হল। বাবা বাজাচ্ছেন, থামার সময় থামছেন। আবার বাজাচ্ছেন। বেহালা কেবল দুঃখই বাজায়। ছড় টেনে টেনে কান্না। মৃত্যুর দৃশ্য, বিচ্ছেদের দৃশ্য। উইংসের পাশে এতটুকু বাতাস নেই। বাবা দরদর করে ঘামছেন। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার কষ্ট হচ্ছে।

নাটক শেষ হল। বাবাকে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। রাত অনেক। বড় বড় শিল্পীরা মোটরে উঠে চলে যাচ্ছেন। রবিন মাস্টারের দিকে কেউ তাকাচ্ছেন না। সবশেষে এলেন প্রযোজক। তাঁর অপেক্ষায় নতুন ঝকঝকে গাড়ি। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'আপনার পেমেন্টটা আজ আর করা গেল না। কাল দেখা যাবে।'

আদ্দির পাজামা, পাঞ্জাবি। বুকে হীরের বোতাম। আতরের গন্ধ। গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করলেন। স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেলেন হুস করে। রাস্তা ফাঁকা। বাবার বিস্ফারিত চোখ।

ভেঙে-পড়া মানুষটা যেন আরও ভেঙে পড়লেন, 'দেখলি খোকা ? কী আশ্চর্য ! সামান্য কটা টাকা তাও দিলে না ! কাল যে তোর পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে ! হুস করে কেমন বেরিয়ে গেল !'

বাবার হাতটা শক্ত মুঠোয় ধরে বলেছিলুম, 'আপনি ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কোনও আশা নেই, তবু পথে দাঁড়িয়ে বাবাকে সেই রাতে আশার কথা শুনিয়েছিলুম। তারপর একটা রিকশা ধরে দুজনে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় এল ঝেঁপে বৃষ্টি। বল্লমের খোঁচার মতো অঝোরে ঝরছে। জল জমে উঠছে পথের দুপাশে। ঘন কালো জল। গায়ের জামাটা খুলে বেহালার বাক্সটাকে ঢেকেছি। শরীরের নীচের দিকটা ভিজে সপসপে।

বাড়ি ফিরে শুনি, কে এক ভদ্রলোক এসে অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে বাবাকে সোলো বাজাবার জন্যে বুক করে গেছেন। যে টাকায় আমার ফি তো হয়েই যাবে, বরং কিছু বাঁচবে। বাবার চেয়েও আমার বেশি আনন্দ, কারণ অন্ধকার আকাশের তলায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমিই বাবাকে বলেছিলুম, সব ঠিক হয়ে যাবে। ওইওই অন্ধকারে আশার আলোটা আমিই জ্বালিয়েছিলুম।

রবিবারের সকালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে সেই আসর হল। মাত্র দুজন। কানন সাহেব গাইবেন। বাবা বাজাবেন। বাবা জানতেন না যে তাঁকে সম্বর্ধনাও দেওয়া হবে। মানপত্র, উত্তরীয় ও নগদ কিছু টাকা, ফুলের মালা। মালা পরে বাবাকে কেমন হতভম্ব দেখাচ্ছিল। আজ পর্যন্ত শিল্পী হিসেবে তাঁকে কেউ আলাদা করে সম্মান জানায়নি। এতকাল নিজের বিশেষণ শুনে এসেছেন, হ্যান্ডস। এই কথাই হয়তো ভাবছিলেন। এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন, দুটো কথা পরিষ্কারভাবে বলতে পারলেন না।

মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ' বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

বাবা বাজালেন বৃন্দাবনী সারং। সঙ্গত করলেন, কেরামতুল্লা সাহেব। জীবনের শ্রেষ্ঠ বাজনাটি সেদিন বাজালেন। আমার পাশে আমার মা বসেছিলেন স্তব্ধ হয়ে। চোখ দুটো তাঁর আকাশের মতো হয়েছিল। তেহাই মেরে বাজনা শেষ হওয়া মাত্র কেরামতুল্লা সাহেব চিৎকার করে বলে উঠলেন—'কেয়াবাত ! লা জবাব !'

সেই রাতেই বাবা মারা গেলেন। আনন্দ করছিলেন আমাদের সঙ্গে। বেহালাটা কোলে। মজা করেছিলেন, 'ফরমাইয়ে, ফরমাইয়ে, কেয়া পেশ করুঁ।'

আমি বললুন, 'ওস্তাদজি, থোড়ি সি এক পীলু ঠুংরি।'

বেহালাটি বুকের কাছে ধরলেন, কায়দা করে। মুখটা হঠাৎ পাথরের মতো হয়ে গেল।

ওই সেই বেহালা। ঘরের মৃদু নীল আলোয় ভাসছে। সেই হাত দুটি চলে গেছে, সেই সুরসাধকের সঙ্গে। তন্তুতে তন্তুতে স্তব্ধ জমাট সুর। বাবার শেষ উপদেশ ছিল, জীবনটাকে সুরে বেঁধে তালে লয়ে বাজাও। লাল, সাদা, হলুদ, গোলাপ দিয়ে সাজানো হয়েছিল। দু-একটি পাপড়ি থাক খুলে আলতো শুয়ে পড়েছে। যেন সুখের শয়নে সুন্দরী।

নীল মশারির ঘেরাটোপ থেকে দেখছি। ঝকঝকে মেঝেতে পাতা হয়েছে নরম গালচে। সুন্দর একটা পাঞ্জাবি পরে বাবা বসেছেন বেহালা নিয়ে। সুন্দর একটা শাড়ি পরে মা বসে আছেন। ছোট্ট একটা কাচের বাটিতে মতিয়া বেল। দুজনের শরীরে অভাবের কোনও চিহ্ন নেই। সুখে থাকলে মানুষের শরীরে যেমন কান্তি আসে সেইরকম।

বাবা বাজাচ্ছেন আর গাইছেন—

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।।
বাতাস বহে মরি মরি আর বেঁধে রেখো না তরী—
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয় মাঝারে।।
তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকালবেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে।।

শিখা হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। চোখ বোজা। ব্যস্ত হয়ে কেবল বলতে লাগল, 'এ কী, ওঁরা চলে যাচ্ছেন কেন ? কোথায় যাচ্ছেন আমাকে ফেলে ! আমি একা থাকব কী করে ! যাও যাও, ফিরিয়ে আনো। ফিরিয়ে আনো। ওঁরা চলে যাচ্ছেন কেন ?

শিখাকে ঠেলা মারলুম, 'এই, কী হয়েছে ?'

ধাতস্থ হয়ে বললে, 'স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখছিলুম।'

কোনটা স্বপ্ন ? জীবনটা স্বপ্ন, না স্বপ্নটা স্বপ্ন। মনে হচ্ছে, আর একটু পরেই ভোর হবে।

আত্মজা

বুদ্ধদেব গুহ

আজ শনিবার। অফিস ছুটি।
লিখছিলাম।

এমন সময়ে ফোনটা বাজল।

তোমার ফোন, সনু।

সনু যথারীতি তার দিদির ঘরে ঘুটুর-ঘুটুর করছিল। বি.এ. পরীক্ষা হয়ে গেছে অনেকদিন। এখন ফলের জন্যে শবরীর তপস্যার মতো তপস্যা করা ছাড়া অন্য কাজ কিছু নেই।

আমি আমার দু মেয়ের, বা সাধারণভাবে বলতে গেলে, সংসারের জন্যে কিছুমাত্রই করি না বা করিনি কোনদিন-ই। আমার মেয়েরা দুজনেই ন্যাশনাল স্কলার। সবদিক দিয়েই ভাল। এবং তাদের ভাল হওয়ার পেছনে সব কৃতিত্বই তাদের মায়েরই একার।

দোষের মধ্যে সনুটা বাংলা পড়ে না। বড়ই দুঃখ হয়, যখনই এ কথা মনে হয়।

আমার মেয়েরা আমার কাছ থেকে পাওয়ার মধ্যে শুধু একটি বদভ্যাস পেয়েছে। সেটি এই যে, তারাও শিশুকাল থেকেই বইয়ের মধ্যে বাস করতে ভালবাসে।

অন্তর্মুখিনতা আজকাল আর কোনও শখ নয়। এটি একটি দুর্মূল্য বিলাস এবং অতি স্বল্প মানুষেরই মনের জোর বা জেদ আছে এই বিলাসে বিলাসী হওয়ার। আমার মেয়েরা যে অন্তর্মুখী হয়েছে তা দেখে বড়ই আহ্লাদিত হই। আজ রাতেই যদি ঘুমের মধ্যে মরে যাই তবুও একটুও দুঃখ থাকবে না আমার।

কী হল ' সনু ! তোমার ফোন।

আবার বললাম।

এই দুবাব ওকে ডাকার মধ্যেই এত কথা মাথার মধ্যে দাপাদাপি কবে গেল।

হুঁ। কে ?

অনুরাবা।

কোন 'অনুরাধা ?

অরিজিনাল। বোস। পণ্ডিতিয়ার। কল্লোলদার মেয়ে।

আসছি।

ধরো অনুরাধা। আসছে সনু। তোমার বাবা কেমন আছেন ?

ভাল ।

মা ?

ভাল।

আমাকে কবে ইলিশমাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক আর ভাপা ইলিশ আর ইলিশমাছের টক খাওয়াবেন, জিজ্ঞেস কোরো তো মাকে ?

সনু আসতে আসতে বলল, বিরক্ত গলাতে ; আবার আরম্ভ করলে !

তারপর ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কর্ডলেসটা তুলে নিয়ে ঘরে চলে গেল।

ঘবটা যদিও ওর একার নয়।

আমি এমনই তালেবর বাবা ওদের যে, দুই অধ্যয়নশীল মেয়েকে দুটি আলাদা ঘর পর্যন্ত দিতে পারিনি জীবনের শেষে পৌঁছেও। হায় ! তাতেও কত মানুষই না আমাদের "সাফল্যে" (?) কাতর।

মৌ আর সনু ওই একটি ছোট্ট ঘরেই গুঁতোগুতি করে পড়াশুনোর পাট প্রায় চুকিয়ে ফেলল।

আমার একটি আলাদা ঘর লাগেই। সে-ঘরের আলমারিতে বই, টেবলে বই, বিছানাতে বই, বাথরুমে বই। বইয়ের সঙ্গেই শুয়ে থাকি আমি। সে জন্যে আমার স্ত্রী মিতুর অভিযোগও কম নেই। তবে আজকাল আর কেউই কিছু বলে না আমাকে। পুরনো আসবাবেরই মতো আমিও এই ফ্ল্যাটের একটি ফিক্সচার হয়ে গেছি। যেতে-আসতে চোখে যে পড়ি না তা নয়, কিন্তু আমার আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া, সকলেই জেনে গেছে যে বলে কী লাভ ? পাথরের গায়ে কলমের আঁচড় তো পড়ে না।

ও ঘর থেকে হিহি-হাহা শোনা গেল। ফোনে কত যে বলার কথা থাকে ওদের !

মিতু এখন বাড়িতে নেই। রেডিওর রেকর্ডিং-এ গেছে। মৌ অফিসে। তার কোনও শনি-রবি নেই। উইকডেজ এ সকাল নটাতে বেরিয়ে দশটা এগারোটাতে ফেরে একগাদা বইপত্র-ফাইল ইত্যাদি নিয়ে। তারপরও যতবার আমি রাতে বাথরুমে যাই, দেখি প্রায় সারারাতই ঘরের আলো জ্বলে। ও আবার চলে যায় অফিসে সকাল নটাতে। মোমবাতির দু দিকেই আগুন দিয়েছে। ওরও অবস্থা আমারই মতো হবে।

ওর মায়েরই সঙ্গে মিতুর ঘরে শোয় রাতে সনু। কোনও কোনও দিন রাতে খেতে বসে, বেয়ারা পঞ্চাননকে শুধোই, মৌ এখনও আসেনি ?

উনি তো আজ বিকালে দিল্লি চলে গেছেন। অফিস থেকেই। হঠাৎ কাজ পড়ে গেছে।

ও ! কবে আসবেন।

দিদির অফিসের ড্রাইভারই জানে। তাকেই বলে গেছেন। বলল, কিছুই ঠিক নেই। ফেরার আগের দিন ফোন করবেন বলেছেন। তখনই জানা যাবে।

বৌদি কোথায় রে পঞ্চানন ?

মেহেন্দি হাসানের গান শুনতে গেছেন জয়ন্ত চ্যাটার্জির বাড়িতে "সানি টাওয়ার্স"এ। বলে গেছেন, ফিরতে ফিরতে একটা হবে। খেয়ে আসবেন। চাবিও নিয়ে গেছেন। আপনাকেও তো যেতে বলেছিলেন।

হ্যাঁ। কিন্তু কাজ আছে আমার। আজই একটি লেখা শেষ করতে হবে। আর গাইয়ের নামটি মেহেন্দি হাসান নয় মেহেদি হাসান।

লজ্জা পেল পঞ্চানন।

আর সনু ?

দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে ছোটদিদি বটানিকস-এ গেছিলেন। ভীষণ ঘুম পেয়ে গেছে। তাই খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ওঃ।

আমি বলি।

ফাঁকা টেবলে বসে খেতে ভাল লাগে না। কিন্তু এ নিয়ে আমার কোনও অনুযোগ নেই। হয়তো ওদেরও, আমার বিরুদ্ধে নেই। কারণ, আমারা প্রত্যেকেই জানি যে, আমাদের পরিবার অন্য দশটি পরিবারের মতো নয়। ভালমন্দর কথা নয়, আমরা শুধু অন্যরকম। আমরা, আমরাই। সেকথাটা জেনে এই একাকিত্ব, অসুবিধা, এই সবকিছুর জন্যই এক ধরনের গর্বও বোধ করি। আশ্চর্য ! এই গর্বটাও আবার অনেকের চোখে স্পর্ধা হয়ে প্রতিভাত হয়।

কেউ না থাকলে বা আগে পরে কোনদিন কেউ খেলে, ঘরেই নিয়ে আসতে বলি আমার খাবার ট্রলি করে। খাওয়াটাও যদি মনপসন্দ না হয়, তবে সেটা নিতান্তই শুষ্ক কর্তব্য হয়ে ওঠে আমার কাছে। ইনকনসিডারেট, বিবেকরহিত ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানহীন অধুনা ডাক্তারদের অজ্ঞতায় prescribe করা অখাদ্য, নাড়াচাড়া করে ফিরিয়ে দিই।

সনু বলল, বাই-ই।

বলে, ফোনটি রাখতে এল আমার ঘরে।

ফোনটা থাকে বসার ঘরেই। অনেকগুলো ফোন করতে হবে জরুরি তাই এ ঘরে কর্ডলেসটি নিয়ে এসেছি।

কথা হল ?

হ্যাঁ।

কী কথা বললে ?

বাবা ! সত্যি তুমি না ! বন্ধুরা কত কথা বলে। তুমি যখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ছিলে তখন দাদু কি জিজ্ঞেস করতেন তোমাকে, বন্ধুর সঙ্গে কী কথা বললে ?

বয়ফ্রেন্ডসদের কথা বলছিলে বুঝি ?

আমি শুধোলাম সনুকে ?

হাঃ ! তাহলে তো হতই !

তোর দাদু তো আমাকে বি. কম. পরীক্ষার অনেক আগে থেকেই জোয়ালে জুতে দিয়ে নিজের বেগুন ক্ষেতে বেগুন চাষ করাচ্ছিলেন। তোর মতো অত কথা বলার সুযোগ কি আমার ছিল ? সকালে ঘুম থেকে যেতাম উ্যনিভার্সিটি ল কলেজে। সেখানে ক্যান্টিন এ ভরপেট খেয়ে অফিস টাইমের ট্রামে-বাসে উঠতে পারতাম না বলে কলেজ স্ট্রিট থেকে হেঁটে হেঁটে অফিসে আসতাম।

হ্যাঁ। সনু বলল। আর তার পরেরটাও বলো। সেটা বলছ না কেন ? বিকেলে টেনিস খেলতে যেতে দেশপ্রিয় পার্কে। 'দক্ষিণী'তে গান শিখতে, নাটক করতে।

তারপরই বলল, তোমার না, বাবা, সবটাতেই একটা দুঃখ দুঃখ ভাব। কেন বলো তো ? মাকে দেখো না? সবসময় আনন্দে ঝলমল করছে। যেন আনন্দময়ী মা ! এই জন্যেই তো মা বলে, ঠিকই বলে, যে, তোর বাবা জানেই না কী করে সুখী হতে হয়। এততেও যদি তুমি সুখী না হও তবে কে তোমাকে সুখী করতে পারে বলো ? তোমার মতো কজন সাকসেসফুল ?

"সাকসেস" কথাটার মানে একেকজনের কাছে একেকরকম। সেইটাই হচ্ছে মুশকিল ! তাছাড়া, তোর মায়ের চৈত্র মাসে জন্ম তো। তোর দাদুরই মতো। ওঁরা ভীষণই অপ্টিমিস্ট, এনার্জেটিক। কুলি-খাটানো, কাজের-লোক-খাটানো, কারখানা চালানো, এসব কাজ ওঁরা খুবই ভাল পারেন। আর্মিতে জয়েন করলে ওঁরাই জেনারেল হন।

তুমি শুধুই মায়ের নিন্দা করো। মা কিন্তু কখনও তোমার নিন্দা করে না।

এটা কি নিন্দের কথা হল ? যা বললাম ? তাছাড়া আমার সম্বন্ধে নিন্দা করাব কিছু থাকলে তবেই তিনি নিন্দা করবেন ?

হ্যাঁ। তা কি আর নেই !

আমি চললাম।

যাবে ? কোথায় ? তোমাকে তো দেখতেই পাই না। বোসো না একটু। ছুটির দিন। বাবাকে একটু কম্পানি দাও। কী করবে কী, গিয়ে ?

বাবাঃ ! কত্ব কাজ !

কী কাজ ? করছিলে কী ?

একটা বই পড়েছিলাম। দিদি বম্বে থেকে কিনে এনেছে গত সপ্তাহে।

কী বই ?

"V" When Feeling Bad Is Good".

কার লেখা ?

Ellen Mcgrath.

কিসের বই ?

মেয়েদের পড়ার বই। লানডান এর সাইকিয়াট্রিস্ট লেনার্ড ক্রিস্টাল লিখেছেন "A truly remarkable book...An absolute must for women the world over who will take heart form its profound message."

প্রকাশক কে ?

Bantam

তুমি তো আর ডিপ্রেশান ফিল কবছ না ?

মাঝে মাঝে কবি বাবা।

কেন ? এখনই কি ? এত অল্প বয়সে।

অল্পবয়স যে চিরটাকাল অল্পবয়স থাকে না বাবা। তুমি মনে করে দেখো, এই তো সেদিনও তুমি অল্পবয়সী ছিলে। ছিলে না ? ক্যালকাটা র‍্যাকেট ক্লাবে স্কোয়াশ খেলতে যেতে। আমাকে অবেঞ্জ স্কোয়াশের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দিয়ে তুমি খেলতে। আমি তখন এক হাতে গ্লাস ধরতেই পারতাম না। দু হাতে করেই ধরতাম। আমি একটা হালকা লেমন-ইয়ালো রিবন মাথায় বেঁধে যেতাম। মনে আছে। মাসি যেন কোথা থেকে এনে দিয়েছিল। বেঞ্চ-এ উঠতে পারতাম না। এতই ছোট ছিলাম। তোমাদেব র‍্যাকেট ক্লাবের আবদুল বেয়ারা আমাকে তুলে ধরে বসিয়ে দিত। বাবা। বাবা। বলে আদর কবে কথা বলত।

তারপর বলল, কেমন আছে এখন আবদুল দাদা ?

আবদুল মারা গেছে।

দেখলে তো !

আবদুল দাদা তখন প্রৌঢ় ছিল। এই সেদিনও। দেখো, মবে গেল এরই মধ্যে।

আমি তোমার খেলা দেখতাম। বাবাঃ কী ফাস্ট খেলা স্কোয়াশ। মার্কার জেভিয়ার এর সঙ্গে খেলতে তুমি। তাই না ? মনে হয়, এই তো সেদিন। আর আজ ? আজ বাদে কাল আমি এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হব। তুমিও অফিস ছেড়ে দেবে শিগগির। কী যেন বলো না তুমি ! এবারে নিজের "নিজস্ব" কাজ করবে। এতদিন কি তাহলে পবস্ব কাজ করলে ?

আমি হাসলাম।

বললাম, তাই-ই। তা এখন কটা বাজে বল তো সনু ?

সাড়ে বারো ? বলিস কী ? ইটস টাইম ট্যু হ্যাভ আ ড্রিংক নাউ।

তোমাকে না শম্ভু কাকা দুপুর বেলা এসব আজেবাজে জিনিস খেতে মানা করেছেন ?

রাখ তো তোর শম্ভু কাকার কথা। সে কি আমার মতো ভোর চারটেতে উঠে লেখাব কাজ কবে ছুটির দিনে ? আর সে তো লেখে প্রেসক্রিশান ' ক্রিয়েটিভ লেখালেখির যে কী স্ট্রেইন তা তারা কী জানে ! দুটো জিন খাব, তারপর গিয়ে ভাত খাব তোমার সঙ্গে আজ ইলিশমাছ দিয়ে, তারপর কিছুক্ষণ ঘুমুব, আঃ কী সুন্দর মেঘলা দিন । তারপর আবার লিখব রাত আটটা অবধি। আমার তো ছুটিব দিনেও ষোল ঘণ্টা কাজ।

তুমি খেও। আমি ইলিশমাছ খাব না, তুমি তো জানো ! বোঁটকা গন্ধ। খেলে ওডিকোলোন লাগাতে হবে হাতে।

সনু বলল।

তারপরে বলল, সোম থেকে শুক্র, আমি আর মা যখন Star T.V-র Bold and the Beautiful সিরিয়াল দেখি, রাত আটটা থেকে পৃথিবীর আর কোনও কিছু সম্বন্ধেই যখন আমাদের আর কোনও

হুঁশ থাকে না ; তখন Santa Barbara শেষ না হওয়া অবধি তুমি পঞ্চানন দাদাকে দিয়ে বরফ আর গ্লাস আর হুইস্কির বটলটা আনিয়ে নিয়ে ঘর অন্ধকার করে পটাপট...

তোর তো সাংঘাতিক বুদ্ধি ! থুড়ি, দুর্বুদ্ধি।

হবেই তো। আমি তো তোমারই মেয়ে !

আরে বোকা ! তখন তো আমার সঙ্গীত সাধনার সময়। ওয়াকম্যানটা কানে লাগিয়ে রাজ্যের গান শুনি। কখনও কখনও সঙ্গে সঙ্গে গাইও। আর একটু হুইস্কি খাই। খুব অন্যায় করি কি ?

আমি কী বলেছি অন্যায় করো। ন্যায় অন্যায় রিলেটিভ ব্যাপার। তবে, মাঝে মাঝে যা চেঁচামেচি করো, তখন আই রিয়্যালি হেইট উ্য।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, আমি জানি যে, ইউ অল হেট মী। এ কথা ঠিক যে, মাঝে মাঝে অমন রেগে যাই। রাগটা কিন্তু ড্রিংক করার জন্যে নয়। রাগটা থাকেই ভিতরে, সবসময়েই গুমরে মরে। কখনও কখনও অনেক বছর ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরির মতো অগ্ন্যুৎপাত করে।

তাবপরে বললাম, আমি নিজেও নিজেকে ঘেন্না করি। কেন যে কী করি, যদি বুঝতিস সনু ! কত বড় একটা জাহাজ আমাকে চালাতে হয়। সারেং আমি। যতই মাসের এক তারিখটা এগিয়ে আসতে থাকে, ততই · · · মাথাটা · · · অথচ আমি মানুষটা এসবের কোনও কিছুই · · · তোরা ঠিক বুঝবি না। কেউই বোঝে না আমাকে। সংসারে আমাকে মানায় না।

চললাম আমি। আবার আরম্ভ করলে।

না মা ! যাস না। আর একটু বোস · · ·

পঞ্চাননদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, নইলে অধীরদাকে।

নারে সনু। তোর হাতে এক গ্লাস জল খেতেও যে কী মিষ্টি লাগে !

সত্যি। তুমি এত জ্বালাও না। ভাল লাগে না। এখন আমাকেই দিতে হবে তোমার ওই সব ? যত্ত বাজে সব।

বলেই, গজরাতে গজরাতে সনু চলে গেল।

তারপর ফ্রিজের দরজা খুলে ডাইনিং-কাম-সিটিং রুমে দাঁড়িয়ে বলল, বিটারস দেব, না লেবু ! বলো ?

আজ লেবু। গন্ধরাজ।

বরফ ?

হ্যাঁ।

জিন তো ? না ভডকা ? কোথায় আছে সেই সব ছাই-পাঁশ।

সেলারেই আছে রে মা।

একটু পরেই সবকিছুই ট্রেতে করে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে এল সনু।

মায়ের শিক্ষাতে দুই মেয়েই বড় গুছিয়ে কাজ করতে শিখেছে। করে না কিছুই। কিন্তু যদি করবে বলে মতি হয়, তবে একশতে একশ নম্বর দিতে হয় তাদের। মৌ তাও একটু আমার মতো, কাগজপত্রর ব্যাপারে, বইটই এর ব্যাপারে একটু অগোছালো, সেটা আমারই মতো সময়াভাবেই হয় ; বুঝি। কিন্তু সনু একেবারে তার মা বসানো। মেজাজেও। মাঝে মাঝে বড়ই বকাঝকাও করে আমাকে। কী করব ! বাড়িতে যে আমি মাইনরিটি। এই পরিবার ম্যাট্রিয়র্কাল ফ্যামিলি। মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা ছেলে থাকলে হয়তো আমার দিকটা বুঝত, বাবাকে তার চোখ দিয়ে অ্যাপ্রিসিয়েট করত।

তুমি না আমাকে "বার গার্ল" বানিয়ে দিলে। এসব কাজ কি কোনও বাবাই মেয়েকে দিয়ে করায় ? ছিঃ।

আমি যে তোর যে "কোনও বাবা" নই রে মা। প্রথমত, আমি তোর একমাত্র বাবা। দ্বিতীয়ত,

আমি যে আমিই ! জাস্ট "কোনও" বা "এলেবেলে" বা "যে কোনও" বাবা নই ! তাছাড়া, একটা কথা ভাব। আমার জামাই তো বলবেই তোকে, আহা ! তোমার মা কী চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন তোমাকে। এটা তো নতুন কোনও কথা নয়। সব মায়েরাই মেয়েদের ভাল ট্রেনিংই দেন তাঁর তাঁর মতো। কিন্তু ক' জন বাবা ক' জন মেয়েকে তুই যে ট্রেনিংটা পেলি, তা দেয় বল ?

সনু হাসল।

বলল, বলেছ ভালই। ট্রেনিংই বটে !

আমি বললাম, জামাই বলবে, আহা ! শ্বশুরমশাই তোমাকে ট্রেনিংটা দিয়েছিলেন বটে !

সনু হাসল। বলল ভাবছ তাই ! জামাই-ফামাই হবে না কোনদিনও তোমার। সব বোকা বোকা vague ছেলে। পছন্দ হয় না একটাকেও। আর যদি হয়ও কখনও কাউকেও পছন্দ ; আমার প্রথম condition-ই হবে যে ড্রিংক করতে পারবে না। করলে, মাথাতে বোতল ভাঙব।

সে তো বিয়ের সময়ে সব ছেলেই প্রতিজ্ঞা করবে রে। ছেলেদের তো চিনিস না। আমিও কি তোর মাকে কথা দিইনি ? তাছাড়া আমিও তো বলেছিলাম। সিনসিয়রলি বলেছিলাম। বিশ্বাস কর। এসব তো এই বুড়ো বয়সেই···

তবে ? কথা দিয়েও। ছিঃ বাবা।

ও তুই বুঝবি না। জীবনে কোনও প্রতিজ্ঞাই, কোনও কথাই static নয়রে। বড় দুঃখময় হলেও এর চেয়ে বড় সত্যি আর নেই ! সময়ের সঙ্গে কথা সরে যায় ; নড়ে যায়, এই পৃথিবীতে, সুন্দরতম গাছের পাতাও ঝরে যায়। ফুলও। আমরা নিরুপায়। কে বলতে পারে ! হয়তো বুঝবিওবা, এই স্ট্রেইন,এই ঘোরাঘুরি, এই আনসার্টেনটি, এই নোংরামি, চক্রান্ত, বিদ্বেষ, এই এত এবং এতরকমেব অকৃতজ্ঞতা, অপমান, লেখার চিন্তা, মক্কেলের চিন্তা, এত সবের বোঝা যে এই ঘাড়ে চাপবে সে কথাও তো জানা ছিল না আগে, বল ? সব মিলে-মিশে এই ক্লান্ত বিরক্ত মাথাটা একটু উদ্দীপ্ত হতে চায়। ড্রিংক করাতে, মাথার কাজ যাদের, তাদেব দোষ নেই, বাড়াবাড়িটাই দোবের। ক্রিকেটার ফুটবলারদের বিয়ার আর উকিল, ব্যারিস্টার, অ্যাকাউন্ট্যান্টদের হুইস্কি। ওষুধই বলতে পারিস। আমাদের প্রফেসর নারিয়েলভালা সাহেব বলতেন, ড্য মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড টু আর্ন ইওর স্কচ। ড্রিংক-ট্রিংক পরিশ্রমী মানুষদেরই জন্যে। হয়তো ক্রিয়েটিভ মানুষদের জন্যেও। ড্য মাস্ট ডিসার্ভ ইন ; আর্ন ইট।

ছাই ওষুধ। চললাম আমি।

সনু বলল।

বলেই দুদ্দাড় করে ও ঘরে চলে গেল।

দু মিনিট পরেই আবার বোতাম টিপলাম রিমোট কন্ট্রোল বেল-এব।

সনু দরজাতে দাঁড়িয়ে বলল, ওরা কেউ নেই।

কেউই নেই ? কোথায় গেল ?

পঞ্চাননদা চুল কাটতে গেছে আর অধীরদা গেছে চান করতে।

আমি যেদিন বাড়িতে থাকব সেদিনই কি ওদের বিউটিফিকেশান-এর দিন !

মহিম কোথায় ! বাবুর্চি সাহেব ?

সে ওষুধ কিনতে গেছে।

কী ওষুধ ? নির্জৌষধি ? আমারই মতো ?

জানি না। বলো কী চাই ?

কী আর চাইব বল ? কার কাছেই বা চাইব ? এ বাড়িতে প্রত্যেকেই মালিক। শুধু আমি সকলের তাঁবেদার। আমিই একমাত্র কাজের লোক। না, কী যেন বলে আজকাল "গৃহকর্মী"।

কী চাও বলো না বাবা ?

আমার স্টেপলারটা। কোথায় যে গেল !

হাতের কাছেই তো থাকার কথা। নিয়ে নাও না।

কই ? পাচ্ছি না রে। কোথায় হাতের কাছে ?

উঃ। তুমি যা জ্বালাও না। সে জন্যেই তো বাড়ি থাকতে ইচ্ছে করে না তুমি বাড়ি থাকলে।

একটু আহত হয়েই আমি বললাম, তোদের এতই জ্বালাই !

আমিও আহত হই কখনও কখনও। লজ্জাহীনেরও লজ্জা থাকে।

তারপর বললাম, লক্ষ্মী সোনা, একটু দেখে দিয়ে যাও।

ঘরে ঢুকেই বলল, এই তো। এটা কী ?

কোথায় ?

তোমার পেছনে।

পেছনে যে ভগবান চোখ দেননি রে মা ! যদিও দেওয়াটা, তোদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁর 'হাইলি' উচিত ছিল।

বিছানাটাকে যা করেছ না ! মা দেখতে পেলে ! মা আসার শব্দ পেলেই দরজা লক করে দেবে ভিতর থেকে বুঝেছ ! যদি কুরুক্ষেত্র এড়াতে চাও...

স্বল্পক্ষণ পরেই আবারও আমি ডেকে উঠলাম, সনু-উ-উ সনুউউ—

কী হল আবার ?

একটু এসো।

না। আসব না। বলো না।

একটা বই খুঁজে পাচ্ছি না। কালকেই রিভিউটা জমা দিতে হবে।

কী বই ? রিভ্যু-ফিভ্যু করার দরকার কী ? তুমি তো আবার মন রেখে কথা বলতে পারো না। আর কত বাড়াবে শত্রু ?

বাড়ুক বাড়ুক। অগণ্য শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে যে কী আনন্দ তাও আমি তোদের শিখিয়ে দিয়ে যাব। মাই লিগ্যাসি। তোরা যদি সততার দিকে থাকিস, ন্যায়ের দিকে থাকিস, তবে অসত্য, ভণ্ড, খল অন্যায়কারীরা চিরদিনই তোর সঙ্গে শত্রুতা করবে। যার শত্রু নেই, সেই মানুষকে এড়িয়ে চলবি। তারা মানুষ হিসেবে খুবই গোলমেলে। শত্রুতা, এই ক্লীবের দেশে, তোদের ক্ষমতাকে ক্ষুরধার করুক, ওই আশীর্বাদ করি।

বইটা পড়ইনি আর রিভিউ করবে কী করে।

কে বলেছে পড়িনি, পড়েছি রে পড়েছি। পড়েছি অনেকবারই কিন্তু সমালোচনা করার সময়ে বইটা তো হাতের কাছে দরকার।

কোন কাগজে করবে ? রিভিউ ?

"আজকাল" থেকে বলেছে।

কেমন দেখতে ? বইটার কভার ?

মিঞা তানসেন অথবা অন্য কেউ বসে ফতেপুর সিক্রীতে হাত ছুঁয়ে গান গাইছেন। দারুণ কভার এঁকেছেন বিমলদা।

বিমলদা কে ?

বিমল দাস।

মিঞা তানসেন হাত ছুঁড়লে দোষ নেই। আর পপ মিউজিকে যখন হাত পা ছোঁড়ে তখনই দোষ হয়ে যায়।

আরে সেই হাত-পা ছোঁড়া আর এতে অনেকই তফাত আছে।

কী বিষয়ের বই !

ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক অ্যান্ড মিউজিসিয়ানস। বইটা একবার পড়লে পারতিস। অনবদ্য ভাষা। চমৎকার বই। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে রে ! কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

হতে পারেন। কিন্তু আমার কাছে অ্যাজ ফরেন অ্যাজ এম্পেরর হাইলে সেলাসি। বাবা ইচ্ছে থাকলেও পড়া যাবে না।

তারপরে বলল, আমরা বড়ই আনফরচুনেট বাবা। আমাদের কেরিয়ারই ফার্স্ট প্রায়রিটি। একচুল বাড়তি সময় .য নেই। আর কেরিযারের দিকে না দেখলে যে তোমাব ঘাড়ে বসেই সাবাজীবন খেতে হবে।

তা খাবি না হয়। আমার ঘাড় তো তেমন অমজবুত নয়।

না বাবা। ঠাট্টা নয়।

নইলে, কোনও অশিক্ষিত বড়লোক, নয়তো অত্যাচারী স্বামীব পয়সাতে খেতে হবে। আজকেব মেয়েদের কাছে স্বাবলম্বনই হচ্ছে প্রথম প্রায়রিটি। আমরা নিরুপায় বাবা। তাছাড়াও সত্যি কথা বলতে কী, ইন্টারেস্টও পাই না। ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়ার যেমন গুণ আছে অনেক, অনেক দোষও আছে। আমাদের জীবনের পাতাগুলোকে সব মার্কার দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইটস আ ম্যাটার অফ প্রায়রিটিজ। প্রায়রিটি আফটার প্রায়রিটি। আসলে, জীবন তো বড় ছোট না !

গম্ভীর হয়ে গেলাম।

আমি বললাম, তা ঠিক। তুই কুড়ি বছরেই একথা যে বুঝেছিস এটাই তোর কৃতিত্ব। আমি যে এখনও সে কথা পুরোপুরি বুঝেই উঠতে পারলাম না। আজও ভাবি যে, জীবন বুঝি অনন্ত। এখনও অনেক কিছুই করার সময় আছে। আসলে বোঝা উচিত যে, নেই।

সনু বলল, অবশ্য দীর্ঘ জীবনটা ইমমেটেরিয়াল। গ্রিক হিরো অ্যাকিলিস বলেছিলেন না ? জীবনের দৈর্ঘ্য দিয়ে জীবনের মাপ হয় না কখনওই। জীবনে কে কী করল, সেটুকু দিয়েই জীবন মাপা হয়।

তারপরেই বলল, আমি চললাম। একটু গান শুনব ওয়াকম্যানে। বড় টেনশানে আছি। বুঝেছ বাবা ! কখন খাবে ? মায়ের তো আজ আসার ঠিক নেই। তুমি দেরি করলে আমি কিন্তু খেয়ে নেব।

তোর আবার কিসের টেনশান ?

জে, এন, উ্য-তে ভর্তি হবার পরীক্ষা দিয়েছিলাম তো। রেজাল্ট বেরোবে দু একদিনের মধ্যেই।

জে. এন. উ্য মানে ?

দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি ?

সে কী ! কবে দিলি আবার পরীক্ষা ?

ওই তো ! দিয়ে দিয়েছি। পরীক্ষা সব জায়গারই দিয়ে রেখেছি। তবে জে, এন, উ্য-তে হবে না। সারা দেশের ছেলে মেয়েরাই দিয়েছে তো ! তার মধ্যে আমার কোনও চান্সই নেই।

আর যদি পেয়ে যাস ? কী হবে ?

আতঙ্কিত গলাতে আমি বললাম।

কী আবার হবে। চলে যাব।

কোথায় ?

দিল্লিতে ! রাজধানী।

সে কী রে।

আমি সোজা হয়ে বসে, উৎকণ্ঠিত গলাতে বললাম।

তারপর বললাম, আমি তোকে যেতে দেবই না। তুইই আমার একমাত্র সঙ্গী, বন্ধু ; ফিলসফার।

ফাই-ফরমাস খাটার মানুষ, হাতের নড়ি; অন্ধের যষ্টি। তবে মা আর দিদির কি সময় আছে আমার দিকে দেখার ? তোকে কিন্তু আমি যেতে দেব না। আগেই বলে রাখছি। দুটি কান খুলে শুনে রাখ।

সনু হাসল। শব্দ না করে।

বললাম, হাসছিস যে বড়।

ও বলল, কী যে বলো। তুমি সেনাইল হয়ে যাচ্ছ বাবা। আমাকে যদি বিয়ে দিয়ে দিতে ? তখন যেতে না দিয়ে পারতে ?

অকাট্য যুক্তিতে আটকে গিয়ে তুতলে বললাম, বিয়ে ? বিয়ে দিলেও খুঁজে পেতে ঘরজামাই আনতাম। আমার সনুকে আমি ছাড়তে পারব না। ছেড়ে, বাঁচতেই পারব না একদিনের জন্যেও।

সনু চুপ করে থাকল একটুক্ষণ।

বলল, সকলকেই সকলে ছাড়ে বাবা। ছাড়তে হয়ই। আজ আর কাল। তা ছাড়া, ছাড়ার কত্ত রকম হয়। এই যে আমাদের বন্ধু রিঝির ছাড়তে কি হল না ? আমরা তো কতজনাই ছিলাম। আটকাতে কি পেরেছিলাম। রিঝি জড়িয়ে ধরে রাখতে চাইল, তার বাবাকে, শ্মশানযাত্রীরা এসে বললেন, আর দেরি করা ঠিক হবে না হে, এবার ওঠাও। জ্যান্ত জ্বলজ্বলে রিঝির বাবা থেকে, হঠাৎই তিনি একটা "ডেডবডি" হয়ে গেলেন। একটা ফোটো। ফোটোমাত্র। জীবন এরকমই····

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমার মেয়ের কথা শুনে। সে বি.ও পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু আমার চোখে সে যে আমার সেই ছোট্ট সনুই। এই তো সেদিন জন্মাল সনু। মিতুর সেকেন্ড সিজারিয়ান বেবি। সেদিন !

অনুরাধাও যাবে নাকি ? দিল্লি ?

আমি শুধোলাম।

অনুরাধা খুব আদরের মেয়ে। ওকে বাড়ি থেকে ছাড়বেই না। ছোট মেয়ে। তাছাড়া ও এ কারণে পরীক্ষাই দেয়নি জে এন ইউর।

তুমিও তো আমার ছোট্ট মেয়ে। তুমি কি অনাদরের ?

আমাকে তুমি বলো না, দূর হয়ে যা। রেগে গেলে ?

বলিরে বলি। সে তো মুখেরই কথা। তুই চলে গেলে, আমিও থাকব না কলকাতাতে। চলে যাব কোথাও। বলে দিচ্ছি। দেখিস !

যাবে কোথায় ?

যেদিকে দুচোখ যায়।

হ্যাঁ। তুমি দেখি শরৎবাবুর শ্রীকান্তর মতো ডায়লগ দিচ্ছ।

তুই পড়েছিস নাকি শরৎবাবুর শ্রীকান্ত ?

না। আমি পড়িনি। দিদির সব পড়া। দারুণ তাড়াতাড়ি পড়তে পারে দিদি। বড় ব্যারিস্টারের মতো। অনুরাধা চক্রবর্তী পড়েছে আমাদের ক্লাসের। ওই বলত, প্রেসিডেন্সির ছেলেদের, এই, শ্রীকান্তর ডায়লগ ঝাড়িস না তো !

কবে জানতে পারবে রেজাল্ট ? জে এন ইউর ?

এনি মোমেন্ট।

ঠিক সেই সময়েই ফোনটা বাজল।

আমিই তুললাম। গলাটা খুবই চেনা লাগল। সনুর কোনও অবাঙালি বন্ধু।

ইয়েস। প্লিজ স্পিক হিয়ার।

আমি বললাম।

হো-য়া-ট ! আই ডোন্ট বিলিভ ইট। হি-ই-ই-ই।

বলেই, লাফাতে লাফাতে ডান হাতে রিসিভার ধরে, বাঁ হাত উপরে তুলে, যেমন করে ম্যাচ জিতে স্টেফি গ্রাফ হাত তোলে, বলল ; পেয়ে গেছি ! পেয়ে গেছি ! পেয়ে গেছি। বা-ব্বা-বা-আ। আই কান্ট বিলিভ ইট !

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পরে বলল, থ্যাঙ্কস আ মিলিয়ান গীতাঞ্জলি। বাই।

কোন গীতাঞ্জলি ?

আমি চোরের মতো বললাম।

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে বইমেলাতে দেখা হয়েছিল না ? সেই।

তারপরেই আমার মনে পড়ল গীতঞ্জলিকে। গীতাঞ্জলি চতুর্বেদী । ওর বাবা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সেক্রেটারি। ওর বাবার এক বন্ধু দিল্লিতে ফল জেনে ওঁকে তক্ষুনি ফোন করে খবর দিয়েছেন। গীতাঞ্জলিও যাচ্ছে দিল্লিতে।

সনু বলল, মা যে কী রেকর্ডিং করছে এতক্ষণ আকাশবাণীতে ! ও, না। রেকর্ডিং করে তো ন্যু-মার্কেট হয়ে আসবে বাজার টাজার করে। মা শুনলেই খুব লাফাবে।

হ্যাঁ। আমি বললাম।

বলেই, একটা বড় জিন ঢাললাম।

বললাম, সনু, তুই কি সত্যিই যাবি নাকি ?

বাবা। উ্য রিয়্যালি আর আ · · ·। যাব না ?

আমি চুপ করে গেলাম। বুকের মধ্যেটা ফাঁকা হয়ে গেল।

ও বলল, ভাল কথা। তুমি ভারতী রায়কে চেনো ?

কে ভারতী রায় ?

ক্যালকাটা উ্যনিভার্সিটির প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার।

চিনি মানে, দুবার দুজায়গাতে দেখা হয়েছিল। অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা। অত্যন্তই খোলামেলা, সপ্রতিভ। এবং বিন্দুমাত্র এয়ার নেই। কথাও বলেন চমৎকার। আ গ্রেট লেডি ! কিন্তু কেন !

এখন নিয়ম করেছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, শুনেছি, উনি আসার পরই যে, রেজাল্ট যবেই বেরোক, যে সব ছেলেমেয়ে বাইরের কোনও ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে তাদের রেজাল্ট পাবলিকলি বেরোবার আগেই কনফিডেনশিয়ালি পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে রেজাল্টের জন্যে তাদের ভর্তি হওয়া আটকে না থাকে। শুনেছি বাবা। তুমি প্লিজ একটু ফোন করো না। গীতাঞ্জলি ফোন নাম্বার দিয়েছে ওঁর।

তুই ডায়াল কর।

বলেই, জিনটা এক গাল্পএ গিলে ফেললাম।

সনুকে বললাম, সনু আমি আজকে দশতলা থেকে নীচে ঝাঁপ দেব।

কেন ?

আমার সনু আরও উন্নতি করবে বলে তার একটা মাত্র বাবাকে একা ফেলে দিল্লি চলে যাবে। আর বেঁচে থেকে আমি কী করব ! উন্নতি করার কি অন্য কোনও উপায় ছিল না !

সত্যি। তুমি না ! দাঁড়াও। ডায়াল করি। ডায়াল করে, ভারতী রায়কে চেয়েই বলল, নাও। নাও। শিগগির নাও। কথা বলো। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার বলে কথা ! আমার ভয় করছে।

আমি বুদ্ধদেব গুহ বলছি। নমস্কার। চিনতে পারছেন ?

বাবাঃ। বুদ্ধদেব গুহকে না চিনলে চলবে ?

ওঁকে সমস্যার কথাটা বলতেই উনি বললেন, নো প্রবলেম। দুশো টাকা জমা দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করে দিতে বলুন। কনফিডেনশিয়ালি রেজাল্ট আগেই পাঠিয়ে দেব। আমি আসার পর থেকে, অন্য

জায়গাতে সুযোগ পেয়েও ফল দেরিতে বেরোবে বলে, ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারবে না এমনটি আর হতে দিচ্ছি না।

বললাম, আপনি শুধু সুন্দরীই নন। সুদক্ষ সহ-উপাচার্যও বটে। অশেষ ধন্যবাদ।

সৌন্দর্য এবং দক্ষতার সহাবস্থান কি দোষের ?

হেসে বললেন উনি।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ।

বলেই, রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বললাম, সনু। যাঃ। তোর কাজ হয়ে গেল। চমৎকার মহিলা। কোনও ফর্ম আছে কিনা খোঁজ নিয়ে সেই ফর্মে টাকা জমা দিয়ে দে। কিন্তু · · · । কিন্তু কী করে থাকবি একা একা ? মা-বাবা কাকা-কাকিমারা মামা-মামিমারা, মাসি, দিদি সকলকে ছেড়ে · · ·

ফ্ল্যাটে আসার পরে তো অনেক বছর একা থাকা অভ্যেসই হয়ে গেছে বাবা। আর অন্যরা কেই বা কতটুকু খবর রাখে আমরা বেঁচে আছি কি মরে গেছি। তুমিই বা কতক্ষণ বাড়ি থাকো ? বা কলকাতাতেই ? দিদি ও মাও তো তাইই ! সবই অভ্যেস হয়ে যাবে বাবা। কিছু ভেব না। বিদেশে যাচ্ছে কত ছেলে মেয়ে। তাদের বাবারা কি কাঁদতে বসছে পা ছড়িয়ে ? তুমি ভীষণই ব্যাক-ডেটেড বাবা।

ভাবছিলাম আমি। বিদেশে যে কেন যায় ছেলেমেয়েরা ! সকলেই কি খুব কিছু একটা হয়ে ফেরে ? অনেকে তো ফেরেই না। বিদেশে গেলেই কি লেজ গজায় ? গজার ছেলে ধ্বজাকে বি.এ পড়তে পাঠিয়েছিল গজা ইংল্যান্ডে। মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে। দুনম্বরি বড়লোক। টাকার অভাব কী ? ট্যাক্স দিতে হয় না। ইন্ডিয়াতে নাকি বি.এ-টাও ভালভাবে পড়া যায় না ! কী পড়ে এসেছে জানি না। তবে ফিরে এসেছে ধ্বজা। একটা ট্রাউজার পরে এসেছে। তার একটা পা নীল আর অন্যটা লাল। পেছনেও হয়তো অন্য রঙ ছিল, লক্ষ করিনি সেদিন। পরে একদিন লক্ষ করে দেখতে হবে।

গজা বলল, দ্যাখ দ্যাখ, আমার বিলেত-ফেরৎ ছেলেকে দ্যাখ।

গজাদের মাছের ভেড়ি আছে। টাকার অভাব নেই। এখন একটু "কালচার"-এর দরকার। "জাতে ওঠার" জন্যে।

সনু কালই সকালে চলে যাবে। দিল্লিতে।

তার মা, তার দিদি এবং সে, গত তিন সপ্তাহ ধরে বিয়ের তত্ত্ব সাজানোর মতোই তত্ত্ব সাজিয়েছে। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই ; চান নেই। মাথার চুল সব খাড়া। জামা-কাপড়, বই-পত্র, কাগজ-খাতা, কলম-কালি, এখানের সকলের ঠিকানা, দিল্লির সকলের ঠিকানা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের। ফোন-নম্বরের লিস্ট।

গত প্রায় সাতদিন রাতে সনু বাড়িতে খায়নি। স্কুলের বন্ধুএবং কলেজের বন্ধুরা বাড়িতে নেমন্তন্ন করে আলাদা করে ওকে খাইয়েছে। বন্ধুরা তো বটেই, বন্ধুর মায়েরাও খুবই ভালাবাসেন ওকে।

বন্ধুদের সকলকেও ও একদিন খাইয়ে দিয়েছে।

পরশু ডেকে বলেছিলাম, মায়ের মনটা খারাপ, আর তুমি রোজই বাইরে খাচ্ছ ? বাড়িতে একটু থাকলে কী হয় ?

আজকালকার ছেলেমেয়েরা সকলেই বাইরে বড়ই রুক্ষ-স্বভাবের। ক্যাট ক্যাট করে কথা বলে। পৃথিবী বদলে গেছে, তাই তাদের আবরণকেও পুরু করতে হয়েছে বোধহয়। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো ওদের ঋতি। বাইরে থেকে ওদের হৃদয়ের নম্রতা বোঝা যায় না। অনেকখানি খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়।

সনু বলল, তা কী করব ! বন্ধুরা আমাকে যদি নেমন্তন্ন করে তো কি 'না' বলব !

আমার কাছেও তো আসতে পারো একটু।

কী হবে এসে ! তুমি তো সবসময়েই কাজ করো। তোমাকে ডিসটার্ব করি না। আমারও এখন এত কাজ। সংসার উঠিয়ে নিয়ে হস্টেলে থাকব তো। বোঝো না কেন বাবা !

পাকা গিন্নির মতো বলল সনু।

বুঝি রে ! বুঝি বলেই তো···

বালিগঞ্জ পার্ক-এর চক্রবর্তীদের বাড়িতে কার যেন বিয়ে। লীলাদিদের (মজুমদার) বাড়ির কাছেই। অথবা বৌভাত। অথবা বিয়ের পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর হবে।

আমার মনটা ভারী খারাপ। অফিস যাইনি আজ। বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকেই ফিসফিস করে। আমি ওঁদের চিনি না। ওঁরাও আমাকে চেনেন না, কিন্তু ওঁদের বাড়ির দুগগোপুজো বা বিয়ে সবই আমাদের বহুতল বস্তি থেকে চোখে পড়ে। না চিনেই বলতে পারি ওঁরা কলকাতার বাঙালি পরিবারদের মধ্যে 'Last of the Mohicans' ! গর্বিত হই।

চক্রবর্তী বাড়িতে সানাই বাজছে। এতদূর থেকে বৃষ্টি ফিসফিসানির মধ্যে রাগটা যে কী তা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত বিভাস। যোগিয়াও হতে পারে। তখন সকালের সানাই বাজছিল।

দেখতে দেখতে সন্ধে নেমে এল। বৃষ্টি থেমে গেছে। সানাই-এর শব্দ জোর হয়েছে।

সনু চিংড়িমাছ খেতে খুব ভালবাসে। গড়িয়াহাটে গৌর সাহার দোকান থেকে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব বলেছিলাম, মাছ। কিন্তু মিতু বলল, যাওয়ার আগের দিন যদি পেট আপসেট করে ? মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাক।

এ বাড়িতে আমার কোনও মতই খাটে না ! অতএব।···

আমি এখন আমার লেখার টেবলের সামনে বসে আছি বাইরে চেয়ে। ঘর অন্ধকার করে। দিনের বেলাতে যে বড় কদম গাছ আর জোড়া অমলতাস দুটি চোখে পড়ে বালিগঞ্জ পার্ক-এর পথের মোড়ে, তাদের দেখা যাচ্ছে কিন্তু অন্ধকারে তাদের রূপ বোঝা যাচ্ছে না। অন্ধকাবের মধ্যে অন্ধকারতর দেখাচ্ছে তাদের। ঝুপড়ি-ঝুপড়ি। আজ রাতের আমার সব ভাবনারই মতো।

রাতের সানাইয়ের রাগের চেহারাটা স্পষ্ট হয়েছে এখন—হংসধ্বনি। হংসধ্বনি বাজছে।

প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ আগে রবিশংকরের একটি ডিস্কে ওই হংসধ্বনি প্রথম শুনি। গান-বাজনার কতটুকুই বা বুঝি।

ভালবাসি, এইটুকুই !

সানাইয়ের সুরে শিশুকাল থেকে শুধু আনন্দই পেয়ে এসেছি। সানাইয়ের সুর যে এত ব্যথাবাহীও তা আগে কখনই হৃদয়ঙ্গম করিনি। কত শত বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সানাইওয়ালার সামনেই বসে থেকেছি। খাদ্যের চেয়েও গানবাজনা আমার কাছে চিরদিনই বেশি প্রিয়। নির্গুণ হলেও মুগ্ধ হয়ে বাজনা শুনেছি। কিন্তু সেই সুর, বিদায়ী কন্যার হাস্যমুখী বাবা-মায়ের হৃদয়ের গভীরে যে কত অন্যরকম ক্ষতের ব্যথাবাহী বিধুর ভাবের উদ্রেক করে, তার বিন্দুমাত্র খোঁজও রাখিনি এত বছর।

সন্ধের সময়ে সনুর একমাত্র মাসি এল। অনেক খাবার-দাবার নিয়ে। হজমি, দইবড়া, আচার, চুরমুর, বিস্কিটের প্যাকেট, জীবনে প্রথমবার বাইরে পড়তে-যাওয়া এবং প্রবাসী হয়ে-যাওয়া বোনঝির জন্যে সব গুছিয়ে নিয়ে। আরও অনেকে এলেন। অনেকে ফোনও করলেন।

রাত দশটা বাজতে চলল। আমি বললাম, এবারে শুয়ে পড়ো সনু। ভোর সাতটাতে ফ্লাইট। পাঁচটাতে বেরোতে হবে।

তারপর বললাম, আমার কাছে একটু শোবে না আজ ?

সনু বলল, বাবা ! কত্ত কাজ যে এখনও বাকি তোমাকে কী বলব।

আমি কিছুই আর বললাম না। অধিকার বলে তো কিছুমাত্রই নেই আমার মেয়ের উপরে। মেয়েকে চোখের দেখা দেখতে পাওয়াও অনেকখানি আমার কাছে। বাবার তেমন কোনও ভূমিকাও নেই আমার মেয়েদের জীবনে। এবং এই সংসারেও।

মৌ, সনুর দিদি সঙ্গে যাবে। ন বছরের বড় দিদি, প্রায় গার্জেনেরই মতো। একজন মক্কেলকে বলে দিয়েছিলাম, দিল্লি এয়ারপোর্টেই একটি গাড়ি পাঠাবেন। ওরা যতদিন থাকবে, গাড়িটা থাকবে ওদের সঙ্গে। দিল্লিতে এখন ভারী পচা গরম। তাই এ.সি. গাড়িই পাঠাতে বলেছি।

আমি বললাম, এয়ারপোর্টে কি আমি যাব ?

সনু বলল, একদম না ! তুমি গিয়েই দশজনের সামনে যাত্রা করবে। জানো বাবা, শো অফ এমোশানস কিন্তু শিক্ষার লক্ষণ নয়। আনন্দেও কাঁদতে নেই : শোকেও নয়।

আমি বললাম, কারেক্ট। তোরা আমার মৃত্যুতেও কাঁদিস না।

সত্যিই। কান্নাকাটি, চোখের জল, এসব অশিক্ষারই লক্ষণ। কোনও সন্দেহ নেই। এসব গ্রাম্যতাও। এ কথা আমিও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যে এখনও গ্রাম্যই রয়ে গেছি রে মা। গ্রামের ছেলে তো একপুরুষে শহুরে হতে পারে না।

আমার ঘুম আসছিল না। রাত আড়াইটা অবধি লিখলাম। পুজোর লেখার সময় এখন। যদিও খুবই কম লিখি, তবুও চাপ পড়েই। তারপরেও যখন ঘুম এল না তখন একটা অ্যালজোলাম খেলাম।

হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল। আচমকা, দরজা খুলে ঘরের মধ্যে দুড়দাড় করে ঢুকে সনু বলল, শোনো বাবা। আমরা এবারে যাব। তুমি কি চা খাবে ?

আরে ! আমাকে আগে কেউ উঠিয়ে দেয়নি কেন ? বাড়িসুদ্ধ মানুষে উঠে তৈরি হয়ে যেতে পারল আর ··· পঞ্চানন ! তোরা ভেবেছিস কী ? পাঁচটা হয়ে গেছে। এখন তৈরি হব কী করে ? সাতটাতে যে প্লেন ছেড়ে যাবে।

তুমি থাকো বাবা, মৌ বলল। তোমার শরীর ভাল নেই। চোখে হেমারেজ হয়েছে। তাই নিয়ে কাজ করছ ! তাড়াহুড়ো করতে হবে না। চা খাও। এসো, বাইরে এসে বোসো।

মিতুর ঘরে ওরা ফাইনাল-টাচ দিচ্ছিল। ড্রাইভার, রাতে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারেই ছিল। সে গাড়ি বের করেছে। সনুর বড় ট্রাঙ্কও তাতে উঠে গেছে। এখন ওভার-নাইটার দুটি নিয়ে, দুই বোনে নামবে। মিতুও তৈরি হয়ে গেছে।

সনু তৈরি হয়েই ঘর থেকে বাইরে এল। আমি বসবার ঘরের সোফাতে বসে চা খাচ্ছিলাম। আমার মন ভারী খারাপ। সনুকে দেখে, আমি সোফা ছেড়ে, চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে, দাঁড়িয়ে উঠলাম।

ডাকলাম, সনু !

আমি ডাকলাম না। বুকের মধ্যে থেকে অন্য কেউ যেন আর্তনাদ করে উঠল।

আমার আধুনিক, কঠিন হৃদয়ের ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট সনু হঠাৎই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দৌড়ে আমার বুকে এসে আছড়ে পড়ল। আমিও অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের মতো কেঁদে উঠলাম।

পরমুহূর্তেই ওকে আদর করে বললাম, কাঁদে না ! কাঁদে না মা ! জীবনে বড় হতে যাচ্ছ, মানুষ হতে যাচ্ছ ; কাঁদে না সোনা।

তারপরই লিফট-এ করে সকলে নেমে, নীচে এলাম।

গাড়িতে সনু, তার মা আর তার দিদির মধ্যিখানে বসেছিল।

গাড়ি ছেড়ে দেবার আগে, গাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমি আবার ডাকলাম, সনু।

সনু হাতটা বাড়িয়ে দিল। ওর পুরো হাতের পাতায় নয়, ওর চারটি আঙুলের সঙ্গে আমার

আঙুলের একবার ছোঁয়া লাগল।

কী যেন বলতে গেলাম আমি। বলতে পারলাম না। আমার আত্মজার পরশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কান্নাতে এই গ্রাম্য, অশিক্ষিত মানুষটার গলা বুজে এল।

মিতু বলল, এবারে যেতে হবে।

গাড়িটা ছেড়ে দিল।

যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ হাত নাড়লাম সনুকে। দশতলাতে উঠতে উঠতে লিফটম্যান রতনকে বললাম, ছোট দিদি চলে গেলরে রতন। দিল্লিতে। বড় হবে বলে।

কবে আসবেন আবার ?

সেই ডিসেম্বরে।

ডিসেম্বর তো অনেকই দেরি।

আমি মাথা নাড়ালাম।

আমার চোখের জল দেখে লিফটম্যান রতন নিজেই অস্বস্তি বোধ করে, চোখ নামিয়ে নিল।

আমি ভাবছিলাম, মানুষ হয়তো একদিন চাঁদেই বাস করবে। সুপার-কম্পুটার নির্ধারণ করবে আমাদের নিত্যকার জীবনযাত্রা। কিন্তু পিতা-পুত্রীর সম্পর্কের ওপরে কোনও যন্ত্র, কোনও দেবতা, কোনও দাবি কখনও প্রভাব ফেলতে পারবে না। আমার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোটি কোটি বাবার আদরের সনুরা, তাঁদের কাছে সনুই থাকবে। বড় আদরের ধনু ; কুসুমরতন !

বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। গাড়ির চাকা-চারটেতে হাওয়া বেশি নিয়েছিল নিরঞ্জন গতকাল। এয়ারপোর্টের রাস্তাতে গাড়ি স্কিড না করে। আমার চিন্তা হচ্ছিল।

ফ্ল্যাটে ঢুকে আমি আমার ঘরে গিয়ে শুলাম।

সেই সকালে চক্রবর্তীদের বাড়িতে সানাই থেমে গেছে। একটু পরেই ম্যারাপ খোলা শুরু হবে। নগ্ন বাঁশগুলো, কোনওরকম সিমেট্রিহীন বাঁশগুলো ; দিগ্বিদিকে দাঁত উচিয়ে জেগে থাকবে। শয়ে-শয়ে বাঁশ।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বা, ঘোরে ছিলাম। কর্ডলেস ফোনটা হাতের কাছেই ছিল। হঠাৎ বাজতেই উঠিয়ে নিলাম।

মৌ ! কী রে ? মৌ !

বাবা, চিন্তা কোরো না। চেক-ইন করে নিয়েছি। সনুর সঙ্গে কথা বল।

সনু স্বাভাবিক, সপ্রতিভ গলাতে বললও, শোনো, বাবা ! চেক-ইন করে নিয়েছি। ভাল থাকবে। ওই সব খারাপ জিনিস কম খাবে।

বললাম, প্রতি সপ্তাহে ফোন কোরো আমাকে। রিলিজয়াসলি। বুঝেছ। মাকেও চিঠি লিখবে। ফোন করা ছাড়াও।

ও বলল, হুঁ।

তারপর বলল, তোমার পাঠক-পাঠিকাদেরই মতো আমাকেও চিঠি লিখো। লিখবে তো ? যদিও আমি তোমার কোনও বইই পড়িনি। এমন কী যে-বই তুমি আমাকে উৎসর্গ করেছ, সেই বইও।

বাক্যটি শেষ করেই সনু স্তব্ধ হয়ে গেল।

আমি কল্পনা করে খুব আনন্দ পেলাম যে, সেই "পাপের প্রায়শ্চিত্ত" করতে সনু তার অপদার্থ বাবার জন্যে হয়তো এক ফোঁটা চোখের জল ফেলছে। নীরবে। হয়তো।

বলতে গেলাম হ্যাঁ। কিন্তু হয়ে গেল ভ্যাঁ।

ছাড়ছি বাবা।

বুদ্ধিমতী সনু বলল, তাড়াতাড়ি, আমার স্বরের বৈকল্য বুঝেই।

আমি রেসপনসিবল বাবা হয়ে গিয়ে, বললাম লুক আফটার ইওরসেল্ফ। বি সাকসেসফুল ইন লাইফ সনু। বি ব্রেভ।

বলেই, সুইচ— অফফ্ করে দিলাম কর্ডলেসটার। ভাবছিলাম আমরা যখন সনুদের বয়সী ছিলাম তখন আমরা কথাটাকে জানতাম "Battle Of Life" বলেই। কিন্তু আজকে ওদের জীবন তো শুধু একটি মাত্র "Battle"-এর নয়। অগণ্য "Battle"-এর সমষ্টি। অনেকই লড়াই ওদের লড়তে হবে। আজীবন। "War Of Life"- এ জয়ী হতে হবে।

আমাদের মতো অশিক্ষিত, এমোশানাল ; গ্রাম্য মানুষের দিন শেষ হয়ে গেছে।

বড় কষ্টের হবে ওদের বেঁচে থাকাটা, বড়ই সংগ্রামের।

বেচারি সনু।

আমার সনু।

আমাদের প্রজন্মের বাবা-মায়েদের লক্ষ লক্ষ সনুরা।

দিয়ে যাওয়া

সমরেশ মজুমদার

মেঝেতে পাতা বিছানায় শোয়া বিজনের একদম অভ্যেস নেই, গায়ে পিঠে খুব বেদনা হয়ে যায়। অথচ এই ঘরে যে ছোট ডিভানটা রয়েছে তাতে দুজনের কুলোবে না। আর একটা খাট কিনতে হবে, বাইরের লোকজন এলে মুশকিলে পড়তে হয়। অবশ্য এর আগে এমন কেউ আসেনি যে নিজেদের শোয়ার খাট ছেড়ে দিয়ে ওদের বাইরের ঘরের মেঝেতে শুতে হয়েছে। বিজন মুখ ফিরিয়ে দীপাকে দেখল, শোয়ার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। যেন এইরকম শক্ত মেঝেতে শুতে ও আজন্ম অভ্যস্ত। দীপা কী অদ্ভুতভাবে সবকিছু মানিয়ে নিতে পারে। ওর বিয়ের আগের স্বাচ্ছন্দ্য আর এখনকার অভাবটভাবগুলোর মধ্যে যেন কোনও ফাঁকা জায়গা নেই। যেসব মেয়েরা প্রেম করে বিয়ে করে তাদের মনের জোর বোধ হয় খুব জোরালো হয়ে যায়।

এতদিন যে কথাটা মনে হয়নি, ওদের এই দু'ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাটটাকে খুব ছোট বলে মনে হচ্ছে এখন। মাত্র বছর দেড়েক ওদের বিয়ে হয়েছে, এখনও ভাল করে ঘরদোর সাজানো হয়নি। জিনিসপত্রে ঘর জুড়ে আছে, কিন্তু তবু সেই দেশলাই বাক্সের উপমাটাই বার বার মনে আসছে। বিছানা ছেড়ে উঠল বিজন, বড্ড গরম হচ্ছে। এ-ঘরে ফ্যান নেই। ওদের যাবতীয় সম্পত্তি পাশের ঘরে, ওদের শোয়ার ঘরে। আলো না জ্বেলে ভেতরের বারান্দায় এল ও। দরজা খোলার সময় শব্দ বাঁচাতে গিয়েও জোর শব্দ হল। মাঝরাত্রে শব্দগুলোর প্রাণশক্তি যেন বহুগুণ বেড়ে যায়। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেতে খেতে মনে হল পাশের ঘরেও ফ্যান ঘুরছে না। চিরকাল হাত-পাখা চালিয়ে ফ্যানের হাওয়া দাদুর একদম সহ্য হয় না। ছেলেবেলায় দেখেছে, ঘুমোতে ঘুমোতে দাদুর একটা হাত পাখাটাকে ঠিক নেড়ে যেত। কী মনে হল, বিজন ওদের শোয়ার ঘরে উঁকি দিল। দরজা বন্ধ করেননি দাদু। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরটা বেশ দেখা যায়। ও-পাশের জানলা দিয়ে ফিকে চাঁদের আলো ওদের খাটের বাজুতে এসে

পড়েছে। সাদা ধপধপে বিছানায় দুই পা সোজা করে দাদু শুয়ে আছেন। দাদুর গায়ের রঙ অসম্ভব ফর্সা, এই নব্বুই বছরেও রঙটা মরেনি। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে গিয়ে কী রূপময় লাগছে এই মুহূর্তে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘরে ফিরে এল বিজন। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ও বুঝতে পারল দীপা জেগে আছে। বিজন বলল, 'ঘুমোওনি ?'

পাশ ফিরে শুয়ে দীপা বলল, 'বড্ড গরম, ঘাড় গলা একদম জবজব করছে।' বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতড়ে একটা সিগারেট বের করল বিজন। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে চট করে ঘুম আসতে চায় না। এই সময় সিগারেট খেতে মন্দ লাগে না। দেশলাইটা জ্বালতেই অন্ধকার ছিটকে সরে গিয়ে আবাব ছুটে এল। শুয়ে শুয়ে সিগারেটে টান দিয়ে বিজন বলল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?'

'ধ্যুৎ, দাদুর জন্যে তো আলাদা করে কিছু করতে হচ্ছে না। প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম, এখন দেখছি একদম মাটির মানুষ।' তারপর একটু চুপ করে থেকে আদুরে গলায় বলল, 'এই, আমাকে একটা টান দাও !'

হাত সরিয়ে নিল বিজন, 'না, তোমার অভ্যেস হয়ে যাবে। বাঙালি মেয়ের সিগারেট খাওয়া কী! তারপর আবার কী ভেবে দীপার হাতে সিগারেটটা দিয়ে দিল ও। মাঝে মাঝে দীপার মাথায় এরকম ভূত চাপে। টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে যেতে বললে নিজেই ধরিয়ে এনে দেয়। এ নিয়ে অনেক ঠাট্টা করেছে বিজন। ব্যাপারটা সবটাই মজা দীপার কাছে। দীপার কাছ থেকে সিগারেটটা ফেরত নিতে নিতে বিজন বলল, 'এসময় তোমার পেটে নিকোটিন যাওয়া ঠিক নয়, বুঝলে !'

'কেন ?'

'পেটের ভিতর যিনি আছেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন !' সঙ্গে সঙ্গে বিজনের কোমরে প্রচণ্ড চিমটি কাটল দীপা। প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল বিজন, দীপা চাপা গলায় বলল, 'বদমাস !'

খানিকবাদে দীপা বলল, 'আমাদের এই সতুবদ্যিটা একদম বোগাস, সামান্য কাটা ঘায়ের জন্যে ইঞ্জেকশন দিতে চায়, বোঝো !' ওদের পাড়ার ডাক্তার এস কে রায়কে দীপা ঠাট্টা করে সতুবদ্যি বলে। সামান্য জ্বরজারি হলেও ইঞ্জেকশন ছাড়া কথা বলে না। অল্প পয়সায় চট করে অসুখ সেরে যায় বলে রুগী উপচে পড়ে। বেশির ভাগই গরিব গেরস্ত মানুষ। সেই সতুবদ্যির কাছে দাদুকে নিয়ে গিয়েছিল দীপা। দিন সাতেক আগে দাদুর বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে ঘা-টাকে আবিষ্কার করেছিল ও। দাদু বলেছেন, বেশ ক'দিন থেকেই ওটা হয়েছে, সারছে না কিছুতেই। দীপা দু-একটা মলম দিয়ে কমাতে না পেরে আজ সতুবদ্যির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সতুবদ্যি সব দেখেশুনে একটা ইঞ্জেকশানের কোর্স কমপ্লিট করতে বলছিল। দীপা আপত্তি করায় একজন স্কিন স্পেসালিস্টকে দেখাতে বলেছে। বিজন অবশ্য এতটা গুরুত্ব দিতে রাজি নয় ব্যাপারটাকে। কিন্তু দীপার আবার ডাক্তার দেখানো ব্যারাম আছে। সামান্যতেই ছটফট করে। ও-ই ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে ডক্টর নাগের সঙ্গে। চাঁদনিতে বসেন ভদ্রলোক, দীপার বাবার বন্ধু, ফিসটিস কম নেবেন বোধ হয়। অবশ্য দাদুর জন্য খরচা করতে ও পিছু-পা নয়। উনি এসেছেন আজ ন'দিন হল। প্রথমদিন বাজারে গিয়ে ও খুব বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। এমনিতে ওদের সংসারে আলু পেঁয়াজ আর আড়াই'শ মাছ কিনলে দিব্যি চলে যায়। বেশি রান্নাবান্নার ঝামেলা করতে চায় না দীপা। কলকাতার মেয়েরা বিয়ের আগে বড় একটা হেঁসেলের ধারে ঘেঁষে না। দাদু আসছেন খবর পেয়ে তো ওর নাড়ি ছেড়ে যাবার মতো অবস্থা। অবশ্য দাদু মাছ মাংস ডিম খান না। এই নব্বুই বছর বয়সে ওঁর গলার খাদ্যনালী ছোট হয়ে এসেছে। শক্ত কিছু খেতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে। একদম গলানো ভাত ডাল আর একটা সেদ্ধ হলেই চলে যায়, তবে দুধটা চাই ছেলেবেলায় দাদুকে রোজ শীতকালে এক জামবাটি পায়েস খেতে

দেখেছে বিজন। এখানে অবশ্য জামবাটি নেই। শ্যামবাজার থেকে কিনে আনা কাচের বাটিতে পাতলা করে পায়েস রেঁধে দেয় দীপা বিজনের কথামত, খেয়ে বুড়োর কী ফুর্তি।

এই সময়ে দীপার এতটা খাটুনি উচিত নয়। কিন্তু দাদু যখন নিজে থেকেই এখানে আসার কথা লিখলেন তখন দীপা যেন বেশ খুশি হয়েছিল। ওদের এই বিয়েটা বিজনের বাড়ির লোক সহজ চোখে নেননি। এমন কী বিজনের বাবাও অমত করেছিলেন প্রথমটায়। একমাত্র এই ঠাকুর্দার চাপে সবাইকে মেনে নিতে হয়েছে। মেনে নেননি কেউ, নিলে ছেলের সংসার গুছিয়ে দিতে কেউ না কেউ আসতই। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার দূরত্ব আর কতটুকু ? কিন্তু এই দেড় বছরে ওঁরা কেউ আসেননি বিজনের কাছে। মনে মনে একটা দুঃখ ছিল ওর। বোধ হয় দীপা ব্যাপারটার জন্যে নিজেকে দায়ী করত, মুখ ফুটে বিজনকে অবশ্য বলেনি। তা সেই দাদু আসছেন শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গিয়েছিল ওরা । ওদের এই কলকাতার বাড়িতে দাদু আসা মানে ওদের সব অভাব পূর্ণ হয়ে যাওয়া। এই ফ্ল্যাটটা দোতলায়। যোগাযোগ ছিল বলে খুব সস্তায় পেয়ে গিয়েছিল বিজন। দক্ষিণ খোলা এই ফ্ল্যাট বাড়িটার সামনেই ছোট একটা পার্ক আছে। মোটামুটি ওদের পক্ষে স্বর্গই বলা যায়। দাদু যেদিন কলকাতায় এলেন বিজন একাই যেতে চেয়েছিল স্টেশনে। দীপা বাড়িতে থাকলে দাদুর খাবার-দাবার জল গরম রাখতে পারবে। কিন্তু দীপা শোনেনি সে কথা। জোর করে সেই ভোর রাত্রে প্রায় প্রথম ট্রাম ধরে স্টেশনে ছুটেছিল। অত ভোরে কখনও বেরনো হয় না। বেশ লাগছিল ট্রামে যেতে যেতে। কলকাতার চেহারাটা ভোরবেলায় একদম অন্যরকম হয়ে যায়। যদিও বিজন দাদুর চিঠিতে জেনেছিল উনি একাই আসছেন, তবু ঠিক বিশ্বাস করেনি। এখন শিলিগুড়ি থেকে এক রাত্রেই কলকাতা চলে আসা যায়— কিন্তু দাদুর এই বয়সে একা আসাটা ভাবা যায় না। ট্রেনটা যখন এল প্ল্যাটফর্মে ঠিক তখনি ওরা দাদুকে দেখতে পেল। দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন ওদের দেখে। বয়সে শরীর প্রায় কুঁজো হয়ে এসেছে কিন্তু ট্রেন থামা মাত্রই যেভাবে নেমে এলেন তাতে বয়সটাকে বোঝা যায় না। ওরা প্রণাম করতেই দুই হাত বাড়িয়ে ওদের আঁকড়ে ধরলেন দাদু, তারপর চোখ বন্ধ করে বুক ভরতি বাতাসটাকে ছেড়ে দিলেন আরামে। দাদু একা এসেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল বিজন, তার আগেই দাদু বললেন, 'জোর করে চলে এলাম দিদিমণি, তুমি আমাকে দুটো ভাতে ভাত খাওয়াতে পারবে তো ?' তারপর বিজনের দিকে বুড়ো আঙুল নেড়ে দীপাকে বললেন, 'একে আমার বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না বাপু !' বিজন দাদুর কাঁধ থেকে কাপড়ের ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে নিল। পরে দেখেছে গোটা তিনেক কাপড় আর দুটো লং ক্লথের পাঞ্জাবি, দুটো গেঞ্জি, একটা ব্রাহ্মী তেল, একটা চিরুনি নিয়ে দাদু সটান চলে এসেছেন। এতক্ষণ লাঠিটা কনুইতে ঝোলানো ছিল, এবার এক হাতে লাঠি অন্য হাতে বিজনকে ধরে উনি স্টেশন পেরিয়ে এলেন। ট্যাক্সিতে উঠে বললেন, 'তোমাদের কলকাতার যা গল্প শুনি— আমি থাকতে পারব তো ?' তারপর হেসে বললেন, 'তা তোমাদের ঘরের মধ্যে তো আর কলকাতা ঢোকেনি—কি বলো ?'

দীপা বড় বড় চোখ মেলে দাদুকে দেখছিল। বিয়ের পর ওরা যখন বউভাতে শিলিগুড়ি গিয়েছিল। তখন দাদুর সঙ্গে খুব বেশি কথা হয়নি। ওদের শিলিগুড়ির বাড়িতে দাদুর সঙ্গে কাকারা থাকেন। বিজনের বাবা দাদুর বড় ছেলে, সারাজীবন রেলে চাকরি করে যাচ্ছেন। এখন রিটায়ার করার মুখে গৌহাটিতে পোস্টেড্। ছেলের বউভাতে বিজনের মাকে নিয়ে যেন ক'দিন শিলিগুড়িতে বেড়িয়ে গেলেন। যা কিছু আয়োজন সব দাদুই ভার নিয়েছিলেন। দাদু রিটায়ার করেছেন প্রায় তিরিশ বছর হল। সারাজীবন চাকরি করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছেন তা তিরিশ বছর থাকতে পারে না। কিছু শেয়ার কেনা ছিল চা-বাগানের—তার সামান্য ডিভিডেণ্ড আর শ'খানেক পেন্সনের টাকায় দাদুর চালাতে হয়। কাকারাই সংসার চালান কিন্তু বিজন দেখেছে ওর কিছু ব্যাপার হলে দাদু কোথা থেকে টাকা এনে দরাজ হাতে খরচা করেন। প্রায় চার বছর বয়সে দাদুর সঙ্গে শিলিগুড়ির নতুন বাড়িতে চলে আসে ও।

বাবা-মাকে ছেড়ে সেই চার বছর বয়স থেকে প্রতি মুহূর্তে ওর মানসিকতায় দাদু জড়িয়ে ছিলেন। নিজের ছেলেদের বদলির চাকরির জন্য বোর্ডিংএ রেখে মানুষ করেছেন কিন্তু নাতিকে কখনও চোখের আড়াল হতে দেননি। বউভাতের দিন সবার সামনে দীপাকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কখনও বোকা হবে না, ওকে চোখে চোখে রাখবে, যেমন আমি রেখেছিলাম। এখন থেকে বিজুর দায়িত্ব তোমার ওপর।'

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে দাদু বললেন, 'ওরে বাবা, তোমরা দোতলায় থাকো নাকি ! আমার যে উঠতে বড় অসুবিধা হবে।' দীপা বলেছিল, 'আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

দাদু বললেন, 'তা ধরো ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার নিজের শরীরেই তো রক্ত নেই বাপু। মেয়েমানুষেব ''ারীরে রক্ত না থাকলে সন্তান জড়ভরত হয়ে যায়।' লজ্জায় মাথা নিচু করেছিল দীপা। আড চোখে বিজনের দিকে তাকিয়েছিল, দাদুর চোখে কি এর মধ্যেই ধরা পড়ে গেছে ! বিজন দাদুকে দেখছিল। ঠিক সেই রকম আছেন। একটুও পাল্টাননি। সোজা কথা একদম মুখেব ওপব সোজা বলে দেওয়ার জন্য আত্মীয়স্বজনের কাছে এই মানুষটি বড় অপ্রিয়।

দোতলায় উঠতে বেশ কয়েকবার দাঁড়াতে হল। ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকে দীপা দাদুকে শোয়ার ঘরে নিয়ে গেল। 'আপনি আগে বিশ্রাম করুন, তারপর জামা কাপড় ছাড়বেন।' শোয়ার ঘবে ঢুকে দাদু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেওয়ালে বিজনের ছোটবেলার একটা ছবি ছিল। দাদুর হাত ধরে হাঁটছে। ছবিটা দেখে দাদু চোখ বড় করলেন, 'ওবে বাবা, আমার ছবি দেখছি এখানে ।' তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'দ্যাখো দিদিমণি, বিজুর মুখটা কেমন পাল্টে গেছে, আমি কিন্তু একই রকম আছি—কি বলো ?' ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল বিজন কথাটা শুনে। হঠাৎ, কী সহজে, সেই ছেলেবেলাটা ওর বুকের মধ্যে একছুটে চলে এসে সমস্ত শরীরে একটা কান্নার কাঁপুনি ছড়িয়ে দিল। বিজন পা টিপে টিপে বসার ঘরে চলে এসেছিল।

মাঝরাত্তিরে অন্ধকার বেশ চোখ-সওয়া হয়ে যায়। যদিও এ-ঘরে চাঁদের আলো এখনও আসেনি তবু মুখ ঘুরিয়ে বিজন দীপার মুখ দেখতে পেল। এর মধ্যে কোন ফাঁকে ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। বেচারার খুব খাটুনি যাচ্ছে। এখন দুপুরবেলায় একদম ঘুমোয় না, শুধু দাদুর সঙ্গে বকবক করবে ! বুড়োদের এমনিতে ঘুমটুম কম হয় কিন্তু এ-সময় দীপার তো ঘুমনো উচিত। অবশ্য হিসেবমতো এখনও প্রায় সাড়ে চার মাস দেরি আছে। এর মধ্যে দুবার চেক-আপ করিয়ে এনেছে বিজন। সব ঠিক আছে, শুধু রক্তাল্পতার অভিযোগ। একগাদা ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তার, খেলে তো কাজ হবে ! বিজন আর ওকে ডাকল না। আর ক'ঘণ্টা পরেই তো ভোর হবে। তখন এমনিতেই বেচারার ঘুম ভেঙে যাবে। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দরজায় শব্দ করেন দাদু। আজন্ম দেখে আসছে ও ব্যাপারটা। ছেলেবেলায়, ভোর রাত্রে দাদু ওকে বিছানা থেকে টেনে তুলতেন। ঘুমে চোখ এঁটে থাকত, তাতেই জলের ঝাপটা দিতে বলতেন। শীত গ্রীষ্ম বলে কিছু ছিল না। প্রচণ্ড শীতের ভোরে মাথায় বাঁদুরে-টুপি সারা শরীর পশমে জড়িয়ে দাদুর হাত ধরে ওকে দৌড়তে হত। দাদু এত জোরে হাঁটতেন যে না দৌড়লে তাল রাখতে পারত না বিজন। তখনও আবছা অন্ধকার জড়ো হয়ে থাকত গাছের মাথায়। মহানন্দার ধার দিয়ে দাদু ওকে নিয়ে চলে যেতেন সেই পিলখানা অবধি। যেই সূর্য উঠল, আকাশ সোনায় সোনায় ভরে গেল, ব্যস, দাদু থেমে গেলেন। দু'হাত জড়ো করে তিনবার জয়গুরু বলে প্রণাম করতেন। চুপচপ দাঁড়িয়ে নদী দেখত বিজন। সেই ভোরবেলার ঠাণ্ডা বাতাসে নদীর ওপর দিয়ে একরাশ মায়াময় কুয়াশা গড়িয়ে গড়িয়ে যেত। সূর্যের আলো পড়তেই জলে শরীর থেকে ধোঁয়ার সুতো মাথা চাড়া দিয়ে যেন আকাশটাকে ধরতে চাইত। সমস্ত বাল্যকাল এইভাবে সকালগুলো কেটেছে। যেদিন বৃষ্টি হত সেদিন খুব খুশি হত বিজন। বৃষ্টির ভোরে দাদু তাঁকে ডাকতেন না। বিবাট ছাতাটা

মাথায় দিয়ে গামবুট পরে একাই বেরিয়ে পড়তেন উনি। সূর্য ওঠার আগেই যদি বৃষ্টি থেমে যায়! আর মনে মনে প্রার্থনা করত বিজন, যেন রোজ রোজ ভোরে বৃষ্টি হয়।

কলকাতায় এসে প্রথম ভোরেই এইসব স্মৃতি বিজনের মনে পড়ে গেল। ভোর বেলায় দরজায় শব্দ শুনে দীপার ঘুম ভেঙেছিল আগে। বিজনকে ঠেলে তুলতে ও দরজা খুলে দেখল দাদু দাঁড়িয়ে আছেন। সাজগোজ হয়ে গেছে, হাতে লাঠিটি। দীপা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোথায় যাচ্ছেন দাদু?' 'একটু বেড়িয়ে আসি ভাই। দরজা খোলা থাকবে কিনা, তোমাদের ঘুম ভাঙাতে হল।'

বিজন বলল, 'এখানে তো কাছে পিঠে নদী নেই, গঙ্গা তো অনেকটা দূরে।'

'নদীর কি দরকার হয় সবসময়?' দাদু হাসলেন।

'না, তবে আপনি কি একা-একা হাঁটতে পারবেন, রাস্তা-ঘাট খোঁড়া, গাড়ি ঘোড়া আছে।' বিজনের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না কলকাতায় দাদুর এই মর্নিং-ওয়াকের ব্যাপারটা। কিন্তু এর মধ্যেই দীপা চট করে শাড়ি পাল্টে চলে এসেছে, এসে দাদুর হাত ধরল, 'চলুন, আমরা ঘুরে আসি।'

দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'হুম, আমার চেয়ে তোমার এতে উপকার হবে বেশি, বুঝলে?'

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় অন্ধকারে ঠুকঠুক করে দাদুকে নিয়ে নামতে নামতে ঘাড় ঘুরিয়ে হঠাৎ দীপা চেঁচিয়ে বলল, 'এই, হিটারে জল গরম করে রেখো, আমি এসে চা করব।'

কথাটা কানে আসতেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল বিজন। এমনিতে এটা কিছু নয়। সংসারের অনেক কাজে ও দীপাকে সাহায্য করে। কিন্তু দাদুর সামনে একথা দীপা না বললেই পারত। বেচারা জানে না ওদের বাল্যকালে বাড়ির পুরুষরা এইসব কাজ করলে তাদের স্ত্রৈণ বলা হত। বিস্ময়ে বিজন দেখল, কথাটা শুনেও দাদু পিছন ফিরে ওকে দেখলেন না। বরং দীপার সঙ্গে গল্প করতে করতে নেমে গেলেন। লজ্জা পাওয়ার জন্য নিজেকে নির্বোধ বলে মনে হল বিজনের।

এখন প্রতিদিন ভোরে দীপা দাদুর সঙ্গে মর্নিং-ওয়াকে যাচ্ছে। ভোর পাঁচটায় দাদু এসে দরজায় শব্দ করলেই দীপা তড়াক করে উঠে পড়ে। ওরা বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে আবার ঘুমুতে চেষ্টা করে বিজন। কিন্তু একা একা শুয়ে ঘুমনোর অভ্যেসটা এই দেড় বছরে কেমন করে চলে গেছে—কিছুতেই ঘুম আসে না। আশ্চর্য, দাদু এখন ওকে মর্নিং-ওয়াকে সঙ্গী হতে বলেন না।

পরদিন অফিসে যাবার আগে দাদুকে ডাক্তার নাগের কাছে নিয়ে যাওয়া নিয়ে দীপার সঙ্গে কথা বলে নিল বিজন। ওর অফিস ধর্মতলায়। সেখান থেকে এত দূরে ফিরে এসে আবার চাঁদনিচকে ফিরে যেতে প্রচুর সময় লেগে যাবে। তার চাইতে বরং দীপা যদি ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে চলে যায় তাহলে বিজন অফিস থেকে পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে সরাসরি চেম্বারে চলে যেতে পারে। অন্য সময় হলে দীপা রাগ করত। বলত, সব ঝক্কি বিজন ওর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ঝগড়াঝাটির সময় বলেই ফেলে, 'তুমি খুব স্বার্থপর'। কিন্তু এখন এ প্রস্তাবে ও দ্বিমত করল না। ঠিক হল ডাক্তারের কাছ হয়ে ওরা কালীঘাট মন্দিরে যাবে। দাদুকে টুকটাক করে কলকাতা দেখানো হচ্ছে। আজ এই সুযোগে কালীঘাট হয়ে যাবে। আর এখন বিজন হঠাৎ আবিষ্কার করল, এত বছর ও কলকাতায় আছে কখনও কালীঘাটে যাবার কথা মনে আসেনি। মানুষ নিজের হাতের তালুর দিকে সবচেয়ে কম সময় তাকায়।

অফিস থেকে বেরিয়ে বিজন চৌরঙ্গিটা হেঁটে এল। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দূরত্বটা এত সামান্য যে মিনিট দশেকের মধ্যে ও চাঁদনিতে পৌঁছে গেল। জায়গাটায় ভিড়ভাট্টা বেশি। ফলওয়ালাগুলো রাস্তা জুড়ে চিৎকার করছে। হকারদের জ্বালায় নিশ্চিন্তে ফুটপাথ ধরে হাঁটা মুশকিল। নম্বর মিলিয়ে একটা গাড়িবারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে দাঁড়াল ও! দোতলায় যাবার সিঁড়ির পাশে অনেকগুলো নেমপ্লেটের মধ্যে ডক্টর নাগের নাম দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল বিজন। দীপারা নিশ্চয়ই এখনও আসেনি। ট্যাক্সি পেলে সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই অবশ্য আসর কথা। বিজন সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে

চারপাশে সতর্ক চোখ রেখে সিগারেট ধরাল। সারা গায়ে অদ্ভুত ধবনের পাঁচড়ার মতো ঘা নিয়ে এক ভদ্রলোক আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেলেন। নিশ্চয়ই ডক্টব নাগের কাছে এসেছেন। হঠাৎ ও খুব বিরক্ত হয়ে পড়ল দীপার ওপর। খামোকা একটা বুড়ো লোককে নিয়ে এইসব চর্মরোগগ্রস্ত রোগীর সঙ্গে বসাতে চাইছে দীপা। রোগ রোগ বাতিকটা বোধ হয় ওর মা ওকে দিয়েছেন। শাশুড়ির কথা মনে করলেই নিম্নাঙ্গে বাত, পেটে আমাশা, উইংশু এবং অম্বল, রক্তচাপের হ্রাসবৃদ্ধি মনে পড়ে। বিজন নিজে ডাক্তারদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। কিন্তু দেখেছে, এই কলকাতার সবরকম বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে চেনে এমন লোকের অভাব নেই। সেখানে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলে শুনতে হয়, 'সে কী, ডক্টব মিত্রকে চেনেন না ! কলকাতায় ওর চেয়ে বড় গাইনি কেউ নেই।' অথবা, 'ডাঃ সেনেব নাম শোনেননি ? কী বললেন, ইন্ডিয়ার টপ হার্ট স্পেসালিস্ট।' মেয়েলি কোনও অসুখ অথবা বুকের ব্যামো না থাকলে কেন যে ওদের চিনতে হবে বুঝতে পারে না বিজন। এই ব্যাপাবে দাপা অবশ্য খববা-খবর রাখে। টপাটপ ডাক্তারদের নাম বলে দিতে পারে।

খানিকবাদেই ওরা এসে গেল। ট্যাক্সির বিল মিটিয়ে দিয়ে দাদুর হাত ধরে বিজন গাডিবারান্দার তলায় চলে এল। চাবপাশে এত লোকের চিৎকার, দ্রুত চলাফেরা, রিকশাওয়ালাদের ঘণ্টিব শব্দ— দাদু কেমন বোকা হয়ে গেছেন। দীপা বলল, 'কতক্ষণ এসেছ ?' বিজন বলল, 'মিনিট পাঁচেক। তুমি ঐ সিঁড়িটা দিয়ে এগিয়ে যাও, আমি দাদুকে নিয়ে আসছি।'

সিঁড়িটা প্রায় খাড়াই হয়ে উঠে গেছে। এক পা করে উঠে দাদুকে দাঁড়াতে হচ্ছে। উঠতে উঠতে বললেন, 'এই সব বাড়িগুলো কবেকার বিজু ?' সিমেন্ট-ওঠা সিঁড়ির ধাপে চোখ বেখে বিজন হাসল, 'ক্লাইভের আমলের হবে !'

'কিন্তু দেখছ কী শক্ত গাঁথুনি ! এবা সিঁড়িতে আলো দেয় না কেন ?' দাদু এক হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে অন্য হাতে বিজনকে নিয়ে উঠছিলেন। বিজন উত্তর দিল না। কলকাতায় অনেক কিছু স্বাভাবিক ঘটনা আছে যা প্রথম চোখে মেনে নেওয়া যায় না। কলকাতায় প্রথম পড়তে এসে হোস্টেলেব ঘবে ছয়জনকে শুতে হবে ভেবে ওর কান্না এসে গিয়েছিল। শিলিগুড়ির স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে এরকম অভ্যাস ওব ছিল না। এখন তো এটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

ওপরে উঠে বিরাট চাতাল, তাকে ঘিরে ইউ-শেপে ঘবগুলো সাজানো। ডক্টর নাগের চেম্বারটা দেখতে পেল বিজন। বেশ ভিড় এই সন্ধেবেলায়। ওদের দেখে দীপা এগিয়ে এল, 'আপনি একটু বসুন দাদু। একজন পেসেন্ট ভেতরে আছেন, তারপরেই আপনাকে ডাকবে।'

বিজন দেখল বসার ঘরটা বেশ বড়। অনেক চেয়ার ছড়ানো। মাঝখানে একটা কাঠের গোল টেবিলে কিছু ইংরেজি হিন্দি পত্রিকা রাখা আছে। কাগজের রঙ দেখে বোঝা যায় ওগুলো কয়েকমাস আগে ছাপা হয়েছে। ভিজিটার্স তো রোজ পাল্টাচ্ছে তাই পত্রিকাগুলো পুরনো হয় না।

একটা সোফার অর্ধেকটা খালি পেয়ে দাদুকে নিয়ে বসল বিজন। ভেতরে ডাক্তারের চেম্বার। সুইং-ডোরটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল দীপা। আর কেউ ঢোকার আগেই ও চান্স নেবে। আশেপাশে তাকিয়ে বিজনের কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। এই ঘরের অর্ধেক মানুষ সুস্থ নয়। গায়ের চামড়ায় নানা রকম রোগ কিলবিল করছে। ওর সামনের চেয়ারে এক ভদ্রলোক মুখ নামিয়ে কাগজ পড়ছেন। বিজন লক্ষ করল ভদ্রলোকের ঘাড় গলা কাঁঠালের মতো উঁচু উঁচু হয়ে আছে। অস্বস্তিটা ক্রমশ বাড়তে লাগল বিজনের। এই সব স্কিন ডিজিজ কি সংক্রামক নয় ! এই যে চেয়ারে ও বসছে সেখানে একটু আগে যদি এই ধরনের রোগগ্রস্ত কেউ বসে থাকেন তবে বিজনের তো তা হতে পারে।

হঠাৎ দাদু বললেন, 'বিজু, তুমি ডাক্তার হলে পারতে।' অন্যমনস্ক ছিল বিজন, ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলছেন ?'

সেই সময় ভেতরের দরজা খুলে এক মহিলা আর পুরুষ বেরিয়ে এলেন। দীপা বলল 'এসো।'

বলে কাউকে কিছু না বলতে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটু গুঞ্জন উঠল হয়তো যাঁরা আগে এসেছেন তাঁরাই বিরক্ত হলেন। বিজনের অস্বস্তি হচ্ছিল, দীপা মাঝে মাঝে এমন সব ব্যাপার করে ফেলে। অবশ্য এখানে যাঁরা অপেক্ষা করছেন তাঁরা দাদুর মতো নব্বই পেরোননি। সে হিসেবে নিশ্চয়ই দাদুকে ওঁরা ক্ষমা করে দিতে পারেন।

চেম্বারে ঢুকে বিজন ডক্টর নাগকে দেখতে পেল। বয়স হয়েছে নিশ্চয়ই সত্তরের কাছাকাছি। সাদা হাফ হাতা জামা, মুখটা হাসি হাসি। দীপা এগিয়ে এসে দাদুকে ধরে চেয়ারে বসাল, মুখোমুখি। দুপাশে আরও দুটো চেয়ারে বিজনরা বসল। দীপা বলল, 'আমাদের দাদু।'

ডক্টর নাগ হাতজোড় করে নমস্কার করতে দাদু ঝুঁকে পড়ে সেটার সম্মান দিলেন। এই একটা ব্যাপারে দেখেছে বিজন, মাঝে মাঝে ওর বিরক্তিও লেগেছে, সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে, দাদু কোনও সম্মানীয় মানুষ অথবা ব্রাহ্মণ কেউ হলে, তা তার বয়স যাই হোক না কেন, নমস্কার করার সময় প্রায় ঝুঁকে পড়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। এক সময় মনে হত এটা এক ধরনের ক্রীতদাস-মনোবৃত্তি। দীর্ঘকাল ব্রিটিশ রাজত্বে থেকে চরিত্রের মধ্যে এসে গেছে। এখন ডক্টর নাগকে প্রায় প্রণামের ধরনে নমস্কার করাটা ওর ভাল লাগল না। ডক্টর নাগ বললেন, 'বলুন, কী হয়েছে আপনার ?' কথা বলার সময় এক ধরনের স্নেহ ঝরে পড়ে, কানে বেশ আরাম দেয়।

দাদু হাতটা সামনে নিয়ে এলেন। বিজন এইবার দেখল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দীপা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে আঙুলের ফাঁকটা ঢেকে দিয়েছে। ডক্টর নাগ দীপাকে ইঙ্গিত করতে দীপা হাতটা টেনে নিয়ে ব্যাণ্ডেজটা খুব সতর্ক হাতে খুলে নিল। টেবিলল্যাম্পের মুখটা ঘুরিয়ে আলোটা হাতের ওপর ফেললেন ডক্টর নাগ। তরপর মনোযোগ দিয়ে দুই আঙুলের মাঝখানের ঘা-টা দেখতে লাগলেন। বিজন এই চড়া আলোয় দাদুর হাতের চামড়া-শিরা দেখছিল। পোস্ট-অফিসের সিলের মতো সময় তার চিহ্ন দিয়ে ঘিরে ফেলেছে দাদুকে। হঠাৎ ডক্টর নাগ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত বয়স হল আপনার ?'

দাদু বললেন, 'এইট্টিন এইট্টিফোরে জন্ম আমার।'

মুখ তুলে তাকালেন ডক্টর নাগ, 'শরীর তো দেখছি বেশ ভাল।' তারপর একটা লম্বাটে বাক্স খুলে সূঁচের মতো জিনিস বের করলেন, 'হাতটাকে ছড়িয়ে দিন তো, আঙুলগুলো স্প্রেড করুন—হ্যাঁ।' তারপর সেই সূঁচটাকে ঘায়ের কাছাকাছি চামড়ার ওপর ফোটাতে লাগলেন, 'লাগছে ?'

দাদু চোখে বন্ধ করে কিছুটা ভেবে বললেন, 'না তো।'

আরও জোরে বিদ্ধ করে প্রায় ফিসফিসিয়ে ডক্টর নাগ বললেন, 'এবার ?'

দাদুর হাতটা সামান্য নড়ে উঠল, 'এবার যেন লাগছে, কিন্তু আরও লাগা উচিত ছিল।' ডক্টর নাগ সোজা হয়ে বসে দাদুর মুখের দিকে তাকালেন খানিক, তারপর উঠে এসে টেবিলল্যাম্পটাকে দাদুর মুখের ওপর ঘুরিয়ে দিলেন। বিজনের হঠাৎ মনে হল, কোনও নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যে যেন লাইটম্যান ফোকাস ফেলল। ডক্টর নাগ দাদুর জিভ দেখলেন, ঝুঁকে পড়ে নাক আর কান দেখলেন। তারপর দাদুর অজান্তে কানের লতিতে সেই সূঁচটা সামান্য ফুটিয়ে দিলেন। বিজন দেখল দাদুর শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটল না।

পাশের বেসিনে হাত ধুয়ে এসে ডক্টর নাগ সিগারেট ধরালেন। এবার টেবিলল্যাম্পটা তার সামনে মুখ ফোরানো। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেন ডক্টর নাগ। বিজনের মনে হল ওঁকে কেমন অন্যরকম লাগছে। দীপার দিকে বার বার তাকাচ্ছেন ভদ্রলোক। তারপর প্রেসক্রিপশন-প্যাডটা টেনে নিয়ে অনেক ভেবেচিন্তে লিখে গেলেন। বিজন লক্ষ করেনি দীপা কখন ব্যাগ থেকে টাকা বের করে হাতে রেখেছিল, এখন ও টাকাটা টেবিলের ওপর রেখে একটা পেপারওয়েট চাপা দিয়ে দিল। ডক্টর নাগের হাবভাবে বিজন একদম স্বস্তি পাচ্ছিল না। দাদুর দিকে ও তাকাল। ও দেখল দাদু মুখ তুলে দেওয়ালে টাঙানো রামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন।

প্রেসক্রিপশনটা দীপার দিকে ভাঁজ করে এগিয়ে দিয়ে ডক্টর নাগ বললেন, 'অফ্ হ্যাণ্ড বলা মুশকিল, আপনারা ওকে ইমিডিয়েটলি একবার ট্রপিক্যালে নিয়ে যান। ওরা কারেক্ট ডায়োগনসিস করবে। তবে, আমার মনে হয় ওরা আমাকেই সমর্থন করবে।' তারপর দাদুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তো বাইরে থাকেন, না ? তা যে ওষুধ আর ইঞ্জেকশন দিলাম এগুলো নিয়মিত ব্যবহার করুন, ঠিক হয়ে যাবে। তবে কলকাতায় আর বেশিদিন থাকা বোধহয় উচিত হবে না। বাইরের জলহাওয়া শরীরকে অনেকখানি হেল্প করে।' হঠাৎ বিজন দেখল দীপার হাত থর থর করে কাঁপছে। ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে হঠাৎ, চোখ বন্ধ করে ফেলেছে ও, নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে। দাদুও লক্ষ করছেন ব্যাপারটা। বিজন কিছু বলার আগেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে দিদিমণি ?'

হঠাৎ দীপা একদম শান্ত হয়ে গেল, বিজনের দিকে একবার তাকিয়ে দাদুকে বলল, 'কিছু না, আপনি এবার চলুন, অনেকে অপেক্ষা করছে।'

ওরা উঠে বাইরে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কী হয়েছে ? ডাক্তার কী বললেন ?' 'তেমন কিছু নয়।' দীপা মুখ ফিরিয়ে নিল।

নীচের ফুটপাথে আসতেই ওরা আকস্মিকভাবে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। কোনও পেসেন্ট হয়তো এইমাত্র এল ট্যাক্সিটায়। দাদুকে নিয়ে দীপা পেছনে বসল, বিজন সামনে। ট্যাক্সিওয়ালা কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করায় দাদু বলল, 'বাড়ি ফিরে চলো বিজু, কালীঘাট না হয় অন্যদিন হবে।'

বিজন ঘুরে বসে হাত বাড়াল দীপার দিকে, 'প্রেসক্রিপশনটা দাও।' ব্যাগ খুলে প্রেসক্রিপশনটা নিস্পৃহের মতো এগিয়ে দিল দীপা। বিজন সামনের দিকে ফি়রে বসে ড্যাসবোর্ডের আলোয় কাগজের ভাঁজ খুলে ধরল। ডাক্তাররা যে কেন হাতের লেখাগুলো ভাল করে না। ও আজ অবধি যত হাতের লেখা দেখেছে তার মধ্যে বোধহয় ডক্টর নাগের হাতের লেখাই সবচেয়ে খারাপ। গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে ও মুখ তুলে তাকাতেই বোম্বাইয়ের একজন নায়িকাকে খুব লাস্য মাখানো চোখে ওর দিকে তাকাতে দেখল। সিনেমা হলের সামনে লোক গিজগিজ করছে। সামনে সারিবদ্ধ গাড়ি। সিনেমা হলের আলোয় প্রেসক্রিপশনটা পড়তে লাগল বিজন।

মুহূর্তে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল ওর। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা হিমস্রোত চলকে চলকে উঠল যেন। শব্দ দুটোর ওপর চোখ রেখে ওর চোখ ফেটে জল এসে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বিজন পাথরের মতন বসে রইল। এখন ট্যাক্সিটা চলছে। ধর্মতলা স্ট্রিটের দু'পাশের জনতা, দোকানপাট, বিজনের চোখে কোনও কিছুর ছায়া পড়ছিল না। শুধু বুকের মধ্যে শব্দ দুটো ক্রমশ ওজন বাড়িয়ে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। প্রেসক্রিপশনটা আবার একবার দেখে ভাঁজ করে ফেলল বিজন। ডক্টর নাগ তাঁর স্নেহময় গলায় শব্দ দুটো কীভাবে উচ্চরণ করতেন ? কেমন লাগত শুনতে— ড্রাই লেপ্রসি !

এই সময় দাদুর গলা শুনতে পেল বিজন, 'প্রেসক্রিপশনে কী লিখেছে বিজু ?' বিজন মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। ড্রাইভারের সামনে রাখা আয়নায় ও হঠাৎ দাদুকে দেখতে পেল। দুটো হাতে লাঠিটা মুঠোয় ধরে তার ওপর গাল চেপে দাদু আয়নাটার দিকে চেয়ে বিজনের মখ দেখছেন। চোখাচোখি হতে চোখ সরিয়ে নিল বিজন। দাদু বললেন, 'কুষ্ঠ হলে শুনেছি শরীরের সাড় চলে যায়, তবে কি আমার কুষ্ঠ হয়েছে ?'

দাদুর গলার স্বরের মধ্যে এমন কিছু ছিল বিজন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বাচ্চা ছেলের মতো হু হু করে কেঁদে ফেলল ও।

অনেকক্ষণ দাদু কিছু কথা বললেন না। কান্না একটু সামলালে বিজন শুনতে পেল, 'দিদিমণি, আমার কান নাক কি ফুলে গেছে মনে হচ্ছে, লালচে লালচে লাগছে ?'

কোনরকমে দীপা বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে না।'

শবীরটা সিটের ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে দাদু আপন মনে বললেন, 'এই এতগুলো বছর বেঁচে থাকলাম কি এই জন্যে !'

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বিজন দেখল দাদু বেশ সোজা হয়ে লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে ওপরে উঠে যাচ্ছেন। পেছনে দীপা। এর আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় অন্তত উনি দীপার হাত ধরতেন, নইলে হাঁটু কাঁপে, কিন্তু এখন তাঁকে আরও শক্ত মনে হল।

ওপরে এসে বিজন শোবার ঘরে ঢুকল না। দীপা এসে বলল, 'দাদু একটু একা থাকতে চাইছেন। আর রাত্রে শুধু দুধ খেতে চাইছেন।'

বিজন কিছু বলল না। দীপা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাথরুমে চলে গেল। ওর যাওয়াব ধবনটা ভাল লাগল না বিজনের।

বিজন জানলার পাশে বসে সিগারেট ধরাল। এখান থেকে সামনের পার্কের একটা কোণ দেখা যায়। ইলেকট্রিক আলোর তলায় বসে একটা ফুচকাওয়ালা ভিড় জমিয়ে বিক্রি করে যাচ্ছে। কয়েকজন পরিচিত-মুখ বৃদ্ধ বেঞ্চিতে বসে। বাচ্চারা যে যার বাড়িতে ফিরে গেছে। পার্কটা এখন একদম শান্ত, চুপচাপ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঝাপসা হয়ে গেল পার্কটা, ও যেন স্পষ্ট দেখতে পেল লাঠি হাতে দাদু দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন আর সাত বছরের ছোট্ট বিজন দৌড়ে দৌড়ে তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে চাইছে। দাদুর কথা মনে হলেই এই ছবিটা ওর সামনে চলে আসে। আরও ছোটবেলায়, দাদুর গায়ের গন্ধ না পেলে ওর ঘুম আসত না। মানুষ তার ছেলেবেলার কোন সময় অবধি স্মৃতিতে রাখতে পারে ? বিজন খুব ঝাপসাভাবে একটা দৃশ্য দেখে, সে দাদুর কোলে বসে আছে, সামনে থালায় অনেক কিছু সাজানো। দাদু হেসে উঠে বললেন, 'ও কলম ধরেছে, তার মানে লেখক হবে, রবিঠাকুর হবে।' এটা কি ওর অন্নপ্রাশনের ঘটনা ? তা কি মনে রাখা যায় ? কিন্তু ও জানে দাদুর সামনে দাঁড়ালে দাদু ওর মনের প্রত্যেকটা স্তর চিনতে পারেন। যেমন—চোখ বন্ধ করে কোনও রাজমিস্ত্রী নিজের হাতে গড়া চারতলা বাড়ির প্রতিটি ইট চিনে নিতে পারবে ! দীপাকে বিয়ে করার সময় এই মানুষটি তাঁর বিরাট হাত দিয়ে সমস্ত বাধা আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন।

কুষ্ঠ হলে মানুষ মারা যায় ? নিশ্চয়ই যেত কখনও। কিন্তু এখন, এখন তো কত ওষুধ বেরিয়েছে। ওর মনে আছে, একবার দাদুর সঙ্গে বর্ষাকালে তিস্তা পেরুচ্ছিল বিজন। নৌকোয় গাদাগাদি করে মানুষ বসে। মাথার ওপর বর্ষার মেঘ ঝুলে আছে। ভিজে হাওয়ার দাপটে ছুটন্ত ঢেউগুলোর ফাঁক দিয়ে নৌকো নিয়ে যাচ্ছিল মাঝি। যাত্রীরা কেউ কথা বলছিল না। মাঝে মাঝে বুড়ো হালের মাঝি আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠছিল, 'তিস্তা মাইকি জয় !' টলমলে নৌকোয় দাদুর কোমর জড়িয়ে বসেছিল বিজন। বুকের মধ্যে শিরশিরানি ভয়। হঠাৎ নৌকোটা খুব বড় একটা ঢেউ-এর মাথায় চড়ে বসে প্রায় কাত হয়ে পড়ল। অনেকখানি জল ছিটকে এল ওদের গায়ে। গেল গেল চিৎকারের সঙ্গে বিজন দেখল, একটা লোক তাদের পিছন থেকে ঝুপ করে জলে পড়ে গেল ; আর একটু হলেই নৌকোর তলায় চলে যেত সে, দাদু চকিতে হাত বাড়িয়ে তার জামা ধরে ফেললেন। তারপর অনেক কষ্টে যখন তাকে ওপরে টেনে আনলেন দাদু তখন শিউরে উঠেছিল বিজন। লোকটার নাক কান গলে গেছে। মাথায় চুল নেই। আঙুল না থাকায় নৌকো ধরে বসতে পারেনি। ওর মনে পড়ল নৌকোতে ওঠার সময় সে ঘোমটা দিয়ে বসে ছিল। বোধহয় কাউকে নিজের চেহারা দেখাতে চায়নি। আর দাদু যখন তাকে টেনে তুলেছিলেন তখন কেউ তার সাহায্যে হাত বাড়াতে চায়নি। তিস্তার জলে হাত ধুয়ে দাদু বলেছিলেন, 'মহাপাপের ফল কি এত তাড়াতাড়ি মেটানো যায় !'

কথাটার মানে তখন বোঝেনি বিজন। এখন এই সন্ধেবেলায় পার্কের ওপাশে বাড়িগুলোর মাথায় আসা চাঁদের দিকে তাকিয়ে সেই লোকটাকে পরিষ্কার মনে পড়ে গেল। এখন ও জানে কুষ্ঠ কোনও মহাপাপের ফল নয়। কিন্তু দাদু তখন কথাটা কী বিশ্বাসে বলেছিলেন ? এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সৃষ্টি

করা শরীর নিয়ে যারা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে না তারা নিশ্চয়ই খুব দুঃখী। কিন্তু যে কোনও ব্যতিক্রমের পেছনেই তো কারণ থাকে। দাদু কি তাকেই মহাপাপ বলেছিলেন ? ও হঠাৎ দেখতে পেল দাদু তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাদুর দিকে তাকিয়ে ও চোখ দু'হাতে ঢেকে ফেলেছে। ওঁর নাক নেই, কান নেই, হাতের আঙুল খসে গেছে। ঠোঁটেব আড়াল না থাকায় দাঁতগুলো বীভৎস লাগছে, দাদু বলছেন, 'চলো হে, সূর্য প্রণাম করে আসি।'

খুট করে আলোটা জ্বলে উঠতে চমকে উঠল বিজন। দীপা ঘরে এসেছে কখন, 'অন্ধকারে বসে আছ ?'

বিজন দেখল, দীপাব চেহারাটা একদম পালটে গেছে এই কয় ঘণ্টায়। এবং এতক্ষণ পরে এই প্রথম দীপাব পেটের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নাড়া খেল ও। ডক্টর নাগ প্রেসক্রিপশনে আণ্ডারলাইন কবে লিখেছেন, 'একদম সংক্রামক নয় !' কিন্তু—। কিছু কি বলা যায় ?

খুব আস্তে বিজন বলল, 'কী যে হয়ে গেল !'

দীপা বলল, 'একা থেকো না। দাদু না চাইলেও তোমার ও-ঘরে যাওয়া উচিত। আমি ওঁর দুধ নিয়ে যাচ্ছি। তুমি নিজেকে শক্ত করো।'

দীপা চলে গেলে বিজন দাদুর ঘরে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে ভেতবে ঢুকে দেখতে পেল জানলার ধারে চেয়ারে দাদু বসে আছেন। মুখ বাইরের দিকে ফেরানো। পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন, 'কে বিজু, এসো। না, না, বিজু তুমি খাটে বসো না।'

প্রায় একটা চাপা আর্তনাদ করল বিজন, 'দাদু।'

'আমি চলে গেলে এই ঘর হোয়াইট-ওয়াশ কবে নিলে ভাল করবে। বিছানার চাদর-টাদরগুলো ফেলে দিলে ভালই, নইলে লাইজলে ধুয়ে নিও। ধোপার বাড়ি দিও না। আর কাল সকালে গিয়ে শিলিগুড়ির টিকিট কিনে এনো। ট্রেনে না পাও, প্লেনে। আমি টাকা দেব।' দাদু খুব স্পষ্ট গলায় কথাগুলো বলে গেলেন।

'সকালেই চলে যাবেন ?' কথাটা বলতে গিয়ে বিজন চমকে উঠল। ও কি মনে মনে দাদুর চলে যাওয়া চাইছে ! নইলে প্রশ্নটা করার সময় হঠাৎ এক ধরনের স্বস্তি চলকে উঠল যেন ওর মনে ? নিজেকে এই মুহূর্তে ভীষণ ছোট মনে হল ওর।

দাদু ওর মুখের দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ। এই মুহূর্তে আমার শিলিগুড়িতে যাওয়া প্রয়োজন।'

'কিন্তু ডাক্তার তো আপনাকে ট্রপিক্যালে দেখাতে বলেছে। ওখানে দেখানোর আগে আপনার অসুখটা সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।' বিজন বলল।

দাদু হাসলেন, 'ধরো তোমার ট্রপিক্যাল পরীক্ষা করে বলল এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের লেপ্রসি, ভীষণ সংক্রামক, তুমি কী করবে ?'

বিজন কোনও উত্তর দিল না। দাদু আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। এই কয়েক ঘণ্টায় মানুষটার চেহারা কেমন যেন বদলে গিয়েছে। ওদের বংশে নাকি এত দীর্ঘ সময় কেউ বাঁচেনি। বোটানিকসের সেই গাছটার মতো হয়ে গেল ব্যাপারটা। মূল শেকড় থেকে যে কাণ্ড বেরুল তার অজস্র শাখা এবং তা থেকে প্রশাখা—সবাই মাটিতে শিকড় নামিয়ে দিয়ে মজবুত হল। এখন মূল শেকড়ে যখন ঘুণ ধরল, শুকিয়ে গেল, তখন তাকে চেনা গেল না, প্রয়োজন হল না।

হঠাৎ দাদু বলল, 'বিজু, আমাব জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে ?'

উত্তর দিতে পারল না বিজন। এ কথা জোর করে চেঁচিয়ে বলা যায় না।

'দ্যাখো, আমার এই শরীবটার বয়স তো অনেকদিন নব্বই পেরিয়ে গেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে আমি আমার শরীরটার কত রকম চেহারা দেখলাম। নিজের শরীরের জন্য এক সময় ভীষণ মায়া হত। তারপর রোদ জল ঝড়ে এই শরীরটার ওপর শ্যাওলা পড়তে দেখলাম। তা সেটা বোধ হয়

ষাট বছর বয়স হবে। দেখলাম শরীরের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে। হাতের গুলিগুলো কেমন ঢিলে হয়ে গেল। তখন তুমি সেই চার বছরের বিজু। কচি কচি হাত পা, গাল টিপলেই রক্ত ছুটে আসে। তোমাকে বুকে নিয়ে যখন ঘুমোতাম তখন নিজের শরীরটার কথা মনে থাকত না আর। তোমাকে আমি একটু একটু করে বড় করে তুললাম। নিজের কথা মনে থাকল না আর। অতীতের কথা ভাবলেই তো বর্তমানের জন্য কষ্ট হয়। আমার নিজের দশ-বারো বছরের চেহারাটার কথা মনে এলেই তোমার দিকে তাকাতাম। তুমি তো আমার শরীরের আদল পেয়েছ। আমার আফসোস থাকত না। শুনেছি সাধক যাঁরা, তাঁরা নিজের শরীর ছেড়ে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে ঘুরে বেড়ান। আমার তো সে ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু মনে মনে তোমার যৌবনকে আমার বলে ভাবতে একটুও কষ্ট হত না। এটা যে কী ধরনের তৃপ্তি বুঝবে ন । এখন, এই শরীরের জন্যে কষ্ট নেই। আমি তো বড় জোর দু'তিন বছর বাঁচতাম। এই জীর্ণ শরীরটার কুষ্ঠ হোক আর নাই হোক কী এসে যায় তাতে। তুমি তো সুস্থ হয়ে বেঁচে আছ, বিজু তুমি বেঁচে থাকা মানেই আমার বেঁচে থাকা !' এক নাগাড়ে বলা কথাগুলো শেষ দিকে যেন ভারী হয়ে আসতে লাগল। দাদু যেন ওজন বইতে না পেরে হাঁপাচ্ছিলেন। তারপর আবার বললেন, 'মনে করে কাল টিকিট নিয়ে এসো। শিলিগুড়িতে না গেলে আমি একটুও স্বস্তি পাচ্ছি না।' বিজন দেখল দীপা এক গ্লাস দুধ আর মিষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকছে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল না বিজন।

মেঝেতে পাতা বিছানায় শোয়া এখন কোনও ব্যাপার নয়, বিজন মড়ার মতো পড়েছিল। আজ রাত্রে ওর খাওয়া হয়নি তেমন, খাবার ইচ্ছেটাই শরীরে ছিল না। দীপা কী করছে কে জানে। এখন রাত অনেকটা হবে। দীপা ওর দিকে পাশ ফিরে হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। বিজন জানে দীপা ঘুমোয়নি। দাদুর ব্যাপার নিয়ে দীপা কোনও কথা বলছে না। অবশ্য আলাদা করে বলার মতো সময়ও পায়নি। বেচারা যে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে এটা বোঝা যায়। আজ রাত্রে দাদুর ঘা-টা ড্রেস করে মলম লাগিয়ে দেওয়া হল না। রোজ দীপাই করত। এমনিতেই ওর ঘেন্নাপিত্তি কম। আজ কি ওর খেয়াল হয়নি, না সাহস পায়নি !

হঠাৎ দীপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'কী হবে ?'

বিজন এইরকম প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিল, 'ধ্যুৎ, একটা ডাক্তার কোনও টেস্ট না করেই বলে দিল লেপ্রসি আর তাই সত্যি হয়ে গেল—এটা কি সম্ভব ! কত পরীক্ষা করে তবে বোঝা যায়, ডাক্তারকে আমার ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু দাদু তো একদম নার্ভাস হলেন না। এমন কী আবার পরীক্ষা করাবার কোনও আগ্রহ নেই। আমার হঠাৎ মনে হল উনি জানতেন।' দীপা বলল।

'কী যা তা বলছ', বিজন প্রতিবাদ করল, 'জেনেশুনে কি উনি আমার কাছে আসবেন ? দীপা কোনও উত্তর দিল না প্রথমটায়, তারপর বলল, 'আমার বাড়ির লোকেরা কী ভাববে কে জানে। ডাক্তার নাগ কি না বলে ছাড়বেন !'

এই ব্যাপারটা ভাবেনি বিজন। দীপার আত্মীয়স্বজন এমন কী বিজনের নিজের বাড়ির লোকেদের কী প্রতিক্রিয়া হবে ! দাদুকে কি কাকারা একঘরে করে দেবে ? নাকি কোনও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে !

বিজন বলল, 'ডাক্তার তো বলেছে সংক্রামক নয়।'

'কেউ বিশ্বাস করে !' চট করে জবাব দিল দীপা, 'আমার জন্যে নয়, এই পেটেরটার জন্য ভয় হচ্ছে গো।'

'তুমি তো খুব শক্ত মেয়ে, এত ভয় পাও কেন', বিজন নিজের সঙ্গে যেন কথা বলল।

'নিজের জন্যে আমি ভয় পাই না।'

'দাদু কালই চলে যেতে চাইছেন।'

'আমি আর পারছি না।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'এ বাড়ি তুমি ছেড়ে দাও, এখানে থাকার সাহস আমার নেই।'

বিজন এক হাত বাড়িয়ে দীপাকে জড়িয়ে ধরল। কেমন ঠাণ্ডা দীপার শরীর।

'দীপা, তুমি খুব ভাল মেয়ে, প্লিজ, দাদু যেন না বুঝতে পারেন কিছু।'

হঠাৎ দীপা বলল, 'আচ্ছা, দাদু এটাকে এত স্বাভাবিকভাবে নিলেন কেন ?'

বিজন বলল, 'একটা বয়সে এলে মানুষ সব কিছু স্বাভাবিকভাবে নেয়।'

অন্ধকারে মাথা নাড়ল দীপা, 'আমার মনে হল দাদু যেন জানতেন। কিছু মনে করো না, তোমাদের বংশে কি কারও এ রকম হয়েছিল ।'

'আমাদের বংশে ?' কথাটা বলে পাথরের মতো হয়ে গেল বিজন। সমস্ত শরীর নিরক্ত হয়ে গেল হঠাৎ। দীপা কি এটাকে বংশানুক্রমিক রোগ বলে ভাবছে ? কোনদিন কারও মুখে তো এই রোগের কথা শোনেনি। এই রোগ রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে ! দীপার পেটে যে এসেছে তার কথা এই জন্যে ভাবছে দীপা ?

'বিজু, তুমি বেঁচে থাকা মানেই আমার বেঁচে থাকা।' কথাটা হঠাৎ মনের মধ্যে ছুটে এল। বাড়ির লোকে বলত দাদুর সব কিছু নাকি ও পেয়েছে। সব কিছু ?

দীপার শরীরের ওপর নিঃসাড় পড়ে থাকা হাতটা সরিয়ে আনল বিজন। তারপর জানলা দিয়ে চুঁইয়ে আসা জ্যোৎস্নায় চোখ রেখে বলল, 'আমি জানি না।' তারপর জুড়ে দিল, 'এই প্রথম শুনলাম।'

চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় বিজন বুঝল দীপা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর জন্যে খুব কষ্ট হল বিজনের। বেচারা এখনও ছেলেমানুষ। এই অবস্থায় পড়লে হয়তো বিজনও একই প্রশ্ন করত। কাল দাদু চলে গেলে ঘরদোর লাইজলে ধুয়ে নিয়ে হবে। হেসে ফেলল বিজন, মানুষের মন কীভাবে ধুয়ে মুছে সাফ করা যায় !

শেষ পর্যন্ত ঘুম এল না ওর। বিজন জানলায় উঠে বসে সিগারেট ধরাল। জ্যোৎস্নার রঙ ফিকে হয়ে আসছে। সামনের পার্কটায় একটা ভিখিরি গোছের লোক কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। এখন কোথাও কোনও শব্দ নেই। কলকাতা মাঝে মাঝে কেমন শান্ত হয়ে যায়। দীপার দিকে তাকাল ও। ঝাপসা অন্ধকারে ওকে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো দেখাচ্ছে। ঘুম এল না বিজনের। দীপার ঘুমন্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ গায়ে মেখে মেখে হাওয়ারা এবার বিজনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া আসা শুরু করল।

মাঝরাত্তির পেরোলে শব্দরা বড় শক্তিশালী হয়। খুট্‌ শব্দটা যত সতর্কেই হোক না কেন, বিজনের কান এড়াল না। কিন্তু এখন তো ঠিক মাঝরাত্তির নয়। বসে বসে ঢুলুনি এসেছিল বিজনের, শব্দটা শুনে চটকা ভেঙে বাইরে তাকাল। আকাশের চেহারাটা দু'হাতের মুঠোয় আদর করে ধরে রাখার মতন। দীপা এখনও ঘুমোচ্ছে সেই একই ভঙ্গিমায়। বিজন উঠে সন্তর্পণে দরজা খুলল। চোর-ফোর আসতে পারে।

বাইরে পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়াল ও। পাশের ঘরের দরজা সন্তর্পণে বন্ধ করছেন দাদু। এই ঝাপসা অন্ধকারেও ওঁর সাদা পাঞ্জাবি দেখা যাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াতেই বিজনের সঙ্গে চোখাচোখি হল ওঁর। লাঠিটা মাটি থেকে সামান্য ওপরে তুলে এগিয়ে এলেন কয়েক পা, 'তোমার এখানে লাস্ট মর্নিং-ওয়াকটা করেই আসি, কি বলো ?'

বিজন ভাবতে পারেনি, আজ, কালকের ঐ ঘটনার পর দাদু এত সহজে মর্নিং-ওয়াক করতে বেরুতে পারেন। ও অবাক হয়ে তাকাতে গিয়ে লাস্ট শব্দটার কথা ভাবল। দাদু আজ চলে যাবেন বলে কি লাস্ট মর্নিং-ওয়াকের কথা বললেন ? নাকি, আত্মহত্যার—নিজেকে শেষ করে দেবেন বলে এমন চোরের মতো বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ।

বিজন বলল, 'এখনও তো ভোর হয়নি।'

'দেরিও নেই। তুমি আমাকে রাত চিনিও না।' বাইরের দরজার কাছে এগিয়ে দাঁড়ালেন দাদু, 'দিদিমণিকে আজ আর কষ্ট দিও না। আমি একাই ঘুরে আসি।'

দাদুকে দরজা খুলে সিঁড়িতে দাঁড়াতে দেখে বিজন বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে থেকে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দাদুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও, 'আমি আপনার সঙ্গে যাব !'

'সে কী ! দরজা খোলা রইল, দিদিমণি একা থাকবে—'

'কিছু হবে না।'

'তা ছাড়া তোমার অভ্যেস নেই—।'

'চলুন।' দাদুর কনুই ধরল বিজন।

এখন সিঁড়িতে বেশ অন্ধকার। অত্যন্ত সাবধানে পায়ে পায়ে দাদুকে নীচে নামিয়ে আনল বিজন।

রাস্তায় এখন ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। চারধারের বাড়িগুলো ভীষণ বকম চুপচাপ। পার্কের ঘাসে ইলেকট্রিক আলো ক্যাটকেটে হলদে নিয়ে মুখ থুবড়ে আছে। এত ভোরে অনেকদিন ওঠা অভ্যেস নেই ওর। অবশ্য আজকে ঠিক ওঠা বলা যায় না।

দাদু বললেন, 'এসো, এই রাস্তায় পায়চারি করি।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বিজন, 'দাদু, আজ নদীর ধারে যাব।'

'নদী !' বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাকালেন, 'সে কত দূর !'

'বেশিদূর না। আমি অবশ্য কোনদিন যাইনি।' বিজন দাদুকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পালপার্বণের দিন এই রাস্তা দিয়ে মেয়েদের গঙ্গাস্নানে যেতে দেখেছে ও।

বিজন সামনে হেঁটে যাচ্ছে, পেছনে লাঠি হাতে দাদু। ফুটপাতে লাঠির শব্দ উঠছে। এই নির্জন শেষরাত্রে শব্দটা শুনতে শুনতে বিজন হাঁটছিল। বড় রাস্তায় এসে একটা রিকশাওয়ালাকে দেখতে পেল বিজন। কেমন হেলতে-দুলতে যাচ্ছে। যাওয়া-আসার কড়ারে ওর রিকশা নিল ও। বাড়ি ফিরে ভাড়া দেবে।

দিনের প্রথম সওয়ারি নিয়ে রিকশা ছুটছিল গঙ্গার দিকে। রাস্তায় এখন দু'একজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারের চুবড়িটা এখনও উপুড় করা আকাশটাকে অনেকদিন দেখেনি ও। সেই বাল্যকালে অথবা কৈশোরে মহানন্দার ধার দিয়ে দাদুর পেছন পেছন ছুটে যেতে ঐ আকাশটাকে দেখতে পেত ও।

গঙ্গার পাড়ে এসে ওরা রিকশা থেকে নামল। দাদু বললেন, 'বাঃ।' একবুক শান্তির মতো এপার ওপার জুড়ে থাকা জলেরা ঢেউ তুলে তুলে যায়। বিজন দেখল, দাদু বেশ শক্ত মানুষের মতো লাঠি দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন নদীর পাড় ধরে। বিজন তাল রাখতে পারছিল না। সেই ছোটবেলায় যেমনটি হত আকাশের রঙ পাল্টে যাচ্ছে এখন। পুব দিকটা সদ্য জন্মানো বাচ্চার মতো লাল হাতের মুঠো খুলছে। খানিক বাদেই মুঠো মুঠো সোনা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেবে আকাশময়। সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে দাদু দাঁড়িয়ে গেলেন পুবমুখো। বিজন জানে এখন সূর্যস্তোত্র পাঠ করবেন উনি।

বিজন দেখল, নদীর শরীর থেকে ধোঁয়ারা সুতোর মতো উঠে যাচ্ছে না আকাশের দিকে, যেমনটি মহানন্দায় হত। হয়তো সব নদীর চরিত্র সমান নয় অথবা এখন সেই ঋতু নয়। হঠাৎ ও শুনল দাদু ডাকছেন 'বিজু।' দু'হাতের মুঠোয় লাঠিটাকে ধরে দাদু বললেন, 'দেখছ, রাতটা কেমন খসে খসে পড়ছে। আমরা বলি ভোর হচ্ছে। আমার শরীর যদি খসে খসে পড়ে তখন তুমি কী বলবে বিজু ! বড় ভার জমে যাচ্ছে ভাই। এই এতগুলো বছরের ভার। তবু তো অভিজ্ঞতার শেষ হয় না। তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারিনি, আমার এতগুলো বছর শুধু তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমার তো কেউ

দেয়নি।'

সোনার কড়াইটার এখন উপুড় হয়ে যাবার সময় হয়েছে। জলের ওপর কচি কলাপাতার ছায়া মাখামাখি হতে শুরু হল। দাদু বললেন, 'গায়ে মুখে রোদ মাখো বিজু, এই রোদে কখনও ঘাম হয় না।'